পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

(নব পর্য্যায়)

রাণী শ্রীনিরুপমা দেবী সম্পাদিত।

সহঃ সম্পাদক শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

অষ্টম বর্ষ।

১৩৩০ সনের অগ্রহায়ণ—১৩৩১ সনের কার্ত্তিক।

কোচবিহার।

কোচবিহার ষ্টেট প্রেসে

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, বার আনা।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

অষ্টম বর্ষ।

১৩৩০ সনের অগ্রহায়ণ—১৩৩১ সনের কার্ত্তিক।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৮ম বর্ষ। | অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সাল। | ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

নতি।

—:o:—

আজ তোমাকে প্রণাম করি; আজ এ জন্ম-দিনে দেহমন লুণ্ঠিত করিয়া কামনা-বাসনা সমস্ত লুটাইয়া দিয়া সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হই তোমার বরাভয়প্রদ শ্রীশ্রীচরণ-মহাতীর্থে। জীবন-জগরাণের দেবতা তুমি, হে সর্ব্বময় কর্ত্তা বিশ্ব-নিয়ন্তা! তোমারি নিয়োগে, তোমারি আহ্বানে জগত ছুটিয়া চলিয়াছে কর্ম্ম-প্রবাহে। তোমারি কর্ম্ম, করিতেছ তুমি; অণুতে পরমাণুতে হৃদয়ে হৃদয়ে অবস্থান করিয়া হে গোপ্তা, তুমি যাহাকে যেখানে নিযুক্ত করিতেছ, সে করিতেছে তোমার সেই কার্য্য। অনাদিমধ্যান্তম্, আদিতে তুমি, মধ্যে তুমি, অন্তেও তুমিই আশ্রয়,—পরমাগতি।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-

স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম

ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।

হে আদি দেব, অনাদি পুরুষ, বিশ্বের প্রকৃষ্ট লয়কেন্দ্র, তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য, পরম আশ্রয় তুমি, বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বর, হে সর্ব্বস্বরূপ।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে

নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।

অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং

সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

হে গুরুগরীয়ান্, তোমায় কোটি কোটি নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করি,—তোমার ইচ্ছা আমাতে পূর্ণ হউক। হে আনন্দময়!

"তব আনন্দ আমার অঙ্গে মনে

বাধা যেন নাহি পায় কোনো আবরণে।

তব আনন্দ পরম দুঃখে মম

জ্বলে' উঠে যেন পুণ্য আলোকসম,

তব আনন্দ দীনতা চূর্ণ করি

ফুটে ওঠে ফেটে আমার সকল কাজে।

* * *

তব আনন্দ মহাসঙ্গীত বাজে।"

ক্লান্তি যেন না আসে হে দেবতা এ কর্ম্মজীবনে, ভার বোধ যেন না হয় তোমারকর্ম্মে। আনন্দ-আহ্বানে কর্ম্ম-মাধুর্য্যে পাগল করিয়া আহ্বান করিয়াছ যে

প্রাঙ্গণে তাহা আনন্দাতিশয্যে হয় যেন উৎসাহমুখর। যেন অকপটে বলিতে পারি—

'তোমারে সঁপেছি দিনের কর্ম্ম,
　　তোমারে সঁপেছি প্রাণ।'

বিচার করিতে হয় তুমিই কর—আমি নহি আমার কার্য্যের সমালোচক—

'ওহে বিচারক, আপনার হাতে
　　সুবিচার কর দান।
* * *
তুমি জান আমি কত ভুলে ভুলি,
দুঃখের বোঝা নিজ হাতে তুলি,
কঠিন বাঁধন খুলেও না খুলি
　　বাঁধে যবে মায়াডোর ;'

সেও তোমারি ইচ্ছায়।

'তুমি জান মোর যে সকল কথা
　　আমি নিজে নাহি জানি,
দর্পণসম দেখিয়াছ তুমি
　　আমার জীবনখানি।'

সমস্তই তুমি জান ; হে সর্ব্বজ্ঞ! গোপন নাই কিছু—শক্তি নাই কিছু গোপন করিবার! হে বিরাট ব্যবস্থাপক, তোমারি ব্যবস্থা ধন্য হউক—সার্থক হউক এ জীবন। শুভাশুভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচারের আর স্থান কোথা? এ জীবনে শুভের উদ্ভব হইয়া থাকে যদি সেও তোমারি ব্যবস্থায়, অক্ষমতা ফুটিয়া উঠিয়া থাকে যদি সেও তোমার কৃপায়, কেননা কখনও কোন কারণে কষ্ট অনুভব

হইয়াও থাকে যদি—তাহাও এক দিন মানিয়া লইতে হইবেই—

'দুঃখের সাথে পেয়েছি যে সুখের ধনে,

* * *

ফসল হেথা উঠচে ফলে হৃদয় বনে,'

তোমার অমোঘ বিধানে কর্ম্মফল—ফসল এক দিন ফলবেই, সেই আশাই পরিচারিকার জীবনের অবলম্বন—তোমার শ্রীশ্রীচরণে শরণ লইয়া মহা আনন্দে তোমার বিজয় কেতুর তলে নত হইয়া গাই—

'বিজয় পতাকা উড়িয়াছে আজ

হৃদয় গগন ঢাকি'

জুটেছি, ফুটেছি, লুটেছি তাঁহার

শ্রীচরণ-রেণু মাখি ॥'

রামায়ণের ধর্ম্ম ।

—:o:—

(২)

অযোধ্যাকাণ্ডে যে ধর্ম্মের পরিচয় পাই এইবার সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

রামায়ণের সময় যে চার্ব্বাকমত, নাস্তিকমত ও বৌদ্ধমতের প্রচলন ছিল তাহা আমরা অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৮ এবং ১০৯ সর্গে দেখিতে পাই। ১০৮ম সর্গে দেখি, রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইবার জন্য জাবালি কহিতেছেন,

চার্ব্বাকমত ও জাবালি

"জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হয়। অতএব মাতাপিতা বলিয়া যাহার স্নেহাসক্তি হইয়া থাকে, সে উন্মত্ত। যেমন কোন লোক প্রবাসে গমন করিবার কালে গ্রামের বহির্দ্দেশে বাস করে, আবার

পরদিন সেই আবাস সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, পিতা মাতা গৃহ ও ধন তদ্রূপ জানিবে, সজ্জনেরা কোনও মতে উহাতে আসক্ত হয় না। সুতরাং পিতার অনুরোধে পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, দুঃখজনক দুর্গম সঙ্কটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য হইতেছে না। * * * দশরথ তোমার কেহ নহেন, তুমিও তাঁহার কেহ নও; তিনি অন্য, তুমিও অন্য, সুতরাং আমি যেরূপ কহিতেছি তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। * * * যাহারা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি। তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অন্তে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃ দেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, দেখ ইহাতে কেবল অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ কে কোথায় শুনিয়াছে যে মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে? যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে উহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক ব্যক্তিকে আহার করাও, উহাতে কি ঐ প্রবাসীর তৃপ্তি লাভ হইবে? কখনই না। যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা, যজ্ঞ দান ও তপস্যা প্রভৃতি কার্য্যের বিধান আছে ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার জন্য সেই সকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। অতএব, রাম! পরলোক সাধন ধর্ম্ম নামে কোন পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরলোকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও।"

সুতরাং দেখিতে পাইতেছি ইহলোক পরতন্ত্রতা এবং দেবপূজা, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ধর্ম্ম ও শ্রাদ্ধের উপর বিরক্তি এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ নির্ভরতা চার্ব্বাকের সহিত একেবারে মিলিয়া যায়। পরলোক সাধন ধর্ম্মের উপর চার্ব্বাক ও জাবালি উভয়েই খড়্গহস্ত। রামচন্দ্র এই সমাজদ্রোহী এবং ধর্ম্মবিদ্বেষী মতকে যে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন তাহা আমরা পরবর্ত্তী সর্গে দেখিতে পাই। জাবালির বক্তৃতার উত্তরে রামচন্দ্র কহিলেন, "এক্ষণে আপনি যাহা কহিলেন, তাহা বস্তুতঃই অকার্য্য এবং অপথ্য। যে পুরুষ পামর ও বিপথগামী এবং যে জন-সমাজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া থাকে, সে সাধুলোকের নিকট কখনই সম্মান পায় না। আপনি যেরূপ কহিলেন, তদনুরূপ আচরণ করিলে নানা

নাস্তিকতা সমাজদ্রোহী

অনর্থক ঘটিবে। আপনার মত অত্যন্ত অপ্রশস্ত। ইহার বলে লোক কার্য্যতঃ অনার্য্য হইলেও যেন ভদ্র, কদাচারী হইলেও যেন শুদ্ধ স্বভাব এবং দুর্দর্শন হইলেও যেন লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপনাকে অনুমান করিয়া থাকে।

আমি যদি এই লোকদূষণ অধর্ম্মাক্ত ধর্ম্মবেশে গ্রহণ করি এবং প্রকৃত শ্রেয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবৈধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে বিজ্ঞের নিকট অনাদৃত ও কুলাচার হইতে পরিভ্রষ্ট হইব। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ জন্য উৎকৃষ্ট গতি লাভের আর প্রত্যাশা থাকিবে না এবং প্রজারাও আমায় ধর্ম্মবিপ্লবকারী ও স্বেচ্ছাচারী দেখিয়া আমার অনুকরণ করিবে, কারণ রাজার যেরূপ আচার প্রজার তদ্রূপই হইয়া থাকে। অতএব আপনি যেরূপ কহিলেন, তাহা কোন মতে প্রীতিকর নহে।"

দেখিতে পাইলাম জাবালির মত গ্রহণ করিলে সমাজ উচ্ছন্ন যায় এবং অবৈধ ব্যবহারের শেষ থাকে না। সুতরাং এই মত কার্য্যকরী নয়। আধুনিক Pragmatistগণও ঠিক এইরূপ যুক্তি দ্বারাই জাবালির মত খণ্ডন করিতেন। সুতরাং নবীন ও প্রাচীনের মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বৌদ্ধ ও নাস্তিকের প্রতি রামচন্দ্রের ঘৃণা ও বেদে বিশ্বাস

রামচন্দ্র জাবালিকে আরও কহিলেন, "আপনার বুদ্ধি বেদবিরোধিনী, আপনি ধর্ম্মভ্রষ্ট নাস্তিক; আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার এই কার্য্যকে নিন্দা করি। যেমন বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিকেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে। অতএব যাহাকে বেদ বহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণ করিবে না।"

অবস্থা সুবিধাজনক নয় দেখিয়া জাবালি বিনয় বচনে কহিলেন, "আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছুই নাই, তাহাও নহে। আমি সময় বুঝিয়া আস্তিক হই, আবার অবসর ক্রমে নাস্তিক হইয়া থাকি।" ইহাতে যে জাবালি--বিপ্রতীতর হইয়া দাঁড়াইল তাহা মূর্খ জাবালি বুঝিলেন না। এইরূপ লোক যে বিষকুম্ভ পয়োমুখ, বিশ্বাসঘাতী নরাধম হইয়া সমাজের ব্যাধি স্বরূপ হইয়া দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং সুযোগ পাইলে স্বেচ্ছা-পরতন্ত্রতার ও নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সমাজের নানা প্রকার অনিষ্ট সাধন করিয়া চার্ব্বাকত্ব ঘোষণা করিয়া থাকে তাহা আমরা জানি। পাছে রামচন্দ্র জাবালিকে এই কথার জন্য আরও তিরস্কার করেন এই ভয়েই

বোধ হয় বশিষ্ট রামচন্দ্রকে উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া তাড়াতাড়ি বেদবিহিত ধর্ম্ম ও সৃষ্টি রহস্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

বৌদ্ধ ও নাস্তিকেরা তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ

বৌদ্ধ ও নাস্তিকেরা রামায়ণে সময়ে তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ হইত। ইহা হইতে রাজনীতির অনুদারতা সহজে প্রতীয়মান হয়। কোন এক বিশেষ মতবাদের জন্য যে লক্ষ লক্ষ লোককে প্রাণ দিতে হইয়াছে তাহা যাঁহারা খৃষ্ট ও ইস্লাম ধর্ম্মের ইতিহাস পড়িয়াছেন তাঁহারা বিশেষ ভাবে অবগত আছেন। সুতরাং দেখা গেল ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান শুধু ইউরোপ এবং আরবের একচেটিয়া নয়, ভারতবর্ষেও সে অনুষ্ঠান প্রাচীন কালেও হইত।

বৌদ্ধকথা প্রক্ষিপ্ত

রামচন্দ্রের উক্তিতে বৌদ্ধমতের উল্লেখ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম রামায়ণের অনেক পরবর্ত্তী সুতরাং এ সর্গকে, কিম্বা এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সাব্যস্ত করিতে বোধহয় কোন ঐতিহাসিকই ইতস্ততঃ করিবেন না।

রামচন্দ্রের সত্যধর্ম্ম

জাবালির মত খণ্ডন করিয়াই রামচন্দ্র ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আপনার ধর্ম্মমতও সেই সঙ্গে জাবালিকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। রামচন্দ্র জাবালিকে কহিলেন, "অনাদি শাস্ত্রসকল দয়া প্রধান রাজত্ব স্বয়ং সত্য, এই নিমিত্ত লোকে রাজাকে সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সত্যের প্রভাব অতি চমৎকার, সমস্ত লোক সত্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, দেবতা ও ঋষিগণ সত্যেরই সবিশেষ সমাদর করেন, সত্যবাদীর ব্রহ্মলোক লাভ হয়। সত্যই সর্ব্ব ধর্ম্ম সকলের মূল। সত্য ঈশ্বর, সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন, সকল বস্তুই সত্যমূলক এবং সত্য অপেক্ষা পরমপদ আর নাই। দান যজ্ঞ হোম ও তপঃ প্রতিপাদক বেদশাস্ত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ, তাহাকেই তুমি যশ ও কীর্ত্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে। অতএব সত্যপর হওয়া সর্ব্বতোভাবেই উচিত * * * আমি তাহাদের সমক্ষ পিতা নিকটে বদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ আমায় যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি কেন তাহা অবহেলা করিব। আমি তাঁহার

নিকট সত্যে প্রতিশ্রুত আছি, এক্ষণে ক্রোধ মোহ বা অজ্ঞানতা বশতই হউক কোন মতে গুরুলোকের সত্য-সেতু ভেদ করিব না। যে ব্যক্তি অসত্য-প্রতিজ্ঞ ও অস্থির-মতি শুনিয়াছি তাহার নিকট দেবতা ও পিতৃলোক কিছুই গ্রহণ করেন না। এই আধ্যাত্মিক সত্যপালন ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সাধুলোকেরা ইহার ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আমি তদ্বিষয়ে এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। * * * সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেবপূজা ও অতিথিসৎকার এই সকল স্বর্গের পথ, ব্রাহ্মণেরা

স্বর্গের পথ

ঐ গুলিকে মুখ্য ফলপ্রদ বলিয়া শ্রবণ এবং তর্ক দ্বারা সম্যক অবধারণ করিয়া যথাবিহিত ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোক আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। * * * আমার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা নিষ্কাম হইয়া শুভকার্য্য সমাধান করিয়াছেন এবং এখনও অনেকে অহিংসা তপ

অহিংসা ধর্ম্ম

ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ও দানশীল অহিংসক ও পবিত্র সেই সকল মহর্ষিই পূজনীয় হইয়া থাকেন।"

ইহাই রামচন্দ্রের সত্য ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের সার বেদ ও সত্যপরায়ণতা, দান ও দানশীলতা এবং অহিংসাপরায়ণতা, কুলাচারপরায়ণতা, আস্তিকতা, দেবপূজা,

সত্যধর্ম্মের সার

তপস্যা ও প্রিয়বাদিতাও এই ধর্ম্মের অন্তর্গত। কায়িক, মানসিক বাচিক এই তিন প্রকার কর্ম্মপাতকই এই সত্যধর্ম্মানুসারে পরিত্যাজ্য। এই ধর্ম্ম শুভপ্রদ, পবিত্রতাজনক ও কার্য্যকরী। এই ধর্ম্ম শ্রবণ (authority) তর্ক (reasoning) এবং আচরণের (custom and practice) উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সত্য দ্বারা আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে তাহা রামচন্দ্র ভাল করিয়া বুঝান নাই। সত্যপরায়ণতা এই সত্যের একটি দিক মাত্র। বাস্তবিক সত্যের ব্যাখ্যা দেওয়ার মত কঠিন কার্য্য আর নাই। তবে রামচন্দ্রের উক্তি

সত্য কি ?

হইতে মোটামুটি বলা যায় যাহা শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত, তর্ক দ্বারা সমর্থিত, ব্যবহারোপযোগী এবং নিখিল জনমানবের কল্যাণকর তাহাই সত্য।

সুতরাং রামচন্দ্রের পক্ষে যে সত্যভঙ্গ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব তাহা আমরা বুঝিলাম কিন্তু ভরত যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাপ্য রাজ্য গ্রহণ করে তবে তাহাকেও সত্য ভ্রষ্ট হইতে হয়। সেই জন্য ধার্ম্মিক ভরতকে রামচন্দ্রের কনকখচিত পাদুকা গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিতে হইল, এবং রামের প্রতিভূ স্বরূপ হইয়া রাজ্যশাসন করিতে হইল।

বশিষ্টকথিত সৃষ্টি-তত্ত্ব ও জলবাদ

এখন বশিষ্ট যে সৃষ্টিরহস্য প্রকাশ করিলেন তাহাই উল্লেখ করিব। এই সঙ্গে তিনি ইক্ষ্বাকুবংশের এক ধারাবাহিক ইতিহাস বা বংশাবলিও জুড়িয়া দিলেন। বশিষ্ট কহিলেন, "অগ্রে সমুদায়ই জলময় ছিল, ঐ জল মধ্যে এই পৃথিবী নির্ম্মিত হয়। পরে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উৎপন্ন হইলেন এবং বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া, জল হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধার পূর্ব্বক প্রজাগণের সহিত সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই ব্রহ্মা স্বয়ং ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্য ও অবিনাশী। ইঁহা হইতে মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মেন। কশ্যপের আত্মজ বিবস্বৎ। বিবস্বৎ হইতে মনু উৎপন্ন হইয়াছেন। এই মনুই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু পিতা হইতে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেন। ইক্ষ্বাকু বংশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠই রাজা হন, জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠ কখন সিংহাসনে অধিরোহন করিতে পারে না। এই বংশাচার দেখাইবার জন্য বশিষ্ট ইক্ষ্বাকুবংশের ইতিহাস প্রকাশ করিলেন। তিনি আরও কহিলেন,

গুরু কে?

"আচার্য্য, পিতা ও মাতা পৃথিবীতে এই তিনজন গুরু। পিতা জন্মদান করেন, এই নিমিত্ত তিনি গুরু, এবং আচার্য্য জ্ঞান প্রদান করেন, এই কারণে তাঁহাকেও গুরু বলা যায়। রাম! আমি তোমার পিতার ও তোমার আচার্য্য, আমার কথা রক্ষা করিলে সদগতি লাভ হইবে। এই তোমার পারিষদ, এই সকল বন্ধুবান্ধব এবং এই সমস্ত অধীন রাজা, ইঁহাদিগের রক্ষাসাধন করিলে সদগতি লাভ হইবে। তোমার জননী কৌশল্যা, ধর্ম্মশীলা ও বৃদ্ধা, ইঁহার বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত হয় না। ভরত বারংবার তোমার প্রতিগমন প্রার্থনা করিতেছেন, ইঁহাকে উপেক্ষা করাও সঙ্গত হইতেছে না।"

কিন্তু তথাপি রাম সত্য পরিত্যাগ করিলেন না। ইহা হইতে বুঝা যায় সত্যপালনের জন্য বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন, এমন কি পিতামাতা ও আচার্য্যের বাক্যও লঙ্ঘন করা শ্রেয়।

বশিষ্ঠ ও Thales

বশিষ্ঠের কথা হইতে আমরা যে সৃষ্টিরহস্যের আভাস পাইলাম তাহাতে জলকেই আদি সত্তা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। গ্রীসের সর্ব্বপ্রথম দার্শনিক Thalesও এই জলবাদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। বশিষ্ঠের সৃষ্টি ব্যাখ্যায় বিষ্ণু, মহেশ্বর ও শক্তির স্থান নাই। ব্রহ্মা তাহার মতে আদিদেব এবং তিনি স্বয়ম্ভূ (Causa sui)। কিন্তু তিনিও জল ও পৃথিবীর পরবর্ত্তী। পাছে রাম তাঁহাকেও নাস্তিক বলিয়া তিরস্কার করেন এই জন্য বোধহয় তিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে স্বয়ম্ভূ বলিয়া পরক্ষণেই কহিয়াছেন, "এই ব্রহ্মা স্বয়ং ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্য ও অবিনাশী।" বশিষ্ঠ বুঝিলেন না যে ব্যক্তি স্বয়ম্ভূ তিনি

বশিষ্ঠের ঈশ্বর

কখনই অন্য হইতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। আর ঈশ্বরের সঙ্গে জলের যে কি সম্পর্ক তাহাও বশিষ্ঠ প্রকাশ করিলেন না। সর্ব্বাগ্রে জলের অস্তিত্ব মানিলে ঈশ্বর জলের পরবর্ত্তী হইয়া পড়েন এবং জল দ্বারা সীমাবদ্ধ হন। সুতরাং বাধ্য হইয়া জলকেই ঈশ্বর বলিতে হয়। জলকেই ঈশ্বর বলা বশিষ্ঠের অভিপ্রায় কিনা তাহা তাঁহার কথা হইতে বুঝিতে পারা গেল না।

নাস্তিকতার উপর ঘৃণা

নাস্তিকতা যে রামচন্দ্র অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন তাহা আমরা অ... সর্গেও দেখিতে পাই। রামের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ হইলে রামচন্দ্র তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ, হস্তধারণ এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস! * * নাস্তিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তোমার ত বিশেষ সংস্রব নাই? ঐ সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী বালক কেবল অনর্থ উৎপাদনে সুপটু। উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র থাকিতে ঐ সকল কুবোদ্ধা তর্কবাদজনিত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নিরর্থক বাকবিতণ্ডা করিয়া থাকে। * * * নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘসূত্রতা, অসাধুসঙ্গ, আলস্য, ইন্দ্রিয়সেবা, এক ব্যক্তির সহিত রাজ্য

চতুর্দ্দশ রাজদোষ

চিন্তা ও অনর্থদর্শীদিগের সহিত পরামর্শ, নির্ণীত বিষয়ের অনুষ্ঠান মন্ত্রণা প্রকাশ, প্রাতে কার্য্যের অনারম্ভ এবং সমুদয় শত্রুর উদ্দেশে এককালে যুদ্ধযাত্রা, তুমি ত এই চতুর্দ্দশ রাজ-দোষ পরিহার করিয়াছ?"

সুতরাং দেখিলাম নাস্তিকতা রাজ-দোষের এক দোষ। আরও দেখিলাম রাজার আদর্শ তখনকার দিনে অনেক উচ্চ ছিল। যাঁহারা রামায়ণী যুগের রাজধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্যকরূপে জানিতে চাহেন তাঁহারা যেন এই সর্গ ভাল করিয়া পাঠ করেন। যে কোন দেশের যে কোন রাজধর্ম্মের সহিত এই রাজধর্ম্ম বা রাজনীতি যে সমকক্ষতা করিতে পারে তাহা এই সর্গ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

রাম চরিত্র ও আদর্শ চরিত্র

অযোধ্যা কাণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে রামের চরিত্রের এবং তাঁহার আচরিত ধর্ম্মের যথেষ্ট পরিচয় পাই। "রাম অসূয়াশূন্য ও প্রিয়দর্শন, বুদ্ধিমান ও প্রিয়ংবদ, বলবান, সত্যবাদী বিদ্বান ও বৃদ্ধদিগের মর্য্যাদা পালক। তিনি প্রজারঞ্জন, বিপ্রভক্তিপরায়ণ, দীনশরণ ও পবিত্র স্বভাব-সম্পন্ন। তিনি দুষ্টের নিয়ন্তা, ধর্ম্মজ্ঞ ও দেশকালজ্ঞ। তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে সমাদর করিয়া থাকেন এবং ঐ ধর্ম্ম রক্ষা করিলে যে স্বর্গ লাভ হয়, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। অমঙ্গল প্রসঙ্গে ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কথায় তাঁহার অভিরুচি নাই। কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তিনি উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। তিনি তরুণ ও নীরোগ এবং সুলক্ষণ সম্পন্ন। তিনি সাধু ও বেদবেদাঙ্গবিদ্, শস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ। অস্ত্রশস্ত্র সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত এবং তদ্বিষয়ে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কল্যাণের জন্মভূমি, তেজস্বী ও সরল। ধর্ম্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আচার্য্য। তিনি ত্রিবর্গ তত্ত্বজ্ঞ, স্মৃতিমান ও প্রতিভা সম্পন্ন লোকাচার কুশল, বিনীত, গম্ভীর, গূঢ়মন্ত্র ও সহায়সম্পন্ন। তিনি আলস্যশূন্য, সাবধান, স্বদোষদর্শী কৃতজ্ঞ ও লোকের অন্তরজ্ঞ। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কখনও নিষ্ফল হয় না। অর্থ যে ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জন ও সৎপাত্রে দান করিতে হয় তাহা তিনি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার ভক্তি অসাধারণ। তিনি অসৎ বস্তু গ্রহণে কখনই লোলুপ নহেন।

রাম সম্বন্ধে দশরথের মত

কর্ত্তব্যচার বচনে তাঁহার আলস্য ও ঔদাস্য নাই। তিনি শিল্পী ও অর্থ বিভাগে সুপটু, হস্তী ও অশ্বে আরোহণ ও উহাদিগকে শিক্ষাদান তিনি এই দুইটি কার্য্যে সুদক্ষ। সৈন্য পরিচালনা, ব্যূহ রচনা ও শত্রুসংহার বিষয়ে তিনি সুপারগ। তিনি ধনুর্ব্বেদজ্ঞ-গণের অগ্রগণ্য ও অতিরথ। দেবাসুরগণ রোষাবিষ্ট হইলেও তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব করিতে

পারেন না। তিনি কোন অংশে লোকের অবজ্ঞাভাজন নহেন। কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত। তিনি ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে সুখ সংগ্রহ করিয়া থাকেন এবং ন্যায় অনুসারে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।"

এই সকল গুণে রামচন্দ্রকে অলঙ্কৃত দেখিয়া রাজা দশরথ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে বাসনা করিলেন। মন্ত্রীগণ দশরথের প্রস্তাব অনুমোদন করিলে রাজসভা আহুত হইল এবং সেই সভাতে অধীন ভূপালগণ এবং পৌর ও জনপদবাসীরা যোগদান করিলেন। সভায় দশরথ তাঁহার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সমবেত সভাবৃন্দ কহিলেন, "দেবরাজসদৃশ রাম অলোক সামান্য গুণে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি সত্যপরায়ণ,

রাম সম্বন্ধে জন সাধারণ ও রাজন্য বর্গের মত

ধর্ম্ম ও অর্থ তাঁহা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি প্রজাগণের সুখোৎপাদনে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে বসুন্ধরার ন্যায় এবং বলবীর্য্যে শচীপতি ইন্দ্রের ন্যায়। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও অসূয়াশূন্য। কেহ দুঃখিত হইলে তিনি সান্ত্বনা করিয়া থাকেন। তিনি ক্ষমাশীল, প্রিয়বাদী, কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি কোমল স্বভাব স্থিরচিত্ত ও সুদর্শন। তিনি জ্ঞানবান, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত গুণে ইহলোকে তাঁহার অতুলকীর্ত্তি, যশ ও তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সুরাসুর মনুষ্যে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান, তৎসমুদায়ই তিনি অধিকার করিয়াছেন। সমস্ত বিদ্যা তাহার আয়ত্ত এবং তিনি অঙ্গের সহিত সমুদায় বেদ অবগত আছেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার। তিনি শ্রেয়ের বাসভূমি ও সাধু। কারণ সত্ত্বেও তিনি কদাচ ক্ষুব্ধ হন না। ধর্ম্মার্থ নিপুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার শিক্ষক। তিনি পথিমধ্যে স্বজনের ন্যায় পুরবাসীগণের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তিনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই পুত্র, কলত্র, ভৃত্য, শিষ্য ও অগ্নিসংক্রান্ত সমগ্র সংবাদ আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করেন। শিষ্যের শুশ্রূষা ও ভৃত্যের একান্ত মনে সেবা এইরূপ বিষয়ও তিনি তন্ন তন্ন করিয়া প্রায়ই আমাদিগকে জিজ্ঞাসিয়া থাকেন। প্রজাদিগের দুঃখ উপস্থিত হইলে তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হন এবং উহাদের উল্লাসে পিতার ন্যায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি যখন কথা কহেন, তাঁহার মুখারবিন্দে মন্দ মন্দ হাস্য নির্গত হয়। তিনি প্রাণপণে

ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহার সমুদায় উদ্দেশ্যই শুভ ফল প্রসব করিয়া থাকে। বিবাদে তাহার কিছু মাত্র প্রবৃত্তি নাই। শৌর্য্য বীর্য্য এবং রণক্ষেত্রে ক্ষিপ্র গমনাগমন এই সমস্ত বীরোচিত গুণে সাধারণই তাঁহাকে ভালবাসিয়া থাকে। তিনি প্রজাপালক, বিষয় লোভ তাঁহার চিত্তকে কদাচ কলুষিত করে না। এই পৃথিবীর কথা ত সামান্য, বিশ্বলোকের ভারও তিনি অনায়াসে বহন করিতে পারেন। তিনি নীতিপথ প্রদর্শন করিয়া বধার্হকে দণ্ডপ্রদান করেন, কিন্তু যাহারা নির্দ্দোষ, তাহাদের উপর তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ নাই। প্রত্যুত প্রসন্নতা প্রদর্শনার্থ তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন।"

রামচন্দ্র যে শিষ্টাচারের জন্যও প্রখ্যাত ছিলেন তাহা আমরা প্রথম সর্গেই পাই।

রামের শিষ্টাচার

রামচন্দ্রের নিকট কেহ উপস্থিত হইলে তিনই সর্ব্বাগ্রে তাহার সহিত আলাপ করিতেন। যে কৈকেয়ীর জন্য তাঁহাকে যৌবরাজ্য হারাইয়া বনে যাইতে হইল তিনিও রামচন্দ্রের কম সুখ্যাতি করেন নাই। কৈকেয়ী মন্থরাকে কহিয়াছিলেন, "রাম ধার্ম্মিক, গুণবান, সুশিক্ষিত কৃতজ্ঞ ও পবিত্রস্বভাব।" (অ ৮ স) সুতরাং দেখিতে

রাম সম্বন্ধে কৈকেয়ীর মত

পাইলাম শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যা বুদ্ধি শিষ্টাচার, ধর্ম্মকর্ম্ম, রাজনীতি, লৌকিক ব্যবহার এমন কি কলাকুশলতায় যে দিক দিয়াই রামচন্দ্রকে দেখি না কেন সেই দিকেই তিনি আদর্শ পুরুষ। এইরূপ আদর্শ পুরুষ এখনও যে হিন্দু নরনারীর মনপ্রাণ আকর্ষণ করিয়া থাকে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এইরকম আদর্শ যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সেই দেশ ধন্য হয়।

এই দুই সর্গ পাঠ করিলেই একটা ঐতিহাসিক প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। ধর্ম্মালোচনায় ঐতিহাসিক প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা প্রশ্নটি উত্থাপন না করিয়া পারিলাম না।

কে রামকে যৌবরাজ্য দিতে বলিয়া ছিল?

রাজা দশরথ যে কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিবেন সে কথা ভুলিয়া যাইতে পারেন কিন্তু কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময় দশরথ যে কেকয় রাজকে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, "রাজন, তোমার এই কন্যাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, আমি তাহাকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অর্পণ করিব।"—ইহাও যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস হয় না।

রামচন্দ্রও এই কথা বলিয়াছেন (অ ১ স)। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে প্রজাপুঞ্জ এবং অমাত্য রাজন্যবর্গ প্রকাশ্য সভাতে রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্য প্রদান করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দশরথ স্বেচ্ছায় উহা স্বীকারও করেন নাই এবং নিজেও ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই, বাধ্য হইয়াই বোধ হয় তাঁহাকে ঐরূপ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে হইয়াছিল। রামচন্দ্র ও কৌশল্যার প্রতি দশরথের ব্যবহার সুবিধাজনক ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

কৌশল্যা ও রামচন্দ্রের প্রতি দশরথের ব্যবহার

কৌশল্যা পৃথক গৃহে থাকিতেন আর কৈকেয়ী থাকিতেন রাজ-প্রাসাদে আর কৈকেয়ীও সপত্নীদিগের সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার দাসীরাও সপত্নীদিগকে গঞ্জনা দিতে ছাড়িত না (অ ৮৮স)। ঐতিহাসিকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন দশরথ স্বেচ্ছায় রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্য দিতে চাহিয়াছিলেন, না বাধ্য হইয়া তাঁহাকে প্রজা ও রাজন্যবর্গের প্রস্তাব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সভা অবসানের পর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দশরথ রামকে পুনর্বার আনয়ন করিবার জন্য সুমন্ত্রকে প্রেরণ করিলেন। সুমন্ত্রকে দেখিয়া রামচন্দ্র অতিশয় শঙ্কিত হইলেন (অ ৩স)। এই শঙ্কিত হইবার কারণ কি ঐতিহাসিকগণ অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

আদর্শ রাজার কর্তব্য

আদর্শ রাজচরিত্র ও লোকচরিত্র যে কি তাহা দশরথের কথা হইতেও বুঝা যায়। সভামধ্যে দশরথ রামচন্দ্রকে কহিলেন, "বৎস, তুমি যদিও বিনীত, তথাপি অপেক্ষাকৃত বিনয়ী হইয়া প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয় নিগ্রহে যত্নবান হও। কাম ক্রোধ নিবন্ধন ব্যসন পরিত্যাগ কর। অস্ত্রাগার, ধনাগার ও ধান্যাগার পরিপূর্ণ রাখিয়া পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচার দ্বারা অমাত্যাদি প্রজাবর্গের অনুরাগ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হও। যিনি অভিমত প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যপালন করেন অমৃতলাভে দেবতার ন্যায় মিত্রগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব বৎস! তুমি আপনাকে এইরূপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া স্বকার্য্য যথোচিত যত্নবান হও" (অ ৩স)। সুতরাং দেখিতে পাইলাম আদর্শ চরিত্র স্বার্থপরতা শূন্য, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্টাচারী, লোকহিত-পরায়ণ ও বুদ্ধিমান।

ভরতের শোক দূর করিবার নিমিত্ত ও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইয়া অযোধ্যায় পাঠাইবার জন্য রামচন্দ্র ভরতকে যে উপদেশ দেন তাহা হইতেও রামচন্দ্রের ধর্ম্মমত সম্যক বুঝিতে পারা যায়। রামচন্দ্র কহিলেন "জীব অস্বতন্ত্র, সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতে পারে না। এই কারণ কৃতান্ত ইহকাল ও পরকালে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সমুদায় বস্তুর বিনাশ আছে। যেমন সুপক্ক ফলের বৃক্ষ হইতে পতন ভিন্ন অন্যকোনরূপ ভয় নাই, তদ্রূপ মৃত্যু ব্যতীত মনুষ্যের আর কোনও আশঙ্কা দেখি না। * * * তুমি একস্থানেই থাক, বা ইতস্ততঃ পর্য্যটন কর তোমার আয়ু ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তুমি আপনার অনুশোচনা কর, অন্যের নিমিত্ত তোমার কি হইবে? মৃত্যু তোমার সহিত গমন করিতেছে, তোমার সহিত উপবেশন করিতেছে এবং তোমারই সহিত বহুপথ পরিভ্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। * * * যেমন মহাসমুদ্রে কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ, আবার কালবশে বিয়োগ হইয়া থাকে ধনজন, স্ত্রীপুত্রের বিষয়ও সেইরূপ জানিবে। এই জীবলোকে জন্মমৃত্যু শৃঙ্খল অতিক্রম করা অসম্ভব। সুতরাং যে অন্যের দেহান্তে শোক করিতেছে, আপনার মৃত্যু নিবারণে তাহার সামর্থ্য নাই। * * * অতএব যখন তাহার ব্যতিক্রম অসাধ্য তখন মৃত লোকের নিমিত্ত শোক করা কি উচিত হয়? বয়সের হ্রাস দেখিয়া আপনাকে সুখসাধন ধর্ম্মে নিয়োগ করা শ্রেয়ঃ হইতেছে কারণ সুখই সকলের লক্ষ্য। * * * সেই সজ্জনপূজিত, ধর্ম্মপরায়ণ পিতা যজ্ঞানুষ্ঠান বলে স্বর্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক করা উচিত হইতেছে না। সকল অবস্থাতেই শোক বিলাপ ও রোদন পরিত্যাগ করা সুধী লোকের কর্ত্তব্য। অতঃপর তুমি পিতৃবিয়োগ দুঃখে অভিভূত হইও না, রাজধানীতে গিয়া বাস কর, পিতা তোমাকে এইরূপই অনুমতি করিয়াছেন। * * * তিনি আমাদের পিতা ও বন্ধু, তাঁহার আদেশ অতিক্রম করা তোমার শ্রেয়ঃ হইতেছে না, তাঁহাকে সম্মান করা তোমারও উচিত। দেখ যিনি পারলৌকিক-

রামের ধর্ম্ম

জীব অবস্থার দাস ও জন্মমৃত্যু অনতিক্রমণীয়

সুখবাদ

শোক পরিত্যাজ্য

শুভ সঞ্চার অভিলাষ করেন, গুরুলোকের বশীভূত হওয়া তাঁহার বিধেয়। বৎস! পিতা স্বকর্ম্ম প্রভাবে সদ্গতি লাভ করিয়াছেন, তুমি তদ্বিষয় স্থিরনিশ্চয় হও এবং ধর্ম্মে মনোনিবেশ পূর্ব্বক আপনার হিত চিন্তা কর (অ ১ ৫স)।

উদ্ধৃত বাক্য হইতে বুঝিলাম জীব অবস্থা বা দৈবের দাস, পুরুষকার দৈবসাপেক্ষ। মনুষ্য জন্মমৃত্যু শৃঙ্খল অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং মৃত্যুজনিত শোক করা অনুচিত। সুখই সকলের লক্ষ্য, সেই জন্য সুখসাধন ধর্ম্মপথে চলা সকলেরই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে স্বর্গ লাভ হয়। পিতার আদেশ পালন করা এবং তাঁহাকে সম্মান করা এবং গুরুজনের বশীভূত হইয়া চলা সকলেরই কর্ত্তব্য; কারণ ঐরূপ করিলে পারলৌকিক শুভ হয়।

সুখসাধন ধর্ম্মপথ

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণে ভরত যে উত্তর প্রদান করিলেন তাহা হইতে রামের দৃঢ়চিত্ততা ও চিত্তবৃত্তির উপর তাঁহার অসামান্য প্রভুত্ব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ভরত কহিলেন, "দুঃখ আপনাকে ব্যথিত এবং সুখ ও পুলকিত করিতে পারে না। * * * যিনি আপনার ন্যায় সপ্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, বিপদ উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয় না। * * * জীবের উৎপত্তি বিনাশ আপনার অবিদিত নাই, সুতরাং দুর্ব্বিসহ দুঃখ ভবাদৃশ ব্যক্তিকে কিরূপে অভিভূত করিবে (অ ১০৬ স)!

রামের দৃঢ়চিত্ততা ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান

প্রজাপালন বা ধর্ম্মানুসারে বর্ণচতুষ্টয়কে পালন করা যে ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম এবং চার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ঈশ্বর যে সর্ব্বভূতের প্রতি কৃপা করিতেছেন তাহা আমরা ভরতের কথা হইতে পাই। (অ ১০৬ স) সুতরাং বুঝা যায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও বর্ণ বিভাগ রামায়ণের সময় প্রচলিত ছিল। তবে বর্ণ অর্থে যে আধুনিক জাতি বুঝিতে হইবে তাহা পণ্ডিতগণ বলেন। কারণ পূর্ব্বে বর্ণান্তর অসবর্ণ বিবাহ এবং অসবর্ণ পংক্তি ভোজন প্রচলিত ছিল (Rhys Davids)।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম

দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে রামচন্দ্রের মত অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই। লক্ষ্মণ পুরুষকারে বিশ্বাসী এবং সেই পুরুষকারবলেই সকলের সহিত, এমন কি বৃদ্ধ পিতা দশরথেরও সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজ্য জয় করিয়া রামচন্দ্রকে রাজা করিতে চাহেন। কিন্তু রামচন্দ্র দৈব মানেন এবং বিশেষ রূপ পিতৃভক্ত হওয়ায় এ ক্ষেত্রে দৈব না মানিয়াও পারেন না। সেই জন্য কৌশল্যা ও লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রামচন্দ্র কহিলেন, "লক্ষ্মণ, প্রাপ্ত রাজ্যের পুনঃ প্রত্যাহরণ ও আমার নির্বাসন এই দুই বিষয়ে দৈবই কারণ সন্দেহ নাই। আমার প্রতি কৈকেয়ীর মনের ভাব যে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে, দৈবই ইহার কারণ। * * * দেবী কৈকেয়ী সৎস্বভাবা ও গুণবতী হইয়া ভর্ত্তাসমক্ষে সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় যে আমার ক্লেশকর বাক্য প্রয়োগ করিবেন, দৈব ভিন্ন ইহার কোন কারণই দেখি না। যাহা অচিন্তনীয় তাহাই দৈব; জীবগণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাদি দেবতারাও এই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। * * * কর্ম্মফল ব্যতীত যাহার জ্ঞেয় আর কিছুই নাই, সেই দৈবের সহিত কোন ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইবে? সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, ক্ষতি, লাভ, বন্ধন ও মুক্তি এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে দুর্জ্ঞেয় কারণ এমন যাহা কিছু ঘটিতেছে তৎসমুদায়ের মূলই দৈব। উগ্রতপা তাপসেরা দৈব বশতই কামের নিয়ম সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কাম ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকেন। * * * সুতরাং এই রাজ্যনাশ বিষয়ে দৈবোপহত পিতা ও কনিষ্ঠা মাতার দোষাশঙ্কা করা আর তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না।"

দৈব পুরুষকার

দৈব কাহাকে বলে?

সুতরাং দৈব দ্বারা রামচন্দ্র প্রাকৃতিক নিয়ম বিপর্য্যয়কারিণী কোন অপ্রাকৃতিক শক্তি বুঝাইলেন না। যাহার কারণ জ্ঞাত নহে এবং যাহা অচিন্তনীয় তাহাই রামের মতে দৈব। আধুনিক ইউরোপীয় ন্যায়েও দৈবকে এই রকমে ব্যাখ্যা করা হয়।

লক্ষ্মণ রামের কথায় প্রবোধিত না হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, "আপনি অনায়াসে দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন? * * * যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্ব্বীর্য্য, সেই-ই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বলবিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচ

দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বয়ং পুরুষকার দ্বারা দৈবকে নিরস্ত করিতে পারেন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। * * * অদ্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে।" কিন্তু ক্রোধান্ধ লক্ষ্মণ দেখিলেন না যাঁহাদের বিরুদ্ধে তিনি পুরুষকার দেখাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা তাহারই পিতামাতা, আর সেই পিতামাতাকে ভক্তি করা, সম্মান করা, সেবা করা এবং তাঁহাদের আদেশ পালন করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। স্বার্থহানি হইল বলিয়া পিতামাতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা পুত্রের পক্ষে অন্যায়, সুতরাং রামচন্দ্র কর্ম্মক্ষম ও বীর হইয়াও লক্ষ্মণের মন্ত্রণা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তবে রাম যে পুরুষকার মানেন না তাহা নয়। পুরুষকার না মানিলে সীতা উদ্ধার না করিয়া তিনি নীরবে চোখের জল ফেলিয়া দিন কাটাইতেন। পুরুষকার দেখাইয়াই তিনি জানকীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বালীকে বধ করিয়াছিলেন এবং সহায়শূন্য হইয়াও অগণিত সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন এবং অবশেষে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসবাহিনীকে ধ্বংশ করিয়া সীতার উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পুরুষকার কি পিতামাতার বিরুদ্ধে দেখান যায় ?

রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি

এইবার রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। অ ৮ সর্গে দেখিতে পাই, রামচন্দ্র কৈকেয়ীকে কহিতেছেন, "আমি মহারাজের নিদেশে অগ্নিপ্রবেশ ও বিষপান করিতে পারি। ইনি পিতা, পরম গুরু, বিশেষতঃ রাজা। ইঁহার নিয়োগে সাগরগর্ভেও নিমগ্ন হইতে পারি। অতএব ইনি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, বল, প্রতিজ্ঞা করিতেছি অবশ্যই তাহা রক্ষা করিব। তুমি নিশ্চয় জানিও রাম কখনই দুই প্রকার কথা কহিতে জানে না।"

রামের ভ্রাতৃভক্তি

অ ১৮ সর্গে দেখি রাম কহিতেছেন, "শুভাকাঙ্ক্ষী গুরু, পিতা, কৃতজ্ঞ রাজার আদেশ পাইলে এমন কি আছে, যাহা বিশ্বস্ত চিত্তে না করিতে পারি। * * রাজাজ্ঞার কথা কি, তোমার (কৈকেয়ীর) হিতসাধন ও পিতৃসত্যপালনের জন্য আমি স্বয়ংই ভ্রাতা ভরতকে রাজ্য, ধন, প্রাণ, অধিক কি সীতা পর্য্যন্ত দান করিতে পারি। * * যদি প্রাণ দিয়াও পূজনীয় পিতার হিতসাধন করিতে পারা যায়, তবে মনে করিও তাহা আমার করাই হইয়াছে। পিতৃ

শুশ্রূষা ও পিতৃআজ্ঞাপালন অপেক্ষা জগতে মহান্ ধর্ম্ম আর নাই। * * পিতৃ সেবাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম।"

অ ২১ সর্গে দেখিতে পাই রাম কৌশল্যাকে কহিতেছেন, "পিতৃ আজ্ঞা পালন মনুষ্যের একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম; এই জন্যই আমি এই বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছি। আপনি কিছুতেই ইহা অধর্ম্ম বিবেচনা করিবেন না। দেখুন, পিতার আজ্ঞাবর্ত্তী হইলে কোন কালে কাহারই ধর্ম্মহানি হয় না।" অ ২৩ সর্গে দেখি রাম, লক্ষ্মণকে কহিতেছেন, আমি পিতৃআজ্ঞা পালন করিব সর্ব্বাবস্থায়ে ইহাই সৎপথ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।" অ ৩০ সর্গে দেখি রাম সীতাকে কহিতেছেন, "পিতা মাতার বশ্যতা স্বীকার করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম। আমি তাহা লঙ্ঘন করিয়া জীবনধারণ করিতে চাহি না। পিতা প্রত্যক্ষ
পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা। দেবতা, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া দৈবের শরণাপন্ন হওয়া শ্রেয়স্কর নহে। * * পিতার উপাসনা করিলে ত্রিলোকের উপাসনা করা হয় এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই জীবলোকে ইহা অপেক্ষা পবিত্র বিষয় আর কিছুই নাই। এই কারণেই আমি পিতার আদেশ পালনে যত্নবান হইয়াছি। দেখ, পিতৃসেবার ন্যায় সত্য দান মান ভূরি দক্ষিণা যজ্ঞ ও পরলোকে হিতকর হয় না। পিতার চিত্তবৃত্তি অনুবৃত্তি করিলে স্বর্গ ধনধান্য বিদ্যা পুত্র ও সুখ লাভ হইয়া থাকে। যে সমস্ত মহাত্মা মাতাপিতার শরণাগত হন, তাঁহাদিগের দেবলোক গন্ধর্ব্বলোক, গোলোক, ব্রহ্মলোক ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। সুতরাং সত্যপরায়ণ পিতা যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমি তাহাই করিব, ইহাই আমার যথার্থ ধর্ম্ম।" অ ৩৪ সর্গে দেখিতে পাই রামচন্দ্র কহিতেছেন, "পিতা দেবগণেরও দেবতা; সেই দেবতা বলিয়াই আমি পিতৃবাক্য পালনে তৎপর হইতেছি।"

ইহা হইতেই যথেষ্ট বুঝিতে পারা যায় রামচন্দ্র পিতাকে কতখানি ভক্তি করিতেন এবং কি রকম পিতৃভক্তির জন্য তিনি জগৎ বিখ্যাত। দশরথ যখন সর্ব্বসমক্ষে রামকে কহিলেন, "অদ্য তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া স্বয়ংই অযোধ্যা গ্রহণ কর।" তখন রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, "পিতঃ! আপনি অতঃপর সহস্র বৎসর আয়ু লাভ করিয়া পৃথিবী শাসন করুন।

রাজ্যে আমার কিছু মাত্র স্পৃহা নাই। আমি চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্য পর্য্যটন এবং আপনারই প্রতিজ্ঞা পূরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ আসিয়া আপনাকে অভিবাদন করিব। (অ ৩৪ স)।

দশরথকে সত্যপাশ হইতে মুক্ত করিতেই রাম বনে গিয়াছিলেন। পিতাকে যে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করা পুত্রের কর্ত্তব্য তাহা আমরা রামের কথা হইতে পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। রামচন্দ্র যে বৃদ্ধ পিতার জীবনের জন্য কতদূর চিন্তিত ছিলেন তাহা আমরা তাঁহার কথা হইতেই বুঝিতে পারি। রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বোধ হয় ভরত উপস্থিত হইলে কৈকেয়ী তাঁহাকে মহারাজ্যে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রাজাকে আর প্রাণে বাঁচিতে দিবেন না। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং আমিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং তিনি অনাথ (অ ৫৩ স)।

রাম বৃদ্ধ পিতার জীবনের জন্য চিন্তিত।

রামচন্দ্র ভরতকে বলিবার জন্য সুমন্ত্রকে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা হইতেও রামের পিতৃ কল্যাণ চিন্তার বিষয় জানিতে পারা যায়। রাম কহিয়াছিলেন, ভরত যৌবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতাকে যেন রাজ্যেশ্বর করিয়া রাখেন। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা অকর্ত্তব্য, অতএব তাঁহার আজ্ঞা প্রচার করিয়া তাঁহাকে যেন সন্তুষ্ট করেন। (অ ৫৮ স)।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল। সেই জন্য এইখানেই আজ উপসংহার করিলাম। ধর্ম্ম ও আচার সম্বন্ধে অযোধ্যাকাণ্ডে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বারান্তরে সে সকল আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এবার কেবল ধর্ম্মদর্শনের অংশটুকু এবং রাম চরিত্র আলোচিত হইল।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

হারাসুর।

—:•:—
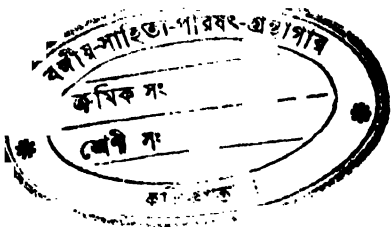
ওই নীল গগনের বুকের মাঝে
নিশিদিন ভাষাহীন কি গান বাজে !
গুরু গুরু বরষায়
সে গান কাঁদিয়া যায়,
ছল ছল মেঘ-ছায় সজল লাজে।

এই শ্যামা ধরণীর পাঁজর ছাপি'
কোন্ কথা অনিবার মরিছে কাঁপি !
বিকাশি' কুসুম বন
বুঝি তারি শিহরণ
কি কাহিনী সুগোপন মরমে চাপি' !

যুগ যুগ মানবের হিয়ার তলে
কোন্ সে উতল ধারা নিয়ত চলে !
নিখিল রাগিণী তায়
ধরিতে পারেনি হায়—
নীরবে বহিয়া যায় নয়ন জলে।

কে জানে জাগিবে কবে হারানো বাণী,
ধ্বনিবে রাগিণা শত সফল মানি' !
তারি লাগি' অনুক্ষণ
কত বীণা আলাপন,
চিরদিন উনমন নিখিল প্রাণী।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বিলাতের পথে।

Wadham College,
Oxford.
১৭-১০-২৩.

পরমকল্যাণীয়া ভগিনীদ্বয়,

তোমাদের এতদিন চিঠি লিখি নাই, সে জন্য মনে কিছু করো না। আমি এখন ঠিক মত যায়গা পেয়েছি, আর নূতন-আসার জন্য যে ছুটাছুটী ছিল, তা কমে গিয়াছে। তাই এই অবসরে তোমাদের কাছে চিঠি লিখব। আমার এডেন পৌঁছা পর্য্যন্ত ছোট মামাকে লিখেছিলাম। বাকিটুকু তোমাদের কাছে লিখে জানাচ্ছি।

১৩ই সেপ্টেম্বর রাত ৪টার সময় এডেন পৌঁছি। জাহাজ এখানে মাত্র তিন ঘণ্টা থাকবে। সুতরাং ৬টার সময় তাড়াতাড়ি ক্যাবিন থেকে কোন রূপে ভদ্রোচিত সাজ সজ্জা করে 'ডেকে' এলাম। দেখি জাহাজের চারদিকে ছোট ছোট নৌকা ঘিরে ধরেছে। সব নৌকাতেই নানা রকমের কার্পেট, উঠপাখীর পালকের হাতপাখা, আরবদেশের বুনানো নানাপ্রকার ঝাঁপি, কোন নৌকায় মাছ ও ফল পাওয়া যায়। জাহাজের উপর এদের উঠতে দেওয়া হয় না। এরা বড় মজা করে জিনিস উপরে পাঠায়। নৌকা থেকে একখানা দড়ি জাহাজে ছুড়ে ফেলে। জাহাজে যার যে জিনিস দরকার সেই দড়ি বেয়ে সেই জিনিস পাঠায়। এদের ইংরাজী বড় ভাঙ্গা ভাঙ্গা। এদের রঙ মিশমিশে কাল, চুল কোঁকড়া। দূরে এডেন সহর দেখা যাচ্ছিল। একবারে কেবল পাহাড়। সে পাহাড় এমন উলঙ্গ যে গাছপালার কোন চিহ্ন নাই। সেই প্রকৃতির বীভৎসতার মধ্যে ইংরেজের Town. আমাদের জাহাজ সকাল আটটার সময় যাত্রা করল। দুপুরের সময় পেরিম দ্বীপ দেখা গেল। সেও একবারে নগ্ন। সমুদ্রের তীরে হাওয়ার্ড অরেল কোম্পানীর এক তেলের গুদাম, আর কয়খানা টাইলের ঘর এই মহাশূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ বাবেলমণ্ডেব প্রণালী পার হয়ে গেল। এইখানে অনেক মগ্নশৈল আছে। তাতেই একে Gate of mourning বলা হয়। Red Seaতে দারুণ গরম। আমরা ভদ্রতার গলায় পা দিয়ে সার্টগায়ে বসে থাকতাম। জাহাজের উপর আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। এক রকম Straw-rings দিয়ে খেলা আছে, তাতে বুড়ো

যুবা সবাই মত্ত হ'ত। তারপর Hand tennis ও মধ্যে মধ্যে Cricket খেলা। ইংরাজদের জুয়োখেলার অভ্যাস সবস্থানেই আছে। প্রত্যেক দিন জাহাজ কত যায় এইটা বেলা ১২টার সময় জানিয়ে দেওয়া হ'ত। এই নিয়ে জুয়োখেলা হ'ত,—যে কে ঠিক তা বলতে পারে। প্রত্যেকে নিজের মত একটা বোর্ডের উপর লিখত, Entree fee প্রবেশ ফি একশিলিং। যার ঠিক হ'ত সে সব পেত, অবশ্য কিছু Seamen's Associationএ দান করতে হতো। রাত্রে Dinner এর পর প্রায়ই নাচ হ'ত, জাহাজের দুইজন লোক পিয়ানো এবং বেহালা বাজাত, সেই সঙ্গে নরনারীর তালে তালে নাচ।

১৭ই সন্ধ্যায় আমরা সুয়েজ পৌঁছিলাম। জাহাজে ডাক্তার এসে একজামিন করার কথা ছিল, কাপ্তেন নোটীশ দিলেন, পরের দিন 'পোর্টসেডে' একজামিন হবে। দূরে সুয়েজের আলো বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমাদের জাহাজ রাত ৮টার সময় বিশ্ববিখ্যাত সুয়েজখালে প্রবেশ করল। এই সুয়েজখাল এখন কোম্পানীর এবং সেই কম্পানীর চেয়ারম্যান হচ্ছেন আমাদের লর্ড ইঞ্চকেপ। এই খাল থেকে খুব লাভ হয়। আমাদের জাহাজকে প্রায় £500 পাঁচশত পাউণ্ড দিতে হয়েছে খাল পার হওয়ার জন্য। প্রত্যেক জাহাজকে Tonnage হিসাবে দিতে হয়। রাত্রে খালের কিছু দেখা গেল না। খালের মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট হ্রদ আছে। খালের মধ্যে জাহাজ পাঁচ মাইল বেগে যায় কিন্তু হ্রদের মধ্যে পূর্ণ বেগে যায়। সেই জন্য হ্রদে পৌঁছিয়া সব জাহাজ খালের অন্য মুখের জন্য পূর্ণ বেগে ছুটে। যে আগে পৌঁছাবে তারই আগে যাওয়ার সম্ভাবনা। অপর দিকের জাহাজের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। দুঃখের বিষয় রাত্রের জন্য এসব দেখা গেল না। তারপর Red Seaএর গরমের পর বেশ শীত লাগছিল। পরদিন সকালে দেখি জাহাজ খুব ধীরে চলছে। খাল ২০০ ফিটের বেশি চওড়া নয়। তীর বাঁধানো। তীরের একটু দূরেই সব লাল রঙের বয়া লাগানো আছে দুই দিকেই। তাতে বুঝা যাচ্ছে যে গভীর জল ইহার মধ্যে। তীর হতে বয়া ৩।৪ হাতের বেশি নয়। কিন্তু জল ২০ ফিট গভীর। সামান্য এতটুকুর মধ্যে এতখানি গভীর করা ও তা ঠিক রাখা Engineeringএর চূড়ান্ত। খালের আফ্রিকার তীরে রেল বসানো আছে। কিছু দূর দূর ষ্টেশন। ষ্টেশনের সব নামই ফরাসীতে; কিন্তু খালে এখন ফরাসী হাতের নামগন্ধ নাই। ষ্টেশনে ষ্টেশনে Wireless, মধ্যে সৈন্যদেরও

ছাউনী দেখলাম। সব ইংরাজদের হাতে। আজকাল যে Pan-Islam (অন্তর্জাতিক ইসলাম) movement হচ্ছে তা রোধ করার খাল একটা মস্ত উপায়। সেই জন্য এমন সুরক্ষিত। খালের দুই ধারে শুধু অনন্তবিস্তার মরুভূমি। সেই বালির উপর স্থানে স্থানে ঠিক সমান দূরে দূরে ঘাস বসানো, এবং আফ্রিকার তীরে মাইলখানেক দূরে দেবদারু গাছের ঘন সমান্তরাল ভাবে চলেছে। পাছে মরুভূমির বালি উড়ে এসে খাল বন্ধ করে সেইজন্য এই ঘাস ও গাছ। এর জন্য মরুর বালির উপর দূর থেকে মাটির স্তর বসানো হয়েছে। এত না হলে কি এই জাত বড় হয়। বেলা ২টার সময় পোর্টসেডে পৌঁছান গেল। জাহাজ থাকবে ৬ ঘণ্টা। সুতরাং তীরে নামা গেল। এক Guide ঠিক করা গেল। দিতে হবে ছয় শিলিং। এখানে ইংরাজী ও ভারতীয় মুদ্রা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে। পোর্টসেড সুন্দর ও পরিষ্কার টাউন জনসংখ্যা চল্লিশ হাজার। রাস্তা সব সোজা এবং চওড়া। এ হিসাবে কলকাতার চেয়ে ভাল। এমন কি Native quartersএর রাস্তা আমাদের চিৎপুর, যোড়াসাঁকোর গলির যে কত ভাল, এবং কলকাতার গলি নামে কোন রাস্তা এত সুন্দর আছে কি না সন্দেহ। বাড়ী সব উঁচু ও প্রায় এক রকমে তৈরী। তবে রাস্তায় বড় ধূলো। পোর্টসেড অল্প দিন হল তৈয়ারী হয়েছে বলে এত সুন্দর। একটা সাধারণের পার্ক আছে, একটা মেয়ে মানুষের জন্য বিশেষ করে আছে। রাস্তার নাম ফরাসীতে এবং ইজিপ্টের ভাষাতে। দোকানে সব সাইনবোর্ডই প্রায় ফরাসীতে। কিন্তু যারা সুয়েজখাল এবং এই সমস্ত টাউন সৃষ্টি করেছেন, আজ তাঁরা কোথায়? যেখানে ইংরাজ এবং ফরাসী জুটেছে, সেখানেই ফরাসীরা হটে এসেছে। আমাদের দেশ ডুপ্লে থেকে বর্ত্তমান মিশরের ইতিহাস তার জলন্ত সাক্ষী। খাল সমুদ্রে মিশেছে। একদিকে Concreteএর প্রাচীর মস্ত অনেক দূর সমুদ্রে গিয়েছে, একে Break-water বলে। পাছে সমুদ্র থেকে ঢেউ এসে খালের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত না করে, তারই জন্য এই ব্যবস্থা। সেই প্রস্তর প্রাচীরের উপর ঠিক খালের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ফাডনার্ড ডিলেস্পেপএর প্রতিমূর্ত্তি। একহাত দিয়ে আপনার অমর কীর্ত্তির দিকে দেখছেন। "ভারতবর্ষে"র প্রথম বর্ষেই বোধহয় রবিবর্ম্মার এক ছবি দেখেছিলাম "অনন্তের শাসন।" ভগবান্ রাম ধনু হস্তে সাগরকে বন্ধন স্বীকার করতে বলছেন। সেখানে রামের মুখে যে তেজ ফুটে উঠেছে, তা চিত্রকর তার

অমর তুলিকায় অঙ্কিত করেছেন। এখানেও যেন তাই। সেই কলনাদিনী শুভ্রফেন বারিধি তটে অনন্ত বিস্তার নীলের বক্ষের উপর একটি মূর্ত্তি যেন তার অসীমত্বকে ব্যক্ত করছে। মর মানুষের অমরত্বের ছবি এর চাইতে কোথায় ভাল দেখা যায় না।

রাত্রি আটটার সময় জাহাজ ছাড়ল। শীত বোধ হতে লাগল। জাহাজে অনেক মিশরীয় ভদ্রলোক ও মহিলা এসেছিলেন। যে সমস্ত খালি ক্যাবিন ছিল তাহা ভরে গিয়াছে। অনেক বালকও আছে। আমরা তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করলাম। কথা উঠল মিশরীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে। এঁরা বললেন ইংরাজদের সঙ্গে এখন চুক্তি হয়ে গিয়েছে যে ইংরাজ যত টাকা পাবে তা শোধ করে দিলেই ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে যাবে, দেশ স্বাধীন হওয়ার আর দেরী নাই। তারা প্রত্যেক বৎসরই টাকা দিয়ে কতকগুলি ইংরাজকে দেশে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এইরূপে সকলেই ইংরাজ চলে যাবে। আমরা কিন্তু বিশ্বাস করলাম না। দেখলাম এঁদের চুল কোঁকড়া, কিন্তু রঙ পরিষ্কার। আমার মনে একটা বড় দুঃখ লাগল যে এরা সম্পূর্ণ ইংরেজি বা ইউরোপীয়ান ভাবাপন্ন। এরা সব ইংরাজী গৎ বাজান; মহিলারা ইউরোপীয়ান পোষাক পরেন এবং রোজ সন্ধ্যার পর জাহাজে নাচেন। অধিকাংশই গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বিদেশে প্রেরিত হচ্ছেন। ছেলেরা বিলাতে কিংবা ফ্রান্সে Engineering, Science Industry, Architecture পড়তে যাচ্ছে। খরচ গবর্ণমেণ্টের। অনেক যুবক ফরাসী দেশে যাচ্ছেন Diplomatic service শিখতে। ইজিপ্ট গবর্ণমেণ্ট নূতন স্বাধীনতার চিহ্ন স্বরূপ যে সব বিদেশে দূত যাবেন, তাঁদের কাষ শিখতে যাচ্ছেন। ইজিপ্ট নূতন স্বাধীনতা পেয়ে নব জীবনের ক্ষুধায় জ্ঞানের জন্য বিদেশ ছুটেছে। যে জাতের যা কিছু বড় আছে তা দেশে আনা চাই। এরা ফ্রান্সকে বেশী পছন্দ করে। সেদিন মাল্টার ভূমিকম্পের জন্য সমুদ্রে ঝড় হয়েছিল; একজন মিশরীয় ভদ্রলোক বললেন এই ভূমিকম্পে লণ্ডন ভেঙ্গে যায় না! যাই হোক, এঁদের এই সাহেবিয়ানাতে আমার মনে একটু দুঃখ হয়; তাতে আমার মিশরীয় বন্ধু বলে উঠলেন "What is in dress?" আমি শুনলাম এঁরা আসল মিশরীয় নন। তুর্কীদের বংশধর; প্রাচীন মিশরীয় লোকের উপর এই তুর্কির নূতন পলি এসে পড়েছে। এঁরাই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। আসল মিশরীয়রা কিরূপ বুঝা গেল না। যাই হোক, আমাদের দেশের শিক্ষিতদের মত, তাঁরাও দেশের জনসাধারণের হতে অনেক তফাৎ। তাই

আমাদের জাতীয় রথ চল্‌ছে না। জনসাধারণ এগিয়ে এসে রথের দড়ি না ধর্‌লে রথযাত্রা হবে না, এই বিশ্বনিয়ন্তার বিধান। আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল, এই মিশরীয় স্বাধীনতা জগতের কোন উপকারে আস্‌বে না। কারণ যারা নিজের প্রাচীন গৌরব ত্যাগ ক'রে একেবারে নূতন হয়ে গিয়াছে, এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করছে, তাহাদের স্বাধীনতায় সেই পাশ্চাত্য রণদেবতারই আবাহন হবে। হায়, প্রাচীন মিশর, তোমার অ'দ সন্তানগণের— "নাহি নাহি ভাষা।"

সেই সঙ্গে আমার দেশের কথা মনে হল। যার লোক মিশর জ্ঞানের ও কর্ম্মের দীক্ষা লাভের জন্য দেশে দেশে চর পাঠিয়েছে; বিশ্বের কর্ম্মযজ্ঞে যোগদানের জন্য ছুটেছে কিন্তু—

"দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই।"

নিদ্রা, অনন্ত নিদ্রা, ভয়ানক রোগ Sleeping Sickness এ তাকে ধরিয়াছে। আর জাহাজে আমাদের জাতিকে কিরূপে ব্যবহার করা হয় দেখা গেল। P and O Company-এর কৃপায় আমাদের দেশের যে নূতন Scindia Steam Navigation কোম্পানী হয়েছিল, তার কারবার গুটাতে হচ্ছে। অথচ, সমস্ত জাহাজ চল্‌ছে ভারতীয় খালাসীর দ্বারা। ঐ যে নীল কুর্ত্তা পরে ও নীল পাগড়ী মাথায় বঙ্কিম ভাবে হেলায়ে গর্ব্ব মনে জাহাজের ডেক সাফ কর্‌ছে সে গুজরাতীয়; জাহাজের ডেকে পর্দ্দা তুল্‌ছে সেও ভারতীয়। নীচে ইঞ্জিনে কাজ করে' জাহাজ চালাচ্ছে সেও কালা আদমি। টেবিলে যে খানার সময় উপস্থিত থাকে সে গোয়ানীজ; স্নানের ঘরের টব পরিষ্কার করে, শৌচাগার পরিষ্কার করছে সেও এই হতভাগ্য দেশের লোক। কিন্তু তবুও এ দেশ কোন কাজের নয়। এদের এই শ্রমের সমস্ত লাভ যায় লর্ড ইঞ্চকেপের মোটা পেটে। জাহাজে আমরা এত জন ভারতীয় ছিলাম, অন্ততঃ ৪০।৫০ জন, তাদের জন্য কোন খাবারের বিশেষ বন্দবস্ত নাই; নতুন নতুন রকম রান্না মাংস ও লার্ডের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে ভারতীয় রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত খাদ্য;— কেউ কিছু খেতে পারে না কিন্তু তা দেখে কে!

জাহাজে এক বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনি বার্মিংহাম ইউনিভারসিটির Medicine এর Pofessor. আলাপ দাবাখেলাতে। সেদিন সকালে ক্রীটদ্বীপ দেখা যাচ্ছিল। কথা আরম্ভ হল ক্রীটের প্রাচীন সভ্যতা বিশেষতঃ Knossus এর সব প্রাচীনমূর্ত্তি নিয়ে। বৃদ্ধ আমাকে বললেন "তুমি হিন্দু?" আমি বললাম "হাঁ, ব্রাহ্মণ।" ব্রহ্ম কি?" আমি বললাম, "ভগবান সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান?" "ব্রহ্মা কি?" "ভগবানের এক কল্পিত মূর্ত্তি। হিন্দুরা অনেক সময় ভগবানকে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা ও শিব সংহারকর্ত্তা এই তিন মূর্ত্তিতে দেখেছেন। সকলের মূখে সেই এক কবিত্বময় কল্পনা আছে—যে কোন অবস্থায় আমরা ভগবানের জীব।" তারপর তিনি নেবু-কাডনেজা'র যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং মনীষি ডানিয়েল যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা আমাকে বললেন। তিনি বললেন নেবুকাডনেজারের সেই ভবিষৎ বাণী সফল হবে; জগতে দশটি জাতের Balance of power হবে, পাঁচটি East এ এবং পাঁচ পশ্চিমে। কিন্তু ভারতবর্ষ তার মধ্যে থাকবে না। আমি বললাম সাহেব "তুমি খ্রীষ্ট বিশ্বাস কর?" তিনি বল্লেন "হ্যাঁ।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম "মহত খৃষ্ট একজন অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি যে আদমের পাপক্ষালনের জন্য জন্ম গ্রহণ করেছেন তা কিরূপে বিশ্বাস কর? বাইবেলের সব সত্যি কিরূপ ডারুইন বলেছেন মানুষ বাঁদর থেকে এসেছে। সুতরাং যখন প্রথমে আদি পিতা বাঁদর ছিল, তখন আদমের পাপের কথা অলীক। তুমি বিজ্ঞান পড়ে কি করে সে সমস্ত বিশ্বাস কর?" সাহেব চটে বললেন "এসব মিথ্যে কথা।" আমি বললাম "তুমি যদি H. G. Wells এর Outline of History পড়ে দেখো,—দেখবে যে বর্ত্তমান খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে কি লেখা আছে। "ইবানেজ" জনবোয়ার (Ebanêz John Bojer) প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখকগণ এই ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না; কারণ ইহা দুর্ব্বলের ধর্ম্ম। Charity করে দুর্ব্বলকে আমরা দুর্ব্বলই রাখছি। যাদের জন্য তারা এই দুর্গতি পাচ্ছে, আমরা ক্ষমা শিখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ওদের বিদ্রোহ করতে নিষেধ করছি। জার্ম্মান দার্শনিক Nietgsche প্রভৃতি যে শ্রেষ্ঠ মানবের কল্পনা করেছেন এ অনেক বিষয়ে সত্যি।" সাহেব অমনি চটে বললেন, "আমার কাছে ঐ সব Anti-Christian দের নাম করো না। বাইবেলে Superman এর এক ছবি আছে, যে ভগবানকে মানবে না—নিজের জন্য সব কাড়বে। অবশেষে ভগবানের ক্রোধ তার উপর পড়বে।" আমি বলিলাম, "সাহেব

আমাদের গীতায় যে Superman-এর বর্ণনা আছে তা তুমি জান?" সাহেব বল্লে "না।" আমি বল্লাম "আমাদের Superman অর্থে যাঁর সমস্ত প্রবৃত্তি নিজের অধীনে আছে, যিনি জীবনের আনন্দ ও কর্ত্তব্যকে এক করেছেন; এবং কর্ম্মকে ফলাফলহীন ভাবে গ্রহণ করেছেন।" সাহেব খুব খুসী হলেন। আমরা নিশিদি প্রণালী দুপুরে পার হলাম। দুইধারে সমস্ত ঘর বাড়ীতে ভরা। যেন একটা ছবি। ২২শে প্রভাতে মার্সলেশ পৌছান গেল।

পরের চিঠিতে মার্সলেশ হতে লণ্ডন আসা জানাব। আশা করি তোমরা ভাল আছ। ইতি— আঃ—

মাখন দাদা।

'গীত-গোবিন্দ' হইতে একটি

গান।

—:o:—

ভৈরবী—যৎ।

প্রিয়ে, চারুশীলে মুঞ্চময়ি মানমনিদানম্।
প্রিয়ে, সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্,
দেহি মুখকমলমধুপানম্ ॥
প্রিয়ে, বদসি যদি কিঞ্চিদপি
দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দর তিমিরমতিঘোরম্ ॥
স্ফুরদধরসীধবে তব বদন চন্দ্রমা,
রোচয়তি লোচন চকোরম্ ॥

I র্সা -ঋ´জ্ঞ´০ | জ্ঞা জ্ঞ´ঋা | -০ ঋা | ঋা ঋ´সা I
রো ০ ০ চ র তি ০ লো চ ম ০

২´ ৩ ০
I সা স´০ | -ঞা -স´ঋ´সা | ণ০ -দণা } II II
চ কো ০ ০ ০ ০ র ম্০

নিবেদন।

(১) স্থায়ী দু'বার গেয়ে। তৃতীয় বার "হিয়ে, চারুশীলে" কথার শীর্ষোদেশে এই || রকম দু'টী দাঁড়ি চিহ্ন পর্য্যন্ত গেয়ে, তখন অন্তরা ধরতে হ'বে। অন্তরা দু'বার গেয়ে, আবার স্থায়ী ধরতে হ'বে। তার পর স্থায়ীর ঐ || দু'টী দাঁড়ি চিহ্ন পর্য্যন্ত আবার গেয়ে, সঞ্চারী ধরতে হ'বে। সঞ্চারী দু'বার গেয়ে আভোগ ধরতে হ'বে। আভোগ দু'বার গেয়ে, আবার স্থায়ী দু'বার গাইতে হ'বে; তারপর স্থায়ীর আরম্ভে "প্রিয়ে" কথাটি গেয়ে গান শেষ করতে হ'বে। একাধিক কণ্ঠে সমস্বরে গাইলে, গানটি বেশ শ্রুতিমধুর হ'বে।

(২) গানখানি 'ঝং' তালের নিম্ন লিখিত ঠেকার সঙ্গে মন্দ চল্‌বে না :—

১ ২ ৩ ০
ধাগে ধিন্ I ধঃ ধিন্ | ধগে তিন্ | নঃ তিন্ |

অর্থাৎ তালটির মাত্রা-সমষ্টি সাত্; চারটি পদে ভাগ করা। তিনটি তালি ও একটি ফাঁক। ১ম ও ৩য় পদে দু' দু' মাত্রা, আর ২য় ও ৪র্থ পদে দেড়্ দেড়্ মাত্রা। এই রকম ঃ দু'টী শূন্যের চিহ্ন আধ্-মাত্রা বোঝায়। তাই পঃ=পঞ্চম=অর্দ্ধ মাত্রা। তাই ঋজ্ঞঃ=কোমল ঋষভ ও কোমল গান্ধার, প্রত্যেকে সিকি মাত্রা ক'রে—অর্দ্ধ মাত্রা।

(৩) শ্লোকটির ভাবার্থ বোধ হয় কতকটা এই রকম :—

হে প্রিয়ে! তোমার স্বভাবটি সরল; আমার ওপর বিনা-কারণ মান্‌টান্‌ করা ছেড়ে দাও-না! আমি কি তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত নই—ব'লতে পার? দেখ-না-কেন, এই যে তুমি মান ক'রে ব'সে আছ, তা'তে মদন ব'লে আগুনটা আমার চিত্তকে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিচ্ছে যে! তাই তোমার মুখ-কমলের মধু আমাকে না-হয় দিয়েই ফেল না! আমি এক ঢোঁক্ সে মধু খেয়ে ঠাণ্ডাটাণ্ডা হই! আর নেহাত যদি তাতে কাঁপেটম কর, তা হ'লে একবারটি দু'টো মিষ্টি-কথাই না-হয় ক'য়ে ফেল! আমার শুধু ভয় হ'চ্চে এই যে, তুমি হয়-ত আমার ওপর বেজায় একচোট্ রাগ করেছ। প্রিয়ে! তুমি একবারটিও যদি কথা কও, তা হ'লে তোমার দাঁতগুর পাটী হ'তে, চাঁদের জোছনার মতন যে মন্-কেড়ে-নেওয়া আভা বেরোয়, সে আভাটি আমার ঐ ভয়টাকে—যেটা ঠিক ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারের মত, নির্ঘাৎ তাড়িয়ে দেবে। আমার চোখ্-চকোর তোমার ঐ চাঁদের মত চেহারার ঠোঁটের সুধা পান ক'রতে হা-হুতাশ ক'রচে যে,—দেখ্‌তে পাচ্চ না-কি?

(৪) বোধ হয় শ্যাম-নটবরের সঙ্গে শ্রীমতী রাই অভিমানিনী যে সময়ে নন্-কো-অপরেশান্ নীতি চালিয়েছিলেন, সে সময়টির সহিত খাপ খাইয়ে শ্লোকটি রচিত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, নারীর কাছে পুরুষকে কবি অত নত, অত নরম করতে কেন যে গেলেন! ও-কি-ও ভারত ছাড়া কথা? কবির আমল হ'তে আজ নাগাদ নারী-জাতিরা কখন মান্ অভিমান করলে, দুই দাবড়িতে তাদের মানভঞ্জন করাকেই ত পুরুষরা বীরোচিত কাজ ব'লে গৌরব ক'রে আসচেন। হয় ত রচনা কালীন কবি সখী-ভাবে বিভোর ছিলেন, আর তাই হয়-ত তিনি প্রেমিক-প্রেমিকার আত্মনিবেদনের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে, নারীদের সম্বন্ধে পুরুষদের উল্লিখিত বীরোচিত সৎসাহসটাকে মোটেই প্রশ্রয় দেন নি। যাক্,—"কাজ্ কি শ্যামের কথা কহিয়ে!"

—লেখিকা।

প্রত্নতাত্ত্বিকা

-:*:-

(রঙ্গ-চিত্র)

(১)

সে অনেক দিনের কথা; বৌদ্ধ যুগের মধ্যভাগে যখন সমুদ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিতেন, তখন সহরের অদূরে শ্যামায়িত শস্যক্ষেত্রগুলির অন্তরালে যে কুটীরখানি উঁকি মারিত, সেখানি ছিল গ্রামের প্রধান জোতদার অমিতাভ ঘোষের। ভগবান্ বুদ্ধের কৃপায় অমিতাভ ঘোষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না।

সেদিন সারাবেলা পরিশ্রম করিয়া অমিতাভ গোলায় শস্য ভরিয়া যখন ফিরিল, তখন প্রতিদিনের মত তার স্ত্রী অনামিকাকে পাখা হস্তে ছুটিয়া আসিতে না দেখিয়া সে একটু চিন্তিত হইল; উদ্বিগ্ন চিত্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অনামিকা তক্তাপোষে মাথা রাখিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। স্বামীকে দেখিয়া যেন তাহার রুদ্ধ আবেগ মুক্ত হইয়া গেল। সে উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল "ওগো, কি মহাপতক ক'রেচি, আমার কি হবে গো!" অমিতাভ কান্না শুনিয়া বিচলিত হইল না। সে বলিল "যা হ'য়েচে, তা'র জন্য কেঁদে কি হবে? স্থির হ'য়ে বল, কি ব্যাপার।" বলিয়া অমিতাভ তক্তাপোষের উপরে বসিল এবং স্ত্রীকে হাত ধরিয়া বসাইল।

ব্যাপার হইয়াছে এই। অমিতাভ রান্নাঘরের পশ্চাতে একটি শসার ক্ষেত্র ছিল। সেদিন অনামিকা শসা তুলিতে গিয়া দেখে একটি বিড়াল শসার মাচার নীচে একটা চড়াই পাখীর ঘাড় মট্‌কাইয়া আহারের আয়োজনে বসিয়া আছে। গৃহস্বামিনীকে দেখিয়া বিড়াল ভীত হইল না, বরং মূর্ত্তিমতী হিংসার মত তীক্ষ্ণ, লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল— যেন সে কিছুতেই শিকার ছাড়িতে প্রস্তুত নয়।

বিড়াল ভয় পাইল না বটে—কিন্তু অনাদিকা মানুষ হইয়াও শিহরিয়া উঠিল; সর্ব্বনাশ, যে বৌদ্ধ—অহিংসা যার পরমধর্ম্ম—তাহাদের গৃহে এবং তাহাদের চক্ষের উপর হিংসার এই বীভৎস লীলা!

(২)

গঙ্গার তীরে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রধানাচার্য্যের মঠ। অমিতাভ দৌড়িয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইতে গেল। ভিক্ষু ব্যবস্থা দিলেন "এক মাস কাল পতি-পত্নী রুগ্নের সেবা ও প্রত্যহ এক সহস্রবার ভগবান্ বুদ্ধের নাম স্মরণ করিবে" উভয়ে তাই হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

তখন অমিতাভের মনে হইল ইহার একটা প্রতীকার চাই। আমার কোনও ক্ষেত্রে যাহাতে পশু-পক্ষীর হিংসাচরণ না হয় তাহার ব্যবস্থা না করিলে ভগবান্ বুদ্ধের আদেশ লঙ্ঘন করা হইবে।

কিন্তু কি করা যায়! প্রতিক্ষেত্রে একজন করিয়া লোক বসাইয়া রাখা সম্ভবপর নহে। কিন্তু যদি মানুষের প্রতিমূর্ত্তি বসাইয়া রাখা যায়, সবগুলি ক্ষেত্রে না হোক্, অন্ততঃ ছোট ক্ষেত্রগুলিতে পশু-পক্ষী উপদ্রব করিবে না—ভয়ে পলাইয়া যাইবে। বড় ক্ষেত্রগুলিতে লোক না রাখিলে চলিবে না।

গ্রামের মধ্যস্থলে নবীন ভাস্কর জীমূতাদব দোকান খুলিয়াছে। অমিতাভ কয়েকটি বিশালকায় রাক্ষসের প্রতিমূর্ত্তি গড়িতে বলিল। শিল্পী দর হাঁকিল অনেক কিন্তু অমিতাভের ভ্রুক্ষেপ নাই—তাহার জিনিষ ভাল হইলেই ধর্ম্মের পথ মুক্ত হইয়া আসিল। নবীন শিল্পী একটু বসিয়া ভাবিল "আর একটু দর বাড়াইলে হইত।"

যা হোক্, ভাস্কর যখন কাজ শেষ করিল, তখন দেখা গেল কয়েকটি অতিকায়, অদ্ভুত মনুষ্য-মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে; তাহাতে গুপ্তযুগের ভাস্কর্য্যের ও ললিতকলার সমস্ত চিহ্ন বর্ত্তমান দেখিয়া প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু দূর হইতে সেই গাঢ়-কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিলে ভয়ে এত অভিভূত হইতে হয় যে ভাস্কর্য্য-কলা লক্ষ্য করিবার অবসর থাকে না।

অমিতাভ সেই মূর্ত্তিসকল লইয়া তাহার ক্ষেত্রগুলির মধ্যস্থলে স্থাপন করিল। তাহাতে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি কতদূর হইল জানি না, কিন্তু এক কাণ্ড বাধিল।

(৩)

গুপ্তযুগের পর কত যুগের প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। সে প্রবাহে কত জাতি-বংশের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু অতীতের সে ভাস্কর্য-কীর্তি বিনষ্ট হয় নাই—যেন ধরিত্রীদেবী ক্রমশঃ সেই অতীতযুগের নিদর্শন বক্ষে টানিয়া লইয়াছেন। কোথকার অমিতাভ ঘোষ, আর কোথায় তার শস্যক্ষেত্র—শুধু সেই মূর্তিগুলি বর্তমান কিন্তু তাঁরও কৃষ্ণ বর্ণ কালের প্রভাবে গিয়া ভাস্কর্য্যের লালিত্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ, কি বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ, ঠিক্ মনে নাই, সেই সময় পুরাতন পাটলিপুত্রের ভূভাগ খনন করা হয়। খননের পর তদানীন্তন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক ওয়েলার সাহেব এই কয়েকটি মূর্তি আবিষ্কার করিয়া যে বিবরণ প্রকাশ করেন তাহা এই—

"গত বৎসর পুরাতন পাটলিপুত্রের অনতিদূরে যে খননকার্য্য আরম্ভ হয়, তাহার ফলে আমি সাতটি মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূর্তিগুলির বিশেষত্ব এই যে কয়েকটিই আকারে, গঠনে ও সব বিষয়ে এক প্রকার; সবগুলিই দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে সুবিশাল—দেখিতে ভীষণ। ইহা হইতে মনে হয় বুদ্ধযুগের অবসানের পর হিন্দুধর্ম্মের আবার যখন আবির্ভাব হইল, সেই সময়ে ঘরে ঘরে তান্ত্রিক পূজা আরম্ভ হয়। তান্ত্রিকেরা ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতির পূজা করিত এবং এগুলিও সেই যক্ষ মূর্তি। আমার বোধ হয় এই সময়ে পাটলিপুত্রবাসীরা ঘোর তান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছিল এবং পিশাচদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় ও ভক্তি করিত নতুবা একই প্রকারের এতগুলি মূর্তির সমাবেশ কিরূপে হইল?

মূর্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম সবগুলিই শ্বেত বর্ণের। ইহা হইতে বুঝা যায়, পিশাচ-সম্বন্ধে সে-কালের লোকদিগের ধারণা খুব ভীষণ ছিল না, কারণ শ্বেত বর্ণ পবিত্রতার লক্ষণ।

ভাস্কর্য্য লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এগুলি যে বৌদ্ধযুগের পরে রচিত, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না। বিশাল চক্ষু, বাঁশীর মত নাসিকা, সুগোল বাহু ও হস্তীশুণ্ডের মত উরু কখনই বৌদ্ধযুগের ভাস্কর্য্য নহে—কারণ তখনকার লোক পৌত্তলিক না হওয়ায় কেবল নির্মীলিতনেত্র বুদ্ধমূর্তি ছাড়া অন্য মূর্তি গঠন করিতে জানিত না। পরে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে

পৌত্তলিকতার পুনঃপ্রচার আরম্ভ হওয়ায় ললিতকলার যে অভ্যুদয় হয়, এই মূর্ত্তিগুলি তার শ্রেষ্ঠ দান।

* * * *

বলা বাহুল্য ওয়েলার সাহেবের গভীর গবেষণায় মুগ্ধ হইয়া স্বদেশেবিদেশে প্রশংসার অবধি থাকিল না। সরকার অচিরে তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কবি গাহিলেন—

"রাজা অশোকের কটা ছিল হাতী
টোডরমলের কটা ছিল নাতি
কালাপাহাড়ের কটা ছিল ছাতি
এ সব করিয়া বাহির বড় বিদ্যে করেছি জাহির।"

শ্রীঅনন্তলাল সান্যাল

জ্যোৎস্নায় নন্দন-পাহাড়।

জ্যোৎস্না-রজনী ঢালে
মলয়জ চন্দন,
নন্দন-গিরি এ যে
ধরাতলে নন্দন!

বন্ধুর গিরিমূল,
আশে পাশে ফুটে' ফুল,—
গাহে পিক চারিদিক
করি' নব-বন্দন!

সাধ যায় বসে' থাকি
এ গহন-কক্ষে,
মিটাই মনের ক্ষুধ
বিনিদ্র-চক্ষে।

অম্বরে শোভে চাঁদ
অন্তরে পাতে ফাঁদ;
—এ বিভূতি, অনুভূতি,
রস-ঘন স্পন্দন!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

রক্তাম্বরা।

—:*:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পূর্ব্ব-প্রকাশিত পরিচ্ছেদগুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

[দ্বিজেন (বক্তা) এক জন বিলাত ফেরত ডাক্তার, পসার তেমন ছিল না। একদিন তার বন্ধু ডাক্তার বিনোদ বাবুর ডিস্পেন্সারীতে সে যখন বার দিয়া বসিয়াছিল তখন তার একটা অদ্ভুত 'কল' আসে। অদ্ভুত—কেননা ডাক্তার দ্বিজেন রোগী দেখিতে যাইয়া জানিতে পারিল যে চিকিৎসার জন্যে তাহাকে ডাকা হয় নাই, একটী মৃত্যু-মুখী মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্যে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল। মেয়েটি ভালবাসিত একটি যুবককে কিন্তু পিতার ইচ্ছা নয় তাহার হাতে কন্যা সমর্পণ করা;—ইহাই হইয়াছিল কন্যার জীবন নাশের হেতু। সুতরাং তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে দ্বিজেন ডাক্তারই মেয়েটীর সেই প্রেমাস্পদ এই ভ্রম ধারণা জন্মাইয়া তাহার বিবাহ দিয়া কন্যাকে শেষ-মুহূর্ত্তে সুখী করিবার জন্যেই নাকি সে বিবাহচেষ্টা। অনেক টাকার প্রলোভন দেখাইয়া দ্বিজেন ডাক্তারের সহিত রক্তাম্বর পরিহিতা মৃতপ্রায় কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। এই রহস্যভেদের জন্যে কন্যার পিতা অনন্তকুমার আদিত্যের

ও তাহার বন্ধু মেজরের সহিত দ্বিজেন ডাক্তারের যথেষ্ট বাকবিতণ্ডা ও মনান্তরের অবধি রহিল না। শ্বশুর-আঘাতে খুব্বং দেহির ভাব অভিনয়ের পর দ্বিজেন ডাক্তার যখন তাহার স্ত্রীর পাশে পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল তখন দেখিতে পাইল পার্শ্বেই বিবাহের মালাখানি ঝুলিতেছে কিন্তু সদ্যপরিণীতা অনিন্দ্যসুন্দরী তাহার স্ত্রী, হত্যাকারীর কবলে পড়িয়া চির জনমের মত নয়ন মুদ্রিত করিয়াছে! যখন সে বিমূঢ় ভাবে সেই দৃশ্য দেখিতেছিল হঠাৎ না জানি কোন্ তীব্র ঔষধের প্রভাবে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল, পরে চেতনা পাইয়া দেখিল সে একখানি জাহাজে। জাহাজে বহু কষ্ট ভোগের পর সে আত্মত্রাণের সুবিধা করিয়া যখন আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল তখন তাহাকে বেশ বুঝিতে হইল যে একটা চক্রান্তকারীর গুপ্ত রহস্যজালে সেই বিবাহ দ্বারা জড়িত হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেই রহস্যজাল সে ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। হঠাৎ একদিন রাজা হরনাথ দেবের পত্নী নির্মলা দেবী তাহাকে ডাক্তার-হিসাবে আহ্বান করিলেন। তাঁরও রোগটা হইতে মানসিক রহস্যটা ভেদ করিবার জন্যেই ডাক্তারকে আহ্বান। আরও আশ্চর্য্যের কথা সেখানে দ্বিজেন দেখিতে পাইল তাহার সেই নবপরিণীতা মৃতা পত্নীকে। ডাক্তারের স্ত্রী ডাক্তারকে চিনিতে পারিল না। যে অবস্থায় বিবাহ, তাহাতে তাহাকে চেনাও অসম্ভব। ডাক্তার শুনিল মেয়েটীর নাম বেলা নহে, কুন্তলা এবং সে সতীশবাবুর বাগ্‌দত্তা স্ত্রী। সতীশ জমীদার যতীন্দ্রনাথের পুত্র। দ্বিজেন্দ্র রহস্য ভেদ চেষ্টায় যতীন্দ্রনাথের বাড়ীতে যাইয়া দেখিল সেখানে মেজর গোপনে বেলার সহিত কথা বলিতেছে। সে আত্মগোপন করিয়া যাহা শুনিল তাহাতে বুঝিল মেজরকে কোন বিষয়ে সাহায্য করিতে সে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেও কার্য্যতঃ তাহা তাহাকে করিতে হইতেছে। জহুরা নামক কাহার ভয়ে বেলা আতঙ্কিতা, সে মরিয়াও জহুরার হাত হইতে রক্ষা পাইতে চায়। মেজর বলিল, 'এসো আমরা দুজনে জহুরার বিরুদ্ধে পরামর্শ করি।' বেলা তাহাতে অস্বীকার। মেজর বলিল 'আমি জহুরাকে মারবো।' যুবতী বলিল 'ওতে আমি নই।' কথা কাটাকাটির পর উভয়ে বিদায় হইল। প্রভাতে শুনা গেল রাজা যতীন্দ্রনাথ খুন হইয়াছেন। ডাক্তার ভাবিল এ আবার রহস্যের উপর রহস্য,—ইহা উদ্‌ঘাটন করিতেই হইবে।

আমার অভিমত।

আধ ঘণ্টা পরে আমি রাজাবাহাদুরের মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে গেলাম। পুলিশসার্জ্জেণ্ট রাজার মৃতদেহ কড়া পাহারায় রাখিতে আদেশ দিয়াছিলেন কাজেই শব যেভাবে প্রথম পাওয়া গিয়াছিল তেমনি ছিল। রাজার চেহারা দেখিলেই উচ্চবংশজাত বলিয়া মনে হয়। প্রায় ষাট আন্দাজ বয়স। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম মাথার নীচে কপালের উপর ক্ষত চিহ্ন। এ ক্ষত বন্দুক বা কোন তরবারীর আঘাতে নয় সম্ভবতঃ পাথরের উপর পড়ার দরুণ

কাটা। এ ক্ষত হইতে প্রাণহানি হওয়া অসম্ভব। আমার সঙ্গে ডিটেক্‌টিভ বোসও পরীক্ষা করিতেছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বুঝছেন ডাক্তার ?"

"বুঝেছি যে আঘাতের জন্যে মৃত্যু হয় নি।"

"ত হলে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু নয় ?"

"পাথর বাঁধান ঘাটে পড়ে যাওয়ায় এ ক্ষত হোয়েছে।"

"আপনার কি মনে হয় তা হতেই মৃত্যু হোয়েছে।"

"না মনে হয় প্রথমে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।"

"ওঁর সার্টের বোতামগুলি চুরি গিয়েছে।"

"আমার চুরি গিয়েছে ব'লে মনে হয় না।"

"কেন ?"

"সার্টের বোতামের ঘরের কাছে সবুজ দাগ দেখছেন ? আমার মনে হয় যাবার সময় কাঁটা গাছে আটকে বোতাম ছিঁড়ে পড়ে গেছে। ওঁর আংটী ঘড়ি ত ঠিক আছে।"

"হয় ত চোর এসেছিল তাই টের পেয়ে রাজা তাদের ধরতে বাইরে এসেছিলেন। তারা প্রাণের ভয়ে রাজাকে খুন কোরেছে।"

"আমার তা মনে হয় না। চোর হ'লে পালাত।"

"তবে কেন রাজা বাইরে এলেন ?"

"সে ওঁর স্ত্রী হয় ত বোল্‌তে পারেন।"

তারপর দুজনে রাণীর সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলাম। খানিক পরে ভিতরের বসিবার ঘরে চাকর আমাদের ডাকিয়া বসাইল। তার দশ মিনিট পরেই রাণী প্রবেশ করিলেন। রাণী সুন্দরী বটে। কৃষ্ণ তার বিশাল চক্ষু দুটি অশ্রুভারে আনত। বেশ বোঝা গেল তিনি এইমাত্র কাঁদিতেছিলেন। তাহার মুখখানি মর্ম্মর প্রস্তরের মত শ্বেতবর্ণ কোথাও এতটুকু রক্তের চিহ্ন নাই।

গঠন দেখিলে মনে হয় ননী প্রতিমা এখনই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু কথাবর্ত্তায় মনে হয় তিনি নীচবংশজাত। রাজপরিবারের কর্ত্রী হইবার উপযুক্ত নহেন। তিনি আমাকেও একজন ডিটেক্‌টিভ মনে করিলেন। আমরা তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার

অভিপ্রায় প্রকাশ করায় তিনি রাজি হইলেন। বোস জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজা কখন্ বাইরে গিয়াছিলেন আপনি কি জানেন?"

"না, তবে আন্দাজ দশটার সময় হবে।"

"অনেকক্ষণ না ফেরায় আপনার ত সন্দেহ হবার কথা।"

"আজ সকালে এ ব্যাপার শোন্‌বার আগে কিছুই সন্দেহ করি নি।"

"তা'হলে আপনি তাঁর যাবার বিষয় কিছু জানেন না? আচ্ছা কাল সন্ধ্যেবেলা আপনারা কি কোর্‌ছিলেন?"

তিনি চমকিয়া বলিলেন "কাল রাত্রে কি কোরেছিল মানে?"

"আমি জানতে চাই যে সন্ধ্যাটা আপনারা কেমন ক'রে কাটিয়েছিলেন? এখানে অতিথি ত অনেক ছিলেন।"

"হাঁ, নাচগান হোচ্ছিল, তেমন আর কিছু হয় নি।"

"রাজা কোথায় ছিলেন?"

"বৈঠকে। তিনি ১০টার সময় আমায় বোল্‌লেন তাঁর শরীর ভাল লাগছে না। তিনি তাই শুতে যাবেন।"

"তারপর আর আপনি তাঁকে দেখেন নি?"

রাণী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিলেন "আজ দেখেছি।"

বোস ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "বাধ্য হ'য়ে এ সময়ে বিরক্ত কোরতে বাধ্য হচ্ছি, ক্ষমা কোর্‌বেন—খুনের কিনারা কোর্‌তে হবে—একাজ কে কর্‌লো বের কোর্‌তেই হবে। আর কিছু বোলতে পারেন যদি যাতে এই কাজে সাহায্য হয়?"

"আর কিছু ত মনে হচ্ছে না।"

"তা হলে হয় ত রাজা গোপনে কারও সঙ্গে দেখা কোরতে প্রতিশ্রুত ছিলেন?"

"না! তা ত বোধ হয় না।"

"তাঁর কোন শত্রু ছিল?"

"না।"

"সব অতিথিরা চলে গেছেন?"

"সব। আমি একেবারে একলা আছি।"

"তাঁদের নাম ঠিকানা পেতে পারি কি ?"

"বেশ এক ঘণ্টার মধ্যেই পাবেন।"

"আমরা রাজার কাগজপত্র দেখতে চাই। যদি তা থেকে কিছু পাওয়া যায়।"

"বেশ দেখুন।"

"রাণী যেন আমাদের দেখিয়া ভয় পাইয়াছেন বোধ হইল। তাঁর স্বামীর খুনীকে ধরিবার আগ্রহ তাঁর দেখা গেল না। বোধ হয় স্বামীর সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না তাই ওরকম। বোস সেটা লক্ষ্য কোরেছিলেন তিনি আরও ভাল ক'রে রাণীকে বোঝাবার জন্য কয়েকটা প্রশ্ন করিলেন। শেষে সতীশবাবুর সম্বন্ধে কথা উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই রোগা লম্বা ফিটফাট একটি ছোকরা ঘরে প্রবেশ করিয়া রাণীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।"

রাণী বলিলেন "এই যে সতীশ, এঁরা কি জিজ্ঞাসা কোরছেন উত্তর দাও।" আমরা সতীশবাবুর কাছে কোন সংবাদই বাহির করিতে পারিলাম না। শেষে রাজার বসিবার ঘরে তাঁহার কাগজ পত্র পরীক্ষা করিতে গেলাম। রাণী আমাদের পিছনে দাঁড়াইছিলেন। তাঁর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, হাত পা কাঁপিতেছিল। তাঁর কিসের ভয় ? আমি তাঁহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিলাম। রাণী হঠাৎ ছেলের কাছে সরিয়া গিয়া কি দিলেন এবং সতীশ তাহা লুকাইয়া ফেলিল। লোক মুখে শুনিয়াছিলাম মায়ে পোয়ে বনে না। আমি কিন্তু খুব সদ্ভাবই দেখিলাম। যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে সকলে বাহিরে এলে আমি টুপী ফেলিয়া আসিবার ছলে যেখানে সতীশ দাঁড়াইয়া ছিল সে জায়গাটা পরীক্ষা করিতে গেলাম। তাই ! দেওয়ালে কাটালের ভিতর এক টুকরা কাগজের মত কি ? আমি বাহির করিয়া দেখিলাম সেটা ফটো। এ কি ! এ যে আমার দেখার মৃত্যুর পরের সেই চেহারা। সেই ভাবহীন স্থির চক্ষু। সেই অবশ দেহ। আমি তাড়াতাড়ি এক টুকরা কাগজ লইয়া কাটালের মধ্যে রাখিয়া ফটোটি পকেটে লইয়া বাহির হইয়া আসিলাম। সেই দিনই কলিকাতা ফিরিলাম।

আমার নূতন ব্যবসা।

যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ইন্‌স্পেক্টরের সহিত দেখা করিয়া জানিলাম যে আমার অনুমানই সত্য। হীরকের বোতামগুলি কাঁটাগাছের ভিতর পাওয়া গিয়াছে। ইন্‌স্পেক্টার বলিলেন "রাণীর ব্যবহার সম্বন্ধে তোমার কি মত, তিনি যেন কিছু লুকোতে চাচ্ছেন, নয় ?"

"আমার ত তাই মনে হয়।"

ইন্‌স্পে। আমাদের তা হলে খুব সাবধানে কাজ কোরতে হবে, কি বল ?

আমি। নিশ্চয়ই।

তারপর তিনি পকেট হইতে অতিথিদের নামের তালিকা আমার হাতে দিলেন দেখিলাম বেলা ও রাণী নীরদার নাম তাহাতে নাই। সে কথাটা আমিও তখনকার মত চাপিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার সময় আবার বিনোদের বাসায় পৌঁছিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র বিনোদ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "ওঃ! ফিরে এলে! বাঁচলাম। খুনের মামলা কেন হোল ভাই ?"

"ব্যাপার জটিল" আমি তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিয়া মৃত পত্নীর ছবিখানি তার হাতে দিলাম। তারপর তার মত জানিতে চাহিলাম।

বিনোদ। রহস্য ত বেড়েই চলেছে। ঠিক চিনেছ ইনিই তোমার স্ত্রী ?"

আ। নিশ্চয়ই।

বিনোদ। তা'হলে তোমার স্ত্রী রাণী নীরদা ও মেজর দত্ত সব এক দলের লোক। বেশ বোঝা যাচ্ছে আসল ব্যাপার ওরা সবাই জানে। বিনোদ খানিক পরে আবার বলিল "দেখ ভাই একটা জিনিষ আমার প্রথমেই অদ্ভুত ঠেকেছিল এই রাণী নীরদার তোমার সঙ্গে গায়ে পড়ে সেধে আলাপ করা।

আ। সুখের বিষয় এই যে রাজবাড়ীতে আমি যখন ডিটেক্‌টিভদের সঙ্গে পরীক্ষা কোরতে যাই তখন উনি সেখানে ছিলেন না। একটা কথা বিনোদ, সেই যে রাত্রে রাজবাড়ীর বাগানে গিয়েছিলাম এখন সে কথা কাউকে বলি নি।

বি। ভালই কোরেছ। তুমি গোপনে গোপনে তোমার স্ত্রীর অদ্ভুত মৃত্যু ও রাজ্যের

 কিনারা কোরতে পারবে।

আ। আচ্ছা তোমার কি মনে হয় মেজর খুন ক'রেছে ?

বি। তোমার স্ত্রীও যদি ওই দলের লোক হ'ন তা'হলে ত তা হ'তে পারে না।

আমার কিন্তু মেজরের উপর কেমন সন্দেহ রহিল। অনেকদিন কাটিয়া গেল কিন্তু কোন সূত্র না পাওয়াতে ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া গেল। ক্রমশঃ লোকও সব ভুলিয়া গেল। আমার বেলাকে দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হইত। তার হাসিভরা মুখখানি দেখিবার ইচ্ছা কিছুতেই দমন করিতে পারিতাম না। তার সেই রাত্রের শেষ কথাগুলি কেবল মনে হইত যে সে অন্য কোন ষড়যন্ত্রের ভিতর থাকিবে না বা কোন পাপকাজের সংশ্রবে যাইবে না। হায় সে, কি পাপ করিয়াছে! যদি জানিতে পারিতাম, জীবন দিয়া প্রতীকার করিতাম।

শেষে বাসনা দমন করা কষ্টকর হইয়া উঠায় আমি আবার রাণী নীরদার বাড়ী গেলাম। দাসী বলিল রাণী তাঁর জমিদারীতে আছেন। আমি রাণী যে নামে বেলাকে এখানে আমার সঙ্গে পরিচিত করিয়াছিলেন সে কথা মনে রাখিয়া বলিলাম "আর কুমুদাদেবী তিনি কোথায়?"

"কুমুদা বলে কেউ রাজকুমারী ত নেই।"

"না না আমি নাম ভুল করেছি। বেলা তাঁর নাম।"

"ওঃ! বেলাদেবী! তিনি রাণীর সঙ্গেই আছেন। তিন দিন আগে তাঁরা রাজা হরনাথ দত্তর সঙ্গে দেশে গেছেন।"

"আর কেউ সঙ্গে ছিল? সতীশবাবু?"

"না কেউ না।"

"তুমি রাজকুমার সতীশকে চেন ত?"

"হাঁ তিনি বেলাদিদিমণিকে বিয়ে কোরবেন।"

"সতীশবাবুর মা রাণীর বন্ধু, নয়? তিনি এখানে ত প্রায়ই আসেন?"

"হাঁ।"

"আর মেজর দত্ত এর মাঝে এসেছিলেন কি? তিনি কোথায়?"

"তিনি একবার বেলাদিদিমণির সঙ্গে দেখা কোরতে এসেছিলেন। এখন কোথায় জানি না।" অগত্যা আমি বাড়ী ফিরিলাম। তারপর একদিন ডাইরেক্টরী বইএ নজর
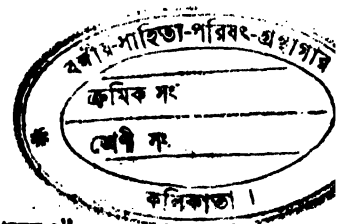
পড়ায় আমি সেন আদিত্য সব নাম খুঁজিতে বসিলাম। সেনের কোথায় নবীন আদিত্য সেন। ঠিকানা ৪ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট। সেইদিনই সে বাড়ীর সন্ধানে চলিলাম। গাড়ী থামিতেই দেখি, সেই ধূসর প্রসাদ; যেখানে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অঙ্ক অভিনীত হইয়াছে।

অবগুণ্ঠিতা।

ধূসর বর্ণের সেই বাড়ীটা! কত স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দিল এই বাড়ী! আমি কম্পিত হস্তে সেই বাড়ীটির দরজায় করাঘাত করিতে একজন লোক বাহিরে আসিয়া বলিল "কি চান?"

"নবীন আদিত্য এখানে থাকেন?"

"না, এ শোভনা দেবীর বাড়ী।"

"কিন্তু কিছুদিন আগে ত এখানে নবীনবাবু ছিলেন। কতদিন আগে উঠিয়া গেছেন?"

"আমি জানি না। পনের দিন আগে এখানে আমি কাজ নিয়েছি। আমার মনিব চার বৎসর ধ'রে এ বাড়ীতে রয়েছেন।"

"তিনি বাড়ীতে এখন আছেন?"

"না পাহাড়ে গেছেন।"

"তোমার হাতে বাড়ীর ভার?"

"হাঁ।

"বেশ এ বাড়ীতে যে নবীনবাবু ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তিনি থাকতে আমি দুদিন এখানে অতিথি ছিলাম। একবার ঘরগুলি দেখাবে?"

লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সন্দিগ্ধভাব দেখিয়া আমি বলিলাম "চোর ডাকাত ভেবো না। আমি ডাক্তার। বিশ্বাস না হয় এই দেখ।" আমি ষ্টেথোস্কোপটি দেখাইলাম।

"আপনি ত শোভনা দেবীর কেউ নন্ তবে আপনাকে বাড়ী দেখাব কেন?"

"আমি এই প্যাটার্ণের একটা বাড়ী তৈয়ার করাব তাই তোমার ঘরগুলি ও লাইব্রেরীটি দেখতে চাই।"

কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া সে আমাকে হলের মধ্যে লইয়া গিয়া একটি ঘরের দরজা খুলিল। আমি ভিতরে গিয়া দেখিলাম ঠিক সেই ঘর, সেই রকমই সাজান। খাবার ঘরে গেলাম সেটাও

ঠিক তেমনি। আমার বিয়ের পরে যে ঘরে থেকে বসেছিলাম সেই রকম। অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা। তারপর আরও কয়েকটি ঘরে গেলাম। সব ঘরগুলিই সেকেলে মুসলমানী জিনিষ পত্রে সাজান আর প্রত্যেকটাই বেশ মনোরম ও আরামপ্রদ। নীচে আসিতে আসিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কতদিন এখানে কাজ কোরছ ?" "পনের দিন" "তুমি পুলিশের লোক ?" "কি করে বুঝলেন ?" "পুলিশের লোক চেনা ত মুস্কিল নয়।"

"আর কোন চাকর এ বাড়ীতে নেই ?" "না" লোকটিকে পুলিশের লোক বলিয়া চিনিতে পারায় সে ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল "কেন ?" "আমি জানতে চাই তোমার প্রভু এবাড়ী আর কখনো কাউকেও ভাড়া দিয়েছিলেন কি না ?" বোধ হয় না।"

"কি করে জানলে ?"

"শোভার আগে মনিব বোলেন যে ভাড়া দিয়ে জিনিষপত্র নষ্ট করার চেয়ে পাহারাওলা রাখা ভাল ? "প্রতিবাসীরা কিছু বোলতে পারে ?" "চারবছর আগে আদিত্যমশায় থাকতেন। "কিন্তু তিনি ত এই ক'দিন আগেই এ বাড়ীতে ছিলেন।" "তাহাকে লুকিয়ে ভাড়া দিয়েছিলেন কেননা প্রতিবাসীরা কিছু জানে না।"

"তুমি পাড়ায় এ বিষয় জিজ্ঞাসা কোরেছিলে ?"

"হাঁ ক'দিন আগে একজন ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা কোরতে এসেছিলেন।"

"কে ?"

"একজন মেয়ে।"

"কি নাম ? কেমন দেখ্তে ?"

"ঘোমটায় মুখ ঢাকা ছিল। নাম কিছু বলেন নি। তবে ঘরের পাল্কী ক'রে এসেছিলেন।"

"আপনি যে ঘরগুলি দেখ্তে চাইলেন ঠিক সেই ঘরগুলি দেখ্লেন। আর আদিত্য মশায়ের খবর নিলেন। খুব আশ্চর্য্য, নয় ?"

"তাই ত ! কেন দেখ্তে চান কিছু বোলেছিলেন ?"

"না, তার বদলে পাঁচ টাকা বকশিশ দিলেন।"

"খুব লম্বা দেখ্তে ?"

...লা মাঝামাঝি গড়নের। খুব সুন্দরী বলে মনে হোল। তাই আপনিও যখন দেখ্‌তে চাইলেন তখন ভারী সন্দেহ হোল।"

দুঃখের বিষয় সঙ্গে টাকা ছিল না তাকে কিছু দিতে পারিলাম না। লোকটিও কিছু পাবে আশা কোরেছিল একটু ক্ষুণ্ণ হইল। ভবিষ্যতে হয় ত লোকটিকে আবার দরকার হবে ভাবিয়া তাহাকে বলিলাম যে টাকা হাতে আসিলেই দিয়া যাইব। বাড়ী ফিরিয়াই দেখি টেবিলে নিয়োগপত্র রাখা। সেইদিনই যাত্রা করিয়া পরদিন কাজে যোগ দিতে হইবে। আমি বিনোদকে তার অতিথিপরায়ণতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া যাত্রার বন্দোবস্ত করিলাম। যাত্রার সময় বিনোদ বলিল "বিজু তোমার একটা কাজ কোরতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর তুমি আর এ রহস্যভেদের চেষ্টা কোরবে না। তুমি প্রাণ দিলেও এ রহস্য ভেদ কোরতে পারবে না। বৃথা চেষ্টার কেন প্রাণ দেবে ভাই ?"

"বিনু, আমি যে তাকে না পেলে বাঁচব না।"

"সেই ত মুস্কিল। তাই ত উঠেপড়ে লেগেছ।"

"ঠিক বুঝেছ বন্ধু। তোমার উপদেশ গ্রহণ কোরতে কিন্তু পারিলাম না ভাই।"

"এ তোমার খোকামি বিজু।"

"হবে। কিন্তু আমি জীবন পণ কোরেছি।"

"তুমি রাজা সতীশকুমারকে হিংসে কর ?"

"করি। আর জানি যে বেলায় প্রাণ সংশয়। সুতরাং ধর্ম্মতঃ লোকতঃ সকল প্রকারে বিপদ ও কষ্ট থেকে তাকে রক্ষা কোরতে বাধ্য।" বিনোদ ভালর জন্য বলিয়াছিল জানি, কিন্তাই ত কেবল নূতন নূতন গোলমাল বাড়িয়াই চলিয়াছে—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন বারণ কোরছ বিনু ?"

"তোমারই মঙ্গলের জন্য। মাথা ওই সবে ভরা থাকলে ডাক্তারি কোরতে পারবে না। দেখ্‌ছ না এতে মানসম্ভ্রম বজায় রাখা কঠিন হবে।"

"আমার মান সম্ভ্রমের চেয়ে তার প্রাণটা কি বড় নয় ? আমার জন্য ভেবো না ভাই।"

তারপর নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। এখানে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রুগী দেখিতে হইত সুতরাং অন্য বিষয় ভাবিবার সময় পাইতাম না। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক

এক করিয়া রোগীদের প্রেসক্রিপসন লিখিতেছি ভৃত্য আসিয়া খবর দিল একজন ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে দেখা করিতে চান, আমি নাম আনিতে বলিলাম। নাম দেখিয়া বিস্ময়ের সীমা রহিল না। রাণী নীরদা যে! আমি হলঘরে গিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলাম "ওঃ ডাক্তারবাবু কাগজে দেখলাম আপনি ভবানীপুরে নূতন কাজ পেয়েছেন তাই আপনার ঠিকানা জেনে নিয়ে এখানে এলাম। ভারি বিপদ আমার। চলুন গাড়ী বাইরে অপেক্ষা কোরছে।"

"কোথায় যাব? আপনার বাড়ী?"

"হাঁ দেরী কোরবেন না জীবন মৃত্যুর ব্যাপার। রুগীদের পরে আসতে বলে দিন।"

"কার অসুখ?"

"গোপনীয় কথা। ব্যাপার অতি ভয়ানক।"

"অনেক পরিবারের অনেক কথাই আমায় গোপন রাখতে হয়। সুতরাং আপনার কাছে যে বিশ্বাসঘাতকতা কোরব না এ নিশ্চয়।"

তারপর চাকরকে রোগীদের সেদিনকার মত বিদায় দিতে বলিয়া আমি প্রস্তুত হইয়া আসিলাম।

"কি অসুখ এবার বলুন ত? কার অসুখ?"

"কি জানি কি অসুখ! ফুলরার অসুখ হোয়েছে,—মরণাপন্ন।"

"মরণাপন্ন? এই কলিকাতাতেই!"

"হাঁ আমার বাড়ীতেই। বন্ধু ব'লে বিশ্বাস করি তাই আপনাকেই ডাকতে এসেছি।"

বিপদে।

দ্রুত গাড়ী চালাইয়া আমরা রাণীর ভবনে শীঘ্রই উপস্থিত হইলাম। গাড়ীতে রাণী আর একটিও কথা কহেন নাই! তিনি যেন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। হলে প্রবেশ করিতেই খোলা দরজার সম্মুখে পাশের ঘরে কৌচের উপর বেলার অসাড় দেহলতা দেখিতে পাইলাম। আমি প্রকল রকমে পরীক্ষা করিলাম জীবনের কোন চিহ্ন নাই। তার সুনীল কৃষ্ণ চক্ষুর তারকা দুটি স্থির। উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশপাশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পরীক্ষার জন্য বক্ষের বসন ঈষৎ সরান হইয়াছিল তাহার ভিতরে শুভ্র মর্ম্মরনিন্দিত কণ্ঠে মুক্তার মালা বড় শোভা পাইতেছিল। একদিন ওই কণ্ঠ হইতে এমনি অবস্থায় আমি হীরক কবচ খুলিয়া লইয়াছিলাম। আজও সে কবচখানি বুকে থাকিয়া আমার প্রিয়তমার স্মৃতি জাগাইয়া রাখে। হাতে অনেকগুলি আংটী দেখিলাম কিন্তু বিবাহের আংটী দেখিতে পাইলাম না। আবার ভাল করিয়া নিঃশ্বাসের গতি ও নাড়ী পরীক্ষা করিলাম। সব স্থির। তখন কোচম্যানকে গাড়ী জুড়িয়া শীঘ্র ডাক্তার জগদাম্বকে আনিতে বলিলাম। রাণী বলিলেন "কি দরকার? আপনি পারবেন না?" "না, দাদাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কোরতে হবে। জীবন সঙ্কট।" তারপর একটু ব্র্যাণ্ডি চাহিয়া অতি কষ্টে কয়েক ফোঁটা রোগীর গলায় প্রবেশ করাইয়া দিলাম। রাণী বিবর্ণমুখে কি ভাবিতেছিলেন আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিলাম "কি রকম ক'রে এ রকম হোল জানতে চাই।"

"তা ত জানি না।"

"আপনি নিজের বোনের জীবন চান?"

"নিশ্চয়। ওর মরা হবে না।"

"তা হ'লে সব খুলে বলুন। নইলে মরার পরে পুলিস ঘিরবে। এঁকে কেউ হত্যা কোরেছে। শেষে ভয়ানক কলঙ্ক হবে।"

"বারবার চেষ্টা কোরেছে, এ কি ক'রে আপনি বোলছেন?"

"যেমন ক'রে বোলছি যে বেলা আদিত্য কুমার সেন এক লোক, যেমন ক'রে জেনেছি যে কাল কারও সঙ্গে গোপনে দেখা কোরতে আপনারা হঠাৎ এসেছেন।"

"কার সঙ্গে দেখা কোরতে এসেছেন বোলুন? যতীন্দ্রনাথের রাণীর সঙ্গে।"

আমি ঘরের ধূলিবিক অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম যে এঁরা আগের দিন এসেছেন। রাজাকে জানাইয়া আসিলে সব ঠিক থাকিত। তবে গোপনে কাহারও সহিত দেখা করিবেন। কাহার সঙ্গে? যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময়কার কথা মনে পড়িল। অতিথিদের নামের তালিকার ভিতর রাণী নীরজা ও বেলার নাম ছিল না তবে তাঁহারই সহিত কিছু গোপনীয় কথা থাকিবে। এই সব ভাবিয়া কথাগুলি বলিলাম।

"ডাক্তারবাবু আপনার অসাধারণ ক্ষমতা। থট্‌রিডিং জানেন নাকি? রাণী কাঁচঘরের সহিত কথাগুলি বলিলেন।"

"কোন কথা গোপন রাখ্‌বার ইচ্ছা থাকিলে তা অতি সাবধানে রাখা উচিত।"

"তা হ'লে আমিই সাবধানে ছিলাম না? আর কিছু বোলতে পারেন? ভারি খুসী হব শুনলে।"

"আমার বলে দরকার নেই। আপনার বোনের জীবন সঙ্কট তাই এ কথা বোলতে বাধা ভোলায় তবে এখন কি কারণে কে তাকে হত্যার চেষ্টা করা সম্ভব বোললে সেটা আপনার নারীসুলভ কোমলতার পরিচয় দেবে।"

"সত্যি বোলছি আমি কিছু জানি না।"

"কতদূর জানেন?" রাণী নীরব রহিলেন। আমি আমার প্রিয়াপ্রতিবিম্পন্দ দেহের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। কোনই পরিবর্ত্তন নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে ভয়ে আমার হাত পা হিম হইয়া আসিতেছিল। যদি তাহাকে জীবনের মত হারাই হে ভগবান! হালদার যেন সহরেই থাকেন আর তাঁর দেখা যেন পাওয়া যায়। আমি কিছুক্ষণ পরে বলিলাম "পাছে আমি আপনার গোপনীয় কথা বাহিরে প্রকাশ করি তাই আপনি কিছু বোলতে চান না? কেমন?"

"আপনি এসব কথা বাহিরে প্রকাশ কোরবেন না জেনেই আপনাকে ডেকেছি। রাণী একটু রাগত স্বরে আবার বলিলেন "পারিবারিক কথা জেনে আপনার কি লাভ?"

"ডাক্তারকে অনেক সময়ে পারিবারিক গোপনীয় কথা বলা দরকার হ'য়ে পড়ে।"

"সব কথা বলা কি দরকার? আর, আর একজন ডাক্তার আসবেন তাঁকেও বোলতে বলেন?"

"তিনি আমার বহুদিনের পরিচিত, তাঁকে কিছু ভয় নাই। এবার বোলবেন কি?"

রাণী গর্ব্বিত গ্রীবাভঙ্গি করিয়া আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টে চাহিলেন।

আমি সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলাম "রাণি আপনি বড় বিপদে পড়েছেন যথাসাধ্য আপনার সাহায্য কোরব। আপনার কাছে বিশ্বস্ত থাকবার প্রতিজ্ঞা আগেই কোরেছি। বলুন আমাকে কি হোয়েছে।"

রাণী একটু বিচলিত হইয়া বলিলেন "বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার।"

"কি আশ্চর্য্য ব্যাপার হোল ?"

"আপনার আন্দাজই ঠিক। আমরা রাজা যতীন্দ্রনাথের রাণীর সঙ্গে দেখা কোরতেই এসেছিলাম এবং রাজাকে আসল কারণ না বলে দাসীর বোনের অসুখের অছিলায় বেলাকে নিয়ে চলে এসেছি।"

রাণী অন্যমনস্ক ছিলেন তাই সুন্দরী না বলিয়া বেলা বলিয়া ফেলিলেন।

"যতীন্দ্রনাথের রাণীর সঙ্গে দেখা করাই উদ্দেশ্য ছিল কেবল ?"

"হাঁ ছুটোর সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল।"

"রাজা যতীন্দ্রনাথের ভীষণ মৃত্যুর কথা কাগজে প'ড়েছি বটে।"

"সেই ঘটনার পর থেকে তাঁর রাণী আপনার বোনের কাছে আছেন। আমার সঙ্গে দেখা কোরতে সহরে এসেছিলেন।"

আমি কথার ফেরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনারা রাজার মৃত্যুর সময় ত সেখানে ছিলেন, না ?"

রাণী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন "না আমরা আগের দিন সেখান থেকে চলে এসেছিলাম।"

আমি জানিতাম রাণী সেদিন সেখানে ছিলেন কিন্তু আমি যে তা জানি তা তাঁকে জানিতে দেওয়া উচিত মনে করিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "যতীন্দ্রনাথের রাণী এসেছিলেন ?"

"না, আমরা গিয়েছিলাম।"

"কোথায় ? কতক্ষণ ছিলেন ?"

"আধঘণ্টা।"

"সেখানে কিছু খেয়েছিলেন ?"

"না কিছু খাই নি। বাড়ী এসে খেতে বসি দুজনে. তারপর ঝি এসে বল্লে "দর্জ্জি বৌ বেলার সঙ্গে দেখা কোরতে এসেছে" তাই সে উঠে গেল। কুড়ি মিনিট পরেও যখন সে ফিরল না তখন আমি তার খোঁজে তার বসবার ঘরে গিয়ে দেখি আলো নেবান আমি ইলেক্ট্রিক লাইট জালিয়ে দেখি বেলা অজ্ঞান হ'য়ে মাটীতে পড়ে।"

"আর কিছু জানেন না ?"

"না আমি ওকে তুলে শুইয়ে আপনাকে ডাকতে গেলাম।"

"উনি এক ঘণ্টা থেকে এরকম ভাবে পড়ে আছেন ?"

"হাঁ।"

"যে স্ত্রীলোক দেখা কোরতে এসেছিল সে কে ?"

"সে জামা সেলাই কোরতে নিয়ে গিয়েছিল শুনলাম। তাই দেখাতে এসে ছিল।"

"তাকে আর কেউ দেখে নি ?"

"না বেলা চলে আসার পর কোন শব্দই শোনা যায় নি।"

"ওঁকে যে কেউ হত্যা করবার চেষ্টা কোরেছে তাতে সন্দেহ নেই। এ মূর্চ্ছা নয়।"

"কে কোরবে ? সে স্ত্রীলোকটি ? সে কে তা কেমন কোরে জানাব ?"

"সেই মুহূর্ত্তে একটা কথা আমার মনে পড়িল। সে জহুরী নয় ত ? আর কে হওয়া সম্ভব ?

ক্রমশঃ—

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

অল্প ও বিরাট।
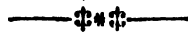
নিভৃতে হায় ছিলাম যখন বন্ধ,
অল্প দেখে—দেখার নেশায় অন্ধ;
অল্প দেখে অল্প শুনে,
ফুটত কুসুম কল্প-বনে,
ভেদ ছিল না মনের মনে,

ভাল কি বা মন্দ।
নিভৃতে হায় ছিলাম যখন বন্ধ।

দূর যে ছিল বড়ই নিকট তথ্য,
সেথা ছিল বিরাট রঙীন সত্য;
আকাঙ্ক্ষার এক প্রবল জোয়ার,
ঠেল্‌ত মোরে হৃদয় দোয়ার,
কল্পনা মোর দিল-দরিয়ার—
উজানবাহী ভৃত্য।
দূর যে ছিল বড়ই নিকট তথ্য।

মুক্ত আজি, রিক্ত আমার দৃষ্টি,
তিক্ত করে ফেলছে সকল মিষ্টি;
অন্যেরি সেই সবটা লয়ে,
বিয়ালতার অন্ন দিয়ে,
গড়লে কে আজ সৃষ্টিলয়ে—
বিবশ অনাসৃষ্টি।
মুক্ত আমি, রিক্ত আমার দৃষ্টি!

শ্রীছিন্নপদ মুখোপাধ্যায়।

কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব

কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন একথা ভারতবর্ষের বঙ্গেতর স্থানেরও অনেকের বিশ্বাস। বাঙ্গালাদেশের লোকের ত কথাই নাই। পশ্চিম ভারতে জনপ্রবাদ আছে যে কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া মাছ খাইতেন। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কিছু দিন হইল প্রবাসীতে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলে এ কিংবদন্তী আছে যে কালিদাস সেই অঞ্চলের লোক। তেমনি রাঢ়দেশেও জনশ্রুতি আছে যে তিনি রাঢ়ের লোক ছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেহই কালিদাসের সমস্ত গ্রন্থ আলোড়ন করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন নাই যে কালিদাস প্রকৃতই বাঙ্গালী ছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোয়াড়ি গ্রামের শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য বিশেষ উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন, কত মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং কত লোককে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আহ্বান ও আমন্ত্রণ করিয়াছেন। দুই বৎসর গত হইল একবার তাঁহার বাড়ীতে এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য যে সভা হইয়াছিল, দৈব বিড়ম্বনা বশত আমিই তাহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম। তখন তিনি আমাকে স্বপ্রণীত পুস্তিকা তিনখানি উপহার দিয়াছিলেন। আমি তাহা সাগ্রহে পড়িয়াছি এবং সাহস করিয়া বলিতে পারি যে তিনি কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব প্রমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার আহ্বানানুসারে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ও ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন। আমি তাঁহার সকল প্রবন্ধ আমার দুর্ভাগ্যক্রমে পাঠ করিবার সুযোগ পাই নাই কিন্তু যে দুই একটা পড়িয়াছি তাহাতে দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি যে তিনি যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব প্রমাণ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়ানুমোদিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অখণ্ডনীয়। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রত্যেক যুক্তি সম্বন্ধে আমি এরূপ কথা বলিতে পারি না। তিনিও অনেক প্রবল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার কতকগুলি যুক্তির দুর্ব্বলতাও আছে বলিয়া

আমার আশঙ্কা হয়। সে দুর্ব্বল যুক্তিগুলির দ্বারা তিনি বিরুদ্ধবাদীদিগকে তাঁহার মতকে আক্রমণ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। এইরূপ সুযোগ পাইয়াই প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ রায় বাহাদুর তাঁহাকে সিংহ বিক্রমে আক্রমণ করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে সকল যুক্তি দ্বারা কালিদাসের বাড়ী কোন্ গ্রামে ছিল, তিনি কয়টী দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কোথায় তাঁহার শ্বশুরবাড়ী ছিল ইত্যাদি নির্ণয় করিয়াছেন এবং অবশেষে কালিদাসের যে অদ্ভুত প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন, সেগুলি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুর্ব্বল যুক্তির অন্তর্গত বলিয়াই আমার বোধহয়। ইহা যে কেবল আমারই আশঙ্কা তাহা নহে, গত কার্ত্তিকের মানসী ও মর্ম্মবাণীতে প্রকাশিত তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধেও সেইরূপ আভাষ দেখিতে পাইলাম।

সে যাহা হউক আমার নিজেরও দুই তিনটী কারণে বোধহয় যে কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন। সেইগুলি নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

১। শকুন্তলায় দেখিতে পাই যে শকুন্তলাও তাঁহার সখীদ্বয় পরস্পরকে সম্বোধন করিবার সময়ে "হলা" শব্দ ব্যবহার করিতেছেন; যথা—হলাসউন্দলে, হলা পিঅম্বদে। এই হলা শব্দটা বঙ্গদেশ প্রচলিত স্ত্রৈণ সম্বোধন শব্দ হাঁ লা, হেঁলা বা হাঁালা শব্দের সহিত প্রায় অভিন্ন। এই সম্বোধন শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া বিশ্বাস হয় যে কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন এবং বাঙ্গালী পাঠকদিগের জন্যই প্রধানত সেই নাটক প্রণয়ন করেন। কিন্তু যদি এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে মালব দেশে অথবা দক্ষিণাপথের কোন স্থানে ও এই স্ত্রৈণ সম্বোধন শব্দ প্রচলিত আছে অথবা যদি অন্য কোন প্রদেশের কোন লেখকও এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে এই যুক্তির বিশেষ কোন মূল্য নাই ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া উচিত। আমার সেরূপ অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা নাই। কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব প্রমাণ বিষয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেরূপ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তিনিই যেন কোন মালব দেশীয় এবং দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন আমার এই অনুরোধ। যদি অন্যত্র এই প্রাদেশিক শব্দের প্রচলন না থাকে তাহা হইলে কালিদাস বাঙ্গালী না হইলে কখনই শব্দটা প্রয়োগ করিতেন না।

২। কালিদাস আর একটী এমন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা কেবল বঙ্গীয় নারীরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই শব্দটা ওমা। কোন আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলে বা শুনিলে অথবা কোন অসম্ভব বা কষ্টসাধ্য কার্য্যের প্রস্তাব শুনিলে বঙ্গীয় নারীরা ওমা বলিয়া থাকেন। এই ওমা interjectionএর ওকারের মাত্রা (অর্থাৎ quantity) সংস্কৃত ও-কারের মাত্রার সমান নহে অর্থাৎ ইহা দীর্ঘ স্বর নহে—হ্রস্ব। ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু সংস্কৃতে হ্রস্বওকার নাই। ব্যাকরণের মতে উকারই হ্রস্বওকার। সুতরাং সংস্কৃতে এই ওমা লিখিতে হইলে উমা লিখিতে হয়। কালিদাসও কুমারসম্ভবে তাহাই করিয়াছেন। কালিদাস বলিয়াছেন যে পার্ব্বতী মাতা মেনকাকে বলিলেন "আমি তপস্যা করিতে যাইব" তাহা শুনিয়া মেনকা বলিলেন "উমা" এবং সেই জন্যই পার্ব্বতীর নাম হইল উমা। উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম। কুমার সম্ভব। সংস্কৃত উ (সম্বোধনে) এবং মা (নিষেধ) এই দুই শব্দের যোগে উমা শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা কষ্ট-কল্পনা। বাঙ্গালীরা সহজে বুঝিতে পারিবেন বলিয়াই কালিদাস এই সুপ্রচলিত interjectionটা ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহাই অধিকতর সঙ্গত। কালিদাস বঙ্গেতর কোন স্থানের লোক হইলে এই স্ত্রৈণ interjectionটা যেন কার মুখ দিয়া কখনই বলাইতেন না।

প্রচলিত ও ব্যাকরণসম্মত ব্যুৎপত্তি ত্যাগ করিয়া কলিদাস যে কোন কোন শব্দের অভিনব ব্যুৎপত্তি রচনা করিতে ভালবাসিতেন তাহার আরও দুইটী দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। প্রথমটা এই যে লঘুভাবে অর্থাৎ অনায়াসে সকল বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতেন এবং বিদ্যার অপর পারেও অনায়াসে গিয়াছিলেন বলিয়াই (রলযো ভেদঃ অনুসারে) রঘুর নাম রঘু হইয়াছিল। (দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। লোকের চিত্তরঞ্জন করিতেন বলিয়াই ভূপতির নাম রঞ্জ ধাতু হইতে রাজা হইল।)

৩। কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন এরূপ বিশ্বাস করিবার প্রধান একটা হেতু এই যে রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে ৮১৩ শ্লোকে দেখা যায় যে তিনি ব্রহ্মপুত্র তটস্থ কামরূপকেই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু মহাভারতোক্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর কখনই কামরূপ হইতে পারে না। মহাভারতে বহুবার প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরের নাম দেখিতে পাওয়া

যায়। প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ছিলেন নরক তাঁহাকে বধ করিয়া কৃষ্ণ তাঁহার পত্নীদিগকে হরণ করেন; ভগদত্তের ভগিনী ভানুমতীকে দুর্য্যোধন প্রাগ্‌জ্যোতিষে গিয়া বিবাহ করেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ হইতে নরকের পুত্র রাজা ভগদত্ত বড় বড় হাতী লইয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেন। মহাভারতের এই সকল স্থানে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর যে দ্বারকা এবং হস্তিনাপুর কোন্ দিকে এবং কত দূরে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু ইতিহাসজ্ঞ কোন ব্যক্তিই বোধ হয় বিশ্বাস করেন না যে ভারতযুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ অন্তত ১৩০০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ বা আসাম পর্য্যন্ত আর্য্যেরা বিস্তৃত হইয়াছিলেন। আর একটা কথা এই যে কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের জন্য কৃষ্ণের প্রয়াস বিফল হইবার পর দুই মাসের মধ্যেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে ভগদত্ত কামরূপে অর্থাৎ হস্তিনাপুর হইতে ন্যূনাধিক আট শত ক্রোশ দূরে থাকিয়া হস্তিনাপুর হইতে প্রেরিত সংবাদ পাইয়া বহু হস্তী লইয়া যুদ্ধের পূর্ব্বেই সেখানে গিয়া পঁহুছিবেন ইহাও অসম্ভব। এই সমস্ত অবস্থাগত প্রমাণের বলবত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু অবস্থাগত প্রমাণ ব্যতীত স্পষ্ট প্রমাণও মহাভারতে আছে। সভাপর্ব্বের ২৬ অধ্যায়ে দেখা যায় যে রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে অর্জ্জুন হস্তিনাপুরের উত্তরদিকের রাজা সমূহ জয় করিবার জন্য প্রথমে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর এবং পরে কাশ্মীর জয় করিলেন। তখন ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ছিলেন। আবার বনপর্ব্বের ২৫৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে কর্ণও সেইরূপে উত্তরদিকে গিয়া প্রথমে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ভগদত্তকে পরাস্ত করিয়া পরে আরও উত্তরে গিয়া কাশ্মীর জয় করিলেন। সুতরাং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর কাশ্মীরের দক্ষিণে এবং হস্তিনাপুরের উত্তরে অবস্থিত। অতএব প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর কখনই হস্তিনাপুর হইতে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ৮০০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কামরূপ হইতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গালী ও আসামবাসী মাত্রেরই বিশ্বাস যে কামরূপই পূর্ব্বকার প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। আমি চারি বৎসর কামরূপে অবস্থান করিয়া দেখিয়াছি যে সেখানকার পুরাকালীন নগরের ধ্বংসাবশেষকে লোকে ভগদত্তের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে করে। কামরূপে প্রচলিত কালিকা পুরাণে লিখিত আছে যে কামরূপই পূর্ব্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ছিল। কিন্তু কালিকা পুরাণই হউক বা কিংবদন্তীই হউক মহাভারতের প্রমাণের কাছে সে সকলের কিছুমাত্র মূল্য নাই। কালিদাসও যখন বিশ্বাস করিতেন যে কামরূপই প্রাচীন

কালের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর তখন তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে।

উল্লিখিত তিনটী প্রমাণ পুস্তক হইতে সংগৃহীত। পুস্তক ছাড়া আর একটা কথাও এখানে বলি। পাঠক ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন। বঙ্গদেশের বৈদ্যদিগের মধ্যে একটা জনশ্রুতি আছে যে কালিদাস জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বর্ত্তমান লেখককে একাধিকবার বলিয়াছেন যে এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে এবং সেইগুলি একত্র করিয়া তিনি একটা প্রবন্ধ লিখিবেন। কিন্তু তিনি তাহা লিখিবার সময় পান নাই। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ, এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে কালিদাস বৈদ্য ছিলেন। কালিদাস কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কবিরাজ বলিত এবং তাঁহারই স্বজাতি বলিয়া বৈদ্য মাত্রকেই হয়ত কিছু বিদ্রূপভাবে কবিরাজ বলিত এবং ক্রমে চিকিৎসা ব্যবসায়ী বৈদ্য মাত্রেরই নাম হইয়াছে কবিরাজ। যদি এইরূপ কিছু না হইবে তাহা হইলে চিকিৎসা ব্যবসায়ী বৈদ্যদিগকে কবিরাজ বলে কেন? কাব্যের সহিত তাঁহাদের ব্যবসায়ের কোন সম্পর্ক নাই। বৈদ্যেরা চিরকালই ব্রাহ্মণের সমকক্ষ বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। বোপদেব যে বৈদ্য ছিলেন তাহা মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। অথচ বোপদেব কোন স্থানে নিজকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন নাই—কেবল ভিষক্ কেশবনন্দন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মুরশিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ৺গঙ্গাধর কবিরাজ স্বপ্রণীত মনুসংহিতার টীকায় তিনি সেন কি দাশ কি গুপ্ত ছিলেন তাহা প্রকাশ না করিয়া বর্থ বৈদ্য শব্দ প্রয়োগ করিয়া নিজের নাম বৈদ্য শ্রীগঙ্গাধর মাত্র লিখিয়াছেন। ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ছিলেন দাশগুপ্ত কিন্তু তিনিও দাশগুপ্ত লিখিতেন না। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন নিজের নাম দ্বিজ রামপ্রসাদ মাত্র লিখিতেন। সেইরূপে কালিদাসও নিজের জাতির পরিচয় না দিয়া কেবল "কালিদাস গ্রথিত বস্তু" লিখিয়াছেন। অন্য পক্ষে ভবভূতি প্রথমেই "ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণীপুত্রঃ যং ব্রহ্মাণমিব দেবী বাগ্বশ্যেবানুবর্ত্ততে" বলিয়া তিনি যে ব্রাহ্মণ তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

পুনশ্চ। শ্রীযুক্ত তর্করত্ন ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয়ের উভয়েই "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" এই কথার প্রয়োগ যে কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব বিশেষরূপ প্রমাণ করে ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু আমি এই যুক্তিটার বলবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। বঙ্গেতর স্থানের বহু লোকেই ত

৮

মাসের পহিলা, দোসরা ইত্যাদি বলিয়া থাকে। বরং বঙ্গদেশের অশিক্ষিত লোকেও তিথির নাম জানে কিন্তু অন্যদেশের অশিক্ষিত লোক তিথি কাহাকে বলে তাহাও জানে না।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

সন্ধান।

রুদ্ধ বীণায় সুর তুলে আজ
 বল কে হোথায় গান ধরে'
জাগিয়ে তোলে সুপ্ত হিয়া
 অভিমানের মান হরে।
নেইক চোখের দেখা শোনা
 কোন্ অরণ্যের পারটিতে
বনের চাঁপা কুড়িয়ে গেঁথে
 প্রেম বেঁধে দেয় হারটীতে।
তার খোঁজে আজ বিশ্ব উতল
 মলিন দুটী চক্ষে গো
সুখের স্মৃতি ফিরিয়ে দেওয়া
 রঙ্গিন হরষ বক্ষে গো।
বল্ ওরে বল কার দুলালী
 প্রাণ দুলানি আজ গানে
মাতিয়ে দিলে উদাস জীবন
 বিজন বনের মাঝখানে।

চল্‌ছি ছুটে নদীর চড়ে
পলাশ পাটল বন ভূমে।
সবুজ মাঠের প্রান্ত যেথায়
সুনীল নভের কোণ চুমে।
বাতাস বলে আয় ছুটে আয়
আমার সাথে দিক ভুলে
দিই তারে মোর হৃদয় সাড়া
সে আজ মোরে নিক তুলে।

শ্রীকটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মালঞ্চ।

—:০:—

ব্যবসা সম্বন্ধে দু'একটা কথা।

যাঁরা রাতারাতি বড়মানুষ হওয়ার আশায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে অগ্রসর হন, তাঁরা নিশ্চয়ই হতাশ হইবেন। একরাত্রে দীঘি কাটিয়া সেই দীঘি দুধ দিয়া পূর্ণ করিয়া তাতে পদ্মফুল ফুটাইবার স্বপ্ন ও দুঃসাহস উপকথার রাজা মন্ত্রীর থাকিতে পারে,—কিন্তু ব্যবসায়ীর থাকা উচিত নয়। সাধনায় সিদ্ধি। ব্যবসায়ক্ষেত্রেও প্রাণপণ কঠোর সাধনা না হইলে লক্ষ্মীলাভ হয় না। সাঁতারকাটিতে যিনি অজ্ঞ, শিক্ষা ও সহায় ব্যতীত, নদী পাড়ি দেওয়ার দুঃসাহস যেন তিনি না করেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে

শিক্ষানবিশী

সর্বাগ্রে প্রয়োজন। যিনি চাকুরীকে গোলামী বলিয়া বাস্তবিকই ঘৃণা করেন, এবং ব্যবসায় করিয়াই জীবন কাটাইবেন বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন, তিনি যাঁর কাছে, সুবিধা ও

অবস্থানুযায়ী কোন ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হইবেন। ব্যবসায়ের উত্তম অধম নাই বলিলেও চলে। ব্যবসায় মাত্রেই লাভজনক। মেডিকেল কলেজের নিকট যে প্রসিদ্ধ পানওয়ালা বসে সেও এক পয়সা আধ পয়সা পান বেচিয়া অনেক টাকা উপায় করিয়াছে। স্বর্গীয় মতিলাল শীল শিশি বোতলের ব্যবসায়কে সূত্র করিয়া কোটিপতি হইয়াছিলেন। এস, সি আঢ্য পুরাণো বই বিক্রয় করিয়া অদৃষ্ট ফিরাইয়াছিলেন। তুচ্ছ ঝাঁটার ব্যবসায়ে এক একজন প্রচুর ধন উপার্জ্জন করেন। গোয়ালন্দ হইতে মাছ চালান দিয়া কলিকাতার বাজারে বেচিয়া মফঃস্বলের জেলেরা সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সকল ব্যবসায়েতেই লাভ হয় যাঁহার যেমন সুবিধা তিনি সেইরূপ ব্যবসায়ের শিক্ষানবিশীতে লাগিয়া যাইবেন, মহাজনের গদিতে চাকুরী করিয়াও সেই শিক্ষালাভ করা যায়। চাকুরী যদি না মিলে বিনা বেতনেই খাটিতে প্রস্তুত হইবেন। একাগ্রতা, পরিশ্রম, সততা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিলে মহাজন, আপনা হইতেই বেতন দিতে চাহিবেন। এরূপ চাকুরীতে সুবিধা এই যে, ইহাতে ব্যবসায়ের স্থানিক অবস্থা, খরিদ্দারের সহিত ব্যবহার, হিসাব রক্ষা, ব্যবসায়ীদিগের চালচলন এবং ব্যবসায়ের নানারূপ ফাঁদফন্দী ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। কোথা হইতে মালপত্র আসে, কোথায় কোন জিনিষ সুবিধা দরে পাওয়া যায়, কিনিয়া কি দরে বেচিলে গ্রাহকের বিশ্বাস জন্মে ও লাভ হয়, এই সকল জানা যাইবে। ব্যবসায়ীরা মুখে মুখে চটপট জটিল হিসাবাদি করিয়া ফেলে। ইহা কঠিন ব্যাপার নয়। একটু অভ্যাস হইলে ও সঙ্কেত জানিলেই হইল। যেখান হইতে মাল আসে, সেই মহাজনদিগের সহিত জানাশুনা এবং খরিদ্দারের সহিত আলাপ পরিচয় হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস হইতে থাকিবে যদি ওজন করিয়া জিনিষ বিক্রয় করিতে হয়, তবে সে বিষয়েও অভিজ্ঞতা জন্মিবে। পাঁচজন খরিদ্দার এক সঙ্গে আসিয়া ভিড় করিলে চটপট করিয়া কি ভাবে তাহাদিগকে বিদায় করিতে হয়, সে বিষয়ে দক্ষতা হইবে। দোকানদারকে চারিদিকে নজর রাখিতে হয় দুষ্ট প্রকৃতি কোন খরিদ্দার কোন জিনিষ সরাইয়া না লয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখা শিক্ষা হইবে। এক শ্রেণীর লোক আছে, তারা দোকানদারকে প্রতারণা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। পাকা দোকানদার মুখ দেখিয়াই তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলে। তারা নানা প্রকার জুয়াচুরি করিয়া বেড়ায়। মুদির দোকানে আসিয়া দশ কি চার পয়সার চিনি চাহিল। চিনি দেওয়া হইলে

পকেট বা রুমাল হইতে টাকা বের করার ভাণ করিয়া বলিবে বাকি পয়সা দাও। কাঁচা যে কানা হয় ত পয়সা গণিয়া তাহার হাতে দেয়। সে পয়সা গুলি বাঁ হাতে লইয়া একবার এ পকেট একবার ও পকেট খুজিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিবে—"তাইত টাকাটা হল কি, অঁা!" সঙ্গে তার একটি পুঁটুলি থাকে। সে পকেট খুঁজিয়া, ট্যাঁক খুঁজিয়া হঠাৎ বলিবে—'তা ত, এই মোড়ের দোকানটায় আগে পান খেয়েছি, ওখান থেকে ত টাকা দিয়ে পয়সা আনিনি। কি ভুলই আমার হা হা হা! আচ্ছা ভাই দোকানী, আমার এই পুঁটুলিটা রইল, আমি পয়সা এনে তোমায় দিচ্ছি।' এই বলিতে বলিতে পানের দোকানের দিকে চলিয়া গেল।

"আত্মশক্তি।"

রোগ বীজাণু ও সর্দ্দিরোগ।

আমাদিগের কেন যে সর্দ্দিরোগ হয় তাহার সকল কারণ অনুসন্ধান করা এখনও শেষ হয় নাই। এখনও অনেক জিনিষ আছে যাহা আমরা জানিনা, এখনও আমরা ঠিক করিয়া ঐ সকল কারণের সংখ্যা বা তাহার শক্তি বলিতে পারিনা। কয়েক বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে জীবাণুই সর্দ্দি রোগের এক প্রধান কারণ। এই সর্দ্দিরোগের আক্রমণের অর্থ হইল এই যে আমাদের শরীরের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য যে সকল পদার্থ আছে তাহার সহিত ঐ সর্দ্দির জীবাণুর সংগ্রাম। এই জীবাণু সকল যে আমাদিগের শত্রু তাহা ভাল করিয়া জানা উচিত এবং ঐ জীবাণু সকলের শক্তি কম মনে করা উচিত নহে। ঐ সকল জীবাণু না থাকিলে আমরা সর্দ্দি দ্বারা আক্রান্ত হই না অথবা ঐ সকল জীবাণু বর্ত্তমান না থাকিলে সর্দ্দিরোগ হইতে আমাদিগের এত শক্ত রোগও হইত না।

রোগ জীবাণু দ্বারা যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ঠিক সেই সকল লক্ষণ, উত্তেজক বা প্রদাহকারী ঔষধ ব্যবহারেও হয়। পটাশ আওডাইড নামক ঔষধ অল্প মাত্রা সেবনেও কোন কোন লোকের সর্দ্দি উপস্থিত হয় এবং নাক, চোখ এমন কি ফুসফুসেও প্রদাহ উপস্থিত হয়। এইরূপে সর্দ্দির সকল লক্ষণই প্রকাশ পায় যদিও রক্তের মধ্যে সর্দ্দির জীবাণু একটুও থাকেনা।

ঠিক সেইরূপ কুপাশ্যা হইলে, ভগবান জানেন তখন বাতাসে যে কি থাকে তাহাতেই সর্দ্দি হয়। কখন যে কোন কারণে আমাদের ঝিল্লি সকলে প্রদাহ উপস্থিত হয় তাহা জানা যায় না।

এই সকল কারণে সর্দ্দির জীবাণু নষ্ট করিবার প্রয়াসে আমাদিগের উদ্যম নষ্ট না করিয়া যাহাতে আমাদিগের শরীর সুস্থ থাকে এবং যাহাতে এই সকল জীবাণুর সহিত সংগ্রাম করিতে পারে তাহার দিকেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এইরূপ করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগের নাসিকার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে কারণ এই রোগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ইহাই আমাদিগের যন্ত্র এই যন্ত্র যদি ঠিক থাকে তবে আমাদিগের রোগ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না, ইহা ছাড়া আমাদিগের সমগ্র শরীরকে রক্ষা করাই আমাদিগের প্রধান কার্য্য। স্থানিক যন্ত্র ঠিক অবস্থায় রাখিয়া যদি শরীর সুস্থ অবস্থায় না থাকে তবে রোগাক্রমণ হইতে বাঁচিবার আশা কম। রক্ত চলাচল ঠিক থাকা চাই এবং রক্তে যাহাতে কোন প্রকার দূষিত পদার্থ না থাকে তাহার উপায় করা চাই। রোগাক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রাত্রে শয়নের সময় গৃহের জানালা খুলিয়া রাখা দিনে মুক্ত বায়ুতে ও সূর্য্যালোকে অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণ থাকা উচিত এই উপায়ে শরীর দৃঢ় হয় এবং নানা প্রকার জীবাণুর আক্রমণ হইতে শরীর আত্মরক্ষা করিতে পারে।

শরীর সকল সময়ে এরূপ অবস্থায় থাকে না যাহাতে সকল সময়েই রোগাক্রমণে বাধা দিতে পারে, তাহা ছাড়া জীবাণুর শক্তির ও কম বেশী আছে। এই জন্যই সকল সময়ে বুঝা যায় না কোন কারণে আমাদিগের রোগ হইয়াছে।

"সঞ্জীবনী।"

অশ্বিনীকুমারের শক্তির উৎসব।

গার্হস্থ্য জীবন।

পরমহংসদেব বলতেন, সংসারে থাকবি তো মাখন হয়ে থাক, দুধের জিনিষ দুধের জেতরেই থাকবি অথচ দুধের সাথে মিশবি না। অশ্বিনীবাবুর গার্হস্থ্য জীবনটী আলোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি সংসারের থেকেও সন্ন্যাসী ছিলেন। আসক্তি তাঁর কোন

কিছুর উপরেই দেখি নাই। বিলাসিতাই মানুষকে সকলের চেয়ে আগে আক্রমণ করে যার থেকে মানুষের পতন আরম্ভ হয়। কিন্তু বিলাসিতা তাঁকে আক্রমণ করা তো দূরের কথা; বিলাসপ্রিয় লোক পর্য্যন্ত তাঁর কাছে যেতে ভয় পেতো। তবে সংসারে তাঁর যখন যেটুকুর প্রয়োজন তাঁর কোন ত্রুটী হয়নি, সাংসারী মানুষের পক্ষে এটে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কর্ত্তব্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। এটুকু না করলেও বোধ হয় সংসারের কর্ত্তব্যের একটা দিক বাদ পড়ে যায়। তিনি পরিষ্কারের সাথে মনের পরিচ্ছন্নতা খুবই পছন্দ করতেন;—ভগবৎ-ভক্তদের ইহাই একটা লক্ষণ। পরমহংসদেবও বলতেন, ঠাকুর ঘরে যাবি তো গঙ্গাস্নান ক'রে যা, অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যা, গায়ে কোন ময়লা যেন না থাকে। বাইরের পরিষ্কারের সাথে মনেরও পরিচ্ছন্নতা এসে পড়ে। অনেক সময় তিনি বলতেন "আনন্দের শিশু আনন্দ করতেই এসেছি, আনন্দময়ের সাধনার জন্যই সংসারে আসা, তাঁকে সাধন করতে হবে; পেচক-বদন হয়ে তাঁকে ডাকবো কেন? আনন্দে নেচে গেয়ে আনন্দের শিশু আনন্দময়ী মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বো। "ফূর্ত্তি মন্ত্রেরই" তিনি পূজক ছিলেন, তাঁর গানেও তা পাওয়া যায়।

গীত।

ফূর্ত্তি মন্ত্রের পূজক আমি, ফূর্ত্তিই আমার ধ্যান,
ফূর্ত্তিই আমার জপ তপ, ফূর্ত্তিই আমার দান ॥

আমি যাঁর করি পূজা, সে ফূর্ত্তি-মুলুকের রাজা,
ফূর্ত্তিরই তাঁর বাজ্‌ছে বাজা ফূর্ত্তিরই হচ্ছে গান ॥

ফূর্ত্তি থেকে সৃষ্টি হয়, ফূর্ত্তিতেই ব্রহ্মাণ্ড রয়,
ফূর্ত্তিতেই হয় লয়, ফূর্ত্তিরই বিধান ॥

পানে থেকে একটু চুণ খসেছে, অমনি ঠুনকো প্রাণ ছেঁকে গেছে,
দু চ'খে ঝরনা ঝরছে হা হুতোশির জ্ঞান ॥

ধরো একটা বিড়াল ছানা, তাকে আকাশ থেকে ফেলে দাওনা,
যোলআনা পূর্ণ চৈতন্য হবে না, যে যদি চাই যে-ভাব ॥

ওকালতী পাশ করেই তিনি ঋষি রাজনারায়ণ বসুর সাথে দেখা করতে যান। বোধ হয় রাজনারায়ণ বাবু তখন দেওঘরে ছিলেন,—পীড়িত। এই রাজনারায়ণ বাবু বাংলার কি ছিলেন তার একটু আলোচনা এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শিষ্যের জীবনের সাথে গুরুর জীবন আলোচনা হলে উভয় জীবনই উজ্জ্বল হয় বলে আমার বিশ্বাস। মা যে কত রত্ন প্রসব করেছেন তার খোঁজ অনেকেই রাখেন না, অথচ এই সব মহাপুরুষদের জীবনের ঘটনাবলী আমাদের দৈনন্দিন আলোচনার সামগ্রী হওয়া উচিত। এ আলোচনায় যে শুধু মনুষ্যত্বের দিকটাই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় তা নয়, সমগ্র মানব জাতিটাকে কল্যাণের পথে টেনে নেয়। পরশপাথরের স্পর্শ ব্যতীত লোহা যেমন সোনা হয় না, তেমন সাধুদের স্পর্শ ব্যতীতও মানুষের দেবতা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

অশ্বিনীবাবু দেওঘরে গিয়ে দেখেন ঋষি শয্যাশায়ী। পীড়ার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছেন। অশ্বিনীকে দেখেই যেন ভেতরে আনন্দের তুফান বইতে লাগলো, কখনো বেদান্ত, কখনো কোরাণ, কখনো বাইবেল, কখনো হাফেজ চলতে লাগলো। যখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছেন তখন মাঝে মাঝে বলে উঠছেন অশ্বিনী,—আমাদের ছ'জনার এখন "সেম্পেন চলছে।" যখন খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে তখন এক একবার বলে উঠছেন অশ্বিনী,—উঃ—। আবার ঐ অনন্তরূপ সেম্পেন বা মদ খাচ্ছেন। অশ্বিনীবাবু আবার বলেছেন, মুকুন্দ, এই ভাবই হচ্ছে সাধকের সিদ্ধির অবস্থা বা উন্নত অবস্থা। বিশেষ ভাগ্যবান বা ঠাকুরের কৃপাপাত্র না হ'লে এ অবস্থায় মানুষ পৌঁছিতে পারে না।

পায়ের ধুলা নিয়ে যখন বিদায় প্রার্থনা করলেন তখন আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন তোকে বড়ই স্নেহ করি, বিদায় নিচ্ছিস্—যাবার সময় একটা কথা বলে দিচ্ছি, বৃদ্ধের এই কথাটা তুই স্মরণ রাখিস, আর রক্ষা করতেও চেষ্টা করিস। তোকে দেখে মনে হয়, তুই সংসারে কিছু কাজ করবি, ঠাকুর তোর দ্বারা কিছু করাবেন। আমি তোর কর্মক্ষেত্র নির্দেশ করে দিচ্ছি, এ ক্ষেত্র ভুলে যাসনে কিন্তু। যার পশ্চিমে, মারাটা ডিচ্‌ যার পূর্ব্বে, কাশীপুর যার উত্তরে, টালিগঞ্জ যার দক্ষিণে, এই সীমানাটুকুর ভেতরে যেন তোর কর্ম্মক্ষেত্র না হয়। বরিশালেই কর্ম্মক্ষেত্র ক'রো। কলিকাতার মানুষের জীবনে পূর্ণত্ব আসা বড় শক্ত ব্যাপার। বর্ত্তমান কলিকাতা যাঁরা ভাল করে দেখেছেন—অর্থাৎ খাঁটী চখ্‌ দিয়ে, তাঁদের পক্ষে এ কথা

অস্বীকার করাও সঙ্গত নয়। অশ্বিনীবাবু উত্তরে বলেছিলেন, আশীর্ব্বাদ করুন, আদেশ প্রতিপালন করে যেন আমি কৃতার্থ হয়ে যেতে পারি। অশ্বিনীবাবু তাঁর গুরুর আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করে গেছেন, অনেকেই তাঁকে "High Court"এ দাঁড়াতে বলেছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর গুরুবাক্য লঙ্ঘন করে কখনো তাঁর সাধনক্ষেত্র বরিশাল ত্যাগ করেন নি।

বরিশালে ওকালতী করে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি "প্রসিদ্ধ উকীল" এই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তখন বরিশালে অনেক প্রতিভাশালী উকীল ছিলেন যাঁদের পরামর্শ নিয়ে High Court এর উকীল ব্যারিষ্টার মহাশয়েরাও অনেক সময়ে কাজ করতে বাধ্য হতেন। অশ্বিনীবাবু অল্পদিনের ভেতরেই তাঁদের সকলের স্নেহ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন ইহাই তাঁর ওকালতি জীবনের বিশেষত্ব। এই সময়টাতে তাঁর ব্রহ্ম সমাজের দিকেই বেশী অনুরাগ লক্ষিত হয়েছিল বলে অনেকে বলেন। কিন্তু তিনি পুরাতন হিন্দু মতের সীমা অতিক্রম করে কখনো চলেছেন একথা শুনা যায় নি। কখনো তাঁর মুখে কেউ কালী কি কৃষ্ণের নিন্দা শোনেন নি। ব্রহ্মজ্ঞানের আস্বাদ তিনি তাঁর জীবনে পেয়েছেন, তা না হ'লে দ্বন্দাতীত অবস্থায় মানুষ বেশী সময় স্থির থাকতে পারে না। একমাত্র ব্রহ্মানন্দ ভোগীর জীবনেই তাহা সম্ভব। তিনি ব্রাহ্ম সমাজেরও যেমন নেতা ছিলেন, বরিশাল বান্ধবাশ্রমের বা ধর্ম্মরক্ষিণী সভারও তেমনই চালক ছিলেন। ও দু'টী জিনিষই তখন বরিশালে রীতিমত জাগ্রত ছিল। বর্ত্তমানে সে জাগ্রত ভাবের অভাব হয়েছে বলেই বরিশালবাসীর ভেতরে একটু চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে। স্কুল, কলেজের ছেলেরাই তখন তাঁর খেলার সাথী ছিল, তাই তিনি ঐ দু'টী অনুষ্ঠান জাগ্রত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্ত্তমানে তেমন শক্তিশালী খেলোয়ারের অভাব হয়েছে বলেই বান্ধবাশ্রম আর ব্রহ্ম সমাজের অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়। Foot Ball এর গোলেই আজ ছেলেদের জীবন মস্ত বড় গোলে পড়ে গেছে, এই Foot Ball থেকে ছেলেদের সরিয়ে আনতে না পারলে শুধু বরিশাল কেন সমগ্র বাংলার সকল অনুষ্ঠানই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ছেলেদের আলোচনা পর্য্যন্ত Foot Ball বই আর কিছুতে নেই। সেই সময় তাঁর জীবনের স্পর্শ যে সকল ছেলেদের ভাগ্যে ঘটেছে তাঁদের কারো জীবনই ব্যর্থ হয় নি, যিনি যেখানে আছেন তিনিই সেখানে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন। কথায় বলে "জানি কার সঙ্গগুণে রং ধরেছে রে"—সাধুসঙ্গের ইহাই বিশেষত্ব।

কর্ম্মজীবন।

একদিন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ থেকে বক্তৃতা দিয়ে রাত্রি দশটায় অশ্বিনীবাবু বাসায় চলেছেন, সঙ্গে সে দিন অপর লোক কেউ ছিলেন না। সেদিন বক্তৃতার বিষয় ছিল "সত্য।"

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে ভাবছেন এই তো আজ বক্তৃতা দিয়ে এলুম, আমাদের সকলকে সত্যবাদী হ'তে হবে, সত্যকে অবলম্বন করেই আমাদের কর্ম্মের পথে অগ্রসর হ'তে হবে।

কিন্তু কাল Court এ গিয়ে আমাকেই আবার মিথ্যা নিয়ে দাঁড়াতে হবে, বিপক্ষের অনিচ্ছারও মিথ্যাকে সমর্থন ক'রে Court এ বক্তৃতা করতে হবে। আচ্ছা আমি কি মিথ্যা কথা না ব'লে পারি না? টাকা উপার্জ্জনের জন্যই ত আজ আমায় ওকালতী করতে হচ্ছে, বাবা যা রেখে গেছেন তাতেই ত আমার মোটা ভাত মোটা কাপড় হ'তে পারে? মিথ্যা কথার ব্যবসা করতেই কি আমি সংসারে এসেছি, ঠাকুর কি আমায় এই জন্যই সংসারে পাঠিয়েছেন? এত ঘৃণিত জীবন আমার? উপদেষ্টার আসনে ব'সে আজ আমি যে বাণী প্রচার করে এলুম, আমার ব্যক্তিগত জীবনে যদি তা অনুষ্ঠিতই না হলো তবে সমাজকে এ প্রতারণা ক'রে আমার ভবিষ্যৎ ম্লান করে তুলছি কেন? ভেতরে দেবতা জাগ্রত হয়েছেন, বার বার তিনি প্রাণে আঘাত করে তার অভীষ্ট পথ নির্দ্দেশ করে দিচ্ছেন আর কি স্থির থাকবার যো আছে? প্রাণ-গঙ্গায় যে বান ডেকেছে, কোথায় তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে প্রাণের সঞ্চিত আবর্জ্জনা। সত্যের বিমল রশ্মিতে প্রাণ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, প্রাণ তার কর্ত্তব্যের পথ চিনে ফেলেছে, তাই তখনই সঙ্কল্প হলো "আর আমি court এ যাবো না অন্য ভাবে জগতের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করবো।" আনন্দে ভরপুর হয়ে বাড়ীতে এলেন।

সে দিন আর কারুর কাছেই সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেন না তারপর দিন প্রত্যুষেই সহধর্ম্মিনীর কাছে তাঁর শুধু সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেন। সহধর্ম্মিনীও হাসা মুখে তাঁর আরাধ্য দেবতার সাধু সঙ্কল্প সমর্থন করে তাঁর কর্ত্তব্য শেষ করলেন। তিনি ভাগ্যবতী।

ওকালতী ত্যাগ করো ওকালতী ত্যাগ করো, মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনের একটা মস্ত বড় প্রচার্য বিষয়। অনেক স্বদেশ সেবক মহাত্মার এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করে দেশ-সেবার জলন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে ধন্যও হয়েছেন। কিন্তু পঁচিশ বছর পূর্ব্বে মায়ের একনিষ্ঠ সন্তান অশ্বিনীকুমারের প্রাণে এ প্রেরণা এসেছিল এবং তিনি সে প্রেরণার সার্থকতা নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করে দেশের কাছে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

নূতন কিছু জগতকে যদি কেউ দেয় তবে সে বাংলাই দেবে—একথা খুব জোর গলায় বলা যেতে পারে। বাংলাকে এ যে শ্রীচৈতন্যের বাংলা, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দের বাংলা, রামমোহন, কেশব সেনের বাংলা, বঙ্কিম মাইকেল নবীন হেমচন্দ্রের বাংলা, বাঙ্গালী গৌরব করবে না কেন? বাঙ্গালীর যে গৌরব করার যথেষ্ট সামগ্রী রয়েছে। বাঙ্গালীর যা আছে সমগ্র বিশ্বের যে তা নাই। আজ মহাত্মা যে অহিংসা মন্ত্র প্রচার কচ্ছেন এ যে বাংলার অতি পুরাতন কথা, এ যে বাঙ্গালীর শ্রীনিত্যানন্দের। "মেরেছিস কানা কলসির কানা তা বলে কি প্রেম দিব না" ... টিক বদনে হরি বোলরে" এ সেই কথা; বাঙ্গালীর কাছে মহাত্মার এ মন্ত্র নূতন নয়; পাঁচশো বছর পূর্ব্বেই বাঙ্গালী এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। কথাটা হচ্ছে কি, তম, রজ আর সত্ত্ব, এই যে ত্রিগুণের খেলা এ পুরাকাল থেকে চলে আসছে; এত যুগ যুগান্তর চলে গেল কিন্তু এ ত্রিগুণ

তলার লড়াই আজ পর্যন্ত থামলো না। বাঙ্গালী উপাসনার সোপান লঙ্ঘন করে এক পা অগ্রসর হ'তে পারে না, তাতে তাঁর ইষ্ট দেবতার মর্যাদা নষ্ট করা হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ হচ্ছে সোপান লঙ্ঘন করে এক পা অগ্রসর হয়ো না, ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে আসতে হবে। তাই তমোগুণী বাঙ্গালী চায় তার রজোগুণকে জাগিয়ে তুলতে, রজোগুণের ভেতর দিয়েই সে সত্যে পঁহুছাতে চায়, তাই মহাত্মার সত্যের বারতা, আর বিশ্বভারতের কথা বাঙ্গালীর কাণে তেমন ভাবে পঁহুছায় নাই। এদেশে ভারতের অনেক নেতা অথবা বক্তা, তার ভেতরে আমাদের বাঙ্গালীও দু'চারজন আছেন যাঁরা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন যে বাংলা এ আন্দোলনে অনেক পিছিয়ে গেছে, আরো কত কি। এ সকল বক্তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে বোধ হয় অন্যায় হবে না, আশা করি তাঁরা সদুত্তরও দেবেন; এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন, পীড়িত, লাঞ্ছিত, ভারতবর্ষের ক'জন নরনারী এই "প্রেমমন্ত্রে" দীক্ষা নিয়েছেন? প্রিয়পাঠক! প্রাণের আবেগে আমি অনেক দূর এসে পড়েছি আশা করি ক্ষমা করবেন।

বেলা ৮টার ভেতরেই সহরময় অশ্বিনীকুমারের ওকালতী ত্যাগের কথা ছড়িয়ে পড়লো। যাঁরা অশ্বিনীবাবুর অভিভাবক রূপে তখন বরিশালে ছিলেন, তাঁরা সকলেই এসে বাসায় উপস্থিত। কত অনুরোধ ও উপদেশেও অশ্বিনীকুমারকে সত্যের পথ থেকে কেউ তিল মাত্র টলাতে পারলেন না; সত্যের কাছে সকলে পরাস্ত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করে যে যাঁর আপন কার্য্যে চলে এলেন। যাদের মোকদ্দমা হাতে নিয়েছিলেন তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না, তাদের মোকদ্দমার ক্ষতি হবে বলে দু'চার দিন courtএ যেতে বাধ্য হয়েছিলেন! ইহা কর্ত্তব্যের ডাক, এ ডাক অগ্রাহ্য করলে কর্ত্তব্যের ত্রুটী হবে মনে করেই তিনি দু'চার দিন court এ গিয়েছিলেন।

ওকালতী ত্যাগ হয়ে গেল, এখন কি করবেন, জীবনতরণী কোন পথে চালাবেন, তা'র চিন্তা করতে লাগলেন। কিছু দিনের মধ্যেই স্থির করলেন শিক্ষা বিস্তার করতে হবে, সর্ব্বসাধারণের ভেতর শিক্ষা বিস্তার না হওয়া পর্যন্ত দেশে জাতীয় ভাবের উন্মেষ হবে না; তাই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ঐ দিকেই নিয়োজিত করলেন। অল্পদিনের চেষ্টায়ই আপনার বাটীতে একটা Entrance School এর পত্তন করলেন। এই বিদ্যালয় থেকেই তাঁর প্রকৃত কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়।

বিদ্যালয়টী অল্প দিনের ভেতরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। যে সকল শিক্ষক তিনি পেয়েছিলেন তেমন শিক্ষক বাংলার সকল বিদ্যালয়ে থাকলে আজ বাংলার যুবকদের জীবন বিশ্বের একটা আলোচনার সামগ্রী হতো। সেই সকল শিক্ষকদের অনেকেই এখন পরলোকে, যাঁরা বর্ত্তমান আছেন তাদের পদধূলি পেলে এখনো মানুষ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার শ্রদ্ধেয় কুমার জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখনও বরিশালে তাঁর

আশ্রমে আছেন। ইনিই কর্ম্ম জীবনে অশ্বিনীকুমারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন, আজ পর্য্যন্তও তিনি কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেননি। এখন তিনি তাঁর ভাঙ্গা বুক নিয়ে আর কর্ম্মক্ষেত্রে থাকবেন কি না তা তিনিই জানেন; যদি থাকেন সে আমাদের সৌভাগ্য। এই সকল সহকর্ম্মীদের মিলিত চেষ্টায়ই অশ্বিনীকুমার তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আগ্নেয়মী মন্ত্রে দীক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

একদিন বরিশাল ব্রহ্ম সমাজের শ্রীযুত বরদাকান্ত রায় মহাশয় এসে অশ্বিনীবাবুকে বল্লেন; "অশ্বিনীবাবু, নৌকা ঘাটে একটী মাঝি কলেরা হয়ে নৌকায় পড়ে ছট্‌ফট্ কচ্ছে, সঙ্গে তার বন্ধু বান্ধব কেউ নাই, লোকটা এভাবে কিছু সময় থাকলে নিশ্চয়ই মারা যাবে, এর জন্য কি আমরা কিছুই করতে পারি না?" যার সেবা-ময় জীবন তিনি কি আর এ কথা শুনে স্থির থাকতে পারেন? তিনি তখনই বরদাবাবুর সাথে সে নৌকায় গিয়া মাঝির পাশে বসলেন। অশ্বিনীবাবু এমন করে নৌকার মাঝির পাশে বসেছেন বরিশালে এ এক নূতন ব্যাপার। এ দেখে বরিশালের অনেক গণ্য মান্য লোক এসে সে যায়গায় উপস্থিত হলেন, অশ্বিনীবাবু তাঁদের কাছে মাঝির সেবার বিষয় ব্যক্ত করলেন। আমাদের কাছে থেকে লোকটা চিকিৎসা বা সেবার অভাবে মারা যাবে এ বরিশালের পক্ষে বস্তু বড় কলঙ্ক, এ কলঙ্ক রাখবার আমাদের অধিকার নেই, তাই আমি অনুরোধ করি আপনারা সকলে এর সেবা করে বরিশালের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন। কথা শুনে সকলের প্রাণেই সেবার গুরুত্ব উপলব্ধি হয়ে গেল, তখনই সকলে মিলে তাকে Hospital এ নিয়ে গেলেন, ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করে তাকে রোগ মুক্ত করে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো; এই সেবা থেকেই তাঁর প্রাণে সেবক-সঙ্ঘ তৈরী করার ইচ্ছা বলবতী হয়ে ওঠে, এবং তাঁর বিদ্যালয়ে Little Brothers of the poor" বলে একটী সেবা সমিতি" গঠন করেন। এই "সেবা সমিতি" যে বরিশালে কি অপূর্ব্ব কাজ করেছে বা কচ্ছে তা যাঁরা বরিশালে গিয়েছেন তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন। এই অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়েই তিনি ছেলেদের জীবনে সেবার বীজ রোপন করেন।

স্বর্গীয় ঋষি কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ই ছিলেন এই সেবক-সঙ্ঘের চালক, বা Captain. স্বামী বিবেকানন্দ যে দরিদ্রনারায়ণের সেবা আজ জগতময় প্রচার করে ভারতকে ধন্য করেছেন নিজেও ধন্য হয়ে গেছেন, সেই দরিদ্র নারায়ণের সেবাও বরিশালে এই পঁয়ত্রিশ বছর যাবত চলে আসছে। ছাত্রজীবন গঠন করার যে সকল পন্থা তিনি অবলম্বন করে ছিলেন তাও জগতে নূতন। প্রতি শনিবারে তিনি অথবা তাঁর বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক ছেলেদের নিয়ে Excursion এ যেতেন, এবং এই খেলার সাথে ছেলেদের যে শিক্ষা দেওয়া হতো, তাঁর মতে তাই হচ্ছে ছেলেদের প্রকৃত শিক্ষা। কোন জঙ্গলের পাশে ছেলেদের জন্য "খিচুড়ী রান্না হতো" কারণ সে আনন্দটাই হচ্ছে ছেলেদের সব চেয়ে আনন্দের জিনিষ।

এদিকে খিচুড়ী রান্না হচ্ছে ওদিকে হয় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, না হয় বেদ, কিম্বা গীতা এর যে কোন একখানা গ্রন্থ পাঠ ক'রে তার ভেতর থেকে কত অমূল্য কথা ছেলেদের তিনি শোনাতেন। এরূপ শিক্ষাই আমাদের জাতির জীবনের ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরে যাঁর জীবন প্রতিষ্ঠিত নয়, ব্রহ্মানন্দের পরশ যাঁর জীবনে হয়নি, সে জীবনের সার্থকতা কি? তাই ছেলেদের ঐ ব্রহ্মানন্দের দিকটে যাতে ফুটে ওঠে সে দিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। ইহাই ছিল অশ্বিনীবাবুর বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব। এই জনাই সে বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা বাংলার সকল বিদ্যালয় থেকে বেশী ছিল। শিক্ষকরা ছেলেদের সঙ্গে যে ভাবে মিশতেন, তেমন ভাবে মেলামেশা ক'রে ছেলেদের বুকে টেনে নেওয়া শিক্ষক আজ বাংলায় দুর্লভ হ'য়ে উঠেছে। তাই ছেলেদের জীবনও দিন দিন বাঁধন-ছাড়া হয়ে পড়ছে। শিক্ষক আর ছাত্রের সম্বন্ধ হচ্ছে বাপ আর ছেলে। কিন্তু এখন শিক্ষক দেখলেও ছাত্র মনে করে ওটা একটা বাঘ, আর শিক্ষকও ছাত্র দেখে মনে করেন ওটা একটা বাঁদর। মাষ্টার আর ছাত্রের ভেতর যেখানে এই সম্বন্ধ সেইখানে মানুষ তৈরী করার আশা করা বাতুলতা মাত্র? অশ্বিনীবাবু যখন কোন শিক্ষক নিযুক্ত করতেন, তখন তাঁকে নিজেই পরীক্ষা করে নিতেন। তাঁকে বলাই হতো আমি ছেলের পাশ করাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলে মনে করিনে। সেটা অনেক সময় অদৃষ্টের উপরেই নির্ভর করে। কারণ সর্ব্বদাই দেখতে পাচ্ছি, যে ছেলে পরীক্ষায় প্রথম হবে, হয় তো সে ফেল হয়ে গেল, আর যে ছেলেটা ফেল্ হবেই স্থির হয়ে রয়েছে, সে ভাল রকম পাশ করে ফেলে। তাই সে দিক দিয়ে আমার দেখবার তেমন ইচ্ছা নেই আমি চাই ছেলেদের চরিত্র গঠন করতে, তাকে মানুষ করে দিতে। বিদ্যালয় থেকে যখন সে বাড়ী যাবে তখন তার জনক জননী যেন ছেলে দেখে আনন্দে ভরপুর হয়—মনুষ্যত্বের দিকটে যদি ফুটে ওঠে তা হ'লে তার জীবন ব্যর্থ হ'তে পারে না, এই আমার বিশ্বাস।

এই ভাবে পরীক্ষা ক'রে শিক্ষক নিযুক্ত করায় লাভ এই হয়েছিল, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র দেখলেই লোকে মনে করতেন এর কিছু বিশেষত্ব আছে। কলিকতার অনেক অধ্যাপক নাকি বলেছেন—বরিশালের ব্রজমোহনের ছাত্র দেখলেই চেনা যায়। শিক্ষক নির্ব্বাচনে অশ্বিনীকুমারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল বলেই তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের তৈরী ছাত্র দিয়ে বাংলার একটা নূতন ভাবের স্রোত বহাতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। তিনি কর্ম্মবীর। পূর্ব্বেই বলেছি তাঁর স্নেহময় স্পর্শ যাঁরা পেয়েছেন তাদের কারুর জীবনই ব্যর্থ হয় নি। তিনি যে ছাত্র জীবন গঠন করার প্রকৃত অধ্যাপক ছিলেন এ কথা বাংলার কারো অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

"বিজলী"

শ্রীমুকুন্দলাল দাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এবারে মহামায়ার আগমন হইয়াছিল মহামারী লইয়া। আশ্বিনের শেষে ওলাউঠা দেখা দিয়াছিল সহরে ও মফঃস্বলে। সরকারের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার প্রকোপ অগ্রহায়ণের প্রথমেও প্রশমিত হয় নাই। সহরে থামিলেও মফঃস্বলে আজও তাহার জের চলিতেছে। মৃত্যু-আতঙ্কে অধিবাসীবর্গ এরূপ অভিভূত হইয়াছিল যে পূজার উৎসব-আনন্দে কেহই যোগ দেন নাই। অনেকেই সহর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন, যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের আলোচনার বিষয়ই হইয়াছিল 'আজ আবার কার কি হ'ল!' কোচবিহার সহরে 'দেবী-বাড়ী'তে দেবীপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর মেলা হয়—এবার তাহা হইতে পারে নাই, তোর্ষা নদীতে 'ভাসান' হয়, নদীর দু'ধারে কলেরা—কাজেই প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়াছিল একটি বৃহৎ সরোবরে। জ্বরেও লোকে কম ভুগে নাই, জ্বরে প্রাণহানি হইয়াছে কম কিন্তু কাহিল করিয়াছে রোগীকে খুব,—এবারকার জ্বরের দৌর্ব্বল্যই প্রধান লক্ষণ।

*   *   *   *   *

শীত পড়িয়াছে,—এখনও কনকনে নয়,—সহরের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাল হইতেছে কোচ-বিহারে যে বৎসর শীত বেশী পড়ে, স্বাস্থ্যও সে বৎসর ভাল হয়।

গো-মড়ক এবারে সর্ব্বত্র। সর্ব্বদিকে হাহাকার! ধনপ্রাণে মরিয়াও আমাদের চেতনা জাগ্রত করিতে সমর্থ হইবে কি দেবতা! মুখে হাহাকার কিন্তু অন্তরে যে ঘোর নিদ্রা-তন্দ্রাস ভাব রহিয়াছে তাহার। কোথায় দুঃখ নিবারণের চেষ্টা? ওলাউঠায় প্রাণ যায়! আতঙ্ক অস্থির! কিন্তু স্বাস্থ্যের নিয়ম পালনে যত্নবান কম ব্যক্তি! রোগ যে এরূপ সংক্রামক ব্যাপ্ত হয়, আমাদের অসাবধানতা, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যই তাহার মুখ্য কারণ। লোক বুঝাইলেও বুঝিতে চায় না—যিনি বুঝেন তিনিও জ্ঞান অনুযায়ী আচরণ করেন না। প্রাণ দিবেন তথাপি আলস্য ত্যাগ করিবার হাঙ্গামা পোহাইবেন না! আমরা জানি এই মহামারীতেও জল ফুটাইয়া পান করেন নাই অনেকেই। খাদ্যাদি রীতিমত ঢাকিয়া মাক্ষিকা প্রভৃতি হইতে রক্ষা করেন নাই প্রায় পনর আনা অধিবাসী। রোগ হইলেও সাধারণের মধ্যে গোপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছে প্রায় অর্দ্ধেক লোক,—এ অবস্থায় রোগের প্রসার হইবেই ত! চিকিৎসা বিভাগ মহামারীর সময়ে বহু পরিশ্রমে রোগপ্রশমনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন—বহু উপদেশ অস্থানে অযাচিতভাবে দান করিয়াছিলেন। অকর্ষিত হৃদয়ে কি ফল ফলে! মহামারী হউক আর নষ্ট হউক—সংক্রামক রোগের মূল—তাহার ব্যাপ্তির কারণ—তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় অধিবাসীদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিতে না পারিলে সাময়িক চেষ্টায় ফল লাভের আশা কম!

পাড়ায় পাড়ায় হইয়াছে কালীপূজা—নিজের প্রাণের আতঙ্কে ছাগের প্রাণ লইয়া প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইবার আশা থাকিলেও কয়েকটি রোগের কারণ হইয়াছিল রাত্রিজাগরণ ও

পাঁঠাপ্রসাদ। উৎসবে আতঙ্ক দূর হয় সত্য কিন্তু সেই সঙ্গে শরীরের উপর অত্যাচার হয় যদি মা কালী কি রক্ষা করেন—তাঁহারই নীতি যে অনাচারী অত্যাচারীর পরিত্রাণ নাই!

কোচবিহারের রিজেন্সী কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন—মিঃ এচ, জে, টোয়াইন্যাম, বি-এ, আই সি এস; তাঁহার কার্য্যকাল পূর্ণ হওয়ায় তিনি ভারত গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসে ৯ই নবেম্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন—তাঁহার স্থানে মেজর সি, টি, সি প্লাউডেন, আই-এ, বৃত হইয়াছেন। ইনি ইহার পূর্ব্বে ছিলেন মহীশূর রাজ্যে। প্লাউডেন পরিবার বহু দিবস হইতে ভারতে ভারতসরকারে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

এ বৎসর প্রতিমাসেই ব্যথিত হইতেছি মৃত্যু সংবাদে। বাঙ্গলার সর্ব্বজনমান্য খাঁটী নেতা ঋষিকল্প অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় লোকান্তরিত হইলেন। তাঁহার অভাব বঙ্গবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। অশ্বিনীকুমার কোন জাতি, সম্প্রদায় বা দল বিশেষের নেতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন তাঁহার কর্ত্তব্য বুদ্ধির মূর্ত্তিমান অনুষ্ঠাতা এবং তাঁহার এই গুণেই তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেণীর লোক আপনাদের অভিভাবক ও আত্মীয়রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাঁহার অভাবে বঙ্গে যে সর্ব্বজনীন শোক উৎসারিত হইয়াছে তাহা হইতেই তাঁহার সর্ব্বজনপ্রিয়তা অনুমেয়। অশ্বিনীকুমারের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তাঁহার পত্নী মহোদয়া সংক্রান্তিক মুচি মেথর ধোবা এবং কাঙ্গালীগণকে সুভোজ্য দ্বারা পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের যে প্রীতিতর্পণ করিয়াছেন তাহা অশ্বিনীকুমারের সহধর্ম্মিণীরই উপযুক্ত। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুকুমার ও সরলকুমার প্রত্যেক মুচি মেথরের বাড়ীতে গিয়া সাদরে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন ও কাঙ্গালী ভোজনকালে গলবস্ত্র হইয়া সকলকে যথাসম্ভব আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ইহা বঙ্গে এক অভিনব দৃশ্য ও অশ্বিনীকুমারের বংশধরেরই যোগ্য। দান ব্যাপারেও ইঁহারা মুক্তহস্ততার পরিচয় দিয়াছেন। ভগবান এই অশ্বিনীকুমারের সুকুমার ও সরল এই বংশধরগণকে দীর্ঘজীবি করিয়া মুক্তাত্মার অক্ষয় কীর্ত্তির নিদর্শন চিরস্থায়ী করুন।

নায়ক সম্পাদক পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইহলোকে আর নাই, বিগত ২৯শে কার্ত্তিক দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদকগণ মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তি; তাঁহার লেখনীস্পর্শে বক্তব্যগুলি হইয়া উঠিত প্রাণস্পর্শী; তাঁহার মত অমন মধুর করিয়া সুমিষ্ট সতেজ ভাষায় পাঠককে মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা বাঙ্গলায় সংবাদ পত্রের নায়ক-দিগের মধ্যে কত বেশী নাই। নায়ক সম্পাদক প্রকৃতই ছিলেন পাণ্ডিত্যে অসাধারণ খাঁটী বাঙ্গালী। খাঁটী বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য বাঙ্গলার জাতীয়ত্ব অটুট রাখিতে তাঁহার মত দক্ষ দ্বিতীয় ছিল না। মনটা ছিল তাঁহার খাঁটী বাঙ্গালীর, এই জন্য সময় সময় সেকেলে বাঙ্গালীর মত তাঁহাকে মত পরিবর্ত্তন করিতে দেখা গিয়াছে কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভে

সৌভাগ্যবান ছিলেন তাঁহারা জানেন সেই সকল মত পরিবর্ত্তনের অন্তরালে তাঁহার প্রাণের কতখানি কোমলতা বিরাজিত ছিল। পাঁচকড়ি ছিলেন অতিশয় মাতৃপিতৃভক্ত; আজ সেই যোগ্য সন্তান অতি বৃদ্ধ জনক জননীকে মহাশোকে অভিভূত করিয়া পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে ও বঙ্গের সাহিত্যসমাজকে শোক তিমিরে আবৃত করিয়া মহানিদ্রায় নিদ্রিত। এ বেদনার সান্ত্বনা নাই। কেবল সর্ব্বসন্তাপহারী ভগবানই এ শোকে আশ্রয়।

আর একটী তরুণ প্রাণ আমরা হারাইয়াছি। ইনি ছিলেন পাবনা জেলাবাসী আমাদের কোচবিহার রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব স্বনামধন্য বিচারক স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র বিখ্যাত আই, এম, এস, ডাক্তার শীতেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তিনি বিলাত গমন কালে পোর্ট সৈয়দে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন জনৈক ইংরেজ মহিলাকে এবং তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিবার আশায় অসুস্থ অবস্থাতেও বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন,—পথিমধ্যে সমস্ত অবসান! সান্ত্বনার কি আছে! এ সময় পরমসান্ত্বনার স্থল দেবতার চরণশরণ ব্যতীত। আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে চক্রবর্ত্তী-পরিবারের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পাবনা জেলাবাসী প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ ও বিবিধ গণিতের গ্রন্থপ্রণেতা বিখ্যাত অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও বিগত ২৭শে নবেম্বর মঙ্গলবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

স্থানাভাব বশতঃ গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশ করিতে সমর্থ না হইয়া আমার লেখকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বিশ্বরূপা বহুভুজা কল্পনায় তায় পায় বল না কে ?
মা যে মহালক্ষ্মীরূপে পালেন আপন স্নেহে সন্তানকে।
মহাদেবী মা বিনে আর সর্ব্বঘটে বিরাজে কে ?
ভক্ত সিংহ-বলে নাশেন অসুর, লয়ে পুণ্য-ষড়াননকে।
নাচেন আনন্দে গণেশজননী সিদ্ধি দিতে সর্ব্বজন কে ?
রাখি এক পা ভক্ত সিংহ পৃষ্ঠে অপর পদ এ পাপীরও বুকে।

দীন সেবক—ব্রহ্মানন্দদাস

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
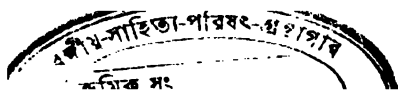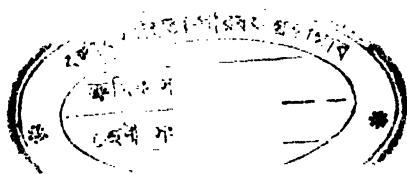
'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।'

৮ম বর্ষ। } পৌষ, ১৩৩০ সাল। { ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

অন্ধ আভিজাত্যের পরিণাম।

মৃত্যু একদিন অবশ্যম্ভাবী ইহা স্থির-নিশ্চয় জানিয়াও মানুষ মনে করে তাহার জীবনে সে দিনের বহু দেরী—ইহাই বিবেচিত হইয়াছিল সে কালে কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! এ যুগে ইহাকেও হার মানাইয়াছে আমাদের আভিজাত্য-গর্ব্বীদের আর একটী আত্মপ্রতারণা। মৃত্যু সজোরে কেশাকর্ষণ করিতেছে, অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণায় তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি, এ দুর্দ্দশার মূল কোথা তাহা জানিতেও বাকী নাই তথাপি চিন্তাবিমুখ মনের বলিবার চেষ্টা—তোফা আরামে আছি বেশ! নিজের দেহে শক্তি নাই—অন্তঃসারশূন্য তবুও মুখের জোরে কেবল ভ্রূকুটী বলেই জয়ী হইবার চেষ্টা! নিজের স্বার্থ একতিলও পরের জন্য ত্যাগ করিব না অথচ অন্যে নিঃস্বার্থ ভাবে আমার স্বার্থ—আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতে বাধ্য,—তাহার নিকট আমার পাওয়াই চাই ষোল আনা কেন না বিধির বিধানে

জন্মিয়াছি আমি জমীদার কুলে, প্রজাসাধারণ আমার সুখের জন্য তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে বাধ্য! বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বংশধর আমি, অন্যে আমার পদানত হইতে বাধ্য! এইরূপ বাধ্য করিবার চেষ্টা প্রকৃতির নিয়মে অসাধ্য, অচল হইলেও অচল-পাষাণের ন্যায় বঙ্গের আভিজাত্য-অভিমানী, বর্ণগৌরবে অন্ধ ব্রাহ্মণবৈদ্যকায়স্থগণের মনে এ যুগেও মাথা তুলিয়া আছে ইহাই,—একালের অত্যাশ্চর্য্যম্! এই ভাবদৈন্যে বঙ্গ দিন দিন অন্য জাতী অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে হীন হইতে হীনতর, ধর্ম্মে অর্থে শক্তিহীন হইয়াও কি করিয়া মোহে মনে করিতেছে, ভ্রূকুটীরই জয়! অন্যকে উপেক্ষা করিয়াও সেবা পাইয়া পুষ্ট হইবার সাধ বর্ণশ্রেষ্ঠ আলালের ঘরের দুলালদের। জাতীয় জীবনের স্বাস্থ্যনাশের হেতু যেটী তাহাই তাহাদের জ্ঞানে শক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। উচ্চ বর্ণগণ সে সংস্কারে এরূপ অন্ধ যে কিছুতেই সে মোহ অন্ধকার কাটিবার নয়। অথচ বিশেষ ভাবে জানেন সকলেই—মাটীর সম্বন্ধ ঘুচাইয়া আকাশে ইমারৎ নির্ম্মাণ চেষ্টাও যাহা, জাতীয় নিম্ন শ্রেণীকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের সুখের প্রচেষ্টাও তাহা,—জানিলে হয় কি,—ব্রাহ্মণ বৈদ্যের সমকক্ষ হইবে অপর জাতি—অসম্ভব—ভাবিতেও তাহা মনে অসহ্য ব্যথা লাগে—সব একাকার! কল্পনা করিতে শরীর হয় রোমাঞ্চিত!

কিন্তু প্রকৃতির পরিশোধ,—স্বভাবের নিয়ম,—বিধির বিধান হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় নাই কাহারও—আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে,—আকাশের ইমারৎ নির্ম্মাণের যতই চেষ্টা কর না কেন, স্বভাবের বিরুদ্ধে যে অনুষ্ঠান—পরিণামে তাহাকে একদিন সেই উপেক্ষিত ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেই হইবে।—বঙ্গের আভিজাত্যাভিমানী বর্ণশ্রেষ্ঠদিগের আজ সেই দশা! সর্পের বিষ দন্তের বিলোপ হইয়াছে—দেহে শক্তি নাই, উদরে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, কর্ম্ম করিবার সামর্থ নাই প্রবৃত্তিও নাই—অভিমান করিয়া বসিয়া থাকা আর চলে না অথচ আজও নিজের জন্য নিজ হস্তে কার্য্য করিতেও দেহমন আরষ্ট হয়—ফলে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণবৈদ্যকায়স্থের অবস্থা দিন দিন হইতেছে ভয়াবহ—সংখ্যা কমিতেছে, তাঁহারা তথা-কথিত ইতর জাতী হইতে হইতেছেন আরও ইতর—আরও অকর্ম্মণ্য—সমাজের দেশের আবর্জ্জনা,—উন্নতি-পথের জীবন-যাত্রার অন্তরায়!

আধ্যাত্মিক উন্নতি অবনতির হিসাব না নাই হইল, সাধারণ জীবন-যাত্রায় বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণাদি জাতীর কিরূপ অবনতি ঘটিয়াছে তাহা আদমসুমারীর খতিয়ানে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গের মুসলমান ভ্রাতাদের সংখ্যায় তুলনায় ব্রাহ্মণাদির সংখ্যার তুলনাত চলেই না অন্যান্য হিন্দু অপেক্ষাও ব্রাহ্মণাদির অবনতির হার ভয়াবহ। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য কলাপ পর্য্যালোচনা করিলে ত মনে হয় না যে এরূপ অবস্থাতেও তাঁহারা একটুকুও ভীত বা বিচলিত! কুম্ভকর্ণের নিদ্রা,—তাহাও ছয় মাস অন্তর ভঙ্গ হইত, ইহাদের মোহ নিদ্রা মরণেও শেষ হইবে না। ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের জন্মের হার, মৃত্যুর হার, শিক্ষিতের হার, সুস্থ্যের হারের অবনতি ঘটিয়াছে! তথাপি আস্ফালন,—আভিজাত্যের অভিমান সমভাবেই চলিয়াছে! মরের অমরত্ব কল্পনায় অপেক্ষাও কি এ—সদা নিগৃহীত দারিদ্রের বেত্রাঘাতে নিত্য জর্জ্জরিত আভিজাত্য অভীমানীর এ-মোহ নিদ্রা আশ্চর্য্যের নয়! এখনও কি এ অবস্থায়েও প্রতীকারপর হইতে বঙ্গের উচ্চজাতী নারাজ! যে প্রেমবলে বলীয়ান হইয়া একদিন ইঁহারা হইয়াছিলেন উচ্চ, শিক্ষক, দশের আদর্শ, সেই মনের ধর্ম্ম, আর কি ফিরিয়া আসিবে না! বঙ্গ কি রহিবে সেই তিমিরে, মরণের নরকের দ্বারে—না—কবে আবার নির্ম্মল মানবিকতা—প্রেমের ধর্ম্মে বর্ণশ্রেষ্ঠগণ হইবেন দ্বিজ—ব্রাহ্মণ!

শ্রী—

রক্তাম্বরা।

—:#:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রহস্যময় কক্ষ।

আমার চক্ষু আমার প্রিয়তমার বিবর্ণ মুখের উপর নিবদ্ধ রহিল। দেখিতে দেখিতে সহসা যেন একটু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। মুখের সমস্ত পেশী ঢিলা হইয়া মৃতবৎ বোধ হইতে লাগিল। রাজা যতীন্দ্রনাথের পুত্রের নিকট যে ছবি পাইয়াছিলাম ঠিক যেন তারই প্রতিচ্ছায়া।

আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও হতাশাব্যঞ্জক অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া ফেলিলাম। তাহার হাত দুটী দুই হাতে চাপিয়া গরম করিবার চেষ্টা করিলাম। মুখের সামনে আয়না রাখিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করিলাম। সব স্তব্ধ। হায় আমার রহস্যময়ী পত্নী কি এবার সত্যিই মৃত্যুমুখে পতিত হইল ? আমি হাত দুটি ধরিয়া বারবার তাহার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম এবং রাণীর সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস লওয়াইবার সকল রকম চেষ্টা করিলাম—সব ব্যর্থ হইল। বেলার সেই মেজর দত্তর সহিত কথোপকথনের সময় মেজর যে অদ্ভুত উপায়ে অতি শীঘ্র মৃত্যুর কথা বলিয়াছিল ইহা নিশ্চয় তাহাই হইবে। কিন্তু উপায় যে দুর্জ্ঞেয়। আমি রাণীর দিকে ফিরিয়া বেলার শিথিল হাতদুটি দেখাইয়া বলিলাম "সব শেষ হ'ল।"

"না ডাক্তারবাবু আপনাকে মিনতি করি ওকে বাঁচিয়ে দিন।"

"মানুষের সাধ্যের অতীত। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ; উনি বিষ খেয়ে মরলেন শেষে।"

রাণী আর্তস্বরে কহিলেন "সেই রমণীই ওকে বিষ খাইয়েছে তা হলে ? কি ক'রে খাওয়াল ?"

"কি করে বোল্‌ব। কোন ঘা নেই, কোন চিহ্ন নেই—বুঝব কেমন ক'রে ?"

"হায় হায় আগে কেন সব কথা বলি নি ? এ বাড়ীর কিছু হ'য়েছে। বোধ হয় ভূত আছে।"

আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন ?"

আমার মুখের কথা মুখেই রহিল। ভৃত্য ডাক্তার হালদারকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

আমি দ্রুত অগ্রসর হইয়া এত রাত্রে তাঁহাকে ডাকার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা রাণীর সহিত পরিচয় করাইয়া বেলার অসুখের সমুদয় লক্ষণ সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। তিনি সস্মিত মুখে আমাকে আশ্বাস দিয়া বেলার দিকে চাহিয়া বলিলেন উঁহাকে মৃতবৎ বোধ হচ্ছে।"

আমি বলিলাম "আমি ত জীবনের লক্ষণ দেখি না আপনি কি বলেন ?"

তিনি আবার ভাল করিয়া বুক মুখ নাড়ী সব পরীক্ষা করিলেন, তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কি কারণে এরূপ হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি রাণীর দিকে চাহিলাম।

তারপর রাণী আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন অবিকল বর্ণনা করিয়া এ সকল কথা বাহিরে প্রকাশ না করিতে অনুরোধ করিলাম।

"গোপন রাখতে চাও? কিন্তু মৃতদেহ নিয়ে যখন পুলিশ গোলমাল কোরবে তখন?"

রাণী হতাশ ভাবে বলিলেন "সত্যি বেলা আর নেই?"

বৃদ্ধ নির্ব্বিকার ভাবে উত্তর দিলেন "না সব শেষ হ'য়ে গেছে।"

"আর কোন উপায় নেই।"

"সত্যি যদি মৃত্যু হ'য়ে থাকে ত উপায় কি হবে?"

আমি তখন বলিলাম "আমাদের মত লোকের ওঁকে মৃত বলে ভুল হ'তে পারে কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র। এও ত এক রকমের মূর্চ্ছা হতে পারে।"

ডাক্তার হালদার নানাপ্রকার ঔষধ আবিষ্কার করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিয়া সমাদৃত হইয়াছিলেন কিন্তু অধিক বাক্য ব্যয় করা স্বভাব তাঁহার ছিল না।

তিনি রাণীর বর্ণিত হঠাৎ মূর্চ্ছা যাওয়ার কথা বিশ্বাস করেন নাই। কনুই, বাহু, নাসিকা পরীক্ষা করিয়াও যেন কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তারপর বামচক্ষুটা খুলিয়া অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ আনন্দধ্বনি করিয়া বলিলেন "আমাদেরই ভুল হ'য়েছে। এখনো মৃত্যু হয় নি।"

আমি উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিলাম "দয়া ক'রে ওঁকে বাঁচান তবে। কি কোরতে হবে বলুন আমি এক্ষুণি কোরছি।"

তিনি তিরস্কার করিয়া বলিলেন "চুপ কর।"

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসিবেন বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। দশ মিনিট পরে একটি ছোট মোড়ক হাতে লইয়া ফিরিলেন। হয় ত কোন নিকটের ডাক্তারখানা হইতে সেটি আনিতে গিয়াছিলেন।

তিনি ফিরিয়াই খানিকটা গরম জল চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ গরম জল আসিল। তখন অনেকগুলি ছোট ছোট পুরিয়া পকেট হইতে বাহির করিয়া এক এক করিয়া তিনি খুলিয়া দেখিয়া লইলেন তারপর সমান ভাগে মিলাইয়া বেলার বাহুতে ইন্‌জেক্‌সন দিলেন।

তারপর সেই মৃত্যুমুখী তরুণীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার প্রদত্ত ঔষধের ফলাফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাণী নিকটে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে আমাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন। হালদার ঘড়ী দেখিয়া আবার আর একটি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া হঠাৎ রাণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আগে বলুন দেখি এমন অবস্থা কি ক'রে হোল ?"

"আমি যা জানি তা ত বোলেছি। আর কিছু জানি না।"

"ডাক্তার হালদার যখন এলেন আপনি আমার কি আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বোলতে যাচ্ছিলেন, সে কি ?

রাণী সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার বৃদ্ধ হালদারের মুখের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "সে অতি অদ্ভুত কথা, সে আমি সকলকে বলতে পারব না। সে আমার বাড়ীর সম্বন্ধে একটি কথা।"

"গুপ্তকথা ? তাই ত শুনতে চাই। নইলে এ মেয়েটির অসুখ সারান যাবে না।" বলিয়া হালদার তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন।

"আচ্ছা বোলছি। বেলার সঙ্গে যে দেখা কোরতে এসেছিল সে চলে গেলে আমি বেলাকে ডাকতে গিয়ে তাকে বসবার ঘরে যখন দেখতে যাই তখন আমার শরীর খুবই ভাল ছিল। কিন্তু সে ঘর থেকে বাইরে আসা মাত্র আমার যেন বোধ হোল যে সমস্ত শরীর অসাড় হ'য়ে যাচ্ছে। যখন ডাক্তার করকে ডাকতে যাই তখন গাড়ীতে কেমন মূর্চ্ছার মত বোধ হোয়েছিল। আরও আশ্চর্য্য এই যে বেলাকে বার ক'রে আনবার জন্য আমার দাসীরা ওঘরে গিয়েছিল তারাও ওই রকম মূর্চ্ছা যাবার মত হোয়েছিল।

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম "তাহলে কিছু গুরুতর রহস্য আছে।"

হালদার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "ভেতরে যাবার সময়ে কিছু অনুভব করেন নি ?"

"না শুধু বাইরে আসার সময়ে"

"ঘরটি একবার দেখ্‌লে যদি কিনারা কোরতে পারি। আপনার ভগ্নীর এ অবস্থার কারণও বোঝা যাবে।"

আমি বলিলাম "উনি জীবিত আছেন তো ?

"আছেন কিন্তু এ শেষ বারের ঔষধটির ফল বুঝতে একটু দেরী লাগবে।"

রাণী আমাদের তাঁর বসিবার ঘরের দ্বার পর্যান্ত পৌছাইয়া দিয়া নিজে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম "আপনি প্রবেশ কোর্‌তে ভয় পাচ্ছেন নাকি !

রাণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "আমি বাইরেই থাকি।"

আমি পুনরায় হাসিয়া বলিলাম "বেশ তাহলে আমরাই যাই ভেতরে।"

ছয়টী উজ্জল বৈদ্যুতিক বাতির আলোকরশ্মিঝলসিত প্রকাণ্ড বসিবার ঘরখানিতে প্রবেশ করিতে রাণীর এরূপ দ্বিধা আমাদের দুজনেরই একটু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। রাণীর মনের এ বৃথা দুর্ব্বলতা দেখিয়া সত্যিই আমার হাসি আসিল। আমার প্রিয়তমা যে স্থানে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিল সেই স্থানে কোন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় কিনা দুজনে প্রথমে তাই পরীক্ষা করিলাম, কিছুই পাইলাম না।

দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে কোন্ অপরিচিতার সহিত সাক্ষাতের ফলে বেলার এমন দশা ঘটিল ? কে সে ? আপনাকে দর্জ্জি বৌ বলিয়া পরিচিত করিল ? জহুরা নয় ত ? সেই মেজর দত্তর মুখে জহুরার নাম আমার কানে কেবলি বাজিতেছিল। আমরা যতক্ষণ পরীক্ষা করিলাম রাণী বিবর্ণ মুখে বাহিরে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমরা কিন্তু কিছুই দেখিতে বা বুঝিতে পারিলাম না। আমি মনে মনে ইহা বেলার অসুখটী রহস্যপূর্ণ করিবার জন্য রাণীর গঠিত গল্প বলিয়া ভাবিলাম। কিন্তু আমাদের সামনে ভীতকম্পিত নারীমূর্ত্তি সে চিন্তা স্থায়ী হইতে দিল না। অবশেষে রাণী আমরা কোন রকম অসুস্থ বোধ করিতেছি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা করি নাই বলায় রাণী বলিলেন "কেবল বাইরে আস্‌বার সময় সে রকম বোধ হয়" আমি হাসিয়া বলিলাম "ভাল কথা আমি এইবার বাইরে আস্‌ছি" বলিয়াই দ্রুত বাহিরে চলিয়া আসলাম। এ কি ! হা ভগবান ! আমার সারা অঙ্গ যেন হিম হইয়া গেল। মাথার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল।" হালদার মশায় আমার রক্ষা করুন। আমার জীবনে কখনো এ রকম হয় নি। বৃদ্ধ চক্ষের নিমেষে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন "কি ? কি রকম বোধ কোরছ ?" আমি প্রশ্ন শুনিতে পাইলাম কিন্তু যেন সে স্বর কোন দুরদুরান্তর হইতে আসার মত ক্ষীণ ও অস্পষ্ট।

হাত পা অবশ, গলার স্বর বদ্ধ, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শিহরণ জাগিয়া উঠিতেছিল। আমি পড়িয়া যাইতেছিলাম হালদার ক্রোড়ে তুলিয়া শোওয়াইয়া বলিলেন "দ্বিজেন কি হোল? বল ত।" আমি কষ্টে বলিলাম "বড় শীত" তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ভীত হইলেন "এ কি! নাড়ীর গতি যে বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হাত পা শীতল ও শিথিল, দৃষ্টি জ্যোতি-হীন ও অন্যান্য সব লক্ষণই ওই মেয়েটির মত হ'য়ে আসছে।"

"আর আপনি? ভাল আছেন?"

"এখনো আছি।"

"আমার যে সব অন্ধকার হ'য়ে গেল। আমাকে কি কোন ওষুধ দিয়ে বাঁচাতে পারেন না। কে যেন জোর ক'রে আমার প্রাণ টেনে বার কোরছে।"

রাণী চিত্রাপিতের ন্যায় আমার পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন।

হালদার তৎক্ষণাৎ যে ঔষধ মেলাকে দিয়াছিলেন তাহাই খানিকটা আমার বাহুতে ইন্‌জেক্ট করাইয়া দিলেন। তাহার পরেও খানিকক্ষণ আমাকে মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল। আর একবার ইন্‌জেক্‌সন্ দিবার পর আমি কিছু ভাল বোধ করিলাম। ভিতরে আমার জ্ঞান ছিল হালদারের উদ্বিগ্ন মুখ আমি দেখিতে পাইতেছিলাম। কিন্তু কথা বলিবার শক্তি ছিল না। হঠাৎ আমার মনে হইল হয় ত বৈদ্যুতিক তারগুলি সংলগ্ন না থাকায় তাড়িতাঘাতে এরূপ হইল কিন্তু তাড়িতাঘাতে ত এরূপ যম যাতনা ভোগ করিতে হয় না। যাহাই হউক কেবল বাহিরে আসিবার সময়ই এরূপ হয় ভিতরে নয় একথা ঠিক। আমি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলাম।

হালদারের অদ্ভুত প্রক্রিয়া।

বিশ মিনিট পরে আমি কথা বলিতে পারিলাম। হালদার আবার একটি লাল বড়ী জলে গুলিয়া আমাকে খাওয়াইলেন। সেরূপ বিস্বাদ কোন ঔষধ আমি কখনে খাই নাই। ডাক্তার হালদার তাঁহার আবিষ্কৃত ঔষধের জন্য পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সে সকল ঔষধ তৈয়ারী করিবার প্রক্রিয়া আমার অজ্ঞাত ছিল। দেশবিদেশ হইতে ডাক্তারেরা তাহার

নিকট সে সকল ঔষধ কিনিতে আসিতেন। হালদার কিন্তু কাহাকেও তাঁহার ঔষধ প্রস্তুতের প্রণালী শিখাইতেন না। আমি সুস্থ হইলে হালদার বলিলেন কি আশ্চর্য্য, সমস্ত লক্ষণ মৃত্যুর মত। কোন রকম বিষাক্ত গ্যাস ত হতে পারে না, কারণ দরজা জানালা সব খোলা কি ব্যাপার দেখতে হোল। যতক্ষণ ঘরে থাকা যায় কিছু বোঝা যায় না বাইরে আসলেই মুস্কিল।"

রাণী। আপনি আর ও ঘরে যাবেন না।

হালদার। এমন কৌতূহল চরিতার্থ করবার উপায় হাতে থাকতে ছাড়তে নেই।

এই বলিয়া তিনি যদি মূর্চ্ছিত হ'ন তাহা হইলে কি কি ঔষধ কি রকমভাবে ব্যবহার করিতে হইবে বুঝাইয়া দিয়া পুনরায় সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের চারিপাশ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া কিছু পাইলেন না। কিন্তু বাহিরে আসা মাত্র বিবর্ণমুখে বসিয়া পড়িলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর কথা-মত তাঁর বাহুতে ঔষধ ইন্‌জেক্ট করিলাম। তিনি বলিলেন তাঁর সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া গিয়াছে। আর শীতে অবশ হইয়া আসিতেছে। আমিও ঐরূপই বোধ করিয়াছিলাম। তিন মিনিট পরে আর একবার ইন্‌জেক্‌সন্ দিলাম। তিনি একটু ভাল বোধ করিতেই বলিলেন "ওই দরজার কাছে কিছু আছে, ভাল করে দেখতে হোল।"

রাণী। ওঘরে আর যাবেন না আমি দরজা বন্ধ করিয়ে দি।

হালদার। ও ঘরে না গেলে অসুখের কারণ বোঝা যাবে না।

রাণী। আগে বেলাকে বাঁচান সে ত এখনো সেইভাবে পড়ে।

হালদার। আগে কারণ না জানলে কি করে বাঁচাব? রোগ ধরতে পেরেছি বটে। মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত।

তিনি আবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজার নিকট সমুদয় স্থান পরীক্ষা করিলেন। তারপর আরও কতগুলি ঔষধ কিনিয়া আনিতে গেলেন।

আমি। এর আগে আর কারো এ ঘরে এসে এ রকম হয়েছিল।

রাণী। আমার সামনে ত নয়।

আমি। আজই তা'হলে প্রথম হোল। সে স্ত্রীলোকটি আসার পর থেকে, কি বলুন। তাকে বাইরে যেতে কেউ দেখে নি ?

রাণী। আমি খাচ্ছিলাম, আমার জামা দেখ্‌বার তাড়া ছিল না। বেলা জামা দেখ্‌তে গিয়ে ফিরল না তাই শেষে তার খোঁজে এলাম। সে স্ত্রীলোকটি কতক্ষণ গেছে কোন্‌খান দিয়ে গেছে কে জানে ?

আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইল স্ত্রীলোকটি জহুরা। কিন্তু আমি যে তাঁহাদের কোন কথা জানি তা জানিতে দিতে ইচ্ছা না থাকায় আমি কিছু বলিলাম না। একটু পরে হালদার নানা রকমের গুলি ও চূর্ণ লইয়া ফিরিলেন। তিনি সেগুলি নিজের আন্দাজ মত মিশাইয়া আবার বেলার বাহুতে ইন্‌জেক্‌সন্‌ দিলেন। এইবারে ফল হইল। অধর ওষ্ঠে রক্তের সঞ্চার হইল। হাত পায়ের শীতলতা কমিয়া গেল। হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক গতি ফিরিয়া আসিল। অবশেষে বেলা তার সুনীলকৃষ্ণ চক্ষুদুটি মেলিয়া বিস্ময়াবিষ্টের মত আমাদের পানে চাহিল। আমি তার পাশে বসিয়া ধীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম "চিন্‌তে পার্‌ছেন না ? আমি ডাক্তার কর। আর এই ইনি ডাক্তার হালদার। ইনি আপনাকে ভাল করলেন। আপনার কি হোয়েছিল বলুন ত ? যে স্ত্রীলোকটী আপনার সঙ্গে দেখা কোরতে এসেছিল সে কি সত্যিই দর্জ্জি বৌ ?"

"না। তিনি একজন ভদ্রমহিলা। কাল কাপড়ে তাঁহার আপাদমস্তক ঢাকা ছিল। চেহারা ভাল দেখতে পাই নি। আমি দর্জ্জিবৌএর বদলে তাঁকে দেখে অবাক হ'য়ে যাই কিন্তু তিনি বোললেন যে এক বন্ধুর কাছ থেকে দরকারী খবর এনেছেন তাই মিথ্যা নামে পরিচয় দিয়েছেন। তারপর আমি অসুস্থ বোধ কোরলাম। ক্রমে হাত পা অবশ হ'য়ে এল। আমি দরজার হাতলে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম কিন্তু ভর না রাখতে পেরে পড়ে গেলাম। তখন তিনি বার হ'য়ে গেলেন যাবার সময় আলো নিভিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে চিনি না। আগে কখনো দেখিনি, কথা বলবার ক্ষমতা না থাকায় কাউকে ডাকতে পারিনি কিন্তু আমার জ্ঞান ছিল, কেবলি ভয় হচ্ছিল আমার প্রাণ থাক্‌তে শ্মশানের আগুনে পুড়তে না হয়।"

আমি। কোন বন্ধুর কাছ থেকে খবর এনেছিলেন তাঁর নাম বোল্‌বেন? তা হলে দেখি যদি কিছু বুঝতে পারি।

বেলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "তা বোলতে পারি না।" ঠিক সেই সময়ে রাণী খাবার ও সরবৎ লইয়া আসিলেন তিনি ভগিনীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি কেবল বেলার বন্ধুর কথা ভাবিতেছিলাম। কে সে? মেজর? না বেলার ভাবী পতি? বেলা নাম না বলায় আমি স্তম্ভিতভাবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার কেবলি মনে হইতে লাগিল সে রমণী জহুরা নয় ত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনাকে সে স্ত্রীলোকটি স্পর্শ করেন নি ত? বা কোন জিনিষ স্পর্শ কোর্‌তে দেয় নি ত?"

"না তিনি শুধু কথা বোলছিলেন। আমি একবার চিঠির কাগজ আন্‌তে বাইরে গিয়েছিলাম; সেখানায় তেলের দাগ থাকায় আবার আর একখানা আন্‌তে গেলাম। বাইরে যেতেই শরীরের ভেতর কেমন কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল আর ঘরের ভেতরে যাবার পর অজ্ঞান হ'য়ে গেলাম আর তিনিও চলে গেলেন।"

"তাঁকে চেনেন না?"

"না আগে কখনো দেখি নি।"

"তিনি কি বোল্‌তে এসেছিলেন তা বোল্‌তে পারেন না?"

"তার সঙ্গে অসুখের ত কোন সম্পর্ক নেই।"

আমার নূতন আঘাত।

বেলা স্ত্রীলোকটির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে অস্বীকার করায় আমি কিছু ক্ষুণ্ণ হইলাম। এ রমণী কাহার সংবাদ আনিল? তাহার ভাবী স্বামীর? কি মেজরের?

আমি কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলাম "স্ত্রীলোকটি আপনাকে হত্যা করবার চেষ্টা কোরেছিল।"

"না, না তাও কি হয়?"

"নইলে বাতী নিভাবার দরকার ?"

"কিন্তু সে চলে যাবার দু'ঘণ্টা পরেও আপনাদের ও'রকম অসুখ কোরবে কেন ?"

হালদার বলিলেন "সেই ত আশ্চর্য্য। ঘরটি যমের দক্ষিণ দোর যেন। সত্যি বেলাদেবী কে এসেছিল আর কি খবর কার কাছ থেকে এনেছিল জানলে আমরা একটা মীমাংসা কোরতে পারতাম।"

"সংবাদ প্রেরক আমার বন্ধু। আমাকে হত্যা করা তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে না।"

"রমণীটিকে আপনি চেনেন না ?"

"না উনি সম্পূর্ণ অপরিচিত।"

হালদার আমার হাতে ঔষধ ঠিক করিয়া দিয়া আবার সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুন্দর সুসজ্জিত ঘরটি দামী আস্‌বাবে সাজান। কোথাও কোন কিছুর চিহ্ন নাই। তিনি আবার বাহিরে আসিলেন। আবার সেই অবসন্ন ভাব বোধ করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ইন্‌জেকসন্ দিতে এবার আর একেবারে মূর্চ্ছা গেলেন না। রোগের কারণ না জ'না সত্বেও ঔষধ যে ঠিক পাওয়া গেছে এই ভগবানকে ধন্যবাদ। হালদার শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ঘর বন্ধ রাখা হোক। কাল আবার আমি দেখব।" তারপর পরদিন আসিব বলিয়া দুজনে বিদায় লইলাম। পথে হালদার বলিলেন "আমার ভাল বোধ হচ্ছে না। এঁরা কিছু লুকোচ্ছেন।"

অবশেষে আমি বাড়ী ফিরিলাম। রাত্রে আমার নিদ্রা হইল না। রাজা যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু, বেলা ও নীরলাদেবীর নাম গোপনের চেষ্টা, নীরলার এই রাজা যতীন্দ্রনাথের রাণীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে আসা,—এইসব ভাবিতে লাগিলাম। বেলা যে সংবাদ প্রেরকের নাম গোপন করিল তাহাতে আরও চিন্তিত হইলাম। অহরা কে হওয়া সম্ভব তাহা ভাবিতে লাগিলাম। বেলা কেন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যা করাও শ্রেয় মনে করে কে জানে ? বাড়ী ফিরিয়াই টেবিলের উপর একখানা চিঠি দেখিয়া খুলিয়া পড়িলাম। অপরিচিত হাতের চিঠি। আমার এক দূরসম্পর্কীয় নিঃসন্তান খুল্লতাতের উকিল চিঠি দিয়াছেন। খুল্লতাতের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমুদয়

সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছি। কপর্দ্দকহীনের নিকট এ আকাশ-কুসুম। চিরদিনের মত অন্নচিন্তা ঘুচিয়া গেল। বিনোদকে সুসংবাদ দিতে চলিলাম। বামীর মা আদর করিয়া বসাইল। বিনোদ খবর শুনিয়া খুব খুসী হইল। তারপর রাত্রের সব ঘটনা বলিলাম। বিনোদ গম্ভীর হইয়া বলিল "দ্বিজেন আমার কথা শোন,—ও'সব ঝঞ্ঝাটে কেন মাথা দিচ্ছ? ওসব ভুলে যাও"

"ভুলে যাব? পাগল? বেলার কথা ভুল্লে?"

"আমার মনে হয় তোমার বেলাও কম নন্। ওঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখাই ভাল।"

"কিন্তু ওরা যদি বেলাকে হত্যা করে? তাকে সব জেনে ওদের হাতে ছেড়ে দিই কেমন করে?"

"তুমি কি মনে কর কাল ওরা সত্যই বেলাকে হত্যা করবার চেষ্টা কোরেছিল?

"নিশ্চয়।"

"কিন্তু তা হলে সবাই ওরকম অসুস্থবোধ কোরলে কেন? হালদারের কি মত?"

"কিছুই না।"

"উনি ত কখনো কিছু বলেন না। নিজের মত বা নিজের নতুন কিছু আবিষ্কার করা ওষুধপত্র কিছুই অপরের কাছে প্রকাশ করেন না।"

"তা ঠিক। এই নিয়ে কত তামাসা কোরতাম মনে পড়ে?"

"আমার কথা শোন, ওসব ভোল,—নিজেকে মিছি মিছি কষ্ট দিচ্ছ। কিছুই হবে না শেষে।"

"তোমার কেন এরকম মনে হচ্ছে? আমার মনে হয় একদিন এ রহস্য ভেদ করতে পারব।"

"আমার কথা শুনে রাখ, কখনো তা পারবে না।"

"কেন বল দেখি?"

"কারণ ওরাও তোমার কাজকর্ম্মের ওপর সর্ব্বদা নজর রাখে।"

"কে নজর রাখে?"

"সবাই। তোমার স্ত্রীও।"

"কেমন করে জানলে ?"

"তোমার স্ত্রী পরশু আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে গাড়ী করে গেলেন আবার এলেন আবার গেলেন। চোখ তাঁর এই বাড়ীর ওপর। তাঁরা যে তোমায় বলেছেন কাল সকালে এসেছেন তা ঠিক নয়।"

"ঠিক জান তুমি ?"

"ঠিক।"

"তুমি চিনলে কি করে ? কখনো ত তাকে দেখ নি ?"

বিনোদ চমকিয়া উঠিল ; সে যেন আমার স্ত্রীকে চেনে এ কথা হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিল। বিনোদ বেলাকে চেনে আমাকে এতদিন তা বলে নাই। আমাকে সে বার বার বেলার আশা ত্যাগ করিতে বলিয়াছে আজ তাহার উদ্দেশ্য বুঝিলাম। হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলাম। বিনোদ তবে কি প্রকৃতপক্ষে আমার বন্ধু নহে !

ক্রমশঃ—

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

ভিঁটের মায়া।

—:o:—

মনটা আমার গাঁথা যে এর
হরেকখানি ইঁটে,
ছাড়বে ব'লে ছাড়তে নারি
এ যে বাপের ভিঁটে !

মিষ্টি যেমন চাঁদের আলো
সকল-সময় লাগে ভালো,—
সবার-মাঝে মিষ্টি এ যে
গুড়ের মতো মিঠে !

সুখের সময় হেথায় যে রোজ
জ্বালাই মোমের বাতি,
মাটিটা এর কাম্‌ড়ে' থাকি
এলে দুখের রাতি ।

বাপের স্নেহ মায়ের মায়া
মূর্ত্ত হ'য়ে ধর্‌ল কায়া,—
এর ছায়াতে মরণ যাচি
দেবের পাদপীঠ এ !

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

কোচবিহারের দামোদরধাম ।

কোচবিহার রাজ্যের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিবার জন্য আমি তখন ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলাম। একদিন দ্বিপ্রহরে দামোদরধাম দেখিবার উদ্দেশ্যে একজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

ছবির মত সাজানো কোচবিহার সহরের নির্জ্জন রাজপথ ধরিয়া পশ্চিমদিকে চলিয়াছি। ক্রমে সহরের পথ ছাড়িয়া ছায়ায় ঢাকা পল্লীপথে আসিয়া পড়িলাম, সেটি সহরতলী। পথের দুই ধারে গৃহস্থের বাড়ী।

কিয়দ্দূর যাইয়া সম্মুখে দেখিতে পাইলাম 'মরাতোরসা।' ইহা স্থানীয় 'তোরসা'নদীর একটি শুষ্কপ্রায় শাখা। পার হইবার কোন বন্দোবস্ত নাই। আমরা ইহা হাঁটিয়া পার হইলাম। তাহার পর পথের উভয় পার্শ্বে শ্যামল শস্যপূর্ণক্ষেত্র। মধ্যে মধ্যে গৃহস্থের দুই চারি-খানা বাড়ী।

মাঠের বুকের 'পরে পল্লীর আঁকাবাকা পথ ধরিয়া দুইবন্ধু গল্প করিতে করিতে চলিতেছি, এমন সময় সঙ্গী বলিয়া উঠিলেন—ঐ সেই ধাম। সৌন্দর্য্যের আগার এক নূতন জিনিষ দেখিবার জন্য আমি উৎসুক নয়নে তাকাইলাম, কিন্তু দেখিলাম শুধু বনস্পতির সভা!

পথের বাম পার্শ্বে একটি উচ্চ স্থান। সম্প্রতি উহার উচ্চতা প্রায় দ্বাদশ হস্ত হইবে। জনৈক বৃদ্ধ গ্রামবাসীর নিকট শুনিলাম, উহা পূর্ব্বে আরও উচ্চ ছিল; বড় ভূমিকম্পে বসিয়া গিয়াছে। স্তূপের শিখরে উঠিয়া দেখিলাম বড় বড় গাছের নীচে লতাগুল্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্তূপের দক্ষিণে 'তোরসা'নদী। স্থানটী নির্জ্জন হইলেও বড় মনোরম। এটি যেন নীরবতার রাজ্য। এই নিঝুম্ নীরবতার পরশে অন্তরে এক গভীর উদাস সুর বাজিয়া উঠে।

স্তূপের উপরেই জঙ্গলের মাঝে এক স্থানে দেখিলাম কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত একখানা বিষ্ণুমূর্ত্তি। দামোদরপুরের এক অতিবৃদ্ধ অধিবাসী আমাদিগকে বলিলেন, বহুদিন পূর্ব্বে জনৈক সন্ন্যাসী ঐ মূর্ত্তিখানা তথায় আনিয়াছিলেন। কোনস্থান হইতে তিনি আসিয়াছিলেন তাহা গ্রামবাসী বলিতে পারিলেন না। শিক্ষাভাবে কি অনিষ্টই না ঘটিয়া থাকে! যাঁহার প্রভাবে কোচবিহারে একদিন ধর্ম্মের বন্যা বহিয়াছিল; এদেশবাসী, এমন কি কোচবিহারের তৎকালীন মহারাজ পর্য্যন্ত একদিন যে সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়াছিলেন, আজ এই দেশের লোকই তাঁহার নাম ভুলিয়া গিয়াছে!

সেই সন্ন্যাসীর নাম দামোদর দেব। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক লোক। পরীক্ষিত নারায়ণ যখন আমাদের রাজা তখন দামোদরদেব আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। পরীক্ষিত নারায়ণের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দামোদরদেব পলায়ন করিয়া

কোচবিহারে আসিলেন। কোচবিহারের তৎকালীন মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহাকে যসম্মানে আশ্রয় দান করিয়া বর্ত্তমান দামোদরপুর গ্রাম নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন (১৫৮৭ খৃঃ হইতে ১৬২১ খৃঃ মধ্যে), এবং স্বয়ং তাঁহার শিষ্য হইলেন। মহারাজ এই উচ্চ স্থানটির উপরে 'হরিমন্দির' নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। দামোদরদেব এই ধামে থাকিয়া তাঁহার সাধন ভজনাদি করিতেন। অল্প সময়ের মধ্যে দামোদরপুর এই রাজ্যে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হইয়া উঠিল।

১৫২০ শকাব্দার বৈশাখমাসের শুক্লা প্রতিপদতিথিতে দামোদরদেব ইহলোক ত্যাগ করেন।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর (১৬২১ খৃঃ) পর কোচবিহার মহারাজবংশও শক্তির উপাসক হইলেন। ক্রমে ক্রমে দামোদরদেবের শিষ্য সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিল। জনকোলাহলময় দামোদরধাম নির্জ্জন হইয়া গেল। যে ধামে একদিন শত মনুষ্যকণ্ঠ মৃদঙ্গতানের সহিত সুর মিলাইয়া হরিগুণ গান গাহিত, আজ সেই স্থান মৌন, যেন ধ্যাননিমগ্ন পাদপে পূর্ণ। আজ সেই বনমাঝে বনমালীর গুণগান শুধু বনবিহগগণই গাহিয়া থাকে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

শীতের সওগাত।

-:০:-

ঘোর কোয়াসার আঁধার কেটে ওরে
আজ থেকে রোজ সন্ধ্যা এবং ভোরে
উঠান কোণে ঘুঁটের আগুন জ্বলুক;
নতুন খেজুর আখের রসই আর
নতুন ধানের পায়স পিঠেটার
জোগাড় সকল ঘরে ঘরেই চলুক—
গৃহস্থদের এতদিনের (আহা)
আশার গাছের ফলটি এবার ফলুক।

নতুন গাছে ধরছে খাসা লাউ
হকনা তবে আতপ চালের জাউ
জলপানিটা হয়ে যাবে তাইতে ;
তৈরী কর মাষকলায়ের বড়ী
হয় যদি তায় ফুলকপির চচ্চরী
দেখ্‌বে এখন কেমন লাগে খাইতে—
সুধার কথা শুনছি শুধু (আহা)
ভাল কিনা হয় এ সুধার চাইতে ?

দারুণ শীতে শরীর কাঁপুক, তবু
মশার কামড় হয়না খেতে কভু
সাপের বাঘের ভয় সেতো আর নাই'ই'
হকনা ভাঙা জল ঝড়ে না ঘরে,
প্রাণ কাঁপে না মেলেরিয়ার ডরে
বহুত ভালা যা আছে যার তাই'ই'—
কেউ বলে না এইদিনে আর (আহা)
'এইটা' 'ওটা' চাইরে আমার চাই'ই'।

গোলা ভরা ধান রয়েছে তাতে
কোনও রকম পেট্‌টা ভরে ভাতে
আজকে সকল দীন দুখীরা হাসুক ;
দেবতারা ঘুমেই থাকুক সবে
আজকে শুধু মাভৈঃ মাভৈঃ রবে
দীনের দেবী বাণী আমার আসুক—
দারুণ শীতে নিঃস্ব হয়েও (আহা)
বিশ্ববাসী হাসুক্‌ আজি হাসুক।

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর।

ইতিহাসে কালিদাস।

প্রথম প্রস্তাব, দিগ্‌বিজয় বর্ণনা।

কবি কালিদাস এবং তাঁহার আশ্রয়দাতা মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে লইয়া দেশীয় এবং বিদেশীয় ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্বিক পণ্ডিতগণ একাল পর্যন্ত অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু এখনও সে সম্বন্ধে সর্ববাদিসম্মত কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই। এদেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে কবি কালিদাস সংবৎ নামে প্রসিদ্ধ অব্দের স্থাপয়িতা উজ্জয়িনীপতি মহারাজ-বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন এবং সার্ উইলিয়ম জোন্স ও বিদ্যাসাগর-প্রমুখ কয়েকজন বিদ্বান্ এই মতের পুনঃপ্রচার করিয়াছিলেন। গত শতাব্দের শেষার্ধে বোম্বাই প্রদেশের প্রসিদ্ধ ডাক্তার ভাউদাজী অনেক গবেষণার পর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর এক হর্ষ বা শ্রীহর্ষ বিক্রমাদিত্যকে* কালিদাসের আশ্রয়দাতা বলিয়া প্রচার করেন এবং তাহার পর প্রোফেসার ম্যাক্সমূলার, ডাক্তার কার্ণ, ডাক্তার ভাণ্ডারকর এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রিপ্রমুখ স্বদেশী বিদেশী বহু পণ্ডিতই সেই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথিত এই বিক্রমাদিত্য ও মালব প্রদেশের উজ্জয়িনী নগরে রাজত্ব করিতেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকসমূহেও যথাকালে এই মত প্রচারিত হইয়াছিল এবং শিক্ষকগণ বালকগণকে এই মতই শিক্ষা দিতেন। অদ্য হইতে প্রায় চল্লিশবৎসর পূর্ব্বে এই মতই বেশ চলিয়া গিয়াছিল।

বর্ত্তমান শতাব্দে আবার সেই মত পরিত্যক্ত এবং অপর একটি নূতনতর মত প্রচারিত হইয়াছে। আজ কালকার বিদ্যালয়ের পাঠ্য "ভারতবর্ষের ইতিহাস" নামধেয় যে কোন

* কেহ কেহ ইঁহার নাম "যশোধর্ম্মদেব" ও বলিয়াছেন।

পুস্তক খুলিলেই এই নূতন মতের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই নূতন মতের উদ্ভাবক এবং প্রচারক পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে পাটলিপুত্রের গুপ্তবংশীয় মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই কালিদাসপ্রমুখ নবরত্নের আশ্রয়দাতা আসল বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহাদের এই মতই আজকাল বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণ মুখস্থ করিতেছেন।

এই আধুনিক মতের প্রকৃত ভিত্তি কোথায়, তৎসম্বন্ধে কোন সূক্ষ্ম আলোচনা অথবা বিচার এ পর্যন্ত আমরা দেখিতে পাই নাই। তবে মোটামোটি এই প্রকার শুনিয়াছি যে কবি কালিদাস তৎপ্রণীত "রঘুবংশ" কাব্যের কয়েকটি শ্লোকের ভিতর অতি কৌশলে গুপ্তরাজগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সংকেত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি রঘুবংশ কাব্যে বর্ণিত রঘুরাজার দিগ্বিজয়কাহিনী প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পিতা সমুদ্রগুপ্তের প্রসিদ্ধ দিগ্‌বিজয়ের স্মারক-স্বরূপে এবং "কুমার-সম্ভব" কাব্য উক্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র যুবরাজ কুমারগুপ্তের জন্মমহোৎসবের স্মৃতিচিহ্নরূপে রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই মতের বিশেষজ্ঞ বিদ্বন্মণ্ডলীর কেহ যদি কৃপাপূর্বক সমুদায় প্রমাণগুলিকে একত্র সমাবেশ করত সমালোচনা করেন, তাহা হইলে আমাদের মত জিজ্ঞাসুজনের বড় উপকার হয়। এই মতের সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া আমাদের মনে অনেকগুলি সংশয়ের উদয় হইয়াছে এবং আমরা মনে করিয়াছি যে বর্তমান প্রবন্ধে ধারাবাহিক ভাবে একে একে সেগুলি প্রকাশ করিয়া ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতবর্গের নিকট সে সকলের মীমাংসা এবং সিদ্ধান্তের জন্য প্রার্থনা করিব। সম্প্রতি রঘুরাজার দিগ্বিজয়কাহিনী লইয়াই উপস্থিত হইতেছি।

প্রথমতঃ পাটলিপুত্রের গুপ্তরাজবংশের যে সকল প্রাচীন-লিপি ডাক্তার ফ্লীট কর্তৃক সংগৃহীত এবং প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে মহারাজ শ্রীগুপ্ত এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার অধস্তন সপ্তম বংশধর শ্রীস্কন্দগুপ্ত পর্যন্ত সেই বংশের প্রতাপ এবং প্রতিপত্তি উত্তরখণ্ডে বিলক্ষণ বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদের বংশলতা এইরূপ—

মহারাজ শ্রীগুপ্ত ।
|
মহারাজ শ্রীঘটোৎকচ গুপ্ত ।
|
মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত + মহিষী লিচ্ছবি-রাজ-কন্যা কুমার দেবী ।
(বংশের প্রথম সম্রাট্—গুপ্তাব্দের প্রতিষ্ঠাতা ; ৩১০—৩২৬ খৃষ্টাব্দ)
|
মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্ত + মহিষী দত্তা দেবী । ৩২৬—৩৭৬ খৃষ্টাব্দ ।
|
মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) + মহিষী ধ্রুব দেবী । ৩৭৬—৪১৩ খৃষ্টাব্দ ।
|
মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্ত । ৪১৩—৪৫৫ খৃষ্টাব্দ ।
|
মহারাজাধিরাজ শ্রীস্কন্দগুপ্ত । ৪৫৫—৪৮০ খৃষ্টাব্দ । (১)

শ্রীকুমার গুপ্তের মৃত্যুর পরই হূণদিগের আক্রমণে গুপ্তরাজগণের বংশ-লক্ষ্মী বিপ্লুত হইলেও শ্রীস্কন্দগুপ্ত স্বকীয় পরাক্রমে শত্রুসৈন্যকে পরাস্ত করত (শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দেবকী দেবীর করিয়াছিলেন সেইরূপ) অশ্রুলোচনা মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়াছিলেন । (২)

ডাক্তার ফ্লীটের প্রকাশিত এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ অশোকস্তম্ভ-লিপিতে মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) দেবের রাজত্ব-কালে তদীয় পিতা মহারাজাধিরাজ সমুদ্র গুপ্তের বিখ্যাত দিগ্বিজয় কাহিনী ক্ষোদিত হইয়াছিল । এই স্তম্ভলিপিতে যে সকল রাজার পরাজয় কাহিনী ক্ষোদিত হইয়াছে তাঁহাদের বিবরণ এইরূপ ;—(স্তম্ভলিপির অত্যাবশ্যক অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি)

(১) "দক্ষিণাপথ :—কোশলরাজ মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কুরাল বা কোরালের মণ্টরাজ, পিষ্টপুরের মহেন্দ্রগিরি (?), কূট্টর বা কোট্টরের স্বামিদত্ত, এরণ্ডপল্লের

---

(১) Dr. Fleet's Gupta Inscriptions, Nos 1, 4, 10 and 13.

ডাক্তার ভাণ্ডারকর বহু অনুসন্ধানের পর খৃষ্টীয় ৩১৯—২০ অব্দে গুপ্তাব্দের প্রারম্ভ স্থির করিয়াছেন এবং তাহাই ম্যাক্সমুলার ও ভিন্সেণ্টস্মিথ প্রমুখ পণ্ডিতেরা গ্রহণ করিয়াছেন । Dr. R. G. Bhandarkar's "Early History of Dekkan", Appendix A.

(২) Fleet's Selected Gupta Inscrptions, No. 13, 12 th to 14 th Lines.

দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তের নীলরাজ, বেঙ্গীর হস্তিবর্মা, পালক্কের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের কুবের, কুস্থলপুরের ধনঞ্জয় প্রভৃতি সমস্ত দক্ষিণাপথের রাজা ;

(২) আর্য্যাবর্ত্ত ;—রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মা, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুতনন্দী, বলবর্মা প্রভৃতি অনেক আর্য্যাবর্ত্তের রাজা ;

(৩) সর্ব আটবিক রাজা (জঙ্গলময় স্থানের রাজগণ) ; এবং

(৪) রাজ্যের প্রত্যন্তদেশে স্থিত ;—সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্ত্তৃপুর, মালব, অর্জুনায়ন, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর প্রার্জুন, সনকানীক, কাক, খরপরিক, দেবপুত্র, ষাহি, ষাহানুষাহি, শক, মুরুণ্ড, সিংহল ইত্যাদি" (৩) ।

এই বর্ণনায় যে সকল দেশের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দক্ষিণাপথের এবং প্রত্যন্ত প্রদেশের কতকগুলি রাজ্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত কোন রাজ্যের নাম পাওয়া যায় না, তাহার পরিবর্ত্তে কেবল কতকগুলি পরাজিত রাজার নাম পাওয়া যায় মাত্র। এই সকল রাজার মধ্যে কে কোন দেশে রাজ্য করিতেন তাহা লিখিত না হওয়ায় তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছে বলিতে হয়। অন্যান্য সন্তোষজনক আনুষঙ্গিক প্রমাণ ব্যতিরেকে কেবল মাত্র কল্পনা অথবা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে অগ্রসর হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র এবং সেরূপ সাহস আমাদের নাই।

(৩) (১৯শ পংক্তি) "কৌসলক-মহেন্দ্র-মহ (?)-কান্তারক ব্যাঘ্ররাজ-কৌরালক মণ্টরাজ পৈষ্টপুরক-মহেন্দ্রগিরি কৌট্টুরক-স্বামিদত্তৈরণ্ডপল্লক-দমন কাঞ্চেয়ক-বিষ্ণুগোপা বমুক্তক—

(২০শ পংক্তি) "-নীলরাজ বৈঙ্গেয়ক-হস্তিবর্ম পালক্কোগ্রসেন দৈবরাষ্ট্রক-কুবের কৌস্থলপুরক ধনঞ্জয় প্রভৃতি সর্ব্বদক্ষিণাপথ রাজ-গ্রহণ-মোক্ষানুগ্রহ-জনিত-প্রতাপোন্মিশ্র মহাভাগ্যস্য—

(২১শ পংক্তি) "রুদ্রদেব-মতিল-নাগদত্ত-চন্দ্রবর্ম্ম-গণপতিনাগ-নাগসেনাচ্যুতনন্দি-বলবর্ম্মাদ্যনেকার্য্যাবর্ত্তরাজ প্রসভোদ্ধরণোদ্বৃত্তপ্রভাবমহতঃ পরিচারকীকৃত-সর্ব্বাটবিকরাজস্য—

সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় কীর্তিকে চিরস্থায়িনী করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এলাহাবাদের প্রাচীন অশোক স্তম্ভের উপর এই কাহিনী ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন, সুতরাং এই ক্ষোদিত লিপিতে উক্ত সম্রাটের দিগ্বিজয়-কীর্তির কথা বেশ বিস্তৃতভাবেই আছে, এই আশা আমরা করিতে পারি। এক্ষণে, কবি কালিদাস তাঁহার "রঘুবংশের" চতুর্থসর্গে রঘুরাজার যে দিগ্বিজয়ের বার্ত্তা লিখিয়াছেন, আমরা তাহাই পরীক্ষা করিয়া উভয়ের তুলনা করিব। কবি এইরূপে সেই কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন ;—

"প্রথমতঃ রঘুরাজ সসৈন্যে পূর্বদিকে গমন করিলেন। পূর্বসাগরগামিনী তাঁহার মহতী সেনা হরজটাভ্রষ্টা গঙ্গার ন্যায় মহাসাগরের তালীবনশ্যামল উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। এই পথ আসিতে আসিতে রঘু প্রাচ্যদেশের কতকগুলি রাজ্য জয় করিয়া অবশেষে সুহ্মদেশ আক্রমণ করিলেন। সুহ্মদেশবাসী ক্ষত্রিয়েরা নদীস্রোতঃপতিতা বেতস-লতার নীতি অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন,—অর্থাৎ নদীর তীব্র স্রোতোবেগে পতিত বেত যেমন স্রোতের গতির সহিত নিজে নরম ভাবে বাঁকিয়া চুরিয়া বাঁচিয়া যায়, (ওরূপ না করিয়া শক্ত হইয়া স্রোতকে বাধা দিতে গেলে ভাঙ্গিয়া যাইত) সুহ্মবাসীরাও ঐরূপ বিজয়ী রাজার নিকট পরাজয়-

---

(২২শ পংক্তি) "সমতট-ডবাক-কামরূপ-নেপাল-কর্তৃপুরাদিপ্রত্যন্তনৃপতিভি-র্মালবার্জ্জুনায়ন-যৌধেয়-মাদ্রকাভীর-প্রার্জ্জুন-সনকানীক-কাক-খরপরিকাদিভিশ্চ সর্ব্বকরদানাজ্ঞাকরণপ্রণামাগমন—

(২৩শ পংক্তি) "পরিতোষিত প্রচণ্ড শাসনস্য অনেক ভ্রষ্টরাজ্যোৎসন্নরাজবংশ প্রতিষ্ঠাপনোদ্ভূত নিখিল ভ [ু ব] নবিচ [র] ণ শান্তযশসঃ দৈবপুত্র-ষাহি-ষাহানুষাহি-শক-মুরুণ্ডৈঃ সৈংহলকাদিভিশ্চ" ইত্যাদি। ডাক্তার ফ্লীটের ১ নং গুপ্তলিপি হইতে উদ্ধৃত। উপরে অনুবাদে আমরা যে সকল রাজা এবং রাজ্যের নাম পাঠ করিয়াছি, উক্ত পাঠের দায়িত্ব প্রধানতঃ আমাদের। উক্ত পাঠ যে নিঃসন্দিগ্ধ অথবা বিশুদ্ধ তাহা আমরা বলিতে পারি না। পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে যদি কেহ কোন বিশুদ্ধতর পাঠ দয়া করিয়া বলিয়া দেন, তাহা হইলে অনুগৃহীত হইব। এই দিগ্বিজয় সম্ভবতঃ ৩২৬—৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল।

স্বীকার ও বিনয়প্রদর্শন করিয়া বাঁচিয়া গেলেন (৪)। তাহার পর, রঘুরাজ নৌবলে বলীয়ান্ বঙ্গীয় বীরগণকে পরাস্ত করত গঙ্গার তরঙ্গাবলীর মধ্যভাগস্থ ভূখণ্ডে জয়স্তম্ভ-সমূহ স্থাপিত করিলেন। পরাস্ত বঙ্গীয়গণ রঘুকর্তৃক নিজরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিজয়ীর পাদপদ্মে প্রণাম করত বহুবিধ ধনের দ্বারা তাঁহার তুষ্টিসাধন করিলেন।

"অতঃপর রঘুরাজ কতিপয় উৎকলরাজের নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করত গজসমূহে সেতু প্রস্তুত করিয়া (হাতী একটির পর আর একটি দাঁড় করাইয়া সাঁকো অথবা বাঁধের মত করিয়া) সসৈন্যে সুবর্ণরেখা (কপিশা) নদী পার হইয়া কলিঙ্গদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহেন্দ্র-পর্বত-সনাথ কলিঙ্গরাজকে পরাস্ত করিবার পর রঘুরাজের সেনাদল "পানের পাতের ঠোঙ্গায়" নারিকেলজ মদ্যপান করিয়া বিজয়োৎসব সমাধা করিল।

"ইহার পর সমুদ্রের বেলা তট ধরিয়া রঘুসৈন্য দক্ষিণমুখে যাইতে যাইতে কাবেরী নদী উত্তীর্ণ হইল এবং পাণ্ড্য দেশে গিয়া পাণ্ড্যরাজকে পরাস্ত করিল।"

"পরে বিজয়ীসেনা মলয় এবং দর্দুর পর্বত অতিক্রম করত অপরান্ত (পশ্চিম) প্রদেশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে কেরল দেশে উপস্থিত হইল এবং তথাকার রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়া রঘুরাজকে কর প্রদান করিলেন।

"অতঃপর মহারাজ রঘু স্থলপথে পারসীকদিগকে জয় করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আক্রমণে পারসীকবাসিনী যবনীরা (ভয়ে ?) মদ্যপান পরিত্যাগ করিল, অশ্বারোহী পাশ্চাত্যগণের সহিত রঘুর তুমুল সংগ্রাম হইল, কত শত পারসীকবীরের শ্মশ্রুলশিরঃ ভল্লের আঘাতে ধূলাবলুণ্ঠিত হইল। অবশেষে শত্রুরা মাথার পাগড়ী খুলিয়া রঘুর শরণাপন্ন হইয়া

(৪) সুহ্মদেশ—বর্দ্ধমান রাঢ় দেশ। মহাকবি দণ্ডী স্বকীয় দশকুমারচরিতে, এবং গুণাঢ্যের বৃহৎকথাতে (অথবা উহার অনুবাদে) ও অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের পুঁথিতে সুহ্মদেশ এবং তাহার রাজধানী দামলিপ্তি বা তাম্রলিপ্তির (আধুনিক তমলুক) উল্লেখ আছে। সবলের নিকট দুর্বলের রক্ষা পাওয়ার উপায় এই বৈতসী নীতি। মহামতি কৌটিল্য (চাণক্য) বলিয়াছেন, "বলীয়সাভিযুক্তো দুর্বলঃ সর্বত্রানুপ্রণতো বেতসধর্মমাতিষ্ঠেৎ"—ইতি।

রক্ষা পাইল। রণশ্রান্ত রঘুসৈন্য দ্রাক্ষালতার উদ্যানে, মূল্যবান্ গালিচা পাতিয়া (আসন জমকাইয়া) দ্রাক্ষারস-নির্মিত মদ্যপান করিয়া শ্রান্তিদূর করিলেন।

"ইহার পর তিনি উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন।

"উত্তরদিকে, সিন্ধুনদের তীরজাত কুঙ্কুমকেশরের রেণুগুলি রঘুরাজার অশ্বসমূহের কেশরে লাগিতে থাকায় উহারা ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। রঘুরাজ ক্রমশঃ হূণ ও কম্বোজগণকে পরাস্ত করত তাহাদের নিকট হইতে বহু উৎকৃষ্ট অশ্ব উপহার স্বরূপ গ্রহণ করিলেন এবং অবশেষে হিমালয় পর্বতে আরোহণ পূর্বক তত্রত্য "উৎসব সঙ্কেত" প্রভৃতি পর্বতীয় জাতিবৃন্দকে পরাস্ত করিলেন।

"অবশেষে লৌহিত্যনদ পার হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি এবং পরে কামরূপরাজকে জয় করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।"

রঘুবংশের চতুর্থসর্গের ২৮শ হইতে ৮৫ তম শ্লোক পর্যন্ত ৫৮টী শ্লোকে কবি কালিদাস এই দিগ্বিজয় বর্ণন সমাপ্ত করিয়াছেন। অতি সংক্ষেপে আমরা এই শ্লোকগুলির মর্ম্মার্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। মর্ম্মার্থগ্রহণে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকিলেও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই দিগ্বিজয়ে নিম্নলিখিত দেশ অথবা রাজাগুলি উল্লিখিত হইয়াছে;—

পূর্বদিক্—সুহ্ম, বঙ্গ ও উৎকল।
দক্ষিণদিক্—কলিঙ্গ, পাণ্ড্য ও কেরল (অপরান্ত)।
পশ্চিমদিক্—পারসীক।
উত্তরদিক্—হূণ, কম্বোজ।
হিমালয় প্রদেশ,—উৎসব-সঙ্কেত, প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ এবং কামরূপ রাজাকে ঠিক যে হিমালয় প্রদেশের ভিতর বলা হইয়াছে, তাহা নহে; তবে উহাদিগকে পূর্বদিকেও ফেলা হয় নাই। যাহা হউক, পাঠকমহাশয় ও পাঠিকা ঠাকুরাণী এখন এই বর্ণনা সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভলিপির সহিত যদি মিলাইয়া পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে একমাত্র "কামরূপ" ভিন্ন আর একটি দেশের নাম ও দুইটি বর্ণনায় সাধারণ ভাবে উল্লিখিত হয় নাই। কালিদাস পশ্চিমবঙ্গকে "সুহ্ম" এবং পূর্ববঙ্গকে "বঙ্গ" আখ্যায় পরিচিত করিয়াছেন; কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের লিপিতে প্রত্যন্ত প্রদেশস্থিত বলিয়া "সমতট-ডবাক" নামক

এক অথবা দুই প্রদেশের নাম লিখিত হইয়াছে ; উহাকে ঢাকা ও পূর্ববঙ্গ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন মাত্র,—নিশ্চয় কিছুই বলিবার উপায় নাই। কবি কালিদাস যদি তাঁহার সম-সাময়িক ও সুপরিচিত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় ব্যাপারকে আদর্শ করিয়া এই দিগ্বিজয় কাহিনী রচনা করিতেন, তাহা হইলে উভয় বর্ণনার মধ্যে এরূপ ভেদ থাকিত কি ? আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ইহা আদৌ প্রস্তাব-যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। সংস্কৃত প্রাচীন সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ অন্ধ্ররাজ সাতবাহনের সভাসদ সর্ববর্ম্মার বন্ধু মহাকবি গুণাঢ্যের রচিত "বৃহৎ কথা" নামক লক্ষ শ্লোকাত্মক এক বড় গল্পের পুথির সংবাদ অনেকেই জানেন, সন্দেহ নাই। ঐ পুথিখানি পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং কাল ক্রমে উহার অনেক অংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহার সংস্কৃত অনুবাদ "কথা-সরিৎসাগর" নামে আজিও প্রচলিত আছে, কিন্তু উহার মৌলিকাংশের আর দর্শন পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় দশম অথবা একাদশ শতকে কাশ্মিরী পণ্ডিত মহাকবি সোমদেব ভট্ট উক্ত অনুবাদাত্মক "কথা-সরিৎসাগর" লিখিয়াছিলেন। তিনি উহার ভূমিকায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে তিনি অনুবাদগ্রন্থে অমৌলিক একটি কথা লেখেন নাই, অর্থাৎ তিনি পৈশাচী ভাষায় রচিত "বৃহৎকথা"র উপাখ্যান বা গল্পগুলিকে কেবল সংস্কৃত ভাষার পরিচ্ছদে সাজাইয়াছেন মাত্র, নিজের কল্পনাপ্রসূত কোন ও বিষয়ই ঐ সাগরে নিঃক্ষেপ করেন নাই।

এই "কথা-সরিৎসাগর" গ্রন্থের "লাবাণক-লম্বক" অংশের পঞ্চম তরঙ্গে মহাভারতীয় পারীক্ষিত জনমেজয়ের পৌত্র বিখ্যাত উদয়ন রাজার দিগ্বিজয় ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের রসাবিদ্ বিদগ্ধগণের সকলেই জানেন যে প্রাচীন গল্পের কল্পতরু সদৃশ এই "বৃহৎ কথা"কে আশ্রয় করিয়াই, সুবন্ধুর "বাসবদত্তা", বাণভট্টের "কাদম্বরী", শ্রীহর্ষের "রত্নাবলী" এবং "নাগানন্দ", বিশাখদত্তের "মুদ্রারাক্ষস" এবং আরও অনেক রসভাবপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। 'বৃহৎকথার' এই বৎসরাজ উদয়নের কথাই কালিদাস অবন্তীর গ্রামবৃদ্ধগণের নিকট

শুনিয়া "মেঘদূত" কাব্যে তাহার আভাস দিয়াছেন।* "কথাসরিৎসাগরের" এই উদয়ন রাজার দিগ্বিজয় বর্ণনার সহিত "রঘুবংশ" কাব্যের রঘুরাজার দিগ্বিজয়বর্ণনার অতি আশ্চর্য্য-রকম সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৎসরাজের দিগ্বিজয়েও সেই প্রাচ্য সমুদ্রের উপকূলে বঙ্গদেশ-বিজয়, উৎকলস্থান, মহেন্দ্রপর্বতাধিপতি কলিঙ্গরাজ, সেই কাবেরী নদী উত্তরণ, চোলদেশ (পাণ্ড্যদেশ) বিজয়, পারস্যপতির শিরশ্ছেদ, হূণ জাতির পরাজয়ের পরে হিমালয়ারোহণ এবং অবশেষে কামরূপ রাজের পরাজয়বার্ত্তা বিবৃত হইয়াছে; অধিকন্তু লাট, (গুর্জ্জর?) সিন্ধু এবং তুরুষ্কদেশীয় অশ্বারোহ-সেনাধ্যুষিত ম্লেচ্ছদেশবিজয়ের কথাও ইহাতে পাওয়া যায়। দেশগুলির নাম প্রায় ব্যতীত এই উভয় কাব্যে বর্ণিত বিষয়ের পৌর্বাপর্য্য, শ্লোক রচনা, ভাব ও অলঙ্কারপ্রয়োগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারেও বেশ মিল আছে। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণের সুবিধার জন্য পর পর কয়েকটি করিয়া শ্লোক তুলিয়া দেখাইতেছি :—

রঘুবংশ, ৪র্থ সর্গ।

পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তাঞ্জনপদাঞ্জয়ী।
প্রাপ তালীবন-শ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ ॥ ৩৪ ॥
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ ॥ ৩৬ ॥
স প্রতাপং মহেন্দ্রস্য মূর্দ্ধ্নি তীক্ষ্ণং ন্যবেশয়ৎ।
অঙ্কুশং দ্বিরদস্যেব যন্তা গম্ভীরবেদিনঃ ॥ ৩৯ ॥

---

* "পশিয়া অবন্তী,—যথা বৃদ্ধগণ, উদয়ন-কথা অভিজ্ঞ সকলে,—
পরে উজ্জয়িনী করিও গমন,—শোভার সম্পদে অতুল ভুতলে।" পূর্ব্বমেঘ, ৩০শ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ, লেখক কৃত অনুবাদ। মেঘদূতের পূর্ব্বমেঘের ৩১শ শ্লোকের পর উজ্জয়িনী-নগরীর বর্ণনাত্মক তিনটি শ্লোকের মধ্যে একটিতে কথাসরিৎসাগরে প্রসিদ্ধ এবং "বাসবদত্তা" কথাগ্রন্থের নায়ক বৎসরাজ উদয়নের দ্বারা উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তা-হরণ-ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। টীকাকারেরা এই তিনটি শ্লোককেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন।

প্রতিজগ্রাহ কালিঙ্গস্তমস্ত্রৈর্গজসাধনঃ।
পক্ষচ্ছেদোদ্যতং শক্রং শিলাবর্ষীব পর্বতঃ॥ ৪০॥
দ্বিষাং বিষহ্য কাকুৎস্থস্তত্র নারাচদুর্দিনম্।
সন্মঙ্গলস্নাত ইব প্রতিপেদে জয়শ্রিয়ম্॥ ৪১॥
স সৈন্যপরিভোগেন গজদানসুগন্ধিনা।
কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ॥ ৪৫॥
স্থলানাবাকস্তোক্‌তস্থামৎকৈতকং বলঃ।
উদ্বোধবারবাধানামধরপটবাসতাম্॥ ৫৫॥
দিশি মন্দায়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি।
তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে॥ ৬১॥
পারসীকাংস্ততো জেতুংপ্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী॥ ৬০॥
ভল্লাপবর্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীম্।
তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ সক্ষৌদ্রপটলৈরিব॥ ৬৩॥
তত্র হূণাবরোধানাং ভর্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্।
কপোলপাটলাদেশি বভূব রঘুচেষ্টিতম্॥ ৬৮॥
চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ।
তদ্গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালাগুরুদ্রুমৈঃ॥ ৮১॥
তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখণ্ডলবিক্রমম্।
ভেজে ভিন্নকটৈর্নাগৈরন্যানুপরুরোধ যৈঃ॥ ৮৩॥
কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাধিদেবতাম্।
রত্নপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানর্চ পাদয়োঃ॥ ৮৪॥

কথাসরিৎসাগর, লাবাণক লম্বক, ৫ম তরঙ্গ।

প্রাপ স প্রবলং প্রাচাং চলদ্বীচিবিঘূর্ণিতম্।
বলাবলম্বিত্রাসবেপমানমিবাম্বুধিম্॥ ৯০॥

তস্যাবেলাতটান্তে চ জয়স্তম্ভং চকার সঃ।
পাতালাভ্যন্তরস্থার্থং নাগরাজস্বয়োদ্গতম্ ॥ ৯১ ॥
অবনম্য করে দত্তে কলিঙ্গেনাগ্রগেনততঃ।
আকরোচ্চ মহেন্দ্রাদ্রিং যশস্তস্য যশস্বিনঃ ॥ ৯২ ॥
মহেন্দ্রাভিভবাদ্‌ভীতৈর্বিন্ধ্যকুটৈরিবাগতৈঃ।
গজৈর্বিন্ধ্যাটবীং রাজ্ঞাং স যযৌ দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ৯৩ ॥
তত্র চক্রে স নিঃসারপাণ্ডুরানপগর্বিতান্।
পর্বতাশ্রয়িণঃ শত্রূঞ্ শরৎকালে ইবাম্বুদান্ ॥ ৯৪ ॥
উল্লংঘ্যমানা কাবেরী তেন সংমর্দকারিণা।
চোলকেশ্বরকীর্তিশ্চ কালুষ্যং যযতুঃসমম্ ॥ ৯৫ ॥
ন পরং মুরলানাং স সেহে মূর্ধসু নোন্নতিম্।
কবৈরাচনামানেষু যাবৎকান্তাকুচেষ্বপি ॥ ৯৬ ॥
তস্য খড়্গলতা নূনং প্রতাপানলধূমিকা।
যচ্চক্রে লাটনারীণামুদশ্রু কলুষা দৃশঃ ॥ ১০৪ ॥
সিন্ধুরাজং বশীকৃত্য হরিসৈন্যোরমুক্রহঃ।
ক্ষপয়ামাস চ ম্লেচ্ছান্ বাষ্পবারাক্ষসানিব ॥ ১০৮ ॥
তুরস্কতুরগব্রাতাঃ স্কন্ধস্যাব্দৈরবোমিয়ঃ।
উদ্গবেন্দ্রঘটাবেলাবনেন দলশো যযুঃ ॥ ১০৯ ॥
গৃহীতারিকরঃ শ্রীমান্ পাপস্যাপুরুষোত্তমঃ।
রাহোরিব স চিচ্ছেদ পারসীকপতেঃশিরঃ ॥ ১১০ ॥
হূণহানিকৃতস্তস্য মুখরীকৃতদিঙ্মুখা।
কীর্তিদ্বিতীয়া গঙ্গেব বিচচার হিমাচলে ॥ ১১১ ॥
অপচ্ছত্রেণ শিরসা কামরূপেশ্বরোঽপি তম্।
নমন্ বিচ্ছায়তাং ভেজে যত্তদা ন তদদ্ভুতম্ ॥ ১১৩ ॥

তত্রস্থৈর্বাধিতো নাগৈঃ সম্রাড়্ বিববৃতেঽথ সঃ।
অদ্রিভির্জলদৈঃ শৈলৈঃ করীন্দ্রৈর্ব্যাপিতৈরিব ॥ ১১৪ ॥

[কালিদাসের ৪১ উনপঞ্চাশত্তম শ্লোকের "পাণ্ড্য" রাজ এবং গুণাঢ্যের ৯৫ পঞ্চনবতিতম শ্লোকের "চোলকেশর" (চোল বা চোড়রাজ) একই দেশের রাজাকে বুঝাইতেছে; কেবল রাজার কুল বা গোত্র নাম পৃথক্ মাত্র।]

উপরে যতদূর উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাবর্গের বুঝিতে কোনই কষ্ট হইবে না যে দুটির মধ্যে একটি বর্ণনা অপরের অনুসরণ করিয়াছে। একেত্রে কে যে অগ্রগামী আর কে যে অনুসরণকারী তাহা নিশ্চিতরূপে বলিবার শক্তি আমাদের নাই তবে যদি আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ অথবা ঐতিহ্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সর্ববর্মা, সাতবাহন, বররুচি (কাত্যায়ন) এবং মহারাজা নন্দের সম-সাময়িক মহাকবি গুণাঢ্যকে কালিদাসের অনেক পূর্বগামী বলিতে হয়। "কলাপ" অথবা "কাতন্ত্র" ব্যাকরণের প্রণেতা সর্ববর্মাচার্য যে গুণাঢ্যের সমসাময়িক, তাহা কেবল "বৃহৎকথা" গ্রন্থে নহে, সংস্কৃত ভাষার আরও অনেক প্রাচীন পুস্তকে পাওয়া যায়। কালিদাস খৃষ্ট পূর্ব প্রথম শতকে বিদ্যমান্ থাকিলেও গুণাঢ্য তাঁহার অপেক্ষা অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসরের পূর্বগামী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আমাদের মনে হয় যে মহাভারতের সভাপর্বোক্ত ভীমার্জ্জুন এবং নকুল সহদেব চারিভ্রাতার দিগ্‌বিজয়ের উপাখ্যানকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া, অথবা অন্য কোন পৌরাণিকপ্রবাদকে আশ্রয় করিয়া মহাকবি গুণাঢ্য তাঁহার বৃহৎকথায় বৎসরাজ উদয়নের দিগ্‌বিজয়ের কাহিনীর রচনা করিয়া ছিলেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কবি কালিদাস (কালিদাসের পরবর্ত্তী সুবন্ধু, বাণভট্ট ও বিশাখদত্ত প্রভৃতির মত) উক্ত দিগ্‌বিজয়ের কাহিনীকেই আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার কাব্যের অঙ্গপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সাধু অশ্বঘোষ প্রণীত "বুদ্ধচরিত" কাব্যের কোন কোন স্থলের সহিত ও কবি কালিদাসের "রঘুবংশ" এবং "কুমার-সম্ভব" কাব্যের কোন কোন স্থলের (৫) আশ্চর্যারূপ মিল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুরুষের

(৫) বুদ্ধচরিত, ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ১৩শ সর্গ (Prof. Cowel's Edition) রঘুবংশের ৭ম, ৯ম, ১৩শ এবং কুমারসম্ভব কাব্যের ৭ম সর্গ ইত্যাদি।

মত অশ্বঘোষের সময়ও নির্বিবাদে স্থিরীকৃত না হওয়ায় তিনি কালিদাসের অপেক্ষা প্রাচীন অথবা নবীন ছিলেন, তাহাও বলিতে পারা যায় না।

এ সম্বন্ধে একটা সন্দেহ স্বতঃই আসিতে পারে যে "কথাসরিৎসাগর" যখন খৃষ্টীয় দশম অথবা একাদশ শতাব্দীর রচনা, তখন সে পুস্তকে বর্ণিত উদয়নরাজার দিগ্বিজয় কাহিনী কালিদাস কৃত রঘুরাজার দিগ্বিজয় বর্ণনা হইতে অনুকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। এরূপ সম্ভাবনা যে না থাকিতে পারে, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে, কাশ্মীরের মহাকবি সোমদেব ভট্টকে আমরা কিছুতেই অবিশ্বাস করিতে পারি না; তিনি নিজে যখন বলিয়াছেন যে তিনি কেবল "বৃহৎকথা"র অনুবাদকমাত্র, মূলগ্রন্থে যাহা নাই তাহা তিনি লিখেন নাই,—তখন তাঁহাকে কালিদাসের রচনার অনুকারী বলিয়া ধারণা করা কিছুতেই উচিত নহে এবং আমরা সেরূপ ধারণা করিতে পারি নাই। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ এই উভয় দিগ্বিজয়ের বর্ণনা ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া করিয়া কোনও রূপ মত এপর্যন্ত প্রচার করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। যদি ভবিষ্যতে কেহ তদ্রূপ আলোচনা করিয়া কোন যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা অনেক নূতন আলোক পাইব এবং তদনুযায়ী আমাদের বর্তমান মতের পরিবর্তন করিতে পারিব।

মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভলিপিতে "দেবপুত্র, শাহি, শাহানুশাহি, শক এবং মুরুণ্ড" প্রভৃতি রাজন্যবর্গের নামগুলি যেরূপ প্রাচীন ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য-প্রদেশের ঐতিহাসিক সময়ের কতকগুলি রাজকুলের প্রকৃত নাম (৮), কালিদাসকৃত রঘুরাজ-দিগ্বিজয়-বর্ণনার "হূণ,

(৮) বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি মহাপুরাণ গ্রন্থাবলীতে ভারতবর্ষের পশ্চিম এবং উত্তর প্রদেশে শক, যবন, পারদ, কাম্বোজ (বা কম্বোজ) বাহ্লীক, হূণ, পহ্লব, তুষার (তুঃখার বা তুখার) মুরুণ্ড (বা আরমুণ্ড, রুণ্ঠ) মদ্র, কেকয় ও পারসীক প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজন্য জাতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বহু পৌরাণিক প্রমাণ আমাদের "ভারতের আর্য ও অনার্য" (ঢাকার "প্রতিভা" পত্রিকায়) প্রস্তাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। পারস্যে, গান্ধারে ও কাশ্মীরে "দেবপুত্র" "শাহি" ও শাহানুশাহী" (শাহ্ ও শাহান্‌শাহ্—রাজা এবং রাজার রাজা) প্রভৃতি উপাধিযুক্ত অনেক প্রাচীন রাজবংশের সংবাদ ইংরাজী ভাষায় লিখিত ইতিহাস

কাম্বোজ এবং পারসীক"ও যেরূপ উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজকুলের নাম, গুণাঢ্য প্রণীত "বৃহৎকথা"র উদয়নরাজের দিগ্বিজয় বর্ণনায় "তুরুষ্ক, হূণ এবং পারসীকও" তদ্রূপ জাতীয় নাম সন্দেহ নাই। এই সকল নামই প্রাচীনতম পুরাণ গ্রন্থাবলীতে (যথা বায়ু-পুরাণ) এবং মৎস্য পুরাণ) ভারতবর্ষ বর্ণনপ্রসঙ্গে অনেকবার লিখিত হইয়াছে; সুতরাং এই সকল নাম দেখিয়া কোন বর্ণনাকে অধিকতর আধুনিক বলিবার উপায় নাই। অতি প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষের বিস্তৃতি যে কত অধিক ছিল, তাহার পরিচয় আমরা কয়েক বৎসর হইতে প্রদান করিয়া আসিতেছি (৭), এখানে সে সকল কথার পুনরুল্লেখের কোনও প্রয়োজন নাই। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের হস্তলিপি, রঘুবংশের চতুর্থ সর্গ এবং (বৃহৎকথার সংস্কৃতানুবাদ) কথা-সরিৎ সাগরের লাবাণক লম্বকের পঞ্চম-তরঙ্গে বর্ণিত দিগ্বিজয়ের যে বার্তা আমরা পাইয়াছি, তাহা আলোচনা করিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে কালিদাসের রঘুবংশ-কাব্য-বর্ণিত মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয় কাহিনী মহারাজাধিরাজ সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় বটিত ঐতিহাসিক বৃত্তান্তকে অবলম্বন করিয়া অথবা আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া রচিত হয় নাই পরন্তু কথাসরিৎ সাগরের উদয়ন রাজার দিগ্বিজয় বর্ণনার সহিত উহার বিশেষ ঐক্য আছে; এবং এই উভয় রচনাই সম্ভবতঃ কোন এক প্রাচীন পৌরাণিক প্রবাদকে ভিত্তি করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ, রঘুবংশের চতুর্থ সর্গের দিগ্বিজয় বর্ণনার মূলে কোন ঐতিহাসিক (Historical) বৃত্তান্ত আছে বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন হেতু দেখা যায় না,—পরন্তু অলঙ্কার-শাস্ত্র-বিহিত মহাকাব্য রচনার রীতি অথবা পদ্ধতির অনুসরণের ফলেই (৮) কবি কালিদাস তাঁহার কাব্যে এই দিগ্বিজয়ের বর্ণনা করত কাব্যের সৌষ্ঠব-সম্পাদন করিয়া ছিলেন বলিয়াই বোধহয়। তাঁহার

সমূহে এবং রাজতরঙ্গিণীতেও পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে উহাদের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(৭) "ভারতবর্ষ", প্রথমবর্ষ, আশ্বিন সংখ্যা, "ভারতবর্ষ" শীর্ষক প্রস্তাব। ঢাকার সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র "প্রতিভা" পত্রিকা ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা হইতে ক্রমশঃ প্রকাশিত "ভারতের আর্য ও অনার্য" প্রস্তাব ইত্যাদি।

(৮) মহাকাব্যের লক্ষণ, সাহিত্য-দর্পণে, "রঘুপ্রয়াণ" ইত্যাদি।

গ্রন্থরচনার প্রায় দুই সহস্র বৎসর পরে কতিপয় গবেষণাশীল পণ্ডিত যে তাঁহার কাব্য-চাতুর্যকে ঐতিহাসিক আকৃতি প্রদান করিবেন, এই কথা তিনি কখনও ভাবিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। হয়ত তিনি কাব্যের এই অংশ রচনা করিবার জন্য গুণাঢ্য প্রণীত "বৃহৎকথার" নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা, তিনি ও গুণাঢ্য উভয়েই অন্য কোন প্রাচীনতর পৌরাণিক প্রবাদকে আশ্রয় করত স্ব স্ব কাব্য রচনার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত সত্য নির্ণয় করা আমাদের মত অল্পজ্ঞজনের শক্তির বহির্ভূত, সুতরাং সে বিষয়ে আর অধিক বাক্যব্যয় করাই বৃথা।

কবি কালিদাসকে গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্বদ্ধ করিবার পক্ষে যাঁহারা এই দিগ্বিজয়ের প্রমাণ উপস্থিত করেন, আমরা দেখিলাম যে তাঁহাদের সে প্রমাণ সংশয়-শূন্য ত নহেই পরন্তু অতিমাত্র দুর্বল। এরূপ ক্ষীণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত স্থির করা আদৌ নিরাপদ নহে। আগামী বারে কালিদাসের কাব্যে এ সম্বন্ধে কিরূপ আভ্যন্তরিক প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনা রহিল। ইতোমধ্যে যদি কোন সজ্জন প্রস্তুত-বিষয় সম্বন্ধে আরও কোন নূতন তত্ত্বের সংবাদ প্রদান করেন, তাহা আমরা সাদরে এবং কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

নির্ভর।

—:*:-

ব্যথিত হৃদয় মাগিছে আশিস্
　　হে মোর পরাণ প্রিয়,
জীবন আমার পুণ্য পরশে
　　করে দাও রমণীয়।

আঁধারের মাঝে আছ তুমি প্রভু,
দুঃখ বিপদে ডরিব না কভু,
ভক্তি ফুলে অর্ঘ্য রচিয়া
নির্জ্জন গৃহে মম,—
পূজিতে তোমায় নিশিদিন আমি
জাগি রব প্রিয়তম।

কুমারী কুন্দরাণী সিংহ।

রামায়ণের ধর্ম্ম।

—:o:—

অযোধ্যাকাণ্ড।

(৩)

এইবার অযোধ্যাকাণ্ডের অবশিষ্টাংশ আলোচনা করিব। রামায়ণের যুগে স্ত্রীলোকের অবস্থা কেমন ছিল সর্ব্বপ্রথমে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

রামায়ণের সময় আদর্শ-স্ত্রী যে সেবায় কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্য কথায় সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার ন্যায়, শুভানুধ্যানে ভগিনীর ন্যায় এবং স্নেহ প্রদর্শনে জননীর ন্যায়, তাহা আমরা কামুক দশরথের মুখে শুনিতে পাই। শুভাকাঙ্খিনী প্রিয়বাদিনী স্ত্রী যে সম্মানের যোগ্য তাহা আমরা তাঁহার নিকট হইতেই পাই (অ ১২স)। এখনও যেমন স্ত্রীর পাদ-স্পর্শ এবং স্ত্রৈণ হওয়া নিন্দনীয় রামায়ণের সময়েও ঠিক সেইরূপ ছিল (অ ১৩স)। স্বামীর ভালবাসাই যে স্ত্রীলোকের পক্ষে সুখ সৌভাগ্যের মূল তাহা আমরা কৌশল্যার মুখে শুনি (অ ২০স)। এখনও যেমন একান্ত বশ্যা পুত্রবধূ শ্বাশুড়ীর হৃদয়হারিণী

আদর্শ-স্ত্রী

স্ত্রৈণ

ও স্পৃহনীয়া রামায়ণের সময়েও তদ্রূপ ছিল এবং এখনকার মত ভর্ত্তা স্ত্রীলোকের গতি ও ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত (অ ২১স)। স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করা এবং কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করা স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া রামায়ণের সময়ে বিবেচিত হইত (অ ২৪স)। "স্ত্রীলোক যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন ভর্ত্তাই তাহার দেবতা ও প্রভু। যে নারী ব্রতোপবাসশীল হইয়া ভর্তৃসেবা না করে, তাহার অধোগতি লাভ হয়; ভর্তৃসেবা করিলে স্বর্গ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেবতাকে পূজা ও নমস্কার করিতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার ভর্তৃসেবা করাই শ্রেয়। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এইরূপ ধর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট আছে।"—এই সকল কথা উন্নতিশীল নরনারীর অপ্রীতিকর হইলেও ইহা আমরা রামচন্দ্রের মুখ হইতেই পাই (অ ২৪স)।

স্ত্রী-ধর্ম

স্বামী বিদেশে থাকিলে স্ত্রীলোকের পক্ষে ব্রতউপবাস দেবপূজা ও গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা করা রামায়ণের সময়ে বিধেয় ছিল (অ ২৬স)। আদর্শসতী সীতার মুখ হইতে স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই শুনিতে পাই। তাঁহার মতে একমাত্র ভার্য্যাই স্বামীর ভাগ্য বা কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহলোক বা পরলোকে পতিই একমাত্র গতি এবং সম্পদে বিপদে পতির সহগামিনী হওয়া বিধেয়। স্বামীর সহবাসই স্ত্রীলোকের একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং স্বামী ব্যতীত স্বর্গের সুখও তাহার স্পৃহনীয় নহে (অ ২৭স)। স্বামী বিরহ স্ত্রীলোকের পক্ষে অসহনীয় এবং স্বামীর সহিত গমন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। স্বামী স্ত্রীলোকের পক্ষে দেবতা। ইহলোকে এবং লোকান্তরে স্বামীর অনুগমন করা স্ত্রীলোকের পক্ষে সুখজনক। সুশীলা ও পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর সুখে সুখী ও স্বামীর দুঃখে দুঃখী হয় এবং স্বামীর একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়া জীবন কাটায় (অ ২৯স)। একমাত্র স্বামীর বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকা এবং স্বামীর সহবাসই স্বর্গ এবং বিচ্ছেদই নরক বলিয়া অনুভব করা সাধ্বী স্ত্রীর কর্ত্তব্য। আদর্শ স্বামীর পক্ষেও সেই প্রকার স্ত্রীকে দুঃখ দিয়া স্বর্গ কামনাও বিধেয় নহে (অ ৩০স।

পতিই একমাত্র গতি

স্বামী বিচ্ছেদ নরক তুল্য

আদর্শ স্বামী

পতিঘাতিনী ও কুলনাশিনী হওয়া এবং স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে দর্শন করা অর্থাৎ মনে মনে অভিলাষ করা অত্যন্ত পাপ কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। পুরুষের পক্ষে স্ত্রৈণ হইয়া বাঁচিয়া থাকা অত্যন্ত ঘৃণার্হ ছিল (অ ৩০ ও ৩৫স)। ভর্ত্তার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করা সুশীলা স্ত্রী কোটি পুত্র অপেক্ষাও অধিক বলিয়া বিবেচনা করিত (অ ৩৫স)।

স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম

"যেমন তন্ত্রীশূন্য বীণা এবং চক্রশূন্য রথ নিরর্থক হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোক শত পুত্রের মাতা হইয়াও যদি ভর্ত্তৃহীন হয়, কদাচ সুখী হইতে পারে না। পিতামাতা ও পুত্র পরিমিত বস্তুই দান করিয়া থাকে। কিন্তু জগতি স্বামী ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহ নাই। সুতরাং তাহাকে কেনা আদর করিবে? কে তাহার অবমাননা করিবে? পতিই পত্নীর পরম দেবতা"—এই সকল কথা আমরা সীতার মুখ হইতে পাই। (অ ৪ স)।

এখনও যেমন অপদার্থ পাপাসক্ত স্বামী, "পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা" এই মন্ত্র উল্লেখ করিয়া পত্নীর সেবা শুশ্রূষা ও সম্মান লাভে সচেষ্ট রামায়ণের সময়েও তাহার অন্যথা ছিল না। কৌশল্যার তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "যে সকল স্ত্রীলোকের ধর্ম্মজ্ঞান আছে স্বামী গুণবান বা নির্গুণই হউন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। তুমি অতি ধর্ম্মশীলা, সৎ ও অসৎই বা কি, তাহাও জান, অতএব বিশেষ দুঃখিত হইলেও এই শোকের উপর আমার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা উচিত হয় না।" (অ ৬২স)। তবে বর্ত্তমান ও প্রাচীন যে প্রভেদ নাই তাহা নহে। দশরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিয়াছিলেন কিন্তু আধুনিক যুগের পাপাচারী স্বামী স্ত্রীর নিকট কৃতাঞ্জলি হইবে কিনা সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।

পাপাসক্ত স্বামীও পতি পরম দেবতা

স্বামীর শয্যা যেমনই হউক না কেন তাহা সতীস্ত্রীর নিকট এখনও সুখকর রামায়ণের সময়েও সুখকর ছিল (অ ৮৮স)। স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা অত্রিপত্নী, ধর্ম্মপরায়ণা শান্তশীলা, পুণ্যশীলা, বৃদ্ধা অনসূয়ার মুখ হইতেও শুনিতে পাই। তিনি সীতাকে কহিয়াছিলেন, "তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি আছে তুমি আত্মীয় স্বজন ও অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া ভাগ্যক্রমেই বনচারী রামের

অত্রীপত্নী ও স্ত্রীধর্ম্ম

অনুসরণ করিয়াছ। স্বামী অনুকূল বা প্রতিকূলই হউন, নগরে বা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয় বোধ করেন, তাঁহার সদ্গতি লাভ হয়। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী বা দরিদ্রই হউন পুনঃস্বভাব স্ত্রীলোকের তিনিই পরম দেবতা। সেই সঞ্চিত তপস্যার ন্যায় সর্ব্বাংশে স্পৃহনীয় স্বামী হইতে বিশেষ বন্ধু আমি ভাবিয়াও আর দেখিতে পাই না। যাহারা কেবল ভোগ সাধন করিতে তাঁহাকে অভিলাষ করে সেই সকল স্বৈরিণী এই সকল গুণ দোষ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। জানকি! তাদৃশী দুশ্চরিত্রা সকল অধর্ম্মে পতিত ও অযশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমার তুল্য যাহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত গুণবতী, পুণ্যশীলার ন্যায় স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে পতিরই অনুব্রতা হইয়া থাক (অ ১ ১৭ স)।"

আদর্শ সতী সীতাকে অনসূয়া এই উপদেশ না দিলেও পারিতেন। কৌশল্যা একবার সীতাকে অসতীদের কলঙ্কের কথা কহিয়া সতী ধর্ম্মের উপদেশ দিতে গিয়া ঠকিয়াছিলেন। এই অনসূয়াও ঠকিলেন। সতীধর্ম্মের কথা সীতা বিলক্ষণ জানিতেন, কিন্তু তথাপি অনসূয়ার কথায় ক্ষুব্ধ না হইয়া কহিলেন—"স্বামী যে স্ত্রীলোকের গুরু আমি তাহা বিশেষ জানিয়াছি। তিনি যদিও দুশ্চরিত্র ও দরিদ্র হন তথাচ কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাঁহার পরিচারণায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয়, গুণবান, দয়ালু, স্থির অনুরাগী ও ধার্ম্মিক এবং যিনি মাতৃসেবাপর ও পিতৃবৎসল, তাঁহার বিষয়ে আর বলিবার কি আছে। রাম যেমন কৌশল্যাকে, সেইরূপ অন্যান্য রাজ পত্নীকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রাজা দশরথ যে নারীকে একবার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, রাম অভিমান শূন্য হইয়া তাঁহার সহিত মাতৃবৎ ব্যবহার করেন। তাপসি! আমি যখন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, তখন আর্য্যা কৌশল্যা আমায় যাহা উপদেশ দেন, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই এবং বিবাহের সময় জননী অগ্নি সমক্ষে যে প্রকার আদেশ করেন তাহাও ভুলি নাই। ফলতঃ পতি সেবাই স্ত্রীলোকের তপস্যা আত্মীয় স্বজন একথা আমার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ করাইয়া দিয়াছেন। সাবিত্রী ইহার বলে স্বর্গে পূজিত হইতেছেন। আপনি উঁহারই ন্যায় উৎকৃষ্ট লোক আয়ত্ত করিয়াছেন এবং রমণীর অগ্রগণ্য রোহিণীও শশাঙ্ক ব্যতীত আকাশে উদিত হন না। দেবী বলিতে কি, এইরূপ বহুসংখ্য পতিব্রতা পুণ্যফলে সুরলোক অধিকার করিয়াছেন।" (অ ১১৮ স)

সীতা ও স্ত্রীধর্ম

এখন অসতীগণ যে রামায়ণের সময়ে কি রকম নিন্দনীয় ছিল তাহাই দেখাইব।

অসতীগণের প্রকৃতি

অযোধ্যা কাণ্ডের ৩৯ সর্গে দেখিতে পাই কৌশল্যা সীতাকে কহিতেছেন, "যে প্রিয়জনদিগের আদর ভাজন হইয়াও বিপদে স্বামী সেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ অসতীদিগের স্বভাব এই যে উহারা স্বামীর সম্পদের সময় সুখভোগ করে, কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নানা দোষে দূষিত, অধিক কি পরিত্যাগও করিয়া থাকে। উহারা মিথ্যা কহে, দুর্গমস্থানে গমন ও নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করে এবং পতির প্রতি একান্ত বিরস বলিয়া অল্প কারণে বিরক্ত হইয়া উঠে। যে সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত, উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসন ভূষণে বশীভূত হয় না, কৃতঘ্ন হয়, ধর্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে এবং দোষ প্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনার কুলমর্য্যাদা পালন করে, যাঁহারা সত্যবাদী ও শুদ্ধ স্বভাব, সেই সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুনঃ সাধন জ্ঞান করিয়া থাকেন।" ইহার উত্তরে সীতা কহিয়াছিলেন—"আপনি আমাকে অসতীদিগের তুল্য মনে করিবেন না।"

আদর্শ স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে সুখে রাখা, ভালবাসা, যন্ত্রণা না দেওয়া রামায়ণের সময়ে যে

আদর্শ স্বামী ও মাতৃবৎ পরদারেষু

কর্ত্তব্য ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। পরস্ত্রীকে অভিলাষ না করা অথবা মাতৃবৎ দর্শন করা তখনকার দিনে কর্ত্তব্য ছিল, এবং পরস্ত্রী অভিলাষীকে সম্ভবতঃ নির্ব্বাসিত করা হইত (অ ৭২ স)। এক পত্নীতে অনুরক্ত থাকা রামায়ণের সময়ে বিশেষ গুণ বলিয়া

এক পত্নীব্রত

বিবেচিত হইত এবং ঐ রকম অনুরক্ত থাকার নাম ছিল এক পত্নীব্রত (অ ৬৪ স)। স্ত্রী পুরুষকে হৃষ্ট সন্তুষ্ট রাখা এবং স্ত্রীলোকগণকে যত্নে, সাবধানে ও সমাদরে রাখা তখনকার দিনে রাজাদের কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু কোন গুপ্ত কথা স্ত্রীলোকের নিকট প্রকাশ করা রাজনীতির বিরুদ্ধ ছিল (অ ১০০ স)।

রামায়ণের সময়ে সপত্নীরা যে পরস্পরকে গঞ্জনা দিতে ছাড়িত না এবং স্বামী সোহাগিনী পত্নীর দাসীরাও যে সপত্নীগণকে অবমাননা করিত তাহা আমরা অযোধ্যাকাণ্ডেই দেখিতে

পাই। কৌশল্যা রামের বনবাসের কথা শুনিয়া কহিলেন, "এক্ষণে সকলের প্রধানা হইয়াও আমায় মর্ম্মঘাতিনী কনিষ্ঠা সপত্নীদিগের অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হইবে। সপত্নীগণের বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কষ্টকর আর কি আছে? * * * পতি প্রতিকূল বলিয়া কৈকেয়ীর কিঙ্করী সকল আমাকে কতই অবমাননা করিয়াছে। আমি উহাদের সমান বা উহাদের অপেক্ষাও অধম হইয়া আছি। যাহারা আমার অনুগত হয়, আমার সেবা শুশ্রূষা করে, তাহারা কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে আসিতে দেখিলে ভয়ে আমার সহিত কথা কহে না। * * * আমি শীর্ণও হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং সপত্নীদিগের অত্যাচার আর আমার সহিবে না (অ ২০ স)।" ইহা হইতেই বুঝা যায় কৌশল্যা কেমন সমাদরে ছিলেন। তাঁহার জীবন বাস্তবিক ক্লেশে ক্লেশেই গিয়াছিল এবং প্রিয় পুত্রের মুখ দেখিয়াই তিনি বাঁচিয়াছিলেন (অ ২৪ স)।

সপত্নী ভয়

কৌশল্যার অবস্থা

আমরা মন্থরার মুখ হইতে জানিতে পারি সপত্নীপুত্র কাল স্বরূপ শত্রু এবং তাহার শ্রীবৃদ্ধিতে কোন বুদ্ধিমতী স্ত্রীর উল্লাস করা উচিত নয় (অ ৮ স)। রামচন্দ্রও জানিতেন কৈকেয়ী সপত্নীদিগের সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন না। কৌশল্যা ও সুমিত্রার ভরণ-পোষণও বোধ হয় রাম লক্ষ্মণকে করিতে হইত। উঁহাদের ভরণপোষণের জন্যই রাম লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় রাখিয়া বনে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণকে বুঝাইয়াছিলেন কৈকেয়ী রাজ্য হস্তগত করিলে দুঃখিত সপত্নীদিগের যন্ত্রণার আর পরিশেষ রাখিবে না। ভরতও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাতারই বশ্য হইবেন; কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে স্মরণও করিবেন না (অ ৩১ স)। দশরথের মৃত্যুর পর কৌশল্যা যে বিলাপ করিলেন তাহাতে সপত্নীর কথা আছে। তিনি কহিলেন—"অতঃপর রামশূন্য হইয়া দুষ্টা সপত্নী কৈকেয়ীর নিকট কিরূপে বাস করিব? রাম তোমার এবং আমাদের সকলেরই প্রভু। তিনি রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়াছেন। তাঁহাকে ও তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়া আমরা কি প্রকারে কৈকেয়ীর তিরস্কার সহ্য করিয়া থাকিব? যে নারী রাজার মুখাপেক্ষা না করিয়া জানকীর সহিত রামলক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিল, সে আর কাহাকে না দূর করিতে পারে?" সপত্নীর

কৌশল্যার প্রতি কৈকেয়ীর ব্যবহার

প্রভুত্ব ভাল হউক মন্দ হউক এখনও কোন স্ত্রীলোক বরদাস্ত করিতে পারেন না, রামায়ণের সময়েও পারিতেন না।

রামায়ণের সময়ে স্ত্রীলোকগণ যে ব্রত করিতেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় এইবার প্রদান করিব। কৌশল্যা রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ পাইয়া পট্ট বস্ত্র পরিয়া সুমিত্রা, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত গমন পূর্ব্বক নিমিলিত নেত্রে প্রাণায়াম দ্বারা পুরাণ পুরুষকে ধ্যান করিয়া ছিলেন। এখনও মহিলারা পট্টবস্ত্র পরিয়া থাকেন কিন্তু প্রাণায়াম আর ধ্যান এই দুইটির সঙ্গে তাঁহাদের তত পরিচয় নাই। যৌবরাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য রামের সহিত সীতাকে উপবাস করিতে হইয়াছিল (অ ৪র্থ) উপবাস করিলে যে চিত্ত ও দেহ শুদ্ধি হয় এবং ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি সংযত থাকে তাহা এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন।

ব্রত

পুরাণ পুরুষ

পুত্রের হিতকামনায় কৌশল্যা সংযম পূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে উঠিয়া স্বয়ং বিষ্ণুপূজা করিয়াছিলেন এবং পরে শুক্লবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান ও মঙ্গলাচার সমাপন পূর্ব্বক পুলকিত মনে ঋত্বিকগণ দ্বারা হোম করাইয়া ছিলেন। ব্রত পালন ক্লেশের জন্য কৌশল্যা কৃশ হইয়া পড়িয়াছিলেন (অ ২০শ) সুতরাং রামায়ণের সময়ে বিষ্ণুপূজা স্ত্রীলোকেও করিতে পারিত। কৌশল্যার হোমের আয়োজন ছিল দধি ঘৃত, অক্ষত, মোদক, হবনীয় দ্রব্য, লাজ, শ্বেতমালা, পায়স, কৃশর, সমেধ ও পূর্ণকুম্ভ। এখনও এই সকল হোম করিতে লাগে। কিন্তু এত হোম, এত ব্রত নিয়ম, বিষ্ণুপূজা, পুরাণ পুরুষের ধ্যান সব বৃথায় গেল। রাম রাজ্য পাইলেন না, তাঁহাকে বনবাসেই যাইতে হইল। ইহাকেই বলে কপাল বা প্রাক্তন। তাই বড় আক্ষেপ করিয়া কৌশল্যা কহিলেন, "আমি পুত্রের নিমিত্ত এত যে তপ জপ করিয়াছি, উষরক্ষেত্রে নিপতিত বীজের ন্যায় সমুদায়ই নিষ্ফল হইয়া গেল (অ ২৮শ)।" গীতাকার নিকটে থাকিলে হয়ত কৌশল্যাকে কহিতেন পুত্রের নিমিত্ত করিয়াছেন বলিয়াই নিষ্ফল হইল, যদি ধর্ম্মের জন্য করিতেন তাহা হইলে নিষ্ফল হইত না।

বিষ্ণুপূজা

ম্যাকসুইনী প্রায়োপবেশন বা Hunger strike করিয়া জগৎ বিখ্যাত হইয়াছেন। ভারতবর্ষেও রাজনৈতিক কয়েদীগণ মাঝে মাঝে প্রায়োপবেশন করিয়াছেন। রাণী কৌশল্যাও রামকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি বনে যাও তবে আমি প্রায়োপবেশন করিয়া দেহত্যাগ করিব" (অ ২১শ)। উপবাস করা যে একটি ব্রত বিশেষ তাহা আমরা জানি। কিন্তু এই প্রায়োপবেশনও ব্রত বিশেষ কিনা তাহা আমরা বুঝিলাম না। জৈন ধর্ম্মে প্রায়োপবেশন করিয়া দেহত্যাগ করার বিধি আছে।

প্রায়োপবেশন

তাপসব্রত বা বনবাসব্রত বলিয়াও একটি ব্রত রামায়ণের সময়ে প্রচলিত ছিল। এই ব্রত গ্রহণ করিতে হইলে স্নান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। রাম বোধহয় কূপ হইতে স্বহস্তে জল উঠাইয়া স্নান করিয়া বনবাস ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন (অ ২২ শ)।

তাপসব্রত

এখনকার দিনে পুত্র আসিয়া যদি মাতাকে স্বামীসেবায় মনোনিবেশ করিতে কহে তবে পুত্রের ভাগ্যে দুই গণ্ডে চপেটাঘাত ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় না। কিন্তু রামায়ণের সময়ে দেশিতেছি ইহার বিপরীত ছিল, কারণ রামচন্দ্র কৌশল্যাকে কহিয়াছিলেন, "এক্ষণে আপনি স্বামীসেবায় মনোনিবেশ করিয়া আহার সংযম পূর্ব্বক আমারই শুভোদ্দেশে অগ্নিকার্য্যে দেবগণের অর্চ্চনা এবং ব্রতশীল বিপ্রগণের পূজা করিবেন" (অ ২০শ) ব্রতশীল বিপ্রগণ এই কথা হইতে বুঝা যায় পুরুষেরাও ব্রত করিতেন এবং ব্রতশীল হইলে পূজনীয় হইতেন।

ব্রতশীল বিপ্র

রামচন্দ্রকে বিদায় দিবার সময় কৌশল্যার কার্য্যকলাপ বিচার করিলেই তিনি যে কত বড় আচার পরায়ণা, ব্রতশীলা ধার্ম্মিক রমণী ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। সর্ব্ব প্রথমে তিনি পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া রামের নিমিত্ত নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পোড়া চোখের জল কিছুতেই প্রবোধ মানিল না, তাই কহিয়া ফেলিলেন, "বৎস্য! আমি কিছুতেই তোমাকে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না।" একমাত্র গুণধর পুত্রের রাজ্যচ্যুতি ও দীর্ঘকালের জন্য বনবাস যে মাতার পক্ষে কি ভীষণ তাহা একমাত্র মাতাই বুঝিতে পারেন। স্ত্রীলোককে

আচার ও ব্রতের দৃষ্টান্ত

ভগবান ধরণীর ন্যায় সর্ব্বংসহা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্যই গোধহর পুত্রশোকে এবং পতিশোকেও কৌশল্যা মরিলেন না।

মঙ্গলাচরণ শেষ হইলে কৌশল্যা ধর্ম্মকে, দেবালয়ের দেবতাকে, এমন কি বিশ্বামিত্রের প্রদত্ত অস্ত্র শস্ত্র, সমিধ, কুশ, পবিত্র বেদি, স্থণ্ডিল, পর্ব্বত, বৃক্ষ, হ্রদ, পতঙ্গ, পন্নগ ও সিংহকেও আহ্বান করিয়া রামকে রক্ষা করিতে কহিলেন। সাধ্য, বিশ্বদেব, মারুত, ইন্দ্রাদি লোকপাল, বসন্তাদি ছয় ঋতু, মাস, সংবৎসর, দিনরাত্রি, মুহূর্ত্ত, কলা, বিরাট, বিধাতা, পূষা, ভগ, আর্য্যামা, শ্রুতি, স্মৃতি, ভগবান স্কন্দ, সোম, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষি, নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণকেও আহ্বান করিয়া রামকে রক্ষা করিতে কহিলেন। বানর, বৃশ্চিক, দংশ মশক, কীট ইত্যাদি যত কিছু মনে করিতে পারা যায় প্রায় সকলকেই কৌশল্যা রামের রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন। সর্ব্বলোক প্রভু ভূতভাবন ভগবান স্বয়ম্ভূও বাদ পড়িলেন না।

আর্য্যগণ কি পূজা করিতেন?

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে ভগবান পর্য্যন্ত যত কিছু সে সকলের স্তুতি করিয়া কৌশল্যা রামকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই খানেই শেষ হইল না। আশীর্ব্বাদ করিয়া কৌশল্যা মাল্যগন্ধ ও স্তুতিদ্বারা দেবগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তারপর বিপ্রগণ দ্বারা তিনি হোম আরম্ভ করিলেন। হোম শেষ হইলে লোক-পালাদি বলি সমাধান ও ব্রাহ্মণগণকে মধুপর্ক প্রদান করিয়া রামের বনবাসোদ্দেশে স্বস্তিবাচন করাইলেন। তথাপি কৌশল্যা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। মাতার আশীর্ব্বাদ এখনও পুত্রকন্যাগণ অভিলাষ করিয়া থাকে, রামচন্দ্রও সে আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। কৌশল্যা রামকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"বিত্রাসুর বিনাশকালে ইন্দ্রের যে শুভলাভ হইয়াছিল তোমার তাহাই হউক, অমৃতপ্রার্থী গরুড় যে শুভলাভ করিয়াছিল তোমার তাহাই হউক। আর বামন স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল আক্রমণ করিবার কালে যে শুভলাভ করিয়াছিলেন তোমার তাহাই হউক। অদিতি এবং বিনতা তাঁহাদের পুত্রের জন্য যে শুভ কামনা করিয়াছিলেন তুমি তাহাই লাভ কর। আর মহাসাগর দ্বীপ, ত্রিলোক, বেদ ও দিক সমুদায় তোমার মঙ্গল করুন।"

এখনও যেমন সন্তানের মঙ্গল কামনায় মাতা সন্তানের হাতে গলায় ও কোমরে তাবিজ ও কবচ বাঁধিয়া দেন কৌশল্যাও রামের হাতে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পরীক্ষিত ঔষধি ও শুভ বিশল্যাকরণী বাঁধিয়া দিলেন। পরে রামকে বারংবার আলিঙ্গন এবং তাঁহার মস্তক আ-নমন ও আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম শুভ কামনা করিয়া রামচন্দ্রকে যথাইচ্ছা প্রস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তার পর আবার দেবতাগণকে আহ্বান করিয়া রামচন্দ্রের শুভ সাধন করিতে লাগিলেন। পুনরায় স্বস্ত্যয়ন সম্পন্ন করিয়া কৌশল্যা রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া তিনি রামকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।"

রক্ষা কবচ

ইহা হইতে খুব স্পষ্টই বুঝা যায় কৌশল্যা কতখানি ধর্ম্মভীরু, স্নেহপ্রবণা ও ব্রতপরায়ণা ছিলেন।

নদীপূজা বা River cult এর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অযোধ্যাকাণ্ড এই নদী পূজার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আ ৫২ সর্গে দেখিতে পাই গঙ্গা পার হইবার সময় সীতা বলিতেছেন, "আমি নিরাপদে আসিয়া মনের সাধে তোমার পূজা করিব। তুমি সমুদ্রের ভার্য্যা, স্বয়ং ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া আছ। দেবি! আমি তোমাকে প্রণাম করি। রাম ভালয় ভালয় পৌঁছিলে এবং রাজ্য পাইলে আমি ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া তোমারই প্রীতির উদ্দেশে তোমাকে অসংখ্য গো ও অশ্ব দান করিব, সহস্র কলস সুরা ও পলান্ন দিব। তোমার তীরে যে সকল দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং তীর্থস্থান ও দেবালয় অর্চ্চনা করিব।"

নদী পূজা

গঙ্গা পূজা

এখনও গঙ্গা পূজায় মেষ বলির ব্যবস্থা আছে, রামায়ণের সময়ে বোধ হয় গো ও অশ্ব বলির ব্যবস্থা ছিল। এখনও নদীতে ঝড়ে পড়িলে লোকে নদীর উদ্দেশ্যে হরির লুট অর্থাৎ বাতাসা মানত করিয়া থাকে। সুতরাং নদীপূজা এখনও আছে, লোপ পায় নাই। গঙ্গার ন্যায় যমুনাও [illegible]

গো ও অশ্ব বলি

সময় পূজিত হইত। সীতা যমুনা পার হইবার সময় কহিয়াছিলেন, "যদি আমার স্বামী সুমঙ্গলে ব্রতপালন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে পারেন তাহা হইলে সহস্র গো ও শত কলস সুরা দিয়া তোমার পূজা করিব (অ ৫৫ স)। এখন নদীপূজার সময় সুরার পরিবর্তে কলসী কলসী নদীর জল উঠাইয়া নদীতে ঢালা হয়। এখনও সিমন্তিনীগণ নৌকায় উঠিবার সময় নৌকার মাথায় জল দিয়া মা গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া থাকেন। রামায়ণের সময় একার্য্যটি পুরুষেরাও করিত। অ ৫২ সর্গে দেখি রামচন্দ্র নৌকায় উঠিয়া মন্ত্র জপ করিতেছেন এবং লক্ষ্মণ ও সীতা জাহ্নবীকে প্রীতমনে প্রণাম করিতেছেন।

যমুনাপূজা

সুরা

রামায়ণের সময় বৃক্ষ পূজারও প্রচলন ছিল। অ ৫৫ সর্গে দেখি সীতা শ্যাম বটকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিতেছেন, "তরুবর! আমার পতি ব্রত-পালন করুন, আমরা আবার আসিয়া যেন আর্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে নমস্কার।" এই প্রসঙ্গে সীতা শ্যামবটকে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। এখনও বৃক্ষ ও মন্দির প্রদক্ষিণ প্রচলিত আছে। ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিবার জন্য যে সকল দূত প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা পথে শরদণ্ডা নামক নদীর পশ্চিম তীরে সত্যোপযাচন নামক এক দিব্য বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়াছিল (অ ৬৮ স)। সুতরাং পুরুষগণও রামায়ণের সময়ে বৃক্ষপূজা করিত।

বৃক্ষপূজা

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে ৬৮ সর্গ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ এই সর্গের মতে দূতেরা অযোধ্যা হইতে বরাবর গয়ায় আসিয়া ভগবান বিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া গিরিব্রজ বা রাজ গৃহে অর্থাৎ মগধের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু আমরা জানি পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিমাংশে শতদ্রু ও বিপাশা নদীদ্বয়ের মধ্যস্থ প্রদেশের নাম কেকয় দেশ। কেহ কেহ কাশপিয়ান সাগরে তীরবর্ত্তী আর্ম্মানিয়াকে কেকয় দেশ কহিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় অ ৭১ সর্গেও রাজগৃহকে ভরতের মাতুলালয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ভরত যে পথে অযোধ্যায় ফিরিলেন সে পথের সঙ্গে উল্লিখিত দূতগণের গমনের পথের মিল নাই।

কেকয় দেশ কোথায়?

ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন প্রকৃত পক্ষে ভরতের মাতুল গৃহ কোথায় ছিল। এই প্রসঙ্গে ১৩২৬ সনের প্রবাসীতে প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রীঅমৃতলাল শীল এবং শ্রীতারিণী কান্ত মজুমদারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এখনও নূতন গৃহে প্রবেশ করিবার সময় বাস্তু শান্তি করা হয় এবং তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়। রামায়ণের সময়ে বাস্তুশান্তি করিবার প্রথা প্রচলিত কিন্তু ব্রাহ্মণ ভোজন প্রথা বোধ হয় ছিল না। রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বতে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া নিজেই গৃহযজ্ঞ বা বাস্তুশান্তি করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ কৃষ্ণবর্ণ মৃগবধ করিয়া আনিয়া রামের নির্দ্দেশ ক্রমে প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে পবিত্র মৃগমাংস নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা শোণিত শূন্য ও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে অগ্নি হইতে উঠাইয়া রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ঐ মাংস দ্বারা তিনি গৃহযজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। বাস্তুশান্তি করিয়া রাম দেবগণের পূজা করিলেন এবং তৎপর পবিত্র হইয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। তৎপর গৃহমধ্যে পাপহর রৌদ্র, বৈষ্ণব ও বৈশ্বদেব বলি প্রদত্ত হইল এবং ঐ সঙ্গে নানাপ্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও জপ সম্পন্ন হইল। ইহার পর রামচন্দ্র আবার নদীতে স্নান করিতে গেলেন। স্নান শেষ করিয়া আশ্রমের অনুরূপ চৈত্য, আয়তন ও বেদ প্রস্তুত করিলেন এবং পরে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। এই বাস্তুশান্তির ফল সম্বন্ধে রাম কহিয়াছিলেন—যাঁহারা বহুদিন জীবনধারণের বাসনা করেন তাঁহাদিগের বাস্তুশান্তি করা আবশ্যক (অ ৫৬স)।

বাস্তুশান্তি

মৃগমাংস

রামায়ণের সময় আর্য্যগণের মধ্যে সতীদাহের প্রচলন ছিল না বলিয়া বোধ হয়। কারণ রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাঁহার কোন স্ত্রীই সহমরণে গেলেন না। তাঁহারা শুধু চিতাস্থিত দশরথের দেহকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং দাহ শেষ হইলে ভরতের সহিত তাঁহারা প্রেতোদ্দেশে তর্পণ করিলেন এবং পরে ভূতলে শয়ন করিয়া দশাহ অতিবাহন করিলেন (অ ৭৬ স)। এই দশাহ প্রথা ও দশাহ মধ্যে ভূতলে শয়ন করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিবার রীতি এখনও হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু এখন জ্যেষ্ঠ উপস্থিত না থাকিলে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রই

সতীদাহ

মুখাগ্নি, প্রেতকার্য্য ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সকল কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু দশরথের মুখাগ্নি প্রভৃতি ভরতই করিয়াছিলেন শত্রুঘ্ন করেন নাই। সুতরাং রামায়ণের সময়ে জ্যেষ্ঠ অভাবে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের এ সকল করিবার অধিকার ছিল না। তখনকার দিনে অস্থিসঞ্চয় কার্য্যটি শ্রাদ্ধের পর সম্পন্ন হইত। দশরথের অগ্নিসংস্কারের পর ত্রয়োদশ দিনে ভরত চিতা হইতে অস্থি সঞ্চয় করিয়াছিলেন (অ ৭৭ স)। ইহা হইতে বুঝা যায় রামায়ণের সময় মৃতদেহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করা হইত না। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে দেখিতে পাই মৃতদেহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করা হয় না। বর্ত্তমান সময়ে অস্থিসঞ্চয় কার্য্যটি অগ্নিসংস্কারের সময়েই অন্ততঃ বাংলা দেশে হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা গেল অগ্নিসংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রাচীন নবীনে অনেক তারতম্য রহিয়াছে। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে ভিন্সেণ্টস্মিথের মতে সতীদাহের প্রথা সিদিয়ানগণ ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। উঁহাদের মধ্যেই ঐ প্রথার প্রচলন ছিল। তবে সতীদাহের আভাস যে রামায়ণে পাই না এমন নহে। কারণ কৌশল্যার মুখে শুনিতে পাই, "আমি পতিব্রতা, আজ আমি স্বামীর এই দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক অনলে প্রবেশ করিব" (অ ৬৬ স) চিতায় প্রাণবিসর্জ্জন দেওয়ার প্রথা রামায়ণের সময়ে প্রচলিত ছিল। অন্ধ মুনি ও তাঁহার অন্ধ স্ত্রী পুত্রশোকে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন (অ ৬৪ স)। এখনও স্ত্রীলোকগণ সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া বিষপান করিয়া অথবা অনলে কিম্বা সলিলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, রামায়ণের সময়েও করিতেন। নতুবা আদর্শ সতী সীতার মুখে শুনিতাম না," তোমার বিরহ আমার সহ্য হইবে না, নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব। * * * যদ তুমি এই দুঃখিনীকে না লইয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চয় বিষপান, না হয় অগ্নি বা সলিলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" রামায়ণের সময় স্ত্রীলোকগণ বোধহয় অত্যন্ত ক্রোধী ছিলেন নতুবা ক্রোধাগার নামক স্বতন্ত্র গৃহ রাজপ্রাসাদে থাকা (অ ৯ স) সম্ভবপর হইত না।

প্রেতকার্য ও তাহার অধিকার

চিতায় প্রাণবিসর্জ্জন

আত্মহত্যা

অ ৭৮ সর্গে দেখিতে পাই মন্থরাবধোদ্যত শত্রুঘ্নকে ভরত কহিতেছেন, "স্ত্রীলোককে বধ করিতে নাই, ক্ষমা কর। দেখ রাম মাতৃঘাতক বলিয়া আমার উপর যদি ক্রোধ না করিতেন তাহা হইলে আমি দুষ্টা কৈকেয়ীকে বিনাশ করিতাম।" সুতরাং বুঝা গেল রামায়ণের সময় স্ত্রীবধ পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত।

স্ত্রীবধ মহাপাপ

যে সকল কার্য্য রামায়ণের সময়ে অপকর্ম্ম বা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত তাহা আমরা ভরতের মুখ হইতে পাই। শাস্ত্র অমান্য করিয়া চলা এবং পাপাচারীদিগের দাস হইয়া থাকা রামায়ণের সময় নিন্দনীয় ছিল। সূর্য্যের অভিমুখে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করা, নিদ্রিত ধেনুর দেহে পদাঘাত করা, ভৃত্যকে কর্ম্মসমাধানান্তে বেতন না প্রদান করা, পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনরত রাজার অনিষ্ট করা এবং ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন না করা পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাপসগণকে যজ্ঞীয় দক্ষিণা প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিয়া না দেওয়া এবং শ্রাদ্ধাদি নিমিত্ত ব্যতিরেকে পায়স, কৃশর ও ছাগমাংস ভোজন করা ঘৃণার্হ ও নিন্দনীয় ছিল। গুরুলোকের অবমাননা, নিন্দা, মিত্রদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা অধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। পুত্রকলত্রকে বঞ্চিত করিয়া সুসংস্কৃত অন্ন একাকী ভোজন করা, অনুরূপ ভার্য্যা না পাওয়া এবং নিঃসন্তান হইয়া মরা নিন্দনীয় ছিল। রাজা, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধকে বধ করা এবং ভৃত্য ত্যাগ করা পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। লাক্ষা, লৌহ, মধু মাংস ও বিষ বিক্রয় করা নিন্দনীয় ছিল। ভীষণ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করা, নরকপাল গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা করা এবং নিয়ত মদ্য, স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত ও কাম ক্রোধে অভিভূত থাকা অধর্ম্মজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। উভয় সন্ধ্যা ব্যাপিয়া নিদ্রা যাওয়া, অগ্নিদান করা, গুরুদারে গমন করা, মিত্রদ্রোহী হওয়া, দেবগণ, পিতৃগণ ও পিতামাতার শুশ্রূষা না করা পাপ বলিয়া গণ্য হইত। বহু পোষ্য থাকা, জ্বরোগগ্রস্ত হওয়া এবং দরিদ্র হওয়া নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশভোগ করা পাপের ফল বলিয়া বিবেচিত হইত। দীন যাচকের আশা নিষ্ফল করা, কুকস্বভাব, খল ও অশুচি হওয়া, প্রতারণা করা এবং সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ঋতুস্নানান্তর সন্নিহিতা হইলে তাঁহাকে উপেক্ষা করা পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। আহারাদি প্রদান না করিয়া সন্তানাদি বিনষ্ট

পাপের বিষয়

করা, বিপ্রগণের অর্চনায় ব্যাঘাত করা, বালবৎসা ধেনু দোহন করা, ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করা, পরদারে আসক্ত হওয়া, পানীয় জল দূষিত করা, বিষপ্রয়োগ করা, জল থাকিতে পিপাসার্ত্তকে জল না দেওয়া, নিজ নিজ দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বিবাদ করা এবং ঐ বিবাদে রক্তপাত করা পাপ বলিয়া গণ্য হইত (অ ৭৫ স)। উল্লিখিত বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি রামায়ণের সময় সমাজ কতখানি উন্নত ছিল। দরিদ্র হওয়া ও অনেক পোষ্য থাকা এবং পানীয় জল দূষিত করা যে অসুবিধাজনক তাহা ঐ সময়ের সমাজ বুঝিতে পারিয়াছিল। মদ্য, স্ত্রী, অক্ষক্রীড়া ও কাম ক্রোধের একান্ত বশীভূত হওয়া যে সমাজের অনিষ্টকারক তাহাও সকলে বুঝিয়াছিল। রামায়ণের সময়ে করের পরিমাণ ছিল ষষ্ঠাংশ।

রামায়ণের সময়ে ত্রিকালীন স্নান (অ ১৮ ও ৯৫ স) প্রাতঃসন্ধ্যা (অ ৭৮ স), সায়ংসন্ধ্যা (অ ৯০ স) ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও বিধেয় ছিল; ব্রহ্মচর্য্য, অধ্যয়ন, দৃঢ়তা ও সরলতা প্রশংসনীয় ছিল (অ ৫২ স)। রামায়ণের সময় জন্মান্তরবাদ প্রচলিত ছিল এবং সকলে কর্ম্মফল বিশ্বাস করিত (অ ৬৩ স)। সেইজন্য রাম লক্ষ্মণকে কহিয়াছিলেন—"দেবী কৌশল্যা জন্মান্তরে নিশ্চয় অনেক স্ত্রীলোককে পুত্রহীন করিয়াছিলেন সেইজন্য আজ তাঁহার এইরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল" (অ ৫৩ স)। অ ৬৩ সর্গে দেখিতে পাই দশরথ কৌশল্যাকে কহিতেছেন, "মনুষ্য শুভ বা অশুভ যেরূপ কার্য্য করুন, তাহার অনুরূপ ফল তাঁহাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হয়।"

জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফল

রামায়ণের সময়ে মুনিঋষিরাও অতিথির উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিতেন। রাম লক্ষ্মণ ও সীতার উদ্দেশে মহর্ষি ভরদ্বাজ স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলেন। এখনও ঊর্দ্ধবাহু সাধু সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, রামায়ণের সময়েও পাওয়া যাইত। রামচন্দ্র মন্দাকিনীর তীরে ঊর্দ্ধবাহু মুনিগণকে সূর্য্যোপস্থান হইয়া জপ করিতে দেখিয়াছিলেন (অ ৯৫ স)। রামায়ণের সময় ক্ষত্রিয়গণ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে সংসার ক্লেশ শান্তির জন্য ও মোক্ষলাভ করিবার জন্য বনবাসে

ঊর্দ্ধবাহু মুনি

যাইতেন (অ ১৪ স) এবং সকলের পক্ষেই তিন প্রকার ঋণ যথা ঋষি, বিপ্র ও আত্মঋণ হইতে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল (অ ৪ স)। পুত্র উৎপাদন করিয়া আত্মঋণ হইতে, যজ্ঞাদি করিয়া বিপ্রঋণ হইতে এবং বনবাসী হইয়া ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইবার ব্যবস্থা ছিল।

তিন প্রকার ঋণ

এখনও সময় সময় নরনারীকে ভূতে পাইয়া বসে এবং এই সকল ভূতাবিষ্ট নরনারী ন্যায় অন্যায় জ্ঞান হারাইয়া অসঙ্গত লজ্জাজনক নানা রকম কার্য্য করিয়া থাকে। এই সকল ভূতাবিষ্টের চিকিৎসা ভূতের ওঝারাই করিয়া থাকে। রামায়ণের সময়েও নরনারীকে ভূতে পাইত। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই অ ১০ সর্গে দশরথ কৈকেয়ীকে কহিতেছেন, "বোধ হয় তুই ভূতাবেশে বিবশ হইয়াই এইরূপ কহিতেছিস, নচেৎ তোর মনে কদাচ এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইত না।"

ভূতে পাওয়া

এখনও আমাদের দেশের লোকের জ্যোতিষের উপর অবস্থা অত্যন্ত প্রবল। রামায়ণের সময়েও উহা কোন অংশে নূ্যন ছিল না। গ্রহনক্ষত্রের প্রতিকূলতা ছিল বলিয়া দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্য প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন এবং চন্দ্রের পুষ্যা সংক্রমণ দিনে অভিষেক সম্পন্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন (অ ৪ স)। বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে জানকীও জানিতে পারিয়াছিলেন চন্দ্রের সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইয়াছে এবং শুভ লগ্নে বৃহস্পতি দেবতা আছেন (অ ২৬ স)। সুতরাং রামায়ণের সময়ে স্ত্রীলোকগণও জ্যোতিষের খোঁজ রাখিতেন।

জ্যোতিষে বিশ্বাস

রামায়ণের সময়েও গণিকাগণের অস্তিত্ব ছিল। রামের অভিষেক উপলক্ষে সুসজ্জিতা গণিকা আনীত হইয়াছিল (অ ১৪ স)। এবং রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে কহিয়াছিলেন, "সৈন্যের সঙ্গে বচন চতুরা গণিকারা গমন করুক" (অ ৩৬ স)। রাজপ্রাসাদেও গণিকাগণ যাইতে পারিত। দশরথ কহিয়াছিলেন, "পালিকা গণিকাগণ সুসজ্জিতা হইয়া প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থান করুক।" (অ ৩ স)।

গণিকা

রামায়ণের সময়ে অগ্নিপূজার অত্যন্ত প্রচলন ছিল। গৃহে গৃহে অগ্ন্যাগার বিরাজিত ছিল। রাজপ্রাসাদে একটি পৃথক অগ্নিহোত্রে গৃহ ছিল (অ ৩ স) এবং রামচন্দ্র অযোধ্যার অধিবাসীগণের প্রত্যেককেই অগ্নিসংক্রান্ত সমগ্র সংবাদ আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করিতেন। রামের বিরহে নগরবাসীগণের অগ্নিচর্য্যায় প্রবৃত্তি তিরোহিত হইয়াছিল (অ ৪১ স)। রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে দিয়া মাতাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন তিনি যেন যথাকালে অগ্ন্যাগারে অগ্নি পরিচর্য্যা করেন (অ ৫৮ স)। কৌশল্যা অগ্নিহোত্র লইয়া সুমিত্রার সহিত রামের উদ্দেশে যাত্রা করিতে চাহিয়াছিলেন (অ ৭৫ স)। দশরথের মৃত দেহের অগ্রে অগ্ন্যাগার হইতে অগ্নি লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং সেই অগ্নিতে ঋত্বিক ও যাজকেরা আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই অগ্নিতেই চিতা প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছিল (অ ৭৬ স)। সকলের পক্ষে অগ্নিপূজা অবশ্য করণীয় না হইলে রামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেন না, "ধীমান মনুষ্যেরা ত তোমার অগ্নিকার্য্যে নিযুক্ত আছে? উঁহারা যথাকালে হোমের সংবাদ তোমায়-ত জ্ঞাপন করিয়া থাকেন?

অগ্নিপূজা

দশরথের রাজত্ব অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস, কাশী ও কোশল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার সৈন্যগণ অন্ন ও বেতন পাইত, ভৃত্যগণও অন্ন ও বেতন পাইত। মন্ত্রী, সেনাপতি, বিচারক, গুপ্তচর, ধনাধ্যক্ষ ইত্যাদি সকলই ছিল। (অ ১০০ স)। বৃদ্ধা স্ত্রীগণ বেত্র হস্তে ও কুণ্ডলধারী বিশ্বস্ত যুবকেরা অস্ত্রশস্ত্র হস্তে রামের গৃহরক্ষা করিত (অ ১৬ স) আর রাজপ্রাসাদ ধনুর্দ্ধারী পুরুষেরা রক্ষা করিত। হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিক এই চতুরঙ্গ সৈন্যই বিদ্যমান ছিল, এবং ভরত ৯০০০ হস্তী, ১০০০০০ অশ্বারোহী ও ৬০০০০ রথ লইয়া রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন (অ ৮৯ স)। রামায়ণের সময় উৎকোচের প্রচলন না থাকিলে রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেন না, "যে সকল অমাত্যকুল ক্রমাগত ও সচ্চরিত্র এবং যাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করেন না, তুমি তাঁহাদিগকে ত প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার প্রদান কর?" (অ ১০০ স)।

দশরথের রাজ্য ও সৈন্য

রামায়ণের সময়ে সমাজে বণিক, মণিকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, মায়ূরক, করাতি সন্তুকার, সুধাকার, গন্ধোপজীবী, সুবর্ণকার, কম্বলাকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য, ধূপক, সৌণ্ডিক, রজক, দর্জ্জি ইত্যাদি বিদ্যমান ছিল (অ ৮৩ স)।

ব্যবসা

রামায়ণের সময় কোন্ কোন্ খাদ্যের প্রচলন ছিল এখন সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করিব। মৃগয়া রাজর্ষিগণের সম্মত ছিল (অ ৪৯ স), এবং মৃগয়ালব্ধ মাংস আহরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। রাম লক্ষণ উভয়েই মৃগয়া করিতেন। এবং মৃগ মাংস ভোজন করিতেন। বৎসদেশে আসিয়া রাম ও লক্ষণ বরাহ, ঋষ্য, পৃষত ও মহারুরু এই চারি প্রকার মৃগ বধ করিয়াছিলেন এবং উহাদের পবিত্র মাংস ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন (অ ৫২ স)। ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে চিত্রকূটে যাইবার সময় যমুনার নিকট রাম ও লক্ষণ পবিত্র মৃগ বধ করিয়া বন মধ্যে ভোজন করিয়াছিলেন (অ ৫৫ স) চিত্রকূটে বাস্তুশান্তির সময় লক্ষ্মণ কৃষ্ণবর্ণ মৃগ বধ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং নিজেই উহা রন্ধন করিয়াছিলেন, "প্রিয়ে, দেখ, এই মৃগ মাংস অত্যন্ত স্বাদু ও পবিত্র এবং ইহা অগ্নিতে সংস্কার করা হইয়াছে।" সীতা বোধ হয় ঐ মাংস খাইতেন না বা রাঁধিতেন না, সেই জন্যই রাম ঐরূপ কথা কহিয়াছিলেন, এখনও যাঁহারা মাংস খান না তাঁহাদের নিকট যাঁহারা মাংস খান তাঁহারা ঐ ভাবেই মাংসের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

খাদ্য

বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে ভরদ্বাজ যে সমস্ত খাদ্য ও পানীয় দ্বারা ভরতের সৈন্য সামন্তের সৎকার করিয়াছিলেন তাহা হইতে তখনকার সময়ে প্রচলিত খাদ্যের কিঞ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়। বিল্ব, কপিত্থ, পনস, সুকেশ, আমলকী ও আম্রের আদর তখন যথেষ্ট ছিল। সুরা, সুসংস্কৃত মাংস, পায়স, ইক্ষু ও লাজ সৈন্যসামন্তগণের নিকট অমৃত তুল্য ছিল। ছাগ, বরাহ, মৃগ, কুক্কুট, এমন কি ময়ূরের মাংসও তাহারা বাদ দিত না, অন্নব্যঞ্জন, দধি দুগ্ধ, তক্র রসাল ও শর্করা এসকলের ত কথাই ছিল না। মদ্যপান কিছু অতিরিক্ত পরিমাণই হইত।

রামায়ণের সময়ে গয়ার মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র ভরতকে কহিয়াছিলেন, "দেখ, গয়া প্রদেশে, মহাত্মা গয় যজ্ঞকালে পিতৃলোকের প্রীতি কামনায় এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন, " পুৎ নামক নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করেন, তিনি পুত্র এবং যিনি তাঁহাকে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন, তিনিও পুত্র। জ্ঞানী গুণবান বহু পুত্রের কামনা করা কর্ত্তব্য, কারণ ঐ সমষ্টির মধ্যে অন্ততঃ একজন গয়া যাত্রা করিতে পারে" (অ ১০৭ স)। এখনও লোকে গয়া গিয়া পিতৃপুরুষের পিণ্ড দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া থাকে।

গয়া

রামায়ণের সময় যে স্বদেশপ্রীতি ছিল না তাহা নহে। রামচন্দ্র বনে যাইবার সময় অযোধ্যার দিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিয়াছিলেন, "হে রঘুকুল প্রতি-পালিতে, আমি তোমাকে এবং যে সমস্ত দেবতা তোমাতে বাস ও তোমাকে রক্ষা করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। আমি ঋণমুক্ত, বন হইতে প্রত্যাগত এবং পিতা মাতার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় তোমার দর্শন করিব।" (অ ৫০ স)।

স্বদেশপ্রীতি

অরাজকতা যে দেশ ও দেশবাসীর পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর তাহা রামায়ণের সময়ে সকলেই বিশেষ করিয়া বুঝিতেন। অরাজক রাজ্য উচ্ছিন্ন হয় এবং অরাজক রাজ্যে মেঘ বর্ষণ করে না। বীজ রোপণ হয় না, পুত্র পিতার, ভার্য্যা ভর্ত্তার অবাধ্য হইয়া উঠে এবং ধনও স্ত্রীরক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হয়; সুরম্য উদ্যান ও পুণ্যগৃহ নির্ম্মাণে কাহারও উৎসাহ থাকে না, উৎসাহ বিলুপ্ত হয়, বণিকেরা বিপুল পণ্যদ্রব্য লইয়া দূর পথে যাইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়। এই রকম আরও অনেক কুফল রাজ্য অরাজক হইলে ঘটিয়া থাকে। "চক্ষু যেমন শরীরের হিতসাধন ও অহিত নিবারণে নিযুক্ত আছে, প্রজাদিগের পক্ষে রাজাও তদ্রূপ। তিনি সত্য ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, কুলীনদিগের কুলপালক। তিনি পিতা ও মাতা, তাঁহা হইতে সকলের শুভ-সম্পাদন হইয়া থাকে। সদাচার সম্পন্ন রাজা, যম কুবের ইন্দ্র ও বরুণকেও অতিক্রম করেন "অ ৬৭ স)। রাজা সম্বন্ধে এই রকম ধারণা এখনও হিন্দুগণের মজ্জাগত। সেই জন্য হিন্দুগণের মত রাজভক্ত আর এ পৃথিবীতে দেখা যায় না।

অরাজকতার পরিণাম

ধর্ণা

এখনও শুনিতে পাই মহাজনগণ সময় সময় আসামীর নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকে, টাকা না আদায় হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা দরজা হইতে উঠে না। রামায়ণের সময়ও এই প্রকার ধর্ণা দেওয়ার প্রথা ছিল। ভরত সুমন্ত্রকে কহিয়াছিলেন, " তুমি শীঘ্র এই স্থানে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া দাও, যাবৎ আর্য্য রাম প্রসন্ন না হন, তদবধি আমি ইঁহার উদ্দেশে প্রত্যুবেশন করিব। উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন ধন গ্রহণের নিমিত্ত অধমর্ণের দ্বার রোধ করে, তদ্রূপ আমি সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া যতক্ষণ না ইনি প্রতিগমন করিবেন, অনাহারে এই পর্ণকুটীরের সম্মুখে শয়ন করিব" (অ ১১১ স)। তবে এই রকম বিধি ব্রাহ্মণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, ক্ষত্রিয়ের যে ইহাতে কোন অধিকার ছিল না তাহা রামচন্দ্র ভরতকে বুঝাইয়াছিলেন।

বংশানুচরিত্র

এখনও লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে পুত্র পিতার স্বভাব এবং কন্যা মাতার স্বভাব প্রাপ্ত হয়। রামায়ণের সময়েও এ বিশ্বাসের অভাব ছিল না। কৈকেয়ীর মাতার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল না। সেই জন্য সুমন্ত্র কৈকেয়ীকে কহিয়াছিলেন "তোমার পিতা তোমার জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৈকেয়ী, তুমিও মহারাজকে মোহ অভিভূত করিয়া অসৎ পথে প্রবর্ত্তিত করিতেছ। প্রবাদ আছে যে পুরুষেরা পিতার এবং স্ত্রীলোক মাতার স্বভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করে একক্ষণে ইহা সত্যই বোধ হইল।"

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

সত্যের রূপ।

—:o:—

সত্য সদা দূরে দূরে রহে—
মিথ্যা নিজে এসে দেয় ধরা।
সত্যের অন্তর ভরা রূপ —
মিথ্যা শুধু বাহ্য মনোহর।
সত্যের বাহিরে কাঁটাটুকু—
শান্তি পেতে এতটুকু জ্বালা—
মিথ্যার চটকে যেই ভুলে
কণ্ঠে তার কণ্টকের মালা।
দয়া, ধর্ম্ম, পর উপকার—
সৎসঙ্গ, এরা সত্য সাথী—
সুমুখে মিথ্যা বড় প্রিয়,
পিছনে যে দারুণ অরাতি।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আশাহত।

-:*:-

(১)

যৌবনের শেষ সীমায় উপনীত,—তবুও জীবনটাকে একদিনের জন্যও সরস করিয়া তুলিতে পারি নাই—আমার সাজান বাংলোটি শূন্যই রহিয়া গেল—জীবন্ত প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়া পারিলাম না—ভাবিয়াছিলাম এ কথাটা আর বলিব না। যদিও দেহটা তাহার আমার হইল না, মনটাও যে সে আমাকে দিয়াছিল সে খবরও জানি না, তবুও আমি তাকে পাইয়াছি—মনে প্রাণে। মনের নিভৃত মন্দিরে তার মধুর স্মৃতিটি বহিয়া বেড়ানই আমার হইয়াছে এক মাত্র সান্ত্বনা, কল্পনায় তার প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তিটী গড়িয়া তোলাই আমার একমাত্র সুখ, তার চির নবীন স্মৃতিই আমার নির্জ্জনতার একমাত্র শান্তি। যখন এই ক্ষুদ্র জীবনের গূঢ়রহস্য ভাঙ্গিতেই বসিয়াছি তখন আর একটু বিশদ ভাবেই বলি।

বাবা যখন আমাদের দু'ভাইকে মায়ের হাতে তুলিয়া দিয়া অজানা দেশে চলিয়া গেলেন, আমাদের ছোট্ট সংসারটি তখন দারুণ শোকের প্রবল ঝড়ে ওলট পালট হইয়া গেল।

গরীবের সংসার—জমিজমাও নাই, আমাদের চলিবে কি করিয়া? একদিন সেই কথাই মা ভাবিতেছিলেন এমন সময় জমিদার বাড়ীর কর্ত্তামা দয়া করিয়া আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলা দিলেন। আমার ঠাকুরদাদা, বাবা সকলেই একে একে ইঁহাদের জমিদারীতে কাজ করিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তামা বাবাকে বড় স্নেহ করিতেন, তাই তাঁর অভাবে আমাদের সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন। কর্ত্তামাকে দেখিয়াই মা কাঁদিয়া উঠিলেন "কর্ত্তামা, এই অনাথদের নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াব?"

চোখের জল আঁচলে মুছিয়া কর্ত্তামা বলিলেন "বউ, তুই কাঁদিস না। রমেশ তোদের সবাইকে আমার কাছে রেখে গেছে;—যা করতে হয় আমি করব।"

সেইদিন হইতে কর্ত্তামার ব্যবস্থায় দাদার স্কুলের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়া গেল; সেকেণ্ড ক্লাশেই মা সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া বাবার শূন্য স্থানে সরকার মশায় রূপে দাদার প্রতিষ্ঠা হইল।

কর্ত্তামার সাহায্যে গ্রামের স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া বাবার মৃত্যুর চার বছর পর ১৮ বছরের বালক বা নবীনযুবা আমি কলিকাতায় এফ-এ, পড়িতে আসিলাম। কলিকাতায় কর্ত্তামার মেয়ে জামাই থাকিতেন, ঠিক হইল আমি সেই বাসায় থাকিয়া পড়িব—অন্য খরচ যা লাগে কর্ত্তামাই দিবেন।

মনে পড়ে সেদিন যখন প্রথম শিয়ালদা ষ্টেষনে নামিলাম—সম্মুখে সার্কুলার রোডের জন কোলাহল পরিপূর্ণ চিত্রটি আমার চোখের সামনে কেমন অনাস্বাদিত আনন্দের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল! বৈঠকখানা বাজারের পাশ দিয়া নির্দ্দিষ্ট বাসায় গিয়া উঠিলাম। কড়া ধরিয়া নাড়িতেই একটী নয় বছরের ফুটফুটে মেয়ে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। "আপনি কি সমীরবাবু?" বলিয়া সে তার সুনীল চোখ দু'টীর সরল চাউনিতে আমার কাছে স্নেহের দাবি করিয়া বসিল। বুঝিলাম ইঁহারাও আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি "হ্যাঁ" বলিতেই মেয়েটি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল, আনন্দাতিশয্যে তার বাবাকে টানিয়া আনিল "বাবা দেখ মাষ্টারবাবু আসিয়াছেন।" না বলিতেই বালিকার সরলতা বুঝাইয়া দিল আমাকে ইঁহাদের জন্য কি করিতে হইবে।

(২)

সন্ধ্যা হইতেই ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো হাস্য করিয়া উঠিল। দ্বিতলের দক্ষিণদিকের একটা নির্দ্দিষ্ট কোঠার সামনে বসিয়া বাড়ীর কথা—মায়ের কথা ভাবিতেছি, হয় ত একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও বাহির হইয়াছিল, আমি গ্যাসালোক উদ্ভাসিত জন কোলাহল মুখরিত পথের দিকে চাহিয়া আছি এমন সময় কানে আসিল সেই মেয়েটীর মিষ্টি ডাক "মাষ্টার মশাই!"

মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইলাম খুকীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন খুকীর মা। আমি উঠিয়া প্রণাম করিতেই "বেঁচে থাক বাবা", বলিয়া তিনি আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁর এই সস্নেহ বাবা ডাকে সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমার মাতৃস্নেহলোলুপ প্রাণটাকে বলিয়া দিল ইঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে হইবে। নানা কথার পরে তিনি বলিলেন "বাবা সমীর, এইটি হচ্ছেন আমাদের কনক চাঁপা, তুমি আসার পর থেকে বায়না ধরেছেন তোমার কাছে পড়বেন, সময় সময় ওর পড়াটা একটু বলে দিও। তা'বলে কিন্তু নিজের পড়ার ক্ষতি করো না।"

মেয়েটীর নাম চাঁপা। চাঁপার মতই নরম তার কচি প্রাণটি। চাঁপার অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ আমার বাড়ীর অভাব দূর করিয়াছিল; তার শিশু হৃদয়ের সরল আব্দার আমার প্রবাসী জীবনটাকে পূর্ণ করিয়া তুলিল। ছুটির দিনেও চাঁপা আমাকে ছুটি দিত না। তার দুপুরবেলার বায়না—হই। গল্প বলা, না বলিলেও মুস্কিল কঁদিয়া একটা অনর্থ করিয়া বসিত। তার ব্যবহারে মাঝে মাঝে বড় বিরক্ত বোধ হইত—আবার সে বিরক্ত না করিলেও কিছু ভাল লাগিত না। আজ মনে হয় সত্যই কি চাঁপার উপর বিরক্ত হইতাম!

দেখিতে দেখিতে দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল। চাঁপাও বড় হইল আমিও আইএ পাশ করিয়া বি-এ, পড়িতে লাগিলাম। বি-এ, পড়ার সময় আমার কেমন একটা 'কাব্যি' রোগ হইয়া পড়িল—আমি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময় চাঁপারও একটা নূতন বিদ্যার হাতে খড়ি হইল—সে সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করিল। আমিও নবীন সাধক সেও নবীনা সাধিকা আমাদের মিলল ভাল। আমার প্রত্যেকটী কবিতা চাঁপাকে না শুনাইলে ভাল লাগিত না; সে শুধু আমাকে একটি মাত্র উপহার দিত "বাঃ!"; ঐটুকুই যেন আমার মনে হইত কত আকাঙ্ক্ষিত। আবার সেও যখন যে গানটি শিখিত আমাকে না শুনাইয়া পারিত না, সঙ্গীতানভিজ্ঞ আমি বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে তার ললিত সুর লহরীর মধুর রাগিনী শুনিয়া যাইতাম। এমনি ভাবে যে কোথায় দিয়া কেমন ভাবে আমাদের সুদীর্ঘ ছয়টি বছর কাটিয়া গেল বুঝিতেও পারিলাম না। চাঁপাও আমার কাছে কোনদিন সঙ্কোচ প্রকাশ করে নাই, আমিও তাকে বেশ সহজভাবেই স্নেহ করিয়া আসিতেছিলাম। চাঁপা সেবার প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইল, আমি এম্ এতে উচ্চস্থান অধিকার করিলাম। অনেক চেষ্টার ফলে বাঙ্গালী জীবনের বড় আকাঙ্ক্ষিত অধম ব্যবসা ডেপুটিগিরী যোগাড় করিয়া বড় আশা বুকে বাঁধিয়া নবীন উৎসাহে কর্ম্মস্থলে চলিয়া আসিলাম আজ মনে পড়ে যখন চাঁপার কাছে শেষ বিদায় লইয়া আসিলাম তার চোখে এক ফোঁটা জল দেখিয়া আসিয়াছিলাম—তার গলার সুরটা যেন একটু ধরা ধরা মনে হইয়াছিল সে আমাকে বলিয়াছিল "আর কবে আরো আপনার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে। তখন কে জানিত চক্ষুর অন্তরালে অদৃষ্ট এমন নিষ্ঠুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে—কে জানিত বিধাতার নির্ম্মম বিচারে সেই হইয়া ছিল আমাদের চির বিদায়!

(৩)

এতদিন কাছে কাছে থাকিয়া যা বুঝি বুঝি করিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই—দূরে আসিয়াই সেইটাই বড় গভীর করিয়া মনে হইতে লাগিল। এখন বুঝিলাম চাঁপা আমার জীবনের কতখানি দখল করিয়া বসিয়াছিল চাঁপাকে আমি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম, এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম—সে আমার এত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাকে না আমার একটা দিনও কাটান অসম্ভব। কত চেষ্টা করিলাম কিছুতেই মনকে বুঝাইয়া উঠিতে পারিলাম না। ভালবাসা অন্ধ—অন্ধের মত চাঁপাকে চাহিল; বিরহ প্রেমের তুলাদণ্ড চাঁপার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

অনেক ভাবিয়া অবশেষে চাঁপাকে লেখিলাম—কি যে লেখিলাম সবটুকু নাই বলিলাম এইটুকু বলিলেই হইবে সে রাত্রি লেখেছিল "চাঁপা, এমন করিয়া যে জীবনের প্রতিকাজে তোমার অভাব তিল তিল করিয়া জুটিয়া উঠিবে তা কোন দিনই ভাবি নাই। তোমার পরিপূর্ণ প্রাণ লইয়া এই অপূর্ণ জীবনের অসমাপ্ততাকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে না?"

পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার দিন কাটিতে লাগিল আজ চাঁপা বুঝি লেখিবে "তুমি কি তোমার হৃদয় দিয়াই বুঝিতে পার নাই চাঁপার অন্তর-বীণা কোন সুরেতে বাজে?"

একদিন উত্তর আসিল,—সে উত্তর চাঁপার নয়, চাঁপার বাপের তিনি লেখিয়াছেন "সামনে ছুটি থাকিলে একবার দেখা করিয়া যাইবা কয়েকটি বিশেষ কথা আছে"। আনন্দে পরাণ পাগল হইয়া উঠিল, ভাবিলাম, চাঁপার মত আছে তাই সে পত্রের উত্তর নিজে দেয় নাই—হয়ত লজ্জায়; সে উত্তর তার বাপই দিয়াছে। এই বিশেষ কথা তা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

কত আশায় বুক বাঁধিয়া কলিকাতায় রওনা হইলাম। এই সেই শিয়ালদা—এই সেই সারকুলার রোড—এই সেই বৈঠক খানা বাজার সবই যেন আনন্দপূর্ণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল, আজ যেন আকাশে বাতাসে আনন্দের ধ্বনি ছড়াইয়া পরিতে লাগিল। যতই সেই

আমার শান্তিকুটীরের শান্তিলতার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম ততই যেন আনন্দে বুক আমার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

দরজার কড়া নাড়া দিতেই চাকরটা আসিয়া দরজা খুলিয়াছিল। আশাবিকম্পিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "বাবুলোক সব ভালা হ্যায় ?"

"জি"

"দিদিলোক ?"

"দিদি মণি ও হিঁয়া নেই বাবু সাব—পশ্চিম গিয়া।" বলিতে বলিতে সশব্দে চাকরটা বিশাল কপাটটা টানিয়াদিল, আমারও যেন বুকের অস্থি এমনি একটা শব্দের সঙ্গে ভাঙ্গিয়া গেল। যাকে কাছে পাইব বলিয়া—যারজন্য পাগল হইয়া ছুটিয়া আসিলাম সে সেখানে নাই ? তবে ইঁহারা ডাকিলেন কেন ?

সেদিনও ঠিক তেমনি সন্ধ্যা লাগিয়াছিল। ঘরে ঘরে বিদ্যুত্‌আলোক হাসিয়া উঠিয়াছে, রাস্তার গ্যাসের আলোতে জনস্রোত তেমনি অক্ষুন্ন গতিতে বহিয়া চলিয়াছে আমি সেই বারান্দাতেই বসিয়া আছি—ভাবিতেছি চাঁপার সুখ সাহচর্য্যে বিগত জীবনের ইতিহাস। এমন সময় সহসা পদ শব্দে ফিরিয়া দেখি চাঁপার মা। প্রণাম করিলাম সেদিনকার মত আজও আশীর্ব্বাদ করিলেন "বেঁচে থাক"; তবে সুরটা যেন কিছু অস্বাভাবিক গম্ভীর বলিয়া মনে হইল। আমি বলিলাম "আমাকে আসিতে লিখিয়াছিলেন ?"

"হ্যাঁ, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করব বলে ডাকিয়ে ছিলাম।"

আনন্দে আমি পাগল হইয়া উঠিলাম। চোখে মুখে যেন রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আমি বলিলাম "চাঁপা কি আমার পত্র পাইয়াছে ?"

"না সে তোমার পত্র পায় নাই—আর সে পত্রের জবাব তুমি আমার কাছেই পাবে" বলিয়া তিনি একটু থামিলেন; আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন "তুমি ডেপুটি হইলেও তোমার বাপ রমেশ ঘোষাল,—আমার মেয়েকে বিবাহ করিতে চাও কতখানি বাতুলতার পরিচায়ক সে তুমিই বোঝ। হাজার হইলেও কর্ত্তা "বংশ গৌরব" আছে ত।"

আমার সমস্ত বুক ভাঙ্গিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া সে কথার উত্তর করিল উঃ।" আজও সেই কথাটা মনে হয় "বংশ গৌরব"—কি ভীষণ! স্নেহ প্রেম কি কিছুই নয়? যাকে ভালবাসি সে আমারি, এজীবনে পাই বা না পাই, তাকে ভাল বাসিয়াই সুখ—ভাল বাসিয়াই যাইব।

র মাশ গুপ্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সময়ের স্রোত সমভাবে চলিয়াছে। কত আসিল--কত গেল—কত আসিবে—আবার অতীতে মিলাইয়া যাইবে—বিধাতার বিধানে এ অপ্রতিহত গতির বিরাম নাই! বিরাম নাই,—বিশ্রাম নাই—চলিয়াছে, চলিতেছিই কিন্তু কোথায়? এ গতির পরিণাম কি? ভাবিতেও তা' ভয় হয়,—আতঙ্কে মনপ্রাণ শিহরিয়া উঠে! অতীতের তুলনায় বর্ত্তমানকে মাপিতে গিয়া এ সভ্যতার যুগেও বুঝিতে পারি না কোথায় উন্নতি! আধিব্যাধি অন্নচিন্তা ক্রমেই যেন ক্লিষ্ট অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে,—আতঙ্কে আমরা এরূপ অস্থির যে উন্নত চিন্তার অবসর নাই—দেহটাই যেখানে রক্ষা হওয়া কঠিন, আপনাকে বাঁচাইতেই হিমসিম— সেখানে অন্যের কথা সমাজের চিন্তা যেন অসম্ভব! পৌষের শেষ তথাপি ম্যালেরিয়ায় হাড় কাঁপিতেছে,—নূতন ফসল হৈমন্তিক ধান্য আজ কোথায় আশার সঞ্চার করিবে—না তাহার অবস্থা দেখিয়া, এ বৎসরে কি করিয়া প্রাণ বাঁচিবে ভাবিয়াই অস্থির—নূতন চাউল পাঁচ টাকার উপর মন বিকাইতেছে—পাট কৃষকের আশা—তাহাতেও নিরাশ,—এ অবস্থায় আবার অন্য চিন্তা! আমাদের কি এ দৈন্যেই দিন কাটিবে—কালের গতি কি বাঙ্গলার জন্য অধোমুখে—এ গতি ফিরাইবে কিসে—ইহার শেষ হইবে কবে! যে সময় আসিতেছে তাহা কল্পনা করিতেই মন অসার অবসন্ন হইয়া মনে হয় সাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনার শেষ করি—হতাশ হৃদয়ে ইচ্ছা হয় না আর ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে! ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়া তবুও

ত চলিতেই হইবে—এ ভগ্ন দেহে প্রাণ যতদিন আছে। প্রাণহানির ত অবধি নাই। জন সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে—এরূপ হারে হ্রাস হইতে থাকে যদি—আর কতদিন টিকিয়া থাকিবে এ জাতি! নিয়তি? অদৃষ্টের দোহাই দিয়াই বাঙ্গলা মরিতেছে। অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল বাঙ্গলার 'বারো আনা' অবসন্ন মনে পড়িয়া আছে—বুঝি পড়িয়াই রহিবে—মরিয়া হইয়া পড়িয়া পড়িয়া মরিবে—আর মরিয়া হইয়া যাহারা অন্নসংস্থানের জন্য ছুটিয়াছে—তাহাদের পদভারে নিষ্পেষিত দলিত মথিত হইয়া মৃত্যু-যন্ত্রণাকে মূর্ত্ত করিয়া কোঁকাইয়া গোঙাইয়া কাঁদিবে—মরিলাম—অমো মারিল,—লুটিয়া লইল সকলে আমাদের ধন—সোনার দেশ—রত্নভাণ্ডার—সুখের সংসার ছারখার করিয়া দিল!

দেশ বিদেশীতে পূর্ণ হইয়া গেল,—সর্ব্ব কার্য্যেই বিদেশী,—ভৃত্য হইতে ব্যবসায়ী পর্য্যন্ত তাহারা—আর আমরা প্রভু, ক্রেতা,—দিতেই আছি—হইতে জানি না, এই দাঁড়াইয়াছে আমাদের গতি। সময়ের গ্রহের ফের আমাদের—আজ আমরা এমনি অধোমুখ—আধিব্যাধি অভাবের নিত্য সঙ্গী—আজ কি এ গতি ফিরাইবার চেষ্টা হইবে না? পৌষে ছিন্নকন্থার অন্তরালে কাঁপিব—না সংস্থানের উদ্দেশে উঠিয়া দাঁড়াইব—অঙ্গ সঞ্চালনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতিতে হইব উন্নত—রক্ত বহিবে ধমনীতে—স্ফূর্ত্তি আসিবে জীবনে—অনুর্ব্বর হইয়াছে যে ভূমি—আবার হইবে সসার। জগত জাগিল—নিজের অংশ কড়ায় গণ্ডায় গণিয়া লইল—ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অসভ্য ফিলিপাইন হইল স্বাস্থ্যাবাস—পানামা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পাইল পরিত্রাণ—আর আমার সোনার ভারত পরিণত হইল ম্যালেরিয়ার শ্মশানে! দোষ কাহার? বিধাতার!—না বিধাতার বিধানে,—স্বাস্থ্যনীতির নিয়মভঙ্গকারী দেশবাসীর? প্রতিদিন দেখিতেছি—অজ্ঞ দেশবাসী কিরূপে নিশ্চেষ্টভাবে মরণের মুখে আত্ম সমর্পণ করিতেছে—আত্ম ত্রাণের চেষ্টা একেবারে নাই! একদিন আমরা ট্যাঁস ফিরিঙ্গিকে এমন কি ইঙ্গপরিচ্ছদধারী কালা সাহেবটীকে পর্য্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিয়া ভূত ভয়ে ভীত কুসংস্কারগ্রস্তের মত আত্মাকে অবমাননা করিয়া ভীরু বাঙ্গালীতে পরিণত হইয়াছি, প্রশ্রয় দিয়া হইয়াছি পদানত, ভূতের প্রশংসার আসর জমাইয়া দেহমনকে করিয়াছি বিপন্ন, আজও তেমনি অন্নহীন স্বাস্থ্যহীন আমরা, আধি-ব্যাধি অভাবকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়াই রহিয়াছি মৃতের ন্যায়। ভুলিয়া গিয়াছি বিধাতার বিধানে আমাদের অভ্যন্তরে এমন একটি শাশ্বতবস্তু বর্ত্তমান যাহাকে অবলম্বন করিলে কোন ছার এই

সমস্ত আপদবিপদে আত্মনির্ভরশীল হইলে কতক্ষণ আর এ বিপদ! ম্যালেরিয়া রাক্ষস,—রক্তবীজের ঝাড় আক্রমণ করিয়াছে আমাদিগকে কিন্তু আমাদিগের অজ্ঞাত নাই ত সেই প্রাণধ্বংসকারী রাক্ষসের মরণ কোন্ অস্ত্রে! আমরা যদি স্ব স্ব গৃহকে, গ্রামকে নিজেদের চেষ্টায় এক একটি অভেদ্য দুর্গে পরিণত করিতে পারি, ম্যালেরিয়ার প্রাণমূলকে যদি উৎপাটন করিতে সমর্থ হই, নিজেদের পবিত্রতা রক্ষার সহিত গৃহের গ্রামের সমস্ত আবর্জ্জনা বিদূরিত করিয়া সুপেয় স্বাস্থ্যপ্রদ জীবন সলিলের ব্যবস্থা করিতে পারি তাহা হইলে ম্যালেরিয়ার অস্তিত্ব আর কতক্ষণ। ম্যালেরিয়ানাশ ঔষধের এ দেশে অভাব নাই—কত চাই—গুলঞ্চ, কালমেঘ ইত্যাদি ম্যালেরিয়ার কাল কিন্তু পথ্যের দুগ্ধের ব্যবস্থা কোথা! সে ব্যবস্থাও ত আমাদের হস্তে; গোবংশ উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে গো-চর ভূমির সংখ্যা ক্রমে কমিয়া যাওয়ায় ধ্বংস হইতে চলিল সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। বাঙ্গালীর দেহ রক্ষার জন্য—উপযুক্ত আহারীয় যাহা তাহার ব্যবস্থা ত সহজেই হইতে পারে। গ্রামের শুষ্ক জলাশয়গুলির সংস্কার হইলে সুপেয় জল ও মৎস্যের অভাব থাকে না। সে সমস্ত সার এক্ষণে উপেক্ষায় যত্রতত্র নষ্ট হইতেছে তাহা যদি উপযুক্ত স্থানে রক্ষিত ও সঞ্চিত হয় তাহা হইলে এই সকল আবর্জ্জনা যাহা আজ চেষ্টার অভাবে স্বাস্থ্যহানিকর অকেজো বলিয়া মনে হইতেছে তাহাই জমীর সাররূপে জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে ও ধনধান্যে সুখী করিবে বঙ্গবাসীকে, গো প্রভৃতির পশ্বাদির খাদ্যেরও অভাব থাকিবে না। কিন্তু সে চেষ্টা করে কে? আমরা যে নিশ্চেষ্ট, আমরা অদৃষ্টের দোহাই দিয়াই জীবনের শেষ করিতেছি; আমরা জীবন আহবে হটিব না ত হটিবে কে? দুর্দ্দান্ত শীত যে দেশে, বরফে আবৃত যে স্থান জন সংখ্যার তুলনায় যে দেশের ভূমি সংখ্যা অত্যল্প সেই ইংলণ্ড আজ সাধনার ফলে অন্নবস্ত্রে সমৃদ্ধ। কেন—তথায় একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত নিরর্থক নহে। কসাইখানার ক্লেদ মাংস শোণিত পর্য্যন্ত সে দেশের সাররূপে ব্যবহৃত। বিষ্ঠা সার রাজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ক্রমেই দেশের উৎপন্ন ফসলকে উন্নত করিতেছে আর আমাদের সোনার বাঙ্গলার অপর্য্যাপ্ত সার নষ্ট হইতেছে—যেখানে সেখানে। লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া মাতার অনুগ্রহকে যদি উপেক্ষা করা হয় তাহা হইলে মাতৃস্নেহ আর কয় দিন তাহাকে রক্ষা করিতে পারে। চয়নে উপনীত হইয়াছি আমরা, এখনও আত্মরক্ষায় চেষ্টা হইবে না

কি ? মাতৃকৃপা তদ্রূপ সমভাবেই বর্ত্তমান,—কেবল আমাদিগকে তাহা উপভোগ করিবার উপযুক্ত হওয়া চাই, তাহা হইলেই না আমাদের এ সময়ের গতি ফিরিবে—নতুবা যে তিমিরে—] সেই তিমিরেই।

কোচবিহার রাজ্য উৎকৃষ্ট তামাকের জন্য বিখ্যাত। কোচবিহারের তামাক সুদূর বর্ম্মার পর্য্যন্ত চুরুটের জন্য নীত হয়। কিন্তু নিজ কোচবিহারেই তামাকের পরিবর্ত্তে প্রচলিত হইতেছে আইফেনের আরকসিক্ত রাসাগ্রাসের রূপান্তর—অল্প মূল্যের সিগারেট। লণ্ডন ব্র্যাণ্ড সিগারেটের কাটতি এ রাজ্যের সর্ব্বত্র। পূর্ব্বে এ দেশের কৃষক নালি বর্জ্জিত তামাক কল্কিতে পুরিয়া ধূমপান করিত এখন তাহার পরিবর্ত্তে চলিতেছে এই সিগারেট। তামাক পাতা সিগারেট আকারে পরিণত করিতে পারিলে এখানে বোধ হয় এখনও এই রাসাগ্রাসের পরিবর্ত্তে চলিতে পারে। উৎকৃষ্ট সিগারেট হইলে ত কথাই নাই। এই অন্নসমস্যার দিনে এ চেষ্টা কি কেহ করিবেন না? একটু সস্তায় ইহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে সাফল্য সুনিশ্চিত। বাজারে দেখিতেছি সিগারেট কোম্পানীর এজেণ্ট সাহেবরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের সিগারেট কাটতির ব্যবস্থা করিতেছে, এই সময় কোন ধনী মহাজন এ গতির রোধ করিতে চেষ্টা করুন। এক, কোচবিহার সহরেই ষাট হাজার টাকার উপর বৎসরে সিগারেটের কাটতি হয়। কয়েক দিন এখানে বিড়ির প্রচলন দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে বিড়ি বাজারে নাই বলিলেই হয়। তামাক যতই অপকারীই হউক এ দেশে যখন তাহার ব্যবহার এত, তখন এই উৎকৃষ্ট তামাকপ্রসূ স্থানে তামাকের পরিবর্ত্তে বিষাক্ত রাসাগ্রাসের অবাধ কাটতি না হয় তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে হওয়া উচিত।

বিগত ২২শে ডিসেম্বর স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম-এ, মহোদয় ৩৩ বৎসর প্রশংসার সহিত কার্য্য করণান্তর অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যক্ষ সিংহ মহাশয় কেবল সুপণ্ডিত নহেন, তিনি নানা প্রকার মনুষ্যোচিত গুণে বিভূষিত।

এমন ধর্ম্মভীরু, সরল, নিরহঙ্কার ব্যক্তি কমই দেখা যায়। তিনি ধর্ম্মজীবনে যথেষ্ট অগ্রসর—প্রকৃত বৈষ্ণব। তাঁহার এ অবসরে তাঁহাকে ধর্ম্মজীবনে আরও অগ্রসর হইবার সুযোগ ও সুবিধা দান করিবে—কর্ম্মী নির্ঝঞ্ঝাটে ঐকান্তিক ভাবে পরমার্থসাধনে নিয়োজিত হইতে পারিবেন—ইহাই আমাদের শান্তি। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন এই প্রার্থনা।

বিগত ৮ই জানুয়ারী আমাদিগের চির প্রিয় স্বর্গগত মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ রাজোচিত সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর অতীত হইয়া গেল—আমরা হারাইয়াছি আমাদের এই মহাপ্রাণ নৃপতিকে। তিনি ছিলেন না—কেবল শাসক—তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যে, মধুর ব্যবহারে তিনি ছিলেন আমাদিগের পরম আত্মীয়—অপনার জন। আজ তাঁহার স্মৃতি নবভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে জাগরূক হইয়া অধিবাসীবর্গকে শোকাবেগে কাতর করিয়াছে। জগতে তিনিই ধন্য—যাঁহার অভাবে মানুষ যথার্থই অভাব অনুভব করে—আমাদের মহারাজ তাঁহার অসীম উদারতা দয়া দাক্ষিণ্য গুণে সেই স্থান বহু হৃদয়ে অধিকার করিয়া আছেন,—প্রেমের জয় সর্ব্বত্র—তিনি পরলোকে নিশ্চয়ই প্রেমময়ের ক্রোড়ে মহাশান্তিতে বিরাজ করিতেছেন—ইহাই আমাদিগের এ শোকে সান্ত্বনা।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
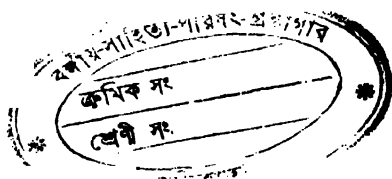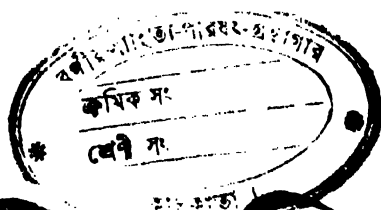
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৮ম বর্ষ। } মাঘ, ১৩৩০ সাল। { ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

রূপ-হীনা।

—:•:—

সুন্দর! ওগো, পূর্ণ ভুবনে
শূন্যতা কিগো আমার লাগি'—
অভিশাপ সম ঘিরিয়া ঘিরিয়া
রয়েছে নিয়ত ভুবনে জাগি'!
হে দয়াল-রাজ! একি বন্ধন?
অমিয়া-সিন্ধু করি' মন্থন,
সুধার ভাণ্ড দেখায়ে এখন
করিলে কি শুধু বিষের ভাগী?

প্রতিদিন শত মর্ম্ম-দহন
সতত নেহারি' আপন রূপ—
কত বিষধর চাপিয়া চাপিয়া
রেখেছি পুরি' এ দীর্ণ বুক !
পূজারিণী আমি নাহি উপচার—
অভাগিনী কেন জীবনের ভার ?
প্রাণ-হীন দেহ ল'য়ে বার বার
কিবা সুখ মম কিবা সুখ ?

মরমের কথা যদি না জানিবে
কেন দিলে ওগো জনম মোর ?
চির-সন্ধ্যায় কাটা'তে জীবন
অন্ধের সম রজনী-ভোর !
রক্তের প্রতি বিন্দুটী ঘিরি'—
বিষের দহন উঠিছে শিহরি'
ব্যথার ধারায় নিয়ত আবরি'
রচেছ কি নব ছলনা-ডোর ?

পূর্ব্ব জন্ম লালসার রাগে
কালিমা গড়িয়া নিপুণ করি'—
কত আকাঙ্ক্ষা, বাসনা নিঙারি'
কালকূট সাথে ল'য়েছ ভরি' !

গত জীবনের গরবের লাগি'—
হতাদর আজ রয়েছে কি জাগি' ?
দোষ কারো নয় যে যাহার ভাগী,
তাই তা'কে নিতে হবে যে বরি' !

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

রক্তাম্বরা।

—:o:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

স্বপ্নকথা।

নিষ্ঠুর-সত্য বড় তীব্র লাগিল। বিনোদকে এতদিন বন্ধু মনে করিয়া তাহার নিকট প্রাণের সকল কথা বলিয়াছি, সে প্রতিপদে আমার জীবন-নাট্যের রহস্য-যবনিকা সরাইবার চেষ্টায় বাধা দিয়াছে, সব জানিয়া শুনিয়া নিজের কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাকে আমার স্ত্রীর প্রকৃত পরিচয় পাইবার চেষ্টা হইতে বিরত করিয়াছে, মনে দারুণ ক্রোধ ও বিদ্বেষ জাগিল। অতিকষ্টে মনের ভাব দমন করিয়া বলিলাম "তুমি তাকে আগে চিন্‌তে ?"

বিনোদ নিতান্ত সপ্রতিভের ন্যায় বলিল "তোমার বর্ণনা মিলিয়ে চিন্‌লাম।"

বিনোদের কথা আমার বিশ্বাস হইল না কিন্তু কিছু বলিলাম না। বেলা তাহা হইলে কলিকাতাতে আগেই আসিয়াছিল এবং আমাকে সে চিনিতও। বোধ হয় সে আমার নূতন বাসার খবর না জানায় বিনোদের বাসাতেই খোঁজ করিতে গিয়াছিল। সে ত চাকরদের জিজ্ঞাসা করিতে পারিত। কেন করিল না ? বোধহয় সে বিনোদের সম্মুখে যাইতে নারাজ ?

আমি বিনোদের সহিত চা পান করিয়া সোজা রাণী নীরজার প্রাসাদ অভিমুখে চলিলাম। বিনোদ আমাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, পরে যাহা হয় তা যেন তাহাকে জানাই। আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম বটে কিন্তু বলিবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। প্রাসাদে যাইতেই ভৃত্য সমাদরে বসাইল এবং কয়েক মিনিট পরে বেলা আসিয়া বলিল "নীরজা বাজারে গেছে, এখুনি ফিরবে আপনি বসবেন কি ?" বলিয়া সে সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া পড়িল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আজ কেমন আছেন ?"

মৃদু হাসিয়া সে বলিল "একেবারে ভাল হ'য়ে গেছি।"

"কোন যন্ত্রণাই নেই ?"

আমি তাহার শুভ্র কোমল হাতটী নিজের হাতে লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলাম। সেই আধছায়া আধআলো প্রভাতে সবুজ রংএর রেশমের সাড়ীপরা কিশোরী তরুণীর ললিত দেহলতার সৌকুমার্য্য যেন বড় অভিনব বোধ হইতেছিল। শুভ্র ললাটে রেশমের মত সুন্দর উজ্জ্বল কৃষ্ণ কেশদাম ছবির মত সুন্দর দেখাইতেছিল। কোমল গণ্ডে রক্তিমা ফুটিয়া কি শোভার বিকাশ হইয়াছিল! ওষ্ঠাধর হাসির মাধুরী মাখিয়া যেন আপন গরবে ফাটিয়া পড়িতেছিল। সে রক্তিম অধর—কি সুন্দর কুসুমপেলব-কমনীয়! বলিতে কি তাহাকে মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমি তন্ময় হইয়া সে রূপশোভা দেখিতেছিলাম। এই আমার স্ত্রী! হঠাৎ চেতনা হইল সে ত জানে না আমি তার স্বামী, এ অশোভন তন্ময়তা তাহার নিকট বিসদৃশ লাগিতে পারে। আমার এ চমকিত ভাবে বেলা কিছু আশ্চর্য্য হইল। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম "হালদার আর আসেন নি ?"

"এসেছিলেন, আবার ওপরে গিয়ে মূর্চ্ছা যাবার মত হ'ল। নিজেই ওষুধ ইন্‌জেকসন ক'রে ভাল হলেন। তারপর কাকেও কিছু না বলে চলে গেলেন। অদ্ভুদ লোক।" বলিয়া বেলা হাসিল।

"তিনি যখন বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন কারো সঙ্গে কথা বলেন না, আচ্ছা আগে আর আপনার কখনো অমন অসুখ হয় নি ?" বেলা যেন একটু বিচলিত হইল, বলিল "কিছু দিন আগে হোয়েছিল। আমি সেদিন মূর্চ্ছিত হ'য়ে গিয়ে স্বপ্ন দেখি।" স্বপ্ন নয় ত—সে যেন জীবনের একটা সত্য ঘটনা!"

কি সে স্বপ্ন? বিবাহের দিনের কথা—কি সে?—সেও কি সম্ভব! স্বপ্ন কি সত্যি ঘটনার আভাস?"

"সে দিন আপনার কাছে আর কে ছিল?"

"আমার ত জ্ঞান ছিল না। ঠিক কে কে ছিল জানি না। যেন কোন স্বপ্নলোকে থেকে কথাবার্ত্তার সুরের রেশ ভেসে আস্‌ছিল। যেন পূজো হোল, কোন মহোৎসব হচ্ছিল।"

"কিসের উৎসব?"

বেলা শুষ্ককণ্ঠে বলিল "সে কল্পনা মাত্র।" তারপর মস্ত নেত্রে বলিল "বিবাহের উৎসব।"

"কার বিবাহ হোল? আপনার? কার সঙ্গে?"

"তা জানি না। দেখি নাই।"

"স্বর ত শুনেছিলেন? স্বর চেনেন না?"

"অতি অস্পষ্ট স্বর শুনেছিলাম। সে চেনা কঠিন।"

"নিশ্চয় জানেন সব কল্পনা?"

বেলা আশ্চর্য্য হইয়া আমার মুখের উপর দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া বলিল "আপনার কথা ত বুঝতে পারছি না। আপনি ত জানেন আমার বিয়ে হয় নি।"

সে দৃষ্টি আমায় নীরব করিল; আমি ক্ষমা চাহিয়া বলিলাম "দোষ হোয়েছে এমন প্রশ্ন করা। ক্ষমা কোরবেন না আমায়?"

"সে স্বপ্ন স্বপ্নই ছিল ডাক্তারবাবু। জেগে দেখি নীরজা পাশে বসে।"

"অসুখ কোথায় হোয়েছিল? সেখানে রাণী ছিলেন না?"

"না সে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে হোয়েছিল?"

"কার বাড়ীতে?"

"আপনি তাঁকে চেনেন না।"

"সে বাড়ীটি কি এখান থেকে অনেক দূরে?"

"হাঁ। মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে।"

তা'হলে বেলা সত্য কথাই বলিয়াছে। সে প্রতারণা করে নাই।

"কেমন ক'রে বাড়ী আস্‌লেন ?"

"আমি জানি না। সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিলাম।"

"সব লক্ষণ কালকের মত ছিল ?"

"হাঁ।"

"দু'জনেই নীরব রহিলাম। সেই নিস্তব্ধতার ভিতর দু'জনের বক্ষ-স্পন্দন শ্রুত হইতেছিল।

"ডাক্তারবাবু এ এক রহস্য। আমি মনে কোরলেই ব্যথা পাই।"

"স্বপ্নে বিয়ের কথা আপনাকে ব্যথা দেয় ?"

"হাঁ ঠিক ধরেছেন।"

"পুরোহিতকে দেখেছিলেন ?"

"না।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার হাসিয়া বলিল "আমি কি পাগল হোলাম ? স্বপ্ন কি সত্য হয় ? বৃথা আপনাকে এ সব কথা ব'লে বিরক্ত কোর্‌ছি।"

"না না ভাল কোরলেন ব'লে। কাল রাত্রের অসুখ কেন হোল বুঝতে পারবো।"

"নীরদা শুন্‌লে রাগ কোর্‌বে।"

"কেন ?"

"সে কাউকে এ কথা বোল্‌তে বারণ কোরেছিল।"

"কেন বলুন দেখি ?"

"জানি না তা। এ সব কথা থাক্।"

"কেন আমায় বিশ্বাস হয় না ?"

"নিশ্চয় বিশ্বাস করি আপনি আমাদের বন্ধু।"

"হাঁ তাই মনে কোরবেন, আমি সে কাল কাপড় পরা স্ত্রীলোকটির খোঁজ কোরব।"

"তাকে খোঁজ ক'রে তার কাছ থেকে কথা বের কোরবেন ?"

"হাঁ।"

"না না তা'হলে আপনার মৃত্যু নিশ্চিত। সে চেষ্টা কোরবেন না।"

"কেমন ক'রে জান্‌লেন? তাকে চেনেন আপনি?"

বেলা দৃঢ় স্বরে জানাইল সে চেনে না। আমি বলিলাম "তা' হলে রাণীকে জিজ্ঞাসা কোরব।"

"নীরলাকে?" তার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে যেন মর্ম্মাহত চাহিয়া রহিল।

পণ্ডিত নিজ গৃহে।

বেলাকে তদবস্থ দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেনইবা রাণী নীরলাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌ব না? আমার মনে হয় আপনার একজন প্রকৃত বন্ধুর দরকার আমাকে সে অধিকার দেবেন না কেন।"

"অধিকার দেব না? আপনি না হলে কাল রাত্রে আমার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল।"

"আমি জীবন দিতে পারতাম না, হালদারই আপনাকে বাঁচিয়েছেন।"

আমার এক একবার বেলাকে মেজর ও যতীন্দ্রনাথের রাণীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু বেলা পাছে আমাকে গুপ্তচর বলিয়া ঘৃণা করে তাই বলিতে পারিলাম না। সেই রাত্রের স ব কথাই আমার মনে পড়িতেছিল, বেলা বলিল মির্জ্জাপুরে তার বন্ধু থাকেন কে সে বন্ধু? আদিত্যমশাইবা বেলার কে? তিনিও ত মেজরের একজন সহচর। আর আজ আমার সম্মুখে এই যে সুন্দরী তরুণী তাদের এমন কি করিয়াছিল যে তাহারা উহাকে কবলে আনিয়া তাহাকে আমার সহিত বিবাহ দিল? আজ সে জানে না আমি তার স্বামী। সে আমাকে নিজের বিচিত্র স্বপ্নের কথা বলিয়া ফেলিয়া নীরলা পাছে জানিতে পারেন সেই ভয়েই অস্থির।

"রাণী নিরলা কি তাঁর জমিদারীতে ফিরে যাচ্ছেন?"

"তাই ত মনে হয়।"

"সেখানে কি আর কেউ যাবেন?"

"হাঁ অনেক লোক আস্‌বেন। সে খুব সুন্দর জায়গা। নীরলাকে বোল্‌ব আপনাকেও নিমন্ত্রণ করতে।"

"বেশ ত।"

টাকা পাওয়ার জন্য চিন্তা আর ছিল না। কাজেই গ্রীষ্মকালে কোথাও বেড়াইতে বাহির হইব ভাবিয়াছিলাম, বেলার কাছে থাকিতে পাইলে ভালই ত। আমি তাহাকে সব বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিব। নীরদাকে আমার কিন্তু ভয় হইত, তিনি ত প্রথমেই স্বামী-বশ করিবার ঔষধ চাহিবার ছলে আমার সহিত আলাপ করেন। নীরদা অতি চতুরা রমণী। সকল কার্য্যেই তিনি দক্ষ। অতিথিসৎকার ও কাঙ্গালী ভোজনের জন্য রাণী নীরদার নাম প্রসিদ্ধ। কিন্তু রমণীর অত চতুরতা আমার পছন্দ হয় না।

"আপনারা কবে এসেছেন এখানে ?"

"পরশু।"

"সকালে ?"

"না।"

"বিকেলে ?"

"হাঁ।"

তাহা হইলে রাণী সত্যি কথা বলেন নি। বেলার কথা যে সত্য তা বিনোদের কথা হইতে বুঝা যায়। কিন্তু বেলা কি বিনোদের চেনে ? আচ্ছা, মেজর ও আদিত্যমশায় দুজনেই ত আমার বিষয় সমুদয় জানিত ? আমি যে নিঃসম্বল অবস্থায় বিনোদের অতিথি হইয়াছিলাম তাহাও জানিত। বিনোদ কি এ খবর তাদের দিয়াছিল ? যাহা হউক বিনোদ কিছু জানে এ নিশ্চয়।

"পরশু বিনোদের বাসায় আমায় খুঁজতে গিয়েছিলেন ?"

বেলা সচকিতে বলিল "হাঁ আপনার খোঁজে গিয়েছিলাম কিন্তু কোন বাড়ীরই সামনে আপনার সাইনবোর্ড দেখতে পেলাম না।"

"আমি সেখানে থাকি না ত। সেত ডাক্তার বিনোদ রায়ের বাড়ী।

"আপনার নামের বদলে তাঁরই নাম ছিল বটে।"

"আমাকে দরকার ছিল কি ?"

"হাঁ শরীরটা তত ভাল ছিল না"

বেলার মুখ আরক্ত ও ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। "নীরদা ত জানতেন সে ডাক্তার রায়ের বাসা। আমি সেখানে অতিথি ছিলাম।"

"আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিনি।"

"আমার নূতন ঠিকানা ত রাণী ডাক্তার রায়ের কাছেই পেয়েছিলেন।"

"এখন আমিও জানি।"

আমি কথার পৃষ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার বন্ধু বিনোদকে আপনি দেখেছেন ?"

বেলা বেশ সহজ ভাবেই বলিল "না মনে ত হয় না।"

"জমাদার কতক্ষণ হোল এসেছিলেন ?"

"এক ঘণ্টা হবে। সেই ঘরটা বন্ধ করে তিনি চাবি সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন।" বলিয়া বেলা মধুর হাসিল। "কিছু বলেন নি ?"

"দশ বারটা ছাড়া ছাড়া কথা ছাড়া তিনি কিছু বলেন নি"

"এরকম ঘর নিয়ে এ বাড়ীতে থাকা মুস্কিল। আপনি বরাবর এখানেই থাকেন ?"

"হাঁ আমার বাবা মারা যাবার পর থেকে এখানেই আছি" তাহলে আদিত্য বেলার পিতা নহে। হায় সে মূহুর্ত্তে আমার ইচ্ছা হইতেছিল ওই একমুঠো ফুলের মত সুকুমারী তরুণীটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলে যে আমি তার স্বামী তাকে ভালবাসি, এবং চিরদিন ভালবাসিব। সতীশকে কি বেলা ভাল বাসে ? না আলাপ মাত্র ? হায় বেলা ! তোমাকে যদি আমার বলিবার অধিকার থাকিত ! মেজর কোথায় এখন ? সে বেলাকে তার সাহায্য করিতে বলিয়াছিল। কি কাজে তাকে জানে ? যাহা হউক কিছু খবর ত বেলার নিকট পাইলাম এখন মেজরকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার অতীতজীবনের ইতিহাস বলিতে বাধ্য করিতে হইবে। এই সব ভাবিতেছি এমন সময়ে রাণী নীরদা প্রবেশ করিয়া ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "উঃ ! কি গরম ! দেশে যেতে পারলে বাঁচি।"

"কবে যাবেন ?"

"আজ রাত্রেই, আমার স্বামী আপনাকে পেলে সুখী হবেন।"

বেলা বলিল "আমি ত তাই বলছিলাম। নীরদা ওঁকে ধরে নিয়ে চল ভাই।"

"আপনারা খুব অতিথিপরায়ণ বটে। কিন্তু আমার পশারটী যে মাটি হবে।"

"ছুটি ত নিতে পারেন। আপনার সেখানে কোন কষ্ট হবে না।"

আমি কয়েকদিন পরে যাইতে স্বীকৃত হওয়ায় বেলা হাসিমুখে গতবারের সব কথা আলোচনা করিতে লাগিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আমি উঠিলাম। বেলা নমস্কার করিয়া বলিল "কালকের সব ঘটনার কথা ভুলে যান, আশা করি শীঘ্র আবার দেখা পাব।"

আমি রাণীকে বলিলাম "আপনার অনুপস্থিতিতে ও ঘরে প্রবেশ করবার অধিকার হালদারকে দিয়াছেন ত ?"

"নিশ্চয়ই। ঘরের ভূত আর তাড়াতে চাইব না ? কে আর যমের মুখে থাক্‌তে চায় বলুন।"

"হাঁ হালদার যথাসাধ্য ভূত তাড়াতে চেষ্টা কোরবেন সন্দেহ নেই।" যাক্ শীঘ্রই রাণীর জমিদারীতে যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আমি বাহির হইয়া একটা ছোট হোটেলে কিছু আহার করিয়া হালদারের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। তিনি ঔষধ প্রস্তুত করিবার ঘরে গেঞ্জি গায়ে দিয়া ও মুখে নাকে ভিজে কাপড়ের পটি বাঁধিয়া আগুনের নিকট কাচের বাসনে কি প্রস্তুত করিতেছিলেন। সমস্ত ঘরময় একটা বিশ্রী গন্ধে ভরিয়া গিয়াছিল। আগুনের উপর নীলরংএর বিচিত্র শিখা উঠিতেছিল। প্রবেশ করিতেই তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আমি নিষেধ সত্ত্বেও প্রবেশ করায় আমার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে তাড়াতাড়ি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া নাকে দিলাম। চক্ষের নিমেষে রুমালটী কাড়িয়া লইয়া পার্শ্বের টেবিলে রক্ষিত একরকম ফিকে সবুজ রংএর তরল পদার্থে তিনি রুমালটী ভিজাইয়া আমার নাকে মুখে বেশ করিয়া জড়াইয়া দিলেন। তিনি যে কি পরীক্ষা করিতেছিলেন জানি না কিন্তু জাল দিতে দিতে সমস্ত ঔষধটিও খাইয়া আসিতেছিল আর তিনি ঔষধযুক্ত কাগজের টুক্‌রায় সেই ঘনকরা ঔষধ ফেলিয়া ফেলিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। একবার কাচের বাসনে ফেলিয়া তাহা জমাইয়া লইয়া অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলেন কিন্তু তাঁর পরীক্ষা যেন মনোমত হইল না। তিনি আবার একটা ঔষধ মিশাইয়া জাল দিলেন এবার সবুজ রংএর শিখা উঠিল। আবার জাল দিয়া কাচের পাত্রে ঢালিয়া রাখিয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন। বসিয়া আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাণীর নিকট গিয়েছিলে।"

"হাঁ আপনিও ত গিয়েছিলেন। কিছু বুঝলেন ?"

"কিছু' না।"

"এ কি পরীক্ষা কোর্‌লেন ? কালকের কিছুর সঙ্গে এর সংশ্রব নেই ?"

আছে, তবে খুব অল্প।"

"শুন্‌লাম আজও আপনার মূর্চ্ছার মত হয়েছিল ?"

"কালকের মত অত নয়।"

"কালকের মত ইনজেক্‌সনএ ভাল হ'লেন ?"

"কিন্তু তাতে ত আর রোগের কারণ বোঝা যাচ্ছে না।"

"হাঁ সে রমণীটির ত সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তাকে পেলে ত এখুনি সব পরিষ্কার হ'য়ে যায়।"

"রাণী আমাকে তাঁর জমীদারীতে নিমন্ত্রণ করেছেন আমি শীঘ্রই যাব, আপনার কি মনে হয় সেখানে গেলে একটা কিনারা হবে?"

"না কলিকাতা থাকলেই ভাল কোরতে। যদি কোথাও সে রমণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ত কলিকাতাতেই পাবে। আর এ রহস্য ভেদ কোরতে হলে আমাদের দুজনকে একসঙ্গে কাজ কোরতে হবে।"

"এ ব্যাপারের মধ্যে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য আছে। বেলাদেবীকে কেউ মেরে ফেল্‌তে চায় এ নিশ্চয় বেলাদেবীও সে রমণীকে চেনেন কিন্তু নাম বোল্‌ছেন না।"

"দেখি সেখানে গিয়ে যদি কিছু বের কোরতে পারি।"

"যদি কি! এখানেই একাজ ভাল কোরতে পারবে। বেলাদেবীর পরিচয় ত আমায় দাও নি?"

"ওঁর মা, বাবা মারা যাওয়ায় উনি ওঁর মামাত বোন রাণী নীরদার কাছে আছেন।"

"তা হলে ওঁর আপনার কেউ নেই? আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

"কেন এমন ভাবলেন?"

"আমার মনে হোল। ওঁর রাজা সতীশকুমারের সঙ্গে বিয়ে হবে?"

"কেমন ক'রে জানলেন?"

"দেখেশুনে বুঝলাম।"

"কেন?" তিনি শুধু একটু হাসিলেন।

আমি বুঝিলাম ডাক্তার হালদার অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। আমি কৌতুহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "রাণীর সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

"দুই বে নেই সত্য কথা বোলতে চান না। দুইজনকেই বিশ্বাস করা যায় না।"

"বেলাদেবীও সত্য গোপন কোরছেন।"

"হাঁ তিনি জানেন সে রমণীটি কে কিন্তু বোলবেন না। আমি তখন যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা তিনি জানেন কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন তিনি শুনিয়াছিলেন এবং নিজে

যাইয়া সে বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেও ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু হইয়া উঠে নাই। আমি বলিলাম "যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ এই যে রাণী নীরদা সে সময়ে সেখানে ছিলেন।"

"সেখানে ছিলেন ?"

"হাঁ।"

"বেলাদেবীও ছিলেন ?"

"তা ঠিক জানি না তবে রাণী নীরদা ও যতীন্দ্রনাথের রাণী প্রাণের বন্ধু।"

"তা হলে তোমার সন্দেহ হয় যে রাণী নীরদা যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বিষয় কিছু জানেন ?"

"তাই ত মনে হয়।"

"আমিও একটা কথা জানি তাতে সুবিধা হবে।"

"কি জানেন ?"

"সেই রমণীটিকে জান্‌তে পেরেছি।"

"সেই রমণীকে জানেন ? কি করে ? কে সে ?"

"তার নাম জহুরা।"

"জহুরা ? জহুরার সন্ধান আপনি পেয়েছেন ?"

"হাঁ তার সন্ধান পেয়েছি।"

"আমি জহুরা যে কে তা জানি না শুধু নাম জানি কিন্তু জহুরাকে তুমিও জান দেখ্‌ছি।"

"আমিও শুধু নামেই চিনি।"

তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না। আর তিনি যে কি করিয়া জহুরাকে জানিলেন সে কথা কিছুতেই বাহির করিতে পারিলাম না। আমি আরও এক ঘণ্টা তাঁর ঔষধ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া দেখিয়া বাড়ী ফিরিলাম। তারপর বাসায় ফিরিয়া যে ডাক্তারের জায়গায় কাজ করিতেছিলাম আর কাজ করিতে পারিব না বলিয়া তাঁহাকে চিঠি দিয়া আমার নিয়মিত দৈনিক রুগী দেখা কাজটিও সারিলাম। বাড়ী ফিরিয়া দেখি সেখানেও বিস্তর রুগী। যাহা হউক পাঁচ মিনিটে জলযোগ সারিয়া আবার দু' তিন ঘণ্টা ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিলাম মাকে আমার টাকা পাওয়ার কথা তারে জানাইলাম। এতদিনে আমারদুঃখিনী মায়ের কষ্ট ঘুচিল। অর্থের অভাব তাঁকে কম ভুগিতে হয় নাই, আমিও নিশ্চিন্ত হইয়া একমাস আমার প্রিয়তমার

কাছে থাকিতে পাইব। রাণী নীরজাকে আমার ভাল লাগে না। তাঁর স্বামী-বশ করিবার ঔষধ চাহিবার ছলে আমার সহিত আলাপ করিয়া নিজ সৌন্দর্য্য ও কথাবার্ত্তায় আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা আমার বড়ই বিসদৃশ লাগিয়াছিল। বেলার সরলতা ও সৌন্দর্য্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিয়াছিল। সে সুন্দর মুখখানি নিশিদিন দেখিবার অধিকার আমার কবে হইবে? যাহা হউক এক মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় রাজা হরনাথ দত্তর খাস প্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। রাজারাণী দুজনেই আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন। রাজা হরনাথ দত্ত বেশ সুপুরুষ ও সদাস্যবদন, তাঁহাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাঁর ব্যবহার অতি সরল ও অমায়িক। বাড়ীর বসিবার ঘরে অন্যান্য অতিথিরা নানা প্রকার খেলা ও গল্পে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরাও সকলে আসিয়া আমার সম্বর্দ্ধনা করিলেন বেলাও আসিয়া আমার নমস্কার করিল।

তারপর রাজা আমাকে অন্যান্য অতিথিদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। খানিক পরে আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটিতে গেলাম। ঘরটি অতি মনোরম। জানালা দিয়া দূরে মালার মত পাহাড়ের শ্রেণী ও রূপালী সলমার সূতোর মত পাহাড়ের জলবাহী নদীটি ও দুইপার্শ্বের সবুজ ধান্যক্ষেত্র ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। রাজবাড়ীর বেশীর ভাগ সাজসরঞ্জাম মোগলাই ফ্যাসনের। শীকারের সরঞ্জামও বিস্তর। শুনিলাম রাজা নিজে প্রসিদ্ধ শিকারী, রাণীও অস্ত্রধারণে সক্ষম। সন্ধ্যার সময় রাণী ও বেলা আমার নিকটে আসিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। বাড়াটি সমুদয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সকলেরই পোষাক সাদাসিধে কিন্তু বহুমূল্য। একটা জিনিষ বড় অদ্ভুত ঠেকিল বেলার গলা হইতে আমি বিবাহের রাত্রে যে রকম কবচ খুলিয়া লইয়াছিলাম ঠিক সেই রকম আর একটি দেখিলাম। ও কবচের এমন কি বিশেষ প্রয়োজন? না হ'লে আবার আর একটির দরকার কি! বেলার মুখে একটি প্রসন্নভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমার আগমনে সে যে খুসী হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আর অসুস্থ বোধ করিয়াছিল কি না আমি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "না বেশ ভালই আছি। ডাক্তার হালদার আর সে ঘরে গিয়েছিলেন কি?"

"জানি না, তিনি এ সব গোপন রাখেন। একটা কথা ছাড়া আমায় আর কিছুই বলেন নি।"

"কি কথা ।"

"যে স্ত্রীলোকটি আপনার সঙ্গে দেখা কোরতে গিয়েছিল তার পরিচয় তিনি পেয়েছেন।"

"কে সে?"

"জহুরা।"

"জহুরা!"

বেলার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল। মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। সে রুষ্ট বলিল "কেমন করে জানলেন তার নাম জহুরা?"

"তিনি আমায় আর কিছু বলেন নি। শুধু নাম বোলেছেন। হালদার অতি বিচিত্র লোক। তিনি বড় বড় ডিটেকটিভদেরও কান মলান্।"

"আমি নীরদাকে বলি গিয়ে।"

"আপনি জহুরাকে চেনেন?"

"চিনি! কেমন কোরে চিন্‌ব?"

"জহুরা ত আপনারই বন্ধুর কাছ থেকে খবর এনেছিল।"

"আমি ত জানতাম না যে এই জহুরা। স্বপ্নেও ভাবি নি।"

"আমি হালদারের কাছে যা শুন্‌লাম তাই বোল্‌ছি। জহুরার পরিচয় জানি না। মুসলমানী হবে বোধ হয়।"

"জহুরার আমার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যও কি হালদার জানেন?"

"বোধহয় না।"

বেলা যেন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করিল। তার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম সে এসম্বন্ধে আর আলোচনা করিতে ইচ্ছুক নয়। কাজেই আর কিছু বলিলাম না। এমন সময়ে রাজা তাস খেলিবার প্রস্তাব করিলেন। অনেকক্ষণ তাস খেলা গেল। বেলা খুব তাস খেলিতেও পারে। তারপর খানিক গল্প হইল। রাজা একটার মজার গল্প বলিলেন। তারপর রাণী আমার কাছে বসিয়া যত্ন পূর্ব্বক আহার করাইয়া রাত্রের মতন বিদায় দিলেন। ঘরে আসিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। এত যত্ন সত্বেও রাণীর ব্যবহার আমার ভাল লাগে নাই। তার

ভিতরে যেন কি উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা ছিল। তাঁর ব্যবহারে তেমন সরলতা ছিল না। শুইয়া শুইয়া ভাবিলাম নিমন্ত্রণ না গ্রহণ করিলেই ভাল হইত।

ঘটনাচক্র।

সে মাসটাও বেশ কাটিল। রঘুনাথ দত্তর পত্নী অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য নিত্যই নূতন বন্দোবস্ত করিতেন। কখনো গাড়ীতে কখনো মোটরে কখনো হাঁটিয়া বেড়াইবার আয়োজন হইত। কখনো শিকারে কখনো মাছধরায় কখনো নৌবিহারে কখনো বনভোজনে দিন কাটানো গেল। প্রায়ই বনভোজনে যাওয়া হইত। কোন কথা ভাবিবার অবসর ছিল না। রাত্রেই যা সময় পাওয়া যাইত। দিনের ক্লান্তি জনিত নিদ্রায় রাত্রিটা সুখেই কাটিত। সমস্তদিন যতদূর সম্ভব বেলার নিকটে নিকটে থাকিতাম। যাহাতে কেহ কিছু সন্দেহ না করে সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতাম। রাণীর চরিত্র বোঝা ভার এমন জটিল রমণী চরিত্র আমি জীবনে দেখি নাই। তিনি নানান ছলে আমায় বেলার নিকটে পাঠাইয়া দিতেন। সতীশের কথা আমি ভুলি নাই। বেলা সতীশের বাগদত্তা। আমি সতীশকে হিংসা করিতাম কিন্তু সে সেখানে না থাকায় কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। কতবার মনে হইত বেলাকে সব কথা খুলিয়া বলি, আবার মনে হইত বেলা যদি বিশ্বাস না করে রাগ করে তবে তার বন্ধুত্ব হইতেও বঞ্চিত হইব হালদারকে খবর জিজ্ঞাসা করিয়া চিঠি দিয়াছিলাম তিনি কোন উত্তর দেন নাই। বিনোদের একখানা চিঠি পাইয়াছিলাম কিন্তু তার বন্ধুত্বের উপর আস্থা না থাকায় উত্তর দেই নাই। একদিন সন্ধ্যাবেলায় রাণী নিজেই সেই ভূতের ঘরের কথা তুলিলেন "আমি আমার স্বামীকে সে ঘরের বিষয় এখনো কিছু বলিনি। কলিকাতা যাবার আগে আপনার বন্ধু কি কিছু কিনারা কোরতে পারতেন ব'লে বোধহয়?"

"যদি না করতে পারেন ত ঘরটি বন্ধ রাখাই ভাল। আপনার আর ডাক্তার হালদারের গুণে বেলাকে ফিরে পেয়েছি এই ঢের।"

"আমাকে কে ডাকাই কোরেছিলেন।"

"একমাত্র হালদার ছাড়া আর কারো এরূপ সরাবার সাধ্য নাই।"

সেদিন রাণীকে বড় বিবর্ণ ও চিন্তাক্লিষ্ট দেখাইতেছিল। তাঁর মুখে যেন কি বেদনার ছায়া। গোলাপী রংএর সাড়ী পরিয়া তিনি একটি ছোট মেয়ের মত বাগানের চাতালে

বসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ডাক্তারবাবু আপনার কোন রকম কষ্ট ত হচ্ছে না?"

"এখানে কষ্ট বোধ করার জন্য একমিনিটও ত সময় রাখেন নি।"

"হাঁ আপনি বেলাকে নিয়েই ব্যস্ত কিনা?"

"বেলাকে নিয়ে ব্যস্ত?"

"অস্বীকার করে কি লাভ? আমি কেন সকলেই ত জানে।"

"কি জানে?"

"আপনি বেলাকে ভালবাসেন।" আমি হাসিলাম মাত্র।

"আপনি অস্বীকার কোরতে চান করুন কিন্তু আমাকেও ঠকান মুস্কিল। আপনি নিশ্চয় বেলাকে ভালবাসেন।"

"আপনি আমার মনের ভাব আমার চেয়েও ভাল ক'রে জানেন দেখছি।"

"লোকের ব্যবহার থেকেই লোকের মনের ভাব বোঝা যায় তবে এতে আপনার বিশেষ অমঙ্গল।"

"অমঙ্গল? কেন? কথার মর্ম্ম বুঝিলাম না।"

"মর্ম্ম এই যে বেলাকে পাওয়া সম্ভব নয় আপনি যদি গোপন রাখেন ত বলি একটা কথা।"

"বলুন। অনেক কথাই ত গোপন রেখেছি।"

"বেলার বিয়ে হ'য়ে গেছে।"

"কার সঙ্গে?"

"তা বোলতে পারি না।"

"সতীশবাবুর সঙ্গে?"

"না, না।"

"কিন্তু বেলা ত তাঁর বাগ্‌দত্তা।"

"না, না কোন বাগ্‌দান হয় নাই। আসল কথা এই যে এতে আপনার কোন লাভ নাই।"

"আপনার কথা শুনে আশ্চর্য্য হোলাম"— কিন্তু আমার মুখের কথা শেষ না হোতেই বেলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বেলা বলিল "আমরা ভারি সুন্দর জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, সঙ্গে আরও দু'চারিজন মহিলা ছিলেন তাঁরাও আসিলেন কাজেই কথাবার্ত্তা স্থগিত রাখিতে হইল। তবে আমি জানিলাম যে বেলার কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে তাহা রাণী জানেন না। সেদিন আহারের পরে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইব দেখি বেলা একলা একটা চিঠি লিখিল, তারপর একজন দাসীকে একটাকা বকশিস দিয়া চিঠিটা তাহার হাতে দিল, তার পর জিজ্ঞাসা করিল "তিনি কি অপেক্ষা কোরছেন?"

"হাঁ দিদি।"

"বল আমি খানিক পরে দেখা কোরব আর এই চিঠিটা দাওগে।" বলিয়া পিছন ফিরিতেই আমাকে দেখিয়া যেন অপ্রস্তুত ও খানিকটা চিন্তিত হইয়া পড়িল। আমি যেন কিছু দেখি নাই এরকম ভাবে দেখাইয়া সরিয়া গেলাম। তারপর রোজকার মত তাস খেলা আরম্ভ হইল। বেলা সেদিন একটা নীচু গলার জামা পরিয়াছিল আমি তার বুকে সেই তিনটী হৃদয় একটী মালায় গাঁথা উল্কি দেখিতে পাইলাম। তাস খেলা শেষ হইলে লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া একটা বই পড়িয়া বেলাকে শুনাইতেছিলাম। বাহির হইতেই কেমন মাথা ঘুরিয়া গেল। পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেই বেলা আমার মাথাটি নিজের বাহুর উপর রাখিয়া ব্যস্তভাবে বার বার কি হইল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

"সেই সেদিনকার মত হোয়েছিল আপনাদের ভূতের ঘরের মত।"

"এখানে? ঠিক সেই রকম হোল?"

"হাঁ।"

তারপর দু'জনে বারান্দায় বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিলাম কথায় কথায় খবর জিজ্ঞাসা করিলাম "সতীশ কবে আসবেন?"

"তিনি কাশ্মীরে গেছেন এখানে ত নেই।"

"আপনাকে চিঠি লেখেন না?"

"না—আমাকে কেন লিখবেন?"

"আপনার সঙ্গে ত তাঁর বিয়ে।"

"কে বোলল?"
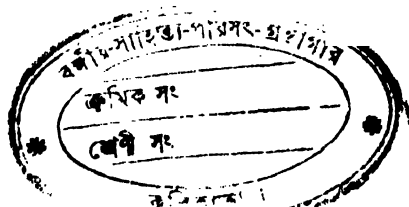
"কেন আপনি তাঁর বাগ্‌দত্তা নন্ ?"

"না যেমন আপনার সঙ্গে আলাপ তেমনি তাঁরও সঙ্গে আলাপ।"

"আর কিছু না ?"

"না আমার অন্তরে কিছু নেই, সব শূন্য।"

"কেন ? যার বাহির এত সুন্দর ভিতর তার শূন্য হইবে কেন ?"

"অন্যের পক্ষে এ কথা খাট্‌তে পারে কিন্তু আমার ভিতর পাষাণ। লোকের একদিন না একদিন ভালবাসার অধিকার আসে আমার কখনো আস্‌বে না।"

"কেন ?"

"সে আর কি বোল্‌ব ? আপনি আমার মনের কথা জান্‌তে চান কেন ?"

সে দিনকার মত সেখানেই শেষ হইল। রাত্রে শুইতে গিয়া ভাবিলাম বেলা কাহাকে চিঠি লিখিল জানিতে হইবে। ভাবিয়া নিজের ঘরে আলো জ্বালিয়া রাখিয়া বসিবার ঘরে যে ব্লটিং কাগজের উপর বেলা চিঠিখানি ছাপিয়াছিল সেখানি আনিতে গেলাম। ঘরের কাছাকাছি হইতেই অস্পষ্ট আওয়াজ শুনিলাম। নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলো ফাঁকের দরজার ভিতর দিয়া ঘরে প্রতিফলিত হইয়াছিল দেখিলাম কেহ দরজা খুলিল তারপর মৃদুপাদক্ষেপে সেই অন্ধকারে বাহিরে আসিল ও আমার দিকে অগ্রসর হইল। কাছে আসিতে দেখি আপাদ মস্তক কৃষ্ণবসনে মণ্ডিত। এইত জহুরা ! এখানে ? কি সর্ব্বনাশ !

কৃষ্ণবসনা রমণী।

আমি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। রমণী হলঘরের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন কি পরীক্ষা করিতেছিল আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহাই দেখিতেছিলাম। তারপর একটু পরে জ্ঞান হইলে আমি তাড়াতাড়ি একটা মস্ত বড় পামগাছেরসমেত জলচৌকির পিছনে লুকাইয়া পড়িলাম। জহুরা কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিল ? তাহার মুখে যেন কি এক প্রতিহিংসার ভাব ছিল হাতে একটা কি ছিল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। সে যে এরূপ নৈশভ্রমণে অভ্যস্ত তাহার চলাফেরা দেখিয়া বোঝা যাইতেছিল। কৃষ্ণবসনে আপাদ-মস্তক আবৃত হইয়া সে এত নিঃশব্দে চলাফেরা করিতেছিল যে দেখিয়া মনে হইতেছিল যে

মূর্ত্তি যেন হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ পরে রমণী আমার পার্শ্ব দিয়া আমাদের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। হায় কি হইবে। বাড়ীর সকলকে জাগাইব? মেজর দত্তর কথা না শোনাতে এখন জহুরা বেলার উপর প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছে। আমি কি করিব? যদি এখন সকলকে ডাকি তাহা হইলে বেলার সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। যাহা হউক আমিও নিঃশব্দে রমণীর পশ্চাতে চলিলাম। কিন্তু একি? সে যে আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। ওঃ! সে ভুল করিয়াছিল ওই যে বাহির হইয়া বেলার কক্ষের দিকে চলিল। এবার কেমন করিয়া আমার স্ত্রীকে রক্ষা করিব? ওই যে চাবি ঘুরাইয়া সে দ্বার খুলিল। এই ত সে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। তখন আমি দ্রুতপদে যাইয়া বাহির হইতে ধাক্কা দিলাম। কিন্তু জহুরা প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে চাবি বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও খুলিতে না পারিয়া কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। হঠাৎ মনে হইল এই সারির সব ঘরেরই এক রকম দরজা। আমার ঘরের চাবি ত তাহা হইলে এ ঘরে লাগিবে।

বেলার দ্বারের দিকে চোখ রাখিয়া আমার চাবিটি লইয়া আসিলাম লাগাইয়া ঘুরাইতেই দ্বার খুলিয়া গেল। কিন্তু এ আবার কি। ঘরে কেহ নাই। বাগানের দিকে একটী জানালা খোলা। বিছানা পরিষ্কার পাতা। কেহ সে বিছানায় শয়ন করে নাই। তবে কি বেলা জহুরাকেই অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিল? সে কি জহুরার সঙ্গেই গেল? আমি জানালা হইতে ঝুঁকিয়া দেখিলাম। জানালা হইতে একটি সিঁড়ি ঝুলিতেছে। বেলা ও জহুরা দুজনে ওই পথেই গিয়াছে। আমিও সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিলাম। একটি পথ বাগানের পিছনে জঙ্গলের দিকে গিয়াছে ও অন্যগুলি সামনের ফুলবাগানে গিয়াছে। আমি ভাবিলাম ফুলবাগানে গেলে বাড়ী হইতে দেখা যায় সুতরাং ফুলবাগানে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি জঙ্গলের পথ ধরিয়া চলিলাম। কান খাড়া করিয়া কথাবার্ত্তার শব্দ যদি শুনিতে পাই সে চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোথাও কোন চিহ্ন নাই। আমি পাহাড়ের নিকট গিয়া পড়িলাম তখনও কাহারো দেখা নাই তখন অগত্যা নদীর ধার দিয়া ফিরিয়া বড় রাস্তায় উঠিয়া সামনের ফুলবাগান ঘুরিয়া আবার সেই দড়ির সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম। জানালা খোলাই ছিল। সেই পথেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। সব তেমনি আছে। বেলাও ফেরে

নাই। হায় আমার প্রিয়তমা চিরজীবনের মত নিরুদ্দেশ হইল। আর কি সে ফিরিবে। রুগ্ন হৃদয় ক্লান্ত শরীরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলাম। আবার কেমন সেই রকম মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। হাত পা অবশ হইয়া গেল। হালদারের প্রদত্ত একশিশি ঔষধ আমি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। নিজেই প্রয়োগ করিলাম কিন্তু তা সত্বেও ধীরে ধীরে জ্ঞানলোপ হইল। প্রায় হু'ঘণ্টা পরে চেতনা হইলে চোখ মেলিয়া দেখি সকাল হইয়াছে। পার্শ্বের বারান্দায় দু'জন ভদ্রলোক বেড়াইতেছিলেন। তাঁদের কথাবার্ত্তাও শুনিতে পাইলাম। বিছানার দিকে চোখ ফিরাইতেই মনে পড়িল রাত্রে বিছানায় শুই নাই। তারপর একে একে রাত্রের সব কথা মনে পড়িল। তারপর একে একে ক্ষুদ্রার আগমন আমারও বেলার ঘরে প্রবেশ ও বেলার পলায়নের কথা মনে মনে আলোচনা করিলাম। ওই যে দু'জন লোক বেড়াইতেছেন ওঁরা ত বেলার ঘরের জানালা দেখিতে পাইতেছেন। ওঁরা অত নিশ্চিন্ত কেন? এখনো কোনরূপ গোলমাল হয় নাই কি? কেহ কি জানিতে পারে নাই? আমি আমার ঘরের বাগানের দিকের জানালা হইতে ঝুঁকিয়া দেখিলাম। দড়ির সিঁড়ি ত নাই। তবে বেলার অন্তর্দ্ধানের কথা এখন সকলে জানে। হায় কি করিয়া দিনের আনন্দ কোলাহলে যোগ দিব? আমাকে কাল রাত্রির ঘটনা ত রাণীকে বলিতে হইবে। নিতান্ত অনিচ্ছায় হাত মুখ ধুইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নীচে যাইবার সিঁড়ির দিকে চলিলাম। অনেকের সহিত দেখা হইল। সকলে কেমন নিশ্চিন্ত ও হাস্য মুখ। আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নীচে আহার করিতে গেলাম। ঘরে প্রবেশ করিতেই কে যেন মধুর কণ্ঠে বলিল "ডাক্তার রয় আবার কবে থেকে বেলা পর্য্যন্ত ঘুমতে শিখলেন? দিন দিন কুঁড়ে হ'য়ে পড়ছেন আপনি।" এই যে আমার প্রাণের সর্ব্বস্বধন আমার সম্মুখে। ভগবান তোমার অশেষ করুণা। বেলা যায় নাই। কোথাও লুকাইয়াছিল আমি বিস্ময়ে আনন্দে হতভম্ব হইয়া রাণীকে অভিবাদন করিতে ভুলিয়া গেলাম! স্বপ্নাবিষ্টের মত টলিতে টলিতে একটা আসন টানিয়া বসিয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ—

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

বাউল।

—:o:—

ওগো বাউল, পরদেশী—
একতারাটি বাজাও তোমার
মানস প্রিয়ায় অন্বেষি'!

কোন্ মানসের সরস নীরে,
মনের মরাল বেড়ায় ফিরে;
সুরের হাওয়া লুটিয়ে পড়ে
কাহার চরণ উদ্দেশি'?

রুদ্র তাহার তড়িৎ বাণে,
রক্ত-রাঙা বেদন হানে;
দুখের মদির তীব্র সুরা
পান কর যে নিঃশেষি!

অচিন্ দেশের অচিন্ পুরে,
যে গান বাজে মোহন সুরে;
বাজাও বাউল সে গান আজি
নিখিল-হৃদি' উন্মেষি'?

শ্রী সরোজ কুমার সেন।
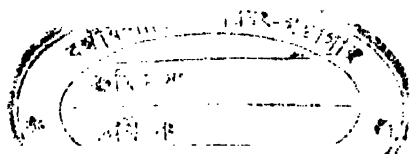
পেশী ও স্নায়ুর ধর্ম্ম ও গঠনে বালক ও বয়স্কদের পার্থক্য এবং শিক্ষায় ইহার তাৎপর্য্য।

পেশীমণ্ডলের পার্থক্য।

দেহের পেশীগুলির বৃদ্ধি ও উন্নতির সমস্ত নিয়মগুলি যদি কখনও সুপরিজ্ঞাত হয়, তাহা হইলে শিক্ষা বিজ্ঞানের তত্ত্বের দিকটা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পেশী সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই এখনও সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত। বালকদের পেশী সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে বয়স্কদের পেশী অপেক্ষা অনেক বিষয়েই পৃথক। একটী নবজাত শিশুর সমগ্র পেশী মণ্ডল তাহার দেহের ওজনের শতকরা ২৩·৪ ভাগ এবং বয়স্কদিগের পেশী তাহাদের দেহের ওজনের শতকরা ৪৩ ভাগ। বালকদের পেশীতে জলের ভাগ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী এবং কর্ম্ম সম্পাদনেও এই পেশীগুলি আরো নিকৃষ্ট। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পেশীগুলির বৃদ্ধির ধারাও পরস্পর সম্পূর্ণরূপে পৃথক। কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পেশী অথবা পেশী-চক্রের কোন একটী নির্দ্দিষ্ট অংশ বয়সের সহিত সমান গতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। প্রত্যেকের বৃদ্ধি রেখা মান (graph) দ্বারা প্রদর্শিত হইলে বৃদ্ধির ধারা বক্র রেখায় (curve) পরিণত হয়। পেশীগুলির শক্তি সম্বন্ধে এই সকল কথা যেমন সত্য, তাহাদের কর্ম্মসম্পাদনের যথার্থতা (accuracy), দক্ষতা, ও ক্ষিপ্রতা সম্বন্ধেও একই কথা বলা যাইতে পারে।

পেশীগুলির উন্নতি সম্বন্ধে কএকটী সারবান কথা বিশেষ ভাবে মনোযোগ আকর্ষণের উপযুক্ত। সর্ব্বাগ্রে প্রধান বা মুখ্য পেশীগুলিকে সজ্ঞানে ব্যবহার করার শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং তারপর ক্রমে ক্রমে অপ্রধান বা গৌণপেশীগুলি এইরূপ উন্নতি লাভ করে। পৈশিক উৎকর্ষের এই স্বাভাবিক ধারার ব্যত্যয় ঘটিলে সুফল লাভ হয় না। মুখ্য পেশীর উপর যথেষ্ট মনোযোগ না দিয়া যদি গৌণ পেশীগুলির অত্যধিক ব্যবহার হয়, তাহা হইলে স্নায়বিকতন্ত্রে লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরূপ স্নায়বিকতার লক্ষণ রোগ পরিচায়ক এবং অস্বাভাবিক অকাল

পরিপক্কত সূচক। অপর পক্ষে মুখ্য পেশীগুলিকে উপেক্ষা করিয়া গৌণ পেশীগুলির দিকে অত্যধিক মনোযোগ দিলে মুখ্য পেশীগুলির অতি বৃদ্ধি বশতঃ গৌণ পেশীগুলি রুগ্ন ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। পৈশিক শক্তি সম্বন্ধে এই তত্ত্বগুলি বিশেষ ভাবেই শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত। হস্ত শিক্ষা (manual training), বৃত্তি শিক্ষা (vocational training) বার্ত্তিক শিক্ষা (industrial training), অঙ্কন, লিখন, ক্রীড়া, ব্যায়াম, সঙ্গীত এবং এমন কি বিদ্যালয়ের সময় বিভাগ ও পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচনে এই সত্যগুলির ব্যবহারের উপযোগিতা সহজেই অনুমিত হইবে। যে সকল বিদ্যার জন্য খুব অল্প বয়স হইতে গৌণপেশী গুলির সূক্ষ্ম ও নিপুণ সন্নিবেশ (delicate Co-ordination) আবশ্যক, সে গুলি কুমার কালের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এই কারণেই ফ্রেবেলের উদ্ভাবিত সূচের দ্বারা ছিদ্র করিয়া পাতলা কাগজের উপর নানা প্রকার আকার উদ্ভাবন শৈশবের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তাহা শিক্ষার আরম্ভেই কলম, লেড্ পেন্সিল্ এবং শ্লেট পেন্সিলের সাহায্যে বর্ণমালার অক্ষর লিখন এই কারণেই অস্বাস্থ্যকর। হস্ত, আঙ্গুল ও চক্ষুর পেশীগুলি গৌন পেশী। যে কার্য্যে এগুলির সূক্ষ্ম সংযোগ আবশ্যক হয়, সে সকল কার্য্য শৈশবের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বালকেরা একদিকে যেমন নিজ নিজ বিদ্যালয় গৃহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপবেশন অবস্থায় থাকিয়া পদ, বাহু ও দেহকাণ্ডের বড় বড় পেশীগুলির উপযুক্ত সঞ্চালনের অবসর পায় না, অন্যদিকে তাহাদিগকে সেইরূপ পঠনের দ্বারা চক্ষু ও বাগিন্দ্রিয়ের এবং লিখনের দ্বারা হস্ত ও অঙ্গুলির গৌণ পেশীগুলিকে অত্যন্ত অধিক ব্যবহার করিতে হয়। মুখ্য পেশীগুলিকে অবহেলা করিয়া গৌণ পেশীগুলির এরূপ ব্যবহার শরীর ও মনের স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর উন্নতির পক্ষের একটী ভয়াবহ ব্যবস্থা। যদি উপবেশন মূলক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক অস্থি, প্রত্যেক পেশী, এবং প্রত্যেক অবশ্যিহার্য্য প্রধান প্রধান শরীর যন্ত্রের অবনতি সম্ভাবনা খুব অধিক। বালিকারা প্রায় সকল বয়সেই পেশী সামর্থ্যে এবং পেশীগুলির কর্ম্ম সম্পাদনের দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতায় বালকদের অপেক্ষা হীন। ইহাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফল। সাধারণতঃ মুষ্টি-পীড়ন শক্তির (Grip) পরিমাণের সাহায্যেই পৈশীক শক্তির পরিমাণ হয়। আমেরিকার বালিকারা এই শক্তিতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের

বালিকাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই ফিলিপিনো বালিকারা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিশ্রমী এবং তাহারা অধিকতর সময় খোলা জায়গায় জীবন যাপন করে। এই সকল তথ্য মনে রাখিলে আমাদের দেশের বালকদের জন্য উদ্ভাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের বালিকাদের কিরূপ উপযোগী তাহা ধারণা করা অসম্ভব হইবে না।

বুদ্ধির সহিত পৈশিক শক্তির সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু সাধারণ শক্তি সম্পন্ন বালক বালিকাদের ভিতর এরূপ চেষ্টার ফল অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর বিরোধী। তথাপি সর্ব্বত্রই দেখা গিয়াছে যে দুর্ব্বল বুদ্ধিরা সূক্ষ্ম পৈশিক শক্তিতে হীন এবং যে সকল বালক পাঠোন্নতির নিকৃষ্টতার জন্য নিম্ন বর্গেই স্থান পায় এবং যথা সময়ে বয়সোপযোগী বর্গে উন্নীত হয় না, তাহাদের গৌণ পেশীর সূক্ষ্ম শক্তির উন্নতি অত্যন্ত অনিশ্চিত। এই সকল তথ্য দ্বারা ধীশক্তিও গৌণ পেশীর সূক্ষ্ম শক্তির ভিতর কার্য্য কারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত না হইলেও তাহাদের ভিতর একটী অবিচ্ছেদ্য সহভাব বা সমবায় সম্বন্ধ (Coex is tence) থাকিতে পারে। একটী আর একটীর কারণ না হইলেও উভয়ে যে কোন এক গূঢ় কারণের দুইটী এককালিক বিভিন্ন প্রকাশ এরূপ অনুমান অযৌক্তিক বিবেচিত হইবে না।

দেখা গিয়াছে যে যেখানে বাহুর শক্তি অপেক্ষাকৃত হীন সেখানে বুদ্ধিও অপ্রচুর। একটী বাহুর উন্নতি কোন কোন স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ স্বাস্থ্যের উন্নতির ও মস্তিষ্কের পরিণতির অনুকূল বলিয়া মনে করেন না। এক হস্তের কুশলতার দ্বারা শরীরের দুই পার্শ্বের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, ফুস্ ফুসের একটী কোষ অপরটী অপেক্ষা দুর্ব্বল হয়, মেরুদণ্ড একপার্শ্বে বাঁকিয়া পড়ে, এবং উপবেশনভঙ্গী একইরূপ থাকিতে বাধ্য থাকায় চক্ষুর অপকার হয়। কিন্তু এক হস্ত কুশলতার সুফল এত বেশী যে সব্যসাচিত্বে প্রভাব মনুষ্য সমাজে কখনই গৃহীত হয়ও নাই এবং হইবেও না। দুর্ব্বল বুদ্ধিরা দুই হস্তের শক্তিতে অনেকটা সব্যসাচী; কিন্তু তাহদের এই সব্যসাচিত্বের অর্থ এই যে প্রকৃতি দেবীর নিকট হইতে তাহারা দুইটী বাম হস্ত লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের তথাকথিত দক্ষিণ হস্ত শক্তিতে বাম হস্তের মতই দুর্ব্বল। দুর্ব্বল বুদ্ধিদের দক্ষিণ হস্ত সাধারণ ও উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদের দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট।

স্নায়ুমণ্ডলের পার্থক্য।

স্নায়ুমণ্ডলের দেহযন্ত্রের কেন্দ্র স্বরূপ। সমস্ত শারীরিক কর্ম্ম ইহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ওজন ও আকারের অনুপাতে ইহার বৃদ্ধি অত্যন্ত বেশী। জন্মের সময়েই আকারে শিশুর মস্তিষ্ক পরিণত মস্তিষ্কের এক চতুর্থাংশ এবং ৭ বৎসর বয়সের সময় শতকরা ৯০ ভাগ। ইহার পর ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৃদ্ধির হার খুব অল্প, এবং কার্য্যতঃ এই বয়সেই মস্তিষ্কের বৃদ্ধি শেষ হয়। কিন্তু কেবল ওজনের দ্বারা শরীরের কোন অংশের পরিণতির ধারণা হয় না। এই কথা মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বিশেষ ভাবেই সত্য। পরিণত অবস্থায় মস্তিষ্কের গঠনে বিভিন্ন অংশের পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট। একটী বৃক্ষ যেমন নানা দিকে এবং নানা ভাবে অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দেয় মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কোষগুলিও সেইরূপ নানা দিকে ও নানা ভাবে স্নায়ুগণ প্রসারিত করে। জন্মের অনেক মাস পূর্ব্ব হইতেই মস্তিষ্কের কোষগুলি অপ্রকট অবস্থায় কণিকার আকারে বিদ্যমান থাকে, এবং খুব ধীরে ধীরেই ইহাদের উন্নতি হয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলতার পরীক্ষার জন্য গোল্জ (Golz) কতকটী কুকুরের মস্তিষ্ক কাটিয়া বাদ দিয়াছিলেন। ইহাতেও কুকুরগুলির স্নায়ুর ক্রিয়া একবারে বন্ধ হয় নাই। জন্মের সময় শিশুর মস্তিষ্ক এরূপ অনুন্নত থাকে যে ইহার স্নায়ুর ক্রিয়া অনেকটা গোল্জের মস্তিষ্কবিহীন কুকুরের মত। এই সময় মানব-শিশুর মধ্যেও কতকগুলি প্রতিক্ষিপ্ত (Reflex) স্নায়বিক ক্রিয়াই বিদ্যমান থাকে।

একটী কোষজ মজ্জাময় স্তরের (Medullary Sheath) উদ্ভবই মস্তিষ্কের পরিণতি সূচক। প্রথমে সংজ্ঞা চক্রে (Sensory Centres) এবং পরে আজ্ঞা চক্রে (Motor Centres) এই স্তরটি শীঘ্র শীঘ্র উৎপন্ন হয়, এবং ফ্লেচ্সিগ্ (Flechsig) যাহাকে প্রত্যয় বা সংস্কার চক্র (Association Centres) নামে অভিহিত করিয়াছেন মস্তিষ্কের সেই সম্মুখ ভাগে ইহার উদ্ভব হয় অপেক্ষাকৃত একটু দেরীতে। এই সংস্কার চক্রই মস্তিষ্কের বহিরাবরণের (Cortex) দুই তৃতীয়াংশ। মস্তিষ্কের কতকগুলি স্নায়ুতন্ত্র অন্তর্মুখীন (Afferent) ও বহির্মুখীন (Efferent) স্নায়ুগুলিকে আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করিয়া মস্তিষ্কের বহিরাবরণের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত রাখে। এই স্নায়ুগুলিকে স্পর্শশীলতন্ত্র

(Tangential fibres) বলা হয়। ইহারা তিনটী পৃথক গুচ্ছ বা স্তরে বিভক্ত। একটী স্তর আর একটী স্তরের উপর স্থাপিত এবং তিনটী স্তরই পরস্পর সংযুক্ত। প্রত্যেক স্তর উপরে উক্ত মজ্জাময় পদার্থ দ্বারা আবৃত হয়। কৈশোরের শেষ দিকেই ফেচ্‌সিগের সংস্কার চক্র এবং স্পর্শশীলতন্ত্র মধ্যান্তরটীর গুরুতর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং বোধ হয় ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এরূপ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। ঠিক এই সময়েই মানসিক শক্তির উন্নতিও খুব স্পষ্ট। এই জন্যই এই সময়ের পূর্ব্বে বালকবালিকাদের ভিতর বিচার শক্তি ও চরিত্রের উচ্চতম নৈতিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। বালকবালিকাদের বিবেচনা শক্তি ও দায়িত্ব জ্ঞানের অসদ্ভাব এবং মানসিক অপরিপক্কতা অভিজ্ঞতার অপ্রাচুর্য্যের ফল নয়—ইহার কারণটী বিশেষ ভাবেই ভৌতিক। মস্তিষ্কের কোষগুলি পরিপুষ্ট হইলে এবং ইহার বিভিন্ন অংশের জালের ন্যায় সংযোগ পরিবর্দ্ধিত হইলেই এই প্রকার উচ্চতর ও উচ্চতম মানসিক ও নৈতিক শক্তির স্ফুরণ সম্ভব হয়।

মস্তিষ্কের উন্নতির দিক দিয়া শিক্ষার কতকগুলি কঠিন সমস্যার পূরণ হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এক স্থানে স্থির ভাবে বসাইয়া রাখা একরূপ অসম্ভব। এরূপ চেষ্টা যদি সার্থক হয়, তাহা হইলেইও এটী একটী অসঙ্গত চেষ্টা। স্নায়ুমণ্ডলের উচ্চতর কেন্দ্রগুলির স্ফুরণ কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিলে শিক্ষার এই কঠিন সমস্যাটী আপনা হইতেই অন্তর্হিত হয়। এই উচ্চতর কেন্দ্রগুলি পরিস্ফুট হইলে বালকবালিকাদের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য নিবারণের শক্তি জন্মে। কোনরূপ উপদেশ না পাইলেও কিশোর বয়স্কেরা আবশ্যক হইলেই স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে পারে। এইরূপে সামান্য একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিলেই শিক্ষার অনেক কঠিন প্রশ্নের সমাধান হয়।

কিন্তু কেবল সময় ও ধৈর্য্য সকল বিষয়ে যথেষ্ট নয়। মস্তিষ্কের অব্যবহৃত কেন্দ্রগুলির নিয়মিত উন্নতি হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত কাহারো কাহারো এমন কি মস্তিষ্কের দর্শন ও শ্রবনকেন্দ্রগুলি শৈশবের অপরিপক্ক অবস্থায় রহিয়া যায়। ঐ স্থানের কোষগুলির আদিম অবস্থায় অপরিস্ফুট কণিকার আকারের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় না এবং এখান হইতে বহির্গত স্নায়ুর সংখ্যা থাকে অত্যন্ত অল্প। নানা প্রকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ক্রীড়া অপরিপক্ক বয়সের উপযোগী বিদ্যাচর্চ্চাই মস্তিষ্কের উন্নতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা মস্তিষ্কের রস সঞ্চালন ও পরিপোষণ ক্রিয়ার উন্নতি হয়, এবং ইহার ফলে মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতর বিকাশ এবং কর্ম্ম সম্পাদনের শ্রেষ্ঠতম উৎকর্ষ সম্ভব হয়। জরা মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু উক্তরূপ পরিণতির ফলে বার্দ্ধক্যজনিত মস্তিষ্কের ক্ষয় বোধ হয় কিছু দেরীতেই আরম্ভ হয়।

মানব করোটির মধ্যে মস্তিষ্কে যথাস্থানে ধারণ করিয়া রাখার নিমিত্ত যে বিধান তন্তুগুলি বিদ্যমান থাকে, ৫০ অথবা ৬০ বৎসর বয়সের পর এই অ-স্নায়বিক তন্তুগুলির মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্তুগুলিকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতে থাকে। ইহার ফলে মস্তিষ্কের কোষগুলিতে এক প্রকার হৈমবর্ণাভ পদার্থের উদ্ভব হয় এবং কোষগুলি শুষ্ক ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ভেকের স্নায়ুগ্রন্থির কোষগুলি (Ganglion cells) তড়িৎ দ্বারা অবসন্ন করিয়া ফেলিলে, ইহাদেরও ঠিক এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়। বার্দ্ধক্যে অনেক কোষ আবার একবারে ক্ষয় হইয়া শারীরিক আবর্জ্জনা রূপে বাহির হইয়া যায়। যাহারা বুদ্ধিজীবী তাহাদের এরূপ ক্ষয় আরম্ভ হয় কিছু বিলম্বে; কিন্তু যাহারা কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, অকালেই তাহাদের এরূপ ক্ষয় আরম্ভ হয়। মধ্য বয়স পর্য্যন্ত মস্তিষ্কের শক্তি-বৃদ্ধি হয় এবং মানসিক পরিশ্রমের ফলে মস্তিষ্কের ক্ষয় বিলম্বে আরম্ভ হয়—এই দুই কারণে বয়স্কদের জন্য শিক্ষা নানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, এবং যাহারা সমস্ত শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহাদিগকেও শিক্ষার অবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য। য়ুরোপ ও আমেরিকায় বয়স্ক-দিগের শিক্ষার নানা চেষ্টা সভ্যতার বর্ত্তমান আদর্শের উন্নতির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

শিক্ষার ভৌতিক ভিত্তি।

বিভিন্ন শারীর মণ্ডলের বিভিন্ন যন্ত্র অথবা একই তন্ত্র চক্রের পৃথক পৃথক অংশ পরস্পর তুলনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে শরীরের বৃদ্ধি সর্ব্বত্রই অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। যে দিকেই লক্ষ্য করা যাকনা কেন, কোথাও বৃদ্ধি বিষয়ে সমতা, সঙ্গতি ও সৌসামঞ্জস্যের লক্ষণ দেখা যাইবে না। হৃৎপিণ্ড ও ধমনীগুলির বৃদ্ধি পরস্পর সম্পূর্ণরূপে পৃথক। পদের পেশীর বৃদ্ধি একরূপ, অগ্রবাহুর পেশীর উন্নতি অন্য প্রকার। উত্তর অস্থি যে নিয়মে পরিবর্দ্ধিত হয়, প্রত্যঙ্গার অস্থির পরিবর্ত্তন ঠিক সেরূপ নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের বৃদ্ধির অভ্যুদয়কাল বা

সন্ধিক্ষণ পরস্পর সম্পূর্ণরূপে পৃথক। পদ ও দেহকাণ্ডের বৃদ্ধির তুলনা দ্বারা এই সত্যটী বেশ স্পষ্ট হইবে। দৈর্ঘ্যে প্রথম তিন বৎসর দেহ কাণ্ডের শতকরা বৃদ্ধি পদের এরূপ বৃদ্ধির দুই তৃতীয়াংশ, ৪ হইতে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক, ৭ হইতে ৯ বৎসর পর্য্যন্ত এক চতুর্থাংশ, এবং ১০ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত আবার অর্দ্ধেক। ৯ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত পদের এই অত্যধিক বৃদ্ধি যে দেহের সৌষ্ঠব নষ্ট করে কেবল তাহাই নহে, এরূপ বৃদ্ধির জন্য হৃৎপিণ্ড ও অপরাপর যন্ত্রের অতিরিক্ত পরিশ্রম আবশ্যক হয় বলিয়া ইহাদেরও অনিষ্ট ঘটে।

বালক বালিকাদের শারীর যন্ত্রগুলির আকার গঠন, ও কর্ম্ম সম্পাদন প্রণালীর অস্থায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। উন্নতি বা পরিণতির জন্য পরিবর্ত্তন বৃদ্ধিসূচক পরিবর্ত্তন অপেক্ষা অনেক প্রয়োজনীয়। বৃদ্ধি ওজন ও আকার সম্বন্ধে, কিন্তু পরিণতির লক্ষ্য শক্তি বিকাশ। শক্তির স্ফুরণ ভৌতিক আকার ও ওজন অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। শরীরিক বৃদ্ধি এবং শারীরিক পরিণতি ও পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। এই সকল নানা কারণে নি ক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এমন কথা কখনই বলা চলেনা যে বয়স্কদের পক্ষে যাহা উপযোগী বালকদিগের পক্ষেও তাহা স্বাস্থ্যকর। মন ও শরীর উভয়ের উন্নতির দিক দিয়াই বয়স্কদের স্বাস্থ্য তত্ত্ব ঠিক বালকদিগের স্বাস্থ্য তত্ত্ব নয়। বাল্যের স্বাস্থ্য বিধান জ্ঞান ও গবেষণার একটী বিশিষ্ট এবং পৃথক ক্ষেত্র রূপেও চর্চ্চিত হওয়া উচিত। শিক্ষার ভৌতিক ভিত্তি শিশু, বালক ও কিশোরদের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত এবং ইহার সাহায্যে শিক্ষার অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হয়।*

শ্রীমণীন্দ্র নাথ রায় এম, এ।

*The Hygiene of the School Child—Lewis M. Terman—Chapter V Some physiological Difference Between Children and Adults.

(Geoge. G. Hareap & Co ld.)

মুরলী

হে মুরলি ! ধন্য তুমি স্বার্থক জীবন,
লভিয়া দুর্লভ শ্যাম-তনু-পরশন
পুলক জেগেছে তব সারা অঙ্গ ভরি',
তাই তুমি নিশিদিন উঠিছ ফুকারি'—
শিখি যথা শ্যাম বর্ণ হেরিয়া অম্বর
পুলকে নাচায়ে পুচ্ছ করে কেকা স্বর।
যে অধর সুধা তরে কাঁদে মোর প্রাণ,
নিশি দিন সেই সুধা করিতেছ পান
শ্যামের অধর হ'তে। কঠিন মুরলি !
নিঠুর শ্যামের প্রাণ কেমনে ভুলালি !
কঠিন মুরলী আমি হইতাম যদি
ও অধর সুধা পান করি নিরবধি;
গোঠে মাঠে শ্যাম সাথে কদম্বেরি মূলে,
সার্থক জনম হ'তো যমুনারই কূলে।

বিজনে বসিয়া শ্যাম শুধায়—"মুরলি
রাধা নাম সেধে সেধে ধন্য তুই হলি।"

শ্রীরেণুকা দাসী

ইতিহাসে কালিদাস।

——:*:——

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পাটলিপুত্র অথবা উজ্জয়িনী ?

গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা যে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করিয়া তাঁহাদের বিশাল-সাম্রাজ্য শাসন করিতেন তাহা সর্ববাদি-সম্মত। অপরন্তু, তাঁহাদের রাজধানী যে পশ্চিম-মালবের প্রধান-নগরী উজ্জয়িনীতে ছিল না, তাহাও তাঁহাদের সম-সাময়িক প্রস্তরলিপি প্রভৃতি হইতে জানিতে পারা যায়। গত-প্রস্তাবে, সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের যে বিখ্যাত স্তম্ভলিপি হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে পাঠক-পাঠিকাগণ অবশ্যই দেখিয়াছেন যে তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তে অবস্থিত সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল এবং কর্ত্তৃপুর প্রভৃতি রাজ্যের সহিত মালব, অর্জ্জুনায়ন প্রভৃতি (স্তম্ভলিপির ২২শ পংক্তি.গত সংখ্যা পরিচারিকার ৯৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) দেশের রাজগণকেও তিনি সর্ব্বরূপ কর-প্রদান, আজ্ঞাপালন, প্রণাম ও তাঁহার সমীপে আগমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মালবের উজ্জয়িনী নগরীতে তাঁহার রাজধানী থাকিলে সে সময়ে মালবে অপর কোন রাজার অবস্থিতি এবং সেই রাজাকে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তস্থিত অন্যান্য রাজার সহিত কর-প্রদান প্রভৃতি অধীনতাব্যঞ্জক কার্য্য করিতে বাধ্যকরা সঙ্গত এবং সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। "পুষ্পাহ্বয়ে" অথবা পাটলিপুত্রে তাঁহার যে রাজধানী ছিল, তাহা উল্লিখিত স্তম্ভলিপির ১৪শ পংক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (যাঁহাকে কবি কালিদাসের আশ্রয়দাতা বিক্রমাদিত্য বলিয়া প্রচার করা হইতেছে) রাজধানী যে পাটলিপুত্রে ছিল, তাহা তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক কুল-ক্রমাগতসচিব, বীরসেন কবির "উদয়গিরি-গুহা-লিপি" হইতে ও সপ্রমাণ হয়। এ লিপি হইতে দেখা যায় যে "উক্ত সম্রাটের কুল-ক্রমাগত সচিব, সান্ধিবিগ্রহিক, শব্দার্থ-ন্যায়লোকজ্ঞ, কৌৎসশাব-কুলজ, পাটলিপুত্র নিবাসী কবি বীরসেন সম্রাটের দিগ্বিজয়

সহচর-স্বরূপে আসিয়া ভক্তিবশতঃ ভগবান্ শম্ভুর এই গুহা করাইয়াছেন (১)।" এই সম্রাটের "গঢ়োবা-শিলালিপি" হইতেও রাজধানী পাটলিপুত্রের নাম অবগত হওয়া যায় (২)। তবে, এই লিপির অন্যান্য অনেক অংশই কাল-প্রভাবে লুপ্ত এবং অপাঠ্য হইয়া পড়ায় এই নগরের নাম ভিন্ন আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

গুপ্ত সম্রাড্‌গণের রাজত্ব সময়ে মালবে (উজ্জয়িনীতে অথবা দশপুরে,—আধুনিক মন্দাশোর অথবা দশোর নগরে) বর্মবংশীয় রাজগণ যে রাজত্ব করিতেন, তাহা তাঁহাদের সমসাময়িক শিলালিপি হইতে সপ্রমাণ হইতেছে। গত প্রস্তাবে আমরা লিখিয়াছি যে পশ্চিম ভারতের প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ গুপ্তাব্দ খৃষ্টীয় ৩১৯—২০ অব্দে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া সার্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর সপ্রমাণ করিবার পর ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক সেই নির্ণয় সুগৃহীত হইয়াছে। মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তদেব (প্রথম) যে এই গুপ্তাব্দের প্রতিষ্ঠাতা, তাহাও প্রথম প্রস্তাবে আমরা বলিয়াছি। প্রস্তর-লিপির প্রমাণ হইতে গুপ্তবংশীয় সম্রাড্‌গণের এবং তাঁহাদের সম-সাময়িক মালব-সামন্তরাজগণের নাম ও সময় সঙ্কলন করত নিম্নে পাশাপাশি ভাবে রাখিতেছি :—

(১) "উদয়গিরি-গুহা-লিপি"—সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তদেবের সমসাময়িক।

(৩য় পংক্তি) "তস্য রাজাধিরাজর্ষেরচিন্ত্যো.........র্ম্মনঃ।
অন্বয়প্রাপ্তসাচীব্যো ব্যা(পৃতসন্)ধি-বিগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

(৪র্থ পংক্তি) কৌৎসশ্ শাব ইতিখ্যাতো বীরসেনঃ কুলাখ্যয়া।
শব্দার্থন্যায়লোকজ্ঞ×কবি×পাটলিপুত্রকঃ ॥ ৪ ॥

(৫ম পংক্তি) কৃৎস্নপৃথ্বীজয়ার্থেন রাজ্ঞেবেহ সহাগতঃ।
ভক্ত্যা ভগবতশ্ শম্ভোর্গুহামেতামকারয়ৎ ॥ ৫ ॥ *Fleet's Selected Gupta Inscriptions*, Inscription No. 6.

(২) *Ibid*, Inscription No. 7. Second part.

গুপ্তবংশীয় সম্রাট্--	মালবের সামন্তরাজ—
শ্রীচন্দ্র গুপ্ত দ্বিতীয় —(৩) (গুপ্তাব্দ ৫৬ হইতে ৯৩)	নরবর্ম্মা (গুপ্তাব্দ ৮৪) (৩)
|	|
শ্রীকুমারগুপ্ত (৪) (গুপ্তাব্দ ৯৩—১৩৫)	বিশ্ববর্ম্মা (গুপ্তাব্দ ১০৩) (৪)
|	|
শ্রীস্কন্দগুপ্ত (৫) (গুপ্তাব্দ ১৩৫—১৬০)	বন্ধুবর্ম্মা (গুপ্তাব্দ ১১৭) (সম্ভবতঃ বন্ধুবর্ম্মা, গুপ্তাব্দ ১৫২) (৪)

(৩) চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) মহারাজের সময়ে ৮২ গুপ্তাব্দে "উদয়গিরিতে" সনকানীক রাজ্যের সামন্ত এক গুহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। *Fleet's Selected Gupta Insriptions* No 3. ১ম পংক্তি —॥ "প্রবাসী" ১৩১০ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, লিখিত "শুশুনিয়ার পর্ব্বত লিপি" প্রবন্ধে উল্লিখিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-মহাশয়ের আবিষ্কৃত "মন্দাশোর লিপি।" ঐ লিপি হইতে জানা যায় যে দশপুরে ৮৪ গুপ্তাব্দে (৪৬১ বিক্রমাব্দে বা ৪০২ খৃষ্টাব্দে) নরবর্ম্মা নামক রাজা রাজত্ব করিতেন।

(৪) শ্রীকুমারগুপ্ত ৯৮ গুপ্তাব্দে, (*Vide* Flee's *Selected Gupta Inscriptions*, Insciption No 9 ২য় পংক্তি; ৯৬ গুপ্তাব্দে, (*Vide Ibid*, Inscription No 10 ৬ষ্ঠ পংক্তি) এবং ১২৯ গুপ্তাব্দে রাজ্য করিতেন। (*Vide Ibid*, Inscription No 11 ২য় পংক্তি।) উল্লিখিত দশপুররাজ নরবর্ম্মার পুত্র বিশ্ববর্ম্মার রাজত্বকালে, (গুপ্তাব্দ ১০৩) সম্রাট্ শ্রীকুমার-গুপ্তের সময়ে বিশ্ববর্ম্মার সচিব ময়ূরাক্ষের কত কগুলি কীর্ত্তির উল্লেখ আছে। (*Vide Ibid*, Inscription No 17, ৩য়, ৭ম এবং ১২শ পংক্তি)। উক্ত কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে (উক্ত বিশ্ববর্ম্মার পুত্র) সামন্তরাজ বন্ধুবর্ম্মার সময়ে মন্দাশোরের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ (১১৭ গুপ্তাব্দ, ৪৯৩ সং বং অথবা ৪৩৭ খৃষ্টাব্দ) এবং উহার সংস্কার (১৫২ গুপ্তাব্দে) হইয়াছিল। (Vide *Ibid*, Inscription No 18.) এইটি ৪৩ শ্লোক যুক্ত একখানি কাব্য-বিশেষ।

(৫) *Ibid*, Inscription No 14, 15 and 16.

এই সমসাময়িক সম্রাট্ এবং তাঁহাদের মালব-সামন্তরাজগণের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে গুপ্ত সম্রাড্গণের রাজধানী মালবের উজ্জয়িনী নগরে থাকিতে পারে না। গুপ্তরাজগণের আবির্ভাবের পূর্বে উজ্জয়িনী নগরে ক্ষত্রপ-রাজ রুদ্রদাম, তাঁহার পিতা জয়দাম এবং পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ চষ্টন রাজা করিয়া গিয়াছেন (৬)। উজ্জয়িনীর উত্তরে সুপ্রাচীন দশপুর নগরে (পশ্চিম মালবে) উল্লিখিত বর্ম্মবংশ প্রথমতঃ স্বাধীন ভাবে এবং পরে গুপ্তরাজগণের সামন্তরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন (৩)। সমুদ্রগুপ্তের সময়ে মালব সম্পূর্ণরূপে তাঁহার শাসনাধীনে আইসে নাই,—তাই মালবরাজ্যকে প্রত্যন্ত-দেশস্থ রাজ্য-সমূহের সহিত গণনা করা হইয়াছিল; পরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুর্জরদেশ পর্য্যন্ত জয় করার ফলে মালবের সমুদায় রাজাই তাঁহাদের সামন্ত-স্বরূপে রাজ্যশাসন করিতেন (৭)। একথা নিশ্চয়রূপেই বলা যাইতে পারে যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী কখনই উজ্জয়িনী নগরীতে ছিল না, পরন্তু পাটলিপুত্রে ছিল এবং কালিদাস তাঁহার আশ্রিত হইলে সম্রাটের সহিত তিনিও পাটলিপুত্র-বাসী ছিলেন।

এ স্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে গুপ্তরাজগণের প্রত্যেকের যে রাজ্য-সময় উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সংশয়-শূন্য কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। উক্ত সময় সংশয়শূন্য হউক আর না হউক, বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচনা সেজন্য কোনরূপ ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সময়-নির্ণয় নিতান্ত কঠিন ব্যাপার; বিশেষতঃ আমরা ঐতিহাসিক সময়তত্ত্বে (Historical Chronology) যেরূপ অনভিজ্ঞ, তাহাতে এ সম্বন্ধে পদে পদে প্রমাদের সম্ভাবনা। কোন বিশেষজ্ঞ পাঠক পাঠিকা এ সম্বন্ধে আমাদের কোন ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে পরম আপ্যায়িত এবং কৃতজ্ঞ বোধ করিব।

গুপ্তসম্রাটেরা যে মগধ, সাকেত এবং প্রয়াগ পর্য্যন্ত অনুগঙ্গ প্রদেশ ভোগ করিবেন এবং সৌরাষ্ট্র ও অবন্তি প্রভৃতি রাজ্য তাঁহাদের সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ শাসনাধীন হইবে না, তাহা

(৬) Dr. Bhandarkar's "*Early History of Dekkarn.*" pp 20-21.
(৭) *Ibid*, pp 100-101.

আমাদের প্রাচীন পৌরাণিক ভবিষ্যদ্বাণী হইতেও বুঝিতে পারা যায় (৮)। কালিদাসের কাব্যাবলীতে "পাটলিপুত্র" রাজধানীর বিবরণ কিরূপ পাওয়া যায়, তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি।

যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে একমাত্র "রঘুবংশ" কাব্য ভিন্ন আর কোনও কাব্য অথবা নাটকে পাটলিপুত্রের উল্লেখমাত্রও পাই নাই। তাঁহার "বিক্রমোর্বশী" নাটকের নায়ক পুরুরবার রাজধানী গঙ্গা-যমুনার পবিত্র সঙ্গমস্থানাবস্থিত "প্রতিষ্ঠান" (৯) নগরীর, "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্রের রাজধানী "বিদিশা" (১০) নগরীর এবং "অভিজ্ঞান-শাকুন্তলে"র নায়ক দুষ্মন্ত মহারাজের রাজধানী "হস্তিনা"র উল্লেখ আছে; অথচ অগ্নিমিত্রের পিতা শুঙ্গরাজবংশের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের (অথবা পুষ্পমিত্রের)

(৮) পুরাণে অতীত ঘটনাও ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদযোগে (লৃট্ লকার যোগে) বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণগুলি কলিযুগের প্রথমাংশেই প্রচারিত হইবার ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছে বলিয়া সেই ঐতিহ্য রক্ষা করিবার জন্যই ঐরূপ শৈলী (Style) অবলম্বিত হইয়াছে।

অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকেত-মগধাংস্তথা।

এতান্ জনপদান্ সর্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ॥ ৩৮৩॥ বায়ু পুরাণ, ৯৯ অধ্যায়।

সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্বুদমালবাঃ।

ব্রাত্যাদ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়াজনাধিপাঃ॥ ৩৮॥ শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশস্কন্ধ, ১ম অধ্যায়। বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৪শ অধ্যায়েও এইরূপ মর্মের বাক্যাবলী পাওয়া যায়।

(৯) "বিক্রমোর্বশী", দ্বিতীয় অঙ্ক। চিত্রলেখা সখী উর্বশীকে বলিতেছেন, "সখি, দেখ দেখ, ভগবতী ভাগীরথীর সহিত যমুনার মিলিত পুণ্য সলিলে প্রতিবিম্বিত প্রতিষ্ঠান নগরের শিরোমণিস্বরূপ রাজপ্রাসাদে আসিয়াছি।" এই নগর দক্ষিণাপথের শাতবাহন (অন্ধ্র) রাজগণের রাজধানী "প্রতিষ্ঠান" (পইঠ্ঠান) যে নহে, তাহা ত নিশ্চয়ই। প্রয়াগ হয়ত প্রতিষ্ঠানের সহিত অভেদ ছিল।

(১০) মালবিকাগ্নিমিত্র, চতুর্থ অঙ্ক।

রাজধানী পাটলিপুত্রের কোনও উল্লেখ ঐ মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে নাই। অথচ মৌর্য, শুঙ্গ, এবং কণ্ববংশীয় নৃপতিগণের সময়ে রাজধানী যে পাটলিপুত্রে ছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

"রঘুবংশের" ষষ্ঠসর্গে বিদর্ভ-রাজ-ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর বর্ণনার উপলক্ষে কালিদাস মগধরাজ পরন্তপের রাজধানী "পুষ্পপুরের" পরিচয় প্রদান করিয়াছেন (১১)। প্রসিদ্ধ আভিধানিক জৈন হেমচন্দ্র তাঁহার অভিধানে "পাটলিপুত্রের" নামান্তর "কুসুমপুর" বলিয়াছেন এবং বিশাখদত্ত কবির মুদ্রারাক্ষস নাটকেও পাটলিপুত্রের নামান্তর "কুসুমপুর" এবং "পুষ্পপুর" দেখিতে পাওয়া যায়। "রঘুবংশের" টীকাকার মল্লিনাথও কালিদাসোক্ত এই "পুষ্পপুর"কে পাটলিপুত্রই বলিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে কালিদাস ইন্দুমতীর প্রতিহাররক্ষী (দরওয়ানী বা Lady body guard) পুরুষের ন্যায় প্রগল্ভা সুনন্দার মুখে বলিয়াছেন "হে রাজকুমারি, যদি তুমি এই মগধেশ্বর পরন্তপ মহারাজকে বিবাহ কর, তাহা হইলে পুর-প্রবেশের সময়ে তুমি পুষ্পপুরের (পাটলিপুত্রের) প্রাসাদ-বাতায়ন-সমূহের নিকট অবস্থিত নাগরিকাগণের নেত্রোৎসব উৎপাদন করিবে—অর্থাৎ উক্ত নগরের রাজপথের দুইধারের বাড়ীর জানালা দিয়া নারীগণ তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিবে।" কবি এই একটিমাত্র শ্লোকের অর্দ্ধাংশে পাটলিপুত্রের এই পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, আর কিছুই বলেন নাই।

কালিদাস অবশ্যই পাটলিপুত্র নগরীর সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি এই "রঘুবংশের" সপ্তম সর্গের একটি শ্লোকে বর্ষার তরঙ্গ-সংকুল শোণনদের ভাগীরথী-প্রবেশের উল্লেখ করিয়াছেন। ইন্দুমতীকে বিবাহ করিবার পর রঘুরাজ-কুমার অজ সস্ত্রীক অযোধ্যা ফিরিতেছিলেন, পথে ইন্দুমতীলাভে হতাশ রাজগণ সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমণ করত

(১১) "অনেন চেদিচ্ছসি গৃহ্যমাণং পাণিং বরেণ্যেন কুরু প্রবেশে।
প্রাসাদ বাতায়ন-সংশ্রিতানাং নেত্রোৎসবং পুষ্পপুরাঙ্গনানাম্॥" ২৪॥
রঘুবংশ, ষষ্ঠসর্গ।

মহাভারত, হরিবংশ এবং মহাপুরাণাবলীর প্রসিদ্ধ রাজবংশাবলী খুঁজিয়া এই "পরন্তপ"কে পাওয়া যায় নাই।

রাজকন্যাকে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজকুমার অজ অগণ্য পিতৃ সৈন্যের সহিত সমাগত সচিবকে ইন্দুমতীর রক্ষার জন্য নিযুক্ত করত স্বয়ং একাকী প্রবল বিক্রমের সহিত সেই সম্মিলিত রাজ-সেনাকে আক্রমণ করিয়া অক্লেশে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া কবি কালিদাস বলিতেছেন, "বর্ষা কালে তরঙ্গভীষণ শোণনদ যেরূপ ভাবে ভাগীরথীকে আক্রমণ করে, (অর্থাৎ তাহার ভীষণ স্রোতোবেগে সে গঙ্গার সলিলরাশিকে যেরূপ পশ্চাতে হটাইয়া দেয়) কুমার অজ সেইরূপে মিলিত রাজসেনাকে আক্রমণ করিলেন" (১২)। শোণনদ যে পাটলিপুত্রের অনতিদূরেই গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহা আমরাও যেরূপ জানি, কবি কালিদাসও তদ্রূপই জানিতেন; অথবা খুব সম্ভব যে তিনি নিজের চক্ষুতেই বর্ষাকালে শোণের সলিলোচ্ছ্বাসের সেই ভীষণ সংগ্রাম দেখিয়াছিলেন। এখানেও তিনি "শোণনদের" এই উপমা ভিন্ন, পাটলিপুত্রের সহিত তাহার কোনও রূপ সম্পর্কের কথা বলেন নাই।

প্রাচীন ভারতে "পাটলিপুত্র" যে অতিশয় প্রসিদ্ধ মহানগরী ছিল তাহা স্বদেশী এবং বিদেশী বিবিধ প্রমাণ হইতে উপলব্ধ হয়। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান খৃষ্ট ৪০৭ অব্দে কয়েকজন সহযাত্রীর সহিত আসিয়া স্ব চক্ষুতে পাটলিপুত্রের ঐশ্বর্য দেখিয়া তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের পালিবোথ্রা বা পাটলিপুত্রের বর্ণনা ত উপকথার মত সুন্দর। এদেশের প্রাচীন গ্রন্থাবলীর মধ্যে বররুচি-কাত্যায়নের পাণিনি-সূত্র-বার্তিকে এবং পতঞ্জলিকৃত ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে পাটলিপুত্রের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। মৌর্য-চন্দ্রগুপ্তের মহামন্ত্রী চাণক্যরচিত "অর্থসূত্রে" পাটলিপুত্রের নাগরিক-শাসন-সংরক্ষণ-ব্যবস্থাদি বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। বাৎস্যায়ন-রচিত "কামসূত্রে"র উপক্রমণিকাতে লিখিত আছে যে পাটলিপুত্র নগরের গণিকা-গণের নিয়োগে "দত্তক" নামক বিদ্বান্ প্রাচীনতর শাস্ত্রকার "পাঞ্চাল বাভ্রব্যের" বিস্তীর্ণ গ্রন্থ হইতে "বৈশিক" অধ্যায়টি লইয়া পৃথগ্‌ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। কথাসরিৎসাগর হইতে পঞ্চতন্ত্র পর্যন্ত বিবিধ কথা-গ্রন্থেও পাটলিপুত্রের উল্লেখ দেখা যায়। তথাপি, গুপ্তরাজগণের পতনের পর এই নগরের প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ

---

(১২) "তস্যাঃ স রক্ষার্থমনল্পযোধমাদিশ্য পিত্র্যং সচিবং কুমারঃ।
প্রত্যগ্রহীৎ পার্থিববাহিনীং তাং ভাগীরথীং শোণ ইবোত্তরঙ্গঃ ॥ ৩৬ ॥"

জয় এবং রাজচক্রবর্ত্তী হর্ষবর্দ্ধনের সময় আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী কন্যাকুব্জ নগরে (কনৌজে) স্থাপিত হওয়ার পর পাটলিপুত্রের প্রভাব কমিতে থাকে এবং অবশেষে শোণনদের (অথবা শোণ এবং গঙ্গা উভয়েরই) প্রবল বন্যায় এবং অগ্নিতে উহা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায়। বহু কাল পর্য্যন্ত পাটলিপুত্র নগর কেবল কথা-শেষ অথবা নাম-শেষ হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দে বেহার (বিহার) প্রদেশের জায়গীরদারের সৌভাগ্যবান্ পুত্র সেরশাহ আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইয়া সুবিধাজনক বোধে শোণ-গণ্ডক-ভাগীরথী এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে নূতন "পাটনা" নগরের পত্তন করেন। এই "পাটনা" যে সেই প্রাচীন পাটলিপুত্র (অথবা গ্রীক পালিবোথরা) নগরের শ্মশানের উপর স্থাপিত হইল, তাহা সেরশাহ্ও জানিতেন না,—দেশের লোকেও জানিতেন না। খৃষ্টীয় ৬৩২ অব্দে য়োয়াঙ্ চোঙ্ ইহার ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিয়াছিলেন। পরে এমনই সম্পূর্ণভাবে সে কালের বিশ্ববিশ্রুত মহানগরীর স্মৃতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল যে সেই প্রাচীন পাটলিপুত্র কোথায় ছিল, তাহা বাহির করিতে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দই শেষ হইয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এলাহাবাদ, পাটনা এবং ভাগলপুর (প্রাচীন চম্পা, মালিনী অথবা চম্পামালিনী) এই নগর তিনটির (এমন কি কনৌজেরও) পক্ষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের দল ওকালতি লইয়া এই জন্য অনেক অনুসন্ধান, গ্রন্থরচনা এবং বাক্যব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের (D' Anville, Rennel, Wilford, Francklin ইত্যাদির) গবেষণাত্মিকা গ্রন্থাবলী এবং প্রবন্ধমালা এখন কেবল পাঠকগণের কৌতূহল-বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে মাত্র। সাধারণপাঠ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে কর্ণেল টডের "রাজস্থান" গ্রন্থে ভাগলপুরই প্রাচীন 'পালি-বোথরা' বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। যাহা হউক, অবশেষে পাটনার দাবীই অভ্রান্তভাবে জয়যুক্ত হইয়াছে এবং তাহার উপকণ্ঠস্থিত "কুমরাহার" গ্রামই যে এতদিন ধরিয়া প্রাচীন "পাটলিগ্রাম" অথবা "পাটলিপুত্রের" শ্মশানস্মৃতি বুকে করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। মৌর্য, শুঙ্গ, কণ্ব এবং গুপ্তরাজগণের সেই সুপ্রসিদ্ধ রাজধানীর কথা কালিদাস যে জানিতেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার সময়ে উহার প্রভাব, প্রাধান্য এবং প্রসিদ্ধি খুব অধিক ছিল কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। কেন, সেই কথা পরে বলিতেছি।

"পাটলিপুত্র" প্রাচীন হইলেও "অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী এবং দ্বারাবতী" অথবা "কুরুক্ষেত্র এবং গয়া"র মত প্রাচীন নহে। রামায়ণ এবং মহাভারতের কোনও স্থানেই" পাটলিপুত্রের উল্লেখ নাই,—থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। অতি প্রাচীন কালে "রাজগৃহ" অথবা "গিরিব্রজ" নগরই (আধুনিক রাজগির—বেহার বা বিহার উপবিভাগের মধ্যে) মগধের রাজধানী ছিল। তাহার পরে শিশুনাগ (অথবা শেষনাগ)-বংশীয় মগধরাজ উদায়ী (উদয়ন, উদাসী, অজয়, উদয়ী ইত্যাদি নামান্তর অথবা পাঠান্তর ও দেখা যায়) তাঁহার রাজ্যের চতুর্থ বৎসরে রাজধানী গিরিব্রজ হইতে গঙ্গার দক্ষিণ কূলে কুসুমপুর নামক নগরে লইয়া গিয়াছিলেন। পৌরাণিক প্রবাদ অনুসারে এই কুসুমপুর বা পুষ্পপুর (পাটলি পুত্র অথবা পাটলি পুত্র) নগর উক্ত উদয়ন রাজার সময়েই স্থাপিত হইয়াছিল (১৩); কিন্তু বৌদ্ধ-শাস্ত্রানুসারে দেখা যায় যে উহা উদায়ী বা উদয়নের পিতামহ অজাতশত্রু রাজার সময়ে, (ভগবান্ শাক্যবুদ্ধের জীবনের শেষাবস্থায়) বৈশালীর বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নির্মিত

(১৩) "উদায়ী ভবিতা যস্মাত্রয়স্ত্রিংশৎসমা নৃপঃ।
স বৈ পুরবরং রাজা পৃথিব্যাং কুসুমাহ্বয়ম্।
গঙ্গায়া দক্ষিণেকূলে চতুর্থেঽব্দে করিষ্যতি॥" ৩১২॥ বায়ুপুরাণ, ৯৯ তম অধ্যায়।

অর্থাৎ যাঁহা হইতে (উদায়ীর পিতা দর্শক অথবা বংশক) উদায়ী জন্মগ্রহণ করিয়া ৩৩ বৎসর রাজত্ব করিবেন; তিনি রাজ্যের চতুর্থ বৎসরে গঙ্গার দক্ষিণতীরে কুসুমপুর নামক নগর স্থাপন করিবেন।

"গার্গীসংহিতা" নামক (সংস্কৃত ভাষায়) প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থে নাকি লিখিত আছে,—

(ক) "ততঃ কলিযুগে রাজা শিশুনাগাত্মজো বলী।
উদয়ীর্নাম ধর্মাত্মা পৃথিব্যাং প্রথিতো গুণৈঃ॥
গঙ্গাতীরে স রাজর্ষি র্দক্ষিণে সমানাচরো ?।
স্থাপয়েন্নগরং রম্যং পুষ্পারামজনাকুলম্॥
তেঽথ পুষ্পপুরে রম্যে নগরে পাটলিসুতে।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি স্থাস্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥"

হইয়াছিল এবং ভগবান্ বুদ্ধ ঐ নগরীর সমৃদ্ধি, এবং অগ্নি, জল ও আভ্যন্তরিক ভেদবশতঃ নাশ, এই উভয় পরিণাম সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী ভগবানের মহাপরিনির্বাণের কিছু পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্বেই তিনি রাজগৃহ পরিত্যাগ করত উত্তর মুখে যাইতে যাইতে গঙ্গাপার হইবার অগ্রে গঙ্গাতীরস্থ পাটলি গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মগধরাজ অজাতশত্রুর মহামাত্যগণ ঐ পাটলিগ্রামে নগর সন্নিবেশ করিবার উপযোগী 'জরিপ' করিতেছিলেন এবং সেই সময়ে আনন্দের সহিত এ সম্বন্ধে তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহ্য আছে তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল (১৪)। গঙ্গাপার হইয়া ভগবান্ উত্তর মুখে শাক্যনগর কপিলবাস্তুর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন;

(খ) "ততঃ সাকেতমাক্রম্য পঞ্চালং মথুরাং তথা।
যবনাঃ দুষ্টবিক্রান্তাঃ প্রাপ্স্যন্তি কুসুমধ্বজম্॥
ততঃ পুষ্পপুরে প্রাপ্তে কর্দমে প্রোথিতে হিতে।
আকুলা বিষয়া সর্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥"

এই "গার্গী সংহিতা" গ্রন্থ দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই; (ক) চিহ্নিত অংশ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার-লিখিত "পাটলিপুত্র" শীর্ষক সন্দর্ভ হইতে এবং (খ) চিহ্নিত অংশ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার-লিখিত "মগধের সুঙ্গবংশ" শীর্ষক সন্দর্ভ হইতে "যথাদৃষ্টতথা" উদ্ধৃত। (ক) অংশ "মানসী ও মর্মবাণী" ১৩২৩, ফাল্গুন সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৩ এবং (খ) অংশ উক্ত পত্রিকার ১৩২৪, বৈশাখ সংখ্যা, ২৫৮ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত। Dr. H. Kern সম্পাদিত "বৃহৎ সংহিতা" গ্রন্থের (কলিকাতা, ১৮৬৫ খৃঃ সংস্করণ) উপক্রমণিকায় এই "গার্গী সংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং পুস্তকখানি এসিয়াটীক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে এখনও নাকি আছে। ডাক্তার কার্ণের মতে এই গার্গী সংহিতা আনুমানিক ৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের রচনা।

(১৪) বুদ্ধ। আয়ুস্মন্ আনন্দ যেন পাটলিগামো তেনুপসংকমিস্সামীতি।

আনন্দ। এবং ভন্তে।

কিন্তু পথে "পাবা" গ্রামের ধাতু্বর্ম্মী উপাসক চন্দ্রের গৃহে আতিথ্যগ্রহণ উপলক্ষে শুক শূকর-মাংসের ব্যঞ্জন খাইয়া তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন এবং কোনও গতিকে "কুশীনারা" অথবা "কুশীনগরের" সন্নিহিত শালবনে পৌঁছিয়া "মহাপরিনির্ব্বাণ" (মৃত্যু) লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বুদ্ধ-নির্ব্বাণের অল্প পূর্ব্বেই পাটলিপুত্র নগরের

বুদ্ধ। কো নু খু আনন্দ পাটলিগামে নগরং মাপেন্তি ইতি।

আনন্দ। সুনীধ বস্সকারা ভন্তে মগধমহামত্তা পাটলিগামে নগরং মাপেন্তি বজ্জিনং (বৃজ্জিনাং) পটিবাহায়।

বুদ্ধ। যাবতা আনন্দ অরিয়ং আয়তনং যাবতা বণিকপথো, ইদং অগ্গ নগরং ভবিস্সতি পাটলিপুত্তং পুটভেদনং পাটলিপুত্তস্স খো আনন্দ তয়ো অন্তরায়া ভবিস্সন্তি অগ্গিতো বা উদকতো বা (অব্ভন্তরতো) মিথু ভেদাবা'তি।

Digha Nikaya, Edited by T. W. Rhys Davis and I. E. Carpentor. London, 1903, Vol. II. pp 84—89.

And also, *Mahaparinibban Sutta*, Translated by Dr. Rhys Davis in the Sacred Books of the East Sereis, Vol. XI.

উপরিযুক্ত পালিভাষায় লিখিত বুদ্ধবাক্য হইতে জানা যায় যে তিনি বলিতেছেন যে, এই "পাটলিপুত্র নগর (পুটভেদন নগর, a town or city, অমরকোষ) কালক্রমে মহানগরী (অগ্রনগরী) হইবে কিন্তু অগ্নি জল অথবা আভ্যন্তরিক ভেদবশতঃ উহার ধ্বংস হইবে।" ডাক্তার স্পুনার সাহেবের খননের ফলে মৃত্তিকা নিম্নে যেরূপ ভস্মরাশি বহিষ্কৃত হইয়াছে এবং যেরূপভাবে প্রাচীন নগরটী মাটির নীচে পুতিয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুমান হয় যে জল-প্লাবন, এবং (যুদ্ধ অথবা অন্তর্বিদ্রোহের ফলে) অগ্নিদাহে নগরের ধ্বংস হইয়াছিল। বহুদিবস পরে পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ লোকলোচনের সম্মুখে আসিয়া ভগবানের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে "সেখ মিটিয়াগড়ি" নামক একটি পল্লীতে একটি পুকুর কাটিতে গিয়া ৮।১০ হাত মাটীর নীচে ইটের পুরাতন প্রাচীর এবং কাষ্ঠস্তম্ভের বেষ্টনী বাহির হইয়াছিল।

প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং তাহার কথা রামায়ণ অথবা মহাভারতের মত অতি প্রাচীন গ্রন্থে থাকিতেও পারে না। আরও বিশেষ কথা এই যে প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ নগরগুলির প্রায় সমস্তই বিদ্যাপীঠ, ধর্মপীঠ অথবা তীর্থস্থান বলিয়া পূজিত এবং প্রতিষ্ঠিত; পাটলিপুত্রের তদ্রূপ কোনও বিশেষ সম্মান এবং সৌভাগ্য না থাকায় এবং সে কেবল লৌকিক সুখ ও সুবিধাজনক ধন-জন-বাণিজ্য-বহুল রাজনগর মাত্র হওয়ায় ভারতীয় জন-সাধারণের স্মৃতি হইতে সে একান্তভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছিল। ভগবান্ যে ভবিষ্যদুক্তি করিয়াছিলেন,—অর্থাৎ জল এবং অগ্নির দ্বারাই পাটলিপুত্রের ধ্বংস হইবে, তাহা (গার্গী-সংহিতাকারের "কর্দম-প্রোথিত-পুষ্পপুরের" প্রবাদ হইতে দেখা যায়) সফল হইয়াছিল। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ৫০ অব্দের পূর্বেই একবার এই দৈবদুর্বিপাক বশতঃ (বন্যার কর্দম অথবা বালুকারাশির দ্বারা প্রোথিত হইয়া) উহার প্রভাব হ্রাস পাইয়া থাকিবে,—তাই কালিদাসের কাব্যে উহার বিশেষ সমৃদ্ধির কোনও বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, বুদ্ধনির্বাণ যে সময়েই হউক, রঘুবংশের অজ রাজার সময়ে যে উহার প্রতিষ্ঠা আদৌ হয় নাই, তাহা নিশ্চয়; এবং সেই হেতু "রঘুবংশ"-কাব্যে "পুষ্পপুর" অথবা "পাটলিপুত্র" নগরীর উল্লেখ আলঙ্কারিকগণের "কালবিপর্যয়" (Anachronism) রূপ দোষের দৃষ্টান্তস্বরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। রঘুরাজপুত্র অজের স্বয়ংবরসময়ে মগধেশ্বরের রাজধানী "রাজগৃহে" অথবা "গিরিব্রজে" ছিল, কিন্তু কবি তাহা না লিখিয়া "পাটলিপুত্র" লেখায় তাঁহার কাব্যে এই "কাল-বিপর্যয়" দোষ প্রবেশ করিয়াছে (১৫)।

(১৫) বুদ্ধ-নির্বাণ কোন সময়ে হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। ফা-হিয়ানের মতে ১০৯৭ খৃঃ পূঃ, চীন-দেশ-প্রচলিত মতে ৬৩৮ খৃঃ পূঃ, (পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রজীর মতও তাহাই) সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ-প্রচলিত মতে ৫৪৪ খৃষ্ট পূর্ব এবং সাহেবদের মতে (B. A. Smith) ৪৮৭ হইতে (Dr. Kern.) ৩৮৮ খৃষ্ট পূর্ব পর্যন্ত নয় দশটি ভিন্ন ভিন্ন সময় নিরূপিত হইয়াছে। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা প্রণীত "প্রাচীন-লিপি-মালা" নামক মূল্যবান্ গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে অনেক মত একত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

রঘুবংশ কাব্যে, পুষ্পপুর ব্যতীত অবন্তী, মাহিষ্মতী, মথুরা, কলিঙ্গনগর এবং উরগনগর (পাণ্ড্য দেশের রাজধানী) এই কয়টি নগরের উল্লেখ আছে (১৬)। তদ্ভিন্ন নাটক তিনখানিতে (শকুন্তলায় হস্তিনা, বিক্রমোর্বশীতে প্রতিষ্ঠান এবং মালবিকাতে বিদিশা) যে তিনটি নগরের উল্লেখ আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। "মেঘদূত" কাব্যে "বিদিশা", "উজ্জয়িনী" (অবন্তী) এবং "দশপুর" নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবন্তী অথবা উজ্জয়িনীর কথা আমরা পরে লিখিতেছি; এক্ষণে কেবল মথুরা, মাহিষ্মতী এবং কলিঙ্গ নগর সম্বন্ধে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে কবি উহাদের সম্বন্ধে পুষ্পপুর অথবা পাটলিপুত্রের মত কেবল নামোল্লেখ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হন নাই পরন্তু একটু করিয়া বিস্তৃত এবং হৃদয়গ্রাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। মথুরা-তট-বাহিনী নীল-সলিলা যমুনা নদী, নব-দূর্ব্বাদল-শ্যামল বৃন্দাবন এবং শৈলেয়-সুগন্ধ-বাসিত গোবর্দ্ধন গিরি-গুহা-গৃহের রমণীয় বর্ণনায় পাঠকের স্মৃতি সুরস এবং সুমধুর ভাব-কদম্বে পুলকিত হইয়া উঠে; মাহিষ্মতী নগরের প্রাকাররূপ নিতম্বের মেখলারূপিণী নর্ম্মদার জল-বেণী চুম্বিত প্রাসাদ-মালার মনোহর বর্ণনায় পাঠকের মন মুগ্ধ এবং কলিঙ্গ-নগর-বর্ণনায় উহার প্রাসাদ-বাতায়ন-সমূহ হইতে সুদৃশ্য সমুদ্র-বীচির ক্রীড়া, উহার উপকণ্ঠে সাগরতীরস্থ তালী-বনের মর্ম্মরধ্বনি এবং দ্বীপান্তর হইতে পবন-বাহিত লবঙ্গপুষ্পের সুগন্ধ পাঠকের অন্তরিন্দ্রিয়কে আকুল করিয়া তুলে। পাণ্ড্যরাজের উরগপুরের বর্ণনায় ও কবি তাম্বূল-বল্লী-পরিবেষ্টিত গুবাকবৃক্ষ-শ্রেণী, এলালতার আলিঙ্গন-বদ্ধ চন্দন-তরুরাজি, এবং তমালপত্র-ছায়া-সুভগ মলয়পর্ব্বতের উপত্যকাবলির অতি সুন্দর ছবি আঁকিয়া পাঠকের মানস-নেত্রের প্রচুর তৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছেন। অথচ, সেই কবিই কেবল একটি শ্লোকার্দ্ধে মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের, (বিক্রমাদিত্য ?) মহাসমৃদ্ধিশালিনী রাজধানী পাটলিপুত্র অথবা পুষ্পপুর নগরীর বর্ণনা সমাধা করিয়া দিয়াছেন! পাটলিপুত্রের প্রতি তাঁহার এইরূপ ব্যবহারের কথা ভাবিলে কি তাঁহাকে সেই নগরের অধিবাসী অথবা তাহার রাজার আশ্রিত

(১৬) "রঘুবংশ" ষষ্ঠসর্গের ৪৩শ শ্লোকে মাহিষ্মতীর, ৪৭শ হইতে ৫১তম পর্য্যন্ত শ্লোকে মথুরার, ৫৪তম হইতে ৫৭তম পর্য্যন্ত শ্লোকে কলিঙ্গনগরের এবং ৬৩তম হইতে ৬৪তম পর্য্যন্ত শ্লোকে পাণ্ড্যরাজধানী উরগপুরের বর্ণনা আছে।

রাজকবি বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয়? এই কথা পাঠকপাঠিকাবর্গের চিন্তার এবং বিচারের বিষয় বলিয়া এই প্রশ্ন তাঁহাদের সমীপে উপস্থাপিত করিতেছি।

সম্প্রতি অবন্তী অথবা উজ্জয়িনীর কথা আরম্ভ করিতেছি। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, মহাভারতে, হরিবংশে ও অন্যান্য মহাপুরাণে "অবন্তি"র উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনি ব্যাকরণেও "অবন্তী"র উল্লেখ আছে, উহা "দেশ" এবং "রাজাকে" (১৭) বুঝাইত, কিন্তু রাজধানী বুঝাইলে "অবন্তী" লেখা হইত, বোধ হয়। মহারাজ শূদ্রক-বিরচিত "মৃচ্ছকটিক" প্রকরণে (সামাজিক নাটকে) "অবন্তী" এবং "উজ্জয়িনী" একই নগরের পৃথক্ পৃথক্ নামস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্কন্দ পুরাণের ভবিষ্য-খণ্ডে লিখিত আছে যে "কলিযুগের ৩২৯০ বৎসর গত হইলে, (অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের ১৮৯ বৎসর পূর্বে) মহাশূর ও সিদ্ধসত্তম শূদ্রক নামক রাজা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন" (১৮)। "কাদম্বরী" কথাগ্রন্থের প্রবাদ অনুসারে এক শূদ্রক বিদিশা-(বর্তমান ভিলসা, ভোপাল রাজ্যে)-নগরে রাজত্ব করিতেন। কবি কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে "অবন্তি" নামই ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি "মেঘদূত" কাব্যে "অবন্তীন্" শব্দে (বহুবচন প্রয়োগে) দেশকে বুঝাইয়া "উজ্জয়িনী" এবং "বিশালা" শব্দের দ্বারা রাজধানীকে বুঝাইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ আভিধানিক

---

(১৭) বসুদেবের ভগিনী রাজ্যাধিদেবীকে অবন্তিরাজ বিবাহ করেন এবং তাঁহার বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে পুত্র জন্মে। ইঁহাদের বিষয় মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণগ্রন্থাবলীতে বর্ণিত আছে।

"স্ত্রিয়ামবন্তি-কুন্তি কুরুভ্যশ্চ" ॥ ১৭৪।৪।১ ॥" পাণিনি-সূত্র।

(১৮) "ত্রিষু বর্ষসহস্রেষু কলের্যাতেষু পার্থিব।
ত্রিশতে চ দশন্যূনে হ্যস্যাং ভুবি ভবিষ্যতি।
শূদ্রকো নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধসত্তমঃ ॥" বিদ্যাসাগর ধৃত।

Marriage of Hindu Widows, Chapter X, p 80. (Fifth or 1905 Edition).
পুরাণের এই সময়-নির্ণয় (কোন পোষক প্রমাণ অভাবে) সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিতে পারা যায় না।

যেমনও "উজ্জয়িনী" নগরের নামান্তর স্বরূপ "বিশালা, অবন্তী এবং পুষ্পকরণ্ডিনী" তিনটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং "উজ্জয়িনী অবন্তী এবং বিশালা" এই তিনটি নামই পশ্চিমমালব দেশের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানীকে বুঝাইবার জন্য সে কালে ব্যবহৃত হইত, এবং কালিদাসও সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

মহাকবি শূদ্রকের রচিত "মৃচ্ছকটিক" নাটকে "উজ্জয়িনী" অথবা "অবন্তী" পুরীর যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে, উহা যে সে কালে খুব প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ ছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। উজ্জয়িনী নগরে "মহাকাল" নামক সুবিখ্যাত ও সুপূজিত মহাদেবের অবস্থিতির জন্য উহা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছিল এবং উহার সম্বন্ধের জন্য স্কন্দপুরাণের একটি খণ্ডই রচিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সাতটি মোক্ষদায়িকা নগরীর মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই নগরী গণিত হইয়া আসিতেছে। আর্য-জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মতে (আধুনিক সময়ে ইংলণ্ডের গ্রীনউইচ নগর হইতে যেরূপ হইতেছে) এই উজ্জয়িনী-নগরী হইতেই পৃথিবীর দ্রাঘিমান্তর (Longitude) গণনা করা হইত। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমীর লিখিত বৃত্তান্ত এবং পুরাতন শিলালিপি প্রভৃতির প্রমাণে উজ্জয়িনী নগরে চষ্টন, তাঁহার পুত্র জয়দাম এবং পৌত্র রুদ্রদাম (ক্ষত্রপ অথবা মহাক্ষত্রপ) গুপ্ত অভ্যুদয়ের পূর্বে রাজত্ব করিতেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন (১৯)। তাঁহারা গুপ্ত অভ্যুদয়ের কতকাল পূর্বে অভিভূত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহারা জাতিতে গ্রীক (যবন), শক, পহ্লব অথবা আর কিছু

---

(১৯) গ্রীক ভৌগোলিক টলেমী ১৬৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে ১৫১ খৃষ্টাব্দের পর তাঁহার ভৌগোলিক-প্রস্তাব বা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইনি লিখিয়া গিয়াছেন যে উজ্জয়িনীতে Tiastenes নামক রাজা এবং পৈঠানে Siro Polemios নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। পণ্ডিতেরা প্রথমকে চষ্টন এবং দ্বিতীয়কে সিরি পুড়মায়ী (শ্রীপুলুমায়ি—অন্ধ্রবংশীয় গোতমীপুত্র শাতকর্ণি) বলিয়া সনাক্ত করিতে চাহিয়াছেন। (*Vide* Dr. R. G. Bhandarkar's "*Early History of Dekkan*", Section VI)। এই চষ্টন-বংশ "ক্ষত্রপ" এবং "মহাক্ষত্রপ" উপাধিভূষিত প্রাচীন পারসিক (জেন্দ অথবা আবস্তিক) ভাষায় "ক্ষত্রম্" শব্দের অর্থ "রাজ্যম্" অথবা "মুকুটম্" এবং "ক্ষত্রপা" "ক্ষত্রপাব", অথবা

ছিলেন, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতে পণ্ডিতে অনেক মত ভেদ আছে, (২০) এবং সে সকল মতের বিচারে সম্প্রতি আমাদের প্রয়োজন নাই। কালিদাসের উক্তি লইয়াই সম্প্রতি আমাদের আলোচনা চলিতেছে, এবং তাঁহার উক্তিই আমরা এইবার উপস্থিত করিতেছি।

কবি কালিদাস অবন্তী অথবা উজ্জয়িনী সম্বন্ধে "রঘুবংশ" এবং "মেঘদূত" কাব্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইবার উদ্ধৃত করিতেছি। উভয় পুস্তকের বর্ণনাত্মক শ্লোকগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ মাত্র তুলিয়া দিলাম, সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণ কৃপাপূর্বক মূল শ্লোকগুলি দেখিয়া লইবেন।

রঘুবংশ, ষষ্ঠ সর্গ। (ইন্দুমতী-স্বয়ংবর-প্রসঙ্গে)

"মহা-বাহু এ যুবক অবন্তী-ঈশ্বর,
সুগোল সুতনু কটি, বক্ষ সুবিশাল,
বিশ্ব-কর্মা-শাণচক্রে শাণিত ভাস্কর
যেন তেজে, শোভিছেন এই মহীপাল। ৩২।
"রণভূমে যান যবে অবন্তী-রাজন্,
অগ্রগামী-বাজি-রাজি-ক্ষুরপদ-ভরে
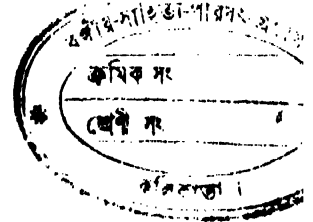
"ক্ষত্রপ" অর্থে সামন্ত-রাজ বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় "ক্ষত্রাৎ ত্রায়তে" এবং "ক্ষদতি, ক্ষতি জনান্" এই দুই বুৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ক্ষা+ত্রৈ+ড করিতে পারি কি? অথবা, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায়ও "ক্ষত্রম্" অর্থে পৃথিবী, রাজ্য ও রাজমুকুট বুঝাইত? গ্রীক ভাষায় Satrapes এবং মরাঠি ভাষায় "ছত্রপতি" ও এই "ক্ষত্রপ" বা "ক্ষত্রপা" শব্দের অর্থ অপভ্রংশজাত বলিয়া বোধহয়। প্রাচীন পারসীক ভাষায় "ক্ষত্রম্" শব্দের অর্থ Rawlinson's "*Five Great Monarchies*" Vol IV p 155 পাদটীকা হইতে আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

(২০) পৌরাণিক ভারতবর্ষের (India বা ভারতখণ্ডের নহে) উত্তর-পশ্চিমাংশে শক, যবন, পহ্লব, পারদ, কাম্বোজ, দরদ এবং হূণ প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর রাজন্যজাতির যে বাস ছিল, তাহার সংবাদ বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু, এবং হরিবংশ প্রভৃতি প্রাচীন পৌরাণিক গ্রন্থের নানাস্থানে পাওয়া যায়।

সমুত্থিত ধূলারাশি আবরে গগন,
সামন্ত-নৃপতি-শিরোমণি-তেজ হরে। ৩৩।

"মহাকালে নাম ধামে আছেন শঙ্কর
অলে যাঁর ভালে শশী, শীতল-কিরণে
উজলি অদূরে পুরী,—তাই নৃপবর
অসিত পক্ষেও জ্যোৎস্না ভুঞ্জে নারী-সনে। ৩৪।

"ইচ্ছা তব হয় কি গো ইন্দুনিভাননে,
বিহরিতে প্রেমভরে এ যুবার সনে,
শিপ্রা তরঙ্গিনী তীরে উদ্যান-মালায়
উর্মি-স্পর্শ-শীতবায়ু খেলিছে যথায় ?" ৩৫।

৺নবীনচন্দ্র দাস, এম. এ. কবিগুণাকর কৃত অনুবাদ।

মেঘদূত, পূর্বমেঘ। (প্রবাসী যক্ষকর্তৃক মেঘের পথ বর্ণনা,—মেঘকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে।)

"তুমি, জলধর, যাইবে উত্তরে,—
উজ্জয়িনী রয় যদিও সুদূরে ;
তবুও তাহার প্রাসাদ-শিখরে
লইতে বিশ্রাম, যেও সেই পুরে।

চপলা-চকিত-বিলোল-লোচনে
রমণীরা তথা হেরিবে তোমায়,
কি ফল তোমার এ ছার-জীবনে
সে সৌভাগ্য যদি না মিলে ধরায় ? ২৭।

"পশিয়া অবন্তি,—যথা বৃদ্ধগণ
উদয়ন-কথা অভিজ্ঞ সকলে,
পরে উজ্জয়িনী করিও গমন,—*
শোভায়, সম্পদে, অতুল ভূতলে ;
যেন ভোগশেষে স্বর্গবাসী নরে
ধরতে নামিয়া আসার সময়,
স্বর্গ একখণ্ড শেষ পুণ্য-বরে
এসেছেন লয়ে রম্যকান্তিময়। ৩০।

"তথায়,— কুল্ল-কমলের সৌরভ মাখিয়া
সুরভিত অতি শিপ্রা-সমীরণ,
প্রভাতে কেমন বহিয়া আনিয়া
মধুর অস্ফুট সারস-কূজন,—
অঙ্গ অনুকূল সুখদ-পরশে,
সোহাগে আদরে (যেন প্রিয়তম)
কত চাটুকথা কহিয়া হরষে
হরিছে নারীর বিলাসের শ্রম। ৩১।

"বাতায়ন-পথে হইয়া বাহির
কেশ-সংস্কারের গন্ধ-ধূম কত,
সুপুষ্ট করিবে তোমার শরীর, (২১)
নৃত্য উপহার দিবে শিখী যত।

* মূল শ্লোকে "উজ্জয়িনী"র পরিবর্তে "বিশালা"আছে, যথা—
"পূর্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্"

(২১) প্রাচীনকালে ভারতীয় মহিলারা (বিশেষতঃ শীতকালে, সামান্যতঃ সকল সময়েই) বিবিধ সুগন্ধ মশলা-সংযোগে প্রস্তুত ধূমবর্ত্তি (ধূপ) জ্বালাইয়া তাহার ধূঁয়া দ্বারা তাঁহাদের

সুন্দরী-চরণ-অলক্তে অঙ্কিত,
কুসুম-সুবাসে সদা আমোদিত,
গৃহে গৃহে শোভা করি দরশন,
সে প্রাসাদে ক'রো শ্রম-বিনোদন। ৩২।

"পরম পবিত্র ধরার উপরে
মহাকাল-ধাম,—যাও হে তথায়, (২২)
প্রমথেরগণ হেরিবে সাদরে
নীল-কণ্ঠ-ছাতি তব নীল কায় ;
তথা,—গন্ধবতী-জলে—কেলিরত
সুন্দরী-দেহের সৌরভ হরিয়ে
কমল-সুরভি অনিল সতত
কাঁপায়ে উদ্যান যেতেছে বহিয়ে। ৩৩।

"পশ যদি তুমি সে পূত-মন্দিরে
অন্য সময়েতে, (বলিহে তোমায়)
অপেক্ষায় তথা রহিবে সুস্থিরে
যতক্ষণ ভানু অস্ত নাহি যায়।
সন্ধ্যা-পূজাকালে তব গরজনে
করিও গম্ভীর পটহের ধ্বনি,
সে ধ্বনি পশিলে শিবের শ্রবণে
গর্জ্জনের ফল লভিবে তখনি। ৩৪।

কেশপাশ সুগন্ধি করিতেন। যক্ষ বলিতেছে, "অত্যুচ্চ সৌধাবলীর বাতায়নমার্গে বাহির্গত সেই সকল ধূম (সর্বদা বাহির হইতেছে এবং তুমি সেখানে গেলেই) তোমার দেহে মিশিয়া তোমার দেহপুষ্টি করিবে।" মেঘের দেহ যে "ধূম, জ্যোতিঃ, সলিল ও বায়ু"র সমবায়ে গঠিত তাহা কবি প্রথমেই (৫ম শ্লোকে) বলিয়াছেন।

(২২) উজ্জয়িনীর মহাকাল শিব-লিঙ্গ-দর্শন মানবমাত্রেরই পরম মঙ্গল-প্রদ। স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন,—

"আকাশে তারকং লিঙ্গং পাতালে হাটকেশ্বরম্।
মর্ত্ত্যলোকে মহাকালং দৃষ্ট্বা কামমবাপ্নুয়াৎ॥"

"বারনারীগণ, আরতির কালে,
চুনায় রতন-খচিত চামর,
নিতম্বে মেখলা বাজে তালে তালে,
শ্রমেতে অবশ সুকুমার কর।
নখ-ব্রণাঙ্কিত তাহাদের কায়ে
পড়িলে সলিল অতি সুখকর,
ভ্রমর-গঞ্জিত অপাঙ্গ হেলায়ে
হানিবে কটাক্ষ তোমার উপর। ৩৪। (২৩)
"আরম্ভিবে শিব তাণ্ডব যখন,
র'বে তুমি তাঁর ভুজতরু'-পরে,
তব নিম্নদেশ জবার বরণ
শোভিবে প্রদোষ-রক্ত-রবি-করে;
তখন মহেশ তাঁহার নর্ত্তনে
আর্দ্র গজাজিন না লবেন আর,
নির্ভয়ে ভবানী স্তিমিত নয়নে
হেরিবেন, সখে, ভকতি তোমার। ৩৬। (২৪)

---

(২৩) প্রাচীনকালে আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণাপথের সর্ব্বত্র বড় বড় শিব অথবা বিষ্ণু মন্দিরে দেব-বিগ্রহের সেবা ও প্রীতির জন্য "দেবদাসী" নামক একদল স্ত্রীলোক থাকিত। গৌড়বঙ্গের মহানগরী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের কার্ত্তিকের মন্দিরে, (রাজতরঙ্গিণী, জয়াপীড় বা জয়াদিত্য এবং কমলার উপাখ্যান) এবং বিজয়পুরের (দেবপাড়া, রাজসাহী) প্রদ্যুম্নেশ্বর-শিব-মন্দিরেও (বিজয়-সেন-প্রশস্তি, কবি উমাপতি ধরের লিখিত) অনেক দেবদাসী ছিল। এখনও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এবং দক্ষিণাপথের কোন কোন মন্দিরে দেবদাসীরা রীতিমত তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন।

(২৪) দশবাহু শিবের সদ্যোহত ও রুধিরাক্ত গজচর্ম্ম লইয়া তাণ্ডব নৃত্যের কথা স্মরণীয়। যথা—মৎস্যপুরাণ, ২৯৯ তম অধ্যায়, "নৃত্যন্ দশভুজঃ কার্য্যো গজচর্ম্মধরস্তথা।" ১১।

"তামসী রজনী,—চলে না নয়ন,
সূচিভেদ্য ঘোর নিবিড় আঁধার ;
বিলাসিনীগণ করিবে গমন
রাজপথ দিয়া বল্লভ-আগার ;
নিকষে কনক-রেখার মতন
মৃদুল-তড়িতে পথ দেখাইবে ;
করো না গর্জন, করো না বর্ষণ,
অবলা তাহারা ভয়েতে মরিবে। ৩৭।
"তব প্রিয়তমা চপলা-সুন্দরী
হ'বে ক্লান্ত যবে সুচির-স্ফুরণে,
লভিও বিশ্রাম প্রাসাদ-উপরি,
সুখ-সুপ্ত যথা পারাবত-গণে ;
উদিলে তপন পূরব গগনে
শেষ পথটুকু করিও গমন,
সুহৃদের কাজে সুহৃদ, ভুবনে,
তিল-মাত্র হেলা না করে কখন। ৩৮।"

প্রবন্ধ-লেখক কৃত অনুবাদ ; (মেঘদূত, ৩১—৪১ পৃষ্ঠা)।

উজ্জয়িনী নগর অতিক্রম করিয়া উত্তরদিকে প্রথমতঃগম্ভীরা নদীর বর্ণনা ; তাহারই পর পশ্চিম-মালবের অন্যতর প্রসিদ্ধ নগর "দশপুরের" কথা কবি কহিয়াছেন। এই দশপুর নগরও অতিশয় প্রাচীন ; মহাভারত-প্রসিদ্ধ গোমেধ-যজ্ঞকারী অতিথি-পরায়ণ রাজা রন্তিদেব এখানে রাজত্ব করিতেন। কালিদাস এই দশপুরের বর্ণনায়, কার্তিকের-মন্দির-সনাথ দেবগিরি পর্বতের কথা, দেবগিরির কার্তিকের ঠাকুরের কথা, দশপুর নগর-বাহিনী চর্মণ্বতী (আধুনিক চম্বল) নদীর কথা, বলিয়া মেঘকে সেই নদী পার হইতে অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন,—

"করি অতিক্রম সেই তরঙ্গিণী
যাও চলি, সখে, উত্তর গগনে,

দশপুর-ধামে যত সীমন্তিনী
হেরিবে তোমায় সতৃষ্ণ নয়নে ;
সে লোচনে খেলে ভ্রূবিলাস ঘন,
ঘন পক্ষ্মরাজি শোভিত অতুল,
ঊরধে তুলিতে সে চারু আনন
(যেন) সুচঞ্চল কুন্দে ধায় অলিকুল।" ৪৭।

লেখক কৃত অনুবাদ, (মেঘদূত, ৫০ পৃষ্ঠা) ।

"মেঘদূত" কাব্যের "পূর্বমেঘ" অংশের ৬৩টি শ্লোকের মধ্যে কবি কালিদাস মালব দেশের (পূর্ব মালব অথবা দশার্ণ দেশের বিদিশা নগর হইতে পশ্চিম মালবের দশপুর নগরের বৃত্তান্ত পর্যন্ত) বর্ণনায় ২৫টি শ্লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। উজ্জয়িনী কবির এতই প্রিয় যে মেঘকে বিদিশা হইতে একবার উজ্জয়িনীতে লইয়া গিয়া সেখানকার ঐশ্বর্য-সৌন্দর্য-বিলাস-ব্যসন-সুপুষ্ট নাগরিক-বৃত্ত এবং শ্রীশ্রীমহাকালের রাজোচিত সেবা-বিভব দেখাইবার লোভ তিনি সংবরণ করিতে পারেন নাই। বিদিশা (আধুনিক ভিলসা) হইতে উজ্জয়িনী (উজৈন) পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে অন্ততঃ পক্ষে ১০০ মাইল (মানচিত্র হইতে যতদূর বুঝিতে পারা যায়,) হইবে; তাই কবি ২৭শ শ্লোকে একটু ভূমিকা করিয়া মেঘকে বলিয়াছেন ;—"তুমি উত্তরদিকে চলিয়াছ ;—উজ্জয়িনী বিদিশা হইতে দূরে পশ্চিম দক্ষিণে ; সুতরাং উজ্জয়িনী যাইতে হইলে তোমাকে সোজাপথ ছাড়িয়া বাঁকাপথ ধরিতে হইবে,—রাস্তারও দূরত্ব বাড়িবে। তথাপি, আমি বলিতেছি, উজ্জয়িনী না দেখিয়া যাইও না। সে নগরীর প্রাসাদ সকল অত্যন্ত উচ্চ তুমি তাহাদের ছাদের উপর বিশ্রাম করিও। উজ্জয়িনীর পুরললনাগণের নয়ন বড়ই মনোরম ; তাহাদের অপাঙ্গ নিতান্ত চঞ্চল ; তাহাদের সেই চঞ্চল নয়ন তোমার চপলাস্ফুরণহেতু আরও চকিত-চঞ্চল হইয়া উঠিবে। যদি তুমি সেই মনোহর নেত্রপথের পথিক হইতে না পাও, যদি সেই বিলোল-লোচনের লীলানৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে না পাও, তাহা হইলে তুমি নিশ্চিতই আত্মবঞ্চনা করিলে,—তোমার চক্ষু দুইটিও বৃথা,—তোমার জীবনটাও বৃথায় গেল " এই উজ্জয়িনী যদি তাঁহার আশ্রয়দাতা বিক্রমাদিত্য মহারাজের রাজধানী এবং তাঁহার নিজের প্রিয় বাস-নগরী না হইত, অথবা যদি উহা অসংখ্য

সামন্ত-রাজগণের মধ্যে কাহারও (তাহাও আবার সাম্রাজ্যের বাহিরে—বা প্রত্যন্তে অবস্থিত) একটা নগণ্য যেমন তেমন শহর হইত, তাহা হইলে কি তাহার উপর কবির এরূপ পক্ষপাত দেখা যাইত ? আমাদের তো মনে হয়, এই পক্ষপাত, প্রাণের টান অথবা প্রেমের টান হইতে কবির হৃদয়ে স্বতই উদগত হইয়াছিল। পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব মেঘের উক্ত ২৫টি শ্লোক (২৩শ হইতে ৪৭তম পর্যন্ত,—প্রক্ষিপ্ত তিনটী বাদ দিয়াছি) ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়াছেন যে এই মালবদেশ (দশার্ণ বা পূর্ব মালব হইতে পশ্চিমে মান্দসোর বা দশপুর পর্যন্ত) কবির কিরূপ সুপরিচিত এবং তিনি কিরূপ নৈপুণ্য এবং প্রীতির সহিত উক্ত দশার্ণদেশ, বিদিশা রাজধানী, বেত্রবতী নদী (আধুনিক বেতোয়া), নীচ নামক ক্ষুদ্র পাহাড় (Hillock), বননদী (আধুনিক পার্বতী), নির্বিন্ধ্যা নদী, (মানচিত্রে নাম নাই, ক্ষুদ্র নদী হইবে), সিন্ধুনদী (আধুনিক সিন্দ Sind অথবা Kali Sind), উজ্জয়িনী নগর, শিপ্রানদী (আধুনিক সেপ্রা), মহাকাল-মন্দির, মন্দির-সন্নিহিত উদ্যানবাহিনী গন্ধবতী নদী (ছোট নদী, মানচিত্রে নাম নাই), গম্ভীরা নদী, (মানচিত্রে নাম নাই, চম্বলের কোন ছোট উপনদী), দেবগিরি, কার্তিকেয় মন্দির, চর্মণ্বতী নদী, (চম্বল, যমুনার উপনদী, এলাহাবাদের পশ্চিম ঢোলপুরের উত্তর ও কাল্পীর পশ্চিমে যমুনায় পড়িয়াছে) এবং দশপুর প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে কবি "রঘুবংশ" কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে (পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে) অবন্তিনাথের ও অবন্তীনগরের যে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই বর্ণনাই "মেঘদূত" কাব্যে অধিকতর বিস্তৃতরূপে এবং চাতুর্য-সহকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কালিদাসের আশ্রয়-দাতা বিক্রমের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার পক্ষে এইরূপ আভ্যন্তর প্রমাণ কখনই উপেক্ষনীয় নহে।

দশপুর নগর বর্তমান সময়ে মান্দসোর (Mandsaur) নামে বিখ্যাত এবং মানচিত্রে লিখিত হইয়াছে। রেলওয়ের প্রসাদে এখন বিদিশা (ভিলসা), উজ্জয়িনী (উজ্জৈন) এবং দশপুর (মান্দসোর) লৌহশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত আত্মীয়তায় আবদ্ধ হইয়াছে। রতলাম হইতে আজমেরের রেলপথে মান্দসোর একটি ষ্টেশন ; এবং উহারই কিছু উত্তরে বিখ্যাত চিতোড় (Chitor বা চিতোর) দুর্গের বা শহরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই মান্দসোর, দসোর অথবা দশপুর নগরে প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ বিখ্যাত ডাক্তার ফ্লীট্ যে অনেকগুলি

প্রাচীন শিলালিপির আবিষ্কার করিয়া ভারত-প্রসিদ্ধ "সংবৎ" (মালব বা বিক্রম সংবৎ) নামক অব্দের বাস্তবিকতা (২৫) জগতে প্রচার করত নিজে যশস্বী এবং ভারতের ব্রাহ্মণগণের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন,—তাহা অনেকেই অবগত আছেন। আমাদের দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার বর্ত্তমান গুরু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রি মহাশয়ও উক্ত স্থানে আর একটি লিপির আবিষ্কার করিয়া কোন কোন নূতন তত্ত্ব প্রকাশের সাহায্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবের প্রথমেই গুপ্তবংশীয় সম্রাড়্গণের সমসাময়িক দশপুরের বর্ম্ম উপাধির (নরবর্ম্মা, বিশ্ববর্ম্মা এবং বন্ধুবর্ম্মা) যে সামন্ত রাজবংশের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই সকল লিপির প্রমাণেই সঙ্কলিত হইয়াছে। কালিদাস মেঘদূত-কাব্যে যে কার্ত্তিকেয়-মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, এই সকল শিলালিপি হইতে তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই; পরন্তু (শ্রীকুমারগুপ্তের সমসাময়িক) সামন্তরাজ বন্ধুবর্ম্মার সময়ের এক সুবিশাল সূর্য্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দিল্লী নগরের প্রসিদ্ধ লৌহ-স্তম্ভে যে "চন্দ্র" নামক রাজার কীর্ত্তিকাহিনী উৎকীর্ণ আছে, তাঁহাকে আমাদের উল্লিখিত নরবর্ম্মার অগ্রজ ভ্রাতা এবং অগ্রগামী রাজা বলিয়া

---

(২৫) গত শতাব্দের শেষ ভাগে (১৮৭০ খৃ অব্দে) প্রত্নতত্ত্বিক মিঃ ফার্গুসন এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে খৃষ্টীয় ১০০০ অব্দের পূর্ব্বে ভারতখণ্ডের কোথায়ও "সংবৎ" নামক অব্দের নাম ও ছিল না এবং এই "সংবৎ"টা খৃষ্টীয় ১০০০ অব্দের পর ব্রাহ্মণগণের জালিয়াতীর ফলে কল্পিত বা সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রোফেসার ম্যাকসমূলার মহোদয় ও "*India, What Can It teach Us?*" পুস্তকে মিঃ ফার্গুসনের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাক্তার ফ্লীটের এই মান্দসোর শিলালিপি আবিষ্কারের ফলে ফার্গুসন প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের "অভয় প্রগল্‌ভোচ্চারণাত্মক পাণ্ডিত্যে"র অবসান হইয়াছে। ঐ শিলালিপি (এবং আর একখানি তাম্র-শাসন) হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে ৪৮৭ খৃষ্টাব্দে এবং ৫৫০ খৃষ্টাব্দে ও (যথাক্রমে ৪৩০ এবং ৫৯৩ মালব অথবা বিক্রমাব্দে) ঐ অব্দের ব্যবহার হইয়াছে; কাজেই "সংবৎ"কে আর ব্রাহ্মণদের কারসাজির ফল বলা যায় না। এই পুরাতন কথা অনেকেই জানেন; তথাপি পাঠক পাঠিকাবর্গের মনে করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে আমরা ইহার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিয়াছি।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ. মহাশয় পরিচিত করিয়াছেন (২৬)। দিল্লীর লৌহস্তম্ভের উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজা "চন্দ্র" একজন দিগ্বিজয়ী মহাবীর ছিলেন এবং তিনি পূর্বদিকে বঙ্গ দেশীয় বীরদিগকে এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদীর অপরপার-বাসী বাহ্লীকগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে ঐতিহাসিকগণ ইঁহাকে গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) বলিয়াই মনে করিতেন; সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাখালবাবু ইঁহাকে (শাস্ত্রি-মহোদয়ের আবিষ্কৃত শিলালিপির সাহায্যে) মালবের বর্ম বংশীয় জয়বর্মার পৌত্র, সিংহবর্মার পুত্র এবং নরবর্মার অগ্রজ বলিয়া সনাক্ত করিতে এবং তিনিই বাঁকুড়ার "শুশুনিয়া শৈললিপি"র "পুষ্করণাধিপতি মহারাজ সিংহ বর্ম্মার পুত্র শ্রীচন্দ্রবর্মা"—এই কথা বলিতে চাহিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের এই মাত্র দ্রষ্টব্য যে যদি ৮৪ গুপ্তাব্দে (৪৬১ সংবৎ অথবা ৪০ খৃষ্টাব্দে) মালবের দশপুরে বর্মবংশীয় নরবর্মা নামক নৃপতি রাজত্ব করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পূর্বে তাঁহার অগ্রজ চন্দ্রবর্ম্মা, পিতা সিংহবর্মা এবং পিতামহ জয়বর্মা সেই দেশের (মালবের দশপুরই হউক অথবা মারওয়ারের পোকরণ—Pokaran—বা পুষ্করণই হউক) রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে গুপ্তবংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অথবা তাঁহার পিতা সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে সে দেশের উজ্জয়িনী- (অথবা দশপুরে) -নগরে রাজধানী করিয়া সাম্রাজ্য শাসন করা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না;—এবং তাহা যে ছিল না তাহা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়-কীর্তি-দ্যোতক এলাহাবাদ স্তম্ভলেখে "পুষ্পপুর"কে রাজধানী স্বরূপে এবং মালবকে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তস্থিত রাজ্য সমূহের সহিত বর্ণনা করাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। মৌর্য-রাজগণের সময়ে একজন উপরাজ (Viceroy) মালবের বিদিশা অথবা উজ্জয়িনীতে থাকিতেন, এবং "দেবানাং প্রিয়" প্রিয়দর্শী (অশোক) নিজে পিতার জীবদ্দশায় মালবের উপরাজ ছিলেন

(২৬) শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর "শুশুনিয়ার পর্বতলিপি" প্রস্তাব ("প্রবাসী," ১৩২০, ফাল্গুন সংখ্যা)। এই প্রবন্ধোল্লিখিত শিলালিখিতে ৪৬১ বিক্রমাব্দে (৮৪ গুপ্তাব্দে) নরবর্মার কীর্তির কথা আছে আর সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে ৮ গুপ্তাব্দে বিদ্যমান্ ছিলেন, তাহার প্রমাণ এই প্রস্তাবের (৩) সংখ্যক পাদটীকায় দিয়া হয়।

বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। কালিদাস ও শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের (পুষ্পমিত্রের) পুত্র অগ্নিমিত্রকে বিদিশার ঈশ্বর (রাজা অথবা উপরাজ) বলিয়া "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটিকায় পরিচিত করিয়াছেন। এই নজীরে গুপ্তগণের সময়েও মালবের উজ্জয়িনীতে (অথবা বিদিশা কিংবা দশপুরে) একজন উপরাজ থাকিবার সম্ভাবনা আমরা কল্পনা করিতে পারিতাম; কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভলিপি এবং দশপুরের বর্মরাজগণের শিলালিপিগুলি সেরূপ সম্ভাবনাকে নিরস্ত করিয়াছে। আর, যদি তর্কের স্থলে, সামন্তরাজকে "উপরাজ" স্বরূপে ধরিয়া লওয়াও যায়, তাহা হইলেও বর্তমান বিষয় সমাধানের কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না। কবি কালিদাস যে কোনও সামন্ত রাজের (অথবা উপরাজের) সভার শিরোরত্ন ছিলেন, এবং সেই সামন্ত-রাজের (অথবা উপরাজের) উপাধি "বিক্রমাদিত্য" ছিল, ইহা কাহারও অভিপ্রেত বিষয় নহে; পরন্তু তিনি কোনও সুবিখ্যাত সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের শ্রেষ্ঠরত্ন ছিলেন, ইহাই সাধ্য বিষয়। তাঁহার রচিত কাব্যাবলী (শ্রব্য এবং দৃশ্য উভয়ই) হইতে পাটলিপুত্র এবং উজ্জয়িনী সম্বন্ধে যে সকল উপাদান আমরা পাইলাম, তাহাতে তাঁহাকে উজ্জয়িনীরই প্রেমিক বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হইয়াছে (২৭) এবং পাটলিপুত্রের সহিত তাঁহার

---

(২৭) আমাদের মনে হয়, যদি "পাটলিপুত্র" নগরে কবির এবং তাঁহার "বিক্রমাদিত্যে"র প্রিয় বাসস্থান হইত, তাহা হইলে তিনি তাঁহার রচিত শ্রব্য এবং দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে কোনও এক বা ততোঽধিক গ্রন্থে ঐ নগরের একটু বিস্তৃত বর্ণনা দিতেন। বিশেষতঃ "মালবিকাগ্নি-মিত্র" নাটিকায় তাঁহার এরূপ সুযোগের অভাব ছিল না। তাঁহার নায়ক অগ্নিমিত্রের পিতা পুষ্পমিত্র (বা পুষ্যমিত্র) রাজধানী পাটলিপুত্রেই যে তাঁহার বিখ্যাত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা পাণিনীয় মহাভাষ্য হইতে জানিতে পারা যায় এবং কবির এই নাটকেও লিখিত হইয়াছে যে পুষ্পমিত্র "যজ্ঞশরণ হইতে (যজ্ঞ-স্থান হইতে) বিদিশাস্থ আয়ুষ্মান্ পুত্র অগ্নিমিত্রকে" পৌত্র-কর্তৃক (অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র কর্তৃক) শত্রুজয় পূর্বক যজ্ঞাশ্ব আনয়নের সংবাদ প্রদান এবং "বধূগণের সহিত" যজ্ঞদেখার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন (পঞ্চম অঙ্ক)। যদি পাটলিপুত্রের উপর কালিদাসের প্রেম থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই এ সুযোগ ছাড়িতেন না। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তিনি ইচ্ছা করিয়াই পাটলিপুত্রকে উপেক্ষা করিয়াছেন। যদি আমাদের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে গুপ্তবংশীয় সুবিখ্যাত সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তদেব যে কবি কালিদাসের আশ্রয়দাতা প্রবাদপ্রসিদ্ধ মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য নহেন, তাহাই স্বীকার করিতে হয়।

প্রগাঢ় অথবা মধুর সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় নাই। এতাবতা প্রমাণে তিনি এবং তাঁহার বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীবাসীই ছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন বোধ হয়। আগামীবারে অন্যান্য "আভ্যন্তর" প্রমাণগুলি বুঝিয়া দেখিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

প্রেমের সুর।

—:o:—

বড় বেদনার মত বেজেছ আমায়
ভাঙ্গা জীবনের তারে
মম যৌবন মন কাঁপিছে তোমার
অশ্রুর ঝঙ্কারে!

আরো কত সুর আরো কত তান
নিমেষে নিমেষে ছুঁয়ে যাবে প্রাণ
থেমে যাবে হাসি ভেঙ্গে যাবে গান
প্রতি নিমেষের পায়ে!
তুমি বেদনার মত বেজেছ আমার
জীবনের তারে তারে?

ওগো ব্যথাভরা প্রেম ওগো ব্যাকুলতা
এযে ভুলিবার নয়
এযে ব্যথা দিয়ে প্রেম প্রেম দিয়ে ব্যথা
মরণের বিনিময় !
কেঁপে ওঠে গান ঝরে আঁখিজল
মুদে আসে মম জীবন-কমল
সুরে সুরে বঁধু ঝরে পড়ে দল
গহন অন্ধকারে !
বড় বেদনার মত বেজেছ আমার
জীবনের তারে তারে ?

বিলাতের পথে।

——:❋:——

"স্যাংকলিন টাওয়ার।"
আইল অব ওয়াইট।
২৩ শে ডিসেম্বর, ১৯২৫।

কল্যাণীয়াসু !

এক পত্রে আমার ভ্রমণ বৃত্তান্তের কিছু লিখে পাঠিয়েছিলেম। বাকীটুকুর জন্য তোমরা তাগিদ দিচ্ছ। কিন্তু এতদিন তোমাদের কথা রাখতে পারি নি; প্রথমতঃ মার্সেলেশ থেকে লণ্ডন পর্য্যন্ত ভ্রমণে বিশেষ কিছু লিখিবার মত নাই; দ্বিতীয়তঃ যখন শুনেছি আমার লেখাটা কাগজে ছাপা হয়েছে তখন আরও ভয় হয়েছে। আমি কাল এখানে ছুটী কাটাবার জন্য এসেছি। জায়গাটা একেবারে সমুদ্রতীরে ও মনোরম। এখান থেকে অক্সফোর্ডে যাব ৩ ৪ সপ্তাহ পরে, তোমরা পূর্ব্বের ঠিকানায় চিঠি দিবে।

আমাদের জাহাজ ২২ শে সেপ্টেম্বর শনিবার মার্শেলেস পৌঁছাল। খুব ভোর থেকেই দূরে ফ্রান্সের সাদা খাড়া তীর দেখা যাচ্ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি পোষাক পরে ডেকে এসে হাজির হলাম। আমরা যখন বোম্বাই ত্যাগ করি তখন ঠিক করেছিলাম সারাপথ সমুদ্রেই যাব। কিন্তু যেদিন ভূমধ্যসাগরে ঝড়ের হাতে পড়ে বমির চোটে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল, সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করা গেল,—আর না। বে অব বিস্কে চিরদিনই তুফানের জন্য বিখ্যাত। সুতরাং তাতে আমাদের অবস্থা কি হবে সেটা স্মরণ করে সকলেই স্থির করলেন স্থলপথে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কেবল কয়েকজন থেকে গেলেন; তাঁদের কাছে পরে শুনেছি যে বে অব বিস্কে বেশ শান্তই ছিল।

মার্সেলেশ হারবারটি ঠিক বোতলের মত। সমুদ্রে তার মুখ খুব সরু। সেই মুখের উপর একটা লাইটহাউস ও ছোট ছোট দুইটী দ্বীপ। তাতে কামান পাতা আছে। বাহিঃশত্রু কোন রকমেই এতে প্রবেশ লাভ করতে পারে না। এই দুইটি দ্বীপের একটি বিখ্যাত Chatend Alxander Dumas এর জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস Count of Montecristo তে ইহা অমরত্ব লাভ করেছে। এখানে ফরাসী রাজগণের আমলে একটা কারাগৃহ ছিল। ডুমা তার পাষাণ কক্ষের নিঃসঙ্গতা ও নির্ম্মমতা এমন করে বর্ণনা করেছেন যে তাকে বাস্তব ও জীবন্ত করে তুলেছেন, শুনেছি এখানে অনেক লোক সেই কারাগৃহ দেখতে আসে ও হতভাগা Edmond Dantes কোন ঘরে আবদ্ধ ছিল এবং পাথরে সুরঙ্গ কেটে Abbe Taria এর ঘরে যাতায়াত করত এখনও লোকে সেই ঘর এবং সেই সুরঙ্গ খুঁজে বেড়ায়। Edmond Dantes বলে কিংবা সে রকম সত্য কোন লোক নিয়ে Dumas লেখেন নাই; কিন্তু এমন তাঁর বর্ণনার প্রভাব যে লোকে সত্য বলিয়া মনে করে। এখানে আর একজন আবদ্ধ ছিল; সে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং ফরাসী বিপ্লবের শোণিত উৎসবের একজন বড় নেতা। সে হচ্ছে মিরাবো। তাঁর পিতা তাকে দুর্দান্ত স্বভাবের জন্য এখানে আবদ্ধ রাখেন।

জাহাজ ধীরে বন্দরে প্রবেশ করতে লাগল। সমুদ্র কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, ঘন নীল। প্রভাতের সূর্য্যের আলোয় জল জ্বলে উঠল। দূরে ফরাসীকূলের শুভ্র পাহাড়ের কুয়াশার আবরণ সরে গেল। মার্সেলেসের অগণ্য হর্ম্ম্যরাজি, কারখানার ধূমায়মান চিমনী ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসল। আমরা আনন্দে অস্থির হয়ে পড়লাম যে এতদিন পরে আমাদের চির অভ্যস্ত মাটি ও গাছপালার

সঙ্গে আবার দেখা হবে। অবস্থায় না পড়লে কিছুর প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা যায় না—আজ আমরা বুঝেছি মাটি আমাদের কত আপনার! মর্ম্মে মর্ম্মে আজ অনুভব করলেম বিশ্বকবির সেই উক্তি—

'হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামল কোমলা! যেথা যে কেহই থাকে
অদৃশ্য দুবাহু মেলি' টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে কি বিপুল টানে
দিগন্ত-বিস্তৃত তব শান্ত বক্ষপানে!'

ব্রেকফাষ্ট শেষ না ক'রে কাউকে নামতে দেওয়া হল না। তাড়াতাড়ি সেটা সেরে আমাদের লাগেজ ক্যাবিন-ষ্টুয়ার্ডের দ্বারা নামবার সিঁড়ির কাছে জমা করা গেল। ক্যাবিন ষ্টুয়ার্ড, ডেক ষ্টুয়ার্ড ও খাওয়ার টেবিলের ওয়েটার কাছেই ঘুরাঘুরি করতে লাগল। তাদিগের উপযুক্ত বকশীসের ব্যবস্থা করতে হল। এখন ইংরাজ চাকরকে বকশীস দিচ্ছি। এক টাকা দুই টাকা দিলে সম্মান থাকে না। দশ শিলিঙের কম দেওয়াই কঠিন।

জাহাজ হতে নেমে টমাসকুকের একজন কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ করা গেল। এখানে টমাসকুকের অনেক Interpretor (দ্বিভাষী) থাকে; তারা প্রায়ই ফরাসী, অদ্ভুত ফরাসী উচ্চারণের জন্য তাদের ইংরাজী বুঝা কঠিন ব্যাপার; তাদের একজনের কাছে মালপত্র সঁপে দিয়ে টমাসকুকের আফিসের দিকে যাত্রা করা গেল। মার্সেলে Customs-এর খুব হাঙ্গাম হবে ভেবেছিলাম কিন্তু টমাসকুকের লোক নির্ব্বিবাদে পাশ করে নিল। কেউ বাক্স খুলেও দেখল না যে তাতে কোন বমাল আছে। পাসপোর্টও তাই। জাহাজের উপর একজন ফরাসী কর্ম্মচারী আমাদের পাসপোর্ট স্বাক্ষর করে দিল; তাকিয়ে দেখলও না যে ফটোটা আমার কি না।

মার্সেল্‌স সহর নূতন আগমনকারীর পক্ষে বিশেষ নিরাপদ নয়; এইখানে নানা দেশের লোক জমা হয়েছে; সেইজন্য জুয়ার আড্ডা ও বদমাইস লোক অনেক আছে। আমাদের একমাত্র জানা হচ্ছে টমাসকুকের আফিস, তাদের সেই কর্ম্মচারী বার বার করে বলে দিল যেন

আমরা অন্য কোন গাইড সঙ্গে না নি; এবং একবারে সোজা তাদের আফিসে যাই। গাড়ী ভাড়া কত তাও বলে দিল, কারণ অচেনা লোককে ঠকিয়ে নিতে গাড়োয়ান ছাড়ে না। ছারবার থেকে বের হয়ে গাড়ীর কাছে থেকে একবারে গয়ার পাণ্ডাদের মত একদল গাইড আমাদের ঘিরে ধরল। অতি কষ্টে তাদের হাত থেকে উদ্ধার লাভ করে টমাসকুকের আফিসে উপস্থিত হওয়া গেল। সেখানে তাদের একটা লোক হোটেলে নিয়ে গিয়ে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করল।

বেলা ১২॥০টার সময় টমাসকুকের এক গাইডের সঙ্গে তাদের এক মোটরে মার্সলেশ সহর দেখতে আমরা বের হলেম। মার্সলেশ সহর প্রকাণ্ড; প্রায় আমাদের বোম্বায়ের সমান, পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাস্তা ঘাট খুব সুন্দর, কিন্তু অসমতল, রাস্তার দুইদিকে সব সুসজ্জিত দোকান। কি কি দেখেছি এতদিন পরে তার নাম মনে নাই; তবে তিনটে কথা এখনও মনে হচ্ছে। সে হচ্ছে মার্সলেশের গির্জ্জা Notre Damo dela garde, পার্ক ও তিন মাইল লম্বা একটা Avenue নাম Prado. Notre Dame dela gardo একটি পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে Fransican monks এই গির্জ্জার নিম্নতল নির্ম্মাণ করেন; ষাট বছর পূর্ব্বে তার উপর আর একতলা নির্ম্মিত হয়েছে। এই গির্জ্জার চূড়ায় Notre Dame dela gardo এর এক মূর্ত্তি আছে—তা বহুদূর সমুদ্র থেকে দেখা যায় ও নাবিকদের হৃদয়ে আশার তরঙ্গ আনে। গির্জ্জার ভিতরে Notre Dame dela garde (our lady of the city) এক সুন্দর ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি আছে। গির্জ্জার পুরাতন অংশের কারুকার্য্য ও mosaic খুব সুন্দর। গির্জ্জাতে রাস্তা হতে উঠিবার জন্য 'লিফট্' আছে, তাও অদ্ভুত। গির্জ্জার উপর মোমবাতি বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে যেমন দেবতার উদ্দেশে লোকে ফুল উপহার দেয়, এদেশে ভক্তেরা তেম্‌নি মোমবাতি জ্বালিয়ে ধরে।

'প্রাডো'র মত সুন্দর রাস্তা এবং মার্শেলেশের পার্কের মত সুসজ্জিত পুষ্পসমাবেশ আমি লণ্ডনে দেখি নাই।

আমাদের ট্রেনে ৭-৩৫ মিনিটে। ভ্রমণ শেষ করে ফিরতে পাঁচটা বাজল। টমাসকুকের সেই লোকটি আমাদের বৈকালিক চা পানের জন্য এক রেঁস্তরায় নিয়ে গেল। সেখানে সুমধুর যন্ত্রসঙ্গীত হচ্ছিল। আর সেই সঙ্গীতের তালে তালে নরনারী নৃত্য সুরু করে

দিয়েছে। চেনা অচেনা বিচার নাই। আমরা হাঁ করে এই সুসভ্য দেশের সুসভ্য লোকদের কাণ্ড দেখছিলাম। দুপুর বেলায় রাস্তায় তিন চার জন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করছিল, যে আমরা যখন বিদেশ থেকে এসেছি তখন আমাদের নিশ্চয়ই উলঙ্গ নৃত্য দর্শন করা উচিত, এবং আমাদের সেখানে নিয়ে যেতেও চেয়েছিল। আমার এক বন্ধু কলকাতায় প্রায়ই সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে খুব সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর গোলগাল নধর দেহটি সাধুর চেলার দুধঘিয়ে পুষ্ট দেহের মতই ছিল! কিন্তু বেচারাকে বাধ্য হয়ে যখন হিন্দুশাস্ত্রের নিষেধ অমান্য করে জাহাজে উঠতে হয় এবং সন্ন্যাসের অনুপযুক্ত রাজসিক আমিষ আহারে ব্রতী হতে হয় তখন নিশ্চয়ই তাঁর উপরে দেবতা চটে গিয়েছিলেন। বেচারা জাহাজে এক দিনও ভাল থাকে নাই,—রোজই বমন করতেন, আমরা তাঁর প্রকাণ্ড বপুর এই দুরবস্থা দেখে খুবই হেসে বলতাম "মশায় আপনি ইংরাজী প্রবাদ Appearances are deceptive প্রমাণ করলেন।" তাঁকে মার্সেলেসে কুইনাইন শরীরে ফুঁড়ে জ্বর তাড়িয়ে আমাদের সঙ্গে নামিয়েছিল। তিনি আগাগোড়াই এই ম্লেচ্ছ দেশের উপর চটে ছিলেন। যখন আমাদের কাছে এই উলঙ্গ নৃত্যদর্শনের প্রস্তাব করা হয়। তখন তিনি সাদা জাতের নৈতিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে দৃঢ়কণ্ঠে এমন বক্তৃতা শুরু করলেন যে শিকারী গাইডের দল একবারে ভঙ্গ দিল। আমরা লণ্ডনে কিংবা ইংলণ্ডের কোথায় এমন প্রকাশ্যে ঢলাঢলি দেখি নাই, ইংরাজ জাত অনেক সংযমী। আমার বন্ধু যখন রেস্তরার এই দৃশ্যে পাশ্চাত্য সম্বন্ধে একবারে হতাশ হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ভগবান তাঁর অদৃষ্টে আরও পরিহাস সঞ্চিত করে রেখেছিলেন। তিনি পকেটে হাত দিয়ে দেখেন ৪০ ফ্রাঙ্ক সুদ্ধ তাঁর মনিব্যাগটি অপহৃত হয়েছে। তিনি তীব্রকণ্ঠে বললেন "মশায় মেছোবাজারের ও বড়বাজারের অসভ্য লোকের ভিড়ে কখনও দুটি পয়সা হারাইনি; কিন্তু এই সুসজ্জিত সুসভ্য লোকদের কীর্ত্তি দেখুন।" তার উপর 'পশ্চিম' এতদিন যে ব্যবহার করেছে, তাতে দুঃখিত হই না—আজকার এতে দুঃখিত হলেম।

আমাদের গাইড বিদায় নিল; বলে দিল "ষ্টেশন খুব কাছে; এই রাস্তা ধরে যাও।" আমরা কিছুদূর গিয়ে আর পথ পাই না। রাস্তায় কেউ জিজ্ঞাসা করলেও বলতে পারে না; কারণ কেউ ইংরেজি বুঝে না। তখন আবার সেই বন্ধুই আমাদের বাঁচালেন। তিনি

কিছুদিন ফরাসী ভাষা শিক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বিদ্যার চেয়ে অবিদ্যাই বেশী হয়েছিল; কারণ যে দুই চারটি ফরাসী শব্দ জানতেন তার উচ্চারণ একবারেই জানতেন না। ইংরাজীতে শব্দের বানান দেখে উচ্চারণ অনেক সময় করা যায়, ফরাসীতে কখনও নয়। তিনি ষ্টেশনের ফরাসী প্রতিশব্দ জানতেন। রাস্তায় একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন "Gare ?" (Station) সে পথ দেখিয়ে দিল। সুতরাং অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী সব সময়েই নয়।

ষ্টেশনে টমাসকুকের লোক জিনিসপত্র সব গাড়ীতে তুলে দিয়ে বকশিশ নিয়ে বিদায় নিল। ট্রেন চলতে আরম্ভ করল। আমরা সেকেণ্ড ক্লাশ যাত্রী। ফরাসীদেশে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী আছে। কিন্তু আমাদের দেশে যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাত্রিতে ঘুমাবার জন্য এক একখানা বেঞ্চ দেওয়া হয়, এখানে তেমন নয়। এখানে কেবল ফাষ্টক্লাশের যাত্রীরাই ঘুমাবার গাড়ীতে স্থান ভাড়া করে নিতে পারে। সুতরাং আমরা বসে বসেই রাত্ত কাটালাম।

পরদিন ফরাসীদেশের সুন্দর দৃশ্য চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে ট্রেণ ৬০ মাইল বেগে ছুটে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে সব চাষ আবাদ। তারপর ছোট ছোট সমতল ভূমি, আবার পাহাড়। কখন সমভূমিতে কখন পাহাড়ের উপর দিয়া, কখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকার ভিতর দিয়া, কখন নদীর তীরে তীরে আমাদের লৌহ অশ্ব অবিরাম চলেছে; দাঁড়াবার কথা নেই,—এখানা rapide ট্রেণ; দূরে দূরে থামে।

আমরা যখন প্যারীসে পৌঁছালাম তখন দুই ঘণ্টা দেরী হয়ে গিয়াছে। ক্যালের (Calais) ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং আমাদের "বুলনে" (Bulogne) যেতে হবে। গাড়ীতেই খাবার ছিল। কিন্তু এখানেও ফরাসী না জানার জন্য বিশেষ কষ্ট পেতে হয়। আমার এক বন্ধু কিছুতেই বুঝিয়ে দিতে না পেরে সমস্ত ডিস পর পর আনান। তারপর নিজের ইচ্ছামত বেছে নিলেন। এখানে দুইজন ইংরাজ বালক আমাদের খুব উপকার করেছিল। তারা ফরাসী জানত, যদিও সেই ট্রেণে খুব বেশী ইংরাজ যাত্রী, কারণ সেখানা

মার্শেলেশ থেকে আমাদের জাহাজের ইংলণ্ডগামী যাত্রী[বোম্বাই কিন্তু ইংরাজি জানা ওয়েটার তাতে মাত্র এক জন। ফরাসী জাত নিজের দেশ ও ভাষার খুব প্রিয় কিছুতেই কোন লোভেই পরের ভাষা শিখবে না।

ট্রেণ আবার ছুটল। সেখান থেকে বর্ত্তমান যুগের বিলাসের লীলাভূমি, সৌন্দর্য্যের লক্ষ্মী, ইউরোপের নন্দনে নরক প্যারিসের বিশেষ কিছু দেখতে পাই নি, কেবল দূরে ইফেল স্তম্ভ দেখা যাচ্ছিল।

ট্রেণ বুলনে এল সন্ধ্যায়। বৃষ্টি হচ্ছিল ও সঙ্গে সঙ্গে বাতাস। শীতে শরীর কন্ কন্ করছিল, কাষ্টমসের ও পাসপোর্টের দায় সেরে ছোট্ট একখানা ষ্টীমারে উঠে পড়লাম। জাহাজখানা বাতাসে বড়ই দুলছিল, এক একবার ঢেউ উপরের ডেকের উপর পর্য্যন্ত আসছিল। আমি সারা রাস্তায় ১৪ দিনের সমুদ্রযাত্রায় যে কষ্ট পাই নাই, তা এই দুই ঘণ্টায় পেলাম। এই দুই ঘণ্টায় ছয় বার বমন করি, কিন্তু আমার সেই সুপুষ্টকায় বন্ধুটি এব্যাপারে আমার পশ্চাতে পড়ে রলেন না! তিনি বার বার সমস্ত জাহাজ সচকিত করে বমি সুরু করলেন আমাদের সুখের বিষয় যে এ অভিনয়ে ইংরেজের খুব অল্প কয়জনই বাদ যায়।

জাহাজ ফোকষ্টোনে পৌঁছিলে কাষ্টমসকর্ত্তারা বড় জ্বালাতন আরম্ভ করলেন। যাত্রীরা তাঁদের কাছে বাক্স খুলে সমস্ত দেখালে তবে নিষ্কৃতি। রাত্ত এগারটার সময় আমার বাল্যের আকাঙ্ক্ষিত লণ্ডনে কাঁপ্তে কাঁপ্তে পৌঁছিলাম—এই না সেই পার্থিব স্বর্গ!

আমি ভাল আছি। বলে দিচ্ছি—এই চিঠির জন্য তোমাদের কাছ থেকে অন্ততঃ চারখানা চিঠি চাই!

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীমাখনদা।

শোক সংবাদ।

আমরা আর একটি একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী হারাইলাম; রাখালরাজ রায় মহোদয় বিগত ২রা পৌষ ৫৩ বৎসর বয়সে রক্তামাশয় রোগে লোকান্তরিত হইয়াছেন। রাখালরাজ মনে প্রাণে ছিলেন বঙ্গ-সাহিত্যের উপাসক,—সাহিত্য সেবাই ছিল তাঁহার জীবনের লক্ষ্য—আনন্দ! বহু বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে;—সন্তানাদিও বর্ত্তমান ছিল না,—তিনি সংসারের সংকে ত্যাগ করিয়া সাহিত্যকে সার জানিয়াছিলেন;—ছোট বড় সকল সাহিত্যিককে তিনি পরম আত্মীয়ের ন্যায় গ্রহণ করিতেন,—তাঁহার প্রাণ খোলা মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইতে হইত, নতুন পরিচয়েও মনে হইত তিনি যেন কতকালের পরিচিত। সাহিত্য আলোচনার কালে তিনি আত্মবিস্মৃত হইতেন। অধ্যয়নের তাঁহার বিরাম ছিল না—আজীবন তিনি ছাত্র ছিলেন, বহু তথ্য তাঁহার আয়ত্বে ছিল,—আলোচনা গবেষণায় তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। পরিচারিকার পাঠক পাঠিকা তাঁহার আলোচিত বিবিধ প্রবন্ধে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ১৮৯২ খৃঃ বি-এ, পাশ করেন, আর কতকাল পরে এই তিন বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গলা ভাষায় এম-এ, পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি তরুণ যুবকের ন্যায় আবার পরীক্ষা পয়োধিতে উত্তীর্ণ হইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই—উৎসাহ তাঁর এমনি ছিল; এম-এ, উপাধী লাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ স্কলারসিপ প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গভাষার তত্ত্বালোচনায় এ কয়েক বৎসর তন্ময় হইয়া নিয়োজিত ছিলেন—আর কিছুকাল তিনি বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহার নিকট হইতে বঙ্গভাষা অনেক স্থায়ী বস্তু প্রাপ্ত হইত কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ—পরপারে তাঁহার ডাক পড়িল। শান্তিময় সেখানেই তাঁহাকে সুখী করুন। কেশবেশের পারিপাট্যহীন, পার্থিবসুখস্বাচ্ছন্দ্যে উদাসীন—ভক্ত সেবকের সকল সাধনা, অকৃত্রিম ঐকান্তিক সেবা—সাফল্য লাভ করুক আনন্দময়ের পরম আনন্দ ধাম।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"
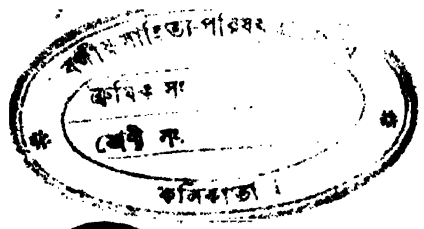
৮ম বর্ষ। } ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল। { ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

মানসী।

—:০:—

কোন কথাটী বল্‌তে এসে অলোক লোকের
অপ্সরি!
মনস মঞ্চে দোলটী দিয়ে বাস রে আঁচল
সম্বরি!
মর্ত্ত্যবাসীর দৈন্যে রে তোর—
এতই হ'ল লাজ।
অশোক বনের ছায়ার তলে
গুটিয়ে নিলি সাজ।

ফুরফুরে তোর কালীর তুলি
চাঁচর চুলের ঝারী।
আকাশ গা'ও মিলিয়ে গেল
ফিকা নীলের সাড়ী।
বিশ্ব-হিয়ার বেদন কথা—
লক্ষ পাখীর কণ্ঠে গাঁথা—
ঝিল্লি তানের এক-সুরাতে
থমকে থেমে যায়।
(ও তোর) সচল গমন অচল হ'য়ে
মূর্চ্ছে পড়ে পায়।
কোন কথাটী ব'লতে এসে
বল্‌লি নাক ফুটে।
(ও তোর) মনের কথা আঁখির কোণে
ব্যথায় প'ল লুটে।
গগন ভরা হাজার তারার অপাঙ্গেরি
মূর্চ্ছনা!
বক্ষ-কারায় বাঁধন ঠেলে,—কতই যুগের
যন্ত্রণা!
(ও তোর) জীবন দলের পর্ব্বে যারা
অতল রসের নির্ঝর ঝারা,
কোন কথাটীর প্রকাশ নেশায়
আবেশ ভরপুর ;
তুই তুফানী বেরিয়ে এলি
বাজিয়ে রতণ চুর।

(ও তোর)　　বুকের কথা ঠোঁট দুটিতে
কেঁপেই হ'ল চুপ।
স্পন্দবিহীন কার সাজী লো
স্ফটিক হেন রূপ।
অঙ্গব্যাপী ভঙ্গীখানি
মেঘের কোলে বাঁকি।
দিগবালেতে থির মেখলা
কে দিল রে আঁকি।
গুমরে নীরব হিয়ার ব্যাথা
প্রাণের সাড়া পাইনে কোথা----
অনুভূতি জানায় নিতি
কতই বাজে ভেরী।
গুন গুনিয়ে ভৃঙ্গ সেথায়
কতই করে দেরী।
কোন কথাটী বলতে এসে
হঠাৎ হলি চুপ।
(ও তোর)　　বুকের কথা ঠোঁটেই রল
ফুটল না তার রূপ।
নৈশ পাখীর পাখায় আজো দীর্ঘ নিশাস
সঞ্চরে।
অপ্রকাশের শোকের স্মৃতি বদ্ধ হিয়ায়
গুঞ্জরে।

বাক্যাতীতের তীরটী ছুঁয়ে
উদাস মণের স্বপন নিয়ে
তুই উদাসী মুখর হয়ে
নীরব অভিসারে,
ফিরবি কবে আবার আমার
কল্প কুঞ্জাগারে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রক্তাম্বরা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

—※※※—

দম্পতি।

আমি চিঠিপত্রের বড় ভক্ত নই। বেশী চিঠি পাওয়া বা লেখা কোনটাই আমার স্বভাব নয়। এক একমাসে দু' তিনখানির বেশী চিঠি পাইও নাই, লিখিও নাই। সেদিন সকালে বসিবার ঘরে যাইতেই টেবিলের উপরে আমার নামে একখানি চিঠি রহিয়াছে দেখিলাম। খামের উপরে লেখা অপরিচিত হাতের। একটু ছুটী পাইলে চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলাম। সেখানি কলিকাতার পুলিশ আফিস হইতে বিনোদের ঠিকানায় আমাকে লেখা হইয়াছিল। বিনোদ আবার আমার এখানকার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছে। পুলিশ সার্জ্জন যিনি যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় খোঁজ করিতে গিয়াছিলেন তিনি আমাকে কলিকাতায় দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। লিখিয়াছেন বিশেষ প্রয়োজন। আমি এ রহস্য ভেদ করিতে গিয়া বাস্তবিকই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার আর নূতন কিছু জানিবার ইচ্ছা

ছিল না। আমি কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে দেখা করিব লিখিয়া দিলাম। পরে নিচে গিয়া দেখিলাম রাণী সকলকে লইয়া পুষ্পপ্রদর্শনী দেখিতে যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। আমি রাণীর সঙ্গে না গিয়া রাজার সহিত তাঁর কুকুরদের খাওয়ান দেখিতে গেলাম। ফিরিবার পথে দেখি বেলা বাগানে একটি লতাকুঞ্জের ভিতর বসিয়া গল্পের বই পড়িতেছে। আমি তাহার নিকটে যাইতেই সে বলিল "আপনি নীরজার সঙ্গে যান নি? আমি ত এ রোদে কোথাও না গিয়ে বরং গল্পের বই পড়াই পছন্দ করি।"

"ঠিক বটে! এত রোদে রাণী গেলেন কেন?"

"ওর খেয়াল।"

আমি দেখিলাম রাত্রি জাগরণজনিত ক্লান্তিতে বেলার চক্ষের নীচে কালী পড়িয়াছে। লতাকুঞ্জের শীতল ছায়ায় বসিয়া তাহার যেন চোখে ঘুম ভরিয়া আসিয়াছে; আমি বলিলাম "কাল গরমই গেছে! আমি ত সমস্ত রাত বাগানের হাওয়া খেয়েছি।"

"বাগানে?" বেলা একটু ভীত ও চমকিত হইল।

"হাঁ বাইরে ঠাণ্ডাও খুব ছিল, আর ফুলেরও সুন্দর গন্ধ আসছিল।"

"তবু একলা ত।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম "কেন একলা কেন? আপনিও ত ছিলেন।"

বেলা নীরব রহিল। তারপর কম্পিত কণ্ঠে বলিল "আমি ত আপনাকে দেখ্‌তে পাই নি। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটু রাগত ভাবে বলিল "আর থাক্‌লেই বা আপনার কি?"

"আমার আর কি? আপনার যা ইচ্ছা কোর্‌তে পারেন আপনাকে কিছু বলবার আমার কি অধিকার? কিন্তু গতরাত্রে আপনার একটা ফাঁড়া গেছে তাই বোল্‌ছি।"

"ফাঁড়া?"

"হাঁ প্রবল প্রতিহিংসার মুখে পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচেছেন।"

"আপনার কথা বুঝতে পারছি না।"

"বেশ, খুলে বোলছি, আপনিও আমার কাছে কিছু লুকোবেন না তা হলে, কাল রাত্রে আপনি একজনের সঙ্গে দেখা কোরেছিলেন। তাঁকে আপনি আগেও দেখেছেন,—কেমন?"

"তা অস্বীকার কোরে কি ফল ?"

"তিনি আগে একবার আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা করে'ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করা কি ঠিক ?"

"আপনি কি বোল্‌ছেন ? তিনি আমার প্রাণনাশের চেষ্টা কোরবেন কেন ?"

সেই স্ত্রী লোকটির কথা বে'ল্‌ছি। তিনি যেতেই ত আপনি অসুখে পড়ে'ছিলেন ?"

"তার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ ?"

"কাল আপনি তার সঙ্গে দেখা কোরতে এসেছিলেন বাগানে।"

"তার সঙ্গে ? নিশ্চয় না।"

"তা হলে আপনি বোলতে চান আপনি তবে দেখেন নি ?"

"অ'বিশ্যি নয়। আপনি তাকে আমার সঙ্গে দেখেছিলেন নাকি ?"

"তা হলে সে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা করেন নি ?"

"না তিনি পুরুষ মানুষ।"

"কে তিনি ?"

"আমি ত বোলেছি আমি নিজের এসব কথা কাউকে বলি না।"

"তিনি আপনার প্রণয়ী ?"

"যা ইচ্ছা ভাব্‌তে পারেন কিন্তু তিনি যে সে স্ত্রীলোক নন্‌ এ ঠিক।"

"বেশ তা না হলেও সে স্ত্রীলোকটি গতরাত্রে এ বাড়ীতে ছিল ও আপনার ঘরের ভিতরও গিয়েছিল।"

ভয়ে বিবর্ণ হইয়া বেলা বলিল "আমার ঘরে ? অসম্ভব।"

"আমি নিজে দেখেছি।"

তারপর গত রাত্রের সমুদয় ঘটনা এক এক করিয়া বেলাকে বলায় সে বলিল "বড় আশ্চর্য্য! সব বন্ধ থাকে কোথা দিয়ে প্রবেশ কোরল ? চাকরদের কারও ঘর দিয়ে হয় ত। সে আপনার ঘরেও গিয়েছিল ? দুজনেরই খোঁজ কোরছে দেখছি।"

"আপনি ও আপনার কলিকাতার বাড়ীর চাকর তার যে বর্ণনা দিয়েছিলেন সেই রকম হুবহু দেখ্‌তে।"

"কি উদ্দেশ্যে সে আবার এল ? আমাদের দিয়ে তার কি দরকার ?"

"কি জানি ? তবে আমরা কেউ ঘরে ছিলাম না এই ভাগ্যি।"

"আপনি ঘরে এসে সেই আগের মত মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন ?"

"হুঁ।"

"আমিও ঘরে এসে মূর্চ্ছা যাবার মত হোয়েছিলাম।"

"আপনার এখন উচিত আপনার অতীত জীবনের কথা আমাকে বিশ্বাস ক'রে বলা।"

"অতীত জীবন ! আশা করি আমার অতীত জীবনে আপনি দোষের কিছু দেখেন নি ?"

"না, না। কিন্তু কয়েকটা কথার ঠিক উত্তর দিলে এ প্রশ্নের সমাধান অতি শীঘ্র হতে পারে।"

বেলা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল "যা বলা যায় তা বোলেছি।"

"না সব বলেন নি। যতটা সাহস করেন ততটা বোলেছেন।"

বেলা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

"একটা কথা আপনি গোপন কোরেছেন সেটাই সব বিপদের বাড়া।"

"কি ?"

"আপনার বিয়ের কথা।"

শুষ্কমুখে বেলা বলিল "কে বোল্‌ল আপনাকে ? নীরলা এ বিশ্বাসঘাতকতার কাজ কোরেছে ?"

"না আমি আগে থেকেই জানি।"

"কেমন করে ?"

"আপনি সব কথা আমায় বলেন না যখন, আমাকেও কিছু গোপন রাখ্‌তে হবে তখন ত।"

"আমি বিবাহের কথা অস্বীকার কোরছি না; কিন্তু এই কথা গোপন রাখ্‌তে কত চেষ্টাই না কোরেছি ! হায় ভগবান ! আমার মৃত্যু হয় না কেন ?"

আমি সহানুভূতির সুরে বলিলাম "যা সহ্য না করে উপায় নাই—কষ্ট সহ্য কোরতে অধীর হ'লে চলে না। আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য কোরব।"

"আপনি আমার কথা গোপন রাখ্‌লে ভাল হয়।"

"গোপন রাখা নয় শুধু। আমি আপনাকে উদ্ধার কোরতে চাই।"

"কখনো পারবেন না। আমি হার মেনেছি।"

"কেন?"

"কারণ আমার স্বামী কে, তা জানি না। আমি তাঁকে কখনো দেখি নি।"

"নামও জানেন না?"

"না, শুধু এই জানি আমি বিবাহিতা এই বিয়ে আমার জীবনের সুখশান্তি হরণ কোরেছে। স্ত্রীলোকের প্রাণ পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন,—পাষাণ ফাটিয়া যায় কিন্তু এ প্রাণ ফাটে না।"

"আপনার স্বামীকে কি খুঁজে বের করা যায় না?"

"না।"

"এ কথা আ'র কে জানে?"

"কেবল নীরজা।"

"আর কেউ না?"

"আর কেউ জানে বলে ত আমি জানি না।"

"স্বামী বর্ত্তমানে ত সতীশের সঙ্গে বিয়ে হ'তে পারে না।"

"সেই ত বাধা।"

""সে স্বামী ত কুরূপা কুচরিত্র হতেও পারে।"

"সে কথা মনে হলে ভয়ে বুক কাঁপে।"

"আপনি সতীশকে ভালবাসেন?"

"আমরা খুব বন্ধু।"

"কেন বোল্‌ছেন না যে আপনি তাকে ভালবাসেন?"

"যদি বাসিই। তাতে ফল কি?"

"তাত। আপনার বিয়ে ত হয়েই গেছে।"

"থাক সে কথায় আর দরকার নেই। আমার জীবনের অভিশাপ জীবন জুড়ে থাক্ আপনাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে?"

"আপনার বিয়ের কথা সতীশ জানে?"

"না তিনি আমায় বড় ভালবাসেন। এখন রাজা হোয়েছেন তাই আরও বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হোয়েছেন।"

"আপনি তাকে কি বোলবেন?"

"কি আর বোল্ব? আমার মত দুঃখীর আর কে আছে?"

"আপনার বিয়ে অতি বিচিত্র। কিন্তু বিয়ের কোন চিহ্ন নেই আপনার কাছে?"

"এই আংটী আছে।" বলিয়া বুকের ভিতর হইতে আংটী বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। বলিল জ্ঞান হইলে সে এ আংটীটি পাইয়াছিল।

"আর কিছু বিয়ের কথা মনে পড়ে?"

"না।" হঠাৎ গাড়ীর শব্দ কানে গেল আমি আংটীটি ফিরাইয়া দিয়া বেলার মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলাম "আমিই তোমাকে তোমার স্বামীর পরিচয় দেব।"

"আপনি জানেন? ঠিক জানেন?

"হাঁ।" মুখের কথা মুখেই রহিল একখানি গাড়ী সামনে দাঁড়াইল ও একজন লোক গাড়ী হইতে নামিয়া বেলাকে নমস্কার করিলেন। কি ভয়ানক! এযে আদিত্য মশায়। কি সাহস! এ এখানে?

প্রতারক

-❀-

আমার বিবাহের দিন যাহার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছিলাম সেই প্রতারক আমার দিকে ফিরিয়া বেশ সহজভাবে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বেলা আমার পরিচয় দিল। বাহিরে প্রফুল্ল ভাব দেখাইলেও আদিত্যর আগমনে বেলা যে অসন্তুষ্ট, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছিল। বেলা পরিচয় দিলে সে বেশ সহজভাবেই আমায় নমস্কার

করিল। আমাকে যে সে চেনে তাহার মুখ দেখিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারিলেও সে বাহিরের আচার ব্যবহারে সেরূপ কোন ভাব দেখাইল না। গাড়ীতে বাক্স ও বিছানা দেখিয়া বুঝিলাম সেও এখানে থাকিতে আসিয়াছে। সে বেলাকে বলিল "অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হোল। বেলাদেবী আপনাকে দেখে ভারী খুসী হোলাম।"

"আপনি আসবেন তা নীরজা ত বলে নি।"

"আমি যে আসব তা কালকেও আমি নিজেই জানতাম না। আমি একবছর পরে বিদেশ থেকে কলিকাতায় ফিরেই দেখি আমার রাজা নিমন্ত্রণ কোরেছেন। কাজেই একটা তার ক'রে তখুনি বেরিয়ে পড়্লাম।"

"নীরজা নিশ্চয় জানে না যে আপনি আস্বেন, সে পুষ্পপ্রদর্শনী দেখ্তে গেছে।"

"হাঁ আরবারে এ সময়ে আমিও গিয়েছিলাম মনে আছে?"

"খুব মনে আছে। আমার নতুন বেনারশীখানি বৃষ্টিতে ভিজে জুবজুবে হয়ে গিয়েছিল।"

"ওঃ! তাগো সাড়ীখানি ভিজেছিল তাই আপনার মনে আছে।"

"হাঁ। তাইই বোধহয়। মেয়েরা কাপড় নষ্ট হ'লে সে কথা ভোলে না সহজে।"

"এখানে এবার আর কে কে এসেছেন?"

"সেবারে যাঁরা ছিলেন সবাই আছেন। কেবল ডাক্তার করই এবার নতুন।"

"হাঁ এঁর সঙ্গেও পরিচয়টা হোল।" বলিয়া সে আমার দিকে ফিরিয়া হাসিল। কিন্তু আমার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে আমি তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি। তবুও হাসিয়া বলিল "এখানে আস্লে একমিনিটের অবসর থাকে না। রাজা রাণী বন্ধুদের কত সেবা করেন আপনি ত এতদিনে বুঝতেই পেরেছেন।"

"বাড়ীর সকলেই বড় অমায়িক।"

"আপনার লোকে আদরযত্ন পেলে আর বিদেশে যেতে ইচ্ছে হয় না।"

"কতদিন পরে আস্ছেন?"

"একবছর পরে এই তিন দিন হোল আস্ছি।"

"এই একবছরে আর আসেন নি ?"

"না।" বলিয়া সে আপনার জিনিষপত্র লইয়া বাটীর দিকে চলিল। বেলার মুখ কেমন হইয়া গিয়াছিল দুজনের মধ্যে যে কোন গোপন সম্বন্ধ আছে তা বোঝা যাইতেছিল।

বেলা আবার বলিল "আপনি আসবেন জানলে নীরলা যেত না।"

"কেন যাবেন না ? আমার জন্য কারও আমোদ নষ্ট হয় তা আমি চাই না।"

"আপনার মত এমন প্রিয়লোক আমি খুব কম দেখেছি আপনি সব সময়েই ভ্রমণ করেন।"

"হাঁ আমি বছরে শুধু একবার শীকার কোরতে দেশে ফিরি।"

"অন্য দেশে শীকারের সুবিধা হয় না ?"

"সঙ্গী না হলে শীকার কি জমে ?"

বেলা চাকরকে আদিত্যমশায়ের ঘরে জিনিষপত্র রাখিতে বলিল তারপর রাজাকে খবর পাঠাইল। ততক্ষণে আদিত্যমশায় একটী চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বেলাকে বলিলেন "এখানে আসলে ভারি আনন্দ হয়।"

"আপনি এবার আরও বেশী দিন থাকতে পারবেন ত ?"

"এখানে থাকতে পেলে ত ভাগ্যের কথা।"

এমন সময়ে রাজা প্রবেশ করিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন "আদিত্য আমায় ক্ষমা কর ভাই। আমি নীরলাকে তোমার আসবার কথা বোলতে একেবারে ভুলে গেছি। সে পুষ্পপ্রদর্শনী দেখতে গেছে। একটু একটু সব রকমই চাই ত।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়। তা আর বোলতে ? তা ছাড়া তুমি ত নিজে র'য়েছ।"

"কোথায় ঘুরছিলে এতদিন ?"

"এখানে-সেখানে। আমার কি ঠাঁই আছে ভাই ?"

"বেশ, এবার কিছুদিন থাক। বন্দুকটা এনেছ ত ?"

"হাঁ, হাঁ। সেটা ভুললে ত এখানে আসাই বৃথা।"

রাজা ও আদিত্য যখন কথা বলিতেছিলেন আমি তাঁহাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। তাঁহারা খুব বন্ধু বলিয়া বোধ হইল। বেলা কিছু বিরক্ত হইতেছিল। আমার বিবাহের দিন

আদিত্যকে দেখিয়া বৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইয়াছিল কিন্তু আজ তাহাকে নবীন বলিয়া বোধ হইল। আদিত্যর খাওয়া শেষ হইলে বেলা বাগানে যাইবার জন্য উঠিল, আসিবার সময় আমায় ডাকিল, তারপর বাগানে গেলে বলিল "কি নাম তাঁর ?"

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। প্রচারকের সহিত বেলার কি সম্বন্ধ না জানিয়া আত্ম-পরিচয় দেওয়া সঙ্গত নয় ভাবিয়া বলিলাম "না আমি চিনি না।"

বেলা হতাশভাবে বসিয়া পড়িল বলিল "আপনিও আমায় ঠাট্টা কোরলেন ?"

"ঠাট্টা নয়। সত্যিই আপনার দুঃখে আমি দুঃখিত। আমি একদিন না একদিন আপনাকে আপনার স্বামীর সংবাদ দেব।"

"আমার মত দুঃখী কেউ নেই।"

"আপনি ও আদিত্য লোকটিকে পছন্দ করেন না, কেমন ?"

"না, লোকটি ভাল নয়।"

"কেন ?"

"জঘন্য প্রকৃতি।"

"আমার মনে হয়, লোকটি আপনার শত্রু।"

"ঠিক, কেমন ক'রে বুঝলেন ?"

"প্রথম দেখা হতেই আপনাদের দুজনের মুখের ভাব দেখে। লোকটা কি কোরেছে বলবেন ?"

"আমার মনে হয় আমার স্বামীকে ও' চেনে কিন্তু বলে না।"

হায় ভগবান কবে আমি বেলাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব ?

সন্ধান মিলিল।

—+—

আমি অতি সাবধানে প্রচারকের সকল কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিলাম। কিন্তু তাহার কোন অসদভিপ্রায় দেখিলাম না। আমরা একত্রই আহার করিতাম, বেড়াইতে যাইতাম,

খেলা করিতাম, গল্প করিতাম, আমি এমন ভাব দেখাইতাম যে যেন আমি তাহাকে চিনি না কারণ তাহা হইলে সে আর সাবধান হইবে না আর তাহা হইলে আমারও একটু সুবিধা হইবে। সে বেলার সহিত বেশী কথা বলিত না। তাবে বোঝা যাইত যে সে বেলার বিষয় কিছু গোপনীয় কথা জানে। বেলাও তাহাকে ভয় করিয়া চলিত তার সদাপ্রসন্ন মুখ চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া পড়িল। সেদিন পুষ্পপ্রদর্শনী হইতে ফিরিয়া সকলে আদিত্যকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাবেলায় মজলিসে তাহাকে নিতান্ত অল্প বয়সী বলিয়া বোধ হইত তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমিই অবাক হইয়া যাইতাম। সে যে কোন নীচ কাজ করিতে পারে কাহারো বিশ্বাস করিবার যো নাই। রাত্রে ঘরে শুইতে গিয়া আবার অজ্ঞান হইবার উপক্রম হইল কিন্তু সেদিন সে ভাব বেশীক্ষণ রহিল না। খানিক পরে ভাল বোধ করিলে নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু নিদ্রা আসিল না। আমি আমার রহস্যময়ী পত্নীর কথাই ভাবিতে লাগিলাম। তারপর যে আদিত্য একদিন আমার প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল সে একই গৃহে আমার অতি নিকটে আছে সে কথা মনে করিতেই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই শয্যাত্যাগ করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া ঘরের বাহির হইতেই আবার সেই অবশভাব আমার সমস্ত দেহমনকে অবশ করিবার উদ্যোগ করিল কিন্তু এ আক্রমণ ক্ষণকাল মাত্র রহিল। সমস্তদিন সে রাত্রে বেলা কোথায় গিয়াছিল জানিবার জন্য তাহার সহিত কত গল্পই করিলাম কিন্তু কিছুই বাহির করিতে পারিলাম না। তবে আদিত্য বেলার যে কোন আত্মীয় নয় আর বেলা তাকে যথেষ্ট ভয় করে তাহা বুঝিলাম। বেলার ভয় দেখিয়া আমি এক মতলব ঠিক করিলাম। আহারের পূর্ব্বে আদিত্যকে বাগানে লইয়া গিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে আদিত্য যখন হাসিয়া হাসিয়া আমার পাশে গল্প করিতেছিল কে বলিবে যে সেই আমার শ্বশুর বলিয়া যে পরিচয় দিয়াছিল সেই আদিত্য। যাহা হউক আমি তাহাকে একটা হ্রদের নিকট লইয়া গিয়া তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কঠোর স্বরে বলিলাম "আমি তোমাকে চিনি তা জান ?"

"আমার ত আপনাকে দেখেছি বলে মনে হয় না।"

"স্মরণ শক্তি কম হ'লে সুবিধা আছে। আর বছরে বর্ষাকালের কোন একটি দিনের কথা মনে পড়ে কি ?"

"না। আমি দিন টিন মনে রাখা প্রয়োজন মনে করি না।"

কিছু মনে না থাকা সত্বেও আদিত্যর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া আবার বৃদ্ধ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমি বলিলাম "সেদিন তুমি কলকাতায় ছিলে।"

"না আমি তখন ইংলণ্ডে। আমি অনেক আগেই বেড়াতে বেরিয়ে ছিলাম।"

"আমি ঠিক উল্টে প্রমাণ কোরতে পারি।"

"কেমন ক'রে?"

"প্রমাণ আছে।"

"বেশ তাহলে যা খুসী তা প্রমাণ কর। আমরা ত একলাই আছি।"

"ওঃ! তাহলে তুমি স্বীকার কোরছ?"

"স্বীকার কি কোরব?"

"আচ্ছা আমি যতক্ষণ না সব লোকজন কাগজ পত্র এনে প্রমাণ করি যে তুমি মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটএর বাড়ীতে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বেলার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে শেষে আমায় তাকে হত্যা কোরতে বাধ্য করবার চেষ্টা কোরেছিলে ততক্ষণ অস্বীকার কর। যে পুরোহিত বিবাহ দিয়েছিলেন তাঁকেও চিনি।"

"কি মিথ্যা বক্‌ছ?"

"বেশ দেখা যাবে। তুমি আমার প্রাণহানির চেষ্টা কোরেছিলে আমিও এবার শোধ নেবো।"

প্রতিশোধের নামে আদিত্য একটু ভীত হইল। অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হইল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল "কেন?"

"সে যাই হোক না কেন আমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। আমি সব জেনেছি। তোমরা আমাদের দুজনকে মারবার চেষ্টা কোরেছিলে তার শাস্তি পাবে।"

"আমার এ বিষয়ে এই মত—যে তুমি একটি আস্ত গাধা।"

"বেশ তাই, কিন্তু আমার কথাও শোন, নিরপরাধকে বৃথা কষ্ট দেওয়ার ফল পাবেই।"

সে শুধু মাথা নাড়িল। খানিক পরে দীপ্ত চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিল "বেলা জানে তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হোয়েছে?"

আমি তাহার কথার ভঙ্গীতে বুঝিলাম যে প্রকৃত কতখানি সে আমি জানি তাহা জানিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়াছে, তাই আমিও সতর্কতার সহিত সে প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া গেলাম। "বেলা আমার স্ত্রী আমি তার ভালমন্দর ভার নিয়েছি। আমিই এর প্রতীকার কোরব।"

"বেশ কর।"

"সত্যি কথা বোলতে গেলে বোলতে হয় যে তুমি যদি জানতে যে আমি এখানে এসেছি তাহলে আসতেই না।"

"তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভারী খুসী হোয়েছি।" বলিয়া সে ব্যঙ্গভরে হাসিল।

"ঠিক আর একজন যে রকম খুসী হোত তুমিও সেই রকম হোয়েছ।"

"সে আবার কে?"

"তোমারই বন্ধু। বেশ ভাল কোরেই জান সে, কে।"

"আমি ত বুঝতে পারছি না।"

"তোমার স্ত্রী বন্ধুদের নাম মনে কর।"

"কি নাম?"

"অম্বরা।"

আদিত্য বিস্ময়স্তম্ভিত লোচনে চাহিয়া আমারই কথার পুনরাবৃত্তি করিল। "অম্বরা?" মুহূর্ত্তে তাহার মুখ মৃতের মত সাদা হইয়া গেল। আমি সুবিধা পাইয়া বলিলাম "আমি আস্ত গাধা বটে, কিন্তু এক'মাস আমি যে ঘুমাচ্ছিলাম না তা বুঝতে পারছ বোধ হয়।"

আদিত্য কোন উত্তর দিল না। এতক্ষণে আমি সব জানি বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইল। কিন্তু এবার সে তাহার বিষদন্ত বাহির করিল। "অম্বরা ত তোমার স্ত্রীর উপর প্রতিহিংসা নেবে। তোমার ওপরে ত নয়!"

"হাঁ, তা আমি জানি। মেজর দত্ত ও তুমি তাকে লাগিয়েছ। রাজা যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কারণও জানি।"

এই কথা বলাতে আমি যে তার সব সৎকার্য্যের কথাই জানি একথা সে বিশ্বাস করিল। সে অবশেষে বলিল "রাজা যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা আমি জানি? তুমি কি বোলতে চাও আমি রাজার মৃত্যুর জন্য দায়ী?"

"আমার কি মত তা দিয়ে তোমার কি হবে? তবে এ জেনো যে পাছে বেলাকে খুন ক'রবার চেষ্টা কোরেছিলে তা বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়ে আমাকেও সরাবার চেষ্টা কোরেছিলে।"

"আমি তোমার কথায় ভয় পেয়েছি মনেও ভেবো না। তুমি কি কোরতে পার আমার?"

"আমি জহুরাকে দিয়ে তোমাদের কীর্ত্তি প্রকাশ কোরব।"

"পার ত ক'র। কিন্তু ব'লে দিচ্ছি জহুরা বেলার ভয়ানক শত্রু; তার কাছ থেকে কিছু বার কোরতে বেগ পেতে হ'বে।"

"মনে কোরছ আমি ঠাট্টা কোরছি, না? দেখো আমি সব বের ক'রে ছাড়্‌ব।"

"কখনো পারবে না।"

"পারবো নিশ্চয়। আমি বেলার স্বামী তাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা কোরব।"

"বেশ যা ইচ্ছা কর কিন্তু জহুরাকে বন্ধু ব'লে ভেবো না।"

"একটা কথার উত্তর দাও দেখি। বেলার সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে কেন?"

"উত্তর দেওয়া না-দেওয়া আমার ইচ্ছা, তুমি ত যত খুসী আমায় ভয় দেখালে তা'বলে কি ভাবছ আমি তোমার পায়ে ধ'রব?"

তারপর একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতে ধরাইতে সে বলিল "শেষ হোল?"

"হাঁ এখনকার মত হোল বটে।"

আমার কথায় সে মৃদু হাস্য করিল। আমি বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। বাড়ী ফিরিয়া স্নান করিয়া আহার করিতে গিয়া শুনিলাম আদিত্য বিশেষ কাজে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। এবারেও আমার নিবৃদ্ধিতায় সে পলাইল। রাণী নীরজা বলিলেন "আমি ওঁকে থাকতে অনেক অনুরোধ ক'রলাম কিন্তু কিছুতেই থাকলেন না। রাজা বলিলেন "আদিত্য ভারি অদ্ভুত লোক। কোথায় যে ডুব মারে মাঝে মাঝে।" আমি সুবিধা বুঝিয়া রাজাকে আদিত্যর বিষয় অনেক প্রশ্ন করিলাম কিন্তু আদিত্য একজন ধনবান লোক ও শীকারে সিদ্ধহস্ত আর খুব আমোদপ্রিয় লোক এ ছাড়া আর কিছু জানেন না দেখলাম।"

আমি। আপনি তাঁমশার বন্ধু মেজর দত্তকে চেনেন ?"

রাজা। পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি এখনো।"

সন্ধ্যার সময় সকালে বেড়াইতে গেলে বেলা গেল না। সে যেন কিসের প্রতীক্ষা করিতেছিল আমি তাহার নিকটে যাইতেই সে চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "ডাক্তারবাবু আমার সঙ্গে প্রতারণা কোরেছেন।"

"আমি ?"

"হাঁ, আমি আপনার স্ত্রী।"

আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া লইয়া আবেগ ভরে বলিলাম "অস্বীকার কোরব না। সত্যি বেলা তুমি আমার স্ত্রী। জীবনে তোমার দেখা পেয়ে আমি ধন্য হোয়েছি।"

"আপনিই আমার স্বামী তা জানতাম না।"

"কেমন কোরে জানলে ?"

"আমি হ্রদের ধারে বেড়াতে গিয়ে আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনতে পেয়েছি।"

"সব ?"

"সব।"

"বেলা আমি তোমায় ভালবাসি। আমি বরাবরই তোমায় আমার স্ত্রী বলে জানি। কিন্তু দুজনের মঙ্গলের জন্য এতদিন আমরা যে ষড়যন্ত্রের ভেতর জড়িয়ে আছি তার কিনারা পাবার আশায় আমিই যে তোমার স্বামী তা তোমাকে জানতে দিই নি। কতবার ওই মুখখানি বুকে নেবার, ওই গোলাপী অধরে একটি মৃদু চুমা দেবার বাসনা সবলে দমন কোরেছি। কারণ, কি প্রমাণে আপনাকে তোমার স্বামী ব'লে দাঁড় করাব ? কত রাত তোমার স্বপ্ন দেখতে দেখতে ভোর হ'য়ে গেছে। বল বেলা তুমিও চেষ্টা কোরবে আমার মত অপদার্থকে ভালবাসতে ? বল আমার সঙ্গে একপ্রাণে এ রহস্যজাল ভেদ করবার চেষ্টা কোরবে ?"

"আমার সব গোল হ'য়ে যাচ্ছে ডাক্তারবাবু আমার মনের ভাব কিছু বুঝতে পারছি না।"

"কিন্তু আমায় ঘৃণা কর কি না তাও জান ?"

"আপনাকে ঘৃণা কোরব? কেমন কোরে?"

"তা হলে ভালবাস?"

সহসা অশ্রু জলে বেলার চক্ষু দুটি ভরিয়া মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু অশ্রু সেই সুগোল গণ্ডদেশে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে আমার বক্ষে মুখ লুকাইল আমি তখন তাহাকে আরও বক্ষে চাপিয়া নিয়া চুম্বন করিলাম। সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। সে কান্নার শেষ নাই। আমি তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বিবাহের পর সে কি কি করিয়াছে সব খুঁটিনাটি প্রশ্ন করিলাম। সে সব বলিল। শুনিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

ক্রমশঃ—

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

আকস্মিক!

যে দিন সে হায় হঠাৎ গেল ঝরে,
মাঝ ফাগুনে দমকা হাওয়ার ভরে,
চমক-লাগা আঁখির পাতে,
ইন্দ্রজালের আলপনাতে,
ফাঁকির আখর ফুটল কেবল-
এক নিমিষের তরে।
যে দিন সে হায় হঠাৎ গেল ঝরে।

এই যে ছিল, পদ্মতো এই আছে,
ওই না তাহারি মূর্ত্তি চোখে নাচে!
　　ওই যে ভ্রমর আসছে ছুটে,
　　মধুর মদির নিত্তেই লুটে,
　　হতাশ প্রেমিক—বজ্রাহত—
　　　　সে কি যে আর আছে।
এই যে ছিল—পদ্মতো এই আছে।

ফুল শয়নের দোলনা দোলে ওই
শয্যাশায়ী কই সে কোথায়—কই!
　　লুকোচুরীর এই অভিনয়,
　　সত্য ব'লে মনেই না লয়,
　সন্দ সদা মনের মাঝে,
　　　　দারুণ ব্যথা বই।
ফুলশয়নের দোলনা দোলে ওই।

নাইকো সে আর—! তাই কখনো হয়!
মিথ্যারি আজ হোক্‌না ওগো জয়;
　　সত্য তোমার সত্য রাশি,
　　প্রলয়বোলে যাক্ না মিশি,
　নিঠুর তোমার দরাজ্ কথা,
　　　　শুনতে লাগে ভয়।
নাইকো সে আর,—তাই কখনো হয়!

কাছ ছেড়ে তার এই তো এলাম হেথা,
কর্ণে বাজে বর্ণে বর্ণে কথা ;
—ভুল্ বুঝেও মন বোঝে না,
মানায় কারো মন মানে না,
পাওনা-দেনা চুকিয়ে কি আজ,
রইল বাকী—ব্যথা ?
কাছ ছেড়ে তার এই তো এলাম হেথা।

শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়।

সহৃদয়তা।

—:*:—

দেশ মধ্যে সর্ব্বত্র ভোটদ্বন্দ্ব চলিতেছিল তখন Statesman এর সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে "যে সুরেন্দ্রনাথ অর্দ্ধ শতাব্দী কাল রাজনীতিক ক্ষেত্রে দেশের সেবা করিয়াছেন সেই সুরেন্দ্রনাথকে কোথায় বিনা বাধায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকল বাঙ্গালী একবাক্যে ভোট দিবেন না সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে বঙ্গদেশ হইতে কি Chivalry একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে ?" এই প্রশ্নের উত্তর এই যে আমাদের দেশে Chivalry মোটেই নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। দেশে অল্প মাত্র Chivalry থাকিলেও সুরেন্দ্রনাথ অবশ্যই ভোট পাইতেন তবে আশা এই যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষ যখন চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে তখন হয়ত একটা প্রতিক্রিয়াও অচিরে উপস্থিত হইবে। আর ইংরেজ বিদ্বেষী স্বরাজ্যবাদীদেরও যেরূপ অতি বৃদ্ধি হইয়া দেশ মধ্যে যেরূপ অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছে তাহাও একটা প্রতিক্রিয়াও শীঘ্র সমুপস্থিত হইবে বলিয়া আশা করাও যাইতে

পারে। কিন্তু অন্য পক্ষে এরূপ প্রশ্নও উঠিতে পারে যে সুরেন্দ্রনাথের নিজের মনেও কি সকল বিষয়েই Chivalry আছে? যদি থাকিত তাহা হইলে তিনি যখন বরিশালে গিয়াছিলেন তখন সেখানে রোগ শয্যায় শয়ান অশ্বিনীকুমার দত্তকে অবশ্যই একবার দেখিতে যাইতেন।

যাহা হউক আমি সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে এখন প্রবৃত্ত হই নাই। Statesman এর প্রবন্ধ পড়িয়া আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইল যে ইংরেজী Chivalry শব্দের বাঙ্গলা অনুবাদ কি? ইহার কিছুদিন পরে আর একখানি ইংরেজী পত্রিকায় Be chivalrous এই শীর্ষক একটী সুলিখিত প্রবন্ধ পড়িয়া আমার বোধ হইল যে সহৃদয়তা শব্দ Chivalry শব্দের প্রতিশব্দ হইতে পারে। প্রবন্ধটী আমার খুবই ভাল লাগিল এবং বাঙ্গালী মাত্রেরই সেটা চিন্তনীয় হইবে এই ভাবিয়া নিম্নে তাহার একটা অনুবাদ দিলাম।

"আমরা সকলেই প্রীতি, সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইতে ইচ্ছা করি। সহৃদয়তাই আমাদের মধ্যে সেই বস্তু যাহা নিশ্চয়ই প্রীতি, সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করাইতে পারে।

"সহৃদয়তাই মনের মহানুভবতা। নীচতা এবং ক্ষুদ্রতা সহৃদয়তার বিপরীত।

"অপরের প্রতি সহানুভূতিই সহৃদয়তা; ইহার বিপরীত স্বার্থপরতা এবং অন্তঃসার-শূন্যতা।

"সহৃদয় হইতে হইলে ব্যবহারে নম্র এবং কর্ম্মে দৃঢ় হইতে হইবে।

"ইহা হইতে আমরা ভদ্র এবং অভদ্র লোকের পার্থক্য দেখিতে পাই। বন্য ও অভদ্র লোকও যেমন নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করিতে পারে এবং শত্রুকে আঘাত করিতে পারে ভদ্র লোকও সেইরূপ পারেন; কিন্তু তিনি নির্ম্মম নহেন এবং কখনও অনুচিত সুবিধা পাইয়া কার্য্য করেন না।

"সহৃদয় পুরুষ নারীকে সর্ব্বদাই সম্মান করেন এবং অন্য পুরুষের প্রতি সদ্বিবেচনা করেন। সহৃদয় নারী নিজের দুর্ব্বলতার সুবিধা গ্রহণ করেন না।

"সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই আপনা অপেক্ষা দুর্ব্বল এবং দরিদ্র লোকের প্রতি বিবেচনাশীল এবং দয়ালু। দাম্ভিকতা এবং সকলকে ছাড়াইয়া অগ্রবর্ত্তী হইবার চেষ্টা নীচতার লক্ষণ।

"সহৃদয় ব্যক্তি সর্ব্বদাই ভদ্র। তিনি রূঢ় ভাব এবং উচ্চরব পরিহার করিয়া থাকেন। সহৃদয় নারী কখনও অসংযত ভাবে আড়ম্বর প্রদর্শন করেন না। তিনি তাঁহার মনোভাব

সংযত রাখেন এবং তাঁহার পরিজনকে যথাশক্তি ভাল রাখিতে চেষ্টা করেন।

"যিনি অধিকাংশ লোককেই সুখী করেন তিনিই উৎকৃষ্ট পুরুষ এবং উৎকৃষ্ট নারী।"

"যদি প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বা নারী এরূপ দৃঢ় নিয়ম অনুসরণ করেন যে একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত তিনি কখনই এমন কোন কথা বলিবেন না যাহা কাহারও মর্ম্মে আঘাত করে তাহা হইলে তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করেন।"

"এই নিয়ম অনুপস্থিত লোকের সম্বন্ধে ও পালন করা উচিত। যদি আমরা এই স্থির নীতিদ্বারা পরিচালিত হই যে কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে এরূপ কোন কথা বলিব না যাহা আমরা তাহার সাক্ষাতে বলিতাম না তাহা হইলে আমরা বহু মনঃকষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইব।

"নম্রতাই সহৃদয়তার জীবন। প্রকৃত নম্রতা কেবল কেতুবাদে এবং এবং ক্ষমা প্রার্থনায় হয় না। মনোমধ্যে যে নম্রতা থাকিলে আমরা পরের ভাবনা যত ভাবি নিজের ভাবনা তত ভাবি না, যাহা থাকিলে আমরা জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক হই এবং যাহার ফলে আমাদিগের যত বিষয়ে জ্ঞান আছে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বিষয় জ্ঞাতব্য আছে বলিয়া মনে করি সেই নম্রতাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

"কৃত্রিম নম্রতা বড় অপ্রীতিকর। কৃত্রিম নম্রতা দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে যে ব্যক্তি কৃত্রিম নম্রতা প্রদর্শন করে সে বাস্তবিক নম্র নহে কিন্তু কোন অভিপ্রায় সাধনের জন্য নম্রতার ভাণ করে। কিন্তু প্রকৃত নম্রতা আমাদের প্রতিকার্য্যেই স্ফুট হয় এবং আমরা যত লোকের সংস্রবে আসি তাহাদের নিকট আমাদিগকে সদয়, সাহায্যকারী এবং সৌজন্যশীল করে।

অনুবাদের মন্তব্য :—এই সুচিন্তিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী অনুবাদ করিতে করিতে অনেক জন মৃত ও বর্ত্তমান সহৃদয় বাঙ্গালীর কথা মনে উদিত হইল—রামমোহন রায়, রামতনু লাহিড়ি, শিবনাথ শাস্ত্রী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকগণ।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

সাঁঝের খেয়া।

—❖-•-❖—

উড়ু-উড়ু মন নিয়ে
　　আজি ত্বরিতে,
গিয়েছিনু সন্ধ্যায়
　　খেয়াতরীতে।
দেখেছিনু অভিরাম
সুষমা সে নব শ্যাম,—
　আশেপাশে ক্ষেতগুলি
　　লেখা হরিতে!

আকাশ রঙের খেলা
　　লাল ও কালো,
প্রতিরূপ ঢেউ'এ তার
　　লেগেছে ভালো।
যেথা যেথা হ'ল বোনা
পড়ন্-রোদের সোনা,
　হৃদয়-গাগরী সেথা
　　দি'ছি ভরিতে!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

বিলাতের পত্র।

———*———

উডহাম কলেজ,
২৪-১-২৪।

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু,

ছোট মামা, আপনার পত্র পেয়েছি ; কিন্তু সময় মত জবাব দেওয়া হয় নাই, তার কারণ হচ্ছে আপনি এত সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, তার সদুত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। আমি ইংলণ্ডে এসেছি সত্য, কিন্তু দর্শকের ন্যায় বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি। এখনও উহার অন্তরে প্রবেশ করতে পারি নাই ; কখনও পারব কিনা সন্দেহ। এ জাত অত্যন্ত বাহিরে সংযত ; যখন খাওয়ার টেবিলে স্ত্রী চা ঢেলে দেন, স্বামী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে ছাড়ে না তখন বুঝাই যাচ্ছে এদের মধ্যে ভদ্রতার বাঁধাবাঁধি কত বড় ; সেই জন্য আমি কখনও আশা করি না যে এদের শীলতার পর্দা ফাঁক করে ইহাদিগকে সাধারণ জীবনের সুখ দুঃখ দেখতে পাব। আমাকে এরা "এটিকেটের" কঠোর শাসনে দূরে দূরেই রাখবে।

আমার প্রতি কখনও এ দেশের কেউ অভদ্রতা করে নাই। বাহিরে কথা বলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের মত কি জানা খুবই কঠিন। এরা সাধারণতঃ ব্যবসায় এমন কঠোর নিয়মে চলে যে কিছুতেই আর কিছু প্রকাশ করতে চায় না ; কিন্তু অনেক সময়ই বর্ণ বিদ্বেষ এমন উলঙ্গভাবে প্রকাশিত হয় যখন ভারতীয় ছাত্র দেখিলে অনেক ল্যাণ্ডলেডি ও হোটেলে আশ্রয় দিতে চায় না। এই বর্ণ বিদ্বেষ আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসেরই খুব বেশী। যদিও ফরাসী দেশেই রুশো জগতে জন সাধারণের সমান অধিকারের বাণী প্রচার করেন কিন্তু এই নূতন মন্ত্র গ্রহণ করে সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা। আমেরিকান রিপাবলিক ফরাসী রিপাবলিকের পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের Declaration of Independence-এর প্রথম কথাই হচ্ছে Every man is born equal and has an inalienable right to liberty. দুঃখের বিষয় যারা এই এত বড় মন্ত্রে নিজেদের জাতীয়তার উদ্বোধন করেছে তারা কার্য্যে ইহার

সার্থকতা রক্ষা করে নাই। তাদের নিগ্রোদের প্রতি ঘৃণা, Lynch law, Kukhixklan প্রভৃতি সুবিদিত। সেদিন প্যারীসের এক হোটেলে পুষ্করার ডাক্তারী রাজের পুত্রও সঙ্গীরা ফরাসী মেয়েদের সঙ্গে নৃত্য করছেন এই দৃশ্য কয়েকজন আমেরিকান টুরিষ্ট (Tourist) এর সহ্য হয় নাই। সুন্দর ফরাসী মেয়েরা যে তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া কালোর সঙ্গে আমোদ করছেন, কালোর এই স্পর্দ্ধার শিক্ষা দেওয়ার জন্য তারা যথোচিত প্রহারের পর তাহাদিগকে হোটেল হইতে তাড়াইয়া দেয়। ইহাতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যে কথা তাদের কমিউনিকে প্রচার করেছেন তা বড় আশার তাঁরা বলেছেন, ফরাসী প্রজা সকলেই সমান। যদি আমেরিকানদের তা সহ্য না হয় তবে তাঁরা যেন ফরাসী দেশে না আসেন এবং এর পর এই অপরাধের গুরুতর শাস্তি হবে। নিগ্রো Boxer সিকির সঙ্গে ইংলণ্ডের champion এর কুস্তি হতে দেওয়া হয় নাই। আমাদের দেশের একখানা বড় কাগজ (Modern Review) যখন মানুষের অধিকার, democracy প্রভৃতি সম্বন্ধে আমেরিকার কাগজ থেকে আমাদিগকে বচন শুনান, এবং ভারতবর্ষে ইংরাজদের শাসননীতি তাঁদের বড় বড় নীতি বাক্য উদ্ধৃত করে কঠোর সমালোচনা করেন, তখন আমার মনে অত্যন্ত মজার সেই কথাটাই আসে To rob Peter to pay Paul. আমার আলাপ এখানে ছাত্র মহলেই। তারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানে না, কেবল কলকাতা, বোম্বাই মান্দ্রাজের নাম জানে, আর জানে গান্ধী বলে কে একজন আছেন, এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে লর্ড রিডিং 'পপুলার' কিনা? ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া উচিত কিনা এ সব কথার সর্ব্ব প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে "Can you defend yourselp against one another? Can you keep out Japan and Afganistan?" এ সব কথার উত্তর বুঝিয়ে দেওয়া এদের কাছে শক্ত; কিন্তু যখনই মনে করি দেশব্যাপী যে অজ্ঞানতা বিরাজ করছে, যে আচারের ফলেই আমাদিগকে একবারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলেছে এবং আজও হিন্দু মুসলমানে ধর্ম্ম নিয়ে কলহ চলছে তখন এই অপ্রিয় সত্যটা স্বীকার করতেই হয়।

এই দেশের লোকের বাহিরে একটা কঠোর সংযম আছে যা আমাদের কাছে সর্ব্ব প্রথমেই চোখে ঠেকে। খৃষ্টমাসের সময় প্রায় পনর কুড়ি দিন অনেকে এক হোটেলে কাটিয়েছি তারা এক সকাল বেলা Good morning ছাড়া অন্য কোনরূপ আলাপের চেষ্টা

কোন দিন করে নাই। Thank you, I am sorry প্রভৃতি বুলি সর্ব্বদা জিভের কোণে এনে রাখতে হয়। আমার অনভ্যাস বশতঃ প্রথমতঃ সব তুচ্ছ ব্যাপারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়ে উঠত না; এখন এত সচেতন হ'য়েছি যে বোধহয় অনেক সময় অনাবশ্যক রূপে ধন্যবাদ ছড়াই। এখানে ভিক্ষুকরা প্রায়ই এমনি পয়সা চায় না; কোন কিছু জিনিস কিনতে অনুরোধ করে যেমন দেশলাই টাইপিন ইত্যাদি। তাকে যদি বলি "no, excuse me" তখন সে বলে "Thank you" ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিলেও যে ধন্যবাদ দেয় তা কোন দেশে দেখি নাই, আমাদের দেশে কিছু কম হলে আশীর্ব্বাদের বদলে অভিশাপই লাভ হয়। এদের বাহিরে এই কঠোর etiquette এর বাঁধন এই এত বড় বড় সহরের অসংখ্য জনস্রোতে, থিয়েটার বাস টিউবের অগণিত যাত্রীর ভিড়ে শান্তি রক্ষা করছে। এখানে টিকিট ঘরের কাছে মারামারি নাই। যে যত পরে এসেছে সে লম্বা সারের ঠিক মত যায়গায় দাঁড়িয়ে আছে; তার পুরোবর্ত্তী এক এক করে টিকিট নিয়ে যাচ্ছে; তারপর সে। আমাদের দেশে মনে আছে যেদিন কোন ভাল Cinema দেখতে যাওয়া যেত সেদিন টিকিট কেনা এক প্রাণান্তকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। টিকিটের কামরার সম্মুখে যেন অমৃতের জন্য সুরাসুরে যুদ্ধ বেধেছে। এ দেশে ভাল ভাল থিয়েটারে ভিড় কোন অংশে কম নাই। এক একটা নাট ৩০০।৪০০ রজনী পর্য্যন্ত প্রায়ই দেখান হয়। কিন্তু এদের ভিড় যে রকমে হয় তা আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেদিন বড় দিনের মধ্যে Daly's থিয়েটার বলে একটা রঙ্গমঞ্চে Madam Pompadour বলে নূতন একটা অভিনয় আরম্ভ হল; আরম্ভ সময় রাত ৮—৫ মিনিট কিন্তু তার পূর্ব্বদিন রাত থেকে টিকিট ঘরের কামরার কাছে ভিড় আরম্ভ হল। একজনের পর আর একজন করে সার কেবল লম্বা হ'তে লাগল। কিন্তু এই সব থিয়েটারে উৎসাহীদের আহার ত চাই। যায়গা ছেড়ে গেলে হয় ত ফিরে পাওয়া যাবে না, এবং সঙ্গে সঙ্গে টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা চলে যাবে. এই ভেবে তারা সব Street boyদের ঐ যায়গা রাখতে ভাড়া করল; একেই বলে সখ। আমি কেবল এই কথাই বলতে চাই যে এ দেশে সখ আমাদের কারও চেয়ে কম নাই; কিন্তু এখানে একটা বাহিরের শীতলতা আছে। এইজন্য ইংরাজ জাতকে বড় Cold মনে হয়; কিন্তু এ রকম না হলে এদের ঐ বড় বড় সব ব্যাপার চলত

কিনা সন্দেহ। প্রত্যেককেই স্বাধীনতা দেওয়া ও নিজে জোর করে অন্যের ব্যাপারে প্রবেশ না করা একটা মহদ্গুণ; তবে এরূপ এ জাতের দোষও আছে।

আর একটা জিনিস খুব করে চোখে পড়ে—তা হচ্ছে এদের নিম্নশ্রেণীর প্রতি ব্যবহার। 'বাস', টিউব প্রভৃতিতে মাত্র একটি ক্লাশই আছে, এক আসনে হয় ত বসে আছে বহুমূল্যবান Fur পরে, সিল্কের হ্যাট মাথায় দিয়ে একোধরা ফ্যাসনেবল লেডি; তার পাশেই বসে আছে একজন ছিন্ন পোষাকে দরিদ্র মজুর; এর জন্য লেডি অন্ততঃ বাহিরে নাক সিটকাচ্ছেন না। ট্রামে আমাদের পাশে যদি একজন গাড়োয়ান বিড়ি মুখে করে বসে তবে আমাদের অন্তরাত্মা জ্বলে উঠে। সেইজন্য আমাদের বাবুরা কখন ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে যান না। আমাকে এক বন্ধু বলেন যে বোধহয় আমাদের দেশের উচ্চ শ্রেণীর (educated) সঙ্গে এ দেশের উচ্চ শ্রেণীর বেশী তফাৎ নাই, কিন্তু এদের নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে আমাদের নিম্নশ্রেণীর আকাশ পাতাল তফাৎ। এখানে চাকরকে খুব কমই গালাগালি দিতে হয়, সে নিজের কর্তব্য খুব বুঝে এবং তা ঠিক মতই করে। কিন্তু আমাদের দেশের সব চাকরই রবীবাবুর সেই "কেষ্টা"। "যত পায় বেত না পায় বেতন তবু না চেতন মানে।" আমাদের নিম্নশ্রেণীর আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান বহু যুগের শাস্ত্র ও মনিবের অত্যাচারে একবারে চলে গিয়েছে। সেই জন্যই —

মহা কলরবে গালি দেই যবে পাজি হতভাগা গাধা
দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জ্বলে যায় চিত্ত

হয় ত অনেকের মনে হবে আমাদের দেশে চাকর একবারে নিজের পরিবারের একজন হয়ে দাঁড়ায়, তার সঙ্গে শুধু কায নিয়ে সম্বন্ধ নয়; কিন্তু প্রত্যহ Times প্রভৃতি কাগজে Wills, bequest প্রভৃতি যা দেখা যায় তাতে বুঝা যায় এদেশের মনিবের চাকরে উপর টান একটুও কম নয়। প্রায়ই দেখতে পাই মৃত্যুকালে মনিব প্রত্যেক চাকরকে অনেক টাকা দান করে গেছেন এবং পুরাণো চাকরদের বার্ষিক বৃত্তি দিয়ে গিয়েছেন, যে দেশে নিয়ম ছিল শূদ্র বেদ পড়লে কানে সীসা গলিয়ে ঢেলে দিয়ে তার স্পর্দ্ধার শাস্তি দেওয়া হবে, যেখানে আদর্শ প্রজারঞ্জক রামচন্দ্র শূদ্রকে তপস্যা করার মহাপরাধে হত্যা করেছিলেন সেখানে নিম্নশ্রেণী আর কত বড় হবে। আর আমরাও সেই মহামান্য আর্য্যজাতির বংশধর কিছুতেই শূদ্রকে

বিদ্যা দান করব না, কারণ আমাদের পিতামহরাই বলে গিয়েছেন যে তা হলে তারা ধ্রুব "রৌরব-নরকং ব্রজেৎ," শূদ্রের এ হিত করা চাইত।"

আমি যে বাড়ীতে থাকি তার কর্ত্তা কাঠের কারখানায় কাজ করে। আমাদের দেশে অসাধু ভাষায় যাকে বলে ছুতার সে তাই। কিন্তু তার দুখানা খবরের কাগজ পড়া চাইই। সেদিন ইংলণ্ডে নূতন Election হয়ে গেল, সে Conservativeদের Vote দিয়েছে। এখানে যিনি Conservative Candidate তিনি পরাজিত হয়েছেন। সে রাত্রে সেই খবর শুনে সে আমার কাছে ছুটে এল, যেন তার খুব একটা প্রিয় ব্যক্তি মারা গিয়াছে—গভীর নৈরাশ্যে বলেছিল—"So, this is the good sense of the people of Oxford" সে নিজে শ্রমিক হলেও শ্রমিক দলে তার সহানুভূতি নাই, কারণ তার বিশ্বাস শ্রমিকরা বেশি সময়ই অন্যায় দাবী করে। এই Electionএ যখন শ্রমিকদের গবর্ণমেণ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা হল তখন তার দুঃখ দেখে কে? তারপর আমি ছুটিতে এখানে ছিলাম না, এবং এর মধ্যে সেই সম্ভাবনা সত্য হয়ে দাঁড়াল। আমি যেদিন ছুটী শেষ করে অক্সফোর্ডে ফিরেছি তার সঙ্গে দেখা হয়ে প্রথম কথাই সে বলল—"So Labour is going to office; it is the worst day for old England." এতে আমি শুধু বলতে চাই এদেশের লোক নিজেদের জাতীয় কাজকর্ম্মের কতদূর খবর রাখে এবং কত খোঁজ নেয়।

কিন্তু এই Electionএ আর একদিকও দেখেছি। চার্চ্চিল বেচারা ডার্ডানেলেস অভিযানের (Dardanelles Campaign) এর অপরাধে কোন যায়গায় কথাই বলতে পান না। এক যায়গায় তাঁকে একেবারে থুথুতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল; শ্রমিকরা অনেক স্থানেই জোর করে অপর পক্ষের সভা ভেঙ্গে দেয়। এই অক্সফোর্ডেই যিনি নির্ব্বাচিত হয়েছেন তাঁর নিজের যোগ্যতায় কতটা সন্দেহ। তিনি সব গরীবদের বাড়ী যেয়ে চা খেতেন, তাদের ছেলেমেয়ের প্রশংসা করতেন, তাদেরকে মোটরে নিয়ে ঘুরতেন; এই করে তিনি গরীবদের বিশেষতঃ যত স্ত্রীলোকের মন অধিকার করেছিলেন।

চিঠিটা বড় হয়ে চলল। এবার ছুটীর প্রথম পনর দিন লণ্ডনে কাটাই। দেখার মধ্যে South Kensingtonএ natural historyএর museum, এবং Albert and Victoria

museumএর ভারতীয় অংশ দেখেছি. এখানে একটা খুব ভাল বন্দোবস্ত আছে যে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে একজন Official guide দুই ঘণ্টা এক একটা বিষয়ে বক্তৃতা দেন; বক্তৃতার বিষয় মিউজিয়ামের সব জিনিস অবলম্বন করিয়া। আমি যেদিন যাই সেদিন বিষয় ছিল Evolution of man from lower animals. তিনি কি করে জলচর প্রাণীরা স্থলচর হয়েছিল, তারপর স্থলে এসে তাদের কি করে বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকশিত হতে লাগল এই সব বিষয় সমস্ত দর্শকগণকে নিয়ে নানা ঘরে নানা প্রাণীর কঙ্কাল ও মৃতদেহ দেখাইয়া বিবর্ত্তনের ইতিহাস চাক্ষুষ প্রমাণ করিয়া দিলেন। এই সব লোক শিক্ষার কত সুবিধা করেছে। অনেক মজার জিনিসও জানা যায়, যেমন হিপোপটামাস হচ্ছেন আমাদের শুকরের বড় ভাই, গণ্ডার হচ্ছেন আমাদের ঘোড়ার সৈনিক ভ্রাতা। আলবার্ট মিউজিয়ামের ভারতীয় অংশ এত বড় যে সামান্য দুইচার ঘণ্টা দেখে তার কোনই ধারণা করা যায় না। আমার কেবল এই কথাটা মনে হতে লাগল যে এখানে এসে ভারতীয় সভ্যতাকে ও ভারতকে যেমন ভাবে জানা যায়, আমাদের ভারতবর্ষে বোধ হয় এত সহজে জানা যায় না। সম্মুখেই বাংলাদেশের একটা হাটের ছোট সংস্করণ রাখা হয়েছে; এটি নির্ম্মাণ করেছেন কৃষ্ণনগরের এক বিখ্যাত পাল, হাটের মধ্যে যে তুমুল কোলাহল হয় তা এই সব মূর্ত্তি দেখে যেন বুঝা যায়। তাঁর হাতের একটি স্বর্ণকার ও একটি তাঁতির মূর্ত্তিও আছে। দেওয়ালে সব অজন্তাগুহার চিত্র, কতক শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র গুপ্তের অঙ্কিত, তার পাশেই মোগল আমলের সব চিত্র; আকবর নামা প্রভৃতি হইতে এ সমস্ত চিত্র সংগৃহীত। বহু বৌদ্ধ মূর্ত্তির সমাবেশ আছে। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে আমাদের দেশে কোন ভাস্কর্য্য ছিল তার নিদর্শন পাই নাই; কিন্তু একটা জিনিস বড়ই চোখে পড়ে, তা হচ্ছে সমস্ত বুদ্ধমূর্ত্তির নাক একটু চেপ্টা, তা হলে কি বৌদ্ধযুগের তখন শিল্প ভারতের নিজের নয়, মঙ্গোলীয়দের যেন ছাপ পড়েছে। আর একটা জিনিস ভারতীয়মূর্ত্তিতে দেখেছি যা হচ্ছে তাদের কোন শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিদর্শন নাই। গ্রীকমূর্ত্তির প্রত্যেকটাই এক একটা স্যাণ্ডো, শরীরের সমস্ত অংশের মাংসপেশী দেখা যায়, যেন একটা জীবন্ত মানুষ। গ্রীকশিল্পীরা যে সব মূর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আজ পর্য্যন্ত দৈহিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ রহিয়া গিয়াছে। এ হিসাবে এই সব ভারতীয় মূর্ত্তি তাদের কাছে অত্যন্ত হার মানে; এ হিসাবে যেন এরা অনেকটা মিশরীয় 'মামী' রক্ষক

মূর্ত্তিদের মত ; তাদেরও Featureএর পূর্ণবিকাশ নাই, মুখ সেই চেপ্টা ও প্রায় সমতল। কিন্তু হিন্দুমূর্ত্তি দের মুখে একটা ভাব আছে যা খুবই সুন্দর। প্রত্যেক বুদ্ধমূর্ত্তির মুখে একটি শান্ত সমাহিত ভাব ; এক যায়গায় একটি পণ্ডিতমশায়ের মূর্ত্তি আছে, এটি উড়িষ্যাদেশের ; খুবই প্রাচীন, কিন্তু পণ্ডিতমশায় তাঁর সুবিখ্যাত "Cunning as a Pandit' ভাবটি ছাড়েন নাই। সমস্ত মূর্ত্তির মুখে এই বৌদ্ধ ছাপ দেখে আমার এই কথাটাই মনে হল বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্বে এই সব বোধ হয় তেমন বিকশিত হয় নাই ; সেই মহাপুরুষ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কঠোর শৃঙ্খল দূর করিয়া যে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন, তা যেমন ভারতের বাণী তিব্বত, চীনে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি বোধ হয় সেই সব দেশ থেকে এই সুকুমার শিল্পের আদর্শ নিয়ে এসেছিল। এ বিষয়ে আমার মত ঘোরতর অজ্ঞের কিছু বলতে যাওয়াই হচ্ছে বোকামি ; তবু যা আমারে খুব লেগেছিল, আপনাকে লিখলাম। অজন্তাগুহার চিত্রেও তাই, অবয়ব কি শারীরিক সৌন্দর্য্য বিকাশের কোন চেষ্টা নাই, কিন্তু মুখে যে একটা ভাব আছে, তার তুলনা নাই। রাস্কিন যে চিত্রকে কবিতা বলতেন, তা অজন্তাগুহার এই সব দেখলেই বুঝা যায়। মোগল চিত্র খুব ভাল বোধ হল না ; একখানা ছবির মধ্যে একশত মানুষ, সকলে ভিন্ন কাষ করছে, আর রঙের এত প্রাচুর্য্য! রাজাদের পোষাকে সোনালী রঙ দিয়া এরা ক্ষান্ত হয় নাই, ছবির বর্ডারও সোনালী রঙে সুশোভিত করেছে, তারপর এক ছবিতে হাতী, ঘোড়া, মানুষ, আকাশ, পাখী, পর্ব্বত সব একত্র করা ; এত বেশী detail, সুতরাং এ চিত্র মনে লাগে না ; অল্পের মধ্যে যে অনন্ত ভাব ফুটাইয়া তোলা যায় তা এই মোগল চিত্রে নাই, আমার মনে হয় অজন্তাগুহার ছবিতেও অনেক লোক সমাবেশে তা অনেক নষ্ট হয়েছে। আমাদের জাতের বিশেষত্ব যেন এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুশীলনে, যাকে বলে চুল-চেরা বিচারে। যখন কাব্য বিচার করতে গেলে প্রথমতঃ দেখতেন ব্যাকরণ ভুল কয়টা, এবং ছন্দে অনুষ্টুপ কি ত্রিষ্টুপ কি আর কোন কঠিন যতির কোন ভুল হয়েছে কি না, তখন ভাবরাজ্যে রস গ্রহণের বড় কথাটাই "It is within limits that the master reveals himself" হয় তঃ তাঁরা অস্বীকার করতেন।

আর এই মিউজিয়াম নিয়ে বেশী লিখব না, কিন্তু বলার অনেক আছে ; আর এই লণ্ডন সহরে নানা জাতের কীর্ত্তির পাশে আমাদের এই সব কীর্ত্তি দেখলে যেন নিজেদের সম্বন্ধে সত্য

জ্ঞান হয়; কেবল অস্ত্রের কথা একটু বলব। যে ঘরে ভারতীয় প্রাচীন অস্ত্রের সমাবেশ আছে, সেখানে বাংলার কিছু নাই।* বাংলার বটি, দা, কুড়াল প্রভৃতি যে সব অস্ত্র আছে তা এই সব রাজপুতদের বল্লম, ভল্ল, ঢাল, তরোয়ালের সাথে না এনে ভালই করেছে। আর অস্ত্রের মধ্যেও সাজসজ্জার অভাব নাই; কে বলে আমাদের জাতের কল্পনা নাই। ঢালের চারটা চক্ষু আছে, একটা পান্নার, একটা চুনীর, একটা হীরার আর একটা বোধহয় আরও কোন দুষ্প্রাপ্য রত্নের; তরোয়ালের বাঁট গজদন্তের, তার উপর মণি মাণিক্যের কাজ করা; না হয় রাজার পদ্ম হস্তের মধ্যে এইটুকু থাকবে জন্য তাকে সেই শ্রীহস্তের উপযুক্ত করে সুশোভিত করা হয়েছে, কিন্তু যেখান দিয়ে শক্র বধ হবে সে স্থানেও কেন এই সব কারুকার্য্য ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য। সুতরাং বেচারা রাজা যখন এই সুশোভিত ঢাল ও সুদৃশ্য তরোয়াল হাতে করে গজনীর মামুদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন শক্রর হাত থেকে নিজের মাথাটা রক্ষা করবেন কি এই মহামূল্যবান অস্ত্রটিকে রক্ষা করবেন, স্থির করতে পারেন নাই; হয়তঃ অস্ত্রকেই রক্ষা করতে চেয়েছিলেন; ফলে মাথা তো হারাইয়াছেন, সাধের অস্ত্রও বিশ্বাস ঘাতকতা করে মন্ত্রপূত দেওয়া সত্ত্বেও যবনের হাতে পড়েছে। যে সব কামান আছে সবটার চেহারাই ভীতিজনক; কোনটা অজগর, কোনটা বিছার মত। কিন্তু এমনি দেখতে যত ভয় করে বোধহয় কাজে সে রকম নয়; তা না হলে আলবার্ট মিউজিয়ামে এদের নির্ভয়ে আনা হত না। আমার এক বন্ধু সাথে ছিলেন, তিনি মাদ্রাজী; এই সব দেখে বলে উঠলেন—No wonder that you were defeated.

আমার এই সব পড়ে আপনারা নিশ্চয়ই ভাববেন ছেলেটা একেবারে পশ্চিমের অন্ধস্তাবক হয়ে পড়েছে; মাতৃভূমিকে একবারে মানে না, কুলাঙ্গার। আমি ভাবছি কবে আমাদের বহুদিনের মরা জাতিটাকে কোন কুলাঙ্গার শ্মশানের চিতায় তুলে দিবে? জগতে বেঁচে থাকার একটা প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, যার জন্য বাবিলন, এসিরিয়া, মিশর, ফিনিসিয়া, গ্রীক প্রভৃতি ধ্বংস হয়েছে এবং আমাদের জাতকে একবারে দুঃসাধ্য প্যারালিসিশ paralysis ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে। পৃথিবী চির পরিবর্ত্তনশীল; প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে এর অবস্থা কেবলই পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে জলবায়ু তাপ, উদ্ভিদের যে পরিণতি ছিল, আজ তা নাই, এবং দুই দিন পরে আবার নূতন হবে। সুতরাং আজ যারা বেঁচে

থাকার যে নিয়ম আবিষ্কার করেছেন, সেই নিয়ম অবলম্বন না করলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। যাঁরা ভাবছেন যে সেই দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কুটীর ও তপোবনের ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে আমাদের সর্ব্বপ্রথমে উচিত, তাঁরা আমার মনে হয় ভুলই করছেন। আমার ঘোরতর সন্দেহ হয় যে রামায়ণ মহাভারতে যে সত্যযুগের ছবি দেখেছি সে রকম কিছু ছিল কিনা। রাজা টুটেন্খামেন (Tutankhmen) এর সমাধি খুঁড়তে খুঁড়তে এঁরা দেখতে পেয়েছেন যে সমাধির যে অংশ অন্ধকারে থাকবে এবং যেখানে মনীব ভাল করে দেখবে না, তখনকার সব মজুররা সে যায়গাটা তৈরী করতে যথাসাধ্য ফাঁকি দিয়েছে। সেকালে সাধারণ লোক অন্ততঃ প্রত্যেকেই বশিষ্ঠ মুনি ছিল না। আর আমাদের আদর্শ প্রজারঞ্জক রাজা রামচন্দ্রের কালেই সীতার অগ্নি পরীক্ষায় যখন দেখি বড় বড় সিদ্ধগণ মুনিগণ, এমন কি আকাশের সব দেবতারাও সেই চিরজন্ম দুঃখবিদগ্ধা হতভাগিনী সীতার অগ্নি প্রবেশে হাততালি দিচ্ছেন, তখন আমার মনে হয় সীতা তাঁহার কল্পিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই, করেছেন তৎকালের লোকের জন্য, বিশেষতঃ রামচন্দ্রের, বড় বড় নৈতিক ভিবনাষ্টিকের জন্য এই রকম অনেক নারীই প্রাণ দিয়াছেন। আমি ভাবি নারী আর আমাদের কত দিন রক্ষা করবেন? সাবিত্রী যেমন সত্যবানের মৃতদেহ কোলে করে বসে ছিলেন, বেহুলা যেমন স্বামীর গলিত দেহটাকে আবার পাওয়ার জন্য কলার ভেলায় সুদূর অনির্দ্দিশে যাত্রা করেছিলেন, তেমনি ভারতের নারী এই প্রাচীন জাতের গলিত মৃতদেহকে সযতনে রক্ষা করছেন; কি জানি যদি তাঁর পুণ্য আবার এই দেহে প্রাণ সঞ্চার হয়!

এখনই কলেজ যেতে হবে। আর কিছু লিখতে পারলাম না। কল্যাণী কেমন আছে? আপনারা কেমন আছেন? আমার প্রণাম জানবেন। আমি ভাল আছি। ইতি

ক্রমশঃ—

সেবক—শ্রীমাখন।

বাঞ্ছিত।

সারাটি জীবন তব তরে শুধু
আছি আশা-পথ চাহিয়া,
ছিঁড়িয়া ফেলেছি সুতার-সেতার-
তার তব নাম গাহিয়া।
বাসনার শত দুয়ার খুলিয়া
মুক্ত উদার বাতাসে,
নীরব নিঝুম পরাণ-বিহগী
মুদিছে নয়ন হতাশে!
থাকি' থাকি' থাকি' উঠিছে চমকি
'ঐ এলে বুঝি' ভাবিয়া,
অমার আঁধারে বিজলি-ঝিলিক্
ক্ষণে ভেসে যায় নিভিয়া!
অসীমের তুমি একটি লইয়া
লুকায়েছ কোথা একাকী,
সসীমের শত প্রলোভন ভেদি'
পশিতে পারিব একা কি?
যা' কিছু সরল যা' কিছু বিরল
মোহন-মধুর নয়নে,
স্বপন যা' কিছু বপন করিছে
তন্দ্রা-অলস শয়নে,

সকলি নকল, সকলি বিকল,
অবিকল শুধু তুমি হে,
কল্পনা-গড়া জল্পনা-ভরা
চির মধুময় ভূমি হে !
শোভা-সরোবরে একটি কমল
ভাসিছে তোমারি বরণে,
সন্ধ্যা-ললাটে স্বাতীর বিন্দু
হাসিছে তোমারি কিরণে !
তোমার আভাসে ভাসে যবে হিয়া
নন্দন গণি গহনে,
অমরার সুধা হলাহল সম
বাঞ্ছিত তোমা বিহনে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসে কালিদাস।

তৃতীয় প্রস্তাব,—কুমার-সম্ভব।

যে সকল সুবিদ্বান্ সজ্জন কবি কালিদাসকে মহারাজাধিরাজ সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তদেবের সম-সাময়িক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে উক্ত সম্রাটের পুত্র যুবরাজ

শ্রীকুমারগুপ্তের জন্মোৎসবকে চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যেই কবি তাঁহার অন্যতর মহাকাব্য "কুমার-সম্ভব" রচনা করিয়াছিলেন। সে কালে রাজ-কবিগণ যে সময়ে সময়ে তাঁহাদের আশ্রয়দাতা রাজা মহারাজগণের জীবন-বৃত্ত এবং কীর্তিকাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিতেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। শ্রীহর্ষচরিত, গৌড়বহো, বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, রামচরিত, নবসাহসাঙ্ক-চরিত, পৃথ্বীরাজ-বিজয়, সুকৃত-সংকীর্তন, কীর্তিকৌমুদী, দ্ব্যাশ্রয়-মহাকাব্য, বল্লাল-চরিত, প্রবন্ধ-চিন্তামণি, প্রবন্ধ-কোশ, কুমার-পাল-চরিত, কুমার-পাল-প্রবন্ধ এবং হম্মীর-মহাকাব্য প্রভৃতি কাব্য উক্তরূপ রচনার উদাহরণ স্বরূপে আজিও সাহিত্যিক-সমাজে সুপরিচিত রহিয়াছে। এই সকল কাব্যের কতকগুলিতে সাক্ষাদ্ ভাবেই রাজ-চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে এবং অন্যগুলিতে শ্লেষের আশ্রয়ে পরোক্ষভাবে ঐতিহাসিক তথা অপর জীবনবৃত্ত প্রকটিত হইয়াছে। উপরিলিখিত কাব্যাবলীর মধ্যে বাণভট্ট প্রণীত "শ্রীহর্ষচরিত" এবং বিদ্যাপতি বিহ্লণ-রচিত "বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত" প্রথম শ্রেণীর এবং কলিকাল-বাল্মীকি সন্ধ্যাকরনন্দী-রচিত "রাম-চরিত" এবং জৈন সূরি হেমচন্দ্র-প্রণীত "দ্ব্যাশ্রয় মহাকাব্য" দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য-রচনার উত্তম উদাহরণ। বরেন্দ্র-ভূমির মুখোজ্জ্বলকারী মহাকবি সন্ধ্যাকরনন্দী গৌড়মণ্ডলের পালবংশীয় রাজা রামপাল-দেবের জীবনবৃত্ত অতি কৌশলময় শ্লেষের আশ্রয়ে তাঁহার কাব্যে বিনিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, অথচ লোকে তাঁহার কাব্যপাঠে প্রথমেই তাহা না বুঝিয়া অযোধ্যাধিপতি জানকীবল্লভ লোকাভিরাম শ্রীরামচন্দ্রেরই চরিতাখ্যান বলিয়া বুঝিয়া লইবেন। খৃষ্টীয় একাদশ-শতাব্দে বরেন্দ্র-ভূমিতে কৈবর্তজাতীয় দিব্যক, রুদক এবং ভীমের নেতৃত্বে যে বিষম প্রজা-বিদ্রোহে রাজলক্ষ্মী রামপালের হস্তচ্যুত হইয়াছিলেন এবং রাজা রামপাল যে অবিচলিত ধৈর্য এবং উৎসাহ-সহকারে গৌড়মণ্ডলীয় সামন্তগণকে একত্র করত তাঁহাদের সাহায্যে কৈবর্ত-নেতৃগণকে পরাভূত ও নিহত করিয়া তাঁহার পৈতৃক জন্মভূমির উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, মহা কৌশলী কলিকাল-বাল্মীকি মহাকবি সন্ধ্যাকরনন্দী সেই ঐতিহাসিক তত্ত্বকে "রামচরিত" কাব্যে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের নায়ক পাল-নরপতি রামপালকে রামচন্দ্ররূপে, পৈতৃক-জন্মভূমি (জনক-ভূ) বরেন্দ্রীকে জনক-তনয়া অথবা জনক-ভূ সীতারূপে এবং

রাজ্যাপহারক কৈবর্ত-নায়ক ভীমকে সীতাপহর্তা রাবণ-রূপে বর্ণনা করিয়া কবি অতি সুন্দর কাব্য-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন (১)।

বিখ্যাত ভট্টি-কাব্যের অনুকরণে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সূরি হেমচন্দ্র স্বপ্রণীত "সিদ্ধহৈম"-শীর্ষক সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রাবলীর ক্রমশঃ উদাহরণ এবং গুজরাত প্রদেশের চৌলুক্য-(সোলাঙ্কী)-বংশীয় মূলরাজ হইতে কুমার-পাল পর্য্যন্ত রাজগণের ইতিহাস প্রকাশ,—এই উভয়বিধ আশ্রয় লইয়া "দ্ব্যাশ্রয় মহাকাব্য" রচনা করিয়াছিলেন। কবি-কালিদাসের "কুমার-সম্ভব" পাঠ করিয়া আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই কাব্যকে উল্লিখিত উভয় প্রকার কাব্যের কোনও এক শ্রেণীতে আনিতে পারা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন শ্লেষাত্মক ঐতিহাসিক কাব্যের কোন লক্ষণ "কুমার-সম্ভব" কাব্যে পাওয়া যায় না। একমাত্র "কুমার-সম্ভব" এই নাম ভিন্ন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের সহিত সংযুক্ত করিবার কোনও কারণ এই কাব্যে আমরা পাই নাই।

কালিদাস-প্রণীত "কুমার-সম্ভব" মহাকাব্য প্রকৃত-পক্ষে পুরাণ-প্রসিদ্ধ স্কন্দ, কার্ত্তিকেয় অথবা কুমার নাম-ধারী দেব-সেনাপতির জন্ম এবং মাহাত্ম্যকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে। "কুমার"দেবের জন্ম-বিবরণ এই কাব্যের মুখ্যবিষয় বলিয়া উহার নাম "কুমার-সম্ভব" হইয়াছে। "সাহিত্যদর্পণ"নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে মহাকাব্য-লক্ষণে লিখিত আছে যে উহার নায়ক হয় কোন প্রসিদ্ধ দেব অথবা ধীরোদাত্ত-গুণান্বিত কোন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় বীর (একজন অথবা এক কুলের অনেক জন, যেমন রঘুবংশে) হইবেন। এই লক্ষণানুসারে কুমার-দেবই এই কাব্যের নায়ক এবং ইহাতে শৃঙ্গার-বীর-করুণাদি নানা রসের বর্ণনা, ঐতিহাসিক (পৌরাণিক) বৃত্ত বা চরিত্র, "সন্ধ্যা-সূর্য্যেন্দু-রজনী-প্রদোষ-প্রাতর্মধ্যাহ্ন-শৈল-ঋতু-বন-সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ-মুনি-স্বর্গ-রণ-প্রয়াণ" ইত্যাদির বিবরণ,—অর্থাৎ মহাকাব্যের সমস্ত

(১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, পণ্ডিত মহাশয়ের প্রযত্নে নেপাল হইতে আনীত এবং প্রকাশিত এই "রামচরিত" কাব্য দ্বারা বাঙ্গালার ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়াছে। রাজা রামপালের সমসাময়িক বৃত্তান্তগুলি জানিবার পক্ষে এরূপ উপযোগী পুস্তক আর সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয় নাই।

অস্পষ্ট,— সম্পূর্ণ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। সংস্কৃত-ভাষার আলঙ্কারিকেরা এই কাব্যকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মহাকাব্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন, আমরাও তাহাই করিয়াছি।

মহাকবি কালিদাস যে যুগেই আবির্ভূত হউন না কেন, তাঁহার আবির্ভাবের অনেক-পূর্বেই যে আর্য-ভারতখণ্ডে (এবং সমগ্র ভারত-বর্ষে ও বটে) শক্তি-প্রধান ধর্মের অভ্যুদয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই। শক্তি এবং তাঁহার সম্বন্ধ-যুক্ত দেব-দেবী-বহুল ধর্মকে, অর্থাৎ তথা-কথিত তান্ত্রিক-মতের ধর্মকে,— যাঁহারা নূতন অথবা বৌদ্ধধর্মের অপচার-জনিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতের উপর, আমাদের আদৌ যে কোন আস্থা নাই,— তাহা অসংকোচে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। কি মিসর, কি এসিয়া-মাইনর, কি আরব, কি মেসোপোটামিয়া, কি পারস্য, অথবা কি ভারতখণ্ড, বিশাল ভারতবর্ষের সর্বত্র অতি প্রাচীন কালে (খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে) শক্তির পূজা ও সাধনা অতিশয় প্রবল ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। সেমিটিক, ইষ্টার অথবা আস্তর্তে, হিট্টাইটীয় মা, মিসরীয় ঐশী (আইসীস্), এবং ভারতখণ্ডের তারা সর্বদেশেই সমভাবে সম্মান এবং পূজা পাইয়াছেন। অসিরিশ, এডোনিশ এবং ঈশ্বর সর্বদেশেই মহা-শক্তির শিব স্বরূপে ভক্তের পূজা এবং ভক্তি পাইয়া আসিয়াছেন। পিতৃদেব এবং মাতৃ-দেবীর সহিত পুত্র-দেবও মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের দেশ পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষের সর্বত্র পূজিত হইয়াছেন (২)। এই শক্তিপূজার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ইতিহাস অতিশয় বিশাল এবং কৌতূহল-জনক হইলেও তৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার বর্তমান প্রস্তাবের

---

(২) Ishtar, Astarte, Aphrodite, Mylitta, Anaitis (Ardvi Sura Anahita of *Zend-Avestha*. Aban Yast), Ma, Cybele, Atheh, Atargatis, Artemis, Nana, Isis, Neith or Net, Venus এবং Mary ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে শক্তি এবং Tammuz, Adonis, Attis, Baal, Osiris এবং Zeus ইত্যাদি নামে শিব এবং Horus, Sandan (স্কন্দ ?), Hercules এবং অবশেষে Jesus Christ ইত্যাদি নামে তাঁহাদের পুত্র-দেব পশ্চিমে মিসর ও গ্রীস হইতে পাশ্চাত্য এসিয়ার সর্বত্র পূজিত হইয়াছেন। See Dr. J. G. Frazer's *Golden Bough*, Part IV, Adonis-Attis-Osiris.

বহির্ভূত। আমরা সম্প্রতি কেবল মাত্র পুত্রদেব অথবা স্কন্দ সম্বন্ধেই যৎসামান্য আলোচনা করিব এবং তাহার পূর্বে শিব-শক্তির সম্বন্ধে ও দুই চারি কথা বলিয়া লইব।

মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাবের বহু পূর্বে ভারতখণ্ডে শক্তিপূজা এবং শাক্ত মতের যে সুপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাও অধুনা 'প্রকাশ করিয়া' বলিতে হয়, এমনই কুসময় আমাদের দেশে আসিয়াছে! য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের পদানুবর্তী এদেশীয় তাঁহাদের 'মানস-পুত্রগণ' শাক্তধর্ম্ম ও তান্ত্রিক মতকে অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া প্রচার করায় অনেকেই এই ধর্ম্মকে যথার্থই নূতন বলিয়া মনে করিয়াছেন। বঙ্গের নবীন মহাকবি ৺নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় শিবকে "ভূতনাথ অনার্য ঈশ্বর" এবং শক্তিকে "অনার্যের কালী" বলিয়া তাঁহার "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতে (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে) প্রচার করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত শাক্তধর্ম্ম ও তান্ত্রিক মতকে মহাযান বৌদ্ধ মতের অপচার-জনিত বলিয়া প্রচার করিয়া দেশে ভ্রমের জাল আরও বিস্তৃত করিয়াছেন। ডাক্তার উইলসন প্রমুখ য়ুরোপীয় এবং তাঁহাদের পদানুগামী ৺অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ এদেশী পণ্ডিতেরা পুরাণগুলির বয়স নির্ধারণ করিয়া দিয়া এই ভ্রমকে আরও বদ্ধমূল করিবার উপায় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে খৃষ্টীয় নবমশতাব্দী অপেক্ষা পুরাতন সময়ের পুরাণ দুর্লভ; সুতরাং পরলোকগত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রজ মহাশয়ও এই শক্তি-বাদকে 'অন্ততঃ নবমশতাব্দেও পাওয়া যায়' বলিয়া ভয়ে ভয়ে নিজ মন্তব্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। "আমাদের পুরাণে আছে, সুতরাং এই শক্তিবাদ অতি প্রাচীন", - এই পুরাতন কথা একালের "অভয়-প্রগল্ভোচ্চারণকারী" পণ্ডিতসমাজে স্থান পাইবে না (৩)। "পুরাণ" যে সত্য সত্যই পুরাতন, তাহা একালে সপ্রমাণ করিতে হয়!

(৩) বিষ্ণু-পুরাণে ব্যাসদেব কলিযুগের লক্ষণ নির্দেশোপলক্ষে কলিযুগোপযোগী অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনার সহিত কলিযুগের পাণ্ডিত্যেরও লক্ষণ-নির্দেশ করিয়াছেন, যথা—"অভয়-প্রগল্ভোচ্চারণমেব পাণ্ডিত্যহেতুঃ।" ৮৫। ৪র্থ অংশ, ২৪শ অধ্যায়। ঋষির অভিপ্রায় এই যে কালকালে যিনি নির্ভয়ে সাহসের সহিত যা' তা' উচ্চকণ্ঠে বলিয়া যাইতে পারিবেন, তাঁহাকেই লোকে পণ্ডিত বলিয়া মানিবে। সত্য অথচ বিনয়গর্ভ বাক্য উচ্চারণকারী সেরূপ সম্মান পাইবেন না।

শ্রীশ্রীকালীঠাকুরাণী যদি এই মহাকবির জন্মের পূর্বে দেশের লোকের নিকট অপরিচিত অথবা নগণ্যা থাকিতেন, তাহা হইলে কবির পিতামাতা তাঁহাদের পুত্রের নাম কখনই "কালীর দাস" (কালিদাস) রাখিতেন না ;—অন্ততঃ আমরা এইরূপই বুঝি। পণ্ডিতেরা অবশ্যই এরূপ প্রমাণে সন্তুষ্ট হইবেন না,—তাঁহাদের নিকট প্রবলতর প্রমাণের আবশ্যক। তাঁহাদের পরিতুষ্টির জন্য আমরা নিবেদন করিতেছি যে এই কবি আমাদের আলোচ্য কাব্যে শিব ও শক্তির লীলাকেই আশ্রয় করিয়াছেন, এবং শিব ও শক্তির সেবা ও পূজা দেশে সুপ্রচলিত না থাকিলে তিনি কখনই এরূপ শিব-শক্তি-ময় কাব্য রচনা করিতেন না। এই কাব্যখানিতে মুখ্যভাবে শিবশক্তির এবং তাঁহাদের পুত্র স্কন্দ-দেবের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। এই কবি তাঁহার অন্যান্য মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং দৃশ্য কাব্যেও এই শিবশক্তিরই মহিমা গৌণভাবে গান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য মেঘদূতে যে প্রসঙ্গত: শিব-শক্তির মাহাত্ম্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা গত প্রস্তাবে উজ্জয়িনীর বর্ণনা-উপলক্ষে আমরা দেখিয়াছি। তাঁহার তিনখানি দৃশ্যকাব্য বা নাটকের নান্দীতে এবং মহাকাব্য রঘুবংশের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকেও তিনি এই শিবশক্তিকেই প্রণাম করিয়া গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রঘুবংশের মঙ্গলাচরণ মুখে তিনি বলিতেছেন,—

"নমি আমি জগতের জনক-জননী,
ভবেশ শঙ্কর আর পর্বত-নন্দিনী—
নিরন্তর যুক্ত যাঁরা বাক্য অর্থ প্রায়,
বাক্য অর্থ জ্ঞান লভি যাঁদের কৃপায়।" ১। প্রথমসর্গ। (ক)

৺নবীনচন্দ্র দাস-কবিগুণাকর কৃত অনুবাদ।

শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী এবং মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের নান্দী অথবা আশীর্বাদ-শ্লোকেও ঠিক এইরূপ শিব-শক্তির মহিমা কীর্তিত হইয়াছে, যথা— (লেখক কৃত মর্মানুবাদ)

(ক) বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥

"যিনি স্রষ্টার আদ্য সৃষ্টি (অপ্ তত্ত্ব), যিনি বিধিপ্রযুক্ত হবিঃ বহন করেন (অগ্নি), যিনি হোম করেন (যজমান বা যাজ্ঞিক), যিনি দিবা ও রাত্রি এই দুই প্রকারে কালের প্রভেদ উৎপন্ন করেন (চন্দ্র ও সূর্য্য), যিনি 'শ্রবণ'-গুণের বিষয় এবং যিনি বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছেন (আকাশ), যিনি সর্বপ্রকার বীজের প্রকৃতি-রূপে কথিত হইতেছেন (পৃথিবী), এবং যাঁহার দ্বারা চরাচরের নিখিল প্রাণী প্রাণবান্ হয় (বায়ু), ইন্দ্রিয়-গোচর অথবা প্রত্যক্ষীভূত এই অষ্ট প্রকার মূর্তির সহিত সতত সংযুক্ত ঈশ্বর (শিব) আপনাদিগকে (দ্রষ্টৃ বা শ্রোতৃবর্গকে Audienceকে) রক্ষা করুন।" শকুন্তলা। (খ)

"বেদান্তে যাঁহাকে দ্যাবা-পৃথিবী-ব্যাপ্ত একমাত্র পুরুষ বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর' এই অনন্য-বিষয়ক শব্দ যাঁহাতে যথার্থ—অর্থাৎ প্রকৃত অর্থযুক্ত—ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রাণায়ামাদি যোগে মুমুক্ষু সাধকগণ যাঁহাকে আত্মার ভিতরে অন্বেষণ করিয়া থাকেন, অচলা ভক্তিরূপ সাধনা দ্বারা সুগম সেই শিব আপনাদিগের অশেষ কুশল বিধান করুন।" বিক্রমোর্বশী। (গ)

"যিনি পরম ঐশ্বর্য্যবান্ এবং ভক্তজনের অনন্ত ফল-দাতা হইয়াও স্বয়ং কৃত্তিবাস, (চর্মমাত্র-পরিহিত), যিনি স্বয়ং প্রিয়তমার দেহের সহিত একান্ত সংশ্লিষ্ট হইয়াও বিষয়ে অনাসক্ত জিতেন্দ্রিয় যোগিজনের পরম ও চরম আশ্রয়, যিনি পৃথিবী-জল-তেজো-বায়ু-গগন-যজমান-সূর্য্য-চন্দ্র-রূপ অষ্ট মূর্তিতে নিখিল জগৎকে আত্মদেহে ধারণ করিয়াও অভিমান-বর্জিত,

(খ) যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

(গ) বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী
যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিতপ্রাণাদিভির্মৃগ্যতে
স স্থাণুঃ স্থির ভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তু বঃ॥

সেই ঈশ্বর (শিব) আপনাদিগের সৎপথাবলোকনের জন্য তামসিকী প্রবৃত্তির নাশ করুন।" মালবিকাগ্নিমিত্র। (৪) (ঘ)

সমালোচক সুধীবর্গের মধ্যে কেহ কেহ কবি-কালিদাসকে শিবভক্ত অথবা 'শৈব' বলিয়া বুঝিয়া তিনি যে 'শাক্ত' নহেন তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এ চেষ্টা বৃথা মাত্র। শক্তিমত অথবা শক্তি-তত্ত্ব শিব-তত্ত্ব অথবা শৈবমতকে পরিত্যাগ করিয়া কখনও কোনও দেশে বিদ্যমান ছিল না, এ দেশেও নাই। নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের দ্বৈতবাদ এবং ব্রহ্মময় বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতবাদকে একত্র সুন্দর ভাবে সমন্বয় করিয়া এই শিব-শক্তিবাদ অথবা শাক্তমতের দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর্য-দর্শন-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতমাত্রেই শক্তিমতকে এই ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পণ্ডিতকুল-শিরোমণি কবি কালিদাসও যে এই তত্ত্ব সুন্দররূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্বোদ্ধৃত চারিটি মঙ্গলাচরণ শ্লোক হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কবির প্রচারিত এই তত্ত্ব তাঁহার বহুকাল পূর্বেই আমাদের দেশের ঋষিরা প্রচারিত ও ব্যাখ্যাত করিয়াছিলেন। বেদ-সংহিতায় আমরা অজ্ঞ, সুতরাং বেদের মন্ত্রভাগে এই শক্তিতত্ত্ব কিরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু সামবেদের প্রসিদ্ধ "কেনোপনিষদ্" শ্রুতির "উমা হৈমবতী"র বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া নানা উপনিষদে, স্মৃতি-সংহিতায়, রামায়ণে, মহাভারতে এবং মহাপুরাণ-গ্রন্থাবলীতে এই তত্ত্ব নানা স্থানে, নানা ভাবে, কথিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কবির রঘুবংশ-কাব্যের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটির মর্মও প্রাচীন ও প্রামাণ্য মৎস্যপুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়—পুরাণকার ঋষি বলিয়াছেন,—

"হে দেবী, আদিত্যের প্রভা আদিত্য হইতে অথবা রত্নের দ্যুতি রত্ন হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে পারে কি? বর্ণাবলি দ্বারা (শব্দের দ্বারা) ব্যক্ত নহে এরূপ কোনও অর্থ থাকিতে

(ঘ) একৈশ্বর্যে স্থিতোঽপি প্রণতবহুফলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ
কান্তাসংমিশ্রদেহোঽপ্যবিষয়মনসাং যঃ পরস্তাদ্ যতীনাম্।
অষ্টাভির্যস্য কৃৎস্নং জগদপি তনুভির্বিভ্রতো নাভিমানঃ
সন্মার্গালোকনায় ব্যপনয়তু স বস্তামসীং বৃত্তিমীশঃ॥

পারে কি? গিরিশ ভিন্ন তুমি কিরূপ থাকিবে?" (৫) মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য অথবা চণ্ডী-সপ্তশতী আজিও লোকের গৃহে গৃহে পঠিত হইতেছে, তাহাতেও শিব-শিবার অভেদত্ব এবং পরমৈশ্বর্য্য পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতের (ও হরিবংশের) অনেক স্থলে এই তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থই যে খৃষ্ট জন্মের পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহা সুদৃঢ়রূপে সপ্রমাণ করা যায়। বর্তমান প্রস্তাবে উহার আবশ্যকতা না থাকায় এবং প্রস্তাব সুদীর্ঘ হইবার ভয়ে সেই সকল প্রমাণের উল্লেখ না করিয়া সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে মৎস্যপুরাণের উল্লেখ মহাভারতে এবং বায়ু পুরাণের উল্লেখ মহাভারত এবং মনুসংহিতাতেও পাওয়া যায় (৬)। সংপ্রতি পিষ্টপেষণের ন্যায় "পুরাণের" পুরাতনত্ব সপ্রমাণের পরিশ্রম পরিত্যাগ করত শ্রীশ্রীকুমার দেবের আখ্যান বর্ণনায় অগ্রসর হইতেছি।

---

(৫) মৎস্যপুরাণ, ১৫৪ তম অধ্যায়, "কুমার-সম্ভব" প্রকরণে উমার প্রতি সপ্তর্ষিগণের বাক্য—

কাদিত্যস্য প্রভাবাতি রশ্মিভ্যঃ ক দ্যুতিঃ পৃথক্?
কোহর্থো বর্ণলিপ্যাবাক্যঃ কথং ত্বং গিরিশং বিনা? ॥ ৩১৬ ॥

ইহার সহিত রঘুবংশের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের "বাগর্থাবিবসম্পৃক্তৌ" ইত্যাদির তুলনা করুন। ইহার সহিত মল্লিনাথ কৃত টীকাধৃত বায়ুপুরাণোক্ত শ্লোকটিও দ্রষ্টব্য।

(৬) মহাভারত বনপর্ব, ১৮৭ তম অধ্যায়ে,—মৎস্যপুরাণের উল্লেখ যথা,—

"ইত্যেতন্ মাৎস্যকং নাম পুরাণং পরিকীর্তিতম্॥ ৫৭ ॥
আখ্যান মিদমাখ্যাতং সর্বপাপহরং ময়া।
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং মনোশ্চরিতমাদিতঃ।
স সুখী সর্বপূর্ণার্থঃ সর্বলোকমিয়ান্নরঃ॥ ৫৮ ॥"

মহাভারত, বনপর্ব, ১৯১ তম অধ্যায়ে বায়ুপুরাণের উল্লেখ, যথা,—

"এতত্তে সর্বমাখ্যাতমতীতানাগতং তথা।
বায়ুপ্রোক্তমনুস্মৃত্য পুরাণমৃষিসংস্তুতম্॥ ১৬॥"

স্কন্দ, কুমার অথবা কার্তিকের ঠাকুরের কথা কহিলেই, দুর্গোৎসবের প্রতিমার পাশে ময়ূর চড়া বাবরিচুলের সিঁথিকাটা, কোঁচান ধুতি চাদর অথবা জামাজোড়া পরা, জুতাপায়ে, দিব্য গৌরবর্ণ, ফিটফাট বাঙ্গালী ছোকরাবাবুর চেহারা আমাদের মনে পড়ে। বঙ্গালীর সুন্দর ছেলের আদর্শ রূপে 'কার্তিক-ঠাকুর' আমাদের দেশে এখন আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। বাঙ্গালীর ছেলের রূপের প্রশংসা করিতে গেলে আজকাল লোকে বলে "ছেলেটি যেন কার্তিক।" কিন্তু, সেই সুরূপ সুশ্রী ফুলবাবু ছেলেটি যে একদিন ভারতবর্ষের সর্বত্র রুদ্র অগ্নি এবং সূর্যের অবতার স্বরূপ তেজস্বী দেবসেনাপতি-রূপে পূজিত হইতেন,—আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণাপথের অনেক স্থলেই যে তাঁহার বড় বড় বিখ্যাত মন্দির ছিল, তিনি যে একাধারে শব্দ-শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র এবং যুদ্ধশাস্ত্রের অত্যাশ্চর্য্য আচার্যরূপে বিখ্যাত ছিলেন,—তাঁহারই পূজক ব্রাহ্মণেরা যে "কালাপ" নামক চরণ ও প্রাতিশাখ্যের এবং লৌকিক "কলাপ-ব্যাকরণ"-শাস্ত্রের প্রচারক ছিলেন, তাঁহারই আশ্রিত "ময়ূর"-ক্ষত্রিয়বংশই যে উত্তর কালে "মৌর্য" অথবা "মোরিয়"বংশ নামে বিখ্যাত ও ভারতখণ্ডের সাম্রাজ্য-সিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন, তাঁহারই নামে যে একদা প্রায় মহাভারতের মত বিশাল, (লক্ষ-শ্লোকাত্মক অথবা মতান্তরে একাশীতি-সহস্র শ্লোকাত্মক) মহাপুরাণ রচিত হইয়াছিল, সে সকল কথা আমাদের অনেকেরই স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে আর্য্য ভারতবর্ষের সর্বত্র শাক্তধর্মের অভ্যুদয়ের কালে একদা পিতা-শিব ও মাতা-শক্তির সহিত পুত্র-দেব কুমারের ও পূজা হইত। মিসর দেশে এবং এসিয়া মাইনরে সুপ্রতিষ্ঠ এই পুত্র-

---

মনুসংহিতায় বায়ু-কথিত পুরাণের উল্লেখ,—নবম অধ্যায়ে,—যথা,—

"অত্রগাথা বায়ুগীতা কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।

যথা 'বীজং ন বপ্তব্যং পুংসা পর-পরিগ্রহে' ॥ ৪২ ॥

"মহাভারত" এবং "মনুসংহিতা" যে অতি প্রাচীন পাণিনি ব্যাকরণ অপেক্ষাও পুরাতন, তাহা অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করিয়াছেন। The Cambridge History of India, vol. I (1922) গ্রন্থে পুরাণাদি গ্রন্থের প্রাচীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। এই নব-প্রকাশিত গ্রন্থে য়ুরোপীয়গণের অনেক পুরাতন ভুল সংশোধিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবের প্রতিমূর্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অসুর-দেশে যৎকালে জরথুস্ত্র প্রচারিত মিত্র-পূজা (সূর্যপূজা এবং অগ্নিপূজা) প্রবর্তিত হইয়াছিল, তখন সেখানে সূর্য এবং অগ্নির ভিন্ন মূর্তি অথবা অবতার স্বরূপ শক্তিধর স্কন্দদেবের পূজাও চলিয়াছিল। জরথুস্ত্র-প্রচারিত "অবস্থা"নামক শাস্ত্রে এই দেবকে "স্রোষ" নামে পরিচিত করা হইয়াছে (৭)। উক্ত গ্রন্থের "স্রোষ"দেব যে স্কন্দ অথবা কার্তিকেয়ের নামান্তর মাত্র, তাহা (অবস্থা শাস্ত্রের সংস্কৃত সংস্করণ-বিশেষ) আমাদের ভবিষ্যপুরাণ হইতেও জানিতে পারা যায়। এই পুরাণেও "রাজ্ঞ" (রাজ্ঞ) এবং স্রোষ"নামেই উহাঁর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার অভিধানে কার্তিকেয়ের নামাবলীর মধ্যে "স্রোষ" না থাকায়, ভবিষ্যপুরাণের ঋষি ঐ স্রোষ-শব্দের যে নূতন নিরুক্তি (গতি অথবা শক্তিশীল) নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল (৮)।

(৭) "*Zend-Avestha*" Part II, translated by James Darmesteter (The Sacred Books of The East Series Vol *XXIII*, pp 159—167. Srosh Yast Hadhokht.—"Unto the holy, strong Sraosha, who is the incarnate Word, a *mighty-speared* and lordly god"—&c. নূতন বাইবেলে যীশুখৃষ্টও ভগবানের Word অথবা বাণীর অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

(৮) ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব, ১২৪ অধ্যায়। এই পুরাণ অতি প্রাচীন "আপস্তম্বধর্মসূত্রে" উল্লিখিত আছে।

"সুরসেনাপতিত্বেন স যস্মাদ্দীপ্যতে সদা।
তস্মাৎ স কার্তিকেয়স্তু নাম্না রাজ্ঞ ইতি স্মৃতঃ॥
স্রুত গতৌ চ স্মৃতো ধাতুর্যস্য স প্রোচ্যতে সুরৈঃ।
গচ্ছতীতি রহস্তস্মাৎ পর্যায়াৎ স্রোষ উচ্যতে॥"

Quoted at page *XXI*, Introduction, *Archeological Survey of Mayurbhanja*, Vol I. By Sriyut Nagendra natha Vasu, Editor, *Visva Kosha*.

এই কার্ত্তিকেয় প্রকৃত-প্রস্তাবে অতি প্রাচীন দেব; গৌতম-বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্ব হইতে যে ইহাঁর মূর্ত্তি এ দেশে স্থাপিত এবং পূজিত হইতেছে তাহার প্রমাণ প্রাচীন নানা শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত গোতম-বুদ্ধের জীবন-চরিত-বিষয়ক "ললিত-বিস্তর" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "বুদ্ধদেবের জন্মের পর শিব, স্কন্দ, নারায়ণ, কুবের, চন্দ্র, সূর্য্য, বৈশ্রবণ, শক্র, ব্রহ্মা এবং লোকপাল প্রভৃতি প্রতিমা স্ব স্ব স্থান হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন" (৯)। স্কন্দ-শিষ্য কলাপী ঋষির প্রবর্ত্তিত বেদের শাখা বিদ্যমান ছিল (১০) এবং তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ের লৌকিক সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ "কাতন্ত্র" অথবা

(৯) "শিব-স্কন্দ-নারায়ণ-কুবের-চন্দ্র-সূর্য্য-বৈশ্রবণ-শক্র-ব্রহ্ম-লোকপাল-প্রভৃতয়ঃ প্রতিমাঃ সর্ব্বাঃ স্বেভ্যঃ স্বেভ্যঃ স্থানেভ্যো বুত্থায় বোধিসত্ত্বস্য ক্রমতলয়োর্নিপতন্তি।" ললিত-বিস্তর, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

Quoted in *The Archeolgical Survey of Miayurbhanja*, Vol. 1, at page XVIII, Introduction, by Sriyut Nagendranatha Vasu, Editor *Visvakosha &c.*

বৈদিক গৃহ্যসূত্রেও "কুমার-"দেবের উল্লেখ পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন ব্যাকরণে আছে, যথা:—

(১০) "কলাপি-বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ॥ ১০৪॥ ৪। ৩॥

"কলাপিনোঽণ্॥ ১০৮॥ ৪। ৩॥" পাণিনিসূত্র। এই দুইটি সূত্রের অর্থ এই যে (তদ্ধিত প্রকরণে) কলাপী (বেদের কলাপ-শাখা অথবা চরণের অধ্যাপক) ঋষির ছাত্র বুঝাইলে 'ণিনিঃ' প্রত্যয় (১০৪ সূত্র); এবং বেদের 'কলাপি' শাখার অধ্যয়নকারীকে বুঝাইতে গেলে 'অণ্' প্রত্যয় হয় (১০৮ সূত্র)। যাঁহারা 'কলাপ' শাখার অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহাদিগকে "কালাপাঃ" বলিত।

রামবনবাসকালে রামের অনুমতিক্রমে লক্ষণ যে সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ধন দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 'কলাপ' শাখাধ্যায়ীরাও ছিলেন দেখা যায়; যথা—

"যে চেমে কঠ-কালাপা বহবো দণ্ডমানবাঃ। ১৮।
নিত্যস্বাধ্যায়শীলত্বান্নান্যৎ কুর্ব্বন্তি কিঞ্চন।"

পাণিনি-প্রণীত ব্যাকরণ যে 'মাহেশ' অথবা 'মাহেশ্বর' সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, তাহা পণ্ডিত-সমাজে সুবিদিত আছে।

"কলাপ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই "কাতন্ত্র" ব্যাকরণ পইঠ্ঠানের শাতবাহন রাজের মন্ত্রী সর্ববর্মাচার্য কুমার অথবা কার্তিকেয়কে আরাধনা করত তাঁহার অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া গুণাঢ্যের বৃহৎকথা (কথাসরিৎসাগর) নামক গল্পের গ্রন্থে প্রবাদ লিখিত আছে। কালিদাসের মেঘদূত-কাব্যে দশপুর নগরের দেবগিরিস্থ এবং রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন-নগরস্থ বিখ্যাত কার্তিকেয়-মন্দিরের উল্লেখ আছে। দক্ষিণাপথে কার্তিকেয়-ঠাকুর অদ্যাপিও স্কন্দস্বামী, সুব্রহ্মণ্যস্বামী এবং স্বামী-মহাসেন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে নানাস্থানে পূজিত হইতেছেন। রামায়ণের সময়ে স্কন্দ অথবা কার্তিকেয় খুব বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী দেব ছিলেন। রামের বনবাস-সময়ে কৌশল্যাদেবী অন্যান্য-বিখ্যাত দেবতার সহিত স্কন্দের নিকটও তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র লোকাভিরাম রামচন্দ্রের রক্ষা-বিধানের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন (১১)। মহারাজ শূদ্রক-প্রণীত "মৃচ্ছকটিক" প্রকরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্কন্দদেব সেকালে সন্ধিচ্ছেদকদিগের (সিঁধেল চোরেদের) ও ইষ্টদেব ছিলেন।

আমরা অগ্রেই দেখিয়াছি যে কবি কালিদাস তাঁহার "অভিজ্ঞান শাকুন্তল" নাটকের নান্দীতে শিবের (পৃথিবী-জল-তেজোবায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত, চন্দ্র সূর্য এবং যজমান—এই তিন,—মোট আট) অষ্টমূর্তির পরিচয় দিয়াছেন। বলাবাহুল্য, শিবের এই অষ্টমূর্তির কথা কালিদাস কল্পনা করেন নাই,—তিনি শাস্ত্রকারগণের নিকট হইতেই লইয়াছেন বৈদিক রুদ্র-দেবতা পরে কাল, অগ্নি, কালাগ্নিরুদ্র, এবং শিব স্বরূপে শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছেন এবং এই

(১১) কৌশল্যা বলিতেছেন,—

"স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ। ৮ ॥
স্বস্তি ধাতা বিধাতা চ স্বস্তি পূষা ভগোঽর্যমা।
* * * * * * *
স্কন্দশ্চ ভগবান্ দেবঃ সোমশ্চেন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। ১১ ॥
সপ্তর্ষয়ো নারদশ্চ তে ত্বাং রক্ষন্তু সর্বতঃ।" ইত্যাদি।

রামায়ণে, অযোধ্যাকাণ্ডে, ২৫শ সর্গ (বঙ্গবাসী)।

নিমিত্ত ভবিষ্যপুরাণে অষ্টমূর্ত্তি শিবের পরিচয় এবং নমস্কার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "পৃথিবীরূপী শর্বকে নমস্কার, জলরূপী ভবকে নমস্কার, অগ্নিরূপী রুদ্রকে নমস্কার, বায়ুরূপী উগ্রকে নমস্কার, আকাশরূপী ভীমকে নমস্কার, যজমানরূপী পশুপতিকে নমস্কার, সোমরূপী মহাদেবকে নমস্কার, এবং সূর্যরূপী ঈশানকে নমস্কার,—এই আটটি শিবের মূর্ত্তি" (২)। ভরতখণ্ডের (আর্যাবর্তে এবং দক্ষিণাপথের) ভিন্ন ভিন্ন স্থলে এই অষ্টবিধ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির মন্দির এবং পূজা-বিধান এখনও বর্ত্তমান আছে। দক্ষিণাপথের "চিদম্বরম্" নামক স্থানের মন্দিরে মহাদেবের আকাশ-মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে, সুতরাং তথাকার মন্দিরে চক্ষুগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন লিঙ্গ অথবা প্রতিমা নাই। অগ্নি এবং রুদ্রদেব প্রকৃতপক্ষে অভেদ বা এক বলিয়া একই শাস্ত্র অথবা পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্র স্কন্দকে শিবের, অগ্নির, এবং অগ্নি ও শিব উভয়েরই পুত্র বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। বায়ুপুরাণে স্পষ্টভাবায় লিখিত আছে যে অগ্নি-বেশী রুদ্রের পত্নীর নাম 'স্বাহা' এবং স্কন্দ তাঁহাদিগেরই পুত্র (১৩)।

মহাভারতের বনপর্বে ২১৭ তম অধ্যায় হইতে ২২২ তম অধ্যায় পর্যন্ত অগ্নির উৎপত্তি, প্রকারভেদ এবং মাহাত্ম্যের কথা বর্ণিত হওয়ার পর ২২৩ তম অধ্যায় হইতে অগ্নিপুত্র কার্ত্তিকেয়-দেবের জন্ম বিবরণ আরম্ভ হইয়া ২৩২ তম অধ্যায় পর্যন্ত উহা সমাপ্ত হইয়াছে।

---

(১২) "শর্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, রুদ্রায়াগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভীমায়াকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, ঈশানায় সূর্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। মূর্ত্তয়োহষ্টৌ শিবস্যৈতাঃ।"

Quoted in Notes on অভিজ্ঞান শাকুন্তলম্ by Messrs N. B. Godbole, B. A. and K. P. Parab, "Nirnaya Sagara" Edition. আরও বায়ুপুরাণ, ২৭শ অধ্যায়, ইত্যাদি।

(১৩) নাম্না পশুপতে র্যা তু তনুরগ্নির্দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ।

তস্য পত্নী স্মৃতা স্বাহা স্কন্দশ্চাপি সুতঃ স্মৃতঃ॥ ৫৩॥

বায়ুপুরাণ, ২৭শ অধ্যায় (বঙ্গবাসী)।

এই কথা ঠিক মহাভারতীয় আখ্যানেও (২২৯ তম অধ্যায়ে) পাওয়া যায়।

মহাভারতীয় উপাখ্যানের সারভাগ এই ;—দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা স্বাহা জন্মাবধি অগ্নিদেবের প্রতি অনুরাগিনী হইলেও অগ্নি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন নাই,—পরন্তু তিনি সপ্তর্ষিগণের সাধ্বী এবং অকামা পত্নীদিগের প্রতি অতি প্রবল অনুরাগ প্রকাশ করিতে থাকেন। স্বাহা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া স্বকীয় দৈব-প্রভাবে ক্রমে ক্রমে ছয়জন ঋষিপত্নীর ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক অগ্নির সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে ষড়ানন কার্ত্তিকেয়-দেবের জন্ম হইয়াছিল। বশিষ্ঠ-পত্নী অনসূয়া দেবীর অপ্রতিহত পাতিব্রত্যের প্রভাবে স্বাহা দেবী কেবল তাঁহার রূপ অনুকরণ করিতে পারেন নাই। সেই হেতু ছয় ঋষিপত্নীর ছদ্মবেশধারিণী স্বাহাদেবীর গর্ভে অগ্নির মহা তেজস্বী পুত্র কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইয়াছিল। পরে দেবরাজ ইন্দ্র ঈর্ষাবশে তাঁহার বিনাশের উদ্দেশ্যে বজ্র ক্ষেপণ করেন ; কিন্তু বজ্রাঘাতে স্কন্দের মৃত্যু হওয়া দূরে থাকুক, উহা দ্বারা তাঁহার আরও তেজ এবং সহায়-সমৃদ্ধির উপচয় হওয়ায় ইন্দ্রদেব অবশেষে তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপিত করেন ও প্রজাপতির কন্যা দেবসেনার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে আপনার সেনাপতি এবং আত্মীয় রূপে গ্রহণ করেন। সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হওয়ার পর স্কন্দ দেবগণের পরম শত্রু মহাবল মহিষাসুরকে (তারকাসুরকে নহে) বধ করিয়া স্বর্গ-রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া দেন। দেবসেনা অথবা ষষ্ঠীদেবী তাঁহার পত্নী এবং শিশুগণের মহাশত্রু রেবতী, পুতনা এবং শকুনি প্রভৃতি অসংখ্য উগ্র স্বভাবের দেবদেবী তাঁহার পারিষদ। এই মহাবল পরাক্রান্ত স্কন্দদেব পূজিত হইলে মানবগণকে ধন-ধান্য-পুত্র-পশু প্রভৃতি বিবিধ সুখ সৌভাগ্য প্রদান করেন।

কবি কালিদাস কিন্তু তাঁহার "কুমার-সম্ভব" কাব্যের উপাদান অথবা পুরাবৃত্তাংশ মহাভারতের উপাখ্যান হইতে গ্রহণ করেন নাই। মহাভারতের কুমার মহিষাসুরের নিহন্তা, অথচ কবির কুমার তারকাসুরকে বধ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে কালিদাস 'শিব-পুরাণ' হইতে তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন ; কিন্তু আমরা সেরূপ মনে করিতে পারি নাই। 'শিব-পুরাণের' নাম মহাপুরাণাবলীর নামের মধ্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অতি প্রাচীনকালে পাওয়া যাইত বলিয়া বোধহয় না। বায়ু-পুরাণে, মৎস্যপুরাণে এবং অগ্নিপুরাণে (বঙ্গবাসী-সংস্করণের) মহাপুরাণের যে নামাবলী দেখিতে পাওয়া

যায়, তাহাতে 'শিব-পুরাণের' নাম নাই (১৪)। দক্ষিণাপথের রামানুজ-সম্প্রদায়ের মতাবলম্বিনী "বিষ্ণুচিত্তী" নামে বিষ্ণুপুরাণের যে টীকা আছে, তাহাতে উদ্ধৃত মৎস পুরাণীয় পাঠে বায়ু অথবা বায়বীয় পুরাণকেই "শৈব"পুরাণ বলা হইয়াছে (১৫)। অপর পক্ষে, যে পুরাণ-তালিকায় 'শিবপুরাণের' নাম গৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে 'বায়ুপুরাণ'কে পরিত্যাগ করিয়া অষ্টাদশ-সংখ্যা ঠিক রাখা হইয়াছে। 'শিব-পুরাণ' অতি বিস্তৃত এবং শৈব বা শাক্ত-মতের অতি পুরাণ বটে, কিন্তু উহার প্রাচীনতা বায়ু এবং মৎস্যপুরাণের সমান বলিয়া আমাদের বোধ হয় নাই। আমরা দেখিয়াছি যে কালিদাসের কাব্য-কথিত কুমার-সম্ভবের উপাখ্যান-ভাগ সংক্ষিপ্তভাবে বাল্মীকি-রচিত রামায়ণে এবং বিস্তৃত ও অতি সুন্দরভাবে মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণের উপাখ্যানের সহিত "কুমার-সম্ভব"-কাব্যের সকল বিষয়েই অতি চমৎকার মিল দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কবি কালিদাস রামায়ণ এবং মৎস্য-পুরাণ হইতেই তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে ; তবে যদি তাঁহার পূর্বে শিবপুরাণের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাহা হইতেও উপাদান-সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে ; এবং তাহাতে আমাদের এই প্রস্তাবের কোনও হানির সম্ভাবনা নাই।

রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৩৬শ সর্গ এবং ৩৭শ সর্গে 'গঙ্গাবতরণ' বর্ণনা-উপলক্ষে হর-পার্বতী, গঙ্গা এবং অগ্নির সংযোগে কুমারের জন্ম-বিবরণ কথিত হইয়াছে। আদি কবি বাল্মীকি এই

(১৪) বায়ুপুরাণের ১০৪ তম অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণের ৫৩ তম অধ্যায়ে এবং অগ্নি-পুরাণের ২৭২ তম অধ্যায়ে মহাপুরাণের তালিকা আছে। বিষ্ণুপুরাণের ৩য় অংশ, ৩য় অধ্যায়ে যে মহাপুরাণের তালিকা দেখা যায়, তাহাতে "শৈবপুরাণের" নাম আছে, কিন্তু "বায়ুপুরাণের" নাম নাই। বায়ুপুরাণের নাম পূর্বোক্ত তিনখানি পুরাণের তালিকায় আছে। "ভাগবত" মহাপুরাণ দুইখানি (শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবত) পাওয়া যায়।

(১৫) "শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেন ধর্মান্ বায়ুরিহাব্রবীৎ।

যত্রতদ্ বায়বীয়স্যাদ্ রুদ্রমাহাত্ম্য-সংযুতম্।

চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি পুরাণং শৈবমুচ্যতে ॥" বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ, ৩য় অধ্যায়ের টীকা (বেঙ্কটেশ্বর সংস্করণ)

৩৭শ সর্গের শেষভাগে বলিতেছেন "রাম, গঙ্গার বিস্তৃত বিবরণ এবং পুণ্যযশোজনক 'কুমার-সম্ভব' এই আমি তোমাকে বলিলাম" (১৬)। কার্তিকেয়-দেবের জন্ম-বিবরণকে বাল্মীকিই 'কুমার-সম্ভব' বলিয়াছেন। মৎস্যপুরাণের ১৫৩ তম হইতে ১৬০ তম পর্যন্ত আটটি অধ্যায়ে (সহস্রাধিক শ্লোকে) তারকাসুরের অভ্যুদয়, স্কন্দের জন্ম এবং তারকবধ বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাস-কৃত "কুমার-সম্ভব" কাব্যের শ্লোক-সমষ্টিও প্রায় সেইরূপই (১৭)। এই মৎস্যপুরাণেও ১৫৪ তম হইতে ১৫৮ তম পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ের নাম "কুমার-সম্ভব" রাখা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণের উক্ত শ্লোকে (১৬) এবং মৎস্যপুরাণের উক্ত অধ্যায় পাঁচটির নামকরণে "কুমার-সম্ভব" সংজ্ঞাটি ঋষিগণ পূর্বেই নির্দেশ করিয়া দেওয়ায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কবি কালিদাস তাঁহার কাব্যের নামটিও নিজে কল্পনা না করিয়া প্রাচীন-গণের নিকট হইতে অবিকল ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

মৎস্যপুরাণে স্কন্দের 'কুমার'-নামের এইরূপ নিরুক্তি দেওয়া হইয়াছে; যথা,—"কনক-কান্তিধারী তিনি কুৎসিত দৈত্যগণকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে দেদীপ্যমান (আবির্ভূত) হইয়াছিলেন, এই জন্য তিনি 'দেব' এবং 'কুমার' হইয়াছিলেন" (১৮)। ইহার সরল অর্থ

(১৬) "এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।

কুমার-সম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ ॥ ৩১ ॥ ৩৭শ সর্গ (বঙ্গবাসী)।

(১৭) প্রকৃতপক্ষে কুমার-সম্ভব মহাকাব্যের ৭ সর্গের শ্লোক-সমষ্টি ১০৯৫ এবং মৎস্য-পুরাণের উক্ত আটটি অধ্যায়ের শ্লোক-সমষ্টি ১০০৯; সুতরাং মৎস্যপুরাণের উপাখ্যান-ভাগকেও একখানি বড় কাব্য বলা যাইতে পারে। কাব্যাংশেও পুরাণকারের রচনা অতি উৎকৃষ্ট কবির অনুকরণের যোগ্য।

(১৮) "দীপ্যমানস্ত্বিষা দৈত্যান কুৎসিতান্ কনকচ্ছবিঃ।

এতস্মাৎ কারণাদ্দেবঃ কুমারশ্চাপি সোঽভবৎ ॥ ৪ ॥ ১৫৮ তম অধ্যায়।

দানকরা, দীপ্তি-প্রাপ্ত হওয়া, প্রকাশ করা অথবা অন্তরীক্ষ (দ্যুস্থানে) স্থানে বাস করা "দেব" শব্দ দ্বারা বুঝায়, যথা,—"দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।" নিরুক্ত, ৭ম খণ্ড।

এই যে 'কু' (মন্দ, দৈত্যগণ)-কে মারিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'কুমার' (কু + মার) এবং দীপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'দেব' নামে পরিচিত হইয়াছেন। এই কার্তিকেয় দেবের মূর্তির সম্বন্ধে পুরাণ বলিতেছেন ;—"কার্তিকেয়ের বর্ণ পদ্মগর্ভ সদৃশ, এবং তাঁহার জ্যোতিঃ তরুণ সূর্যের মত ; আকৃতি সুকুমার কুমারের (তরুণ যুবক অথবা রাজপুত্রের) সমান তিনি দণ্ড ও চীরক (?) যুক্ত এবং একটি সুন্দর ময়ূর তাঁহার বাহন। বনে অথবা ক্ষুদ্র গ্রামে যদি কার্তিকেয় মূর্তিকে স্থাপন করিতে হয়, তবে দুই বাহু, বৃহৎগ্রামে হইলে চারিটী বাহু এবং বড় নগরে হইলে দ্বাদশ বাহু যুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতিমা গড়িতে হইবে। কেয়ূর এবং কটকাদি শোভিত বাহুগুলির দক্ষিণদিগের ছয় হাতে শক্তি, পাশ, খড়্গ, শর, শূল এবং 'বর' অথবা 'অভয় মুদ্রা' এবং বামদিগের ছয়টি হাতে ধনু, পতাকা, চর্ম (ঢাল), একটি কুক্কুট, একহস্ত মুষ্টিবদ্ধ ও অপর হস্তের তর্জনী অঙ্গুলিটি প্রসারিত থাকিবে। দ্বিভুজ দেবতা হইলে বামহস্ত কুক্কুটের উপর স্থাপিত এবং দক্ষিণ হস্তে শক্তি, এবং চতুর্ভুজ দেবতার বাম দুই হাতে শক্তি এবং পাশ ও দক্ষিণ দুই হাতে তরবার ও 'বর' অথবা 'অভয়-মুদ্রা' থাকিবে" (১৯)। দুর্গোৎসবের সময় আমরা দ্বিভুজ-কার্তিকেয়-মূর্তি দেখিতে পাই, কিন্তু

(১৯) কার্তিকেয়ং প্রবক্ষ্যামি তরুণাদিত্যসপ্রভম্।
কমলোদরবর্ণাভং কুমারং সুকুমারকম্।
দণ্ডকৈশ্চীরকৈর্যুক্তং ময়ূরবরবাহনম্॥ ৪৬॥
স্থাপয়েৎ স্বেষ্টনগরে ভুজান্ দ্বাদশকারয়েৎ।
চতুর্ভুজঃ খর্বটে স্যাদ্ বনে গ্রামে দ্বিবাহুকঃ॥ ৪৭॥
শক্তিঃ পাশস্তথা খড়্গঃ শরঃ শূলং তথৈব চ।
বরদশ্চৈকহস্তঃ স্যাদথ চাভয়দো ভবেৎ॥ ৪৮॥
এতে দক্ষিণতো জ্ঞেয়াঃ কেয়ূর-কটকোজ্জ্বলাঃ।
ধনুঃ পতাকা মুষ্টিশ্চ তর্জনী তু প্রসারিতা॥ ৪৯॥
খেটকং তাম্রচূড়শ্চ বামহস্তেতু শস্যতে।
দ্বিভুজস্য করে শক্তির্বামে স্যাৎ কুক্কুটোপরি॥ ৫০॥
চতুর্ভুজে শক্তি-পাশৌ বামতো দক্ষিণে ত্বসিঃ।
বরদোঽভয়দো বাপি দক্ষিণঃ স্যাৎ তুরীয়কঃ॥ ৫১॥ মৎস্যপুরাণ, ২৬০তম অধ্যায় (বঙ্গবাসী)।

তাঁহার বামহস্তে ধনু ও দক্ষিণ হস্তে শর প্রায়ই দেওয়া হয়; এবং কুক্কুটযুক্ত মূর্ত্তি কোথায়ও দেখিতে পাই নাই। তবে, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ-রাজ্যে এবং দক্ষিণাপথের কতকগুলি-স্থানে পুরাণ-বর্ণিত প্রস্তর-নির্ম্মিত পুরাতন স্কন্দমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের কতকগুলির চিত্র আমরা দেখিয়াছি। চিত্রে কার্ত্তিকেয়ের কুক্কুটকেও বেশ স্পষ্ট পাওয়া গিয়াছে। উপরে কার্ত্তিকেয়ের প্রতিমার যে পরিচয় প্রদত্ত হইল, উহা মৎস্য-পুরাণ হইতে গৃহীত। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের দেবী-স্তোত্রে কৌমারী-শক্তির-স্তুতি মুখে দেবীকে দেবগণ বলিতেছেন;—"ময়ূর এবং কুক্কুটবৃতে, মহাশক্তিধারিণি, অনঘে হে কৌমারীরূপ ধারিণি নারায়ণি, তোমাকে আমরা নমস্কার করি।" এই কৌমারী-বর্ণনায় কার্ত্তিকেয়-দেবেরই ভূষণ-বাহনের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ-ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন; যেহেতু যে যে দেবগণের যে যে রূপ এবং ভূষণ বাহন, তাঁহাদিগের শক্তিরাও সেই রূপ ভূষণ-ভূষিত এবং বাহন-বাহিতা লইয়া প্রকটিত হইয়া থাকেন (২০)। সুতরাং কার্ত্তিকেয়-দেবের সহিত কুক্কুটের এককালে যে নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়। মহাভারতীয় উপাখ্যান-ভাগে দেখিতে পাওয়া যায় যে অগ্নি স্বয়ং কুমারকে কালাগ্নিরুদ্রের মত লোহিত এবং অলঙ্কৃত কুক্কুট-কেতু (ধ্বজ, চিহ্ন) প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহার রথে সমুচ্ছ্রিত উক্ত কেতুই শোভা পাইয়া থাকে। এই কুক্কুট-ধ্বজ কেবল মাত্র শোভার নিমিত্তই প্রদত্ত হয় নাই,—উহার সহিত স্কন্দ-পূজা এবং উপাসনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বোধ হয়; যেহেতু মহাভারতে লিখিত আছে যে স্কন্দ-পূজা-প্রবর্ত্তক মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার স্তোত্র এবং পূজাদির নিয়ম প্রচারের সহিত কুক্কুট-সাধনার ও রহস্য প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ঋষি

(২০) ময়ূর-কুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোস্তুতে॥ ১৫॥ একাদশ অধ্যায়। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী।

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ॥ ১৪॥ অষ্টম অধ্যায়। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী।

বিশ্বামিত্র স্কন্দদেবের অতিশয় প্রিয় হইয়াছিলেন (২১)। স্কন্দদেবের এই প্রিয় কুক্কুটকে উত্তর-কালে কেন যে আমাদের পৌরাণিকগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়, সন্দেহ নাই।

স্কন্দ-দেব প্রকৃত পক্ষে যে অগ্নি এবং সূর্য্যদেবেরই অবতার বিশেষ তাহা আমাদের ঋষিগণ যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, মন্ত্র-কেকয়-পারসীকাদি অসুর দেশের সৌর অথবা আগ্নেয়-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক ঋষি জরথুস্ত্র ও ঠিক সেইরূপই বুঝিয়াছিলেন, এবং তিনি তজ্জন্য এই দেবটিকে "শ্রৌষ" নামে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এই অসুর-দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে ও "শ্রোষের" সহিত কুক্কুটের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে এবং তথায় লিখিত হইয়াছে যে "এই পরম পবিত্র পক্ষীই (যাহাকে দুর্মুখ লোকে 'কুক্কুট' বলে) শ্রোষের বিশেষ

(২১) কুক্কুটশ্চ গ্নিনা দত্তস্তস্যাকেতুরলঙ্কৃতঃ।
রথেসমুচ্ছ্রিতোভাতি কালাগ্নিরিব-লোহিতঃ॥ ৩১॥ মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২২৯ তম অধ্যায় (বোম্বাই)।

বিশ্বামিত্রস্তু প্রথমং কুমারং শরণং গতঃ।
স্তবং দিব্যং সংপ্রচক্রে মহাসেনস্য চাপি সঃ॥ ১২॥
মঙ্গলানি চ সর্ব্বাণি কৌমারাণি ত্রয়োদশ।
জাতকর্ম্মাদিকাস্তস্যাক্রিয়াশ্চক্রে মহামুনিঃ॥ ১৩॥
ষড়্বক্ত্রস্য তু মাহাত্ম্যং কুক্কুটস্য তু সাধনম্।
শক্ত্যা দেব্যাঃ সাধনং তথা পারিষদামপি॥ ১৪॥
বিশ্বামিত্রশ্চকারৈতৎকর্ম্ম লোক হিতায় বৈ।
তস্মাদৃষিঃ কুমারস্য বিশ্বামিত্রোহভবৎ প্রিয়ঃ॥ ১৫॥ ঐ, ঐ, ২২৬ তম অধ্যায়ে (ঐ)।

মৎস্যপুরাণের মতে বিশ্বকর্ম্মা কুমারকে কুক্কুটটি ক্রীড়নক (খেলনা) স্বরূপে দিয়াছিলেন (১৫৯ অধ্যায়, ১০ম শ্লোক।

সাহায্যকারী ; এই পক্ষী রাত্রি শেষে উচ্চৈঃস্বরে উষাকে আহ্বান করিয়া থাকে এবং ভক্তগণ তাহার আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হইয়া অগ্নিপরিচর্য্যাদি ধর্ম্ম-কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহার পবিত্র স্বর যতদূর পর্য্যন্ত যায়, ততদূর পর্য্যন্ত অপদেবতাদি তিষ্ঠিতে পারে না।" অধিক কি, আবেস্তিক শাস্ত্রের এক বিশেষ অংশ এই পবিত্র-পক্ষীর প্রশংসাবাদে পূর্ণ রহিয়াছে (২২)। এই শাস্ত্রে লিখিত আছে যে যদি কোন ভক্ত ভক্তিভরে কোন ধার্ম্মিক-সজ্জনকে (ব্রাহ্মণকে ?) এক যোড়া এই পাখী দান করেন, তবে তাঁহার পুণ্যের সীমা থাকে না ;—তাঁহার পুণ্য সহস্র সহস্র বাতায়ন এবং শতস্তম্ভ শোভিত প্রাসাদ দান করিবার পুণ্যের সমান (২৩)।

(২২) জরথুস্ত্র ভগবান্ (অহুর মজ্দ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, পবিত্র, শক্তিমান্, ভগবানের মূর্ত্তিমান্ আদেশ স্বরূপ, বিস্ময়কর-অস্ত্রধারী রাজা শ্রোষের প্রধান সহায় কে ?" তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন,—'It is the bird named Parôdars, which ill-speaking people call Kahrkatâs, O holy Zarathustra the bird that lifts up his voice against the mighty Ushah. (*Zend Arestha*, Vendidad, Fargard *XVIII*, p p 196-200. The Sacred Books of the East Series.) "The cock is the drum of the world. As crowing in the dawn that dazzles away the fiends, he crows away the demons;.. 'The cock was created to fight against the fiends and wizards ;....he is an ally of Srôsh against demons. No demon can enter a house in which there is a cock. &c. &c." Foot note 4, p 197. *Ibid.*

(৩) "And whosoever will kindly and piously present one of the faithful with a pair of these my parôdars birds, a male and a female, O Spitama Zarathustra! it is as though he had given a house with a hundred columns, a thousand beams, ten thousand large windows, ten thousand small windows." Page 200, *Ibid.* Also see Yasna *LVII* ; Yast *XIII*, &c. &c.

স্কন্দ দেবগণের মহাশত্রু তারকাসুরের বিনাশের জন্য যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা মৎস্যপুরাণাদিতে কথিত হইয়াছে এবং মহাকবি কালিদাস যে এই পৌরাণিক ইতিবৃত্তকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। সেই আখ্যায়িকা এই,—"পূর্বকালে বজ্রাঙ্গ নামক অসুরের তারক নামে এক মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিয়াছিল। সে দীর্ঘকালব্যাপিনী তপস্যার দ্বারা ত্রিলোক অভিভূত করিলে ব্রহ্মা নিজে আসিয়া তাহার অভীপ্সিত বর-প্রদান করিতে চাহিলেন। সেই অসুর সময় পাইয়া অমরত্ব প্রার্থনা করিয়া বসিল; তখন ভগবান্ তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন যে 'সংসারে জন্মিলেই মরিতে হয়, অমর কেহই হইতে পারে না ইত্যাদি'—। তখন সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রার্থনা করিল, "যদি আমার নিতান্তই মৃত্যু হয়, তবে যেন সাতদিন বয়সের কোন শিশুর হস্তে আমি মরি।" ব্রহ্মাও "তথাস্তু" বলিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন এবং সেও 'অমরত্বই লাভ করিলাম' ভাবিয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল। সে ভাবিল যে সাতদিন-বয়সের কোনও শিশু কখনই তাহাকে মারিতে পারিবে না,—অতএব বুদ্ধির কৌশলে সে অমরত্বই পাইয়া বসিয়াছে। এই বর-প্রাপ্তির পর সে খুব উৎসাহের সহিত অসুর-সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া স্বর্গমর্ত্যপাতাল ত্রিভুবন জয় করিয়া বসিল এবং তাহার পরাক্রমে দেবগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত এবং নিজ নিজ যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত হইলেন। ইন্দ্রাদি লোকপাল-গণের কথা দূরে থাকুক অসুরারি স্বয়ং বিষ্ণুও সেই দুর্জয়-দৈত্যের হস্তে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

"দেবগণ এই বিপদের সময় একত্র হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা বৃহস্পতির মুখে তাঁহাদের দুর্দশার কথা শুনিয়া বলিলেন,— 'দৈত্যের বিনাশ তাঁহা হইতে হইবে না,— যেহেতু তাঁহারই বরে সেই তারকাসুর এত বড় হইয়াছে, বিষবৃক্ষকেও বড় করিয়া তুলিয়া পরে নিজে মারা উচিত নহে,—সুতরাং তিনি তাহাকে মারিবেন না। শিবের পুত্র জন্মিলে তবে তারকাসুর মরিবে অতএব যাহাতে শিব সংসারী হইয়া পুত্র উৎপাদন করেন, সেই চেষ্টা তোমরা কর।' এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে দেবগণ তথা হইতে প্রস্থান পূর্বক ব্রহ্মার উপদেশানুযায়ী কার্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

"দক্ষ সুতা সতীর দেহত্যাগের পর হইতে মহাদেব সংসারে বিরক্ত হইয়া হিমালয়পর্বতের অধিত্যকা প্রদেশে দেবদারুকাননপরিবৃত স্থিত এক বন-কুঞ্জে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিমগ্ন

অবস্থায় দীর্ঘ-কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। মহাশক্তি এদিকে উমারূপে হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করত যৌবন-লাভান্তে শিবকে স্বামিরূপে প্রাপ্ত হইবার প্রার্থনায় সেই হিমালয় শৈলেই তীব্র তপস্যায় নিযুক্ত আছেন জানিতে পারিয়া চতুর দেবরাজ ইন্দ্র কন্দর্পের সাহায্যে উমার প্রতি মহাদেবের মনঃক আকৃষ্ট করিবার বাঞ্ছা করিলেন। ইন্দ্র-প্রেরিত মন্মথ রতি এবং বসন্তের সহিত মহাদেবের সেই তপোবনে উপস্থিত হইয়া নিজের মায়া বিস্তার করত পুষ্পশরে শিবকে আহত করিতে গিয়া তাঁহার ক্রোধোদ্দীপ্ত ললাট নয়নের অগ্নিতে নিজেই ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। তাহার পর উমার একনিষ্ঠ তপস্যার ফলে মহাদেব তাঁহার বাসনা সিদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলে সপ্তর্ষিগণের সাহচর্যে হরগৌরীর মিলন এবং শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ সংস্কার সম্পাদিত হইল।

"হরপার্বতীর বিবাহের পর অগ্নি, গঙ্গাদেবী এবং ষট্‌কৃত্তিকার সহায়তার ফলে শরবনে ষড়ানন কুমারের উৎপত্তি হইল এবং শিব-শিবার স্নেহ-রসে অভিষিক্ত হইয়া সেই কুমার উপচিতবীর্য, শ্রীযুক্ত এবং মহাপরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। মাঘমাসের অমাবস্যায় তাঁহার জন্ম হয় এবং শুক্লা চতুর্থীতে তিনি সর্বাবয়ব-সম্পন্ন, পঞ্চমীতে শ্রীযুক্ত, ষষ্ঠী তিথিতে দেবসেনার সহিত বিবাহিত এবং দেবসৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া সপ্তমী তিথিতে (জন্মের পর সপ্তম দিনে) ভীষণ-সংগ্রামে তারকাসুরকে বধ করেন। এইরূপে তারকাসুরের নিপাত পূর্ণ এবং স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক হয়।"

"কুমার-সম্ভব" মহাকাব্যের প্রথমসর্গে হিমালয়-পর্বতরাজের বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উমার উৎপত্তি, দেবগণের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, মদনভস্ম, শিব-বিবাহ, কার্তিকেয়ের জন্ম এবং শ্রীবৃদ্ধি (২৪), তাঁহার সহিত দেবসেনার বিবাহ, দেব-সেনাপতি-পদে অভিষেক এবং

(২৪) মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে নবজাত স্কন্দ শ্রীযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া এই তিথি "শ্রীপঞ্চমী" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী স্কন্দের শক্তি দেবসেনারই নামান্তর। যথা,—মহাভারতে, বনপর্বে,—

"শ্রীজুষ্টঃ পঞ্চমীং স্কন্দস্তস্মাচ্ছ্রী পঞ্চমী স্মৃতা।
ষষ্ঠ্যাং কৃতার্থোঽভূদ্যস্মাত্তস্মাৎ ষষ্ঠী মহাতিথিঃ॥ ৫২॥
এবং স্কন্দস্য মহিষীং দেবসেনাং বিদুর্জনাঃ। ৫৯।
ষষ্ঠীং যাং ব্রাহ্মণাঃ প্রাহুর্লক্ষ্মীমাশাং সুখপ্রদাম্। ইত্যাদি" ২২৯ তম অধ্যায় (বোম্বাই)।

অবশেষে সপ্তদশ বা শেষসর্গে মহাযুদ্ধে তাঁহার হস্তে তারকাসুরের বিনাশ পর্যন্ত পৌরাণিক উপাখ্যানটি মহাকাব্যোচিত ভাষার, ছন্দে, অলঙ্কারে বিন্যস্ত এবং বর্ণিত হইয়াছে। মৎস্য-পুরাণের ঋষি এই উপাখ্যানটি যেরূপ ভাবে লিখিয়াছেন, কবি কালিদাসও তাঁহার এই কাব্যে প্রায় ঠিক সেই ভাবেই তাহা অভিব্যক্ত করিয়াছেন; মূল বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য প্রভেদ নাই বলিলেই হয়। সংস্কৃতভাষানুরাগী এবং পৌরাণিক দেবতত্ত্বের জিজ্ঞাসুজনের পক্ষে এই উভয় রচনার তুলনামূলক আলোচনা নিতান্ত প্রীতিপ্রদ এবং শিক্ষাজনক হইলেও বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত বোধে তাহাতে আমরা হস্তক্ষেপ করিতেছি না; তৎসম্বন্ধে যাঁহাদের কৌতূহল আছে, তাঁহারা সেরূপ আলোচনা করিলে যে পরিতৃপ্ত হইবেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। পুরাণে লিখিত আছে যে স্কন্দকথা পাঠ করিলে মানুষের সকল শোক দুঃখ দূর এবং সর্বসৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে; বিশেষতঃ ব্যাধিযুক্ত বালকবালিকা এবং রাজ সেবকগণের (চাকরীওয়ালাদের) সর্ববিধ মঙ্গল হয়; সুতরাং ইহা পাঠ করিতে কাহারও আপত্তি নাই।

কুমার-সম্ভব কাব্যের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া আমরা যতদূর বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে ইহাকে পৌরাণিক উৎকৃষ্ট মহাকাব্য ভিন্ন ঐতিহাসিক কোন গ্রন্থরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। সাংখ্য এবং বেদান্তদর্শনের সুসমঞ্জস সমন্বয়ে সমুৎপন্ন অদ্বৈতবাদমূলক শক্তি-তত্ত্বের পৌরাণিক অভিব্যক্তির এক অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত এই মহাকাব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। কান্তাসম্মিত কোমল-কাব্য-শাস্ত্রের সাহায্যে কঠোর দার্শনিক-তত্ত্বকে যে কত হৃদয়গ্রাহী করিয়া রসজ্ঞ সামাজিকগণের নিকট উপস্থিত করা যাইতে পারে, ঐন্দ্রজালিক কবি তাহাই এই কাব্যে দেখাইয়া নিজে ধন্য ও জ্ঞান-পিপাসুগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন। কোনও সম্রাটের পুত্রের স্মারকরূপে এরূপ কোন মহাকাব্য রচিত হইতে পারে না,—এবং তাহা হয়ও নাই।

স্কন্দ অথবা কুমার নবজাত শিশুর বিঘ্ন-বিনাশক এবং রক্ষাকর্তা। স্কন্দের পারিষদ্‌বর্গের সকলেই শিশুর ভীষণ শত্রু, শৈশবের রোগ এবং শিশুমৃত্যু স্কন্দপারিষদ্‌বর্গের অত্যাচারের জন্যই হইয়া থাকে, বলিয়া পৌরাণিকগণ বিশ্বাস করিতেন এবং শিশুর মঙ্গলের জন্য স্কন্দের পূজা করিবার ব্যবস্থা তাঁহারা দিয়াছেন। স্কন্দ অথবা কুমারের নামে নাম রাখিলে শিশুর সকল বিপদ দূর হইয়া যায় এই বিশ্বাসেই নবজাত শিশুকে "কুমার" অথবা "নবকুমার" বলা হয়

এবং সেই উদ্দেশ্যেই রাজপুত্রদিগকে "কুমার" আখ্যা সাধারণতঃ দেওয়া হইয়া থাকে। সেই উদ্দেশ্যেই মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজ পুত্রের নাম "কুমার" রাখিয়াছিলেন। কুমারগুপ্তের পুত্রের নামও "স্কন্দ" গুপ্ত রাখা হইয়াছিল এবং পরে ঐ বংশে "মহাসেন" গুপ্ত এবং (তাঁহার ভগিনী অথবা কোন আত্মীয়ার নাম) "মহাসেনা গুপ্তা" নাম দেখিতে পাওয়া যায় পরবর্তী কালেও আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণাপথের অনেক রাজপুত্রের "কুমার" ছিল। (২৫) "কুমার"কে আশ্রয় করিয়াই "শ্রীকুমারগুপ্তের" নামকরণ হইয়াছিল এবং "কুমার-সম্ভব" মহাকাব্যের সহিত মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্তের কোন সংস্রব নাই। অতঃপর, রঘুবংশ-কাব্যের আভ্যন্তর প্রমাণ-বিবেচনা করিয়া আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা রহিল।

(আগামীবারে সমাপ্ত হইবে)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

সাহিত্যের মূলতত্ত্ব

মানুষ বহুকাল ধরে বহুরূপে সাহিত্য এবং কলার চর্চ্চা করে এসেছে সেই প্রচেষ্টার মূল উৎস কোনখানে তা দেখতে হবে।

দেখতে হবে কোন্ আদর্শ নিয়ে সাহিত্য সঙ্গীত এবং অন্যান্য রূপে মানুষ আত্মপ্রকাশ করে।

---

(২৫) কামরূপরাজ কুমার ভাস্করবর্ম্মা, গৌড়ের কুমারপাল, গুজরাটের কুমারপাল ইত্যাদি।

* কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সেনেট হলে প্রথম বক্তৃতা থেকে অনুলিখিত।

মানুষকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। উপনিষদেও তাই দেখতে পাই—সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্। নিঃসন্দেহ আমাদের আত্মারও তিনরূপ আছে—আছি, জানি, রচনা করি। I exist, I know, I express. আজ আমি সেই তৃতীয়টির কথা বলব।

কিন্তু প্রথমেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। তার সঙ্গে অন্ন বস্ত্র সমস্যার যোগ রয়েছে। আমাদের টিকে থাকতে হবে। এই জন্য আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে হবে। কিন্তু কেবলি কি সেই কথাই হবে, একটাও কি বাজে কথা বলা চলবে না?

মানুষের যে জ্ঞানরূপ আছে সেই তাকে বিশ্রাম করতে দেয় না। প্রয়োজনের সীমায় এক জায়গায় রেখা টানা যেতে পারে। জ্ঞানের মধ্যে যে অসীমতা আছে তাই আমাদের প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করে নিয়ে যায়।

জীবনযাত্রার গণ্ডীতে যে মানুষ সম্পূর্ণ থাকতে পারে না তার কারণ যে তার চেয়ে একটু বড় কিছু আছে। কেবল মাত্র বেঁচে থাকার জন্য মধ্য আফ্রিকার লোকেরা দিন আনে দিন খায়; কেবল মাত্র তারা টিকে আছে।

কলা-বিদ্যা কি আমাদের জীবনে একান্তভাবে সম্বন্ধ নয়? জীবনযাত্রার পক্ষে জ্ঞানের কিছু প্রয়োজন আছে কিন্তু খানিকটার বেশী জানবার দরকার নেই।

সন্তুষ্ট না হওয়ার মধ্যে বড় সত্য আছে এবং মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলে। এই জন্য মধ্য আফ্রিকার লোকেরা যেমন তেমন করে টিকে থাকে, কিন্তু যেখানে মানুষ তার সমস্তটা বিকাশ করতে পেরেছে সেখানে সে সন্তুষ্ট হল না। কেন হল না? সকলেই যে দুঃসাহসিকতার কাজে প্রবৃত্ত হয় তো কখনই কেবল নিজের জন্য নয়। মানুষ প্রাণপাত করছে, সীমা লঙ্ঘন করছে, কিন্তু কেবল নিজের ব্যবস্থা করার জন্য নয়। কখনই স্বার্থ এত বড় সত্য নয় যা তাকে এত বড় করতে পারে।

আমাদের মধ্যে ভূমা আছেন তিনি কেবল আমাদের গণ্ডীর মধ্যে লিপ্ত রাখতে চান না, ক্রমাগতই আমাদের সীমা অতিক্রম করিয়ে মহত্ত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

শুধু আমি টিকে থাকলেই হল না আমার সমাজ টিকে থাকা চাই। আমার টিকে থাকা যখন সকলের টিকে থাকার সঙ্গে যুক্ত করি তখনই সকলের মঙ্গলের সহিত ব্যক্তির মঙ্গলের সম্বন্ধ হয়। একটা বড় সত্যের ওপর এর স্থিতি নির্ভর করছে, যে অসীম সত্যের

ওপর ব্যক্তিগত টিঁকে থাকা নির্ভর করে, সবারই মঙ্গল নির্ভর করে তখনই টিঁকে বড় হতে পারি। এই কথা যখন মানুষ বোঝে তখন সে নিজে বেঁচে থাকবার জন্য চেষ্টা করে না, সে অসীমের জন্য প্রাণপাত করে।

আমার টিঁকে থাকা যখন অনেকের সঙ্গে যুক্ত করি তখন আত্মজ্ঞান থাকে না কিন্তু সকলেই যেখানে আছি সেখানে আমি আছি সেইখানে মানুষ অসীম সত্তা পেয়েছে। যিনি আপনাকে বহুর মধ্যে এবং বহুকে আপনার মধ্যে দেখতে পান তিনি মুক্ত। যে জাতি তা জানতে পেরেচে তারা ধন্য হয়েছে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে।

তাহলে দেখচি আমাদের মধ্যে যেমন বেঁচে থাকবার ইচ্ছা, যেমন জানবার কৌতূহল আছে তেমনি সীমাকে বড় করবার একটা ইচ্ছা আছে, তার নাম দেওয়া যেতে পারে আনন্দ। এমন একটা কিছু আছে যা জ্ঞানের কৌতূহল থেকে, টিঁকে থাকা থেকে, আর সব দ্বন্দ্ব থেকে ক্রমাগত বড় করে চলেছে। মানুষের যেখানে আলোক সেখানে তার নিস্তার নেই সেটা হচ্ছে তার অসীম সে তাকে বের করে দিতেই হবে, সেটাই তার ভূমা।

সে যেই বাঁশী বাজলো অমনি ছুটে চল্‌লো, পথের ঠিকানা নেই, সে ছুটে চল্‌লো; আমি দেব, আমি পাব এই ভাবনায় সে অস্থির, আপনাকে সে ধারণ করতে পারে না।

প্রকাশের মূল হচ্চে আনন্দ।

আমার জিনিষ যখন আমার কাছে ন্যস্ত তখন তার প্রকাশ নাই। বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য আজ কোথায়, সে সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আওরঙ্গজেব কোথায় আছে? নেই সে কোথাও নেই বরং যে দারাকে যে মেরেছে তার সাধনা এখনো আছে। কিন্তু তাজমহলকে কি বলবো? সবাই বলে সে আমার। যুগে যুগে সবাই ওর মধ্যে দেখ্‌তে পাচ্ছি আমার রূপ, তার মৃত্যু নেই, কেন না তার সৌন্দর্য্য বিশ্বের সৌন্দর্য্য।

বিশ্বকে কি সমস্ত জিনিষ দিলেই নেয়? অনেকেই অনেক কিছু দেন, কিন্তু যেখানে বিশ্বের সুরে আমার সুর মেলে তাই সে নেয়।

প্রকাশের মূলে ঐশ্বর্য্য। কৃপণতার প্রকাশ নেই। তাই সত্যম্ অনন্তম্। কোন প্রকাশে সব চেয়ে মুগ্ধ হলাম্।—অনন্তের ঐশ্বর্য্যের প্রকাশে এবং আমি ভাগ পাওয়াতে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্যের রসতত্ত্ব ।*

সাহিত্যের অর্থশক্তি তা সমাজের অলঙ্কারশাস্ত্রে রয়েছে, তা নিয়ে আমি আলোচনা করব না। সাহিত্যে আমাদের নানা প্রয়োজন সাধন করে থাকে, ছেলেদের শিক্ষা হতে ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেন্ট পর্য্যন্ত বাক্যের দ্বারা যা কিছু প্রকাশ করা যায় তাই হল সাহিত্য। আজ আমার আলোচনার বিষয় রস-সাহিত্য, যাতে কোন রকম সামাজিকতার সম্বন্ধ নেই।

প্রাণ ধারণের জন্য আমাদের বিশেষ কতকগুলি চিত্তবৃত্তি রয়েছে, এই বৃত্তির প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত অংশ খরচ করার নাম হচ্ছে খেলা। খেলা নিছক বাজে নয়, অপ্রয়োজনীয় নয়। যে প্রকাশটা আনন্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে তাকে আমি খেলা বলি। খেলার ভেতর আছে একটা নকল করা। কুকুর খেলা করে, শিকারের নকল করে; বিড়ালছানা যখন কোন জিনিষ নিয়ে খেলা করে তখন ইঁদুর ধরা নকল করে—কিন্তু সাহিত্য কি তাই? শিল্পকলাও কি তাই? আমাদের বেঁচে থাকবার বৃত্তির যা উদ্বৃত্ত রয়েছে তা খরচ করবার আনন্দই কি এই কলাসাহিত্যের আনন্দ? আমার মনে হয় কিছুতেই তাতে সাড়া দেয় না। কবি বল্লে—"শরৎচন্দ্র পবন মন্দ" Meteriological বিদ্যায় মানুষ হয়ত ঠিক বলে দেবে কবে চাঁদ উঠেছিল কতটা বাতাস বয়েছিল, এর দ্বারা কিন্তু তৃপ্তি হয় না। কীট্‌সের সেই পাত্রের কবিতায় বর্ণনায় বাহিরের কথার বর্ণনা তিনি দেননি, দিয়েছেন তিনি অবর্ণনীয়ের ইঙ্গিত। কেবল মাত্র প্রয়োজনের অনুসরণ করে সেই পাত্রের বর্ণনা হয়নি—নিজের ভেতর সুপরিস্ফুট সুষমাযুক্ত পরিপূর্ণতা কবি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন; হয়ত কখনো কখনো তার সঙ্গে প্রতি দিনের ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারে।

সমস্ত সাহিত্য ও কলার ভেতরের কথা এই যে আমাদের ভেতরে একটা ঐক্যের আদর্শ রয়েছে। এই ঐক্য কি, ধর আমি গোলাপের আনন্দ পেয়েছি তা হল বাহিরের দৃষ্টির আনন্দ নয়, তা তার ভেতরের রঙের ও রূপের যে সুষমা রয়েছে তা পরিপূর্ণ একটা ঐক্য আপনার ভেতর আপনি লাভ করেছে তাতে কোথাও অসঙ্গতি নেই।

---

* কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দোসরা মার্চ্চের সেনেটহলের বক্তৃতা থেকে শ্রীযুক্ত তারানাথ রায় কর্ত্তৃক অনুলিখিত। 'আত্মশক্তি।'

এর ভেতর আরেকটা কথাও আছে। এই যে ঐক্য এটার বেশী ভাব রয়েছে সমস্তর সঙ্গে সর্ব্বত্র সঙ্গে। আমরা যখন কোন উদ্দেশ্য মনে নিয়ে কোন কাজ করি তখন আমরা কর্ম্মের মধ্যে উদ্দেশ্যের ঐক্য গঠন করি। কিন্তু এই চেষ্টার দ্বারা আমরা জগৎকে খণ্ডিত করি, নিখিল বিশ্বের সঙ্গে এই চেষ্টার সামঞ্জস্য থাকে না। বিপুল বিশ্বের সৌন্দর্য্যকে দূরে ফেলে দিয়ে আমাদের সমস্ত চিন্তা ঐ এক ঐক্যকে ভাবতেই ব্যস্ত থাকে। সে ঐক্য পূর্ণ আনন্দের ঐক্য নয়, সমস্ত জগতের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই। এ সবের স্থান রস সাহিত্যে নেই।

কিন্তু একটা গোলাপ, যে তার আপনার ভেতর নিখিল বিশ্বের প্রাণের কথা প্রকাশ করেছে, এ ঐক্য সমস্ত বিশ্বকে আহ্বান করেছে, এই ঐক্যই যথার্থ ঐক্য; সেইটাকে প্রকাশ করাই পরম কথা। অসীমের আকুতিকে নিজের কর্ম্মে ব্যক্ত করবার জন্য প্রাচীন কবিদের সাহিত্যকথা সৃষ্টি হয়েছিল। "আকাশ ক্রন্দসি!" অসীমের বেদনাতে অন্তহীন রূপে আপনাকে নিরন্তর ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে—আকাশে আকাশে সমস্ত আকাশের সেই বেদনা নিয়ে কলাশিল্পী যে একখানা Vas তৈরী করেছে তা জল তুলবার জন্য নয়, তা শরীরের পিপাসা নিবৃত্তি করবার জন্য নয়। এই রঙীন পাত্র তার সকলের চেয়ে বড় পিপাসা কতকটা নিবৃত্তি করবার জন্য। তার ভেতরের একটা পরিপূর্ণতার বেদনা রয়েছে যা বল্‌ছে আমাকে তোমার মানস অন্তরে প্রকাশ কর হে প্রকাশ কর। যা বল্‌ছে নিত্য আমাকে প্রকাশ কর, প্রকাশ কর। এই ক্রন্দন আহ্বান ও আকুতিকে মানুষ অবজ্ঞা করতে পারে নি। সমস্তকে অবজ্ঞা করে ঠেলে ফেলে দিয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সব ছেড়ে সে সেই ক্রন্দন প্রকাশ করতে ছুটেছিল।

মানুষ কি কেবল প্রকৃতির তাড়া, প্রকৃতির চাবুক খেয়ে কাজ করবে। না, সে ত নিত্য প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করছে। যখন আমি গান গেয়েছি তখন এই একটা কথাই আমাকে নিত্য উদ্বিগ্ন করেছে—গানের মাত্রার মধ্যে যেমন তোমার জাগিয়ে দিলে তাতে সমস্ত জগতের একটা পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। এটা কি subjective? এটা কি একটা মানসিক অবস্থা? এ কথায় এই উত্তর আমি বলেছি। এই গানের প্রভাবে আমাকে স্বর্গ-লোকে নিয়ে গেল।

সত্য ও তথ্য দুটো কথা আছে। দুটোর মধ্যে মূলগত পার্থক্যও আছে। তথ্য মানে যেমনটী তেমনি। সেইটী যাতে আশ্রয় করেছে তাই হল সত্য। যা ব্যক্তির রূপ তাতে আছে

একটা সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধতা এইরূপ বা আমার ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার মধ্যে নিবদ্ধ তা একটা বড় সত্যের পর নির্ভর করে। আবার তথ্য বা আমার fact এর কোন পরিচয় নেই। পরিচয় সর্ব্বদা universal বা ব্যাপক। তথ্যের পরিচয় সত্যে।

যাকে Art বা সাহিত্য বলি তা যদি তথ্যমূলক হয় তবে তা অত্যন্ত নীচেকার। গুণী তথ্যকে প্রকাশ করতে চায় না, তারা বলে তথ্যের জগত অন্ধকারময় সেটা হয়ত বৈজ্ঞানিক পরিচয়। কিন্তু গুণীর ক্ষেত্র হল রসের ক্ষেত্র। জ্ঞানের বিরুদ্ধতা করা চলে, রসের বিরুদ্ধতা চলে না। তথ্য হল মজুররূপী illustration সেটা আর্ট নয়। তাই রূপ ও রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে তথ্যকে অবজ্ঞা করতে হয়। একটা ছড়া আছে—

খোকা এলো নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে।

জুতাটা তথ্য কিন্তু খোকার নায়ের জুতুয়া চিনাবাড়ীর জুতা নয়, জুতুয়া জুতার চাইতে অনেক বড় কথা।

বস্তু পদার্থ অনেক সঙ্কীর্ণ; রসবস্তু পদার্থের চাইতে ঢের বেশী, তা প্রকাশ করতে হলে তথ্যমূলক ভাষায় ও রেখায় চলবে না। এখানে ছেলেমানুষী চল্‌বে না। যারা রসবিষয়ে প্রবীণ তারা তথ্য সম্বন্ধে ভয় করে না।

ভাষার একটা মুস্কিল এই যে প্রত্যেক শব্দের অভিধান নির্দ্দিষ্ট অর্থ রয়েচে, সেটা মস্ত বাধা। কবিকে সেই শব্দের বাধা অতিক্রম করে অনির্ব্বচনীয়কে কি করে প্রকাশ করতে হবে তাই ভাবতে হবে।

যৌবনের কোণে মোর মন হারাল,
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিল।

পাথারে আঁখি ডোবাটা বৈজ্ঞানিকদের কাছে কেমনতর। আবার ধরুন, "পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে", সাধারণের কাছে এটাও অসম্ভব। কিন্তু কবির কাছে তা নয়, গল্প শেষ হয়ে গেলে ছেলে বলে তারপর তারপর ? কিন্তু রসজ্ঞ বল্‌বে আর বল্‌বার দরকার নেই। অর্ব্বাচীন বলেও হল না, আরো কিছু আছে। তথ্য তাই চিত্রকলা ও সাহিত্যের অঙ্গ নয়। জাতকের গল্প অবলম্বন করে একটা কবিতায় লিখেছিলাম, প্রভু বুদ্ধের লাগি ভিখারীকে নানাজনে সোনাদানা দিচ্ছিল, ভিখারী তা নেয় নি, শেষে এক কাঙালিনী তার ছিন্ন বসনখানা অঙ্গ হতে খুলে দিল প্রভুর জন্য। কবিতা শুনে একজন বলেছিলেন, এটা

ছেলেদের বইয়ে থাকা উচিত নয়। তিনি বল্লেন মেয়েটার নির্লজ্জতা সমাজে আকৃষ্ট হতে পারে, এটা সমাজ গ্রহণ কর্লে সমাজের স্বাস্থ্য হানি হতে পারে, ইনি গেছলেন তথ্য খুঁজতে।

তথ্যকে অগ্রাহ্য করে সাহিত্য এবং চিত্রবিদ্যা আপনার পথ অনুসরণ করবে, ভাষাকে এমন করে বল যে সে ভাষা আপনার কথাকে বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে যাড়ে আড়ে বলবে, যেমন—

আধ চরণে আধ চরণে
আধ মধুর হাস।

এতে শুধু চলা নেই, শুধু শারীরিক প্রক্রিয়া নেই। এটা বৈজ্ঞানিক মতে খারাপ হলেও রসের দিকে অত্যন্ত মূঢ়। সাহিত্যের সত্য ও বৈজ্ঞানিক সত্যে ঢের প্রভেদ, সাহিত্যের সত্য বস্তু ধর্ম্ম মানে না। আমার এক বন্ধু তিনি ডাক্তার; যখন তিনি ডাক্তার তখন তিনি হলেন নিছক তথ্য। সে ডাক্তার শুধু মাত্র তথ্য নয়, যদি সে বন্ধু হয়—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

ডাক্তার হয়ত সেদিন জন্মেছে কিন্তু তার ভেতরে যে রসের সত্য রয়েছে তা কবে শেষ হয়েছে এটা ধারণা করতে পারিনে। এটা আমাকে এত করে বলতে হল তার কারণ এই যে সাহিত্য ও চিত্রকলা সম্বন্ধে অনেকেই মিথ্যাভাব পোষণ করে থাকেন। জ্ঞানদাসের একটা কথা আছে—

এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই
রূপে গুণে রসে প্রেমে আপনা বিকাই।

তথ্যের গণনা মাপা যায়। কিন্তু আমি যেখানকার কথা বল্‌ছি সেথায় নামতা কষতে হয় না, তা রূপে গুণে রসে প্রেমে আত্মহারা। এক দুই তিনের মাপকাঠি নিয়ে আমাদের রসের এলাকায় এসে সার্ভে ডিপার্টমেন্টের লোক অনেক ভুল দেখেন কিন্তু ওটা বড় ভুল নয়।

রসের কথা যেন অরসিকে না বলে। সর্ব্বদাই পকেটে Measuring Rod রয়েছে তাই নিয়ে অরসিক সত্যের ক্ষেত্রে তথ্যকে বড় করে দেখে। যেগুলো মেপে দেওয়া যায় তা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু সত্য ত মাথার উপর নাই তাই আপনি না বুঝলে তা প্রমাণ করা শক্ত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
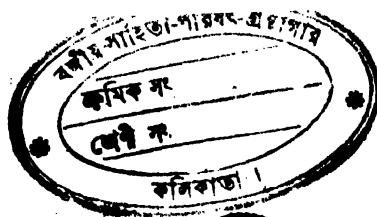
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৮ম বর্ষ। | চৈত্র, ১৩৩০ সাল। | ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

সূর্য্যের প্রতি

—:o:—

(দার্জিলিঙে)

বহুদিন গেছে চলি,' অন্ধ তমসাবলী
ঘিরে' রেখেছিল দেশ
ঢালি' স্তূপ বরফের,
নমঃ দেব ভাস্কর ! উজ্জ্বল ভাস্বর,
আশেপাশে গিরিরাজি
রঞ্জিত করো ফের !

হিরণ কিরণ তব অবাক করুক সবে,
আবার পাখিরা গা'ক সুমধুর কলরবে,
দিকে দিকে মণিদ্যুতি লিখুক তোমার স্তুতি,—
তুষার হউক সুধা,—
সুন্দর বংগের !

কে চায় দেখিতে ও গো
শুধু নিরাশার ছবি,
কাটুক কুয়াশা পুনঃ
চির সুষমার কবি !
নভে রাঙা রঙ্ গুলে' দাও দাও প্রাচীমূলে,
লুটুক আঁধার ; ওঠো
নব-প্রভাতের রবি !
আশ্বাস পেনু আজ তোমার আলোকে নেয়ে,
হোক্ ভ্রম অবসান কিরণ-পরশ পেয়ে,
অ-চাখা সুধায় মরি, দাও দাও প্রাণ ভরি,'—
জুড়াক সকল জ্বালা
হৃদয়ের ভয়কের।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

———

কালিদাসের কথা।

অগ্রহায়ণের পরিচারিকাতে আমার "কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে আমার বোধহয় একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রঘুবংশ পড়িয়াছিলাম। তাহার পর আর পুস্তকখানির সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। মনে একটা অস্পষ্ট স্মৃতি ছিল যে কালিদাস লৌহিত্যানদী, কামরূপ এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর একত্র উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবন্ধটা লিখিবার সময়ে কাছে রঘুবংশ ছিল না। একটী প্রতিবেশীর নিকটে নবীনচন্দ্র দাস কৃত বাঙ্গলা অনুবাদিত রঘুবংশ পাইলাম। তাহা হইতেও কষ্ট করিয়া সমস্ত দিগ্বিজয় বর্ণনাটা পড়ি নাই—কেবল সেই লোহিত্য-প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—কামরূপ নাম যুক্ত স্থানটা পড়িয়া লইলাম। অনাদিকে ব্রহ্মপুত্র নদীকে আসামীরা যে লোহিত বলে তাহা জানিতাম, এবং কামরূপের প্রধান নগর গৌহাটিই যে পূর্ব্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে অভিহিত হইত বলিয়া আসামী ও বাঙ্গালীদের বিশ্বাস তাহাও জানিতাম। সুতরাং আমার প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ গৌহাটিকেই কালিদাস প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু পৌষের পরিচারিকায় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ মহাশয়ের লিখিত অসাধারণ বিদ্যাবত্তা এবং প্রবলযুক্তিপূর্ণ "ইতিহাসে কালিদাস" শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত রঘুর দিগ্বিজয়-বিবরণ পড়িয়া দেখিলাম যে কালিদাসের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও কামরূপ অযোধ্যার উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত হওয়াই সম্ভব যেহেতু পারসীকদিগকে জয় করিয়া রঘু হিমালয়ে আরোহণ করিয়া প্রথমে উৎসব সঙ্কেত অর্থাৎ কিন্নরদিগকে জয় করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও কামরূপের মধ্য দিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। হয় ত কাশ্মীরেরই প্রাচীন নাম ছিল কামরূপ। কেন না কামরূপ শব্দের অর্থ সৌন্দর্য্য মণ্ডিত। ইহা কাশ্মীরের প্রতি যত প্রযোজ্য, আসামের প্রতি তত কখনই নহে। তাহা না হইলেও নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশের নাম কামরূপ ছিল। কালে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও কামরূপ উভয় নামেরই পরিবর্ত্তন হওয়ায় সেই দুইটা নামে তান্ত্রিকেরা আসামের স্থান বিশেষকে অভিহিত করিলেন। তান্ত্রিকদের অকার্য্য কিছুই ছিল না। তাঁহাদের মতে বুদ্ধ এবং বশিষ্ঠ খুব মদ খাইতেন। তাঁহাদের মতে রাম ও রাবণ

দিনের বেলায় যুদ্ধ করিতেন এবং রাত্রে দুইজনে একত্র বসিয়া মদ খাইতেন। ভৈরবীচক্রে স্ত্রীলোক না থাকিলে চলে না বলিয়া মন্দোদরী সেই চক্রে উপস্থিত থাকিতেন। একদা লক্ষ্মণ দৈবাৎ চক্রমধ্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্ত্রীলোকের দিকে তাকাইতেন না সুতরাং মন্দোদরীর দিকেও তাকাইলেন না। ইহাতে মন্দোদরী আপনাকে অবমানিতা মনে করিয়া এই শাপ দিলেন যে তাঁহার স্বামীর নিক্ষিপ্ত শেলে যেন লক্ষ্মণের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই শাপের ফলেই শক্তিশেল হইয়াছিল। তান্ত্রিকদের মতে কল (অর্থাৎ machine) শব্দটা সংস্কৃত। তাঁহারা বলেন যে কলের মধ্যে বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়াই শরীরের নাম কলেবর হইয়াছে। তাঁহাদের শাস্ত্রে ইংলণ্ড, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানের নামও আছে।

কিন্তু এ সকল অবান্তর কথা যাউক। আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে অখিল বাবু জানেন না যে কি কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কালিদাসকে পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলা হয়। আমি নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অখিল বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব।

১। অখিল বাবু যে বলিয়াছেন যে বৃহৎকথা নামক পুস্তক একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আমার কিছু সন্দেহ হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমি কাশী কলেজের লাইব্রেরিতে বৃহৎকথার ইংরেজী অনুবাদ দেখিয়াছি। তাহার সমস্ত পড়ি নাই দুই একটা গল্প পড়িয়াছি ইহা মনে আছে। আমার বোধ হয় মূল বৃহৎকথা দেখিয়াই সেই অনুবাদ প্রস্তুত হইয়াছিল। তবে পঞ্চাশ বৎসরের কথা আমার ঠিক মনে নাও থাকিতে পারে।

২। অখিল বাবু সোমদেবের কথায় সম্পূর্ণ আস্থাবান্। অর্থাৎ সোমদেব যে বলিয়াছেন যে তিনি কথাসরিৎসাগারে বৃহৎকথার বহির্ভূত একটা কথাও বলেন নাই অখিল বাবু তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। কিন্তু অখিল বাবু নিশ্চয়ই জানেন যে পূর্ব্বকালে কি ভারতীয় কি অন্য দেশীয় সাহিত্যিকদিগের সাহিত্যিক সজ্জনতা প্রায়ই ছিল না বলিলেই হয়। কি মহাভারত, কি রামায়ণ, কি বাইবেল সকল গ্রন্থেই বহুল পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত আছে। সোমদেবের গ্রন্থ যে ইহার ব্যতীরেক-স্থল তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। অথবা গুণাঢ্য এবং সোমদেবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে যে বৃহৎকথা অবিকৃত ছিল তাহাও বিশ্বাস করা কঠিন। কথা-সরিৎসাগরে যখন হূণদিগের উল্লেখ আছে তখনই বুঝিতে হইবে যে খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে লিখিত

বৃহৎকথায় তাহা কখনই ছিল না। হূণেরা ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে পরিচিত ছিল না। কালিদাসও সোমদেব উভয়েই যখন হূণদিগের উল্লেখ করিয়াছেন তখন উভয়েই ৪০০ অব্দে পরবর্ত্তী। আবার সোমদেব যখন কালিদাসেরও অনেক পরবর্ত্তী তখন সোমদেবই কালিদাসের অনুকরণ করিয়াছিলেন। ইহা যুক্তি সঙ্গত।

৩। অখিল বাবু যে বলিয়াছেন যে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় বর্ণনাকে আদর্শ করিয়া কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় লেখেন নাই ইহা সম্পূর্ণ ঠিক্। সমুদ্র গুপ্তের দিগ্বিজয়ে হূণদের কোন উল্লেখ নাই কিন্তু রঘুর দিগ্বিজয়ে আছে। কেননা সমুদ্র গুপ্তের অনেক পরেই হূণেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল।

৪। কাতন্ত্র প্রণেতা যে গুণাঢ্যের সমসাময়িক ছিলেন—কাতন্ত্র ব্যাকরণ যে এত পুরাতন তাহা আমার বিশ্বাস হয় না! কিন্তু আমি এই বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে অক্ষম। বস্তুবিকই যদি তাঁহারা সমসাময়িক হন তাহা হইলে হয়ত গুণাঢ্যও তত প্রাচীন নহেন।

যাহা হউক এখন অতি সংক্ষেপে বলিব যে কেন কালিদাসকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক মনে করা হয়।

১। কালিদাস যে কৌশলক্রমে কেবল সমুদ্র গুপ্তের নামই উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নহে তিনি সমুদ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী রাজাদিগের নাম ও পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে অকাশ্যমধ্যা স্থান দিয়াছেন। সমুদ্রের পর চন্দ্র গুপ্ত, কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্তের নামও রঘুবংশে দেখিতে পাওয়া যায়। দিলীপের জন্ম হইয়াছিল যেন ক্ষীরনাধি অর্থাৎ সমুদ্র হইতে ইন্দু অর্থাৎ চন্দ্রের জন্মের মত। দিলীপের পুত্র রঘুকে পুনঃ পুনঃ কুমার বলা হইয়াছে কুমার গুপ্তের উপাধি যে মহেন্দ্রাদিত্য ছিল তাহারও আভাষ আছে। অংকে স্কন্দের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। কুমার গুপ্তের সময়ে হূণেরা রাজ্য আক্রমণে তাঁহাকে যখন বড় বিপন্ন করিয়াছিল তখন যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য রক্ষা করেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনারই ছায়া-স্বরূপে মেঘদূতে কালিদাস যক্ষকে দিয়া মেঘকে বলাইয়াছেন যে "অসুরদিগকে জয় করিবার জন্য পথমধ্যে অসুর বধের জন্য স্থাপিত স্কন্দের মস্তকে জলধারা দিয়া যাইবে।" স্কন্দগুপ্তের সময়েই গুপ্তরাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল। কালিদাসও বলিয়াছেন ছিন্নোহপ্যা বিপ্রসসার বংশ,

গুপ্ত রাজ্য ধ্বংসের ধ্বনি রঘুবংশের ১৯শ অধ্যায়ে আছে। ঘটনার ও নামের এত মিল দৈবাৎ হইতে পারে না।

২। কালিদাস গুপ্তবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে মগধকে এত বাড়াইবেন কিরূপে? গুপ্ত-রাজাদিগেরই রাজধানী ছিল পুষ্পপুরে। কালিদাসের কাব্যে পুষ্পপুরেরও উল্লেখ আছে। কালিদাস এক স্থানে বলিয়াছেন যেমন বহু গ্রহনক্ষত্র থাকিলেও কেবল চন্দ্র থাকিলেই রাত্রিকে জ্যোতিষ্মতী বলে সেইরূপ বহু রাজা থাকিলেও কেবল মগধের রাজা আছেন বলিয়াই পৃথিবীকে রাজবতী বলা যায়।

৩। মেঘদূতের একস্থানে কালিদাস লিখিয়াছেন দিঙ্‌নাগানাং পথিপরিহরন্ স্থূল হস্তাবলেপান্ ইত্যাদি। এখানে তাঁহার সমসাময়িক দিঙ্‌নাগাচার্য্যের প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ আছে। দিঙ্‌নাগ ছিলেন বসুবন্ধুর ছাত্র এবং বসুবন্ধু যখন বড় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন তখন তিনি একবার স্কন্দগুপ্তের সভায় গিয়াছিলেন।

এই সকল বিষয়ে যাঁহারা বিস্তারিতভাবে আলোক পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ১৯ ৯ অব্দে প্রকাশিত এশিয়াটিক্ সোসাইটির জার্ণালে প্রকাশিত হর্ণলি সাহেব এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

আমি এই প্রবন্ধে যাহা লিখিলাম তাহা প্রধানতঃ বিজয় বাবুর কালিদাসাখ্য পুস্তক হইতে গৃহীত। এই পুস্তকখানি সাহিত্যসেবী মাত্রেরই পাঠ করা উচিত।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

ছন্দ-হীন।

—া—

ঐ বিধাতার রুদ্র-বাণী, বিশ্বে মহান উঠ্‌ছে অভয় রোল!
ওরে পাগল! নেরে মাদল; ওরে বাদল দেরে দুদোল দোল!
কোন বিরহী রইল পরে? কোন সাগরের জল শুকা'ল হায়!
কোন হৃদয়ে জাগ্‌ছে মরু? মনের কোণে কে লুকা'তে চায়?

কার হাহাকার আজ নিয়ত—কার নয়নে ঝরল অঝোর ধার ?
কার বাগানে ফুল ফোটে না ঝরল কলি অফুট অনিবার ?
মিথ্যা কোথায় খাপ পেতেছে ? মৃত্যু কোথায় দিচ্ছে রে আজ হানা ?
কার বসন্ত এলিয়ে এলো—কোন শকুনি মেল্‌লো রে আজ ডানা ?
সব টেনে নে' সব ভরে দে'—দে সাড়া দে উঠ্‌ছে অভয়-রোল !
ওরে পাগল ! নেরে মাদল ওরে বাদল দেরে দুদোল দোল !

ওকি ঝরে জানিস কিরে ? গগনে আজ কিসের মহোৎসব ?
ঝঞ্জা-ঝাপট কিসের দাপট ? জাগায় প্রাণে মাতাল মাতন সব !
ওকি ঝরে আশিস্ কিরে ? ওকি বাজ্ঞা মেটে না তোর বুকে ?
মরণ কালো বিশ্বব্যথা প্রতিহত আসছে কিরে রুখে ?
নিদ্রিতেরে বলছে অভয়—নির্দ্দয়েরে বল্‌ছে খবর্দ্দার !
যুগ নিগড়ের বন্ধ হ'তে বিশ্বেরি এ মুক্তি চমৎকার !
দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বহিছে খড়ের সম উড়িয়ে নিবে আজ—
একি নাচন ! একি কাঁপন ! জয় ভগবান জয় হে অধিরাজ !
মুক্তি যে তোর মুক্তি যে তোর দে সাড়া দে উঠছে অভয় রোল !
ওরে পাগল ! নেরে মাদল ওরে বাদল দেরে দুদোল দোল !

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

রক্তাম্বরা।

—:০:—

পরীক্ষা।
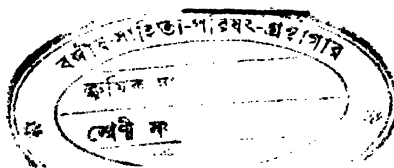
বেলা বলিল "সেদিনের কথা ভাল মনে পড়ে না। বাবা ও নীরদার সঙ্গে কলিকাতা গেলাম। আদিত্য মশাই তার আগে থেকেই এখানে আস্‌তেন। যাক্ সেবার কলিকাতা থেকে বাবা ও নীরদা হরিদ্বার গেলেন। আমি একলা রইলাম। একদিন মেজর দত্তর সঙ্গে দেখা হোল। হঠাৎ বোল্‌লেন তাঁর মা, বোন সবাই এসেছেন। আমাকে ডেকেছেন। আমার সঙ্গে আলাপ কোরবেন। নিজেরাই আস্‌তেন তবে তাঁর মার বড় শরীর খারাপ।"

"তার আগে তুমি ও বাড়ীতে কখনো যাও নি?"

"না, মেজর দত্ত আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ কোরলেন। আমি তাঁদের বাড়ী গিয়ে দেখি তাঁর মা বোন কেউ বাড়ী নেই। শুন্‌লাম তার অসুখ হওয়ায় সেইদিন সকালেই দেশে গেছেন। তা হোক আমায় নিমন্ত্রণ রক্ষা কোরে বাড়ী ফিরতে হবে। কাজেই একটু খেতে হোলো। একটু পরেই কেমন অজ্ঞান হবার মত মনে হোল। সব অবশ হ'য়ে এল। নিজের কোন স্বাধীন ইচ্ছা বা কথা বলার ক্ষমতা রইল না। সেই সময় কে যেন আমায় ক'নে সাজাল, তারপর বিয়ে হোল কিন্তু বরের মুখ মনে রইল না। ক্রমে একেবারে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়লাম ও অজ্ঞান হ'য়ে গেলাম। জ্ঞান হ'লে দেখ্‌লাম আমি গড়েরমাঠে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে আছি। আমি আস্তে আস্তে উঠে বাড়ী এলাম। তারপর একদিন সেই বাড়ীটি দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। শুন্‌লাম গৃহস্বামী পাহাড়ে গেছেন। বাড়ীতে পাহারা ছিল। সে বাড়ীতে আদিত্য বা মেজর দত্ত কেউ থাকে না। পুরুতকে খুঁজে বার করবারও চেষ্টা কোরেছিলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু মনে এল না।"

"বিয়ে যে রেজিষ্ট্রী হোয়েছিল সেখানে চেষ্টা কর নি?"

"রেজিষ্ট্রীর কথা কিছু মনে পড়ে না।"

"মেজর দত্তের সঙ্গে আগে আলাপ ছিল?"

"হাঁ, আদিত্যমশায় সঙ্গে তিনচারবার তিনি আমাদের বাড়ী এসেছিলেন।"

"রাজা ত তাঁকে চেনেন না।"

"রাজা তখন বিদেশে ছিলেন।"

"তুমি তা হ'লে এ বিয়ের কি উদ্দেশ্য কিছু জান না?"

"কিছু না। তোমাকে কেন যে আমার স্বামীরূপে পছন্দ করা হোল তা জানি না।"

"এ বিয়ের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে সব পরিষ্কার হ'য়ে যায়।"

"জহরাও ত এর ভেতর আছে। আমি জহরার নাম তোমার ও মেজরের সেই রাত্রের কথাবার্ত্তা থেকে জানতে পারি।"

আমার হাতের ভিতর বেলার হা[illegible] কাঁপিয়া উঠিল।

"হাঁ, মেজর দত্ত সে [illegible] কথা কোরতে আমায় অনুরোধ করেন। আমি তাঁর কাছে আমার স্বামীর [illegible] তা বোঝাও [illegible] সম্মত হই। কিন্তু কিছুই খবর পাই নি। তিনি কেবল আমায় জহরার প্রাণনাশ ক'রবার জন্য উত্তেজিত করবার চেষ্টা কোরেছিলেন।"

"জহরা কে?"

"আমার শত্রু।"

"আর কিছু বোলবে না?"

"আর কিছু জানি না। সে কি করে তাও জানি না। কেবল জানি সে আমার অনিষ্ট চিন্তা করে।"

"কিন্তু তাকে ত দেখেছ। সে ত বেদিয়ানী সেজে এসেছিল। আর কালিও আগে এখানেও ত এসেছিল।"

"এখানে এসেছিল? ঠিক?" বেলা যেন ভয়ে কাঠ হইয়া গেল।

আমি তখন কোথায় এবং কি অবস্থায় জহরার দেখা পাইয়াছিলাম সব আবার তাহাকে বলিলাম। সে চলিয়া যাইবার পর আমার কি রকম শরীর খারাপ হইয়াছিল তাহা বলিলাম।

"ভুল হয় নি ত ?"

"না। আমি ঠিক জানি কলকাতায় সেই তোমার সঙ্গে দেখা কোরতে গিয়েছিল। কিন্তু সে রাত্রে তুমি কোথায় গিয়েছিলে বোল্লে না ত ?"

বেলা কয়েক মিনিট নীরবে রহিল। তারপর বলিল "মেজরের সঙ্গে দেখা কোরতে। সে আমাকে তার সঙ্গে দেখা কোরতে বাধ্য করে।"

"কেন ?"

"সে বোলতে চেয়েছিল যে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্বন্ধে সে নিরপরাধ। আমি তাকে আমার স্বামীর কথা ও তাঁর নাম গোপনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা কোরেছিলাম সে বোল্লে জহরার কাছে জানতে পারবো।"

"জহরা কোথায় থাকে জান ?" .ব তাঁর মা

"না।"

"তার দেখা আর একবার যদি পাই !"

বেলা উপর্যুপরি ঘটনা সমূহের ঘাত প্রতিঘাতে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বেচারাকে কতই সহ্য করিতে হইয়াছে। সে আমায় কত ভালবাসে। আমরা অনেকক্ষণ গল্প করিলাম অবশেষে যখন বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম তখন সকলেই সেখানে আসিয়াছেন আমাদেরই দেরী হওয়া গিয়াছে। তাঁহারা কেহ তখনো জানেন না আমরা স্বামী স্ত্রী। উপরে গিয়া টেবিলে হালদারের লেখা চিঠি পেলাম। তিনি অবিলম্বে কলিকাতা ফিরিতে লিখিয়াছেন। আমি তাড়াতাড়ি সমস্ত গুছাইয়া দাসীর হাতে বেলাকে একখানি চিঠিতে সব জানাইয়া ভোরের ট্রেণে কলিকাতা রওয়ানা হইলাম। পরদিন হালদারের ঘরে গিয়া দেখি তিনি ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। ঠিক আগের বারের মত আগুনের সামনে কি পরীক্ষা করিতেছেন, একটি পাত্রে নীলরং এর কোন ঔষধ তৈয়ারী হইতেছিল। আমাকে দেখিয়া সাগ্রহে হাত ধরিয়া বসাইলেন।

তারপর উৎসাহভরে বলিলেন "বিমল আমি অবশেষে কিছু জানতে পেরেছি। রাণীর সে [illegible] ব্যাপার যে এত ভয়ঙ্কর অতটা আগে ভাবতে পারি নাই।

"সত্যি ? তা হলে এতদিনে আসল ব্যাপার জানতে পারলেন ?"

"হ্যাঁ, কি ক'রে জানলাম শোন এখন।"

"বলুন আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

"দেখ যেদিন প্রথম আমায় তুমি রাণী নীরজার বাড়ী ডেকে পাঠাও সে দিন আমি বেলাদেবীর অসুখের লক্ষণ দেখে বুঝলাম যে কোন অবসাদজনক বিষ শরীরে প্রবেশ করায় ওই রকম মূর্চ্ছার মত হচ্ছে। তাই কারণ না জেনেও আমার ওষুধ ঠিকই ছিল। যে খুন আমরা পাই তাও বিষ ; একরকমের বিষ তবে সেটা কোন কোন অস্ত্রকে ক্ষয় করে যায়। আমরা বাহিরে তার কোন চিহ্ন পাই না। এই জাতীয় বিষ ত্বক সংযোগেই শরীরে প্রবেশ করে। কিন্তু শরীরের সকল অঙ্গ ইহা শোষণ করতে পারে না। যে সব অঙ্গ পারে তারা আবার এমন ভাবে করে যে তা বোঝাও যায় না। এই নীতির অনুসরণ করে আমি রাণীর সেই বসবার ঘরের জানালা দরজা সব অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করি। শেষে দরজার হাতলে সাদা একরকম জিনিষ লাগান দেখলাম। তার বেশীর ভাগই হাতে হাতে উঠে গেছে যেটুকু ছিল সেটুকু সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসে পরীক্ষা কোরলাম। দেখি যে সে ভয়ানক তীব্র বিষ। সে বিষ চামড়ায় একটু বেশী লাগলে মৃত্যু নিশ্চয়। আমি একটা ব্যাঙের চামড়ায় একফোঁটা ঐ বিষ লাগাতেই ব্যাঙটি তক্ষুণি মরে গেল। ঐ বিষ দরজার হাতলে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। সমস্তটা শরীরের ভেতর গেলে আমাদের কাউকেই বাঁচতে হোত না। কিংবা যে ওষুধ ঐ বিষের কাজ রোধ করবার জন্য আমি দিয়েছিলাম তা যদি না দিতাম তাহলেও মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। এই বিষ কোন্ জিনিষ থেকে তৈরী তা জানবার জন্য অনেক চেষ্টা কোরলাম শেষে এই সিদ্ধান্ত হোল যে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার জঙ্গলের যে সব উদ্ভিদে বিষ থাকে এ সে সব থেকে তৈরী নয়। এ আরও তীব্র। অনেক গ্রীক ও ল্যাটিন বই পড়লাম। সংস্কৃত বই পড়লাম। শেষে একরকম এক উদ্ভিদের কথা পেলাম। তাতে লেখা আছে যে এবিষ শরীরে গেলে মানুষ মাতালের মত হ'য়ে ক্রমশ মৃতের মত হয়। হাত পা ঠাণ্ডা ও অবশ হয়ে যায়। বাক্‌শক্তি রোধ হয়, বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষাঘাত হয়। আর বিষ প্রয়োগে মৃত্যু বলে ধরবারও উপায় থাকে না। এই বিষ মরুপ্রান্তরে জন্মায়। সেখান থেকে প্রথমে মিসরে তারপর তুরস্কে, ও পরে বিদেশে যায়। ভারতবর্ষের মরুভূমিতেও

খুঁজলে বোধ হয় পাওয়া যায়। আমি কৃষিসচিবের সঙ্গে দেখা কোরে এ গাছ ভারতবর্ষে আছে কিনা, আর কটি আছে, জিজ্ঞাসা করি। শুনলাম দুটি মাত্র আছে। একটি অনেকদিন আগে একবার প্রদর্শনীতে দেখান হয়। আর, আর একটি কিছুদিন হোল একজন ধনী মহিলা আনিয়েছেন। তাঁর ফটো আইনানুসারে কৃষিসচিবের কাছে থাকতে বাধ্য; তবে আমি তাঁর ঠিকানাও ফটো চাইলাম। ফটোতে কৃষ্ণবসনা এক রমণী। সেই ফটোর একটি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিলাম।" বলিয়া তিনি দেরাজ হইতে একটি ফটো বাহির করিয়া আমায় দেখাইলেন। কি আশ্চর্য্য এ'ত জহুরার প্রতিকৃতি। আমি তখন তাঁকে রাণী হরনাথ দত্তর প্রাসাদে জহুরাঘটিত সকল ব্যাপার বলিলাম। তিনি বলিলেন "তুমি আমায় এরহস্য ভেদ কোরতে অনুরোধ কোরেছিলে, এই নাও সব বিবরণ আর সেই রমণীর ঠিকানা তাঁর আমার নাম সারদাপ্রসাদ দত্ত। এখন দেখ সন্ধান নিয়ে বাকী কথা বার কোরতে পারো কিনা। আমার কাজ শেষ হোয়েছে। ঐ বিষ আমি তৈরী কোরেছি।" বলিয়া আমাকে একটি শিশি দেখাইলেন তাহাতে সাদা খানিকটা তরল পদার্থ ও নীচে লবনের মত সাদা গুঁড়ো। এতদিনে বুঝিলাম কেন নাকবন্ধ করিয়া দস্তানা পরিয়া সে দিন তিনি পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিলেন।

"আপনি সে রমণীর সঙ্গে দেখা কোরেছেন?"

"হাঁ, সে গাছটিও দেখেছি। আমি বেলাদেবী ও তার বোনের কথাবার্ত্তা থেকে জহুরার নামও বর্ণনা প্রথম শুনি।"

"জহুরা সম্বন্ধে আপনি এরহস্য ভেদ কোরেছেন?"

"না একেবারেই না।"

যাহা হউক তিনি যে কত ধৈর্য্যের সহিত আমার জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন তা জানিয়া কৃতজ্ঞমনে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম আর তিনি যে আরও সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাহাও বুঝিলাম।

জহুরা।

পরদিনই আমার তার পাইয়া বেলা কলিকাতা আসিল। তাহাকে লইয়া জহুরার বাড়ী গেলাম। সে যে বেলাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এখন আর তাহাতে ভুল নাই।

প্রমাণও আমাদের হাতে, কাজেই তাহার নিকট হইতে এখন আর কোন ভয় ছিল না। আমি আগের দিনই পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত দেখা করিয়া বন্দোবস্ত ঠিক রাখিয়াছিলাম; তিনি দুজন কনেষ্টবল সঙ্গে করিয়া একটু দূরে লুকাইয়া রহিলেন। আমি ও বেলা প্রবেশ করিতেই ভৃত্য সমাদরে বসাইল। আমরা ততক্ষণ ঘরের জিনিষপত্র দেখিতে লাগিলাম। বসিবার ঘরের পাশে কাঁচ আঁটা একটি বারান্দা। সেই বারান্দায় সারি সারি টবে ভাল জাতীর এক রকম সবুজ সতেজ গাছ। তার ফলগুলি সীমের মত চেপ্টা লম্বা লম্বা। আমি হালদারের বর্ণনা হইতে বুঝিলাম এই সেই বিষ গাছ। খানিক পরে জহুরা আসিল। আজ দিনের বেলা জহুরার মুখ দেখিলাম। তার বয়স চল্লিশ আন্দাজ করিলাম। তাহাকে দেখিলে সে যে এককালে খুব সুন্দরী ছিল তা বেশ বোঝা যায়। আমি সে আসাতে মাত্র উঠিয়া বলিলাম "আমাদের চিনেছেন নিশ্চয়। যাকে না দেখলেই ঠিক চিনবেন। এঁর নাম বেলা অর্থাৎ আমার নয় ডাক্তার বিমল কর। বুঝলেন আমাদের আসার উদ্দেশ্য? আপনি আমাদের কেন হত্যা কোরতে চান, আপনার কি অনিষ্ট আমরা কোরেছি তাই জানতে এসেছি।"

জহুরা উদ্ধতভাবে বলিল "কি বোলছেন? আমি বুঝতে পারছি না।"

আমি পকেট হইতে তাস বাহির করিয়া আগে দরজার তালা দিলাম তারপর বলিলাম "অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ বিষের গাছ আজকাল এ দেশে আর কোথাও নেই সেই যথেষ্ট প্রমাণ নয় কি?"

জহুরার মুখ এক নিমেষে পাথরের মত কাল ও কঠিন হইয়া গেল। সে মুখে প্রতিহিংসার ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। সে বেলার দিকে দুই পা অগ্রসর হই। তীব্র স্বরে বলিল "তোকে আমি প্রাণপণে ঘৃণা করি।" আমি তাড়াতাড়ি দুজনের মাঝখানে গিয়ে দৃঢ় স্বরে বলিলাম "ও সব রাখ, আসল কথার উত্তর দাও।"

"আমি কিছুই বোলব না। এই মেয়েটার জন্য আমার জীবনের সব সুখ ঘুচে গেছে।"

"তুমি আপনিই আপনার সর্বনাশ কোরেছ। আর এখনো যদি না বল সব, ত আদালতে বোলতেই হবে।"

"আদালতে ?"

"হাঁ, আদালতে। তুমি আমার স্ত্রীর ও আমার নিজের জীবননাশ করিবার চেষ্টা কোরেছিলে আমি তোমার সহকারীদেরও জানি। এ কাজের প্রতিফল দিয়ে তবে ছাড়বো।"

"এ আপনার স্ত্রী ?"

"নিশ্চয়। বিশ্বাস হচ্ছে না ? মিথ্যা কথা বলা অভ্যাস আমার নাই, রেজেষ্ট্রী আপিসে প্রমাণ পাবে। সব কথা না বল ত এখুনি গেপ্তার করাব।"

আরও খানিকক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর জহুরা বলিল যে তাহার জীবনের সব কথা না শুনিলে কেন যে সে আমাদের হত্যা করিবার চেষ্টা কোরেছিল তাহা বুঝা যাইবে না। আমি তাহাকে তাহার জীবনকাহিনী বলিতে বলিলে সে অতি অনিচ্ছায় আরম্ভ করিল। সে বলিল যে এককালে সে খুব সুন্দরী ছিল। শৈশবেই তাহার পিতামাতা মারা যান। তার পিতা খুব ধনবান ছিলেন। আপনার একমাত্র কন্যাকে সমস্ত ধনৈশ্বর্য্যের সহিত এক বন্ধুর হাতে সঁপিয়া দেন। সেই বন্ধুটি একটি রঙ্গালয়ের ম্যানেজার ছিলেন। জহুরা তাঁহারা নিকটে থাকিয়া নৃত্য গীত ও অভিনয়ে দক্ষ হইয়া উঠিল। তখন তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য অনেকেই পাগল হইয়া উঠিল। তাহাদের ভিতর আদিত্য নামে একজন ধনবান যুবক ছিল। বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁর অসামান্য খ্যাতি ছিল। ইহাকে জহুরা বিবাহ করে। বিবাহের কয়েক মাস পরেই জহুরার সমস্ত অর্থ ও গহনা আত্মসাৎ করিয়া আদিত্য নিরুদ্দেশ হইল। ক্রমে দশ বৎসর চলিয়া গেল। আদিত্য আর ফিরিল না। উদরান্নের জন্য জহুরাকে তখন অভিনেত্রী সাজিতে হইল। কিন্তু তখন অনাদরে তার রূপ গিয়াছে দাসী চাকরাণী ছাড়া আর কিছু সাজা তার কপালে জুটিত না। তখন সে অপমানের প্রতিশোধ লইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল। কিন্তু অর্থাভাবে কিছু করিতে পারে নাই। তার এক আত্মীয় মারা যাওয়ায় হঠাৎ সে অনেক অর্থের অধিকারিণী হইল। তখন আদিত্যের সন্ধান লইতে লইতে কাল্কা যতীন্দ্রনাথের বাগানে এই মেয়েটির সঙ্গে তাহার স্বামীকে বেড়াইতে দেখে। তাই এই মেয়েটিই তাহার স্বামীকে তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে ভাবে। তাহার স্বামীর ঘরের ভিতর তাঁর একখানা লাটিন ডাক্তারি বই সে পেয়েছিল তাহাতেই সে এই বিষ প্রস্তুত

করিবার প্রণালী শিখিয়া সেই বিষ প্রয়োগে আমাদের হত্যা করিবার চেষ্টা করে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার স্বামীর নাম কি?"

"তার প্রকৃত পদবী আদিত্য কিন্তু সে যেকব দত্ত বলেই তোমাদের কাছে পরিচিত। তার এক কুকার্য্যে সহকারী বন্ধু আছে সেও নিজেকে আদিত্য বলে পরিচয় দেয় কিন্তু তার পদবী ঘটক। ওরা দুজনেই ডাকাতি কাজে পরিপক্ক ও ওদের নীচে এজেন্টও আছে। ঘটক ত একজন খুনী আসামী। যাই হোক বলছি নব বাগানে ওদের দেখে আমি ওদের ওপরের পুলে এই বিষ মাখিয়ে দিই। ভেবেছিলাম ওই রাস্তা দিয়ে ওরা ফিরবে তা হলে রেলিঙে হাত দিলেই মৃত্যু নিশ্চিত।"

"ওঃ। তা হলে রাজার মৃত্যু এই বিষেই হোয়েছে।"

"হাঁ আমিই তাঁর হত্যাকারী। তোমাদের ইচ্ছা হয় ত এ কথা প্রকাশ কোরতে পার।"

"আমাদের বিষ দেবার কোন উদ্দেশ্য তা হলে তুমি জান না?"

"না। জান্লে নিশ্চয়ই বোল্তাম কারণ ঘটক ও দত্ত আমাকে ঠকিয়েছে আর তারা আমার বন্ধুও নয়। রাজার মৃত্যুর পর আমি রাণী নীহারার জমিদারীর বাড়ীতেও একবার কলিকাতার বাড়ীতে যোগেশবাবুকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে এই বিষ প্রয়োগ করি ভগবানের দয়ায় দুবারই অকৃতকার্য্য হোয়েছি। আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি ভুলে আপনার ঘরে প্রবেশ কোরেছিলাম।"

"তাই আমিও একদিন মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম।"

"হাঁ তাই। আমার ক্ষমা করা মুস্কিল কিন্তু যদি পার চেষ্টা কোরো ক্ষমা কোরতে আমি জানিতাম না যে বেলা আপনার স্ত্রী।"

"আমরা সব ত এখনো বুঝতে পারছি না। তুমি কি আদিত্য বা ঘটক কারো সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারো না?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা বলিল "যাকে আপনি আদিত্য বলে জানেন সে আজ আমার সঙ্গে দেখা কোরতে এসেছে এখনো বসে আছে তাকে ডাকব?"

"ঠিক।"

সহসা বেলা কম্পিতকণ্ঠে বলিল "আমারও কিছু বলবার আছে। আমার তুমি মিথ্যা পরিচয় জান। আমি রাণী নীরজার কেউ নই। আমার বাপ মা কে, তা জানি না। এক দেবমন্দিরে মোহন্তর কাছে নীরজা ও আমি দুজনে মানুষ হই। নীরজার মা মারা গেলে তার বাবা তীর্থ কোরতে যান হ'ন তখন তাঁকে মোহন্তর কাছে দিয়ে যান। রাজা হরনাথ নীরজার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে বিয়ে করেন। আমার ধর্ম্মপিতার ইচ্ছা ছিল যে আমি দেবদাসী হ'য়ে চিরদিন দেবমন্দিরের সেবা করি কিন্তু আমার সে ইচ্ছা ছিল না। নীরজা তা জানত সে আমাকে তাই নিজের কাছে নিয়ে যায় আর বোন ব'লে পরিচয় দেয়। আর সব তুমি জান।"

"তা হলে ঘটককে জিজ্ঞাসা করি কেন সে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিল? কেমন?"

"কর।"

তখন চাকরকে দিয়া ঘটককে ডাকিল। কয়েক মিনিট পরেই আমাদের নিকট আদিত্যমশাই বলিয়া পরিচিত লোকটি ভিতরে আসিল আমি দ্বারে তৎক্ষণাৎ চাবি দিলাম। আদিত্যমশাই স্তম্ভিত ভীত মুখে আমাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

"তুমি এখানে!" বলিয়া ঘটক অবাক হইয়া গেল।

"হাঁ বোস বোস। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

ঘটক জহুয়ার দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল "তোমা হ'তে আমার সর্ব্বনাশ হোল।"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম "আমি তোমার মুখে সব শুনতে চাই, ভালয় ভালয় বল ভালই আর না বল পুলিশ ডেকে গ্রেপ্তার কোরব।"

"আমি কিছু জানি না।" বলিয়া সে পকেটে হাত দিল, বুঝিলাম পকেটে রিভলভার আছে।

"তুমি বিয়ে দিলে আর তুমি জান না ? শীঘ্র বল।"

জহুরা বলিল "কেন বৃথা দেরী কোরছ ? সত্যি কথা বল প্রাণে বাঁচবে।"

"প্রাণে বাঁচব ? যা হোক তুমি খুব ধড়িবাজ মেয়ে, ধরিয়ে দেবে বোলে বসিয়ে রেখেছিলে ? আমি ঠকেছি বটে !"

জহুরা যে তাকে বসাইয়া রাখিবার সময় আমাদের হাতে তাহাকে ধরাইয়া দিবার কথা কল্পনাও করে নাই তাহা সে বিশ্বাস করিল না। সে আর কোন পথ দেখিতে না পাইয়া একটু যেন নরম হইল। আমি বলিলাম "তোমার প্রকৃত পরিচয়ও জানি।"

"সবই যখন জান তখন আর জেনে কি হবে ?"

"দরকার আছে মশাই। তোমার কাছে সব শুনবো।"

"তা'পর ধরিয়ে দেবে ?"

"সরল ভাবে সব বোললে বিশেষ কিছু ভয় নেই।"

"বেশ, দত্তর আর আমার কি রকম বন্ধুত্ব তা তুমি জান, আমরা দুজনেই জালিয়াত। ব্যাঙ্ককে ঠকিয়ে অনেকবার টাকা খেয়েছি। পুলিশ আমাদের সন্দেহ করে বটে কিন্তু প্রমাণ না থাকায় ধ'রতে পারে না। মেজর উদ্ভিদতত্ত্বে সুপণ্ডিত। এবারে ভেবেছিলাম ইন্সিওরেন্স কোম্পানীদের ঠকাব। এই বিষে লোক আচ্ছন্ন হ'লে তখন কটো তুলে আর ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে তার টাকা মারব। একজন ডাক্তার ও লোক ভোলাবার জন্য একজন সুন্দরী মেয়ের দরকার। বেলাদেবীর মত সুন্দরী আমি দেখি নি। রাজা হরনাথ দত্তের বাড়ী তাহাকে দেখিবা মাত্র আমাদের কাজে তাহাকে লাগাইব ঠিক করি। মেজরের সঙ্গেও বেলার আলাপ করিয়ে দিই। মেজর আবার আর এক ধনী ব্যক্তির সঙ্গে বেলার পরিচয় ক'রায়। সে লোকটি বেলার রূপে মুগ্ধ হয় এবং মেজরের প্ররোচনায় বেলা একদিন তাঁকে মেজরের সঙ্গে জুয়া খেলিতে বলে। সে কেবল বেলার কথা রাখবার জন্য খেলে। আর সর্ব্বস্ব হারায়। তারপর মেজর বেলাকে হাতে রাখবার জন্য বলে যে "তুমি ওর সর্ব্বস্ব হারাবার কারণ। ওই লোকটির মা তোমার এ কাজের প্রতিশোধ দেবে। সে ওই লোকটির মার নাম জহুরা বলে। বেলার তাই ভয় যে জহুরা তাকে লোক সমাজে অবমানিত কোরবে। বেলাকে এই রকম ক'রে হাত ক'রে মেজর তাকে আমাদের বাসায়

জহুরার বিষয় খবর দেবে বলে ভুলিয়ে নিয়ে আসে। তারপর ওই ওষুধের গুণে আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়লে তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়। তুমি ডাক্তারি বেশ ভাল জান অথচ তেমন পশার কোরতে পার নি, আমাদের প্রস্তাবে টাকার মোহে প'ড়ে যদি রাজি হও এই ভেবে তোমাকে বেলার স্বামী নির্ব্বাচিত করি। আর যাতে আমাদের সঙ্গে চিরকালের জন্য বাঁধা পড় তাই রেজেষ্টারী ক'রে বিয়ে দিই। আমরা তার একজন সুন্দর দেখে ছোটলোকের মেয়ে যোগাড় করি। রেজেষ্টারী আপিসে নোটীশ দেওয়া ইত্যাদি তাকে দিয়ে করাই।

আমি অনেকদিন আগে আদিত্য নামে ওই বাড়ীটি ভাড়া নিয়েছিলাম। এই আদিত্য পদবী আমরা দুজনে যার যখন সুবিধা ব্যবহার করি। যা হোক বিয়ে অবধি বেশ নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেছিল। যত গোলমাল হোল শেষে তোমার জন্য। পাছে তুমি প্রকাশ ক'রে দাও আমাদের কথা তাই তোমাকেও সিগারেটের সঙ্গে বিষ দিতে হোল।"

"এই (জহুরা আসিয়াছে) লেখা কাগজটি আমি বিয়ের দিন বেলার বালিশের নীচে পেয়েছিলাম এর মানে কি ?"

"ওটি মেজরের লেখা। বেলা যাতে তার পরামর্শ নেবার জন্যও অন্তত: আসে তাই তার আমার বিষয় নিশ্চিন্ত হবার জন্য ভয় দেখিয়ে লিখে পাঠায় বেলাই ওটি হাতে ক'রে আনে যেন।"

"আর রাজা যতীন্দ্রনাথের ঘরে বেলার দেহ অজ্ঞান অবস্থায় একটি ফটো পেয়েছিলাম সেটি কেন তুলছিলে ?"

"সেটা সেম্পল রাখবার জন্য। যে লোককে পরে লাইফ ইন্সিওরার থেকে ফাঁকি দেবো তার ফটো তুললে ঠিক মরার মত বোধ হবে কিনা তাই দেখ্বার জন্য। রাজা যতীন্দ্রনাথ মেজরের ঘরে মাঝে মাঝে আসতেন তিনি হয় ত ওটি দেখে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাই বেলার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে চাইতেন না। যা হোক আমরা কৃতকার্য্য হোতাম এত সত্বেও কেবল রাণী নীরলা আমারও মেজরের কথাবর্ত্তা একদিন শুন্‌তে পেয়ে সব জেনে যান তাই তোমায় ডেকে আলাপ করেন। রাণী বেলা নিদ্রা গেলে তার বুকের ভেতর বিয়ের আংটিটি পান তখন বিয়ে যে হ'য়েছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন। তবুও আমরা তোমাদের ঠিক সরাতাম কেবল মেজর শেষ মুহূর্ত্তে একটা কথা আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লে।"

"সে কি কথা আবার ?"

"বেলা তার মেয়ে !"

বেলা উত্তেজিতভাবে বলিল "আমি মেজরের মেয়ে ?"

"হাঁ তোমার বুকে তিনটি হৃদয় এক সুতোর গাঁথা যে উল্কি আছে তা তার নিজের হাতের আঁকা। তুমি সেদিন অজ্ঞান হ'লেও তোমার প্রাণ আছে কিনা দেখতে গিয়ে আবিষ্কার কোরল যে তুমি ওর মেয়ে তাই অনেক যত্নে জ্ঞান ক'রে গড়েরমাঠে শুইয়ে রেখে এলো। যখন বাড়ী গেলে তখন পেছন পেছন বাড়ী অবধি গেল, তুমি ঠিক যেতে পারো কিনা দেখ্‌বার জন্য।"

বেলা অবশেষে বলিল "আমার কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।"

আমি বলিলাম "রাণী নীরলা সুন্দরী নামে বেলার পরিচয় দেন, তিনিও কি বেলার পিতার প্রকৃত পরিচয় জানেন ?"

"তিনি আমাদের কথাবার্ত্তা থেকে জানতে পারেন। বেলার নামকরণের নাম ফুলরাই বটে।"

বেলা বলিল "আমার বাবার মুখে সব শুনতে চাই।"

"তোমার বাবা আর এ পৃথিবীতে নেই।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম "কবে মারা গেলেন ?"

"কাল বিকেলে তার চাকর আমায় ডেকে নিয়ে গেল দেখি সে চেয়ারে বসে কিন্তু প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। সামনে টেবিলে একশিশি ওই বিষ। তখনই বুঝলাম যে অসাবধান হওয়ায় নিজেই নিজের প্রাণনাশ করেছে। যা হোক শিশিটি তখুনি সরিয়ে ফেললাম। পুলিশে মনে করেছে সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু।"

আমি পুলিশ ইনস্পেক্টরকে যতদূর সম্ভব গোপন করিয়া মোটামুটি বুঝাইয়া বিদায় দিলাম। সেইদিন হইতে জহরা আমাদের সম্পদে বিপদে চিরবন্ধু। রাণী নীরলা ও রাজা হরনাথ আমাদের ও আমরা দু'জনে তাঁহাদের নিত্য অতিথি। আর বিনোদের আমার বাটীতে অবারিত দ্বার। নিত্যই তাহার জন্য একমুষ্টি অন্ন আমাদের হাঁড়িতে চড়ে। মেজরের যে বইখানি হইতে জহরা প্রথমে এই বিষের সন্ধান পায় সেখানি আমি রাজকীয় পুস্তকাগারে

দান করিয়াছি। সে বই এখন আর পাওয়া যায় না। ঐ বিষগাছ হইতে আমি এক রকম ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খুব নাম কিনিয়াছি। যখন লোকে অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর হয় তখন ওই বিষমিশ্রিত ওষুধ অতি যৎসামান্য খাওয়াইলে আশ্চর্য্য ফল হয়। এখন আর আমার কোন দুঃখকষ্ট নাই। পসারও খুব। নিত্য আমার রোগী ধরে না। তারই স্বল্প অবসরে রোগী দেখিবার ঘরে বসিয়াই আমার প্রিয়তমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে এই কাহিনী লিখিলাম। আজ আমার পাশে আমার বক্ষিতা তাঁর বিবাহের লাল বেনারসীখানি পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইবার জন্য গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা দুজনে এই পূর্ণিমা রাতে একটু বাগানে বেড়াইয়া আসিব। আজ আমাদের মত সুখী খুব কম আছে।

সমাপ্ত।

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

অবুঝ।

—:—

চুল বিনিয়ে দে মা কানে দুল্ দুলিয়ে দে,
শুনিস্ নি কি 'গঙ্গাজলের' আজ্‌কে বিয়ে যে;
টিপ্ কেটে দে কাঁচ-পোকারি,
পরিয়ে দে মা পার্শীসাড়ি
নিমন্ত্রণ যে তাদের বাড়ী
শুনেও শুনিস্ নে!

শূন্য হাতে সুনীল চুড়ি পরিয়ে দে মা—দে—
'টুনি' 'ভুলি' 'কৈলি' সবাই হার পরেছে যে ;—
তাদের বাড়ী—এই কাপড়ে,
যেতে বড়ই লজ্জা করে,
উৎসবে বল্ গয়না পরে,
বেড়ায় না মা কে ?

বিয়ের কাজে হাত দিতে মা দিচ্ছে বাধা যে,
এমন সাজে—দেবেই তা তো—শীঘ্র করে দে ;
রং বে-রংএর নাচবে পুতুল,
জ্বলবে আলো শোভায় অতুল,
গাঁথব মালা তুলেছি ফুল,
সময় হয়েছে।

শুধুই বসে কাঁদবি মাগো আমার কথাতে,
মুখ ফিরালি বল্ কেন বল কিসের ব্যথাতে!
সবার মেয়েই সাধ করে—মা,—
আমিই কি গো সৃষ্টিছাড়া,
বল্ তো কেন সোহাগ-হারা
'স্নেহের লতা'তে ?

ওই যে তবু কাঁদলি বেশী কিসের লাগিয়া,
দারুণ আমার আব্দারে কি উঠ্‌লি রাগিয়া ?

আমার মুখে নয়ন তুলে,
ভাবিস্ কি মা আপন ভুলে,
কিসের লাগি অশ্রু গলে,
রাত্রি জাগিয়া !

উঠ্‌লি কেঁদে সেই যে সে কার পত্র খুলিয়া,
হাতের লোহা—সেদিন আমার রাখলি তুলিয়া
নিঠুর তাহার তুল্য যে নাই,
আন্‌লে যে তোর দুখের বালাই,
পরের কথা মরুগ্যে ছাই,—
যাওনা ভুলিয়া।

লুকিয়ে পরিস্ সিঁথীর সিঁদূর কতই বিরলে,
কে দিল তোর স্নেহের বুকে তীব্র গরলে।
মুছিয়ে দি তোর নয়ন-বারি,
সাজিয়ে দেগো শীঘ্র করি,
এই বেশে আজ বিয়ের বাড়ী—
ঢুক্‌ব কি বলে ?

শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়।

ইতিহাসে কালিদাস।

চতুর্থ প্রস্তাব,—রঘুবংশের প্রমাণ।

(পূর্বানুবৃত্তি সমাপ্ত।)

শুনিতে পাওয়া যায় যে যুরোপীয় এবং এদেশী কোন কোন পণ্ডিত কবির "রঘুবংশ" কাব্যের ভিতরই "গুপ্ত-সম্রাড়্‌গণের" পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ও রাজ-কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। সংস্কৃত শব্দ-কোষে "গোপ্তৃ" অথবা "গোপ্তা" এবং "গুপ্ত" এই দুইটি "গুপ্" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দের সহিত সকলেরই পরিচয় আছে। "গুপ্" ধাতুর অর্থ রক্ষা করা; উক্ত ধাতুর উপর কর্তৃবাচ্যে তৃন্ প্রত্যয় করিলে "গোপ্তৃ" (প্রথমার একবচনে "গোপ্তা") এবং কর্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিলে "গুপ্ত" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথম শব্দটির অর্থ রক্ষক, পালক, গোপয়িতা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ রক্ষিত, পালিত, ইত্যাদি বুঝাইয়া থাকে। সংস্কৃত-ভাষার পৌরাণিক এবং কাব্য-সাহিত্যে এই দুই প্রসিদ্ধ অর্থেই উক্ত দুইটি শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হইয়াছে। কবি কালিদাসের কাব্যেও উক্ত "গোপ্তা" এবং "গুপ্ত" শব্দ দুইটি ঐ দুই প্রসিদ্ধ অর্থেই বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কবি কালিদাস যে তাঁহার কোনও কাব্যের কোনও স্থলে ঐ শব্দ দুইটির অন্যরকম অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আমাদের চক্ষুতে পড়ে নাই।

মগধের এই প্রসিদ্ধ সম্রাড়্‌গণের উপাধি "গুপ্ত" পরন্তু "গোপ্তা" নহে, তাহা সর্বজন-বিদিত। বায়ুপুরাণ, ৯৯তম অধ্যায়ের ৩৮৩তম শ্লোকে এবং বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের ২৪শ অধ্যায়ে ইঁহাদিকে "গুপ্তবংশজাঃ" এবং "মাগধা গুপ্তাঃ" বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে (১) এবং

---

(১) (ক) "অনুগঙ্গং প্রয়াগং চ সাকেতং মগধাংস্তথা।
এতান্ জনপদান্ সর্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ ॥ ৩৮৩ ॥
৯৯ অধ্যায়, বায়ুপুরাণ। (বঙ্গবাসী)

ইঁহাদিগের প্রত্যেক শিলালিপিতেই সেই পরিচয় সুদৃঢ় করা হইয়াছে ; কোথাও ইঁহাদিগকে "গোপ্তা" বলিয়া বিশেষিত করা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় প্রাগুক্ত পণ্ডিত মহাশয়েরা কালিদাসের কাব্যে কিরূপে যে মগধের গুপ্তসম্রাড়্গণের পরিচয় পাইলেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাদের প্রমাণগুলি ঠিক কি, তাহাও আমরা জানিতে পারি নাই ; এরূপ অবস্থায়, আমাদের বর্তমানজ্ঞানে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি এবং কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কৃপা করিয়া এ সম্বন্ধে সুষ্ঠুতর আলোচনা করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত এবং উৎসাহিত করিবেন এরূপ আশা করিতেছি।

রঘুবংশ কাব্যের প্রধানতঃ এই কয়টি শ্লোকে গুপ্তরাজগণের (অথবা "গুপ্ত" ও "গোপ্তা" শব্দ ব্যবহারের) সম্পর্কের সন্দেহযুক্ত শব্দ পাওয়া গিয়াছে, যথা :—

প্রথমসর্গে,—

(১) "সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্।
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্ ॥ ৫ ॥"

(২) তস্যৈ সভ্যাঃ সভার্য্যায় গোপ্ত্রে গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ।
অর্হণামর্হতে চক্রুর্মুনয়ো নয়চক্ষুষে ॥ ৫৫ ॥

দ্বিতীয়সর্গে,—

(৩) ব্রতায় তেনানুচরেণ ধেনোর্ন্যষেধি শেষোঽপ্যনুযায়িবর্গঃ।
ন চান্যতস্তস্য শরীর-রক্ষা স্ববীর্য্যগুপ্তা হি মনোঃপ্রসূতিঃ ॥ ৪ ॥

(৪) শশামবৃষ্ট্যাপি বিনা দবাগ্নিরাসীদ্ বিশেষা ফলপুষ্পবৃদ্ধিঃ।
ঊনং ন সত্ত্বেষ্বধিকো ববাধে তস্মিন্ বনং গোপ্তরি গাহমানে ॥ ১৪ ॥

(খ) "অনুগঙ্গমাপ্রয়াগং গয়াদ্ গুপ্তাশ্চ মাগধা ভোক্ষ্যন্তি ॥ ৬৪ ॥
৪র্থ অংশ, ২৪শ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই)।

Fleet's Inscription No. 33. যশোধর্ম্ম মহীপতির প্রশস্তিতে ও গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণকে "গুপ্তনাথ" (৪র্থ পংক্তি এবং ৪র্থ শ্লোক) বলা হইয়াছে।

(৫) তামন্তিকন্যস্তবলিপ্রদীপামন্বাস্য গোপ্তা গৃহিণীসহায়ঃ।
ক্রমেণ সুপ্তামনুসংবিবেশ সুপ্তোত্থিতাং প্রাতরনূদতিষ্ঠৎ॥ ২৪॥

চতুর্থ সর্গে,—

(৬) ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ম্।
আকুমারকথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ॥ ২০॥

(৭) স গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ শুদ্ধপার্ষ্ণিরয়ান্বিতঃ।
ষড়্‌বিধং বলমাদায় প্রতস্থে দিগ্‌জিগীষয়া॥ ২৬॥

আপাততঃ এই পর্যন্ত থাকুক; আরও অনেকস্থলে "গুপ্ত", গোপ্তা", "কুমার", "গুহ", "সমুদ্র", "চন্দ্র", ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে (২); কিন্তু কোনও স্থলেই প্রসিদ্ধ অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থে অথবা শ্লেষ-যুক্ত ভাবে অর্থ করিলে সঙ্গত হয় বলিয়া আমাদের বোধ হয় নাই। অন্যের মতে যদি সেরূপ অর্থ করা সম্ভব হয়, আগ্রহের সহিত আমরা তাহা শুনিতে প্রস্তুত থাকিলাম। এক্ষণে, উদ্ধৃত সাতটি শ্লোকের অর্থ আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

সুকবি ৺নবীনচন্দ্র দাস এম-এ, কবিগুণাকর মহাশয় শ্লোক কয়টির এইরূপ পদ্যানুবাদ করিয়াছেন যথা,—

১ম সর্গে,—

(১) "আজন্ম বিশুদ্ধ রঘুকুল রাজগণ,
পালিলেন সসাগর অবনীমণ্ডল;
করিতেন বিমানেতে স্বর্গে বিচরণ,
করি কার্য লভিতেন সদা পূর্ণ ফল। ৫।

(২) প্রথম সর্গে, ২১. দ্বিতীয় সর্গে ১২, ২৬, ২৩, ৬ , ৫৮, ৫৫. পঞ্চম সর্গে ৩৬, ৩৯, ৫০, ৫২, ৫৯, ৬৭, ৭৫, ষষ্ঠ সর্গে ৩, ৪, ৭৮, ৮০, সপ্তম সর্গে ১৬, ২৮, ৩৬, অষ্টম সর্গে ১৪, দশম সর্গে ৬০, ৭৮, ৮২, একাদশ সর্গে ৪২ ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) আসিলা আশ্রমে যবে কোশল-ঈশ্বর
নীতিচক্ষুঃ, সুহাসিনী মহিষীর সনে,
সসম্ভ্রমে জিতেন্দ্রিয় তাপস নিকর
যথাবিধি দুজনারে পূজিল যতনে। ৫৫।

২য় সর্গে,—

(৩) যত ধেনু গোচারণ করেন নৃপতি,
নিবর্তিলা আপনার অনুচরগণ ;
নিজ বীর্যে সুরক্ষিত মনুর সন্ততি,
আত্মরক্ষা হেতু অন্যে কিবা প্রয়োজন ? ৪।

(৪) অরণ্যে পশিলা যবে অবনী-রক্ষণ
নিবিল বর্ষণ বিনা বন-দাবানল,
লভিল অসীম বৃদ্ধি ফল পুষ্পদল,
প্রবল দুর্বলে নাহি করে আক্রমণ। ১৪।

(৫) সমীপে রাখিয়া দীপ, বলি, উপহার
বসিলা ধেনুর পাছে সে রাজদম্পতী ;
নন্দিনী শুইলে পরে শয়ন রাজার ;
প্রভাতে উঠিলে গাভী, উঠিলা নৃপতি। ২৪।

৪র্থ সর্গে,—

(৬) রক্ষিছে হরিৎ শস্য কৃষক ললনা,
ইক্ষুতলে বসি তারা গাইছে সুস্বরে
ইহার পরাক্রম আদি রঘুবীরপণা,—
যে যশ অর্জিলা রঘু শৈশবে যৌবনে। ২০।

(৭) রাজধানী প্রান্তবর্তী করি সুরক্ষণ,
পৃষ্ঠদেশে সুকৌশলে স্থাপি সেনাবল,
দিগ্‌বিজয় হেতু রঘু করিলা গমন
শুভদিনে, ছয় ভাগে চলে সেনাদল । ২৬ ।

৺নবীনবাবুর অনুবাদ মোটামোটি বিশুদ্ধ এবং সুমিষ্ট হইলেও শেষের দুইটি শ্লোকের অনুবাদে মূলের অর্থ তেমন সুস্পষ্ট হয় নাই। যাহা হউক, এই অনুবাদের কোথাও এরূপ কোন অর্থ দেখা যায় না, যাহা হইতে কবির গুপ্ত-রাজ-সংস্রবের কোনও পরিচয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মল্লিনাথও এই শ্লোকের ভিতর কোন শ্লেষের সন্ধান পান নাই, সে সন্ধান তিনি পাইলে প্রকাশ না করিয়া কখনও ক্ষান্ত থাকিতেন না। যাহা হউক, আমরা নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মত এই শ্লোকগুলির মর্ম বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে, বোধ করি, বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

(১) প্রশ্ন। প্রথম সর্গের উক্ত পঞ্চম শ্লোকের "আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্‌" চরণে গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত মহারাজ হইতে এই বংশ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাইত কবি ইঙ্গিত করিতেছেন?

উত্তর। তাঁহারা কষ্ট ছাড়িয়া সত্যই কি এরূপ কেহ মনে করিতে পারেন? কবি রঘুবংশীয় রাজগণের বর্ণনার ভূমিকায় তাঁহাদের প্রশংসাসূচক (৫ম হইতে ৯ম শ্লোক পর্যন্ত) পাঁচটি শ্লোকের প্রথমেই বলিতেছেন,—"সেই রঘুবংশীয় রাজগণ আ-জন্ম-শুদ্ধ, তাঁহাদের কর্ম ফলসিদ্ধি পর্যন্ত আচরিত হয়, তাঁহারা আসমুদ্র পৃথিবীর রাজা,—তাঁহাদের রথ স্বর্গ পর্যন্ত চলাচল করে।" এই শ্লোকের "সমুদ্র" শব্দে "সমুদ্রগুপ্ত" কি রূপে বুঝাইতে পারে, তাহা বুঝি না। আর এই গুপ্তবংশ যে সমুদ্রগুপ্ত হইতে আরম্ভ হয় নাই, পরন্তু শ্রীগুপ্ত হইতে হইয়াছে এবং সমুদ্রগুপ্ত যে এই বংশের চতুর্থ রাজা, তাহা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবেই দেখিয়াছি। এইরূপ ভাবে সমুদ্রগুপ্ত রাজার নাম বাহির করিতে পারিলে ঐ শ্লোক হইতে "ক্ষিতীশ" রাজার নাম ও বাহির করা যায়, এবং হয় ত কোন বঙ্গদেশ-গৌরব-লুব্ধ কীর্তিমান্‌ পুরুষ কবি-কালিদাসকে কৃষ্ণনগরের রাজা ৺ক্ষিতীশচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া সপ্রমাণ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাইতে পারেন।

(২) প্রশ্ন। প্রথম সর্গের উক্ত ৫৫ তম শ্লোকের "গোপ্তু" শব্দে "গুপ্তরাজকে" বুঝায় না?

উত্তর। কদাপি না,—কেবল "রক্ষকে" অথবা "রাজাকে" বুঝায়। "গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ" শব্দের ও অর্থ "সুরক্ষিত ইন্দ্রিয়গ্রাম যাঁহাদের" অর্থাৎ "মুনিগণ।"

(৩) প্রশ্ন। দ্বিতীয় সর্গের ৪র্থ শ্লোকের "স্ববীর্যগুপ্তা হি মনোঃ প্রসূতিঃ" চরণের অর্থ কি?

উত্তর। বৈবস্বত মনুর বংশধরেরা (সূর্য্যবংশীয় রাজগণ) নিজ নিজ বীর্য দ্বারাই আপনারা "রক্ষিত" থাকেন, অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

(৪) এবং (৫) প্রশ্ন। উক্ত দ্বিতীয় সর্গের ২৪শ শ্লোকের "গোপ্তরি" এবং ২০শ শ্লোকের "গোপ্তা" শব্দের অর্থ কি?

উত্তর। উভয় স্থলেই "গোপ্তৃ" শব্দের সাধারণ অর্থ রক্ষক অথবা রাজা বুঝাইতেছে,—অন্যরূপ অর্থ ত সঙ্গত বলিয়া বোধহয় না।

(৬) প্রশ্ন। চতুর্থ সর্গের ২০শ শ্লোকের "গোপ্তুঃ" শব্দের দ্বারা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং "আকুমার কথোদ্ঘাতং" চরণে কুমারগুপ্তের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নাই?

উত্তর। এই ২০শ শ্লোকে যুবরাজ রঘুরই গুণগণ বর্ণিত হইয়াছে। "গোপ্তুঃ" শব্দে সেই "রক্ষকের" বা "রাজার" এবং "আকুমার কথোদ্ঘাতং" চরণে তাঁহারই কৌমারাবস্থা হইতে অর্জিত গুণসমূহের উপন্যাস অথবা বর্ণনা বুঝাইতেছে। এই শ্লোকেও গুপ্তরাজগণের সম্পর্ক টানিয়া আনিতে হইলে গায়ের জোর ভিন্ন আর কোনও উপায়ে যে তাহা হইতে পারে, তাহা আমাদের মনে হয় না।

(৭) প্রশ্ন। চতুর্থ সর্গের ২৬শ শ্লোকের "গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ" বাক্যাংশে স্পষ্টই "গুপ্তরাজবংশের মূল" বুঝাইতেছে না?

উত্তর। মল্লিনাথ এই বাক্যাংশের অর্থ করিতে গিয়া বলিতেছেন, "গুপ্তমূলং, স্বনিবাসস্থানং, প্রত্যন্তঃ প্রত্যন্তদুর্গং চ যেন সঃ—গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ"—'আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি রাজধানী এবং প্রান্তদুর্গ রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছেন'—এই ত অর্থ। ৺নবীনবাবুও মল্লিনাথের আশ্রয়ে তাঁহার অনুবাদে লিখিয়াছেন,—

৩। স্কন্দগুপ্তের সমসাময়িক প্রাপ্ত "সুদর্শন-তটাক-সংস্কার-গ্রন্থের" ২৪শ পংক্তিতে—

"যোপমা গোপ্তা মহতাং চ নেতা।" "(৪১শ শ্লোক) চরণে "গোপ্তা" শব্দে "রাজা", "রক্ষক", অথবা "পালক"ই বুঝাইতেছে।

এ সম্বন্ধে আর অধিক দৃষ্টান্তের উদ্ধার করিয়া পাঠক-পাঠিকাবর্গের বিরক্তি উৎপাদন করিতে চাহি না। আমাদের কথা এই যে "গোপ্তৃ" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা "গুপ্তরাজবংশের" কোনওরূপ অববোধ হয় না, এবং মহাকবি কালিদাস তাঁহার কাব্যে যে এরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার কোন পরিচয়ও পাওয়া যায় না। যাঁহারা উক্তরূপ মত সংস্থাপিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের যুক্তিযুক্ত কোনও প্রস্তাব এ পর্যন্ত আমরা দেখিতে পাই নাই। যে পর্যন্ত ঐ প্রকার কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া না যায়, সে পর্যন্ত আমাদিগের মত পরিবর্তিত করিবার কোনও কারণ নাই।

দুই একটি নামসাদৃশ্যের শব্দ কোনও কাব্যে দেখিয়া তাহা হইতে কবির কাল অথবা আশ্রয়দাতার নাম নির্ণয় করিতে গেলে নানাপ্রকার বিভ্রমের সম্ভাবনা আছে। "রঘুবংশ" কাব্য হইতেই আমরা কতকগুলি দৃষ্টান্ত তুলিতেছি :—

১। কবি এই কাব্যের একাদশসর্গে রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের পরস্পর ভ্রাতৃপ্রীতির উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"তেষাং দ্বয়োর্দ্বয়োরৈক্যং বিভিদে ন কদাচন।
যথা বায়ুবিভাবস্বোর্যথা চন্দ্রসমুদ্রয়োঃ ॥ ৮২ ॥"

এখানে সৌহৃদ-প্রীতির দুইটি উপমা কবি দিয়াছেন, একটি বায়ু এবং অগ্নির ও দ্বিতীয়টি চন্দ্র এবং সমুদ্রের। এস্থলে পিতা পুত্র চন্দ্রগুপ্ত এবং সমুদ্রগুপ্তের ইঙ্গিত অপেক্ষা মহাভারত-প্রসিদ্ধ বঙ্গের যুগলরাজা চন্দ্রসেন ও সমুদ্রসেনের ইঙ্গিত অধিকতর সুপ্রযুক্ত হইতে পারে; তবে কি কবিকে কুরুপাণ্ডবদিগের সমসাময়িক বলিতে হইবে?

২। চতুর্থসর্গে নবীন রাজা রঘুর গুণ বর্ণনামুখে আছে,—

"পৌরানাপি স তানামুৎকর্ষং পুপুষুর্গুণাঃ।
নবে তস্মিন্ মহীপালে সর্বং নবমিবাভবৎ। ১১।"

এই শ্লোকের "মহীপাল" শব্দ দেখিয়া কবিকে গৌড়ের পালবংশীয় কোন মহীপাল রাজার সমসাময়িক বলিয়া ধারণা করিলে সঙ্গত এবং শোভন হইবে কি ?

৩। সপ্তমসর্গে অজরাজার সহিত ইন্দুমতীর বিবাহ-বর্ণনার প্রারম্ভে কবি বলিয়াছেন,—

"তত্রাবতীর্য্য চ করেণুকায়াঃ স কামরূপেশ্বরদত্তহস্তঃ।
বৈদর্ভনির্দিষ্টমসৌ বিবেশ নারীমনাংসীব চতুষ্কমন্তঃ॥ ১৭॥"

৺নবীনবাবুর অনুবাদ—

"কামরূপ-রাজকর করিয়া ধারণ,
করিণী হইতে অজ নামিলা হরষে;
অন্তর অন্দর-মাঝে, ভোজের আদেশে
প্রবেশিলা, অঙ্গনার অন্তরে যেমন।"

কামরূপ-রাজ কুমার ভাস্করবর্মা যে কান্যকুব্জপতি সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন, তাহা ঐতিহাসিকগণের সুপরিজ্ঞাত; এই শ্লোক হইতে কবিকে, তাহা হইলে, সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ্ বাণভট্টের মিত্ররূপেও কল্পনা করা যাইতে পারে ?

প্রকৃত কথা এই যে এইরূপ কোন শ্লোক, শ্লোকার্দ্ধ অথবা শ্লোকাংশ লইয়া বুদ্ধিজীবী মানুষমাত্রেই যেরূপ ইচ্ছা ঐতিহাসিক অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারেন এবং আমাদের দেশে সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। চোল-কবির "চৌর-পঞ্চাশিকা" কাব্যের কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের কৃত পদ্যময়ী ব্যাখ্যা, প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক "অমরুশতক" কাব্যের বেদান্তপক্ষে ভাষ্য এবং "মহিম্নস্তবের" বিষ্ণুপক্ষে ব্যাখ্যা অনেকেই দেখিয়াছেন; প্রাচীনেরা প্রত্নতত্ত্বের রসিক হইলে আমরা "মেঘদূত" হইতেই শ্রীরামচন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক সংবাদ পাইতাম। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে প্রাচীনেরা সেরূপ ছিলেন না। নচেৎ বাঙ্গালী গোস্বামী প্রভুগণের শ্রীবৃন্দাবনধামের আবিষ্কারের ন্যায় শত শত ঐতিহাসিক অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রভুদিগের বাগাড়ম্বরে দেশ ছাইয়া যাইত। শুনিতে পাই এইরূপ সর্ব্বজ্ঞ কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ "বিদ্যাসুন্দরের" অনেক ঐতিহাসিক স্থান বাহির করিয়া দিয়াছেন। আর প্রতি দেশেই চাঁদসদাগরের এবং বেহুলালখিন্দরের কীর্ত্তিচিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে। দিনাজপুর

কলিকাতায় মৎস্যরাজ বিরাটের বাড়ী এবং অসাম সতীমার নিকটে নির্দ্দিষ্ট হইল শ্রীরুক্মিণী দেবীর পিত্রালয় ইত্যাদির বার্ত্তা বাঙ্গালী-সাহিত্যিক-সমাজে অনেকদিন হইতেই সুবিদিত আছে। আর অধিক আবিষ্কারের আবশ্যকতা আছে কি?

আবশ্যকতা থাকুক আর নাই থাকুক, আবিষ্কর্ত্তারা তাঁহাদের কাজ করিবেন। কবি কালিদাস যে বাঙ্গালী, এই সংবাদ আমরা অনেকদিন হইতেই মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের অনুগ্রহে পাইতেছি। প্রথম প্রথম মনে করিতাম, কথাটা নিছক রসিকতা, কালিদাসের সম্বন্ধে অন্যান্য অসংখ্য উপকথার মধ্যে একটা মাত্র। তারপর দেখিতে পাইলাম, গুরুগম্ভীর ভাবে গবেষণা, আলোচনা এবং প্রমাণ সংগ্রহ ইত্যাদি চলিতে চলিতে কালিদাসের মূর্ত্তি পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িল এবং বাঙ্গলা দেশের মাথাল মাথাল লোক গিয়া সেই কালিদাস ঠাকুরের পৈতৃক ভিটার মহোৎসব করিয়া আসিলেন। কালিদাস রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র অথবা বৈদিক কিনা, তাঁহার কাব্যনাটকগুলির "আদি ও অকৃত্রিম" পাণ্ডুলিপি বাহির হইল কিনা, তাঁহার ফোটোগ্রাফ অথবা পেন্সিল স্কেচ পাওয়া গেল কিনা, ইত্যাকার সংবাদের আশায় দেশ উন্মুখ ও উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া আছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কালিদাস যে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, তাহা ত প্রমাণিতই হইয়াছে,—সে কথায় কে সন্দেহ করিবে? হঠাৎ, সে দিন দেখিলাম, এই "পরিচারিকা"-পত্রে এক পরম মাননীয় প্রবীণ-পণ্ডিত কতকগুলি প্রমাণ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালী মেয়েরা সখী-সম্বোধনে "ওলো, লো, লা", ইত্যাদি প্রয়োগ করেন; "কালিদাস তাঁহার "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র সখী-সম্বোধনে "হলা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন,—সুতরাং তিনি বাঙ্গালী"—এইরূপ একটি প্রমাণও তিনি উপস্থিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। সম্প্রতি উক্ত মাননীয় লেখক মহাশয়ের সমীপে (এবং পাঠক-পাঠিকা-সমাজে) আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে ভারতীয় প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে সংস্কৃত-ভাষার নাটকে ভদ্র মহিলাদিগের কথোপকথনে "শৌরসেনী প্রাকৃত ভাষার" প্রয়োগ করিতে হয়; এবং উক্ত ভাষায় সংস্কৃত "সখি" শব্দের পরিবর্ত্তে "হলা"ই ব্যবহৃত হয়। এরূপ অবস্থায়, কন্যা-কুমারী হইতে কাশ্মীরের মধ্যে যেখানেই কেন কবির 'নিবাস' হউক না, তাঁহাকে সখী সম্বোধনে "হলা"ই বলিতে হইত। এমন কি, আজ যদি কোন ইংরেজ অথবা জর্ম্মাণ পণ্ডিত সংস্কৃতভাষার উপর কৃপা করিয়া ওই "মৃতভাষায়"

নাটক লেখেন, তাঁহাকেও সখী-সম্বোধনে ঐ "হলা"ই বলাইতে হইবে। সংস্কৃত-সাহিত্যের এই নিয়মটির প্রতি সম্ভবতঃ প্রবীণ লেখক কৃপাদৃষ্টিপাত করেন নাই,—তাই এই নিবেদন করিলাম। আমরাও বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালী জাতির এত বড় একটা গৌরব হইতে দেশ-বাসীকে বঞ্চিত করিব, সে ইচ্ছা করি না ; এবং সেজন্য কবি কালিদাস বাঙ্গালী বামুন ঠাকুর বলিয়া সুগৃহীত হউন, এ প্রার্থনা করি।

আমরা এরূপ "স্বদেশ-গৌরবে" সুস্ফীত হইলে কি হয়, বাঙ্গালা দেশে "বিভূষণগণ" ভিন্ন অন্যরূপ লোকও আছেন। "ভারতবর্ষ" পত্রে দেখিতেছি, সুপণ্ডিত এবং সুরসিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্-এ. মহাশয় আমাদের এই "জাতীয় গৌরব-মন্দির"কে ধূলিসাৎ করিবার জন্য কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কবিভূষণের কল্পনার বিরুদ্ধে রায় মহাশয়ের এই অস্ত্রধারণ দেখিয়া সত্যই আমাদের মনে বড় দুঃখ হইয়াছে। "খেলার ঘর" ভাঙ্গিবার জন্য "সিজগান্" বসান দেখিলে লোকের মনে যেরূপ ভাবের উদ্রেক হয়, শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠে আমাদের মনে সেইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে। কৌতুকের পদার্থকে লইয়া পারমার্থিক ভাবে আলোচনা করিলে যেরূপ হয়, এই আলোচনাও যেন তদ্রূপ হইতেছে। যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া অধিক কথা বলায় কোনও অধিকার আমাদের না থাকায় এই পর্যন্তই যথেষ্ট।

বর্ত্তমান প্রস্তাবের আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম যে কালিদাসের কাব্যগ্রন্থসমূহ হইতে তাঁহার সহিত মাগধ-গুপ্তরাজগণের কোনরূপ সংস্রবের কোনও রূপ প্রমাণ ত নাই ই,—অধিকন্তু গুপ্তরাজগণের সমসাময়িক লিপি হইতেও তদ্রূপ কোন সম্পর্কের প্রমাণ বাহির হয় না। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তদেবের সমসাময়িক এলাহাবাদ স্তম্ভলিপির রচয়িতা সান্ধি-বিগ্রহিক কুমারামাত্য মহাদণ্ডনায়ক হরিষেণ এবং কুমারগুপ্তের সমসাময়িক দশপুরের সূর্যমন্দির-প্রশস্তির কবি বৎসভট্টি। এই বৎসভট্টির রচনায় কবি কালিদাসের রচনার সুর ও শব্দের আভাস বেশ পাওয়া যায় ; কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবে লেখকের নাম উহাতে লিখিত থাকায় উহা ত আর কালিদাসের নামে চালাইবার উপায় নাই। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে রাজা সমুদ্রগুপ্তকেই অতি উচ্চাঙ্গের কবি এবং সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ বলা হইয়াছে ; উহাতেও কালিদাসের কোনও নাম-গন্ধ নাই। ঐতিহাসিকেরা বলেন এই স্তম্ভলিপি সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয়

চন্দ্রগুপ্তদেব উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন এবং কবি কালিদাস তাঁহারই সভাসদ বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। যদি ইহাই প্রকৃত সংবাদ হইত, তাহা হইলে মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার কবি ও কলাবিৎ জনকের প্রশস্তি একজন মহাদণ্ডনায়ক (Military Administrator) মন্ত্রীর দ্বারা রচনা না করাইয়া তাঁহার সভার নবরত্নের শ্রেষ্ঠরত্ন কবি কালিদাসের দ্বারাই কি রচনা করাইতেন না? এরূপ মহাকবি নিকটে থাকিতে মিলিটারী মিনিষ্টারের দ্বারায় কি একজন কবি ও কলাবিদ্ সম্রাটের প্রশস্তি কেহ রচনা করাইয়া থাকেন? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ত ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই বোধহয়। যাহা হউক, বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকবর্গের কেহ যদি কখনও দয়া করিয়া আমাদের এই বিষম সন্দেহগুলির নিরাকরণ করিয়া দেন, তবেই আমরা কবিকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব, নচেৎ নহে।

পাঠক-পাঠিকাগণ হয়ত বলিবেন,—এ ত ধ্বংসনীতিমূলক আলোচনা (Destructive Criticism) হইল; লেখকের নিজ মতের প্রতিষ্ঠা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে,—বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ধ্বংসই,—গঠন নহে। বলবত্তর প্রমাণের অভাবে আমরা মনে মনে সংবৎ প্রতিষ্ঠাতা উজ্জয়িনী-পতি বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যকেই কবির আশ্রয়দাতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কেন, কি প্রমাণে, আমরা সে ধারণা করিয়াছি, তাহা বলিবার স্থল ইহা নহে। শ্রীভগবান্ যদি দিন দেন, আর একদিন সেই আলোচনা লইয়া উপস্থিত হইব; আজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এই প্রস্তাব আপাততঃ সমাপ্ত করিতেছি।

সমাপ্ত

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

শুধু ভালবাসো।

—— : ০ : ——

আমারে যে ভালবাসো জানি তাহা জানি ;
কতরূপে নিতি নিতি পাত্র ভরি' আনি
তাই বুঝি নিয়মিত আমারে যোগাও
প্রীতির পসরা সখা। মরুতে ফোটাও
অর্থভরা মধুগন্ধ শত পুষ্পরাশি ;
শরতের নীল নভে, সুধাংশুর হাসি—
অমল ধবল স্নিগ্ধ—অতি সুশীতল ;
পঙ্কিল এ সরোবরে ফোটাও কমল ;
বসন্তে বাসনা-তৃষা জাগরিত করি'
ফুল্ল শোভা বিকশিয়া দাও চিত্ত ভরি।
কি চার নৃপতি-গৃহে বধূর যতন,
কনক-রতন-রচা মণি আভারণ।
এ সকলে নাই কাজ, শুধু তুমি এসো
শূন্য হাতে, পূর্ণ প্রাণে শুধু ভালবেসো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

———

ভার্য্যা-নগরী।

—:•:—

একটি মাত্র স্ত্রী-পালনে এবং তাহার মনোরঞ্জনে যে কত কষ্ট, অধিকাংশ লোকের কাছেই তাহা বলা বাহুল্য। এ হেন অবস্থায়, একটি নয় দুইটি নয়—একেবারে দশহাজার সহধর্ম্মিণীর গুরুভার বহন করিতেছেন, এমন অসমসাহসী ও ক্ষমতাশালী স্বামীর কথা আপনারা কল্পনা করিতে পারেন কি? ভারতের পাশেই শ্যামদেশ। তাহার জনসংখ্যা পঁয়ষট্টি লক্ষ। শ্যামদেশের রাজাদের প্রত্যেকেই চিরাচরিত রীতি অনুসারে এত বেশী স্ত্রী গ্রহণ করেন যে, এক স্বামীর সব স্ত্রীর একটা সঠিক হিসাব রাখাও বাস্তবিক নাই শক্ত ব্যাপার। শ্যামদেশের রাজধানীর নাম ব্যাঙ্কক, ব্যাঙ্ককের রাজপ্রাসাদের পিছনে একটি বিশেষরূপে নির্ম্মিত নগর আছে। শ্যামরাজের রাণীদের স্থান-সঙ্কুলানের জন্যই সেই নগরের প্রতিষ্ঠা।

নগরের ভিতরে রাণীরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া বাস করেন। রাণীদের জন্য আলাদা প্রাসাদ নির্ম্মাণ না করিয়া, একটা নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করার কারণটাও খুলিয়া বলা দরকার। কোন স্থানের জনসংখ্যা যদি দশ হাজার হয়, তবে সে স্থানকে অনায়াসেই সহর বলা চলে। শ্যামদেশের পরলোকগত রাজার স্ত্রী ছিলেন কতকগুলি, তা জানেন কি?—দশটি হাজার! এই দশ হাজার স্ত্রীর দাসদাসীর সংখ্যা খুব কম করিয়া ধরিলেও আরো দশ হাজার হইবে। এমন অবস্থায় উক্ত রাজার (তাঁহার নাম Chulalongkornt) পক্ষে একটি ভার্য্যা-নগরী প্রতিষ্ঠা না করিলে চলিবে কেন?

লোকে নানা ভাবে অবসর-রঞ্জন করে, কিন্তু শ্যামরাজের অবসর-রঞ্জন হয় নিত্য নব স্ত্রী গ্রহণের চিন্তায়। রাজার স্ত্রীরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা রাজবংশজাত; যাঁহারা সম্ভ্রান্ত বংশীয়; যাঁহারা সাধারণ গৃহস্থের কন্যা। রাজবংশজাতা কন্যা আনিবার সময়ে তিন দিনব্যাপী বিবাহোৎসব হয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের বিবাহে উৎসব হয় দুই দিনের জন্য। সাধারণ গৃহস্থের মেয়েকে বিবাহ করিতে আরো কম সময় লাগে। আসলে শ্যামরাজের সারা জীবনটাই বিবাহোৎসবের আলোক-মালায় সমুজ্জল হইয়া থাকে। অবশ্য শ্যামরাজের

অনেক স্ত্রীই, বাঙ্লার কুলীন কন্যাদের মত স্বামীর দেখা পায় খালি এক রাত্রের জন্য,—অর্থাৎ ফুলশয্যায়।

এই বিচিত্র রাজ-রীতির ফলে, বংশরক্ষার ভাবনা যে শ্যামরাজকে খুব কমই ভাবিতে হয়, সে কথা বোধ হয়, না বলিলেও চলে। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রকে একালের অনেকে কবির কল্পনা বলিয়াই মনে করেন। কিছুদিন আগেও শ্যামদেশীয় অনেক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উপরে টেকা মারিতে পারিয়াছেন। শ্যামদেশের রাজার পিতামহের সন্তান সংখ্যা ছিল ছিয়াশী জন এবং প্রপিতামহের ছেলে-মেয়ে ছিল মোট পাঁচশো পনরো জন।

শ্যামদেশের রাজ-পরিবারেও এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছে। শ্যামের বর্তমান রাজা তাঁহার দশ সহোদরের সহিত ইংলণ্ডে গিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য ভাইবোনেরা দেশে বসিয়াই বিলাতী শিক্ষা পাইয়াছেন।

বর্ত্তমান রাজার নাম বজ্রবুদ্ধ। পাশ্চত্য শিক্ষা পাইয়া তিনি পুরাতন রাজরীতি—অর্থাৎ বহুবিবাহের বিরোধী হইয়া উঠেন এবং একটি মাত্র বিবাহ করিতে চান। তাঁহার প্রস্তাবের রাজ্যময় উত্তেজনার সঞ্চার হইল। শ্যামরাজ্যের আইবুড়ো মেয়েরা রাজরাণী হইবার সুযোগ হাতছাড়া হইয়া যায় দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। শেষটা বাধ্য হইয়া রাজাকে মত পরিবর্ত্তন করিতে হইল।

রাণীকে খুসি করিবার জন্য শ্যামরাজের অনেক জিনিষ আছে। তাঁহার প্রাসাদের সংখ্যা কুড়িটি (একটির নাম "হীরক-প্রাসাদ"), শ্বেতহস্তীর সংখ্যা অসংখ্য, সোনা-দানার তো কথাই নাই, চুণী, পান্না, হীরা, মুক্তা আছে প্রায় তিন কোটি টাকার। শ্যামরাজের একখানি বহুমূল্য কেলি-তরণী আছে, তাহার মাঝিমাল্লার সংখ্যা একশো কুড়ি জন; এছাড়া আরো হাজার হাজার কেলি-তরণী, কুড়িটি বড় বড় সোনার ছাতা ও অন্যান্য অগুন্তি বিলাসের উপকরণের মালিক হইয়া শ্যামরাজ কুমারী-কন্যাদের সলোভ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শ্যামরাজের যে সব স্ত্রী রাজবংশের বা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে নন, তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তানরা রাজরক্তের জন্য পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেও ধনদৌলতের উত্তরাধিকারী হন না। তবু

এতগুলি সন্তান পালন করা তো বড় সহজ কথা নয় এবং এমনা শ্যামরাজকে এমন বিপুল অর্থব্যয় করিতে হয় যে, পুত্র-কন্যারা দুর্ব্বহ ভারের মত হইয়া উঠে।

হিন্দুস্থান।

ত্যাগে।

—:০:—

বর্জ্জন ব্যতীত কোথা অর্জ্জন? আমি যখন দশের এক, অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা হইয়াও বিশাল পৃথ্বীর একাংশ, দেশে দেশে নিখিল বিশ্বের সহিত আমি সম্বদ্ধ, আমার জন্য দশ, দশের জন্য আমি—আমার স্বার্থ, আমার সুখ পরিপূরণ করা আমার একার পক্ষে অসাধ্য। দশের সাহায্য, দশের শক্তি আমার সুখে নিয়োজিত না হইলে আমি যে শক্তিহীন হেয় ধূলি সে ধূলিই। দশের বলেই আমি বলী—দশও তুল্যভাবে আমার বলে শক্তিশালী। ব্যষ্টির সমষ্টিতে অণুপরমাণুর ওতপ্রোতভাবে জড়িত মিলিত হইয়াই এই বিশাল বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড। বন্ধনসূত্র তার বর্জ্জন; আমি পুষ্ট বিনিময় নীতিতে;—শক্তি আমার আদানপ্রদানে! উদারতা, পরার্থপরতা ইত্যাদি বড় ভাবের বড় মুখের বড় কথা, স্বার্থকীট আপনায় একদর্শী বারো-আনার স্বার্থ—সংসারের অতি মোটা সুখদুঃখ—অভাব-অভিযোগের সাফল্যের মূলেও এই বর্জ্জন—অর্জ্জন করিতে হইলেই চাই সংস্কার বর্জ্জন! জানি তা; আমরা 'দাও' বলিতে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বলিতে প্রস্তুত থাকতে হয়—'নাও' কিন্তু আপনার যোল আনার উপর আরও যোল আনা স্বার্থ লাভের লোভে—অন্ধ মন আর বলিতে চায় না—'দিলে'—তার পরিবর্ত্তে এই 'নাও'; ভুলে যাই আমরা, বিনা কড়িতে বেসাতি মিলে না! ভবের বাজারেও দুষ্টের আচল, মহাপাপ—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনন্ত নরক, আত্মাহুতি. মহাপ্রলয়ের কোলে চির বিলয়!

আত্মরক্ষা করিতে হইলে—বিশেষতঃ সমাজে—শত চেষ্টা করিলেও বর্জ্জন নীতির হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। এক বর্জ্জনমুক্ত জীবন—না হয় মরণ,—অন্য পথ নাই। এই দুয়ের এক ঘাড় ধরিয়া লওয়াইবেই লওয়াইবে; পরিদৃশ্যমান জগত ইহার সাক্ষ্য, ভারত ইহার দৃষ্টান্ত, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান—ভারতের নানা জাতি ইহার ভুক্তভোগী—'যার লাঠি তার মাটী' মৃত্যু রাজ্যের এই সংহার নীতিতে আজ আমরা জর্জ্জরিত—মরণমুখী প্রেতের গোষ্ঠী!

আমার, আমার সংসার, আমার জাতি—আমার লৌকিক ধর্ম্মের মর্ম্মের মূল নীতি ভুলিয়া গিয়া চেষ্টা আমার প্রাণ রক্ষায়! অন্তঃসারশূন্য হইব না কেন আমি, দশের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া স্বার্থ রক্ষা! বর্জ্জন ব্যতীত অর্জ্জন—জোর আমার লাঠীর? অমেঘ (!) অস্ত্রের? অস্ত্র ব্যবহার করিবে কে? সে শক্তি একার আমার কোথা? একা যে আমি নগণ্য—ক্ষুদ্রতম হইতেও যে কল্পনাতীত ক্ষুদ্র—আমার আবার শক্তি!

ক্ষণিক মোহে—উত্তেজনার আস্ফালনে—অহঙ্কারে অন্ধ আপনাতে শক্তির কল্পনা। কল্পনাই—পরিণাম তার চিরসমাধি!

আসিয়াছিল সে পরকে সাহায্য করিবে, এই অছিলায়—শক্তি দিবে বলিয়া—স্বার্থের আগুণে করিল ছারখার—পরিত্রাণের জন্য আত্মার কল্যাণের বারতা লইয়া মুক্তির সঙ্গীতে দেশ মুখরিত করিয়া জমাইয়াছিল, সে প্রসার—অন্তরে ছিল না তার বর্জ্জন—মতলব তার বর্জ্জনহীন অর্জ্জন—তাই না এই হাহাকার!

আত্মত্যাগ আত্মপ্রতিষ্ঠা—রক্ষণ নীতির মূল সূত্র—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধন—জীবনে যাহাতে হৃদয়ে হৃদয়ে জাগ্রত হয়—এখন চাই সেই অনুভূতি—সেই শিক্ষা আমি নহি আমার, আমি দশের তাহার স্বার্থেই আমার স্বার্থ—আমি দশের স্বার্থ রক্ষা করিতে আত্মস্বার্থ বর্জ্জনে প্রস্তুত এভাব, এ ধারণা শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত জাগ্রত না হইলে রক্ষা হইব কিসে?

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান—যে ভাই যে যেখানে আছে দাঁড়াও আসিয়া বিশ্বেশ্বরের পদপ্রান্তে,—মানসচক্ষে দর্শন কর কি মহাবিসর্জ্জন নীতিতে মহাকাল মৃত্যুঞ্জয় পালন-সংরক্ষণ করিতেছেন—এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড; আত্ম বিসর্জ্জনে তাঁর সৃষ্টি,—এ অর্জ্জন—শক্তির আধার তাই না আমার!

সন্ধ্যা

অন্তঃপুর *

-:০:-

নাট্য-লিখিত ব্যক্তিগণ।

বৃদ্ধ	বাগানে	কর্ত্রী ...	এদের কোন কথা বল্‌তে হবে না	ঘরের ভিতর
বিদেশী		কর্ত্তা ...	" "	
মার্থ ও মারী } বৃদ্ধের নাতনী দুটি		দুটি মেয়ে...	" "	
কৃষক		শিশু ...	" "	
জনতা				

একটি পুরানো বাগান—"উইলো" গাছে ভরা। মাঝখানে তার একটি ঘর—তিন্‌টে তার নীচ তলাকার জানালা—তিনটেই খোলা—আলোর পথ। লক্ষ্য কর্‌লেই স্পষ্ট দেখা যায়—ঘরটিতে, প্রদীপের আলোয় বাড়ীর সকলে এক জটলা করে বসেছে। ঘরের কর্ত্তা আগুনের ধারেই বেশ একটি কোণ বেছে নিয়েছেন।—কর্ত্রীঠাকুরুণ টেবিলের উপর কনুই ঠেস্ দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। অল্প বয়সের দু'জন মেয়ে—সাদা পোষাক পরা পরস্পর গল্প গুজব কর্চ্ছে—নেহাৎ বাজে বাচালতা...আর স্তব্ধ ঘরের সঙ্গে যোগ রেখে নীরবে হাস্য কর্চ্ছে। একটি ছোট্ট শিশু ঘুমিয়ে পড়েছে, মায়ের বাঁ কাঁধে মাথা রেখে ..এ'রকম বোধ হচ্ছে যে, যখন ওদের মধ্যে কেউ উঠে এক পা এগিয়ে যাবে কিংবা একটু অঙ্গ ভঙ্গী কর্ব্বে, তখন দূর-দূর হ'তে দেখা যাবে যেন—সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে, যবনিকার আড়ালের ঐ গতি-ভঙ্গীগুলা যেন এক মহা রহস্যের হয়ে উঠ্‌বে—কি যেন গভীর অর্থে, ইঙ্গিত আর অলৌকিকতা ওদের মধ্যে থাক্‌বে......

---

* মেরিস্ মেতারলিঙ্কের Interieur—মূল ফরাসী হ'তে অনূদিত।

বৃদ্ধ ও বিদেশী অতি সন্তর্পণে বাগানে প্রবেশ।

বৃদ্ধ। আমার! বাগানের যে অংশে এসে পড়েছি, সে অংশটা দেখছি বাড়ীর পিছন দিকে পড়ে গিয়েছে। ওরা কখনও এধারে আসে না। দরজাগুলিও সব ঐ পাশে... সবগুলিই দেখছি বন্ধ, খড়খড়িগুলিও সব আটকানো ...এধারে ত কোন খড়খড়ি দেখছি না— তবু আলো চোখে লাগছে কেন? হাঁ......ওরা যে এখন প্রদীপের নীচে বসে গল্প কচ্ছে...ভাগ্যি এখনও আমাদের কেউ দেখতে পায় নি...ঘরের কর্ত্রী ও ছোট মেয়ে দুটি বোধ করি এখন বাইরে আছেন ...যাকগে—বলত কি করা দরকার এখন?

বিদেশী। কি কর্ত্তে যাচ্ছি আমরা?

বৃদ্ধ। প্রথমে আমি দেখতে চাই ওরা সকলেই ঘরের ভিতর আছে কিনা! হাঁ...... আমি দেখতে পাচ্ছি ঘরের কর্ত্তা আগুনের ধারের কোণটিতে বসে আছেন—হাত দুখানি তার হাঁটুর উপর ...কর্ত্রীঠাকরুণ টেবিলের উপর কনুইএর ঠেস্ দিয়ে...

বিদেশী। কর্ত্রী আমাদের দেখছেন...

বৃদ্ধ। না—উনি চেয়ে আছেন বটে কিন্তু দেখছেন না...চোখের ওর পলক পড়ছে না... কিন্তু যদি দেখবার চেষ্টা করেন, তবু আমাদের দেখতে পারেন না...আমরা যে...বড়, বড় গাছগুলির আড়ালে পড়ে গেছি...কিন্তু আর এগিয়ো না...মৃত মেয়েটির বোন দুটিও ঘরের ভিতর আছে...তারা অর্থহীন দৃষ্টিতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি কচ্ছে; আর ছোট্ট ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়ছে। কোণের ঘড়ীটিতে ন'টা বেজেছে...ওরা এখনও কিছু সন্দেহ করে নি...কোন কথাও ওরা বলছে না।

বিদেশী। ঘরের কর্ত্তার মনোযোগে যদি কোন প্রকারে আকর্ষণ করা যেত, যদি কোন রকম ইঙ্গিত করা সম্ভবপর হ'ত...কর্ত্তা ঐধারেই মুখ ফিরিয়েছেন...বলত, আমি একটা জানালায় ঘা মারি...সকলকে না জানিয়ে ওদের একজনকে জানান উচিত...

বৃদ্ধ। কি কর্ত্তে হবে, বুঝতে পাচ্ছি না...খুব সতর্কতার সহিত চলতে হবে...কর্ত্তা— বৃদ্ধ এবং রুগ্ন...কর্ত্রীও তাই...আর মেয়ে দুটি অতি ছেলেমানুষ...সকলেই তাকে এত ভালবাসে, যেমন ভাল কেউ বাসতে পার্ব্বে না...আমি কখনও ওদের এত আনন্দ দেখিনি... না, না জানালার ধারে যেও না...খুবই অন্যায় হ'বে তা' হ'লে...কোন রকম হেরফের না

করে, যতদূর সম্ভব সোজাসুজি ভাবেই বলে ফেলা ভাল, যেন ঘটনাটি নেহাৎ সাধারণ…অহরহ ঘটেই থাকে…খুব দুঃখিত ভাব দেখানও উচিত নয়, কারণ ওদের দুঃখ আমাদের দুঃখের সীমা অতিক্রম করে যেয়েও শেষ হবে না…চল, বাগানটার ওধারে যাই…ওখানে দরজায় আঘাত করে আমরা বাড়ীর ভিতর ঢুকব, যেন কোন কিছুই হয় নি, আমিই আগে ঢুকব… আমাকে দেখে ওরা মোটেই বিস্মিত হবে না…আমি ত প্রায়ই আসি…এমনি সন্ধ্যা বেলা, ফুল আর ফল নিয়ে; আর ওদের সঙ্গে ঘণ্টা কয়েক কাটিয়ে যাই…

বিদেশী। তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া কি দরকার? একাই যাও; যতক্ষণ ওরা আমায় না ডাকে। বাইরে অপেক্ষা করব…ওরা ত আমায় কখনও দেখেনি…আমি একজন পথিক মাত্র…তার উপর আবার বৈদেশিক…

বৃদ্ধ। একা যাওয়া…উচিত হবে না…একা, একা কোন বিপদের বার্ত্তা বহন করে নিয়ে যাওয়া—সে ভারী বদ্‌খত, বিশ্রী…এখন ওখানে যেতে আমার ভাবনা হচ্ছে…যদি আমি একা যাই, প্রথম থেকেই কথা পাড়্‌তে হ'বে…গোটাকয়েক কথার পরেই ওরা সব বুঝ্‌তে পার্ব্বে—তখন আর কিছু বলবার আমার থাক্‌বে না…দেখ, কোন আকস্মিক বিপদের কথা শেষ করে বল্লে যে হঠাৎ নীরবতা লোককে পেয়ে বসে—আমার তা'তে মনে হয়…তখনি মর্ম্মস্থল ছিন্ন হতে থাকে কি না!…কিন্তু যদি আমরা এক সঙ্গে ঢুকি আমি তাদের ধর না… অনেক ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে বলব…তা'কে পাওয়া গিয়েছে…ঢেউয়ের উপর সে ভাসছিল…হাত দু'টি তার কৃতাঞ্জলি…

বিদেশী। হাত দু'টি তার অঞ্জলি বদ্ধ ছিল না…বরঞ্চ: নিঃসাড় অবস্থায় ঝুলে পড়ে ছিল…

বৃদ্ধ। দেখ্‌লে না জানা সত্ত্বেও অনেকে, অনেক কথা বলে…তবে, কোন দুঃসংবাদই খুঁটিয়ে নাটিয়ে দেওয়া যায় না—আমি যদি একা ঢুকি, আমার জানা প্রথম দু'চারিটি কথায়, তারা সব বুঝতে পার্ব্বে কি সাংঘাতিক হ'বে তা' হলে? ভগবানই বল্‌তে পারেন তা'হলে কি ঘটবে? কিন্তু যদি আমরা দু'জন এক সঙ্গে যাই, এক জনের পর আর একজন কথা বল্‌তেই থাকি, ওরা হাঁ করে আমাদের কথা শুনবে…দুঃসংবাদটির প্রতি নজর দেবার অবসর পাবে না…ভুলে যাচ্ছ—যে ওর মা ওখানে রয়েছেন—যার জীবন প্রভাত কুসুমের মত শিথিল-

বৃদ্ধ...ভালই হয়েছে...প্রথম ধাক্কাটা কতকগুলি বাজে কথার উপর দিয়েই যাবে...তাই, সোজাসুজি সংবাদটি না বলে, কথাগুলি ঘুরিয়ে পাড়তে হবে...সইয়ে, সইয়ে বলতে হ'বে... যে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমাদের কোন সংস্রব নাই, তা'ও শুনলে আমাদের মনে এক অজানা ব্যথার সঞ্চার হয়···সে ব্যথা আমাদের ঘিরে বসে নিঃশব্দে...যেন তাহা বাতাস কিংবা আলোরই মত...

বিদেশী। আপনার পরিচ্ছদ ভিজে গিয়েছে এবং পথের পাথরের উপর টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে...

বৃদ্ধ। আংরাখাটির নীচ দিকটাই কেবল ভিজে গিয়েছে...তোমার শীত কচ্ছে বোধহয়? তোমার বুকে কাদা লেগে গিয়েছে যে...পথে আসতে লক্ষ্য করি নি, অন্ধকার ছিল কি না...

বিদেশী। আমি কোমর জলে নেমেছিলাম...

বৃদ্ধ। আমার আসবার অনেক আগেই কি তুমি তাকে খুঁজে পেয়েছিলে...

বিদেশী। কয়েক মিনিট আগে...গাঁয়ের দিকে যাচ্ছিলাম, ভয়ানক দেরী হয়ে গিয়েছিল, আঁধারে নদীর উঁচু পাড় ডুবে গিয়েছিল, নদীর বুকে কিন্তু তাকিয়ে তাকিয়ে যাচ্ছিলাম কারণ পায়ে হাঁটবার রাস্তার চেয়ে নদীর ঢেউয়ে ছিল আলো ঢের বেশী, হঠাৎ দেখি হাত দুই দূরে, এক ঝাড় নল খাগড়ার ধার ঘেঁসে, কি একটা যেন অদ্ভুত রকমের...এগিয়ে গেলাম— দেখলাম তার কেশরাশি চূড়া করে মাথার উপর বাঁধা...তখনও ভেসে রয়েছে কিন্তু স্রোতে...

(ঘরের ভিতর ছোট মেয়ে দুটি জানালার দিকে মুখ ফিরাল।)

বৃদ্ধ। মেয়ে দুটির কাঁধের উপর চুলগুলি কেমন দুলছে, দেখছ?

বিদেশী। ওরা আমাদের দিকে তাকিয়েছে...না কেবল মুখ ফিরিয়েছিল,...বেরিয়ে খুব জোরে কথা বলছি (মেয়ে দুটি আবার মুখ ফিরিয়ে যথাস্থানে বসল।) এখন, ওরা আর আমাদের দেখছে না...আমি কোমর জলে নেমে গেলাম, হাতে ধরে তাকে উঠিয়ে আনলাম অনায়াসে···তীরের উপর...সেও তার বোন দুটিরই মত অতি সুশ্রী ছিল...

বৃদ্ধ। বোধ হয় সেই ছিল সব চেয়ে সুন্দরী বুঝতে পাচ্ছি না—আমার সাহস কমে আসছে কেন!...

বিদেশী। কি সাহসের কথা বল্‌ছ? মানুষের যা' সাধ্য সব আমরা করেছি...এক ঘণ্টার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল...

বৃদ্ধ। আজকার সকাল বেলাই সে বেঁচেছিল!...গির্জ্জা হতে যেরূবার মুখে তা'কে দেখেছিলাম...সে বল্লে আজ সে রওনা হবে; যে নদীর জলে আজ তুমি তাকে দেখতে পেয়েছ সেই নদী পেরিয়ে সে তার দিদিমাকে আজই দেখতে গিয়েছিল...সে বল্‌তে পারে নাই আবার কখন তাকে আমি দেখব...আমার কাছে সে' সময়েই কিছু চাওয়া তার উচিত ছিল···কিন্তু সে সাহস করে নাই······কিন্তু অকস্মাৎ সে আমায় ছেড়ে গেল...মনে হচ্ছে এখনও যেন সেই জায়গাই রয়েছি...কিছুই আমি লক্ষ্য করি নাই... আহা, সে হাস্‌ত ঠিক্ তাদেরই মত—যারা কোন কিছু কথা বল্‌তে চায় না, যাদের মনে ভয় আছে...বল্লে কেউ তাদের বুঝবে না...সে আশাও কর্ত্ত কত ব্যথার সহিত...চোখ দুটি তার প্রায়ই বিষণ্ণ থাক্‌তো—চোখ উঠিয়ে আমাকে কখনও দেখে নি...

বিদেশী। মাঠের চাষারা আমায় বল্লে তারা সন্ধ্যার সময় নদীর তীরে তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে—তাদের বিশ্বাস ছিল—ফুলের খোঁজে সে বেরিয়েছে......এটা হতে পারে যে তার মৃত্যু...

বৃদ্ধ। কেউ জানে না—কি জানে তারা? সে ছিল তাদেরই একজন যারা কখনও কিছু বল্‌তে চায় না...দেখ, যখন কেউ আর বাঁচতে পারে না, তখন কেন যে বাঁচতে পারে না—তা' সে নিজেই সব চেয়ে বেশী জানে...তবে কিনা—ঘরের ভিতরটা দেখ্‌তে পাচ্ছি আমরা স্পষ্টই কিন্তু নিজের ভিতরটা দেখা অত সোজা নয়...যে আর এ পৃথিবীতে নাই, যাঁর মন আর আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বল্‌বে না, তারই সঙ্গে গত কয়েক মাস এক সঙ্গে বাস করেছি...না ভেবে, না চিন্তে তার কত কথার উত্তর দিয়েছি...তার পরে কি হ'ল, তা'ত তুমি দেখ্‌ছ...যে ফুলগুলি ঝরে পড়ে গিয়ে আঁধারে বসে কাঁদছে—বোন দুটি মৃদু হাস্যের সহিত তাদের কথা বল্‌ছে...যে'টা আগে ভাগে দেখা দরকার, দেবতারাও তা' দেখেন না—আর মানুষ সর্ব্বনাশ হয়ে গেলে দেখে...গতকল্য সন্ধ্যার সময় সে ওখানে ছিল, প্রদীপের আলোর নীচে—তার বোন দুটিরই মত...এই দুর্ঘটনাটি যদি না ঘট্‌ত, যেমন করে তুমি ওদের দেখ্‌তে না...আমার মনে হচ্ছে আমি যেন এই প্রথম ওদের দেখ্‌ছি...সাধারণ জীবনের

সঙ্গে কিছু যোগ না করে নিলে, জীবন রহস্যটা মোটেই বোঝা যায় না...ওরা তোমার কাছে কাছেই রয়েছে, সর্ব্বদা তুমি ওদের চোখে-চোখে রাখ্ছো, কিন্তু যে'দিন চিরদিনের মত ছেড়ে চলে যাবে, সেদিনই কেবল তুমি ওদের চিন্‌তে পার্ব্বে...এই কথাটাই এখন মনে উঠ্ছে, কি মহান বিস্ময়কর, মুক্তার মত ছোট্ট একটুখানি আত্মার মালিক হয়ে এসেছিল সেই মেয়েটি—এত অল্প বয়সে সব কাজ করে যে চলে গেল, কত অমূল্য, অকপট, অথচ অল্পকণ স্থায়ী আত্মিক সম্পৎ তার ছিল...

বিদেশী। দেখ, কক্ষটির স্তব্ধতায় বসে ওরা কেমন নীরবে হাসা কচ্ছে'...

বৃদ্ধ। ওরা আজ নিশ্চেষ্ট...আজকার সন্ধ্যায় কিছু ওদের কর্ব্বার নাই...

বিদেশী। একটু না নড়েও ওরা কেমন হাস্‌ছে...কিন্তু ঘরের কর্ত্তা নিজের ওষ্ঠাধরের উপর একটি অঙ্গুলী রাখ্লেন......

বৃদ্ধ। মায়ের বুকে যে ছোট ছেলেটি ঘুমিয়েছে—তারই অনুকরণ কচ্ছে'ন...

বিদেশী। কর্ত্রী চোখ উঠাতে ভয় পাচ্ছেন—পাছে ছেলেটির ঘুম ভেঙে যায়...

বৃদ্ধ। মেয়ে দুটিও আর কিছু কচ্ছে'না...একটা বিরাট, অন্তহীন নীরবতা, নিদ্রালস পল্লবের মত নেবে এসেছে...

বিদেশী। মেয়ে দুটির হাত হতে খসে পড়্লো—কেমন ধবধবে শাদা রেশমী সূতার-গুলী...

বৃদ্ধ। ওরা ছেলেছটিকে দেখ্ছে...

বিদেশী। ওরা জানে না যে, আর কেউ দেখ্ছে...

বৃদ্ধ। আমাদেরও হয় ত এমনই কেউ দেখ্ছে...

বিদেশী। ওরা সকলে চোখ তুলে চেয়েছে...

বৃদ্ধ। কিন্তু ওরা কিছুই দেখ্তে পাবে না...

বিদেশী। দেখ্তে কত সুখী বলে বোধ হচ্ছে...কিন্তু জানে না কি হয়েছে...

বৃদ্ধ। ওরা ভাবছে কত নিরাপদ ওরা...দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে বসেছে; জানালাগুলিতেও লোহার অর্গল...পুরানো বাড়ীটির সবগুলি দেওয়ালে মজবুত করেছে..."ওক"কাঠের দরজা তিনটেতেও আবার হুড়কে—ভবিষ্যৎ বিপদের, যতগুলি প্রতীকার...তা' ওরা করেছে...

বিদেশী। বলে ফেলাই ভাল...কেউ হয় ত হঠাৎ এসে রূঢ় ভাবে বল্‌তে পারে...সেই প্রান্তরে, ঘটনাটির সময় একদল চাষা ছিল—তারা তার মৃত্যু দেখেছে...যদি তাদের মধ্যে কেউ এসে দরজায় ঘা মারে...

বৃদ্ধ। মার্থ ও মারী—সেই ছোট্ট মেয়েটির পাশেই রয়েছে। সব চাষারা ডাল পালা দিয়ে একটা দোলা গড়েছে—আস্‌বার সময় ওদের বড়টিকে বলে এসেছি, যখনই চাষারা এদিক্ পানে রওনা হ'বে, সে যেন চট্ করে এসে আমাদের খবর দেয়...খানিক অপেক্ষা করে—নিশ্চয়ই সে আস্‌বে সেত আমার সঙ্গেই আস্‌ছিল...তবে এখনও আস্‌বার সময় যায় নি...আমি ভেবেছিলাম দুঃসংবাদটি বলা কিছু নয়—দরজায় এসে ঘা মেরে ঢুক্‌তে হবে, তারপর কয়েকটি কথা জুটিয়ে বল্‌তে হবে...কিন্তু কতক্ষণ ধরেই ওদের আমি দেখ্‌ছি প্রদীপের আলোর নীচে বসে থাক্‌তে!

ক্রমশঃ—

শ্রীফণীভূষণ রায়।

স্নেহ।

ওই দেখা যায় ভোলা খুড়োর
ছোট্ট খড়ো ঘরখানি;
সম্মুখে তার কেয়ার ঝাড় ও
ডোবার জলের ভরখানি।
গল্পে সেথা দিনটি কাটায়
গ্রামের ছেলে পাঁচজনে,
কেউ বা থাকে আমোদ ভরে
কেউ বা কাজের সন্ধানে।

ডোবার ধারে শরের ঝাড়ে
　　থাকত সুখে দিনরাতে
বুলবুলির ওই বাচ্চা দুটী
　　আদর মেখে মার সাথে।

বাচ্চাগুলি সাচ্চা বুলি'
　　ছোট্ট এবং রঙচংএ
ভোলা তাদের আনন্দে ধরে
　　কতই সাধের ঘর ভেঙ্গে

রুদ্ধ করে রাখলে ভরে
　　হস্তে গড়া পিঞ্জরে
মায়ের ছেলে মাকে ভুলে
　　ব্যথার সুরই গুঞ্জরে।

মা যে গেছেন নাইক ঘরে
　　ছেলের আহার সংগ্রহে
আসলো ধেয়ে দেখলে চেয়ে
　　নাই যে ছেলে নাই গেহে।

চৌদিকে সে বেড়ায় ছুটে
　　আপন বাছার সন্ধানে,
হায়রে ভুলি মধুর বুলি
　　খায় না থাকে আনমনে।

কুলায় হ'তে দেখলে সুতে
পিঁজরা দোলে জালনাতে,
অধীর পাখী ছাড়লো শাখী
বস্‌লো গিয়ে আল্‌নাতে।
বনের পাখী ঢুকলো ঘরে
ভয়ভাবনা ভুললো কি ?
গঙ্গা নদীর টান কভু ভাই
মায়ের টানের তুল্য কি ?
মানসলোভা বনের শোভা
ভুললো আহা বুলবুলি
নীড় হ'লো তার আলো আঁধার
খড়ো ঘরের ঘুলঘুলি।
সুদুর থেকে দেখেই সুখী
রইল স্বরগ ত্যাগ করে
ছেলেরা তার চিন্‌তে নারে
খাঁচায় তারা একঘরে।
দিন দেখি এই করুণ ছবি
আমরা কটি ভাই এসে,
মাতৃহারা আমরা ক'জন
চোখের জলে যাই ভেসে।

শ্রীযশোদানন্দ ঠাকুর।

বিদ্যায়।

—:o:—

এ দেশের পাকা প্রবাদ—বাণী ও কমলার দ্বন্দ্ব পাকা রকমের। বলিতেই বলে—"নিম তিতা নিসিন্দা তিতা তিতা মাকাল ফল, তার চাইতে বেশী তিতা বোন সতীনের ঘর।" সতীনে সতীনে দ্বন্দ্ব না হওয়াই যেন অন্যায়—প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কুলীনের সংসারে এই জন্যই সুখ ছিল "দ্বন্দ্ব অহর্নিশ"। বাণীর কৃপা হইলেই কমলা বসেন বাঁকিয়া, তখন তিন্তিড়ি পত্রের ব্যঞ্জনই ভোজনের উপকরণ—তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া অন্য গতি আর কোথা? এই ছিল দেশের প্রবাদ। প্রবাদ যাহা তাহা ফুঁইফোড় হইতে পারে না, তাহার মূলে অবশ্য একটা কিছু নিহিত থাকেই। অন্য দেশের কথা নয় এ প্রবাদ ভারতের মূল প্রকৃতির সহিত জড়িত। বর্ত্তমান অবস্থা ও সভ্যতার আলোকে এ প্রবাদের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—ইহা হইতে অলীক ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। দু'এক ক্ষেত্রের কথা ছাড়িয়া দিলে, মুখে আমরা জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই বিদ্যাচর্চ্চা বা যাহাই প্রচার করি না কেন বাণী উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্যই যে আমাদের পূর্ণভাবে কমলার দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিদ্যার বিজ্ঞানবলে জড় জগৎকে নিজের আয়ত্ত্বের মধ্যে আনিয়া মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির উপকরণ নিত্য বৃদ্ধি করিয়া মানুষকে চরম সুখে সুখী করিবার জন্যই না এই জ্ঞান-চর্চ্চা। ভারতকে ছাড়িয়া দিয়া অন্য সভ্য দেশে দৃষ্টিপাত করিলেই বাণী ও কমলার তুল্য অনুগ্রহে সে সকল দেশ কিরূপ সুখসমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত তাহা সহজে উপলব্ধি হয়। বাণী সেবার ফলে মানুষ প্রকৃতির কঠিন রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য-সম্ভার মানুষের সুখ-উপকরণে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ। ভোগ্য বস্তুর নিত্য বিবৃদ্ধি, বিলাস সুখ, অর্থের অবাধ আগম, কমলার কৃপাবৃষ্টির আর অভাব কোথা? বাণী ও কমলার পূর্ণ-মিলন! এ অবস্থায় ভারতে কেন এ অসামঞ্জস্য অলীক প্রবাদের উৎপত্তি? ভারত যদি পৃথিবী ছাড়া, ইহার মতিগতি বিভিন্ন, ইহার সকলই অদ্ভুত,—অনাসৃষ্টি! অন্য দেশ যাহাকে বলে উন্নত ভারতের চক্ষে তাহা অন্যরূপ। সুখ ঐশ্বর্য্য বলিয়া জগত

পাগল, আর ভারত বলে কিনা বিষয় বাসনা মনুষ্য জীবনে বিষ! অন্য দেশের বিদ্যার দেয় অর্থ,—ভারতের বিদ্যা জাগ্রত করে অর্থ ত্যাগের প্রবৃত্তি, এ দেশের লক্ষ্যই ভিন্ন। ভারতকে বুঝিবার প্রণালীও তাই ভিন্ন। ভারতবাসী আমরা, কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা নই ঠিক ভারতীয়—নই প্রকৃতিস্থ! বিদেশের আবহাওয়া প্রবলভাবে ভারতে প্রবাহিত হইয়া যে ঝঞ্ঝাবাতের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতেই আমাদের হৃদয়মন টলমলায়মান। আপনার সত্তা, আপনার স্থান নিরূপণ করিবার মত চিত্তের স্থৈর্য্য আমরা হারাইয়া বসিয়াছি। কাজেই এখন আমাদিগের ধারণা করা কঠিন জ্ঞান ও অর্থে কোথায় দ্বন্দ্ব। কিন্তু তাহা চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে; অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়িয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইতেছে আমার দেশকে,—আমার প্রকৃতিকে আমাদের ভবে। তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর উপাসক আমরা—বিদেশীর চক্ষে নিরেট পৌত্তলিক—এমন পাকা পৌত্তলিক হইয়াও জানি না আমরা এই তেত্রিশ কোটী দেবদেবী ব্যতীত আরও তেত্রিশ লক্ষ গুণ তেত্রিশ কোটী দেবদেবী অন্য দেশে অবস্থান করিয়া আমাদের পৌত্তলিক জীবনকে প্রকৃত জড়বাদীতে পরিণত করিয়া বিপন্ন করিতে অলক্ষ্যে অবস্থান করিতেছে কিনা। ভূতের মুখে রাম নাম শুনিয়া আতঙ্কিত হয় জীবমাত্রই, কিন্তু ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের চিন্তাহীন ভূত আমরা, ভারতের মহাশ্মশানে অমানিশায় এক সময়ে যে তাণ্ডব নৃত্যের সূচনা করিয়াছিলাম, আজও থামিয়াছি না বলিলে সত্যের অপলাপই করা হয়, তাহাদের পক্ষে জড়বাদীগণ যদি পাল্টা জড়বাদী বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করে তাহার ন্যায্যান্যায্য বিচার করিবার সামর্থ্য আমাদের এ মত্ত অবস্থায় থাকিতে পারে কিরূপে?

কারণ নির্দ্দেশের আবশ্যকতা নাই; ভারতবাসী আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মচিন্তা ত্যাগে কিরূপে হইয়াছিল শ্মশানবাসী প্রেততুল্য, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য। হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহারা তাহাদের মানবিকতা, পরিণত হইয়াছিল পরের ছায়ায়।

একদিন ভারতে যে জ্ঞান দান করিত—ত্যাগ; মুনিঋষি সিদ্ধপুরুষ জ্ঞানকেই মানবজীবনের চরম ও পরম উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়া মনুষ্য সমাজের অশেষ কল্যাণ-ব্রতে ব্রতী, সেই নরনারায়ণ যেথায় উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাধনায় নিজে অতি দীনভাবে—অনাড়ম্বরভাবে জীবনযাপনকেই পরম শান্তির ও চিরানন্দের আধার বলিয়া

বিবেচনা করিতেন সেই জাতি ভারতীয় প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিদেশীয় সভ্যতার প্রভাবে তাহাদের শিক্ষায়—তাহাদের দীক্ষায় পাকা খুঁটি গাড়িয়া বসিয়া চিন্তার ধারা পরিবর্তন করিয়া ভাবিতে শিখিল—পার্থিব দৈহিক সুখেই জীবনের পরম লক্ষ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্যও পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য আকার ধারণ করিল। তাহারা প্রার্থনা করিল বাণী ও কমলার ওতোপ্রোতঃ ভাবে সম্মিলন। ভারতের ঋষি সন্তুষ্ট ছিলেন দিনান্তে ভগবানে উৎসৃষ্ট সামান্য মাত্র শক্ত-অন্নে, বনজাত ফলমূলে, ভারতবাসী বিদেশীয় পলান্নের আঘ্রাণে মত্ত হইয়া সে স্বাদে লোলুপ হইল নবাবীর খানার জন্য। পরার্থপরতার নরনারায়ণের সেবার আন্তরিক কামনা শেষ হইয়া গেল সেইখানেই, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অদম্য লালসা সুযোগ বুঝিয়া মস্তক তুলিল। সপত্নীর অংশিত বক্ষের অন্তরালে যে পরম জ্ঞানের যে পরম শান্তি বিরাজিত ছিল,—অর্থে নিস্পৃহতা দারিদ্র্যেও কমলার অকৃপাতেও বাণীসেবকের হৃদয়ে অতুল শান্তি। জানি না অন্য কোন বিদেশী বাণীর কৃপা লাভ করিতে গিয়া জননী ভারতী বাণীকে বিস্মৃত হইল ভারতবাসী। বাণী আর রহিলেন না,—জ্ঞানদাত্রী শান্তিবিধায়িত্রী পরের কল্যাণকামী দেবতা, তিনি নিয়োজিত হইলেন কমলার কৃপা লাভের উদ্দেশ্য রূপে বাণী ছিলেন রাণী, হইলেন দাসী। দাসীর নিকট হইতে বেশী আর কি আশা করা যায়?—দাসত্ব-বরই তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ বর তিনি দিলেন তাহাই। শিক্ষা বলিতে বুঝাইল তখন আক্ষরিক জ্ঞান—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-দাসত্বলাভের উপায়। দাসত্ব, পরের চাকুরী হইল আমাদের লক্ষ্য। বিশ্ববিদ্যালয় যত সুউচ্চ উপাধি জ্ঞানের পরিমাপক হইলেও তাহার উদ্দেশ্য হইল অর্থ উপার্জ্জন। এতদিন বরং কথাটা ধামাচাপা দিবার উপায় ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি আধিব্যাধির সহিত দু'টি উদরান্নের সংস্থান করিয়া দিত কিন্তু মাদক দ্রব্য যেমন শরীরে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়া আশু উদ্যম আনয়ন করিলেও পরিণামে হয় অবসাদের কারণ, তদ্রূপ আমাদের বিদেশী বিদ্যা আসিতে অর্থাগমের উপায় স্বরূপ হইয়া আমাদের দেহমনে উৎসাহের সঞ্চার করিলেও পরিণামে আজ আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে উহা আমাদিগকে অমানুষ করিয়াছে কতখানি। দলে দলে এমন পাশ করা বেকার ভারত ব্যতীত অন্য দেশে নাই,—হাজার হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পায়ে ঢালিয়া দিয়া এমন সম্বলশূন্য ভাবে উদরান্নের সংস্থানে অক্ষম উচ্চ শিক্ষিতের সৃষ্টি করিয়া দেশ মজাইতেছে বিলাতী-বাণী—ভোগের তৃষ্ণা জাগাইয়া

দিয়াছে ষোল আনা,—তাহা পূর্ণ করিবার পথ রাখে নাই—কোন দিক দিয়া! জ্ঞানের কথা না হয় নাইই তুলিলাম, পুঁথিগতবিদ্যা পুঁথিতে সমাপ্ত, তাহার আলোচনার ফলই বা কি? কিন্তু বিদেশী বিদ্যাই কি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি সম্পূর্ণ? যে রসায়ন-বিদ্যার বলে নানা পার্থিব সুখসম্ভারের নিত্য নবনব উদ্ভাবন করিয়া বিদেশী লাভ করিতেছে অতুল ঐশ্বর্য্য, আমরা সেই বিদ্যারই পুঁথিগত পর্য্যায়টুকু মাত্র লাভ করিয়া ঐ সকল বস্তুর জন্য হইয়াছি পরমুখাপেক্ষী। দৃষ্টি আমাদের শকুনির ন্যায় ঐ ভাগাড়ে—দাসত্ব বৃত্তিতে। প্রতিপদে পরের ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়া দুইটি অন্নের জন্য কাঙাল আমরা, কতই না লাঞ্ছনা নিত্যই যে ভোগ করিতেছি। প্রভু, আমাদের সহিত ব্যবহার করিতেছে পশুর ন্যায়, তথাপি সাহস নাই—সামর্থ্য নাই—শিক্ষা নাই যে নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারি! অথচ মন অন্যের বিলাস চাকচিক্যে এমনই আত্মবিস্মৃত যে এত লাঞ্ছিত—পদদলিত হইয়াও পর-হস্তাহৃত বিলাস সুখলাভ করিবার জন্য ব্যগ্র! এই কি উন্নতি—এই কি সুখের নিদান? উন্মাদও বুঝি আমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখে। কোথায় সে আত্মপ্রসাদ! কোথায় সে স্বল্পে সন্তুষ্টি!—কোথায় সেই বাণী সেবকের অতুল বীর্য্য, প্রশান্তি যাহার বলে কমলার কৃপা তুচ্ছ করিয়া একদিন সে নিজকে রাজেশ্বর অপেক্ষাও সমৃদ্ধশালী, ঐশ্বর্য্যবান্ মনে করিয়া তার স্বরে বলিতে সমর্থ হইয়াছিল—মা জ্ঞানদা! তোমার প্রসাদই জগতে অতুলনীয়, স্বর্গের অমৃত অপেক্ষাও জানা ত মধুরতর!

পরের ধনে তুমি ধনী—আমি ব্রজের কাঙ্গালিনী—সেই আমার সুখ—সেই আমার সাধনা—সেই আমার জীবনে লক্ষ্য! 'আমার দৈন্য, সে মোর দৈন্য, তাহারি জয়!' অন্যের তাহা, তোমার প্রসাদ—তোমার বিজ্ঞানালোক—তোমার সভ্যতার নানা সুখোপকরণ তোমারই, আমার তাহাতে কোন্ অধিকার! তোমার বস্তু তোমাতেই থাক্ যতদিন আমি তাহার মালিক হইতে না পারিতেছি, যতদিন তাহা আমার নিজ শক্তির অর্জ্জিত উপকরণ নহে, ততদিন তোমার ঐশ্বর্য্যে আমার কি উপকার? তাহা কেবল আমার অশেষ দুঃখের কারণ, কেবল মন প্রাণ দেহ বিনাশ করিবার যন্ত্র। তোমার ঐশ্বর্য্যতাপে আমি জর্জ্জরিত—তোমার সভ্যতালোকে আমি পতঙ্গ, আমার জীবনে তোমার সভ্যতালোক যে মোহ আনয়ন করিয়া জীবন বলি দিতে আকর্ষণ করিতেছে তাহা আমার জীবনে যম! রক্ষা কর আমায়

ওগো তেত্রিশ কোটী দেবতার উপর ছয় লক্ষ দেবতা, পরিত্রাণ দাও, প্রসাদ তোমাদের প্রার্থনা করি না আর।

দরিদ্র দেশের অধিবাসী আমরা, দারিদ্র্য হউক আমাদের অঙ্গের ভূষণ; তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা দিন; আমার নিতান্ত আপনার দেশের সাদামাটা প্রকৃতি দেবী তাঁহারই বরে আমরা ব্রতী হই সেই সকল ছোট ছোট কার্যে, যাহা সম্পাদনে আমরা সমর্থ, শিক্ষা হউক আমাদের সেই ভাবে যে জ্ঞান লাভ করিয়া আমরা আমার দেশকে—সমাজকে—দেশবাসীকে, আমার নিজকে রক্ষা করিতে পারি। আমরা হইতে পারি আমাদের দেশের প্রকৃত সন্তান। যাহার জলবায়ু আমাদের আয়ু, যাহার শস্যাদি আমাদের অন্ন যাহার অতি মোটা কাপড় আমাদের নিজের লজ্জানিবারণের উপায় যে শিক্ষায় আমাদের মন প্রাণ দেহ তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে আমাদিগের দেশের ভাইবোন দশজনকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, সেই শিক্ষাই হউক আমার লক্ষ্য, দেশজ অতি কদন্নই হউক আমাদের ভক্ষ্য, জ্যামজ্যাম বিস্কুটে আমার কি কাজ? বিদ্যুতালোকে আমাদের কোথায় পুলক? মৃত্তিকার বর্ত্তিকাই আমার দীন গৃহের উপযুক্ত তৈজস!

সোনার ভারত মা আমার কতই না নিত্যব্যবহার্য্য উপকরণে ঐশ্বর্য্যবতী, কেবল শিক্ষা দীক্ষার অভাবেই আমরা না মাতৃস্তন্য পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী 'ফুড' জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টিত। মাতার অনুগ্রহবঞ্চিত শিশুর জীবন, আর আমাদের জীবন। ভগবানের নিকট মনপ্রাণে এই প্রার্থনা,—এ দুর্দ্দিনেও যেন তিনি আর মাতৃস্তন্য হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত না করেন। দেশের নেতাদের নিকট করুণা ভিক্ষা করি, তাঁহারা দশের কল্যাণের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন তাহার প্রধান লক্ষ্যই হউক আপামরের মধ্যে সেই শিক্ষা বিস্তার যাহাতে দশের মন দেশমাতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। বিদেশী ধাত্রীর দুগ্ধ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা যাহাতে ব্যগ্র হয় মাতৃস্তন্যের জন্য, জীবন যাহাতে রক্ষা হয়; স্বাস্থ্য-সুখ যাহাতে বজায় থাকে। ভারত মাতার দেবশিশু আমরা যাহাতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি আমাদের মানবিকতা, আমরা বুঝিতে পারি আমার একের সুখে নহে সুখ—একের স্বার্থই নহে স্বার্থ—আমার একার জীবন নহে জীবন। আমি দশের—দশ আমার, দশের উন্নতিতে আমি উন্নত—দশের কল্যাণে আমার কল্যাণ, আক্ষরিক জ্ঞান নহে কেবল বিদ্যা, আমার দশ যে সকল বিদ্যায়—যে সকল শিল্প কলায় চাষবাস কৃষিকার্য্যে একদিন হইয়াছিল উন্নত, সেই

সকল শিক্ষা, সেই সকল কারুর উন্নতি সাধন যে শিক্ষার সম্পন্ন হয় তাহাই হউক আমাদের আরব্ধ। আপনার সম্পদে আমরা হই তুষ্ট—সেই তুষ্টি বিবৃদ্ধির জন্য যাহা যাহা করণীয় তাহাই হ'ক আমাদের কার্য্য। বিশ্ব-ভাবের সহিত যোগ রক্ষা করিবার জন্য বিবিধ বিদেশী বিদ্যায়—তথায় কারু-কৌশলের আয়ত্ব করুক ভারতবাসী,—সমগ্র ভারতবাসী নয়, মাত্র তাহার বিশিষ্ট দুই আনা—অবশিষ্ট চৌদ্দ আনার শিক্ষা হউক সম্পূর্ণ দেশীয়—দেশের ঐশ্বর্য্যে তুষ্ট। ভগবান যদি দিন দেন যে মাটিতে পড়িয়া বহুবার আছাড় খাইয়া হাঁটিতে শিখিয়াছি তাহা ধরিয়াই আবার আমরা উঠিব—সেই উন্নতিতে উন্নত হইব যাহাতে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। তাঁহা হইতেই আসিয়াছি তাঁহারই বিভূতি এ প্রপঞ্চ—তাঁহাতেই আমরা প্রার্থনা করি পরম শান্তি—নির্ম্মল আনন্দ।

চীনের প্রতি।

(রেঙ্গুণে চৈনিক অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে)

আমি পৃথিবীর অনেকস্থান থেকে অনেক নিমন্ত্রণ পেয়েছি বক্তৃতা দিতে, কিন্তু আজ চীনবাসীরা যে ভাল বেসে দিয়ে আমাকে ডেকে নিচ্ছেন তা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। আমার পাশ্চাত্য জগতের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে তারা আমাকে শুধু বক্তা হিসাবেই স্বীকার করেছে, কিন্তু আজ চীন থেকে যে আহ্বান আমি পেয়েছি তা অন্তরের আহ্বান, এর ভেতরে মানবতার স্পর্শ রয়েচে তাই আমাকে বিচলিত করেছে। আমি অনুভব করচি যে তোমরা আমাকে বক্তাহিসেবে নয়, বন্ধুর মতই গ্রহণ করচো। যখন আমরা কোনো নূতন দেশে যাই তখন কেবল তুচ্ছ কৌতূহল চরিতার্থ করাই আমাদের উদ্দেশ্য থাকে না সেই দেশবাসীর সঙ্গে আমাদের যে আধ্যাত্মিক বন্ধন রয়েচে সেইটা সত্যরূপে বুঝতেই আমরা যাই। যে দেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই সেখানের নরনারীর সঙ্গে অপূর্ব্ব আত্মীয়তা বোধই হচ্চে সে দেশের সব চেয়ে বড় দান। তোমাদের ভালবাসায় আমার দাবী তোমার

আজ যে ভাবে স্বীকার করলে তাতে আমার আশা হচ্ছে চীনে গিয়ে আমার ঘর চিনে নেওয়া সহজ হবে। আমিত মনে করি আমাদের সেই সত্যই সব চেয়ে বড় যার গর্ব্ব আমরা করতে পারি তা হচ্ছে আমাদের ভালোবাসার ও ভালো জিনিষে বিশ্বমানবের সকলের দাবী, এমন কি যে অপরিচিত অতিথি তারও আমাদের মধ্যে আসবার অধিকার রয়েচে, সে অধিকার মানবত্বার, এবং আমাদের আতিথ্যে ভাগ বসাবার তারও জন্মগত দাবী। তার জন্য তার কোন পরিচয় বা সহি সুপারিশের দরকার করে না এমন কি কোনো রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক পাশপোর্টও চাই না। কেননা সে এই জগতে তার বিধাতার দেওয়া পাশপোর্ট নিয়ে এসেচে।

বিশ্ব-মানবের জন্য আমাদের দেশের সব দ্বার চিরদিন অর্গলিত, সমস্ত পথ আমি চিরমুক্ত, এমনি আবহাওয়ার মধ্যে বেড়ে উঠেচি। এই জন্যে আমি আশা করি চীনবাসীরাও আমাকে সেই ভাবে বুঝবেন, এবং আমার মতের স্বতন্ত্র্য ও পার্থক্যকে বড় করে না ধরে আমাদের মধ্যে যে সহজ ও গভীরতর ঐক্য আছে সেইটাকেই স্বীকার করবেন।

নবযুগে আমরা জন্ম নিয়েচি। আমি বিশ্বাস করি এই যুগের গর্ভে ভারতের বৃহৎ সম্ভাবনা নিহিত আছে। পুরাকালের সব বড় জাতির ইতিহাসেই দেখতে পাওয়া যায় তাদের বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে মিলনের পথ ছিল। এই জন্যেই সে যুগে মানুষের মনের মহৎ প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। চীনেও একটা হয়েছিল, তখন ভারতের দূতেরা সেই উদার দেশে ভারতের জীবন বেদের বাণী বয়ে নিয়ে যেত, এবং সেখানে চীনবাসীদের সহিত মিলিত হত, তার ফলে চীনে ও ভারতের মানুষের মনের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্তি সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানে আপনাকে প্রকাশ করেছিল। এবং এটাও একটা বড় তথ্য যে ধর্ম্মের পথে প্রতীচ্য প্রাচ্যের সংস্পর্শে এসে এমন একটা কিছু পেয়েছিল যা সে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস না করলেও তাতেই প্রতীচ্যবাসীদের অন্তর জাগ্রত হয়েছিল।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মনের স্বাতন্ত্র্য রয়েচে, এই জন্যে এই দুই জাতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষে উভয়েই সৃষ্টশক্তি ও প্রতিভার জাগরণ সম্ভব হয়, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই কথাই বলে, এবং এযুগেও সমস্ত এসিয়া জুড়ে এই ঘটনাটাই আবার ঘটচে। প্রতীচ্য জোর করে প্রাচ্যের দরজা ভেঙে তাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেচে; কিন্তু এতে আমাদের ভীত হবার কিছু

নেই, এটাকে আমাদের বরণ করা উচিত। কারণ এই সংঘাত আমাদের জাতীয়তাকে যুগব্যাপী নিদ্রার কবল থেকে মুক্ত করবে, তখন জাতির আপনার সত্তা দর্শন সম্ভব হবে। এই সংঘাত আমাদের বেদনা দিচ্চে কিন্তু এই বেদনাই আমাদের মোহ থেকে মুক্ত করবে, তখন আমরা সেই অমূল্য সম্পদ প্রত্যক্ষ করতে পারব এবং তখনই পারব যখন আমরা পূর্ণ জাগ্রত হব।

কেউ কেউ মনে করে আমরা হয় ত প্রতীচ্যের অনুকরণ করচি, তা হতে পারে, এবং আরম্ভের যুগে এটা সম্ভবও বটে। কিন্তু অনুকরণ হচ্ছে বাইরের, আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব বদ্‌লাতে পারি না, আমাদের প্রকৃতিও বদ্‌লাতে পারি না কেননা তা করবার আমাদের শক্তি নেই যেমন আমরা বিধাতার দেওয়া চেহারা বদ্‌লাতে পারি না। যদিও আমরা পোষাক বদলাতে পারি, আমাদের মন বদলাতে পারচিনে, হয়ত আমাদের আদবকায়দা প্রথা লোকাচার কিছু কিছু বদ্‌লে যেতে পারে, কিন্তু সেটা মোটেই গুরুতর কিছু নয়।

প্রতীচ্য আমাদের যে মহৎ সম্পদ দিয়েচে তা তার কেবল বিজ্ঞান নয় বা বিশেষ কতকগুলো আরাম ও সুবিধা নয়, গড়বার বা ভাঙবার কতকগুলো বিশেষ পদ্ধতিও নয়। এগুলো খুব বড় দান নয়, তার বড় দান হচ্ছে তার জীবন তার জীবন্ত সভ্যতা। এই প্রতীচ্য জাতিদের মধ্যে জীবন হয়েচে এবং সেই জীবনের সংঘর্ষই আমাদের মধ্যে যে জীবনীশক্তি ঘুমিয়ে রয়েচে তাকে জাগাবে।

কখনো ভেবোনা যে জীবনের চিহ্ন অদ্ভুত রকম আধুনিক কিছু হবে। জীবন যেমন তেমনি পুরাতন। জীবন নিত্যনূতন ও চিরন্তন। কেউ কেউ মনে করে জীবনের এই সব চিহ্ন হচ্ছে পাশ্চাত্য, অনুকরণ আমি তা বিশ্বাস করি না। জীবনের সঙ্গেই জীবনের মিল রয়েচে। আমরা যদি জীবনের পূর্ণ শক্তি লাভ করি তা'হলে সেই শক্তি আরো যারা পেয়েছে তাদের ছবি আমাদের মধ্যে ফুটে উঠবে। এ অনিবার্য্য এবং এই তথ্য আমরা বুঝতে পারব যদি আমাদের সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করি। আমি মধ্যযুগের অনেক কবির কবিতা বিশেষ আলোচনা করে দেখেছি যে তাদের মধ্যে আশ্চর্য্য রকম আধুনিকতা রয়েচে। এর কারণ একই জীবন তাদের ও আমাদের মধ্যে লীলা করেচে ও করবে।

দেওয়ালে কার্ণিশে বাইবেল হতে বড় মূর্ত্তি। বাহিরের দিনের আলো প্রবেশ করিতে পায় না, যেটুকু আলো আসে তাতে সেই ঘরের অস্পষ্টতাকে আরও বেশী করে দেয়। মনে হয় যেন আবার সেই প্রাচীন যুগে আসিয়া ঢুকিলাম। এখনও নানা প্রকার অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ছাত্রদের Cahned gowa-এ থাকতে হবে। প্রত্যহ ডিনারের Grace পাঠ করা হয়। সেই সমস্ত পুরাতন বাড়ীর সুদীর্ঘ ছায়ায় কলেজের অধ্যক্ষরা ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহারা সাদাকলার ও টাই পরিয়া, লম্বা গাউনে এবং মোচার খোলার মত টুপি পরিয়া যেন প্রাচীন ধর্ম্মযাজকগণের "মামী" 'Mummy।' ইংরাজবালকেরা এ সমস্ত সহ্য করে কারণ এই নিয়মের অধিকাংশই হাস্যকর ছেলেমিছাড়া আর কিছুই নহে; সুতরাং সহজ পরিহাসের ভাবে সহ্য যায়।

মা:ন।

শ্যাম।

বর্ত্তমান সভ্যতালোক-মুগ্ধ বিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার নিকট নিশ্চয়ই স্বাধীন শ্যামের 'ভার্য্যা-নগরী' একটা বিষম প্রহেলিকা রূপে বিবেচিত হইবে। শ্যাম-সভ্যতার হিসাবে বহু পশ্চাতে পড়িয়া নাই অথচ এমন একটা কুপ্রথা আজও স্বাধীন শ্যামে বর্ত্তমান ইহা অবশ্য বিস্ময়ের কথা! আদিকালে সংসারের কার্য্যসৌকার্য্যার্থে বহু-বিবাহের আবশ্যক ছিল। প্রেমের টানে নহে—সংসারের গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত গৃহস্বামী পরিণয়সূত্রে যুবতীগণকে আবদ্ধ করিয়া সংসারবন্ধনটা বেশ জমাট করিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করিতেন। পরিবারে নানা বিভাগের কার্য্য পত্নীগণ সরবরাহ করিত; পত্নীমহলে—পেত্নীর অভিনয়ও যে না হইত তাহা নহে। আজও আফ্রিকার অসভ্য সমাজে এ প্রথার বহু প্রচলন সেই হিসাবেই দেখা যায়। কালে এ প্রথার লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল অন্য দিকে, বৃহৎ পরিবারে বহু কার্য্য, পত্নী-সংখ্যারও সেই অনুপাতে হইত আধিক্য,—ধন ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধির সহিত পত্নী-সংখ্যার বৃদ্ধি হইত—ক্রমে পত্নীসংখ্যাই ঐশ্বর্য্যের পরিমাপকরূপে পরিণত হইয়াছিল। এখন যেমন

প্রাসাদপরিচ্ছদ,—গাড়ীজুড়ীকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইয়াছে মোটর—তখন তেমনি ছিল এই পত্নী! ধনৈশ্বর্য্যের পরিমাপক হিসাবেই রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে বহু-পত্নীত্বের প্রসার দেখিতে পাই। বিলাসের চরম নিদর্শনরূপে নবাবী হেরেমে পত্নীগণই ছিলেন প্রধান উপকরণ। তাহার বিষময় ফলে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল অনেককেই। অনন্যোপায় হইয়া তাহার প্রতীকারকল্পে যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ভারত, মুসলমান সম্রাটের এই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অধীনতার শৃঙ্খল সুদৃঢ় করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই—আর আজ স্বাধীন শ্যাম এ সভ্যযুগেও সেই মহা অপকারী প্রথাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে ইহা নিশ্চয়ই বিস্ময়ের কথা! প্রকৃতপক্ষে শ্যামেও পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্যামের অধীশ্বর বহুবিবাহে বিরোধী। 'ভার্য্যানগরী' শ্যাম হইতে অচিরাৎ অন্তর্হিত হইবে। বলিতে গেলে এশিয়ায় আফগানিস্থান ও শ্যামই স্বাধীন রাজ্য। স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে মন প্রাণ কখনই আড়ষ্ট বাধিগ্রস্ত দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না। আফগানিস্থানে বর্ত্তমানে বহু লোক-হিতকর কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। শ্যামও পশ্চাতে পড়িয়া নাই। শ্যামের অপর নাম মুংসাংথাই অর্থাৎ স্বাধীনদিগের দেশ। স্বাধীনদিগের দেশে বিলাসের নিদর্শন 'ভার্য্যানগরী'র অধিষ্ঠান এ যুগে যে অসহনীয় তাহার পরিচয় শ্যাম প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করিতে উঠিয়াপড়িয়া লাগিয়াছে। 'ভার্য্যানগরী' পাঠ করিয়া পাঠক অন্য ধারণা করিতে পারেন আমরা তাই শ্যামের বর্ত্তমান অবস্থার পরিচয় দিতেছি। শ্যামের বিপদ পদে পদে, তাহার চতুর্দ্দিকে পরাক্রান্ত পাশ্চাত্য জাতি বেষ্টন করিয়া আছে। দুঃখ-দুর্দ্দশাগ্রস্ত শ্যাম আত্মরক্ষায় সদা সচকিত ও সশঙ্কিত ভাবে অবস্থান করিতেছে। সৌভাগ্য তাহার—বহু পরাক্রান্ত জাতির দৃষ্টি শ্যামে নিবদ্ধ হওয়ায় শ্যাম একদিকে যেমন বিপন্ন অন্যদিকে তেমনি শ্যামের স্বাধীনতা হরণে অগ্রসর হইলে পরাক্রান্তে পরাক্রান্তে দুর্দ্দান্তে দুর্দ্দান্তে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা তাহাকে রক্ষা করিতেছে। এই হিসাবেই ফরাসী ও ইংরাজ মিলিত হইয়া শ্যামের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বদ্ধ পরিকর ও প্রতিশ্রুত। তদনুসারেই শ্যামের রাজা চূড়াকর্ণ ও যুবরাজ প্রায় ত্রিশ বৎসর সমভাবে স্বাধীন রাজ্যের সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। এমত অবস্থায় শ্যাম নিদ্রিত থাকিতে পারেন না। শ্যামরাজ সৈন্য বিভাগ ও নৌ-বাহিনীর বর্ত্তমান যুগোচিত সংস্কার সম্পাদন করিয়া আপনার রাজ্যের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে শ্যামে জলদস্যুর উপদ্রব কম ছিল না, বর্ত্তমানে নৌ-

বাহিনীর প্রসারে ও যথোপযুক্ত নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করিয়া শ্যাম দস্যুভয় হইতে মুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় আইনানুসারে শ্যামের প্রত্যেক সমর্থ যুবক অন্ততঃ দুই বৎসর কালের জন্য সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই বাধ্যতামূলক নীতি শ্যামে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রত্যেক বালক বালিকাই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য। বিবিধ বিভাগে সুশিক্ষার জন্য শ্যামরাজ বহু কার্য্যদক্ষ বিদেশী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন, পররাষ্ট্র বিভাগে একজন আমেরিকান, বিচার বিভাগে একজন ইংরাজ ও শাসন কর্ত্তাদিগের শিক্ষা দিবার জন্য একজন দিনেমার শ্যামে নিযুক্ত আছেন। পনর হাজার বয়কাউট সমর বিভাগে শিক্ষা লাভ করিয়াছে। শ্যামরাজের মন্ত্রীসভা আধুনিক আদর্শে গঠিত। শ্যামের আইন-কানুন সভ্য দেশের উপযোগী কৃষিবাণিজ্য ও খনিজ-সম্পদের উন্নতি-সাধনে শ্যামরাজের প্রখর দৃষ্টি। শ্যাম বৈদেশিক সভ্যতার যাহা যাহা গ্রহণীয় তাহা গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু আপনাদিগের বিশেষত্ব তাহারা বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাহাদের সামাজিক প্রথার সংস্কার সাধনে শ্যামরাজ চেষ্টিত থাকিলেও লোক-মত ও সামাজিক প্রথার প্রাধান্য সর্ব্বপ্রথমে স্বীকার করেন। সর্ব্বসাধারণ মধ্যে শিক্ষা প্রচলিত হওয়ায় শ্যামের অধিবাসীবর্গ রাজার জনহিতকর কার্য্যে সহায়তায় সর্ব্বদা প্রস্তুত। শ্যামে উন্নতির সাড়া পড়িয়াছে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে জাপানের ন্যায় শ্যামও উন্নতির আলোকে উদ্ভাসিত হইবে। শ্যামের উন্নতিতে স্বাধীনতা-পিপাসু নবীন ভারতের গৌরব বোধ করা স্বাভাবিক।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

চৈত্রমাস অতীত প্রায় একবিন্দু বৃষ্টির নাম নাই। পাট, আশুধান্য প্রভৃতির আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। গোমড়ক ভীষণভাবে চলিতেছে। সরকার পক্ষ হইতে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা হইলেও ফল সন্তোষজনক হয় নাই।

• • •

বিগত ফাল্গুনে স্থানীয় হেড পোষ্ট অফিস নবনির্ম্মিত সুরম্য প্রশস্ত দ্বিতল গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

আচার্য্য রায় মহাশয় স্বদেশের নানা কার্য্যে নিজকে নিয়োজিত রাখিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন ব্রতী। তিনি এ বয়সেও যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহা ভাবিলে দেশের লোকমাত্রই স্বদেশ-প্রেমে অনুপ্রাণিত তাঁহার গৌরবে মন পূর্ণ হইয়া উঠে। শ্রদ্ধেয় আচার্য্য বিগত মার্চ মাসে শ্রীহট্ট পদার্পণ করেন। তৎকালে তিনি স্বয়ং জনশক্তি কার্য্যালয় পরিদর্শন করেন। যে পত্র সুযোগ্য জনশক্তি সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা পরিচারিকায় প্রকাশ করিবার জন্য একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রখানি শ্রদ্ধার সহিত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

আচার্য্যদেবের পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত জনশক্তি সম্পাদক মহাশয়, সমীপে,

শ্রীহট্ট।

মহাশয়,

আমার তাড়াতাড়ি, চতুর্দ্দিকে ডাকাডাকি; কাজেই আপনারা আমাকে সাদরে যে অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ প্রকাশ করিবার সময় করিতে পারি নাই। এমন সঙ্কটের সময়েও যেভাবে আপনাদের পত্রিকাখানি দেশের সেবা করিতেছে তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এ কথা বলা যায় যে, এই একমাত্র পত্রিকাই শুধু শ্রীহট্ট নয়, সমগ্র সুর্ম্মাভেলীতে জাতীয় ভাব জাগাইয়া রাখিয়াছে। সাধারণের পক্ষ সমর্থনে পত্রিকাখানা যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে এবং বার বার পীড়নে পরিচালকবর্গের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। যে পত্রিকা এমন ভাবে দেশের সেবা করিয়া আসিতেছে তাহা যদি আজ সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবে বন্ধ হইতে হয় তাহা হইলে দেশের ঘোর অমঙ্গলই ঘটিবে। এখনই চাঁদা উঠাইয়া একটি ফণ্ড করা ও বিপদ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য মনে করি। এই উদ্দেশ্যে আড়াইশত (২৫০৲) টাকা চাঁদা দানে আমি নিজকে সৌভাগ্যশালী বোধ করিতেছি। ইতি—

করিমগঞ্জ,
২০শে মার্চ ১৯২৪ ইং।

নিবেদক—
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

আচার্য্যদেবের পরামর্শানুযায়ী একটি "সাহায্য ভাণ্ডার" খোলা হইয়াছে। ভালবাসার দান ক্ষুদ্র হইলেও ধন্যবাদের সহিত গৃহীত এবং "জনশক্তি"তে স্বীকৃত হইবে। যিনি যাহা দিবেন "শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব, সম্পাদক "জনশক্তি শ্রীহট্ট" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দত্ত সেক্রেটারী, জনশক্তি কার্য্যালয়।

গ্রন্থ সমালোচনা

হাসির হল্লা।—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ৬০ পৃষ্ঠা, দাম তিন দুয়ানী। প্রকাশক চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, ঠিকানা গৌরীপুর, ময়মনসিংহ। গৌরীপুরের ইন্দুপ্রেসে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভাদুড়ী বি-এ, বি,এস-সি, বি টি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। নামেই মানুষ—হাসির হল্লা হাসির তুফান! অন্তরে তাহার—হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ। হাসি তাহাতে কোথায়! সমাজ-দেহের পরতে পরতে যে দুরন্ত দুরারোগ্য ব্যাধি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়াছে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় শাণিত হাস্য-অস্ত্রে মর্ম্মস্থলে অস্ত্রোপচারে ব্যাধি নিরাকরণে উদ্যত সুতরাং হাস্যের অন্তরালে তাঁহার মর্ম্মন্তুদ বুকফাটা ক্রন্দনধ্বনি, আক্ষেপ— 'মস্ত বড় মেকির যুগে হৃদয় গেছে মারা'—
কিছুতেই প্রাণ জাগে না—সাড়া দেয় না—হাসিতেও নয়—ক্রন্দনেও নয়—এ মরা দেশের মৃত্যু অভিনয়ে নকলে আসল থাস্তা দেখিয়া লেখক হাস্যের ছলে যে অশ্রুর স্রোত বহাইয়াছেন, তাহার প্রবাহে কি জাগিবে আমাদের আত্মবোধহীন অসাড় মন,—জাগে যদি তবে তাঁহার এ শাণিত হাসির হল্লা হইবে সার্থক।

"শর্ম্মারামের আদর কত! হায়রে এখন বুকফাটে!
পুরুষগুলা হোচ্ছে নারী নব্যযুগের ঝপ্পাটে!"

** ** ** **

"নারীত্বটা নিচ্ছে পুরুষ, পুরুষত্ব লাঞ্ছিত;
চরণ-ভরে ভুবন-কাঁপা নয়কো এখন বাঞ্ছিত।"

দুর্দ্দশার চরম সীমায় আমরা উপনীত। রীতি, নীতি, আচার, পদ্ধতি, অলসবিলাসে আমরা মরণমুখী, কবি নানা ভাবে আমাদিগের সেই দুর্দ্দশার যে চিত্র সরস হাস্যরসে মণ্ডিত করিয়া আমাদের সম্মুখে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা মনোহারী না হইলেও দুর্লভ। সত্যই—

"পচে' গেছে আজ হিন্দু সমাজ, মরে' গেছে আজ মানুষ তার!
এ মহাপাপীকে আত্মঘাতীকে কেন মা বসুধা রাখিছ আর।"

প্রকৃতই আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটিলে—আর রক্ষা নাই,—

'জানো কি, জননি জানো কি কত যে আমাদের এই দুখের কাজ !
বাড়ীতে কাঁদিছে গিন্নী কন্যা, পরিধানে শত ছিন্ন সাজ !
তবু এ লজ্জা তবু এ দৈন্য, সহিছে গিন্নী তোমার জন্য

** ** ** **

জীবনে বাড়িছে জীবনের আশা জ্বলিছে জঠরে নিয়ত ক্ষুধা

** ** ** **

মৃত্যু নিত্য করিছে নৃত্য তবু টেকিক্‌ আস্ফালন !
কোথা হেন যোগী সময়োপযোগী ঘটাবে হিন্দু-সম্মিলন !

** ** ** **

'হিন্দুসমাজ-শিখরে যে আজ ধর্ম্ম-নিশান ওড়ে না আর !
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার !'

এ হাসির হল্লাকে যদি হাস্য বলিতে হয় তবে বুকফাটা ক্রন্দন আর কি ? কবি সত্যই মর্ম্মের জমাট অশ্রুতে সিক্ত হইয়া গাহিয়াছেন—

'গেয়েছি গান যখন যত,
চোখের জলে যোবার মত,
সকল সুরে বেজেছে, হায়,
কি রোদন-ই !'

* * *

'ভক্ত, তোমার বাহিরে শান্তি, কণ্ঠে তোমার করুণ উক্তি ;
হস্তে তোমার থাকে না অর্থ স্বাস্থ্য হারায়ে মাগিছ মুক্তি !
চা-পাতা, তোমার কাটতির তরে কত না চেষ্টা, কত না চর্চ্চা !
সভ্যকারিণি স্বাস্থ্যনাশিনি স্বর্গদায়িনি ! নবীনাদর্শ !'

এ আদর্শের বালাই লইয়া মরি !

শান্তি—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ, কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য বারো আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান আদিব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়, ৫৫ অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা; এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভক্ত গ্রন্থকার সংসারের শোক-দুঃখের জ্বালা হইতে আত্মত্রাণের প্রয়াসে সময় সময় যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন তাহা একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন; তাই গ্রন্থের নাম দিয়াছেন শান্তি। শান্তির কবিতাগুলি কবিতা-হিসাবে উচ্চ অঙ্গের না হইলেও সেগুলিতে ভক্ত-হৃদয়ের যে কাতর প্রার্থনা, সাধকের উচ্ছ্বাস, একনিষ্ঠ নির্ভরতা, ওতোপ্রোতভাবে বিরাজিত রহিয়াছে—তাহাতেই এই গ্রন্থ সার্থকনামা। ইহাতে এমন কবিতা ও গান অনেক আছে যাহা সংসারের সঙ্কট সময়ে পাঠ করিলে—উপলব্ধি করিলে ভগবৎপ্রেম জাগ্রত করিয়া পাঠকপাঠিকাকে নির্ম্মল শান্তি দান করিতে সমর্থ হইবে।

'নাহি জানি আমি কত করি দোষ
আমি শিশু অতি কোরোনাকো রোষ
তোমারি চরণে এসেছি পড়িয়া
আর কভু দূরে যায় না চলিয়া
মাগো জননী'—

বিশ্বজননীর নিকট অক্ষম সন্তানের এই চরম কাতর প্রার্থনা। সন্তানই কেবল অনুভব করিতে সমর্থ, মা আমার যে জগতের সর্ব্বস্ব। বিশ্বের আনন্দ সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী বরাভয় প্রদা! তাঁহার নিকটে অহর্নিশি থাকিতে পারিলে আর কিসের ভয়—কিসের দুঃখ! শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্থানাভাবে আমরা প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশ করিতে না পারায় লজ্জিত আছি। গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ বিলম্বের জন্য ক্ষমা করিবেন।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।'

৮ম বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩৩১ সাল। { ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বিস্মৃতি।

—:০:—

যে বেদনা আজ প্রকাশ মাগিছে
ভুলে যাই সখা! ভুলে যাই
ক্ষণিকের ভুল ;—আমোদ প্রমোদ
ছলে তাই মোরে ছলে ভাই ?
নিশার আঁধার দুর্য্যোগ দলি'
পলকের তরে চপলা উজলি'
ভুলায়েছে মোর বেদনা বিপুল
মরে যাই লাজে মরে যাই !

জগতের বুকে যে আগুন জ্বলে
তারে পাই বুকে তারে পাই,
আর্ত্তের বাণী, মরম যাতনা,
সহায়হীনের অপার বেদনা ;
আপন ক্ষণিক সুখের চমকে
মনে নাই মোর মনে নাই !
নিশিদিন মোরে ভুলায় বেদন
মরে যাই লাজে মরে যাই !

শ্রাবণ-ধারায় গ্রীষ্মের জ্বালা
ভুলে যাই সখা ! ভুলে যাই !
বরষার প্রিয়া দূরে সেই কথা
মনে নাই মোর মনে নাই !
ছলনায় শুধু হৃদয়ের ভার,
গুরু হ'তে গুরু হয় অনিবার !
নয়নের জল দ্বিগুণ ধারায়
ঝরে তাই শুধু ঝরে তাই !

সব ভুল আজ পেয়েছে বিলয়
হের তাই আজ হের তাই,
বুকের দরদ কণ্ঠে ঝরিছে,
ঝঙ্কার তালে বক্ষ পড়িছে ;

আমার জীবন-বহ্নি-শিখায়
হ'বে ছাই সব হ'বে ছাই
যে বেদনা আজ প্রকাশ মাগিছে
ভুলে যাই শুধু ভুলে যাই !

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

কালিদাসের বিক্রমাদিত্য।

রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব এবং মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য ও শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী এবং মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের কবি কালিদাসের নামের সহিত সংস্কৃতভাষানুরাগী সজ্জনমাত্রেই পরিচিত থাকিলেও তাঁহার জন্মভূমি ও আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে কেহই নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন নাই। ভারতের চির প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে তিনি উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার বিক্রমাদিত্য যে ঠিক কোন্ সময়ে উজ্জয়িনীর রাজ সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এ পর্যন্ত এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে এই বিক্রমাদিত্যের কাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে স্থির করা যাইতে পারে এবং সেইজন্য তৎসম্বন্ধে নানারূপ মতের উদ্ভব এবং প্রচলন হইয়াছে।

এদেশে চিরকাল হইতে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে যিনি "সংবৎ" নামক অব্দের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই "শকারি বিক্রমাদিত্য" মহারাজই কবি কালিদাসের আশ্রয়দাতা ছিলেন। খৃষ্টীয় অব্দ আরম্ভ হইবার ৫৭ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৫৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে এই "সংবতব্দ" গণিত হইয়া আসিতেছে। এই পরম্পরাগত প্রবাদ হইতে এ দেশের প্রাচীনেরা কালিদাসের বিক্রমাদিত্যকে খৃষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দের অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দের সম্রাট্ বলিয়া চিরকাল হইতে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথম ৬০।৭০ বৎসর পর্যন্ত উক্তরূপ মতই গৃহীত হইয়া আসিতেছিল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে স্যার উইলিয়াম জোন্স এবং

ডাক্তার হোরেস উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এবং আমাদের দেশের ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বিদ্বদ্গণ এই প্রাচীন মতই গ্রহণ ও প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দের শেষার্ধ হইতে য়ুরোপীয় ডাক্তার কার্ণ, প্রোফেসার বেবার এবং ম্যাকসমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা এবং গবেষণা করিতে করিতে অবশেষে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দের বিক্রমাদিত্য নামক সম্রাটের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং ১৮৭০—৮০ অব্দের মধ্যে মিঃ ফার্গুসন নামক প্রসিদ্ধ প্রাত্নতত্ত্বিক "সংবৎ" নামক অব্দটিকেই ব্রাহ্মণদিগের কল্পিত এবং অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দেন। এই সময়েই বোম্বাই নগরের ডাক্তার ভাউদাজী নামক প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ অনুসন্ধান করত তাঁহাদিগকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। ডাক্তার ভাউদাজীর মতই সে সময়ে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত সমাজে একরূপ চূড়ান্ত-সিদ্ধান্ত স্বরূপই গৃহীত হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার মতেরই অনুবর্তী হইয়া ডাক্তার ভাণ্ডারকর, মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অন্যান্য অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক এবং প্রাত্নতত্ত্বিক নিজ নিজ পুস্তকে কবি কালিদাস ও তাঁহার আশ্রয়দাতা বিক্রমাদিত্যকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে সংস্থাপিত করিয়া নিশ্চিত হইয়াছিলেন। আমাদের পাঠ্যাবস্থায় (প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে) বিদ্যালয়ের পাঠ্য "ভারতবর্ষের ইতিহাস" নামধেয় পুস্তকগুলিতে উক্তরূপ সিদ্ধান্তই সুগৃহীত হইয়াছিল।

তাহার পর গত কুড়ি পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আবার সেই সুগৃহীত সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখনকার প্রচলিত যে কোন বিদ্যালয়পাঠ্য (ইংরেজী অথবা দেশীভাষায়) "ভারতবর্ষের ইতিহাস" খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, "কবি কালিদাসের বিক্রমাদিত্য আর কেহই নহেন,—তিনি গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত";—এই তথ্য বেশ দৃঢ়তার সহিত প্রচারিত হইতেছে। কেবল বিদ্যালয়-পাঠ্য-পুস্তক কেন, খুব মূল্যবান্ এবং বৃহদাকারে নব-প্রচারিত "কেম্ব্রিজ ইতিহাস" নামক (১) পুস্তকেও এই মতই গৃহীত হইয়াছে।

---

(১) *The Cambridge History of India.* Vol. I. (1922) chapter, XXI, Page 333. এই পুস্তক বড় বড় ছয় খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। সম্প্রতি আমরা কেবল প্রথম খণ্ডেরই দর্শন পাইয়াছি।

পাটলিপুত্রাধিপতি গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তদেব যে কবি কালিদাসের বিক্রমাদিত্য হইতে পারেন না,—অন্ততঃ এই মতের অনুকূলে প্রকৃত প্রমাণ যে কিছুই নাই,—তাহার সম্বন্ধে আমরা এই "পরিচারিকা" পত্রিকার গত চারি সংখ্যায় (পৌষ হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত) ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে, বর্ত্তমান প্রস্তাবে, আমরা কালিদাসের বিক্রমাদিত্য কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের যৎসামান্য অনুসন্ধানের ফল নিবেদন করিতেছি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের সময় নির্ণয় অতিশয় জটিল এবং কঠিন ব্যাপার ; সুতরাং এরূপ প্রস্তাব নিতান্ত নীরস হইবারই সম্ভাবনা। তাহার উপর, বর্ত্তমান লেখকের অনুসন্ধানের সীমা নিতান্ত সংকীর্ণ এবং তাহার লিপিচাতুর্য্যের অভাব বশতঃ এই প্রস্তাব আরও নীরস হইতে পারে ; তজ্জন্য সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবর্গের ধৈর্য ভিক্ষা করত আমরা বর্ত্তমান বিষয়ে অগ্রসর হইতেছি।

রাজপুতনা, মালব এবং পশ্চিম ভারতবর্ষের অতি প্রসিদ্ধ ধারানগরী এবং উজ্জয়িনীর বিখ্যাত ভোজরাজের সহিত কবি কালিদাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে যে কিংবদন্তী আছে, অর্থাৎ ভোজ প্রবন্ধে রাজা ভোজকে কালিদাস প্রভৃতি নবরত্নের আশ্রয়দাতা বলিয়া যে প্রকাশ করা হইয়াছে,—সেই কিংবদন্তী এবং সম্বন্ধের মূলে কিছুমাত্র সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধহয় না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের লিখিত দলীল এবং পুস্তকে কালিদাস-কবির নাম যেরূপ ভাবে লিখিত (২)

---

(২) দক্ষিণাপথের চালুক্যবংশীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় পুলকেশীর সমসাময়িক (৬৩৪ খৃষ্টাব্দের) আইহোল শিলালিপিতে লিখিত আছে,—

"যেনাযোজি নবেশ্ম স্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিত কালিদাস ভারবিকীর্ত্তিঃ ॥

Indian Antiquary. Vol. VIII, p 237.

কান্যকুব্জপতি হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ্ কবি বাণভট্ট স্বকীয় "হর্ষচরিত" গ্রন্থের সূচনায় কবি-প্রশস্তিতে লিখিয়াছেন,—

"নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসাদ্রাসু মঞ্জরীষিব জায়তে ॥"

পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তিনি যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের বহুপূর্বেই মহাকবি বলিয়া ভারতবর্ষের বিদ্বৎ-সমাজে সুগৃহীত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। মালবের রাজা ভোজ (রাজা মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র) খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন,—তিনি কখনই আমাদের মহাকবির আশ্রয়দাতা হইতে পারেন না। ভারতের প্রাচীন-পণ্ডিতবর্গ ঐতিহাসিক আলোচনায় বিশেষ পটু ছিলেন না ; তাই তাঁহারা ভোজ-প্রবন্ধে কালিদাস, ভবভূতি, বররুচি এবং অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবিগণকে এক সময়েই একত্র রাজা ভোজের সভায় আনিয়া এক অত্যাশ্চর্য গোলোযোগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক সময়-নির্ণয় করিবার জন্য "ভোজ প্রবন্ধের" নামে গ্রন্থ সম্পূর্ণ অযোগ্য, সুতরাং পরিত্যাগ করিবার যোগ্য। সেই হেতু, বর্ত্তমান প্রস্তাবে, আমরা ভোজরাজের সহিত কবি কালিদাসের সম্বন্ধের বিষয়ে কোন আলোচনা করিব না।

অদ্য হইতে ৫৩ বৎসর পূর্বে স্বর্গত পণ্ডিতবর ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় কালিদাস-কৃত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের ভূমিকায় কবির সময়-নির্ণয়াত্মক একটি আলোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত পণ্ডিত মহাশয় কবি-কালিদাস-কৃত "জ্যোতির্বিদাভরণ" নামক একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিতে উহার শেষ অধ্যায় হইতে নিম্নলিখিত কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"মত্তোঽধুনা কৃতিরিয়ং সতি মালবেন্দ্রে
শ্রীবিক্রমার্কনৃপরাজবরে সমাসীৎ। ইতি॥
ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহশঙ্কু
বেতালভট্ট-ঘট-খর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্ণব বিক্রমস্য॥ ইতি॥

হর্ষবর্দ্ধন মহারাজ খৃষ্টীয় ৬০৬ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই প্রমাণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের প্রথমেই কবি কালিদাসের যশঃ ভারত ব্যাপ্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায়, তাঁহাকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের ভোজরাজের সভায় উপস্থিত করা নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার, বলিতে হইবে।

যত্রাজধান্যুজ্জয়িনী মহাপুরী সদা মহাকালমহেশযোগিনী ইতি।

শঙ্ক্বাদি পণ্ডিতবরাঃ কবয়স্ত্বনেকে
জ্যোতির্বিদঃ সমভবংশ্চ বরাহপূর্বাঃ।
শ্রীবিক্রমস্য বুধসংসদি প্রাজ্ঞাবৃন্দে
তৈরপ্যহং নৃপসখঃ কিল কালিদাসঃ॥
কাব্যত্রয়ং সুমতিকৃদ্ রঘুবংশপূর্বং
জাতং যতো ননু কিয়চ্ছ্রুতিকর্মবাদঃ।
জ্যোতির্বিদাভরণকালবিধান শাস্ত্রং
শ্রীকালিদাসকবিতো হি ততো বভূব॥ ইতি॥
বর্ষে সিন্ধুরদর্শনাম্বরগুণৈর্যাতে কলৌ সম্মিতে
মাসে মাধব সংজ্ঞিতেহত্র বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ॥ ইতি চ॥"

এই জ্যোতির্বিদাভরণগ্রন্থের রচয়িতা "কবি কালিদাস" বলিতেছেন, "মালবরাজ শ্রীবিক্রমার্ক দেবের (বিক্রমাদিত্যদেবের) রাজ্যকালে এই গ্রন্থ আমি প্রস্তুত করিয়াছি। ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটখর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির এবং বররুচি এই নব জন রত্ন বিক্রমের সভায় আছেন; তাঁহার রাজধানী মহাদেব মহাকালের মহাপুরী উজ্জয়িনী। শ্রীবিক্রমাদিত্যের সভায় শঙ্কু প্রভৃতি পণ্ডিতবর, অনেক কবি, বরাহ প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ আছেন; তাঁহাদের সহিত নীতিবিদ্ আমি কালিদাসও আছি। অগ্রে আমি রঘুবংশ প্রভৃতি তিনখানি কাব্য ও শ্রুতিকর্মবাদ নামক বৈদিকনিবন্ধ রচনা করিয়াছি, এক্ষণ এই জ্যোতির্বিদাভরণ নামক কাল-নির্ণায়ক শাস্ত্র লিখিলাম। এই গ্রন্থ কলিযুগের ৩০৬৮ বৎসর গত হইলে (৩), বৈশাখ মাসে রচিত হইল।"

পণ্ডিতবর ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই "জ্যোতির্বিদাভরণের" উক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহার ভূমিকায় কালিদাসের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ, উদ্ধৃত

(৩) সিন্ধুর = হস্তী ৮, দর্শন = ষড়্দর্শন ৬, অম্বর = শূন্য ০, গুণ = সত্ব, রজঃ ও তমঃ = ৩ অঙ্কের বামাগতি, সুতরাং ৩০৬৮ অঙ্ক পাওয়া যায়।

শ্লোকগুলির প্রামাণ্য-স্বীকার করিতে পারিলে কবির কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয়ই থাকিতে পারে না। প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির গণনানুসারে খৃষ্ট পূর্ব ৩১০০ অব্দে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে; উল্লিখিত প্রমাণ হইতে সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে খৃষ্ট পূর্ব ৩২ (৩১০০—৩০৬৮=৩২) অব্দে কালিদাস এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, এবং সে সময় তিনি যে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য মহারাজের সভায় বিখ্যাত নবরত্নের অন্যতম রত্নরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তাহাও তিনি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত "জ্যোতির্বিদাভরণ" গ্রন্থ এবং তাহার রচয়িতা "কবি-কালিদাস"কে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধা আছে। ডাক্তার ভাউদাজী, রাও বাহাদুর এস, পি, পণ্ডিত, ডাক্তার হল এবং ডাক্তার কার্ণ (৪) প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ উক্ত পুস্তককে অপ্রকৃত অথবা "জাল" বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। রাও বাহাদুর পণ্ডিত উক্ত পুস্তককে জৈন-জালিয়াতী (Jain Forgery) বলিয়াছেন। ডাক্তার ভাওদাজী এবং রাও বাহাদুর এস, পি, পণ্ডিত মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের উপর আমাদের আদৌ কোনরূপ অবিশ্বাস নাই; সুতরাং তাঁহারা যখন নিঃসন্দেহে এই পুস্তককে কৃত্রিম বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তখন আমাদের মত অল্পজ্ঞজনের পক্ষে তাহা মানিয়া লওয়াই সঙ্গত। বিশেষতঃ উক্ত পুস্তকখানি দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই,—সুতরাং পণ্ডিতবর্গের কথায় বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি? তবে উপরে পণ্ডিতবর ৺তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উদ্ধৃত যে কয়েকটি শ্লোক আমরা তুলিয়াছি, উহাদের রচনা-প্রণালী হইতে কিছুতেই উহাদিগকে রঘু-কুমার-মেঘ-কাব্যের প্রণেতার লেখনী-প্রসূত বলিয়া বোধহয় না। সুতরাং লোভনীয় হইলেও "জ্যোতির্বিদাভরণ" এবং তৎপ্রণেতা তথা কথিত কালিদাসকে নির্মম ভাবেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইতেছে।

"জ্যোতিবির্দাভরণ" গ্রন্থখানি কৃত্রিম হইলেও নবরত্ন সম্বন্ধে উপরিধৃত "ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকো ঽমরসিংহ শঙ্কুঃ" প্রভৃতি শ্লোকটি নূতন রচিত নহে। এই শ্লোকটি ভারতবর্ষে অনেক পুরুষ

(৪) Dr. Bhan Daji's *Essay on Kalidasa*, p 12; Pandit's Edition of *Raghuvamsa*, Part III, preface, p 29; Wilson's Translation of *Vishnupurana*, Edited by Dr. F. E. Hall, preface part VIII, foot note; Dr. H. Kern's Preface to "*Brikatsamhita*" pp 12 and 17.

পরম্পরা হইতে প্রচলিত আছে বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধগয়ার একটি মন্দিরে একখানি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছিল, যাহাতে উক্ত শ্লোকটি ক্ষোদিত ছিল; মিঃ চার্লস উইল্‌কিন্স উক্ত শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। উক্ত সাহেবের মতে বিক্রম সংবৎ ১০০৫ অব্দ ঐ শিলালিপিতে ক্ষোদিত ছিল। আমাদের মনে হয়, সাহেব সংবতের অঙ্ক পাঠ করিতে ভ্রম করিয়াছিলেন; তাঁহার পাঠ বিশুদ্ধ হইলে, অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৯৪৮ অথবা ৯৪৯ অব্দে ও যে এই শ্লোকটি প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা জানা যাইতেছে। দুঃখের বিষয়, এই শিলালিপিখানি হারাইয়া যাওয়ায় তৎসম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হইতে পারে নাই। মিঃ কোলব্রুকের সম্পাদিত "অমরকোষ" অভিধানের ভূমিকায় এই সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ডাক্তার ভাউ দাজী প্রমুখ পণ্ডিতগণ খৃষ্টপূর্ব ৫৬—৫৭ অব্দে উজ্জয়িনী নগরে কোন "বিক্রমাদিত্য" নাম অথবা উপাধিযুক্ত সম্রাটের অস্তিত্বের পরিচয় ঐতিহাসিক গ্রন্থে না পাইয়া প্রাচীন মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং মিঃ ফার্গুসনের মতে "সংবৎ" অব্দটিই জাল বলিয়া কথিত হওয়ায় (এবং বিখ্যাত প্রোফেসর ম্যাক্সমূলার কর্তৃক ফার্গুসনের উক্তি সমর্থিত হওয়ায়) অনেকেই সংবৎ এবং তাহার প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্যকে কল্পিত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুখের বিষয় এই যে, ফার্গুসন এবং ম্যাক্সমূলারের মত যে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত, তাহা এখন প্রমাণিত হইয়াছে। ডাক্তার ফ্লীটের আবিষ্কৃত মান্দাশোর লিপি এবং অন্যান্য প্রমাণে "সংবৎ" অব্দের যাথার্থ্য উত্তমরূপে সমর্থিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে "সংবৎ" অব্দের প্রতিষ্ঠাতার অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নাই।

পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে সংবৎ অব্দটি খৃষ্টপূর্ব ৫৭ (৫৮ হইতে ৫৬ ও অনেকে বলেন) হইতে গণিত হইয়া আসিতেছে এবং ভারতীয় পরম্পরাগত প্রবাদ অনুসারে উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য মহারাজই উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইতঃপূর্বে য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের অনেকে "সংবৎ" অব্দের মৌলিকতার সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন; সম্প্রতি শিলালিপি এবং মুদ্রালিপির প্রমাণে তাঁহারা উক্ত "সংবৎ" অব্দের মৌলিকতা স্বীকার করিয়াছেন (৫)।

(৫) *The Cambirdge History of India*, Vol I, pp 155, 156, 167, 168, 491, 576, 581.

খৃষ্টপূর্ব ৫৮—৫৭ অব্দ হইতে যে একটী অব্দ ভারতের উত্তরভাগে অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং উহাই "মালবাব্দ", "সম্বৎ", "বিক্রমসম্বৎ" অথবা "বিক্রমাব্দ" প্রভৃতি নামা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন ; পরন্তু উক্ত অব্দ যে বিক্রমাদিত্য নামক কোন উজ্জয়িনীরাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা এখনও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে, তাঁহাদের কেহ কেহ বলিতেছেন যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে গ্রীক্ অথবা যবন-রাজ্যের অবসান পরে শক রাজত্বের যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই শকরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা "মগ" বা "মঅ"রাজের (Mauoes) পরবর্তী প্রথম আজেস (Azes I) নামক রাজাই উক্ত অব্দের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (৬)।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের পূর্ব্বের অনেক কুসংস্কার ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অপনীত হইতেছে। ভারতের আর্য্যাভিযান, আর্য্যগণের আদিম-নিবাসস্থান, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের তত্ত্ব, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা এবং বিভূতি, ভারতের স্মৃতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব, ইত্যাদি অনেক বিষয়েই তাঁহারা য়ুরোপীয় অনেক প্রাচীন মতের সংস্কার করিতেছেন (৭)। ইহা নিতান্ত সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহারা "সংবৎ" নামক অব্দের প্রামাণ্য এবং খৃষ্টপূর্ব ৫৮—৫৭ অব্দে কোনও এক বিক্রমাদিত্য মহারাজের অস্তিত্বের সম্ভাবনীয়তাও স্বীকার করিতেছেন (৮)। তবে, সেই বিক্রমাদিত্য যে উক্ত "সংবৎ" অব্দের প্রতিষ্ঠাতা, এই কথাটি কেবলমাত্র স্বীকার করেন নাই। আমাদের আশা আছে যে ক্রমশঃ য়ুরোপীয় বিজ্ঞবর্গের অগাধ পরিশ্রম এবং অক্লান্ত অনুসন্ধানের ফলে এই বিষয় সম্বন্ধেও তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইবেন।

---

(৬) *Ibid*, Vol I, pp 571 Etc.

(৭) আমাদের উল্লিখিত এই The Cambridge History of India, Vol. I, নামক গ্রন্থ আমাদের এই বাক্যের প্রমাণ। এই সব প্রকাশিত গ্রন্থখানি অনেকগুলি সুবিদ্বান্ য়ুরোপীয় অধ্যাপক মহাশয় দিগের দ্বারা লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে অনেক পুরাতন য়ুরোপীয় কুসংস্কারের অথবা হঠকারিতার সংশোধন হইয়াছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের পক্ষে যেরূপ নানাবিধ সুবিধা আছে এবং তাঁহারা যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও পরিশ্রমশীল, তাহাতে তাঁহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে প্রাচীন ভারতের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণীত হইবার আশা করা যায়।

(৮) *The Cambridge History of India*, Vol I, pp 167—169.

এক্ষণে, খৃষ্ট পূর্ব ৫৮—৫৭ অব্দে অথবা, তাহার নিকটবর্ত্তী সময়ে, ভারতের উজ্জয়িনী নগরে বিক্রমাদিত্য নামক রাজার অস্তিত্বের কি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই দেখিতেছি। আমাদের প্রাচীন সময়ের সন তারিখ যুক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ অতিশয় দুর্লভ; তাই, মুদ্রা, শিলালেখ, এবং তাম্রশাসনাদি দলীলের উপর ঐতিহাসিকগণ অধিকপরিমাণে নির্ভর করিতে বাধ্য হন। বিক্রমাদিত্যের সম্বন্ধে সংবৎ অব্দ ভিন্ন আর কোন উক্তরূপ দলীল-প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই; আর ঐ সংবৎ অব্দের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য কিনা, সে সম্বন্ধেও য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। হিন্দু এবং জৈন-প্রবাদ অবশ্য একবাক্যে বিক্রমাদিত্যকেই সংবতব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া আসিতেছেন; সেই প্রবাদ-প্রমাণই আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি।

(১) স্কন্দপুরাণের প্রথম অথবা মাহেশ্বরখণ্ডের অন্তর্গত (দ্বিতীয়) কুমারিকাখণ্ডের ৪০শ অধ্যায়ে কলিযুগবর্ণনার একটি অত্যাবশ্যক অংশ আছে। উহাতে বর্ত্তমান কলিযুগের রাজা শূদ্রক, নন্দ, বিক্রমাদিত্য, শক এবং বিষ্ণুর অংশাবতার "স্বয়ং প্রভু বুদ্ধের" (বুদ্ধের?) আবির্ভাবের সময় লিখিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা ঐ অংশ পাঠ করিলে দেখিবেন যে অন্ততঃ এই একটি পৌরাণিক বর্ণনায় সময়-নির্ণয় সহিত অনেকগুলি বিখ্যাত পুরুষের সন্ধান প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা "বঙ্গবাসী"র পুরাণ দেখিয়াছি, উহাতে পাঠের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক নহে এবং সম্পাদক মহাশয়েরা অথবা অনুবাদক পণ্ডিতেরাও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিষয়ে সাবহিত না হওয়ায়, অনুবাদে বিশেষরূপ প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে উহাতে যাহা আছে, তাহা নিম্নে তুলিতেছি,—

> "ততস্ত্রিষু সহস্রেষু ত্রিংশত্যা চাধিকেষু চ।
> ভবিষ্যং বিক্রমাদিত্য-রাজ্যং সোঽথ প্রলপ্স্যতে।
> সিদ্ধি-প্রসাদাদ্দুর্গাব্যাং দীনান্ যো হ্যুদ্ধরিষ্যতি॥
> ১৫৩॥ (১)

(১) এই পুরাণের পাঠের যে গোলোযোগ আছে, তাহা নিশ্চয়। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার "বিধবাবিবাহবিষয়কগ্রন্থে"র (Marriage of Hindu Widows, 5th

"যথাদৃষ্ট তথা" পাঠ এই। মোটা মোটি ইহার অর্থ এই যে "তাহার (কলিযুগ প্রারম্ভের) ৩০২০ তিন হাজার কুড়ি বৎসরের পর বিক্রমাদিত্য রাজ্য লাভ করিবেন এবং সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দুর্গত দীনজনের উদ্ধার করিবেন।" পঞ্জিকার গণনানুসারে খৃষ্টপূর্ব ৩১০০ অব্দে কলিযুগ প্রারম্ভ হইয়াছে ; সুতরাং (৩১০০—৩০২০ = ৮০) খৃষ্টপূর্ব ৮০ অব্দে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যলাভ হইতেছে। সংবতের হিসাবে খৃষ্টপূর্ব ৫৮—৫৬ অব্দে তাঁহার রাজ্যলাভ হইবার কথা, কিন্তু এখানে ২০—২৪ বৎসর অধিক হইতেছে। যদি "রাজ্যলাভ" স্থলে বিক্রমাদিত্যের জন্ম এই খৃষ্টপূর্ব ৮০ অব্দে ধরা যায়, তাহা হইলে আর কোনও গোলই থাকে না।

(২) জৈন মেরুতুঙ্গাচার্য প্রণীত "পটাবলী" (তীর্থঙ্করাদি আচার্যগণের জীবন-লিপি) নামক গ্রন্থে এই আখ্যান লিখিত আছে :—"উজ্জয়িনী নগরে নভোবাহনের পর গর্দভিল্ল নৃপতি শ্রীকালিকাচার্য (অথবা কালকাচার্য) নামক এক আচার্যের ভগিনী সরস্বতীকে ধর্ষণা করায় উক্ত আচার্য শকজাতীয় এক মহারাজের সহায়তায় গর্দভিল্লকে সিংহাসনচ্যুত করেন ও উজ্জয়িনীতে শকরাজ্য স্থাপিত হয়। এই শকরাজ ৪ চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করার পর গর্দভিল্লের পুত্র বিক্রমাদিত্য ঐ শকজাতীয় রাজাকে দূর করিয়া নিজে উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করেন ও প্রভূত স্বর্ণদান করত ধরার ঋণ মোচন ও সংবৎ অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনা জৈন শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের সংবতের ৪৭০ বৎসর পরে ঘটিয়াছিল। বীর-নির্বাণের ৬০৫ বৎসর পরে শক সংবৎ অথবা শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছে (১০)।"

Edition,) ৮০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে আছে,—

"ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যধিকেষু চ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোঽত্র প্রলপ্স্যতে॥"

এই পাঠের শেষ পংক্তি ঠিকই (ব্যাকরণ সঙ্গত) বোধহয়, কিন্তু প্রথম পংক্তি সুস্পষ্ট প্রামাদিক ; যে হেতু কলি প্রবেশের ৪০০০ চারি হাজার বৎসর পরে অর্থাৎ ৯০০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যকে আনা হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রমাদ কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া বোধহয় না ;—তিনি এ সম্বন্ধে কোনই মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।

(১০) The Literary Remiàns of Dr. Bhau Daji. বায়ু, মৎস্য, ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণে গর্দ্দভিল্ল বংশীয় সাত (অথবা দশ) জন রাজার কথা পাওয়া যায়। জৈন

জৈনদিগের গুরুপরম্পরায় রক্ষিত এই প্রবাদ হইতে দেখা যাইতেছে যে উজ্জয়িনীতে গর্দভিল্ল-পুত্র বিক্রমাদিত্য শকদিগকে পরাস্ত করত রাজ্যাধিকার এবং সংবৎ অব্দের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং এই উভয় ঘটনাই মহাবীরের ৪৭০ অব্দে, অর্থাৎ মহাবীরের নির্বাণের ৪৭০ বৎসর পরে, সংঘটিত হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব ৫২৭ অব্দে মহাবীরের নির্বাণ হইয়াছিল; সুতরাং (৫২৭—৪৭০=৫৭) খৃষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দেই বিক্রমাদিত্যের রাজ্যলাভ এবং সংবৎ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই পটাবলীতে আরও লিখিত হইয়াছে যে বীরনির্বাণের ৬০৫ বৎসর পরে, (অর্থাৎ ১৩৫ বিক্রম সংবৎ অথবা ৭৮ খৃষ্টাব্দে) শকাব্দের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যদি জৈনদিগের এই প্রবাদে আস্থাস্থাপন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সংবৎ প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব এবং সময় সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই অবশিষ্ট থাকে না। আমরা ত নিঃসন্দেহেই এই প্রবাদ গ্রহণ করিতে পারি; যুরোপীয় পণ্ডিতেরাও ইহাকে অসম্ভব অথবা অবিশ্বাস্য বলিয়া আর উপেক্ষা করিতে পারেন নাই (১১)।

গ্রন্থেও গর্দভিল্ল, বিক্রমাদিত্য, বিক্রমচরিত্র অথবা ধর্মাদিত্য, ভৈল্ল, নৈল্ল ও নাহড় এই ৬ ছয় জন রাজার নাম পাওয়া যায়।

(১১) Only one legend, the *Kalakacharya kathanaka*, 'the story of the teacher Kalaka' tells us about some events which are supposed to have taken place in Ujjain and other parts of Western India during the first part of the first century B. C. or immediately before the foundation of the Vikrama era in 58 B. C. This legend is perhaps not totally devoid of all historical interest. For it records how the Jain Saint Kalaka, having been insulted by King Gardabhilla of Ujjain, who, according to various traditions, was the father of the famous Vikramaditya, went in his desise for revenge to the land of the Sakas, whose King was styled 'King of Kings' (*Sahanusaki*). This title, in its Greek and Indian form, was certainly borne by the Saka Kings of the Punjab, Maues and his successors, who belong to this period......However this may be, the story goes on to tell us that Kalaka persuaded a number of Saka Satraps to invade Ujjain and overthrow the dynasty of Gardabhilla; but that

(৩) বিখ্যাত জর্মান অধ্যাপক বেবার (Prof. Weber) ধনেশ্বর সূরি নামক জৈন পণ্ডিতের রচিত "শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্য" নামক এক সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। উহাতে লিখিত আছে যে ৪৬৬ বৎসর গত হইলে, বিখ্যাত এবং যশস্বী বিক্রমাদিত্য মহারাজ পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইবেন (১২)। এই যে ৪৬৬ অঙ্কটি কোন অব্দের তাহা উক্ত গ্রন্থে লিখিত না থাকায় ইহা লইয়া গত উনবিংশ শতাব্দের মহামহা পণ্ডিতেরা মহা গোলোযোগ বাধাইয়া গিয়াছেন। কর্ণেল উইলফোর্ড এবং অধ্যাপক উইলসন এই ৪৬৬ অঙ্ককে বিক্রম-সংবতের অঙ্ক মনে করিয়া বিক্রমাদিত্যকে (৪৬৬+৫৭=৫২৩) খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং অনান্য অনেক পণ্ডিতই উইলফোর্ড এবং উইলসনের অনুসরণ করত এক বৃহৎ প্রমাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ডাক্তার ভাউ দাজী এই সকল মতের আলোচনা করিয়াছেন (১২)। পণ্ডিত মহাশয়েরা বিবেচনা করেন নাই যে জৈন পণ্ডিতবর্গ মহাবীরের নির্বাণাব্দ তাঁহাদিগের গ্রন্থের যত্র তত্র ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মহাবীর তাঁহাদের শেষ তীর্থঙ্কর, আমাদের রামকৃষ্ণাদির মত পূজনীয় এবং প্রিয়; সুতরাং তাঁহারা যে মহাবীরের নির্বাণাব্দ ব্যবহার করিতে ভাল বাসিবেন, তাহাতে আর বিস্ময় কি? ডাক্তার ভাউ দাজী এই কথা বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার লিখিত সন্দর্ভে বেশ করিয়া বুঝাইয়াছেন। যদি ৪৬৬ অঙ্ক মহাবীরের নির্বাণাব্দের অঙ্ক হয়, তাহা হইলে এই গ্রন্থের মতে (৫২৭ – ৪৬৬=৬১) খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬১ অব্দে বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল ধরিতে হয়, এবং তাহা হইলে সংবৎ অব্দের (খৃষ্টপূর্ব ৫৮ – ৫৬ অব্দে স্থাপিত) প্রবাদের সহিত বিশেষ কোন প্রভেদ জন্মে না। আর যদি

---

some years afterwards, his son, the glorious Vikramaditya repelled the invaders and re-established the throne of his ancestors. Prof. Jarl Charpentier, Ph. D., University of Upsala in ch. VI (The History of the Jains) of *The Cambridge History of India*, vol. I, pp 167-168. এই বৃহৎ গ্রন্থের এই "জৈন-ইতিহাস" অধ্যায়টি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট অংশ। জৈন সাধুগণের গ্রন্থাবলীর ভিতর কত যে অমূল্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বলা যায় না। এদেশে এখনও এই সকল গ্রন্থের প্রকৃত আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। জৈন ধনীরা মনোযোগ করিলে অতি সহজেই এই আলোচনা হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

(১২) *The Literary Remains* of Dr. Bhau Daji.

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫২৭ এর স্থলে ৫২৩ অব্দে বীরনির্বাণ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে খৃষ্ট পূর্ব ৫৭ অব্দেই বিক্রমাদিত্য এবং সংবতের প্রতিষ্ঠা ঠিক মিলিয়া যায়। যাহা হউক, "শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য" গ্রন্থের মতে ও আমাদের দেশের চিরাগত প্রবাদ সমর্থিত হয়। (ডাক্তার বুহ্‌লার এই গ্রন্থকে খৃষ্টীয় ১২শ কি ১৪শ শতাব্দীর রচিত বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উক্তির অনুকূলে কোনও প্রমাণ দেন নাই।)

(৪) খৃষ্টীয় ৬২৮ অব্দে লিখিত আমরাজ নামক পণ্ডিতের রচিত ব্রহ্মগুপ্তের "খণ্ডখাদ্য" নামক জ্যোতিগ্রন্থের টীকায় লিখিত আছে, "নবাধিক পঞ্চশত সংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ" অর্থাৎ ৫০৯ শকাব্দে (?) বরাহমিহিরাচার্য স্বর্গগত হইয়াছেন (১২)। ডাক্তার ভাউ দাজী প্রমুখ বড় বড় পণ্ডিতেরা এই উক্তির উপর নির্ভর করত বলিয়াছেন, "বরাহমিহির কালিদাসের সমসাময়িক; সুতরাং বরাহ-মিহির যদি ৫০৯ শকাব্দে (৫০৯+৭৮=৫৮৭) অথবা ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তনু ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কালিদাসও ঐ সময়ের কাছাকাছি, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে, বিদ্যমান ছিলেন, স্বীকার করিতেই হইবে।"

বাস্তবিকপক্ষে যদি, উক্ত ৫০৯ অঙ্কটি বিখ্যাত শকাব্দের অঙ্ক হয়, তাহা হইলে ডাক্তার ভাউ দাজী এবং তাঁহার মতানুবর্ত্তী ম্যাক্সমুলার, কার্ণ এবং ভাণ্ডারকর প্রমুখ বড় বড় পণ্ডিত-বর্গের সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। এখানে, আমাদের কিন্তু, সন্দেহ আছে। আমাদের বিবেচনায় "নবাধিকপঞ্চশত-সংখ্যশাকে" পদের "শাকে" শব্দটি লিপিকর-প্রমাদ অথবা লেখকের অনবধানতা-বশতঃ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই আমরাজ খৃষ্টীয় ৬২৮ অব্দের লোক; তিনি লোকমুখে অথবা গুরু পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন যে বরাহমিহিরাচার্য ৫০৯ অব্দে তনু ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং আধুনিক অনেক লেখকের প্রযুক্ত "খৃষ্টীয় শাকে" পদের (১৩) প্রয়োগের মত অনবধানতা বশতঃ "শাকে" লিখিয়াছেন। "অব্দে" স্থলে এরূপ আলগা অথবা অসাবধানভাবে "শাকে" শব্দের ব্যবহার হওয়া যখন আদৌ অসম্ভব নহে, তখন "শাকে" শব্দের অর্থ ঠিক-ঠাক শক সংবতে ধরিয়া লওয়া এবং তাহার উপর

---

(১২) *The Literary Remains* of Dr. Bhau Daji.

(১৩) ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার লেখায় "খৃষ্টীয় শাক" পদ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে।

চিরাগত প্রবাদের প্রতিকূলে এত বড় একটা মতের প্রতিষ্ঠা করা ঐতিহাসিকের পক্ষে আদৌ নিরাপদ নহে। পক্ষান্তরে, যদি উক্ত ৫০৯ অঙ্ককে মহাবীরের প্রসিদ্ধ নির্বাণাব্দের অঙ্ক ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আর কোন গোলই থাকে না। তাহা হইলে (৫২৭ – ৫০৯ = ১৮ খ্রীষ্ট পূর্ব = ৫০৯ – ৪৭০ = ৩৯ বিক্রম সংবৎ = ৫৭ – ৩৯ = ১৮ খৃষ্টপূর্ব) ৩৯ বিক্রম সংবৎ অথবা খ্রীষ্টপূর্ব ১৮ অব্দে বরাহ মিহিরাচার্যের দেহত্যাগ হইয়াছিল ধরিতে হয় এবং হিন্দু ও জৈনমতের চিরাগত প্রবাদের মর্যাদাও স্থির থাকে। এই হেতু আমরাজের উল্লিখিত ৫০৯ অঙ্ক শক রাজার সংবতের অঙ্ক নহে পরন্তু উহা মহাবীর নির্বাণাব্দের অঙ্ক বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

উল্লিখিত চারিটি প্রবাদ-প্রমাণের বলেই দেখা যাইতেছে যে খৃষ্টপূর্ব ৫৮ – ৫৬ অব্দে সংবৎ অব্দের প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য মহারাজ উজ্জয়িনী নগরে যে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা হিন্দু এবং জৈন শাস্ত্রগ্রন্থে সুস্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে। এই বিক্রমাদিত্য যে কালিদাসের বিক্রমাদিত্য, তাহার সেরূপ কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। তবে প্রাগুক্ত "জ্যোতির্বিদাভরণ" পুস্তকে এই উভয় প্রবাদ একত্র উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ সংবৎ প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য মহারাজই যে কবি কালিদাসের আশ্রয়দাতা বিক্রমাদিত্য, তাহাই উক্ত গ্রন্থে দৃঢ়তার সহিত লিখিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং কৃত্রিম বলিয়া গণ্য হইলেও একথা নিশ্চিত বলা যায় যে আমাদের দেশের চিরাগত প্রবাদ অবলম্বন করিয়াই কোন সাহসী পণ্ডিত এই পুস্তক লিখিয়া সেই প্রবাদকে ঐতিহাসিক সত্যের আকার দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং কৃত্রিম হইলেও উহা আমাদের পুরাতন ও পরম্পরাগত প্রবাদকে সমর্থন করিতেছে, সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পক্ষে এরূপ প্রাচীন প্রবাদ সকল সভ্য দেশেই সসম্মানে পরিগৃহীত হইয়া থাকে ; আমরা তাই কালিদাসের বিক্রমাদিত্যকে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দে সংস্থাপিত করিতেছি।

কালিদাসের "রঘুবংশে" হূণ জাতির উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ কবিকে খৃষ্টীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দে আনিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে হূণেরা ঐ সময়ের পূর্বে ভারতে প্রবেশ করে নাই (১৪)। এই সংবাদ কিন্তু সত্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ভারতের উত্তর দিকে (তিব্বতের পরপারে) হূণগণের অস্তিত্ব বহু পুরাতন (১৫) ; এমন কি মহাভারতে ও

(১৪) *The Cambridge History of India*, Vol I, p 304.

(১৫) *The Outline of History* by H. G. Wells (1920) Book III, pp 101—102.

মহাপুরাণাদিতেও উহাদের উল্লেখ দেখা যায় (১৬)। এরূপ অবস্থায় কোন পুস্তকে কেবল হূণদিগের উল্লেখ দেখিয়াই তাহার লেখককে খৃষ্টীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দে আনয়ন করা কখনই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

ভারতের পৌরাণিক ইতিহাসের আলোচনায় বিক্রমাদিত্যের স্থান কোথায়, তাহার নির্দ্দেশ এক গুরুতর ব্যাপার; আশা করি ভবিষ্যতে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার অবসর পাইব। এক্ষণে এবিষয়ে সুধী সমালোচকগণের আলোচনার জন্য প্রার্থনা করত আপাততঃ বিদায় লইতেছি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

"সে" আর "এ"।

'সে' ছিল বাঁশরী বাঁরোয়া-রাগিণী
উঠেছিল বুকে বাজি';
সাহানার সুরে 'এ' হৃদয় পুরে
বাজিয়া উঠেছে আজি।
'সে' ছিল ললিত কলার শিষ্য
সঙ্গীত অনুরাগী;
শিল্প জানে না রাগিণী ভাজে না
'এ' বুঝি নিখিল ত্যাগী,

(১৬) মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, নবম অধ্যায় ৬৬তম শ্লোক, সভাপর্ব, ৩২শ অধ্যায়, ১২শ শ্লোক, ৫১ম অধ্যায়, ২৪শ শ্লোক (বোম্বাই); বায়ুপুরাণ, ৪? অধ্যায়, ১১৬তম শ্লোক (বঙ্গবাসী); ইত্যাদি।

'সে' ছিল রক্ত-গোলাপ-কলিকা
গন্ধে আমোদি' ধরা ;
শুভ্র শেফালি শেষ আশা 'এ'র
মাটীতে ঝরিয়া পড়া।
'সে' ছিল দীপ্ত প্রখর তপন
যায় না তাহারে চাওয়া ;
'এ' যে সুধাকর সুধার আকর
সহজ ইহারে পাওয়া।
'সে' ছিল ভোগের নন্দন-ফুল
অবসাদে গেছে ঝরে ;
'এ' দেছে ত্যাগের সেবায় সকলি
আপনা' রিক্ত করে।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

প্রাচীন প্রসঙ্গ।

-:*:-

৺কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী।

কুড়িগ্রাম হইতে উলিপুর পর্য্যন্ত যে প্রকাশ্য রাজবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে, উহার মধ্যভাগে দুর্গাপুর নামক একটী গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী। পূর্ব্বে এই গ্রামে ১০।১২ ঘর ব্রাহ্মণ, ৪।৫ ঘর কায়স্থ ও এক ঘর ক্ষত্রিয়ের বসতি ছিল। কালের কঠোর আক্রমণে একে একে সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, বর্ত্তমানে কেবল এক ঘর ব্রাহ্মণ ও এক ঘর ক্ষত্রিয়ের বাস আছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণবংশ দুর্গাপুরের গোস্বামীবংশ বলিয়া খ্যাতি

লাভ করিয়াছে। এই বংশে ১২৩৪ সালে ৺কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺কৃষ্ণকান্ত গোস্বামী। কৃষ্ণকিশোর বাল্যকাল হইতেই স্বভাবতঃ নম্র ছিলেন। সাত বৎসর বয়সে একদিন জীবিত কৈ মৎস্য রন্ধনের জন্য কুটিতে দেখিয়া ইঁহার বাল্য হৃদয়ে বেদনা অনুভব হয় এবং তদবধি ইনি মৎস্য ভোজন পরিত্যাগ করেন। কৃষ্ণকিশোরের পিতা বিশেষভাবে শিক্ষিত ছিলেন। পিতার জীবিত অবস্থায় কৃষ্ণকিশোর সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ কাব্য পুরাণ সাংখ্য প্রভৃতি পাঠ শেষ করেন। ইনি কোনরূপ উপাধি প্রাপ্ত না হইলেও কোন পণ্ডিত সহসা ইঁহাকে বিদ্যাগৌরবে পরাভূত করিতে পারিতেন না।

(২)

কৃষ্ণকিশোর একদিকে যেমন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ অন্যদিকে তেমনি পরদুঃখকাতর ছিলেন। পরের দুঃখ দেখিতে তাহার হৃদয় বিগলিত হইত। ইনি প্রাণমন দিয়া বিপন্ন ও আর্ত্তের সেবা করিতেন।

২৮ বৎসর বয়সে কৃষ্ণকিশোরের পিতার মৃত্যু হয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার জননী পরলোক-গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার নিয়মিত শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে কৃষ্ণকিশোর দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত পদব্রজে বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, মথুরা, ব্রহ্মকুণ্ডে প্রভৃতি তীর্থদর্শন করিয়া ইনি পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যে সময়ে ইনি ব্রহ্মকুণ্ডে গমন করেন, তৎকালে জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণকিশোর ইঁহার নিকট যোগাভ্যাস শিক্ষা করেন এবং অবশেষে ইঁহারই আদেশে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কৃষ্ণকিশোর স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসীর সঙ্গত্যাগ করেন নাই। একদিন কৃষ্ণকিশোরকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া সন্ন্যাসী রাত্রিযোগে কোথায় অদৃশ্য হন। কৃষ্ণকিশোর বহু অনুসন্ধানেও সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ না হওয়ায় অনিচ্ছায় গৃহে প্রত্যাগমন করেন, জন্মপল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কৃষ্ণকিশোর দেখিলেন, গৃহাদি সমস্তই জীর্ণ হইয়া গিয়াছে—কেবল ৺মদনগোপাল বিগ্রহের মন্দির পূর্ব্বাবস্থায় আছে। বাটীর ভৃত্যাদি সমস্তই চলিয়া গিয়াছে—কেবল পূজক ঠাকুর যথারীতি মদনগোপালের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

(৩)

কৃষ্ণকিশোরের পিতার, কোচবিহার, রংপুর, ধুবড়ী প্রভৃতি জেলায় দশ এগার শত শিষ্য ও দেড়শত দুইশত টাকা আদায়ের নিষ্কর সম্পত্তি ছিল। কৃষ্ণকিশোর বাটী আসিয়া সম্পত্তির কোনরূপ সুবন্দোবস্ত করিলেন না—প্রজারা স্বেচ্ছায় যে খাজনা প্রদান করিত তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন এবং তদ্দ্বারা বিগ্রহ সেবা, অতিথিসংকার প্রভৃতি সৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

কৃষ্ণকিশোর এই সময়ে শিষ্যবাটীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। শিষ্যেরা স্বেচ্ছায় যিনি যাহা প্রদান করিতেন, তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই গ্রহণ করিতেন এবং সেই অর্থ যথারীতি বিগ্রহ সেবা ও অতিথিসংকারে ব্যয় করিতেন।

গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, আত্মীয় স্বজন ও শিষ্যমণ্ডলী তাহাকে পুনঃ পুনঃ বিবাহের জন্য অনুরোধ করিলেও তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই ;—অবশেষে কুচবিহারাধিপতির আত্মীয় কুমার ভৈরবনারায়ণ সাহেব স্বয়ং দুর্গাপুরে উপস্থিত হইয়া এক পাত্রী ঠিক করিয়া বিবাহ দিলেন। তিনি একজন ভক্ত শিষ্যের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না! কিন্তু এই বিবাহ তাঁহার সুখের কারণ হইল না। বিবাহের অল্পদিন পরেই কৃষ্ণকিশোর স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া পুনরায় বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তথায় একমাস অবস্থান করিয়া তিনি বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কুমার ভৈরবনারায়ণ এই সময়ে দুর্গাপুরে উপস্থিত হইয়া গুরুদেবের বাটী ইষ্টকালয় করিয়া দিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলেন, "সংসারে কোন বিষয়ে তাঁহার আসক্তি নাই;—সুতরাং প্রস্তাবিত ইষ্টকালয় নিতান্তই অনাবশ্যক।"

বিবাহের ছয়বৎসর পরে তাহার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বালকের পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি কামাখ্যাদেবী দর্শনে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তিনি শুনিলেন যে পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। এই দুঃসংবাদে কৃষ্ণকিশোর কিছুমাত্র কাতরতা প্রদর্শন না করিয়া প্রগাঢ়ভাবে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কৃষ্ণকিশোরের ক্রমে ক্রমে ৪ পুত্র ও ২ কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এক এক তীর্থ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উহাদিগের এক একটি মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই জন্য তাহার সহধর্ম্মিণী সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে স্বধর্ম্মানুসারিণী করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু সমর্থ হন নাই।

কৃষ্ণকিশোর অসামান্য ধর্ম্মভীরু ছিলেন। একদা তিনি শিবালয়ে গমন কালে দেখিতে পান, জনৈক মহাজন এক অধমর্ণকে টাকা কর্জ্জ দিতেছে। মহাজনের বাটীর প্রাঙ্গণ দিয়া গমন পথ ছিল। গমনকালে কৃষ্ণকিশোর মহাজনের কুশল জিজ্ঞাসা করেন এবং তৎপ্রসঙ্গে এই কর্জ্জ টাকার বিষয় অবগত হন। যথাকালে অধমর্ণের বিরুদ্ধে আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে মহাজন কৃষ্ণকিশোরকে সাক্ষী মান্য করিলেন, কৃষ্ণকিশোর বিশেষ কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাজনকে বলিলেন, তিনি সাক্ষ্য দান করিতে পারিবেন না। সাক্ষ্য দান কালে যদি কোন ক্রমে একটা মিথ্যাবাক্য তাহার মুখ হইতে বহির্গত হয়, তবে তাঁহাকে নিরয়গামী হইতে হইবে। মহাজন কৃষ্ণকিশোরের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না। যথাকালে তাহার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। কৃষ্ণকিশোর তথাপি আদালতে উপস্থিত হইলেন না। অবশেষে সরকার হইতে তাঁহার ভূসম্পত্তি বিক্রীত হইল; তথাপি আদালতে উপস্থিত হইতে সম্মত হইলেন না।

কৃষ্ণকিশোর অনেক দরিদ্র লোককে স্ত্রী পুত্র সহ আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং নিজে তাহাদের ভরণপোষণ করিতেন।

কৃষ্ণকিশোর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া বাটীর পশ্চাদ্ভাগে ব্রাহ্মণী নদীতে স্নান ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। অতঃপর ঈশ্বর বিষয়ক স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে ৺মদনগোপাল বিগ্রহের মন্দিরে প্রবেশ করিতেন এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে মধ্যাহ্নকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় স্নান করিতেন। স্নানান্তে বাটী আসিয়া কোন অতিথি আগমন করিয়াছে কিনা তাহার অনুসন্ধান করিতেন। অতিথি অভ্যর্থনান্তে ইনি জপতপে নিযুক্ত হইতেন। বেলা অনুমান তুইঘটিকার সময় সন্ধ্যাপূজাদি সমাপনান্তে স্বহস্তে হবিষ্যান্ন পাক করিয়া আহার করিতেন। তিনি নিজে সামান্য তসরের ধুতী পরিধান করিতেন। জামা, জুতা, ছাতা কিছুই ব্যবহার করিতেন না। শীতকালেও তাঁহার নামাবলী ব্যতীত তাঁহার আর কোন আবরণ ছিল না। তিনি তৈল মাখিতেন না। কৃষ্ণকিশোর বিশেষ ভাবে অতিথিপরায়ণ ছিলেন। যদি কোন দিন স্বেচ্ছায় কোন অতিথি উপস্থিত না হইত, তিনি রাস্তায় বসিয়া থাকিতেন এবং পথের লোককে গৃহে লইয়া গিয়া সযত্নে ভোজ্যদ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক অতিথির ভোজনান্তে স্বয়ং আহার করিতেন।

লোক মুখে শুনিতে পাওয়া যায় গভীর রাত্রিকালে সমস্ত লোক নিদ্রিত হইলে ইনি ব্রাহ্মণী নদীর শ্মশানে অথবা বাটীর প্রাঙ্গনের নিম্ববৃক্ষের নিম্নে উপবেশন পূর্ব্বক সাধনা করিতেন। অদ্যাপি সেই নিম্ববৃক্ষ দুর্গাপুরে বিদ্যমান আছে। এরূপ সুবৃহৎ নিম্ববৃক্ষ রঙ্গপুরের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণকিশোরের পুত্রকন্যাগণ একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী একদা প্রকাশ করেন যে তাঁহার জপতপ ও অলৌকিক আচরণের ফলেই এই সকল অমঙ্গল হইতেছে। কৃষ্ণকিশোর ইহা শ্রবণ মাত্র নিতান্ত দুঃখিতান্তকরণে সহধর্ম্মিণীকে বলেন, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিলে, আমি যে পুত্রের আকাঙ্ক্ষায় এতকাল জপতপ ও সাধনা করিয়া আসিলাম, তুমি অবশেষে তাহারই অন্তরায় হইলে! এই সময় হইতে তাঁহার দেবোপম কান্তি বিলীন হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে তাঁহার গলার অভ্যন্তরে ক্ষত হইল এবং স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এই অবস্থায়ও তিনি একদিনের জন্যও তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। তিনি কোনরূপ ঔষধাদি ব্যবহার করিতেন না। পীড়িত অবস্থায় তিনি বলিয়া ছিলেন, আমার বংশ থাকিবে, কিন্তু এই ব্যাধি আমার কাল হইবে। দারপরিগ্রহ পাপের ফলে আমাকে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। কৃষ্ণকিশোরের তেজঃপুঞ্জ কলেবর দর্শনে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই তাহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিত এবং তিনিও সকলকে সন্তানের ভক্তি করিতেন।

কৃষ্ণকিশোরকে যাহারা দেখিয়াছেন, এরূপ অনেক লোক অদ্যাপি জীবিত আছেন। দারুণ গলক্ষতে আক্রান্ত হইবার পর তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি ইহার নাম কৃষ্ণগোপাল রাখিয়াছিলেন। দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে জন্ম বলিয়া ইহার অন্য নাম, "দুঃখী" রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইহার বয়স ৩৪ বৎসর। কৃষ্ণগোপালের জন্মের ২ বৎসর পরে কৃষ্ণ চৈতন্য নামক ইঁহার অন্য এক পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্রের সপ্তবর্ষ বয়ক্রম কালে ১২৯৮ সালের ৪ঠা ফাল্গুন তিনি পরলোক গমন করেন।

শ্রীকেশবলাল বসু।

[উত্তর বঙ্গের প্রাচীন কাহিনী "পরিচারিকায়" ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইবে। যদি কেহ এই বিষয়ে উপকরণ সংগ্রহে লেখককে সহায়তা করেন, কিংবা আলোচ্য প্রসঙ্গে কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদ লক্ষ্য করেন, উহা লেখককে অনুগ্রহ প্রকাশে জানাইলে লেখক পরম উপকৃত হইবেন।]

ব্যথার দান।

—:o:—

প্রভাতের মালা ঝরে গেছে হায় উৎসব-হীন রজনী,
দীপ নিভে যায় পথে চলি একা আঁধারে আবরে ধরণী ;
তাই হোক্ ওগো তাই হোক্—
আমার বাসনা আমার মাঝারে রচিবে নিত্য অমর-লোক !
মধুরাত কত বৃথা চলে গেল ছিলে কি গো তুমি পাসরি' !
আমার বিজন জীবন-কুঞ্জে বাজিল না তবু বাঁশরি !
দুখ-রজনীর চির-তমসায়,
নাহি জানি মন কোথা ভেসে যায়—
কোন সুদূরের তৃষায় কাতর ক্ষণে ক্ষণে ওঠে শিহরি' !
নিজ হাতে আমি যে মালা তোমারে দিয়েছিনু প্রিয় পরায়ে,
দলগুলি তার খসে গেচে বলে নাও নি যতনে কুড়ায়ে ;
ক্ষতি নাই ওগো, ক্ষতি নাই ;
স্মৃতির উজল মণিময় হারে নন্দনে তারা লভিবে ঠাঁই !
প্রাণের গোপন রক্ত-বেদনা হে নিঠুর ! তব আঘাতে,
ব্যথার বিলাপে লাল হয়ে ওঠে কি যে কমনীয় শোভাতে ;
সার্থক করি' ফুটে ফুটে রয়,
প্রেমের গোলাপ কণ্টকময়—
প্রণয় পূজায় যে মালা সঁপেচি আমার জীবন-প্রভাতে !

শ্রীসরোজকুমার সেন।

অন্তঃপুর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মারীর প্রবেশ।

মারী। তারা আসছে…ঠাকুর্দ্দা…

বৃদ্ধ। কে? তুই—কোথায় তারা?

মারী। ওধারকার পাহাড়ের তলায় তারা এসে পড়েছে…

বৃদ্ধ। তারা কি একটিও কথা না বলে আস্‌ছে?

মারী। আমি তাদের বলেছি—সেই কচি আত্মাটির জন্য নীচু গলায় ভগবানকে ডাকতে… মার্থ তাদের সঙ্গে আস্‌ছে ‥

বৃদ্ধ। তারা কি সংখ্যায় বহু?

মারী। যারা বয়ে নিয়ে আস্‌ছে—তাদের চারদিকে সারা গাঁয়ের লোক এসে জুটেছে… কয়েকটা মশাল জ্বালিয়ে ওরা আলো করেছিল…আমি ওদের বলেছি ওগুলো নিবিয়ে ফেল…

বৃদ্ধ। কোন পথে তারা আস্‌ছে?

মারী। ছোট্ট গলির পথে—ধীর চলনে তারা আস্‌ছে…

বৃদ্ধ। এখনই সময়…

মারী। তুমি ওদের বলেছ, ঠাকুর্দ্দা?

বৃদ্ধ। তুমি ত স্পষ্টই দেখ্‌ছ—কিচ্ছু আমরা বলিনি…ওরা এখনও নিরুদ্বেগে প্রদীপের তলায় বসে আছে…দেখ, চেয়ে দেখ, জীবন রহস্যের একটা দিক দেখ্‌তে পাবে…

মারী। কেমন স্তব্ধ হয়ে ওরা বসে আছে…কে যেন বলছে আমায়—ওরা স্বপ্ন দেখ্‌ছে…

বিদেশী। চেপে যাও—বোন দুটিকে হঠাৎ কেঁপে উঠ্‌তে আমি দেখেছি…

বৃদ্ধ। ওরা উঠেছে…

বিদেশী। আমার বিশ্বাস ওরা জানলার ধারে আস্‌ছে…

(যে দুটি বোন এতক্ষণ কথাবার্ত্তা বল্‌ছিল তাদের মধ্যে একজন উঠে সেই সময় প্রথম জানলার ধারে এল—আর একজন তৃতীয় জানলায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল…তারপর হাত দুখানি তাদের জানলার কাচের উপর রেখে অন্ধকারের দিকে বহুক্ষণ চেয়ে রইল)

বৃদ্ধ। মধ্যেকার জানলার ধারে কেউ আসেনি !…

মারী। ওরা দেখ্‌ছে…ওরা শুনছে…

বৃদ্ধ। ওদের বড়টি—তার পানে চেয়ে হাস্‌ছে যাকে ও দেখ্‌তে পাচ্ছে না।

বিদেশী। কিন্তু ছোটটির চোখ দুটি কি যেন ভয়ে ভরা।

বৃদ্ধ। সামলে যাও…কেউ জানে না মৃত আত্মা কতক্ষণ ঘরে তার আত্মীয়দের পাশে ঘোরাঘুরি করে।

(মারী গুঁড়িসুড়ি মেরে বৃদ্ধের পোষাকের পিছনে লুকাল ও তাঁকে জড়িয়ে ধরল।)

মারী। ঠাকুর্দ্দা।

বৃদ্ধ। ভয় পাস্ না খুকী…আমাদেরও একদিন এই দশা।

বিদেশী। ওরা অনেকক্ষণ চেয়ে আছে।

বৃদ্ধ। ওরা একশ হাজার বৎসর চেয়ে থাক্‌বে কিন্তু কিছু দেখ্‌তে পাবে না…কি ভীষণ অন্ধকার রাত্রি…ওরা এধারে চেয়ে আছে কিন্তু দুর্ভাগ্য ওধার দিয়ে আস্‌ছে।

বিদেশী। ওরা এধারে যে চেয়ে রয়েছে খুব ভালই হয়েছে…আমি বল্‌তে সাহসী হব না—প্রান্তরের ধার দিয়ে এধার পানে ক্রমাগত কি এগিয়ে আস্‌ছে।

মারী। আমি বল্‌তে পারি…জনসঙ্ঘ…তারা এখনও এত দূরে আছে যে তাদের কচিৎ চেনা যাচ্ছে।

বিদেশী। পথের উপর দিয়ে যে আঁকা বাঁকা স্রোত বয়ে আস্‌ছে—ওরা সকলেই তারই টানে টানে আস্‌ছে—ঐ দেখা দিয়েছে—বাঁকের মোড়ে—চাঁদের আলোয় আলোয় উজ্জ্বল।

মারী। একেবারে অগণ্য যে…আমি আস্‌বার পরেও ওরা দল আরও পুরু করেছে…সহরের সব নিকর্ম্মারা এসে জুটছে আরও একটা বাঁক ওদের ঘুর্‌তে হবে।

বৃদ্ধ। সকল ধাঁধা ডিঙিয়ে ওরা আসছে—এবার ওদের দেখ্‌তে পাচ্ছি…প্রান্তরটি তাড়াতাড়ি পার হয়ে এসেছে…ওরা এত ছোট দেখাচ্চে যে ঝোঁপ ঝাড়ের আড়ালে ওদের দেখ্‌তে পাওয়াই ভার…লোকে বলে চাঁদের আলোতে কোন রাজ্যের শিশুরা সব খেলে বেড়ায় তারা যদি আজ ওদের দেখে বুঝ্‌তেই পার্ত্তো না কিছু…ওদের দেখেই তাঁরা ছুটে পালাবে… প্রত্যেক পা ফেল্‌ছে, আর ওরা এগিয়ে আসছে—যেন গত দুই ঘণ্টা যাবৎ দুঃসংবাদটিই সঞ্চিত হয়ে বহুল হয়ে উঠিছে…ওদের সাধ্য নাই যে ভিড় ছেড়ে নড়ে…যারা বয়ে নিয়ে আস্‌ছে তাদেরও সাধ্য নাই যে হঠাৎ থেমে যায়…দুঃসংবাদটি ওদের পেয়ে বসেছে—প্রভুকে যেমন চাকরেরা বয়ে নিয়ে আসে ওরা তাই কচ্ছে…দুঃসংবাদটি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করেছে, ওরা সেই পথ ধরেছে…দেখ, দুঃসংবাদ চল্‌তে আরম্ভ কর্লে কখনও শ্রান্তি মানে না—বুনো মোষের মতন—সে একরোখা… ওদের সমস্ত শক্তি আজ দুঃসংবাদটির কবলে পড়েছে…ওরা দুঃখিত হচ্ছে খুবই কিন্তু তবুও আস্‌ছে…ওদের হৃদয় ফেটে যাচ্ছে কিন্তু না এগিয়ে উপায় নেই।

মারী। বড় বোনটি আর হাস্‌ছে না, ঠাকুর্দ্দা…

বিদেশী। ওরা জানলার ধার হতে সরে গেল…

মারী। ওরা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে…

বিদেশী। বড় বোনটি ঘুমন্ত শিশুটির কোঁকড়ানো চুলের উপর চুমো খেল—কিন্তু খোকাটি জাগে নি…

মারী ঘরের কর্ত্তাটি ইসারায় দেখাচ্ছেন—যেন ওরা যেয়ে তাঁর গলাও জড়িয়ে ধরে…

বিদেশী। কিন্তু এখনও কি নিস্তব্ধতা…

মারী। বোন দুটি আবার মায়ের কাছে ফিরে এল…

বিদেশী। ওদের বাবা প্রকাণ্ড ঘড়ীটির দোলকটি—মাথা নেড়ে, নেড়ে দেখাচ্ছেন…

মারী। সকলে বল্‌বে যে, ওরা কি কচ্ছে না জেনেও প্রার্থনা করে…

বিদেশী। সকলেই বল্‌বে যে ওরা অন্তরের রহস্য-ধ্বনি কাণ পেতে শোনে…

মারী। ঠাকুর্দ্দা, আপনি আজকার সন্ধ্যায় কিছু বল্‌ছেন না ত!…

বৃদ্ধ। তুমিও সাহস হারাচ্ছ……আমি জানতুম ওদের দিকে তাকানো উচিত হবে না……আমার প্রায় তিরেনী বৎসর বয়েস হ'ল কিন্তু জীবনে এই প্রথম জীবনের

একটা বিশেষ দৃশ্যে আমার অন্তরে যা লাগ্‌ল······আমি জানি না—কেন, ওরা আজ যা, যা কচ্ছে আমার কাছে সেই সব মহা বিস্ময়কর, গভীরার্থ-দ্যোতক বলে বোধ হচ্ছে··· রাত্রির অপেক্ষায় ওরা বসে আছে—নেহাৎ সাধারণ ভাবে—প্রদীপের আলোর নীচে, যেমন অমরা আমাদের বাড়ীতে —বসে থাকি আমাদের প্রদীপের আলোতে······ কিন্তু ওরা যা' জানে না—কুশাঙ্কুরের মত একটু সত্য—তা' আমি জানি·········জানি বলেই আমি যেন ওদের আজ দেখেছি একটা অপর জগতের শীর্ষে দাঁড়িয়ে···এই কি নয়? না হ'লে, তোমাদের মুখও কেন ভয়-বিহ্বল হয়ে গেল? আমি জানতুম না জীবনের অন্তরের অন্তরালে এমন একটা অনন্ত, গুপ্ত বেদনা আছে যার দিকে নজর পড়ে কি যেন একটা ভীতি, যাদের নজরে পরে, তাদের পেয়ে বসে···তবে, ওদের অমন স্তব্ধ, অবিচলিত দেখে যতক্ষণ আমি চুপ করে থাকব, কিছু ঘটবে না···এই জগতের উপর ওরা কত বিশ্বাসী!···ওরা ওখানে রয়েছে, জানালার ক্ষীণ আবরণের আড়ালে—মনে হচ্ছে যেন জগতের সব শত্রুতার বাইরে···ওরা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বসে ভাবছে—কোন বিপদ ঘটবে না কিন্তু জানি না, মানুষের মন সর্ব্বদাই কত বিপদ ডেকে আনতে পারে···আর দরজার বাইরেই সব পৃথিবী শেষ হয় যায় নি···ওরা ওদের ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে এতই নিশ্চিন্ত—আর কেউ ওদের বিষয় যে কিছু বেশী জানে, ওরা ভাবেই না···আমি—এই বুড়োই, ওদের দরজার দু' পা দূরে দাঁড়িয়ে ওদের সব সুখ ও শান্তি আমার এই বৃদ্ধ হাত দু'খানির ভিতর ধরে আছি তবে আমি সাহস কর্চ্ছি না বাড়াতে ....

মারী। করুণা কর ঠাকুর্দ্দা···

বৃদ্ধ। ওদের উপর করুণা ত কর্চ্ছি, খুকী আমাদের উপর করুণা কেউ করে না···

মারী। কাল বলো, ঠাকুর্দ্দা, যখন সকাল বেলায় আলোতে জগত পূর্ণ হয়ে উঠবে···তখন হয় ত ওদের অতটা দুঃখিত দেখা যাবে না···

বৃদ্ধ। বোধ হয় তুমি ঠিকই বলেছ অন্ধকার রাত্রির মত চেপে যাওয়াই ভাল···আলো সন্তাপের মনোহরণ কর্ত্তে পারে···কিন্তু কেমন করে কাল পর্য্যন্ত ফেলে রাখ্‌ব? দুঃসংবাদের ত ভয় সয় না যাহারা ইহার দ্বারা বিচলিত হচ্ছে, অপরিচিত অনাত্মীয়দিগের সম্মুখেও তারা ইহা প্রচার কর্ব্বে···যার ইচ্ছা বলুক যেয়ে—এই বলে ফেলে রাখতে তারা মোটেই পছন্দ কর্ব্বে না···আমরা কিছু চুরি করে যেন গোপন করেছি—এইরূপই বোধ হবে···

স্বদেশী। ইতস্ততঃ কর্ব্বার আর সময় নেই···ওদের সমবেত কণ্ঠে মর্শ্মের ধ্বনি আমার কানে এসেছে···

মারী। ওরা ঐ ওখানে···নীচু বেড়ার পিছন দিয়ে—আস্‌ছে···

(মার্থের প্রবেশ)

মার্থ। আমি এসেছি। ঐখানটা পর্য্যন্ত ওদের নিয়ে এসেছি। পথের উপর প্রতীক্ষা কর্ত্তে ওদের বলে এসেছি—(ছোট ছেলেদের কান্না শুনা গেল) আঃ—ছেলেগুলো এখনই কাঁদতে সুরু করে দিয়েছে······ওদের আস্‌তে মানা করেছিলুম···কিন্তু ওরাও দেখ্‌তে চায় আর ওদের মায়েরা শুন্‌ল না······আমি ওদের বল্‌তে যাচ্ছি···না—ওরা চুপ করেছে···সবই তৈয়ার? যে ছোট্ট আংটিটি তার হাতে পাওয়া গিয়াছিল আমি সেটা এনেছি···আমি নিজে ওকে দোলায় শুইয়ে দিয়েছি······যেন ঘুমুচ্ছে—অনেক বেগ পেতে হয়েছে আমায়···ওর চুলের বোঝা গোছানই তার······কতকগুলি ভায়োলেট্ ফুল কেবল তুলেছি বড়ই কষ্টের কথা অন্য কোন ফুল ফোটেনা······এখানে তোমরা কি কর্চ্ছ? ওদের কাছে যাওনি কেন? (জানালার ভিতর দিয়ে ওদের দেখে) ওরা কাঁদছে না ত? ওরা···এখনও বলনি বুঝি?

বৃদ্ধ। মার্থ, মার্থ—তোমার শিরায়-শিরায় জীবনের প্রবাহ বেগে বইছে, তুমি বুঝতে পার্ব্বে না···

মার্থ। কেন বুঝতে পার্ব্ব না? (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে—তিরস্কারের গম্ভীর কণ্ঠে) তুমি ইহা কর্ত্তে পার না, ঠাকুর্দ্দা······

বৃদ্ধ। মার্থ—তুমি জান না······

মার্থ। আমি নিজেইত এসে বল্‌তে চেয়েছিলাম······

বৃদ্ধ। খুকী, একটু অপেক্ষা কর একবার চেয়ে দেখ···

মার্থ। কত দুর্ভাগা ওরা···কিন্তু আর অপেক্ষায় থাকৃতে পারে না···

বৃদ্ধ। কেন?

মার্থ। আমি জানি না···কিন্তু ইহা অসম্ভব···

বৃদ্ধ। এখানে এস, খুকী···

মার্থ। কি ভীষণ ওদের ধৈর্য্য···

বৃদ্ধ। এখানে এস খুকী…

মার্থ। (ঘুরে) কোথায় তুমি, ঠাকুর্দ্দা…হঠাৎ চোখে এত জল এসেছে…তুমি কোথায়… আর দেখ্‌তে পাচ্ছিনা আমি—হাঁ—কি কর্ত্তে হবে জানি না…

বৃদ্ধ। আর দেখো না কথাটা ওদের জানান উচিত ?…

মার্থ। তোমার সঙ্গে আমি ওখানে যাব…

বৃদ্ধ। না, মার্থ, এখানেই থাক…ঘরের দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে, পাথরের ঐ প্রাচীন বেঞ্চে তোমার বোনের ধার ঘেঁসে বোস—ওদিকে আর তাকিয়োনা……নেহাৎ কচি বয়েস তোমার, তুমি হয় ত কখনও ভুলতে পার্ব্বে না…মৃত্যু যখন ধীরে, ধীরে, এসে নয়ন দুটি অধিকার করে লয় তখনকার তার মুখের চেহারা তুমি জান না…হয় ত ওখানে ক্রন্দন ধ্বনি উঠ্‌বে…তুমি ফিরে তাকিয়ো না…হয় ত ওখানে কিছুই ঘটবে না…সাবধান, কোন কিছু না শুন্‌লে মুখ ফিরিয়োনা… দুঃসংবাদের কি যে প্রতিক্রিয়া হ'বে, আগে ভাগে কেউ জানে না…হয় ত চাপা গলায় ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি প্রথমেই শুনতে পাওয়া যাবে আর ইহা ত চিরকালের ধরণ…আমি নিজেও জানি না কি করা উচিত হবে যখন ওদের দীর্ঘশ্বাসের চাপাকান্না আমার কানে আস্‌বে……ইহা যেন আর এ' জীবনের ব্যাপার নয়…বুকে আয়, খুকী,—ওখানে রওনা হ'বার আগে……

(আলিঙ্গনে বদ্ধ হলেন)

(সমবেত কণ্‌ঠের মৃদু প্রার্থনা ধ্বনি ক্রমশঃই এগিয়ে আস্‌তে লাগল। জন সঙ্ঘের একদল বাগানে ঢুকিল। সকলেই শুনল—তাদের পদধ্বনি—তাদের নীচুগলায় ফিস-ফিসানি)

বিদেশী। (আগন্তুকদিগের দিকে চেয়ে) ওখানেই থাক—জানলার দিকে এগিয়ো না…… সে কোথায় ?

কৃষক। কি ?

বিদেশী। তারা—যারা বয়ে নিয়ে আস্‌ছে……

কৃষক। দরজার মুখের গলিতে তারা এসে পড়েছে……

(বৃদ্ধ রওনা হলেন। মার্থ ও মারী পাথরের আসনে বসে রইল—তাদের ঘাড় জানালার দিকে ফিরিয়ে। জনসঙ্ঘের অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল……)

বিদেশী। চুপ…কথা বলো না……

(বোন দুটির যেটি বড়—সে উঠল ও দরজার হুড়কা সরিয়ে দেবার জন্য দরজার দিকে গেল)

মার্থ। খুলে দিয়েছে ?

বিদেশী। না—বরঞ্চ বন্ধ করে দিল।

মার্থ। ঠাকুর্দা—ঢোকেন নি ?

বিদেশী। না…ও ফিরে মায়ের কাছে বসতে গেল…কেউ আর একটুকুও নড়ছে না… ছেলেটি অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

মার্থ। ছোট্ট দিদিটি আমার—তোমার হাত দুখানি আমার হাতে রাখ।

মারী ও মার্থ। (তারা পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ হ'ল ও চুমো খেল)

বিদেশী। কেউ দরজায় আঘাত করেছে নিশ্চিত…ওরা এক সঙ্গে সকলেই মাথা উঠিয়েছে…ওরা দেখ্‌ছে।

মার্থ। দিদি, দিদি—আমার কান্না পাচ্ছে।

(বোনের কাঁধে মাথা রেখে কান্না চাপতে লাগল)

বিদেশী। আমার দরজায় আঘাত করেছে…ঘরের কর্ত্তা ঘড়ীর দিকে তাকাচ্ছিলেন… এই উঠ্‌লেন।

মার্থ। দিদি, দিদি…ওখানে ঢুকতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে…ওরা একলা থাকতে পার্ব্বে না।

মারী। মার্থ, মার্থ।

(ওকে টেনে থামাল)

বিদেশী। ঘরের কর্ত্তা দরজার কাছে এসেছেন…হুড়কো টেনে খুলছেন…ধীরে, ধীরে— অতি সতর্কতার সহিত।

মার্থ। ওঃ—তুমি তাদের দেখছ না।

বিদেশী। কাদের ?

মার্থ। যারা বয়ে নিয়ে আসছে।

বিদেশী। একটু খুলেছেন…আমি কেবল সবুজ মাটির একটা কোনও কোয়ারার খানিকটা দেখ্‌ছি…এখনও দরজা ধরে আছেন, এই সরে গেলেন…তাঁর মুখ দেখে বোধ হ'ল তিনি যেন

বলছেন—"আঃ তুমি"···হাত উঠালেন···অতি সতর্কতার সহিত দরজা বন্ধ করে দিলেন··· তোমার ঠাকুর্দ্দা ভিতরে ঢুকেছেন।

(জনতা ক্রমশঃ জানলার ধারে গিয়ে জমল। মার্থ ও মারী প্রথমতঃ আসন হ'তে একটু, তারপর আরও ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে বসল—পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে···দেখা গেল, বৃদ্ধ কক্ষের ভিতর এগোচ্ছেন। মৃতার বোন দুটি উঠে দাঁড়াল; ঘরের কর্ত্রীও উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু উঠবার আগে ঘুমন্ত শিশুটিকে যে চেয়ার ছেড়ে তিনি উঠেছেন, সেথায় যত্নের সহিত শুইয়ে এলেন; সুতরাং বাহির হ'তে দেখা যাচ্ছিল ছোট্ট খোকাটি আরাম কেদারায় মাঝে বরাবর দিব্যি ঘুমিয়ে আছে কিন্তু ঘাড় তার একদিকে হেলান। কর্ত্রী ঠাকরুণ বৃদ্ধের দিকে গেলেন ও হাত এগিয়ে দিলেন কিন্তু বৃদ্ধ তাঁর হাত ধরবার ফুরসুৎ পাবার আগেই, তিনি হাত টেনে নিলেন। বড় বোনটি আগন্তুকের আংরাখাটি টেনে খুলে আর ছোট বোনটি তাঁর দিকে একটি চেয়ার ঠেলে দিল। কিন্তু বৃদ্ধ ছোট্ট একটু ইঙ্গিতে নিষেধ কর্লেন। ঘরের কর্ত্তা কেমন যেন অবাক হয়ে হাস্‌তে লাগলেন। বৃদ্ধ জানালার দিকে তাকাল।)

বিদেশী। উনি বলবার সাহস কর্লেন না···আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

(জনতার অস্ফুট কলরব)

বিদেশী। চুপ কর তোমরা।

(জানালাগুলির ধারে বহুসংখ্যক ভিড় দেখে, বৃদ্ধ এ ধারে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্লেন। বড় মেয়েটি পুনর্ব্বার তাঁর দিকে চেয়ারটি ঠেলে দিল। তিনি এই বার বসে পড়লেন······ বসে, ডান হাতখানি বার বার কপালের উপর বুলা'তে লাগলেন।)

বিদেশী। তোমার ঠাকুর্দ্দা বসেছেন।

(কক্ষের অপরাপর সকলেই আয়েস করে বসল···এদিকে ঘরের কর্ত্তা মেলাই কথা বল্‌তে লাগলেন। খানিক বাদে বৃদ্ধ মুখ খুল্লেন—তাঁর কণ্ঠস্বর সকলের মনোযোগ আকর্ষণ কর্ল, কিন্তু ঘরের কর্ত্তা তাঁহাকে বাধা দিলেন। বৃদ্ধ তবুও বল্‌তে চেষ্টা কর্লেন···ক্রমে, ক্রমে সকলেই তাঁর কথা বুঝবার চেষ্টা কর্ল। ···এমন সময়, হঠাৎ কর্ত্রী ঠাকরুণ চমকে উঠে, উঠে দাঁড়ালেন।)

মার্থ। ও—ঘরের কর্ত্রী বুঝতে পেরেছেন।

(তিনি মুখ ফিরালেন ও দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেল্লেন। জনতার বহুল কণ্ঠ হ'তে রকমারী আওয়াজ আস্‌ছিল। ক্রমেই জনতা বিশৃঙ্খল হয়ে পর্চ্ছিল। শিশুগুলি কাঁদছিল এইজন্য ওরা তাদের উঁচিয়ে ধর্ত্তে বল্ল, যেন কি হচ্ছে ওরাও দেখ্‌তে পায়···মা'রা অনেকেই ইহা করে'ন।)

বিদেশী। চুপ—উনি আর কিছু বলছেন না।

(সকলেই দেখ্‌তে পেল ঘরের কর্ত্রী অত্যন্ত বেদনার সহিত বৃদ্ধকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন কচ্ছে'ন। বৃদ্ধ আরও কয়েকটি কথা বল্লেন···তখন হঠাৎ সকলেই উঠে এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল এবং প্রশ্ন কর্ত্তে লাগল। তখন তিনি মাথা নেড়ে, নেড়ে অতি কষ্টে কি যেন স্বীকার করে'ন।)

বিদেশী। উঁনি বলেছেন—অতি অকস্মাৎ বলেছেন।

জনতা। উঁনি বলেছেন···বলেছেন।

বিদেশী। কেউ শোনে নি।

(বৃদ্ধ উঠ্‌লেন; এবং মুখ না ফিরিয়ে অঙ্গুলী দিয়ে তাঁর পিছনকার দরজাটি দেখালেন। ঘরের কর্ত্তা, কর্ত্রী, ছোট মেয়ে দুটি, সকলে একসঙ্গে এসে দরজার উপর আছ্‌ড়ে পর্ল্‌···সুতরাং ঘরের কর্ত্তা দরজাটি তৎক্ষণাৎ খুলতে পারে'ন না···বৃদ্ধ, কর্ত্রীকে বেরুবার মুখে আটকাচ্ছেন।)

জনতা। ওরা বেরিয়েছে······বেরিয়েছে······

(সারা বাগান জোড়া একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। সকলেই বাড়ীর ওদিক পানে ঝুঁকে পর্ল্‌ এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল—কেবল বৈদেশিক জানলার নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওদিকে, ঘরের দরজাটি একদম খুলে গিয়েছে আর ঘরের ভিতরকার সকলে একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন··· তখন সকলে দেখল, মুক্ত দরজা দিয়ে—তারার ভরা নীলাকাশ, সবুজে ঘাসে ভরা অন্তঃপুরের ছোট্ট মাঠখানি ও চাঁদের আলোর উজ্জ্বল জলযন্ত্রটি······ঘরের মাঝখানে কিন্তু আরাম কেদারার শুয়ে ছোট্ট খোকাটি দিব্যি নিরুদ্বেগে ঘুমুচ্ছে—যদিও খবরদারী কর্ব্বার তখন তথায় তার কেউ নাই······)

শ্রীফণীভূষণ রায়।

সমাপ্ত।

কবি কুমুদরঞ্জনের উদ্দেশে।

বসি' পল্লী-প্রকৃতির শ্যাম তরুতলে,
জ্যোৎস্না-বিধৌত এই বাসন্তী নিশায়
মনে পড়ে তব কাব্য,—আনন্দ উথলে,
প্রবেশি' শ্রবণ-পথে মরমে মিশায়।

(২)

নিভৃত পল্লীর অঙ্কে হে সৌম্য দুলাল,
সার্থক জনম তব—ধন্য জন্মভূমি;
শিরে ধরিয়াছ কীর্ত্তি-মুকুট-প্রবাল,
অমর অমিয়-সিন্ধু মথিয়াছ তুমি।

(৩)

বঙ্গভাষা-কুমুদিনী-হৃদয়রঞ্জন,
চন্দ্ররুচি-কান্তি-শান্ত প্রশান্ত নির্ভীক;
যতনে রচিলে বাণী-নয়ন-অঞ্জন,
সঙ্গীতে মোহিলে কুঞ্জে কল-কণ্ঠ পিক।

(৪)

এঁকেছ 'উদাসী'-ছবি শান্ত পল্লীশ্রীর,
প্রতি মানসের সরে শুভ্র 'শতদল' ;
'বন-তুলসী'র রাশি 'নূপুর' মঞ্জীর,—
একত্র শোভিছে শুভ্র চরণ-কমল।

(৫)

'বনমল্লিকা'র মালা গাঁথি' সযতনে,
কুতূহলে দিলে গলে 'বিশ্বদেবতার,
বাজাইলে 'একতারা' নিভৃতে গোপনে,
বিতরিল পল্লী'বীথি' স্বর্গ-গীতি-হার।

(৬)

শুনিলাম অজয়ের মৃদু কল-গানে,
তোমার কবিতা-ভাষ্য অমর-কাহিনী ;
সুদূর বাঁশীর সুরে যেই সুধা আনে,
সেই সুর সাধিয়াছে তব বীণাখানি।

(৭)

আলাপে-প্রলাপে তুমি সমান রসিক,
তুমিই হাসাতে পার প্রাণ-খোলা হাসি ;
স্নেহে প্রেমে আত্মজন—অথবা—অধিক,
বিনিময়—অবিজয়, শুধু ভালবাসি'

(৮)

হে কবি, নহেক এতো শুধু স্তুতি গান,
সে দিকে বধির কর্ণ আমি ভালো জানি ;
এযে মরমের কথা সহজিয়া দান,
এ যে তব বিজয়ের ভবিষ্যৎ বাণী।

(৯)

অনন্ত বসন্ত তব অদূরের পথে,
এসেছে—আভাস হের পূরব গগনে,
ঐ দেখ বৈজয়ন্তী স্বর্ণ-চূড় রথে,
বসিবে তরুণ রবি—এ শুভ লগনে।

শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়।

বিবিধ।

:০:

(সঙ্কলন)

মানুষ ও মেসিন।

যন্ত্রের উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাজ অনেক কমিয়া গিয়াছে। উৎপন্ন জিনিসের পরিমাণও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার ফল যে কি, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কলকারখানার অতিবিস্তৃতির পরিণাম যে কোথায় যাইয়া দাঁড়ায় তাহা বলা যায় না। হয়ত এই সভ্যতা আপনার ধ্বংস আপনিই আনিবে।

মেসিনে যত দ্রুত গতিতে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়, ব্যবহারে তাহা তত শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ; সুতরাং এই সকল সঞ্চিত শিল্পজাতের বিপুল ভার স্কন্ধে লইয়া সভ্য জাতি সমূহ পৃথিবীর বাজারে

[illegible]য়া বেড়াইতেছে। এক একটা মেসিন সহস্র সহস্র লোককে এক একটা কর্ম্মক্ষেত্র হইতে [illegible]তাড়িত করে। এই নিরুপায় লোকগুলি কর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে [illegible]কে। এইরূপে নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি,—নিত্য নূতন কর্ম্মের আবিষ্কার,—নিত্য নূতন [illegible]নযাত্রা প্রণালীর উদ্ভাবন হইতেছে।

আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি জুলিয়াস্ বার্নাস্ সম্প্রতি এই [illegible]য়ে তাঁহার অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েকটী বিশেষ শিল্প ব্যাপারে মেসিনের [illegible]লন কিরূপ বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, ও উৎপাদন শক্তি কিরূপ বিপুল মাত্রায় [illegible]ত করিয়াছে, কেবল তাহাই তিনি দেখাইয়াছেন। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিব, [illegible]নুষ ও মেসিনের এই সংগ্রামের মধ্যে মানুষের স্থান কোথায়!

প্রথমতঃ লৌহশিল্পের কথা। পূর্ব্বে যেখানে বিশ জন লোক "হাতে মাথায়" কাজ করিয়া মাল [illegible]লাস করিত এখন মেসিনে সেই কাজ দুইজন লোকে করিয়া থাকে। লৌহ গলাইবার উনুনে [illegible] চালিবার জন্য চৌদ্দ জনের স্থলে এখন মাত্র দুইজন লোকের প্রয়োজন হয়। হাতে ঢালাই [illegible]রিতে হইলে যেখানে ষাটজন লোক লাগে, কাষ্টিং মেসিনে অর্থাৎ কলে ঢালাই হইলে সে স্থলে [illegible] জন লোক হইলেই চলে। চার্জ্জিং মেসিন, ইলেকট্রিক ক্রেইন প্রভৃতি আরও নানা প্রকার [illegible]শলের প্রয়োগে ১৬৫ জন লোকের কাজ ১৪ জনের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ বস্ত্রশিল্প :—বস্ত্রবয়ন ও পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার কলে বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন [illegible]লীতে চৌদ্দ জন লোকের স্থানে একজন লোক কাজ করিতেছে।

তৃতীয়তঃ চর্ম্মশিল্প :—দশ জন লোক হাতে যে জুতা তৈয়ারী করিবে, একজন লোক মেসিনে [illegible]হা করে। তারপর কাচশিল্প একটা বোতল-তৈয়ারী করিবার কলে একজন মেসিনের লোক [illegible] জন হাতে কাজ করা লোকের সমান কাজ করিতে পারে। সার্সি কাচ তৈয়ারী করিবার [illegible]রখানায় মেসিনের সাহায্যে কাচ ফুঁকিলে, ৫০ গুণ অধিক পরিমাণ কাচ প্রস্তুত করা যায়। [illegible] খনিতে বোঝাই গাড়ী চালাইবার ও খালাস করিবার কাজে কুলির বদলে মেসিন [illegible]গাইয়া দেখা গিয়াছে ১৫০ জনের কাজ ১২ জনে করিতেছে। সিগারেট তৈয়ারী করিবার [illegible] ১৫ জন লোক যাহা হাতে করিবে, ৪ জন লোক তাহা মেসিনে করিতে পারে। [illegible] [illegible]ক, সাবান, সিগারেট, চিনি, ক্ষুরের ফলক প্রভৃতি জিনিস কাগজে জড়াইবার কালে একজন [illegible]রের মেসিনে কাজ চল্লিশ জনের হাতের কাজের সমান।

মিষ্টার বার্ণেশ বলেন সুবৃহৎ লোহার কারখানা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য রুটীর কারখানা পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্র হইতেই মেসিন এই প্রকারে মানুষকে সরাইয়া দিতেছে। এমন কি আফিসের কাজেও মেসিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে সুরু হইয়াছে। হিসাব, গণনা, টিকিট বিক্রয় প্রভৃতি কার্য্যেও মেসিনে মানুষের দশগুণ কার্য্য করে। বার্ণেশ কৃষি কার্য্যেও মেসিনের ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। অবশ্য ভূমিকর্ষণ, জলসেচন, বীজবপন, শস্য-কর্ত্তন প্রভৃতি কৃষি সম্পর্কিত ব্যাপারে যন্ত্রের প্রভাব সহজে ও সকল স্থলে কার্য্যকারী হয় না। মন্তারাণা কৃষিক্ষেত্রে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন একজন লোক কলের লাঙ্গলের দ্বারা এক দিনে ২২ একর জমি চাষ করিয়াছে। ২২ একর প্রায় ৬৬ বিঘার সমান। তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন পূর্ব্বে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সমস্ত জমি চাষ করিতে ১৩ কোটী দিন লাগিত, এখন মেশিনের সাহায্যে তাহা ৭০ লক্ষ দিনে হইবে।

আমেরিকাতে এত অধিক কলের প্রচলন হওয়াতে এত লোক কাজের বাহির হইতেছে, কিন্তু তাহারা "বেকার" বসিয়া নাই। পরন্তু তাহারা আবার নূতন নূতন কাজে লাগিয়া যাইতেছে। মানুষের মস্তিষ্কও সেখানে উর্ব্বর। নূতন অভাব—নূতন শিল্প—নূতন ব্যবসায়—নূতন ফিকিরফন্দী এই সেখানকার জীবনযাত্রার প্রণালী ও সভ্যতার ধারা।

জ্ঞানরূপ হোমানলে অবিরাম আহুতি প্রদান করিয়া মানুষ মঙ্গলের জন্য যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল,—কিন্তু এই অসীম ক্ষমতাশালী অভিচার দেবতা শেষকালে কি মানুষকেই নিধন করিবে ?

চর্ম্মের দর্শন-শক্তি।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই কথা জানা গিয়াছে যে মানুষ কর্ণের দ্বারা যেমন শব্দ শুনিতে পারে, তেমনি অস্থি দ্বারাও শুনিতে পারে। হাতের কজীতে একটা নূতন গঠনের টেলিফোন রিসিভার বাঁধিয়া দিলে কর্ণছিদ্র বন্ধ থাকিলেও তারবিহীন টেলিফোনের কনসার্ট সঙ্গীত বেশ শুনিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক আমাদের দর্শনক্রিয়ার এক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন চক্ষু ব্যতীতও মানুষ দেখিতে পারে। তাঁহার "চক্ষুহীনের দৃষ্টি"

নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সকলে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিতেছেন। ইহাও কি কখনও সম্ভব? কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন, চক্ষু ব্যতীত মানুষের অপর দর্শন-ইন্দ্রিয় আছে, যাহার দ্বারা অন্ধও দেখিতে পারে। এই অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কারকের নাম আনাতল ফ্রান্স।

তিনি অনেক ব্যক্তিকে চক্ষু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া পড়িতে শিখাইয়াছেন। অনেক অন্ধও এইরূপে পুস্তক পড়িতে সমর্থ হইয়াছে। সর্ব্ব সাধারণের সম্মুখে, প্রকাশ্যস্থলে, দেশের গণ্য মান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের উপস্থিতে তিনি তাঁহার পরীক্ষা দেখাইয়াছেন। একটী পরীক্ষা সম্প্রতি প্যারীনগরে হইয়া গিয়াছে। যে ঘরে পরীক্ষা করা হইয়াছিল সে ঘরটী অন্ধকার করা হয় নাই, পরন্তু তাহাকে খুব আলোকিত করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সেই ঘরে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করা যায় না। অনেক ডাক্তারও সেখানে ছিলেন। যাহার উপরে পরীক্ষা হয় তাহার চক্ষুর পাতা প্রথমে আঁঠা দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়; তারপর একজন ডাক্তার তাহার উপরে এমন ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলেন যাহাতে স্বাভাবিক দৃষ্টি শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল। তারপর দ্বাদশ প্রকারের পরীক্ষা করা হয়। সেই বদ্ধ-চক্ষু ব্যক্তি একটা পুস্তক হইতে খানিকটা পড়িল,—সেই পুস্তক পূর্ব্বে তার দেখা ছিল না। তাহাকে কতকগুলি তাস দেখান হইলে, সেগুলির নাম ঠিক মত বলিয়া যাইতে লাগিল। একটা ফুলের তোড়া তাহার সম্মুখে ধরা হইলে সে সমস্ত ফুলের নাম ও বর্ণ সমস্ত ঠিক বলিয়া দিল। যে সকল ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা অনেকেই মনে করিলেন ইহা সম্ভবতঃ চিন্তা পঠন শক্তির ক্রিয়া (Telepathy or thought reading); কিন্তু তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত। কারণ মানসিক শক্তির সাহায্যে অপরের চিন্তিত বিষয় জ্ঞাত হওয়া অন্ধকারেও সম্ভব, এমন কি অন্ধকারে আরও ভাল হয়; কিন্তু এই চক্ষুহীনের দৃষ্টি অন্ধকারে মোটেই হয় না। আর একটী কথা। সমস্ত শরীর যদি বস্ত্রাবৃত থাকে তবে আনাতলের আবিষ্কৃত এই চক্ষুহীন দৃষ্টি কিছুতেই খোলে না। অপর পক্ষে বস্ত্রাবরণ ত দূরের কথা সহস্র যোজন দূরেও চিন্তা-পঠন শক্তি কার্য্য করে। সুতরাং এই অভিনব আবিষ্ক্রিয়ার সহিত টেলিপ্যাথির কোন সংস্রব নাই। আনাতল ফ্রান্স মহাশয় বলেন "আমাদের দৃষ্টি শক্তির জন্য অন্য ইন্দ্রিয় আছে, আমরা তাহার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেই তাহা সতেজ হইয়া উঠিবে। বহুকাল নিষ্ক্রিয় ও অলস থাকায় তাহার শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে।"

তিনি আরও বলেন "মানবদেহের চর্ম্মের অভ্যন্তরে এই অভিনব দর্শন ইন্দ্রিয় স্থাপিত আছে। আমরা এইটীকে যদি শিক্ষার দ্বারা জাগ্রত ও কর্ম্মক্ষম করিয়া লইতে পারি তবে আমরা একই সময়ে চারিদিকে দেখিতে পারিব।" তাঁহার বিশ্বাস যুগযুগান্তর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই লক্ষ লক্ষ চর্ম্ম-চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতেন। তারপর যখন দেখা গেল এখনকার এই দুই চক্ষু দিয়াই দেখা সুবিধা, তখন সেই লক্ষ লক্ষ চর্ম্ম চক্ষু ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া গেল। এখন সেই লুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধারের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন; কিন্তু সেই শিক্ষা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

আবিষ্কারক নিজে অনেক কষ্ট করিয়া শিখিয়াছেন। তিনি এখন চক্ষু বন্ধ করিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে পারেন; দূরের জিনিসও দেখিতে পান।

কেহ কেহ বলেন আমরা চোখ বুজিলে বা ঘুমাইলে মানসিক চিন্তায় বা স্বপ্নে যে নানাপ্রকার জিনিস দেখিতে পাই, এই নূতন আবিষ্কার সেই রকমের, বাস্তবিক ইহা সত্যকার দৃষ্টিশক্তি নহে।

যাহা হউক এ বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণের মধ্যে আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে।

অদৃশ্য আলোক-রশ্মি।

গ্রিণ্ডেল মেথুস্ নামক একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করিবার এক অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি একপ্রকার আলোকতরঙ্গ উৎপন্ন করিতে পারেন যাহা তড়িৎপরিচালিত ভ্রামক যন্ত্রাদির উপর পতিত হইলে, তাহাদের গতি হঠাৎ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার লণ্ডনস্থিত বিজ্ঞান-গৃহে এ বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিতরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; শুধু এক বার দুই বার নহে, অনেক বার দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে এই আলোকরশ্মিদ্বারা টেলিফোন, ডাইনামো, মোটর, বেতার বাগ্‌যন্ত্র প্রভৃতি সকল প্রকার বৈদ্যুতযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করা যায়। তিনি বলেন, এই আলোকরশ্মির শক্তি অসাধারণ;—এইখানে অবশ্য তিনি অল্পপরিমাণ আলোকের পরীক্ষা করিয়াছেন, শীঘ্রই বাহিরে কোন বিস্তীর্ণ স্থানে যেখানে কাহারও কোন অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকে এইরূপ স্থানে এই অসীম শক্তিশালী আলোক-তরঙ্গের পরীক্ষা হইবে। তিনি বলেন, এই আলোকের দ্বারা শূন্যপ্রদেশে শক্তিচালনা করা সম্ভবপর।

মিঃ মেথুস্ এই আলোকের সাহায্যে আরও একটা অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন। একটা বায়োস্কোপের চিত্র তুলিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে বক্তার কথার শব্দলিপিও লওয়া হইয়াছিল। তারপর যখন সেই চিত্র পর্দ্দার উপর ফেলিয়া চালিত হইতে লাগিল, তখন চিত্রের অঙ্গভঙ্গীর সহিত বাক্যেরও পরিস্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। সে আলোতে ছবি দেখান হয়,—শব্দতরঙ্গও উৎপন্ন করা যায়। এই বিস্ময়কর আলোকরশ্মি সম্বন্ধে তিনি ভিতরের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেছেন না। তিনি বলেন "আমার নিজের দেশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অপরের কাছে প্রকাশ করিয়া আমি কি দেশদ্রোহীর আচরণ করিব ?"—এ কি রকম স্বদেশপ্রীতি !

মাছির বিনা তারের সংবাদ।

মার্কনির বহু পূর্ব্বে মশক মক্ষিকা প্রভৃতি কীট যে বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত সংবাদ প্রেরণ করিয়া আসিতেছে, একথা এখন বৈজ্ঞানিকগণ জানিতে পারিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইতেছেন।

বাক্‌শক্তিবিহীন ক্ষুদ্র কীট কিরূপে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী তাহার প্রিয় বন্ধুকে আহ্বান করে, তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণের নিকট একটা দুর্ব্বোধ্য বিষয় ছিল। এমন কি বিখ্যাত ডারবিন, রে, ল্যাম্বার্টার প্রভৃতি পণ্ডিতগণও ইহার কোন কারণ বাহির করিতে পারেন নাই।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বে মনে করিতেন স্ত্রীমক্ষিকা শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা পুরুষ মক্ষিকাকে আহ্বান করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই অনুমান সত্য নহে। স্ত্রী মক্ষিকাটীকে এমন একটী পাত্রে বন্ধ করিয়া রাখা হইল যাহার ভিতর দিয়া শব্দতরঙ্গ বাহিরে আসিতে পারে না। কিন্তু এমন অবস্থাতেও সেই স্ত্রীমক্ষিকাটী অনায়াসে পুরুষ মক্ষিকাকে আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছে। তারপর কেহ কেহ মনে করিলেন গন্ধদ্বারা উহাদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলে কিন্তু তাহাও উক্তরূপ পরীক্ষায় ভ্রমাত্মক বলিয়া স্থির হইয়াছে।

সম্প্রতি অধ্যাপক লরেন্স হোয়লে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন ও নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বিদ্যুৎ তরঙ্গের দ্বারাই মক্ষিকাগণের মধ্যে এই প্রকার অদ্ভুত আলাপ ও কথাবার্ত্তা হয়। বিনা তারে কথা বলিবার একটী যন্ত্রের সাহায্যে তিনি বহুদূর হইতে মক্ষিকার গুঞ্জন শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাহাদের যে দীর্ঘ শুঁড় আছে, তাহাই আমাদের আধুনিক বিনা

তারের যন্ত্রের এরিয়েল অথবা "আকাশ-দণ্ডের" কাজ করে। অধ্যাপক হার্টজ যখন ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে এই বিশেষ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আবিষ্কার করেন তখন তিনি এই এরিয়েলকে এনটেনা নাম দিয়াছিলেন। তিনি হয়ত তখন মনে করেন নাই,—তাঁহার সেই অভিনব আবিষ্কার মক্ষিকারই কাছে পুরাতন ;—তিনি অজ্ঞাতসারে মক্ষিকারই অনুকরণ করিতেছিলেন।

দ্রাক্ষালতার জীবন।

সকলেই জানেন ওক, বট প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ বহু দিন বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্র ও কোমল দ্রাক্ষালতার দীর্ঘজীবনের বিষয় কেহ কিছু অবগত নহেন। জানিতে পারা গিয়াছে এক একটি দ্রাক্ষালতা প্রায় চারিশত বৎসর পর্যন্ত জীবিত রহিয়া ফল প্রদান করে।

প্রথম ডাক টিকিট।

প্রথম ব্রিটিশ ডাক টিকিট প্রস্তুত হয় প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনের ৬৯ নং ফ্লিট ষ্ট্রীটের একটী ঘরে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে দুইজন লোক ইউনাইটেড ষ্টেটস্ হইতে ইংলণ্ডে আসেন এবং একটী ছাপাই ও এনগ্রেভিং করিবার কারখানা খুলেন। আজ তাহা পারকিন্স, বেকন্ কোম্পানি নামে সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে জেকব পারকিন্স ছিলেন একজন আবিষ্কারক এবং গিডিওন ফ্যারমেন ছিলেন এনগ্রেভার। তাঁহাদের সহিত অপর অনেক কর্ম্মকুশল ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁহাদের এনগ্রেভ করিবার সহজ প্রণালী অল্প দিনের মধ্যেই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। প্রথম অবস্থায় যখন কোটী কোটী ডাক টিকিটের দরকার হইতে লাগিল তখন সেই প্রণালীতে এনগ্রেভ করাইয়া টিকিট ছাপা হইতে লাগিল এবং তাহাতে অভাব সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইল। পিছনে চটচটে আঠা লাগান ডাক টিকিটের আবিষ্কার করেন ডাণ্ডি সহরের দুইজন পুস্তক বিক্রেতা। প্রথম ব্রিটিশ ডাক টিকিট গুলির রং ছিল কৃষ্ণবর্ণ। তাহা ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চলিতে আরম্ভ হয়। ইহাতে রাজার মাথা অঙ্কিত থাকিত।

সুইজারল্যাণ্ডে বৃষ্টি নামাইবার কৌশল।

সুইজারল্যাণ্ডে জেনিভা হ্রদের আশেপাশে শাকশব্জীর বাগানে বৃষ্টি নামাইবার যে সকল কৌশলের আয়োজন হয় তাহা বাস্তবিকই কৌতুকাবহ। সেই শাক-শব্জীর মাঠের মাঝে মাঝে

ছোট ছোট ঘর আছে এবং প্রত্যেক ঘরের উপরিভাগেই একটা করিয়া চোঙ্গ থাকে। কেহ যদি বিমানযান হইতে এই সমস্ত কুটীর নিরীক্ষণ করে তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে যে কুটীরগুলি একটি বৃহৎ বৃত্তাকারে সজ্জিত। প্রত্যেকটা কুটীরের ভিতরেই একটি করিয়া কামান সজ্জিত থাকে, এই কামানগুলির মুখ উর্দ্ধের চোঙ্গের সহিত সংলগ্ন থাকে। কালো বারুদ দিয়া যখন আওয়াজ করা হয় তখন উপরিস্থিত চোঙ্গের ভিতর দিয়া শব্দ নির্গত হওয়াতে শব্দটাকে খুব বড় করিয়া দেয়। যখন বৃষ্টির খুব দরকার হয় তখন এক একটা কুটীরে কামানের কাছে এক একজন লোক বসিয়া থাকে। ছোট মেঘগুলি ভাসিতে ভাসিতে সেই বৃত্তের ভিতর আসিলেই বৃত্তের এক কোণ হইতে তৎক্ষণাৎ কামান ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কামানের আওয়াজে মেঘগুলি বৃত্তের আর এক কোণে সরিয়া যায়, তখন আবার সেই কোণ হইতে কামান গর্জ্জিয়া উঠে, এই ভাবে চারিদিক হইতে কামানের গর্জ্জনে নিরুপায় মেঘগুলি এক স্থানে জড় হইয়া বৃষ্টির আকারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহারা যে শুধু বৃষ্টি নামাইতে পারে তাহা নহে, দরকার পড়িলে আবার বৃষ্টি তাড়াইবারও পারে। যখন আঙ্গুর পাকিয়া আসে তখন প্রায়ই বর্ষাকাল থাকে। ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা করিয়া তাহারা পূর্ব্বেই কামান লইয়া বসিয়া থাকে। তাড়াইবার ইচ্ছা হইলে মেঘ বৃত্তের বাহিরে থাকিতেই কামান গর্জ্জন আরম্ভ করে। ইহাতে মেঘ আর সে বৃত্তের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না।

এলুমিনিয়াম।

এলুমিনিয়াম আজকালকার সাধারণ ধাতু। নানাবিধ পাত্রাদি নির্ম্মাণে এবং অপরাপর বহু কার্য্যে এখন এই ধাতুর প্রভূত প্রচলন হইয়াছে, অধিকন্তু ইহা এক্ষণে সুলভে পাওয়া যায়। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ধাতু ছিল। তখন ইহার এক সেরের মূল্য ছিল প্রায় ৩০০৲ টাকা। গহনা-পত্র নির্ম্মাণে মাত্র সে সময়ে এলুমিনিয়াম ব্যবহৃত হইত।

এক্ষণে ইহার এক সেরের মূল্য বারো আনার অধিক নহে, এবং ইহা নানাকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। মোটর গাড়ীর সরঞ্জাম আজকাল এলুমিনিয়াম দ্বারা নির্ম্মিত হইতেছে।

জার্ম্মাণ রাসায়নিক ডাক্তার হোলেয়ার প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে প্রথম এলুমিনিয়াম আবিষ্কার করেন। এলুমিনা নামক এক প্রকার শুভ্র রাসায়নিক পদার্থ হইতে এই ধাতু নির্ম্মিত

হয়। জিনিষটি দেখিতে টিক সোডার মত এবং ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকায় ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কর্দ্দমের ইহা একটী প্রধান উপাদান।

ইহার পরে ডি, ভিলি নামে একজন ফরাসী রাসায়নিক স্বর্ণকারের ব্যবহার ভিন্ন অন্যান্য কার্য্যে এই ধাতু কার্য্যকারী করিবার জন্য ইহার সুবহুল পরিমাণে প্রস্তুতে যত্নবান হন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে যথেষ্ট পরিমাণে এলুমিনিয়াম প্রস্তুত করিতে না পারিলে ইহার অভাব দূর হইবে না। ইহাতে তিনি অনেকখানি কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

ইহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে পৃথিবীর রাসায়নিক মহলে একটী সাড়া উঠে যে কিরূপে প্রভূতি পরিমাণ এলুমিনিয়াম এক সঙ্গে পাওয়া যাইতে পারে। বহু রাসায়নিক এ বিষয়ে গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। আমেরিকান বৈজ্ঞানিক চার্লস হল্ এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন। তিনি সস্তায় ও সহজ উপায়ে এলুমিনিয়াম প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবন করেন। নানারূপ পরীক্ষায় বিফলকাম হইয়া তিনি যখন ইহা প্রস্তুতের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন ঠিক সেই সময় হঠাৎ তিনি তাঁহার পরীক্ষাগারে এই ধাতুর কয়েকটী রেণু দেখিতে পান। প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার হলের এই আবিষ্কার জগতে ঘোষিত হইয়াছে। এবং তখন হইতে এলুমিনিয়ামের প্রভূত প্রচলন হইয়াছে।

এই ধাতু হাল্কা, দীর্ঘকাল স্থায়ী, তারসহ অথচ সস্তা। ইহাতে কখনও মরিচা ধরে না বা ইহার জ্যোতিঃ কখনও নিষ্প্রভ হয় না। অতি সহজেই ইহাকে পিটিয়া পাতলা পাত প্রস্তুত করা যায়। ইহা দ্বারা অতি সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এলুমিনিয়ামের বিশেষত্ব এই যে ইহা অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং ইহার তাপ ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা অসাধারণ, অধিকন্তু তামা পিতলের মত ইহাতে কলঙ্ক ধরে না।

কৌটায় আবদ্ধ করিয়া নানা জাতীয় ফল ও অপরাপর খাদ্যাদি দেশ বিদেশে আমদানি রপ্তানি করিবার জন্য শীঘ্রই টীনের কৌটার পরিবর্ত্তে এলুমিনিয়ামের পাত্র ব্যবহৃত হইবে। রন্ধনাদিতে ব্যবহার্য্য পাত্র সকল আজকাল বেশীর ভাগই এলুমিনিয়াম দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে।

মোটর গাড়ী এলুমিনিয়াম সাহায্যে প্রস্তুত করিবার জন্য আজকাল নানারূপ পরীক্ষা হইতেছে। সম্প্রতি এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত একখানি রেল গাড়ী লাইনের উপর চালান হইয়াছিল

সম্পূর্ণ এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত এরোপ্লেন শীঘ্রই প্রচলিত হইবে। এই ধাতু নির্ম্মিত ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতির গুণ এই যে আকস্মিক কোন চোট লাগিলে ইহা সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হয় না। এবং ইহাতে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা খুব কম।

মূল্যবান প্রস্তরাদি প্রস্তুত করিতে আজকাল রাসায়নিকগণ এলুমিনিয়াম ব্যবহার করিতেছেন। এলুমিনিয়াম চূর্ণের সহিত রঙের উপাদান মিশ্রিত করিয়া আজকাল অধিকাংশ এই জাতীয় প্রস্তর প্রস্তুত করা হইতেছে।

লৌহ ও ইস্পাতের বিশোধন কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া এলুমিনিয়াম আজকাল লৌহশিল্পের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। ইস্পাত প্রস্তুত কালে ফার্ণেসে ঐ ধাতুর সহিত এলুমিনিয়াম মিশ্রিত করিলে উহার গ্যাস বাহির হইয়া যায় এবং অপরাপর অনেক দোষ সংশোধিত হইয়া প্রথম শ্রেণীর বিশুদ্ধ ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

স্বর্গে আলাপন।

——:*:——

সাবিত্রী, দ্রৌপদী।

সাবিত্রী। নারী একবারই নিজেকে ঢেলে দিতে জানে, দুইবার নয়। নারী এক পুরুষেরই কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে, দুই পুরুষের কাছে নয়। নারীর প্রাণ জন্মে জন্মে একই দেবতার চরণে অখণ্ডভাবে নিবেদিত—সতীর সত্তা উচ্ছিষ্ট হবার নয়। তোমার জীবনের রহস্য কি তবে, দ্রৌপদী!

দ্রৌপদী। তোমার জীবনের যে রহস্য, আমার জীবনেরও সেই রহস্য—সকল নারীর, সকল সতীর জীবনেরই সেই রহস্য। আমার জীবন প্রাণও জন্মে জন্মে একজনেরই কাছে সর্ব্বতোভাবে সমর্পিত!

সাবিত্রী। সে কি? পঞ্চপাণ্ডবের কথা তবে কাহিনী মাত্র? কবির কল্পনা তোমাকে নিয়ে ত বড় নিষ্ঠুর, বড় অন্যায় খেলা খেলেছে।

দ্রৌপদী। কাহিনীও নয়, কবি কল্পনাও নয়। আমি পঞ্চপাণ্ডবেরই ছিলাম সহধর্ম্মিণী।

সাবিত্রী। তুমি বলতে চাও, তুমি ছিলে মিথ্যাচারিণী! গোপনে বরণ করে নিয়েছ একজনকে আর প্রকাশ্যে আত্মবিক্রয় করেছ আর একজনের—কেবল একজনেরও নয়, আর বহু জনের কাছে? এই তোমার তেজ, তোমার নিষ্ঠা—তোমার নারীত্ব? কিন্তু জানতে পারি কি দ্রৌপদী, কে—কে ছিল তোমার প্রাণের দেবতা, তোমার সত্যকার পতি? অর্জ্জুনের সম্বন্ধে কি একটা কথা শুনেছিলাম, তাই তবে সত্য?

দ্রৌপদী। আমার সত্যকার পতি—অর্জ্জুনও নয়, পঞ্চ ভ্রাতার কেউ নয়, সাবিত্রী!

সাবিত্রী। তুমি এই স্বীকার করলে তুমি পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্ম্মিণী, আবারও বলছ তোমার পতি এঁদের কেউ নয়, আর এক ব্যক্তি। আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে, তোমার হেঁয়ালী ভেঙ্গে সাদা কথায় বল ত শুনি।

দ্রৌপদী। আমার প্রাণের দেবতা যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ।

সাবিত্রী। কি বল তুমি? তবুও ত কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে আবার পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্ম্মিণী হলে কি রকমে?

দ্রৌপদী। সহজ কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমি উৎসর্গীকৃত—তাঁরই নির্দ্দেশ মত আমি চলেছি। তিনি আমাকে যে আদেশ দিয়েছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে আমি সেই আদেশই পালন করেছি।

সাবিত্রী। ভগবান ত সবারই অন্তরে। এক হিসেবে তিনি সবারই পতি—কি পুরুষ, কি নারী। কিন্তু জীবনে যিনি আমার পতি, আমার নারীত্বের যিনি অধিকারী তিনি আমারই মত মানুষ—জীবনের ব্রতে তিনিই জাগ্রত ভগবান; ভগবানকে যদি পাই তবে তাঁরই মধ্যে, তাঁরই সহায়ে।

দ্রৌপদী। আমার কৃষ্ণও মানুষ, আমার নারীত্বের একমাত্র অধিকারী পুরুষ—তিনিই আমার মানুষী দেবতা।

সাবিত্রী। সে দেবতা তবে তোমায় গ্রহণ করলেন না কেন নিজে? এমন ত নয় যে পত্নী হিসেবে তিনি কাউকে গ্রহণ করেন নাই। তা না করে তিনি ঠেলে দিলেন তোমাকে আর পাঁচ-জনার কাছে—এ কোন নীতি, কোন ধর্ম্ম?

দ্রৌপদী। সে বিচারের ভার আমি লই নাই। নীতি ধর্ম্ম আমি সব জলাঞ্জলি দিয়েছি তাঁরই আদেশের মধ্যে। ধর্ম্ম যে কি তা আমি জানি, কিন্তু তাতে আমার কোন অনুরাগ নাই; অধর্ম্ম যে কি তাও জানি, তাতেও আবার আমার বিরাগ নাই—আমার হৃদয়স্থিত হৃষীকেশ যে ভাবে আমায় নিযুক্ত করছেন আমি সেই কাজই করে চলেছি।

সাবিত্রী। তুমি না হয় এই রকমে অব্যাহতি পেলে। কিন্তু আমার প্রাণ তাতে সায় দিতে পরছে না। ভগবান ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হলেও, তিনি অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেবেন কেন, নিজেই অধর্ম্মাচারী হবেন কেন? তাঁহাতেই ত পরম ধর্ম্ম—

দ্রৌপদী। সে ধর্ম্ম মানুষের ক্ষুদ্রবুদ্ধির নয়, সে তাঁর নিজের ধর্ম্ম। মানুষের পরিচিত সংস্কারগত অনেক ধর্ম্মকেই তা ব্যাহত করে চলে।

সাবিত্রী। মানুষের সমাজ তা হলে থাকে কি রকমে? সমাজকেই উচ্ছন্ন দেওয়া ত ভগবানের ইচ্ছা নয়। সমাজের মধ্যে যে সব ধর্ম্ম ফুটে উঠেছে। তাতে কি ভগবানেরই নিজের হাতের গড়া নয়।

দ্রৌপদী। কিন্তু সমাজে কি একটা ধর্ম্মবিশেষ দেখা দিয়েছে? চেয়ে দেখ, দেশ ভেদে কাল ভেদে কত সমাজ কত রকম ধর্ম্ম ফুটে উঠেছে। তোমার কথাই যদি ঠিক হয়, তবে এ সবগুলিকেই সমান ভাবে স্বীকার করতে হয়। সাবিত্রী তুমি নিজের পক্ষে স্বধর্ম্ম বলে যেটা জেনেছ, সেটাকেই শুধু সকলের ধর্ম্ম বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছ কেন? পুরুষ নারীর যে একই অকাট্য ধরণের সম্বন্ধে হতে পারে তা ত নয়। সমাজের প্রয়োজনেই এ সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিভিন্ন সমাজের প্রয়োজন বিভিন্ন, তাই পুরুষ নারীর সম্বন্ধের রূপও বিভিন্ন। এক পতিত্ব, এক পত্নীত্ব, বহু পতীত্ব, বহু পত্নীত্ব মানুষের সমাজে এ সব রকম ব্যবস্থাই ত রয়েছে।

সাবিত্রী। স্বীকার করি। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে একটা আদর্শ আছে—একটা উচ্চতম সত্য আছে। সকল সমাজ সে আদর্শ, সে সত্য ধরতে পারে নি। যে সমাজ পেরেছে সে

সমাজ তত উন্নত আর যে পারে নি সে তত অনুন্নত, অপরিণত। যে মানুষ যে নরনারী এই আদর্শ, এই সত্য জীবনে ফলিয়ে ধরেছে তারাই শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী। সত্যই তাই কি? তোমার নিজের ব্যক্তিগত যে সংস্কার, তোমার নিজের সমাজের যে ব্যবস্থা তার উপর ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবশত তাকে তুমি সকলের উপর স্থান দিচ্ছ না ত? আদর্শের কথা যদি বল আর এও যদি স্বীকার কর যে আদর্শে আদর্শেও ইতর বিশেষ আছে, তবে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ কি ভগবান স্বয়ং নহেন?

সাবিত্রী। কিন্তু স্বয়ং ভগবানকে কে দেখেছে, যে জোর করে বলতে পারে এইটিই তাঁর ব্যবস্থা।

দ্রৌপদী। আমি ভগবানকে দেখেছি, আমি জোর করে বলতে পারি আমি অনুসরণ করেছি তাঁর ব্যবস্থা একটুখানি মানুষী দৌর্ব্বল্য আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল হয়ত, আর তার জন্যে আমার নরক দর্শনও হয়েছে।

সাবিত্রী। আমি যখন তা পারি না, আমি যখন দেখেছি আমি মানুষ মাত্র, তখন আমার মানুষী হৃদয়ে যে সত্য যে আদর্শ জ্বলে উঠেছে, তাকেই শ্রেষ্ঠ পদ দিব, তাকেই ভগবানের নির্দ্দেশ বলে অকুতণ্ঠিত চিত্তে বলব।

দ্রৌপদী। আমি হয়ত সমাজের মানুষের বাহিরে, সাবিত্রী! আমার পথে তোমাকে কখন চলতে বলি না।

বিজলী। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

জনপ্রিয় কথাসাহিত্য।

সকল দেশেই কথাসাহিত্যের প্রসার প্রতিপত্তি অন্যান্য সাহিত্য অপেক্ষা অধিক। উৎকৃষ্ট উপন্যাস অপেক্ষা আবার চমকপ্রদ ঘটনাবহুল ঔৎসুক্য উদ্দীপক কাহিনীর পাঠকপাঠিকার সংখ্যা অনেক বেশী। এ হিসাবে গোয়েন্দা-কাহিনীর স্থান সকলের উপরে। সাধারণ পাঠাগারের দৈনিক পুস্তক বিলির তালিকা, রেলষ্টেশনের বুকষ্টল এবং বৃহৎ সহরের বর্ত্ম্যপার্শ্বের নূতন পুরাতন পুস্তকের দোকানের হিসাবে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে; অথচ এই সকল পুস্তকের নিরনব্বইখানি আর্ট হিসাবে হীন। ইহার কতকগুলি অতি সাধারণ প্রেম-কাহিনী—প্রেম অপেক্ষা তাহাতে লালসার ছাপই সুস্পষ্ট। অধিকাংশেরই উপকরণ অস্বাভবিক উত্তেজনা-উদ্দীপক সমস্যা,—চুরি, ডাকাতি, জাল-জুয়াচুরি, নরহত্যা প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের গুপ্তকাহিনী। মন ও মস্তিষ্কের খোরাক যোগাইবার মত উপকরণ এসকল পুস্তকে তেমন নাই, অথচ ইহাদের এত প্রতিপত্তি! ইহার কারণ? বাংলায় শতকরা ছয়টি মাত্র নরনারী লিখিতে পড়িতে সক্ষম, অর্থাৎ অক্ষরের সহিত পরিচিত সুতরাং ইহাদের মধ্যে নামমাত্র শিক্ষিতের সংখ্যাই অধিক। ইহারা উচ্চ অঙ্গের চিন্তাধারার সহিত অপরিচিত—গভীর চিন্তায় অক্ষম, এই জন্যই অতি মোটা সাহিত্যে তাহাদের অভিরুচি ও অনুরক্তি। কিন্তু এ যুক্তিতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই, সভ্য দেশেও এই অবস্থা—ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি অতি সুসভ্য উন্নত দেশ—তথাকার বারো আনা অধিবাসী সাহিত্য চর্চ্চায় সক্ষম, সে সকল দেশেও এই শ্রেণীর সাহিত্যের চর্চ্চা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সুসভ্য ইংলণ্ডেও তাহাই। বলা যাইতে পারে ও-সকল দেশেও অর্দ্ধশিক্ষিতের সংখ্যা ত কম নহে, আফিসের ছোকরা (Office-boys) কলকারখানার মেয়েরা (Factory-girls) ও সাহিত্যরসে বঞ্চিত গল্পভুক্ পাঠকপাঠিকার জন্যই ও-সকল পণ্য! প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, সভ্য দেশের বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির খোরাকও এই সকল কাহিনী, তাঁহারা কেবল অবসর বিনোদনরূপে এগুলি গিলিয়া যান না, এসকল উপন্যাস পাঠে তাঁহাদের যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষিত

হয়। * সুতরাং এ-শ্রেণীর গ্রন্থকে একেবারে 'অপাঠ্য' বলিবার উপায় নাই। পাঠক যাহার এত অধিক তাহার উচ্ছেদ-সাধনও সম্ভবপর নয়; নৈতিক-জগতে ইহারা তুচ্ছ বা যাহাই হউক সাহিত্যের হিসাবে ইহাদের মূল্য আছে। রসের অনন্ত আধার প্রকৃতি [illegible] রসের অভিব্যক্তি; সাধারণের চক্ষে যাহা রহস্য [illegible] যে মনীষীর মনশ্চক্ষুর অনুবীক্ষণে জগতের জীবন-রহস্য [illegible] ভঙ্গিমা, মতিগতি আকৃতিপ্রকৃতি যে পরিমাণে ধরা পড়ে, তিনি সেই রহস্য তাহার [illegible] যে পরিমাণে যে ভাবেই যে রস-সমন্বয়েই হউক যথাযথভাবে পরিস্ফুট, মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারেন তাঁহার সাফল্য সেই অনুপাতে। মানুষের মন সদাসর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছে—সমস্যার মীমাংসা, যাহা তাহার নিকট অজ্ঞেয় তাহার সমাধানের জন্য সে অস্থির। যে বস্তু এই অজ্ঞেয়কে জ্ঞেয়ের গণ্ডীতে আনিয়া দিতে পারে তাহাতেই তাহার অনুরক্তি—তাহাতেই সে হয় অনুরাগী। শিল্পীর বিশ্লেষণাত্মক রচনা-চাতুর্য্য তাই মানুষের উপভোগ্য—পশুর নহে। মানুষ ভাব-আতিশয্যে রহস্য সমাধানের স্বাভাবিক অনুরাগে শিল্পীকে অনুসরণ করে; সে চায় সমগ্রকে—তাহার ধ্যান ধারণানুযায়ী বিশ্ব-প্রকৃতিকে আপনার ভাবে বুঝিতে। যাহার যতখানি আয়ত্ত করিবার শক্তি, যতটুকু তাহার আবার সেই অনুপাতে আপনাকে ঢালিয়া দিতে সমর্থ হয় কলারহস্যের অন্তস্তলে। সু-কুর প্রশ্ন সে হারাইয়া ফেলে প্রকৃতির কিবা "সু" কিবা "কু"! গ্রহীতার অন্তর্দৃষ্টি-শক্তি অনুযায়ী প্রকৃতি-রহস্য পরিণত হয় "সু" এবং "কু"তে। সুতরাং তথাকথিত কু-কে পরিত্যাগ করিয়া সু এর অবলম্বনে সাহিত্যের অস্তিত্বলাভ অসম্ভব। সূর্য্যরশ্মি যেমন নিজে সুনির্ম্মল—তাহার রংফলে যে আধারে পতিত হয়, তাহার বর্ণ-বৈচিত্র্যে—তাহার স্বচ্ছতা-অস্বচ্ছতায়, কলারহস্যও তেমনি নিজে নির্ম্মল হইলেও মানবমনে প্রকাশ পায় গ্রহীতার

---

* It is a familiar fact that many famous men have found in this kind of reading their favourite recreation, and that it is consumed with pleasure, and even with enthusiasm, by many learned and intellectual men, not infrequently in prference to any other form of fiction. R. Anstin freeman.

19th Century & After. May / 24.

মনোদর্পণের প্রকৃতি অনুযায়ী। কর্ষিত সারযুক্ত ভূমিতে বীজের সাফল্য, ঊষর অনুর্ব্বর ভূমিতে তাহার দুর্গতি। ভূমির উর্ব্বরতা অনুর্ব্বরতার সহিত বীজের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না; বীজ বীজই কিন্তু অবস্থার ভেদে তাহার সাফল্যের ব্যাঘাত ঘটে। এক স্থানে যাহা বিফল অন্যক্ষেত্রে তাহাই সুফল প্রদান করে। সত্য বটে বিষ-বীজে বিষবৃক্ষই অঙ্কুরিত হয় কিন্তু সংসারে বিষেরও আবশ্যক আছে। ভিষকের হস্তে বিষের সুপ্রয়োগে অমৃতের কার্য্য করে, যদিও অন্যের নিকট বিষ অশেষ অকল্যাণকর প্রাণনাশক, তাহার অতি দূরে অবস্থান করাই শ্রেয়। বহু অনিষ্ট অনর্থের মূলে বিষ নিহিত থাকিলেও, বিষ নিজে অকল্যাণকর নহে—অকল্যাণ ইহার অপপ্রয়োগে। এই সকল জনপ্রিয় সাহিত্য সম্বন্ধেও ইহা প্রযুজ্য। এ সকল সাহিত্যে সমাজের সহজ-প্রত্যক্ষিত অংশ ও ব্যক্তিগত জীবনের বিভাগ লইয়াই প্রধানত কারবার, সুতরাং সুবৈদ্যের ন্যায় শক্তিশালী সাহিত্যিক না হইলে, ইহার যথাযথ নিখুঁত গঠন অসম্ভব। মানবের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত অর্দ্ধ-পরিচিত লেখকলেখিকার লেখনীতে লালসার বাহ্যিক ভাব, অপকৃষ্ট অংশ, উচ্ছৃঙ্খল উদ্দীপক চিত্র অঙ্কিত হইবার কথা। অঘটন, অসূয়া, হিংসা প্রতিহিংসার অন্তরালেও মানুষের ধর্ম্ম আত্মপ্রকাশের জন্য, বিকাশের তুমুল সংগ্রামে সদা ব্যস্ত—সে ভাব-লীলা এরূপ সাহিত্যে বিরল। ইহাদের পাত্রপাত্রীর কেহবা প্রকৃত পিশাচ, কেহবা সাক্ষাৎ দেবতা,—অধিকাংশ স্থলেই অস্বাভাবিকতা দোষদুষ্ট। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের সহিত [illegible]। সাহিত্য মূলত এক হইলেও বাহ্যিক আকারে ইহারা বিভিন্ন,—সাহিত্যের মূল ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগও এগুলিতে কম—তা করিতে হইলে লেখকলেখিকার অমিত শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু সেরূপ লেখকলেখিকার সংখ্যা অতি অল্প। মনস্বিনী নারী করেলী,—সমাজের কলঙ্ক, ব্যক্তিগত জীবনের কালিমা, অবলম্বনে তাঁহার শক্তিশালী লেখনী চালনা করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন,—তাঁহার ভেণ্ডেটা প্রভৃতি জনপ্রিয় সাহিত্য,—লালসার চিত্র—কিন্তু স্থায়ী সাহিত্যের আসন পাইবার যোগ্য। তিনি পাপকে পাপরূপেই চিত্রিত করিয়া, তাহার মালিন্য-বিষাংশের কুক্রিয়া জলন্ত ভাবে জন-সমাজে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়া পাঠকপাঠিকার মনে যে ঘৃণার সঞ্চার করিতে সমর্থ—তাহা উপভোগ্য হইলেও [illegible] মানুষের মনকে সতর্ক ও সাবধান করে,—একদিকে পাঠকপাঠিকা যেমন ঘটনার প্রতি, রহস্যের পর রহস্যের সমাবেশে আকৃষ্ট হয়—অন্য পক্ষে সমাজের নিত্য সংঘটিত—পাপাদির অন্তরালে কত অঘটন, কত অত্যাচার—মানুষের পশুত্বের তাণ্ডব লীলা—মানুষের

মনের ঘাতপ্রতিঘাত—প্রেম ও লালসার সংঘাত কাব্য কলায় পরিস্ফুট হইয়া জনপ্রিয় উপন্যাসের আর্টের সূক্ষ্ম চিত্রে সুর প্রতিষ্ঠা করিয়া শক্তিশালী লেখক স্থায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। মিহক গোয়েন্দা কাহিনীর মধ্যে The Mystery of Edwin Drood ও [illegible] S[illegible] Huntকে এ পর্যায় ফেলা যায় কিন্তু জনপ্রিয় সাহিত্যের অধিকাংশ লেখক লেখিকাই উচ্চ চিন্তা বর্জিত—প্রকৃত রূপ বর্জিত লেখা—ইঁহাদের মধ্যে সাহিত্যিকের সংখ্যা কম, ব্যবসাদারই অধিক,—গ্রন্থপ্রণয়নে তাঁহাদের আনন্দ অপেক্ষা অর্থের দিকেই অধিক লক্ষ্য। চলচিত্রের ব্যবসাদারদিগের ন্যায় ইহারাও সাধারণের রুচির (Public taste) দৃষ্টি রাখিয়া রচনা করেন,—যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন—তাহা জনপ্রিয় হইতে পারে কিন্তু তাহা উচ্চাঙ্গের স্থায়ী সাহিত্য হইতে পারে না। (১) সাধারণ লোক অন্তর্দৃষ্টিতে অভ্যস্ত নয়,—তাহাদের প্রীতি বাহ্যেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিতে। উত্তেজনা, উদ্দীপনা, নিত্য নূতন হুজুগের জন্য সাধারণে লালায়িত,—তাহার ভাবের স্থির মনে আলোচনা করিয়া গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা তাহাদের নাই—তাহারা মাদকদ্রব্যের ন্যায় এ সকল সাহিত্যকেও নির্বিচারে স্ফূর্তির সামগ্রীরূপে গ্রহণ করে,—কাজেই তাহাদের রুচি অনুযায়ী এ সকল সাহিত্য বাহ্যিক ভাব,—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির মালমসলা সবটাই জমা গ্রহণ করে,—বিস্ময়ের পর বিস্ময় উদ্রেক করাই হয় লেখক লেখিকার প্রধান চেষ্টা। যে গ্রন্থ যে পরিমাণে তাহার বিপরীত সংধান, অর্থাৎ পাঠকপাঠিকার অনুমান-বৃত্তিকে যে লেখক যত প্রতারিত করিয়া—অন্য আর একটি সম্ভাব্য সমাধানের (False clues) অবতারণা করিতে পারে তাহার প্রচার তত বেশী হয়,—সুতরাং মিথ্যা প্রতারণার প্রেরণাতেই যেন ইহার সাফল্য। সাফল্য? অবশ্য পাঠকপাঠিকার চিত্তরঞ্জনে—ফলে এ সকল গ্রন্থের নিষ্ফলতাই (Failure) সামগ্রিক ভাবে—পাঠকালে সাফল্য

(১) Popularity is no sure indication of permanence of a literary production. Popularity may arise from novelty * * * But the surest recipe for popularity is an attractive mediocrity for the mass of people bow respectfully to the great books and never read them.

—C. T. Winchester.

বলিয়া মনে করা হয়—কিন্তু ইহার পশ্চাতে—পরিমাণে, অবিরত অসত্যের অনুসরণে উত্তেজকভাব পোষণে পাঠকের মনে, সমাজের বুকে যে একটা গভীর অকল্যাণের সৃষ্টি করে—তাহার ফল অতি বিষময়। মানুষের মন এ সকল সাহিত্য পাঠে আপনার অন্তর্দৃষ্টি হারাইয়া কেবল মোহ—ক্ষণিক সুখের উত্তেজনা পশ্চাতে অবিরত ধাবিত হইয়া অবনতির দিকে দ্রুত পতিত হয়—উচ্চ চিন্তার শক্তি,—বিমল আনন্দের অনুভূতির ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে; পশুর ন্যায় অতি সাধারণ সুখ দুঃখ আহার বিহারকেই জীবনের অবলম্বনীয় মনে করে। জড় বস্তুর মধ্যেও যে একটি শাশ্বত ধর্ম্ম অন্তর্নিহিত আছে,—স্বভাবের পরিণতি যে সেই মূল ধর্ম্ম—বিমল আনন্দে—তাহার ধারণার অবসর—এ সকল লোকরঞ্জক সাহিত্যে দেয় না, স্রোতমুখে তৃণের ন্যায় অন্যের শক্তিতে অন্যের ধারণায় নিশ্চেষ্ট ভাবে গা ভাসাইয়া চলিবার প্রবৃত্তি পূর্ণ ভাবে পাঠকপাঠিকার মনে জাগ্রত করে,—মানবিকতার সংহার সাধিত হয়—মনের রস মাতিয়া মাদক তাড়িতে পরিণত হইয়া বিষ হইয়া যায়! মাদকদ্রব্য সেবনের ফলাফল বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন—তাহা সমাজে নিত্য প্রত্যক্ষ।

কথা উঠিবে জনপ্রিয় সাহিত্যের লেখকলেখিকা সত্যই কি কেবল সাধারণের বিকৃত রুচির অনুসরণ করে,—উৎকর্ষ রুচির অবতরণা কি করে না? কেন করিবে না? তথা-কথিত প্রেমলীলাত্মক অনেক উপন্যাসে প্রেমের একটা জনপ্রিয় জলুষ আদর্শ দাঁড় করাইবার চেষ্টা দেখা যায়; অপেক্ষাকৃত উন্নত মন যে সকল প্রচলিত সামাজিক সমস্যায় চিন্তায় অভ্যস্ত—যথা—অস্পৃশ্যোচ্ছেদন—পাপকে ঘৃণা, পাপীকে ক্ষমা, স্ত্রীর অবরোধের অপকারিতা,—স্ত্রীও মানুষ, সমাজে নরের সহিত নারীর তুল্য দাবী, তুল্য দায়িত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি ভাব লোকমতের অনুযায়ী মনোমদ করিয়া নায়কনায়িকার মুখে সুযোগ মত আবৃত্তি করান হয়; পাঠকপাঠিকা আপনাদের ধারণা অনুযায়ী বাক্যের স্ফুর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া কেবল প্রীত হইয়া ক্ষান্ত থাকেন না—লেখকের প্রশংসার ঢক্কানিনাদেও মাতিয়া উঠেন—যেখানে ঔচিত্যঅনৌচিত্যের ধারণা পাঠকের নিজেদের নাই, সেখানে উদ্দীপনা ব্যতীত বিচারের স্থান আর কোথায়? বিশেষতঃ যে বস্তুর ভিত্তি সাধারণের রুচির উপরে প্রতিষ্ঠিত—তাহার প্রাণ-শক্তিও লোকমতের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। রুচি যতই উন্নত হউক না কেন রুচি পরিবর্ত্তনশীল,—কোন ক্রমেই সর্ব্বযুগের শাশ্বত বস্তু নহে। রুচির পরিবর্ত্তন মুহুর্ত্তে মুহূর্ত্তে যুগে যুগে। কারণ রুচির

প্রাণ লোকমত। রুচিকে উচ্চে তুলিয়া ধরিলেও উহার মূলে উন্নত সৌন্দর্য্যপিপাসা কিন্তু প্রাণ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোন বস্তু, কোন কলাই স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারে না। গ্রীক যাঁহারা ছিলেন প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপাসক,—সুকুমার কলার অনুশীলনে অদ্বিতীয়, চিত্রও ভাস্কর্য্যে গুরু, সূক্ষ্ম কল্পনায় নিখুঁৎ তাঁহাদের রুচিও প্রতিপন্ন করিয়াছে,—এই পরিবর্ত্তনশীলতা। কোথায় আজ তাঁহাদের আদর্শ? রুচির পরিবর্ত্তনে গ্রীক আজ পুরাতনের গৌরব সাক্ষী—বর্ত্তমানের কেহ নহে। রুচি খোসা, ধর্ম্ম তাহার প্রাণ, যে কাব্য মূল প্রাণ-ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে অসমর্থ তাহার স্থায়ীত্ব অসম্ভব।* গ্রীক ভাস্কর্য্য আজও যে অতীতের সাক্ষ্য রূপে বর্ত্তমান; তাহাও তাহারা উৎকর্ষ রুচির নিদর্শন বলিয়া;—গ্রীক ভাস্কর্য্য উন্নত কল্পনার ফলে— প্রকৃতির যে নিখুঁৎ ছাপ 'জড়কে ছাড়াইয়া সত্যের আদর্শে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিল—তাহা শাশ্বত তাহাই স্থায়ীত্ব লাভ করিয়াছে,—রুচির আলেখ্য রচনাপ্রণালী, রুচির পরিবর্ত্তনের সহিত কোন অতীত যুগে বিলীন হইয়া গিয়াছে—কিন্তু শিল্পীর প্রাণের মূল ভাব,—স্বভাবের অভিব্যক্তি চিত্রে যাহা প্রকটিত কাল তার কিছু করিতে পারে নাই, ম্যাডোনার পোষাকপরিচ্ছদ দর্শককে আর আকৃষ্ট করে না কিন্তু তাঁর বদনে মাতৃত্বের প্রাণস্পর্শী স্নেহবিগলিত ভাবরাশি সন্তানমাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে—সে ভাব নিত্য, চিরকালের,—অতীতের, বর্ত্তমানের, ভবিষ্যতের তাহা অমর, যত দিন বিশ্বে মনুষ্যের অস্তিত্ব থাকিবে শিল্পীর সে অমর রচনা নর-হৃদয়ে অমৃত সঞ্চার করিবে,—তাহার দর্শন করিয়া নিজ নিজ মাতার স্মৃতি—মাতৃমহিমা জাগ্রত করিবে হৃদয়ে হৃদয়ে। শক্তিশালী শিল্পীর ন্যায়, ক্ষণভঙ্গুর জনপ্রিয় সাহিত্যেও সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে শক্তিমান গ্রন্থকার সমর্থ—

* Greeks, who chose Æstheticism for their ideal—which is still the ideal at heart most popularly believed in—endowed as they were with the finest susceptibilities, proved, in the subsequent deterioration of their sculpture *that art cannot live by beauty alone, any more than by any othert æstetic principle.* Æstheticism is in fact, the unhealthy husk of art when the kernel—the vital inspiration—has dried up.—'Public teste.' Stanly Rowland.

উদাহরণ তাহার রামায়ণ মহাভারত! রামায়ণ মহাভারতে লালসা চিত্রের অভাব নাই, কিন্তু তাহারই ফাঁকে ফাঁকে, সাধারণ সুখদুঃখের মধ্যে দিয়া মানুষ মনকে অজ্ঞাতে এমন স্থানে আহ্বান করিতেছে যাহাতে মানুষ লালসাকে লালসারূপে ধারণা করে! রামায়ণ মহাভারত ধর্ম্মগ্রন্থ তাহার সহিত কথাসাহিত্যের তুলনা হয় না—ইহা হয়ত অনেকেই বলিবেন কিন্তু কথাসাহিত্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যাহা হওয়া উচিত তাহার সহিত ধর্ম্মগ্রন্থ রামায়ণের বিরোধ কোথায়? রামায়ণ ধর্ম্মগ্রন্থ দেব-কথার জন্য নহে—মানুষের মন-ধর্ম্ম উহাতে চিত্রিত সেই হিসাবে উহা ধর্ম্মগ্রন্থ,—মানবাত্মার সহিত মানবকে আনন্দের টানে পরিচিত করা সাহিত্যের চরম লক্ষ্য—কেবল ইন্দ্রিয়ের খোরাকে জোগাইয়া মোহাবৃত করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য কখনই হইতে পারে না,—জনপ্রিয় সাধারণ গল্পের খাঁকতিই ওই খানে। এ খাঁকতির কি নিরাকরণ সংঘটন অসম্ভব! জনসাধারণ সুচিন্তার অভাবে বাহ্যিক ইন্দ্রের তৃপ্তিকর বস্তুর পক্ষপাতী সত্য, রুচির বিকারের সমস্তটা তাহাদের অস্বাভাবিক কিন্তু রুচির উৎকর্ষ সাধন অসম্ভব ব্যাপার নহে। সাধারণ রুচির উপর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য বা অন্য কলাসম্ভারের স্থায়ীত্ব আশা স্বল্পবং হইলেও ইহাদের প্রভাব কম নহে,—উচ্চ অঙ্গের স্থায়ী সাহিত্য অপেক্ষা অনেক বেশী সুতরাং জনপ্রিয় কাব্য, কলার কার্য্যকারিতা সাময়িক ভাবে সমাজে অমোঘ। এই হিসাবেই এ সকল সাহিত্যের মূল্য। জনপ্রিয় সাহিত্যের রচয়িতার দায়িত্বও গুরুতর। সমাজের চিন্তার ধারা পরিবর্ত্তিত ও সুসংস্কৃত করিবার শক্তি ইঁহাদের হস্তে,—সুখদুঃখ পাপপুণ্য ভালমন্দ লইয়া সমাজ;—সংসার।—তাহার অনিত্যতা অসত্য,—স্থায়ী অংশ সত্যে।—জনপ্রিয় সাহিত্যিক লোকের মন মজাইবার গল্প উপন্যাস চিত্র বিচিত্রের অবতারণা করুন—তাহাতে কাহারও বিরোধ থাকিতে পারে না কিন্তু তাঁহারা যেন সত্যের অপলাপ না করেন—অসত্যকে সত্যরূপে দাঁড় করাইতে প্রয়াসী না হন,—যাহা কু তাহাকে কুরূপেই অঙ্কিত করুন—তাহাকে সেই আকারেই দান করুন,—উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বাধীনতার মূর্ত্তি,—লালসাকে প্রেম আখ্যা দিয়া—তাঁহারা যেন, সংস্কার নামে অসত্যের অবতারণা করিয়া বিপদগ্রস্ত বিকৃত সমাজকে আরও বিকৃত না করেন। পুস্তকের কাটতির জন্য ভয় কি? মাদকদ্রব্য সেবনের ব্যবস্থা করিয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট মাতালের কড়ি লুণ্ঠন সহজসাধ্য হইতে পারে কিন্তু তাহা স্থায়ী ব্যবসা হইতে পারে না। সাধারণের মন মাতাও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করিয়া—স্বধর্ম্মের গৌরব জাগ্রত করিয়া;—দুই চারি দিন হয় ত পসার

জন্মিবে না—কিন্তু পরিণাম রক্ষা হইবে—অর্থ ও স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে—সেই সঙ্গে জন সমাজও রক্ষা পাইবে, মানুষ হইবে মানুষ। এত বড় কঠিন ব্রত যাঁহার, যাঁহার সুযোগ এরূপ সহজলভ্য—সেই পুরুষ যদি অমানুষ হইয়া অমানুষেরই সৃষ্টিতে ব্যস্ত হন—তাহার অপেক্ষা সমাজের আর বড় দুর্ভাগ্য কি হইতে পারে!

প্রিয়া।

—:•:—

পলাশের রাগে রাঙা সিক্ত আঁখি তোর,
ঝরে অশ্রু-ধার।
কোন্ কথা স্মরি—
গুরু গুরু কাঁপে হিয়া গুমরি' গুমরি'!
বিদায়ের বেলা,
লয়ে গেলে কত ফাঁকি—কত অবহেলা;
হায়, হায় প্রিয়া,
তবুও করেছ রাজা রাজাসন দিয়া!
আমি' ত দিইনি কিছু—তুমি দে'ছ সব,
এই তো আমার গর্ব্ব এই তো গৌরব;
তাই শুধু দিকে দিকে হেরি তব ছবি,
ফুকারিয়া কেঁদে ওঠে এ বিরহী কবি!
অন্তরের তারে,
প্রেমিক পাগল-কবি নয়নের নীরে,

কি যে গেয়েছিল মর্ম্ম-বিদারিয়া,

হে মানসী-প্রিয়া !

প্রেমের বাদল নাবে ক্ষীণ বুকে তার,

দুলিয়া দুলিয়া নাচে আশার জোয়ার ;

প্রাণের গোপন স্থলে সেই গান আজি,

দখিনের বায়—

স্মৃতির বদন হানি পরশ বুলায় ;

মনে পড়ে আরো ;

বলেছিল "প্রিয়তম মারো, মারো, মারো—

এ অঘাত বুকে ধরি নিশি দিন আমি,

তোমারে পূজিব শুধু হে নিঠুর স্বামি !"

অকারণ অনাদর চির অবহেলা,

সয়ে গেছ তবু হায় বিদায়ের বেলা !

অনাদৃতা সতী,

তোমারি সর্ব্বস্ব-ঢালা প্রেমের আরতি,

করিয়াছে এ পাষাণে করুণ পেলব ;

প্রাণের পেয়ালা ভরা প্রণয়-আসব

রাজিয়াছে রক্ত-রাগে এ তরুণ হিয়া,

এস, এস প্রিয়া !

জীবন উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী উষা,

অনবদ্য লক্ষ্মীসমা অয়ি, জ্যোতি ভূষা !

জানি, প্রিয়া জানি,

পরাবে বিজয় মালা অলকার রাণী ;

বিজয়িনী, তুমি মোর চির পূজারিণী,
জন্মে জন্মে তব কাছে রহিয়াছি ঋণী ;
অনাদির আদি হতে হে, তাপসী বালা
রূপ রস—গন্ধে ভরা মিলনের ডালা
পরিপূর্ণ করি'—
আপনার মাঝে মোরে লইয়াছ বরি' !
ঝরণার তালে তালে গিরি-ভূমি 'পরে,
ফাগুনের ঝরে পড়া পাতার মর্ম্মরে ;
যুগে যুগে আসা তব চরণের ধ্বনি—
বাজে রণি' রণি' !
ক্ষণিকের এ বিরহ—হবে অবসান,
রচিবে মিলন-সেতু-অপূর্ব্ব মহান ;
যৌবন-নিকুঞ্জে মম সেই পথ দিয়া,
আবার আসিবে তুমি, বিরহিণী প্রিয়া ;
সলজ্জা বধূর মতো কম্পিত চরণে
অলক্ত সিঁদুর রাগে, গন্ধে ও বরণে ;
তাই শুধু অনাগত সে দিনের লাগি,
রহিয়াছি জাগি !

শ্রী সরোজ কুমার সেন।

———

রেঙ্গুনে বাঙলা সাহিত্য সম্মিলনীতে কবি সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ।

(বঙ্গবাণীর মারফত।)

আমি একদিন বালক ছিলাম। তখন আমি নির্জ্জনে নিভৃতে কখনো নদীর তীরে কখনো আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীর ছাদে আমার স্বপ্নলোকের মাঝখানে একলা দিন কাটিয়েছি। ক্ষণিকের বালুর উপর ক্ষণিক ছন্দের খেলাঘর গড়েছি। তার দরকার ছিল কি? যদি অনিত্যের বেদীর উপর অনিত্যের মূর্ত্তিকেই বসিয়ে থাকি তবে সেই ব্যর্থতার মূল্য পেলুম কোথায়? এই প্রশ্ন সেই শিশুকে জিজ্ঞাসা কর যে আষাঢ়ের নব বর্ষার জলস্রোতের উপর কাগজের নৌকা ভাসায়,—হিসাব করে দেখে না সেই বর্ষার জলটুকু কতক্ষণ থাকবে আর তার কাগজের নৌকাটিই বা কতক্ষণের নিত্যকার হিসাব বা প্রয়োজনের মূল্য দিয়ে সে নিজের কাজের পুরস্কার গণনা করে না। তার যা বিশুদ্ধ স্বভাব সেই স্বভাবটিকে মুক্তি দেওয়ার আনন্দই তাকে ভিতরে ভিতরে পুরস্কার দেয় বলেই সে এই খেলা খেলে।

সেই আমার নির্জ্জন দিনের স্বপ্ন বিহারের কথা আজ আমার মনে পড়ছে। সেই আমার ছাদের কোণ, সেই আমার নদীর ধার, আর তার মাঝখানে সেই আত্ম বিস্মৃত একলা বালক;—আর আজ এই রেঙ্গুন সহরে এই ঘরভরা সভার ভিড় কত তফাৎ। সেই নির্জ্জন উৎসের ক্ষীণ ধারাটি আজ এই কোন্ জনতার মাঝখানে এসে পৌঁছল। আমার মন বার বার বলে এই ঘাটে ত আমার আস্‌বার কথা ছিল না। আমি ত হাট করতে আসবার কড়ি নিয়ে সেদিন বেরুই নি।

আমি, কাগজের নৌকা বানিয়েছি, যে ছেলে তারই মত ছন্দের বাঁধনে স্বপ্নকে মূর্ত্তি দিয়েছিলুম—কেবলমাত্র স্বভাবের আনন্দে। কিন্তু সেই খেলার চারিদিকে কখন জানিনে খ্যাতি জমে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, কৌতূহলী লোকেরও ভিড় বেড়ে উঠ্‌ল। তারা বাহবা দিচ্ছে! মন ক্ষণে ক্ষণে বলছে আমি কি এর যোগ্য?

বিধাতা সৃষ্টি করেন একলা, তাঁর একলা আনন্দের থেকে তাঁর একলা আকাশের মাঝখানে। মানুষের সৃষ্টিও একা একা, তার একলা আকাশের মাঝখানে। সেই অবকাশকে যদি সবাই মিলে চাপা দেয় তবে তার পরিবর্ত্তে তারা যে কোন পুরস্কার দিক না তাতে ঐ মূল্য লোকসানের মূল্য মেলে না। বিধাতার আকাশ কেড়ে তাকে বেকার করে দিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঘণ্টা নেড়ে কি তাকে খুসি করবার কোনো মানে আছে?

কিন্তু যারা কর্ম্মী, যাঁরা জননায়ক, অবকাশ তাঁদের ক্ষেত্র নয়। জনসাধারণকে চারিদিকে নিয়ে পথ খনন করে' সেই পথে তাদের তাঁরা চালনা করেন। তাঁরা পদে পদে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেই সর্ব্বসাধারণের কাছ থেকে জয়ধ্বনি পান। তাদের পক্ষে সেই জয়ধ্বনির অর্থ আছে। সেই জয়ধ্বনির জোরেই তাঁরা কাজ চালাতে পারেন।

কবিই হোক আর কর্ম্মীই হোক, তাদের মনের মধ্যে নিজের কাজের একটা গৌরব বোধ থাকা চাই ত। কর্ম্মী তাঁর গৌরব পান সাধারণের কাছ থেকে, তাতেই তাদের সার্থকতা। তাঁদের সেই জয়ধ্বনি নিরন্তর হোক, তাঁদের সেই জয়যাত্রা অব্যাহত হোক্—দিনে দিনেই চারিদিক থেকে পথিকের অর্ঘ্য তাঁদের কাছে এসে পৌঁছক।

কিন্তু কবির যথার্থ গৌরব ত বাহিরের থেকে নয়, অন্তরের থেকে। তাঁর অন্তর্যামিনী বাণী হৃদয়াসনে বসে তাকে প্রসাদ বিতরণ করে থাকেন। এত কম কথা নয়। তবু যদি সে চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাত পাতে, যদি জনসাধারণের মুষ্টি ভিক্ষা তাকে প্রলুব্ধ করে তাহ'লে তার দেবীর কাছে কি জবাবদিহি করবে? তিনি বলবেন "আমার পাদপীঠে তোর স্থান, তুই কেন এমন রাস্তায় রাস্তায় কাঙ্গালের মত হাত পেতে বেড়াস্?" যদি তিনি তার বরাদ্দ বন্ধ করে দেন তাহ'লে কি দশা হবে? ইন্দ্র যখন তপস্যা ভঙ্গ করেন তখন ভাল জিনিস দিয়েই করেন। কিন্তু যে জিনিষ এক জায়গায় ভালো সেই জিনিষ অন্য জায়গায় পাপ। যে জিনিষ জননায়কের পুরস্কার সেই জিনিষই স্বপ্নচারীর প্রলোভন। তাতেই তাকে সাধন পথ থেকে ভ্রষ্ট করে।

এর চেয়ে যে অপমান অশ্রদ্ধা প্রত্যাখ্যান ভালো ছিল। কেননা ঋণ নিয়ে যাওয়ার চেয়ে ঋণী করে যাওয়া ভাল। সেই পাওনার ফর্দ্দ নিয়ে যদি কোন দিন মহাকালের দরবারে গিয়ে দাঁড়াতে পারি তাহ'লে আমার দেবতা আমাকে তাঁর আসনের ডান পাশে বসিয়ে বলবেন "আয়রে তোর পাওনা আমি শোধ করে দেব।" সে শোধ ত মানুষের হাত দিয়েই করাবেন। সে

পুরস্কার যদি জোটে সে ত বাইরের দিক থেকেই জুটবে। তেমন মজুরী মাত্রেরই মধ্যে ত কিছু লাঞ্ছনা আছে। কিন্তু সেদিন সেই বক্‌শিষের আঘাত বাজ্‌বে না। মৃত্যুর যবনিকা যে রক্ষা করবে। আজও রক্ষা করবার কিছু নেই।

যারা উপকার করে বা করতে পারে সম্মান তাদেরই পাওনা। আনন্দ দেওয়া যাদের কাজ তাদের প্রাপ্য হচ্ছে প্রীতি। সম্মান জিনিষটাকে খুব মোটা করে ফাঁপিয়ে তোলবার জন্যে তাতে বিস্তর ভেজাল চলে। যত রং-মশাল জ্বালাবে, যত ঢাক ঢোল বাজাবে, সম্মানের সমারোহটা ততই আকাশ পূর্ণ করবে। রাজপুত্র আসেন, ঘটা দেখে তিনি খুসি হন। কিন্তু প্রীতি সম্পূর্ণ অকৃত্রিম যদি না হয় তাহ'লে যে আগাগোড়া ঠকানো হ'ল। তাকে বড় আয়তন দিয়ে সেই ঠকাটাকে ত পূর্ণ করা যায় না। গোলে-হরিবোল-দেওয়া বলে একটা জিনিষ আছে। তাতে হরিবোলের চেয়ে গোলটাই বড় হয়ে উঠে। সেই কানে-তালা ধরানো গোলটাই সেখানে যথাযোগ্য, সেখানে গোল যারা করে তারাও খুসি হয়, গোল যারা পায় তারাও মেতে ওঠে। এই গোলমালের পাওনাটা হাটের পাওনা বাটের পাওনা, এতে সংখ্যা যত জোটে পরিমাণ যত বাড়ে ততই এর দাম। কিন্তু যে পিয়াসী প্রেম চায় সে যে খাঁটি রসটিকেই চায়, পরিমাণের উপর তার মূল্য নির্ভর করে না। আজ সভায় লোক ধরছে না। তাঁদের সকলেরই কাছ থেকে অকৃত্রিম প্রীতি আমি পাচ্ছি এই মোহ নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারব না। এঁদের অনেকেই আমার লেখা পড়েন নি, কেউ বা তা বোঝেন না, কারো বা তা ভালো লাগে না, সে জন্যে আমি কাউকে দোষ দিইনে। রুচি বৈচিত্র্য স্বাভাবিক। সকল মানুষের কাছে যে আদর পায় সে এমন কিছু পায়, বাইরে দেখতে তা যেমনই হোক্; তা অত্যন্ত সস্তা। সেই আদরের উঞ্ছবৃত্তি গৌরবের বিষয় নয়। আমি কোনদিন তা আশা করিনে, কোনদিন তা পাইওনে। অতএব আপনারা সভার তরফে আমাকে সাধুবাদ দিলেন, তার ষোলআনাই খাঁটী বলে আমি গ্রহণ করি না। যেহেতু বীজ জিনিষটা সজীব, এই জন্যেই তাকে ছাড়িয়ে দেবামাত্রই সব জায়গাতেই যে তার অঙ্কুর বেরবে, তার সম্ভাবনা নেই। পাথরের উপর পড়লে সে ব্যর্থ হয়ে যায়, নীরস মাটীতে পড়লে আজ অঙ্কুরিত হয়ে কাল শুকিয়ে যায়, সারালো মাটী পেলে তার অঙ্কুর বের হয়। কিন্তু যারা পাথর ছড়িয়ে পথ তৈরি করে তাদের সব মাটীতেই কাজ চলে; যারা পাথরের গাঁথুনি করে জয়স্তম্ভ তৈরি করে তাদের উর্ব্বরা মাটির অপেক্ষা নাই। তাই, যদি কবির কাব্য

সকল চিত্তেই সমান সফলতা না লাভ করে, যদি কোনো কোনো চিত্ত তাকে বর্জ্জন করে তাতে কবির পক্ষে দুঃখের কারণ নেই, কেন না তাতে এই প্রমাণ হয় যে কবির হাতে প্রাণের বীজ বপনের ভার।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করলে মিথ্যা বিনয় করা হবে যে এ সভায় আমার কাব্যের অনুরাগী, কেউ কেউ আছেন যারা আপন হৃদয়ের ভাণ্ডারে আমার কাব্যকে গ্রহণ করার দ্বারাই আমাকে ধন্য করেছেন। আমি আমার সেই বন্ধুদের পরিচয় জানিনে, পরিচয় জানিবার সময়ও আমার নেই! উদ্দেশে আমার সেই কয়জন অজানা সুহৃদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শোক-সংবাদ

এ বৎসর এ মাস (জ্যৈষ্ঠ) বড় দুঃখের মাস। অকস্মাৎ বঙ্গমাতার বক্ষে বজ্রাঘাত হইল— পুরুষ-শ্রেষ্ঠ আশুতোষ অসময়ে মহাপ্রস্থান করিলেন। স্যার আশুতোষ কে, কি ছিলেন, কিসে তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম রত্ন—তাহা বাঙ্গালীকে বলিয়া দিতে হইলে বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্য। আশুতোষের মহিমা কে না অবগত আছেন? বাঙ্গালীর তিনি আত্মীয়, বন্ধু, পথপ্রদর্শক—সহানুভূতির উৎস—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তক— নব্য-বাঙ্গলার আদর্শ—আড়ম্বরহীন স্বদেশী, পোষাক পরিচ্ছদে আচার-নিয়মে প্রকৃত হিন্দু— উদারতায় ঋষি—আরব্ধ কার্য্যে অটল, উচ্চ উদার মহান্—বহুগুণে আশুতোষ মহাদেবের ন্যায়ই বঙ্গের শিব; তাঁহার অভাবে আজ পল্লীতে পল্লীতে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে, এ শোকের সান্ত্বনা নাই! যাঁহার অলঙ্ঘ্য বিধানে আজ মহা-প্রাণ আশুতোষ বঙ্গকে মহাশোকে নিমজ্জিত করিয়া নিজালয়ে মহাপ্রস্থান করিলেন—তিনিই এই শোকসন্তপ্ত অধীর বঙ্গে সান্ত্বনার

বিধান করিবেন। এ শোক কেবল তাঁহার পরিবারবর্গের নহে—সমগ্র বঙ্গের—ভারতের—ইহাই তাঁহার পরিবারবর্গের একমাত্র সান্ত্বনা!

নশ্বর দেহের অবসানে আজ মহাত্মা আশুতোষের অতুলনীয় গৌরব-কীর্ত্তি হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিভাত, প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে অমর করিয়াছে।

** **

স্যার আশুতোষ চৌধুরীও আর ইহলোকে নাই। এককালে ইন্দ্রচন্দ্রের পতন হইয়াছে। ২৩শে মে স্যার চৌধুরী মহাপ্রস্থান করেন—২৫শে মে স্যার মুখোপাধ্যায়ের দেহত্যাগ ঘটে, উভয়েই বঙ্গের সন্তানের মত সন্তান; উভয়ের কার্য্যক্ষেত্রও প্রায় এক ছিল। ইহাদের তিরোধানে সমগ্র বঙ্গ হাহাকার করিতেছে। পাবনা জেলাস্থ হরিপুরের চৌধুরী বংশ বুনিয়াদি জমীদার, বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের প্রসিদ্ধ কাপ বংশ, আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পিতা ছিলেন চৌধুরী বংশের গৌরব! তিনি ছিলেন সময়ের অগ্রগামী পুরুষ, দৃঢ়কল্প—তিনি যাহা সু বলিয়া বুঝিতেন কিছুতেই তাঁহাকে তাহা হইতে টলাইতে পারিত না;—তিনি সামাজিক কুপ্রথাকে অগ্রাহ্য করিয়া যখন পুত্রগণকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিলাতে প্রেরণ করেন তখন তাঁহাকে কম সহ্য করিতে হইয়াছিল না; কন্যা প্রসন্নময়ীকে তিনি পুত্রের ন্যায়ই সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। সেকালের সমাজ তাঁহাকে সেজন্য নির্য্যাতন করিতে ছাড়ে নাই! কিন্তু আজ এই মহাপ্রাণ পিতার অটল দৃঢ়তার, উদারতার ফলে স্যার আশুতোষ প্রমুখ প্রত্যেকটি পুত্রই বঙ্গের বিশেষতঃ পাবনার গৌরব-রত্ন রূপে বিবেচিত। স্যার আশুতোষ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ! সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যায় অনুরাগী ছিলেন—আশুতোষের জীবনী শিক্ষিত সমাজের আদর্শ! তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় জীবন উন্মেষের বিধি-ব্যবস্থায় তিনি অনেক করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী স্বনামধন্যা প্রতিভা দেবী, দুই বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করেন, পত্নীর মহাপ্রস্থানে স্বামীর হৃদয় বুঝি শতধা করিয়াছিল—তিনি ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। কর্ম্মীর কর্ম্মজীবনের স্রোত সমভাবে প্রবাহিত হইলেও গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল, পরপারে নিবদ্ধ হইয়াছিল যে দৃষ্টি

আজ তাহা ধরাগৃহে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল! সে শিখা নিশ্চয়ই আজ অমরলোকে, প্রতিভার মিলনে উদ্ভাসিত উজ্জ্বল—সেই কল্পনাই আমাদের আজ সান্ত্বনা!

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আমরা নানা গোলযোগে এক মাস পিছাইয়া পড়িয়াছি। জ্যৈষ্ঠের প্রসঙ্গ বৈশাখে লিখিতে হইতেছে। সহৃদয় গ্রাহকগ্রাহিকা আমাদিগকে অবস্থা বিবেচনায় ক্ষমা করিবেন।

* * * * *

তুফানগঞ্জ ও সদরমহকুমার স্থানে স্থানে আজও কলেরা চলিতেছে। সরকার হইতে রোগ নিবারণের জন্য কম চেষ্টা হইতেছে না—তথাপি একস্থানে না একস্থানে কলেরা লাগিয়াই আছে। এই সংক্রামক ব্যাধিতে বহু লোক এবার অকালে প্রাণ হারাইল। অধিবাসীবর্গ আতঙ্কে দিশাহারা হইয়াছে কিন্তু রোগপ্রতিকারের চেষ্টা তাহাদের কমই। সাধারণের মধ্যে অনেকেই ওলাউঠাকে অপদেবতার কোপদৃষ্টি মনে করিয়া রোগী ছাড়িয়া পলাইতেও দ্বিধাবোধ করে না। অনেক স্থলে মৃত ব্যক্তি ঐ অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে, সরকারী লোককে তাহাদের সৎকারের ব্যবস্থা করিতে হয়। পান ভোজনাদি সম্বন্ধেও অনেকেই সাবধান নয়। দেখা গিয়াছে একটি বাড়ীর অধিকাংশ ব্যক্তি এককালে ওলাউঠার আক্রান্ত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির মৃত্যু ঘটিলে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরা অন্যত্র পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে। ইহাদের কয়েকজন সহরের নিকট এক বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া ছিল। তথায় ইহাদের একজন ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সঙ্গীরা পলায়ন করে। অবশেষে সেই রোগীকে সরকারী হাসপাতালে লওয়া হয়। তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রোগবীজ গ্রামে গ্রামে সংক্রামিত হইতেছে। অধিবাসীবর্গের মনের এই আতঙ্ক ও কুসংস্কার দূর করিতে না পারিলে কেবল চিকিৎসার দ্বারা রোগ সংক্রমণ নিবারণের আশা কম। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে উক্ত বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী একটি পঙ্কিল ডোবার জল

ব্যবহারের ফলেই একমাত্র এতগুলি লোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়াছিল। গ্রামের অধিবাসীবর্গ প্রাণ ভয়ে আতঙ্কিত হইলেও ঐ ডোবার জল যে, রোগের কারণ তাহা বোধহয় বিশ্বাস করে নাই। কেন না সরকার পক্ষ হইতে ডোবার জল ব্যবহারের বিপদ সকলকে বুঝাইয়া দিয়া বারবার নিষেধ করা হইলেও গ্রামের অধিবাসীবর্গ সুযোগ পাইলেই সেই জলই ব্যবহার করিয়াছে। ওলাউঠায় কারণ, কিরূপে এই দুরন্ত ব্যাধি সংক্রামিত হয় তাহার বিবরণ, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এ ব্যাধিকে দূরে রাখা যায় তাহা নিরক্ষর অধিবাসীবর্গকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলে—তাহাদের মনে তাহা গাঁথিয়া দিতে পারিলে তবে যদি এ রোগের প্রতিকার হয়। এ দেশে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব পূর্ব্বে বড় ছিল না ইহার প্রকৃতি সহিত এদেশের কৃষকগণ কমই পরিচিত। তাহারা ইহাকে 'দেও' বলিয়াই জানে ও দেওয়ের প্রসন্নতা লাভের জন্য ওঝার সাহায্যে পূজা দিয়াই আত্মরক্ষা করিতে চায়। এ বিশ্বাসটী তাহাদের মন হইতে দূর করিতেই হইবে। কলেরায় রোগীকে বিশেষ ভাবে দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা প্রয়োজন, এ রোগে রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তনও অল্প সময়ে ঘটে ; গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সরকারী ডাক্তারগণের পক্ষে রোগীর নিকটে সর্ব্বদা থাকিয়া এরূপ ভাবে ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। আমাদের মনে হয় সরকার হইতে ধারক-ঔষধ স্থানীয় পঞ্চাইতের নিকট রাখিলে সুফল ফলিতে পারে। পেটের অসুখে বা ওলাউঠা আক্রান্ত হইবা মাত্রই যদি ক্যাম্ফার বা ক্লোরোডাইনের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে অনেক লোক রক্ষা পাইবে। রোগের মুখে একটা ঔষধের ব্যবস্থা হইলে পরে রোগ সঙ্কটাপন্ন হইবার পূর্ব্বেই সরকারী ডাক্তার গিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন।

* * * * *

ভুকানগঞ্জ মহকুমায় এবার গো-মড়কও কম অনিষ্ট করিল না। সরকার হইতে গো-মড়ক নিবারণের জন্য ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহার ফলে রোগ কমিয়া আসিলেও একবারে দূর হয় নাই। সুস্থ পশু যাহাতে রোগাক্রান্ত না হয় তাহার জন্য ইনকুলসন করা হইতেছে কিন্তু আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা তেমন হইতেছে না। সরকার হইতে সত্বর ইহার ব্যবস্থা হইবে।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
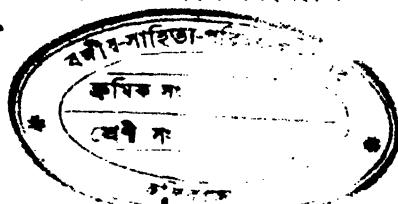
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৮ম বর্ষ। } শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

ঘর মুখে।

—০:*:০—

রোদে ঘুরে ঘুরে ফিরিতেছি আজ
মেঠো পল্লীর আওতাতে,
শত তীর্থের স্মৃতি ডুবে যায়
আবার মায়ার মৌতাতে।
ভাবি তবু দিন রাত্রি রে
হতে হবে পুন যাত্রি রে,
কত মণি মোর হল সঞ্চয়
ছোট এ মনের কৌটাতে।

(২)

ঝাঁক বেঁধে বেঁধে আসিতেছে স্মৃতি
মানসের সরে সাঁতরাতে
মোছা ছবি সব করিছে নূতন
রঙ বুলাইয়া আদরাতে
অজ্ঞাত শত পণ্য গো
করিছে এ বুক ধন্য গো,
নিশ্চল আঁখি পল্বল জলে
ফুটে উঠে 'রাকা' চাঁদ রাতে।

(৩)

সব ভ্রমণের শেষের ভ্রমণ
বড়ই দূরের পাল্লা সে,
নামেই যে হয় অবশ শরীর
হস্তে ও পদে খাল্ আসে,
সে দিনো এমনি রঙ্গে হায়
এতই কি স্মৃতি সঙ্গে যায়
সে দিনো কি মন নাচে খণেখণ
গৃহ দরশন উল্লাসে!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বৌদ্ধ-দর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

(২)

সামান্য বিশেষ অস্তিত্ব

বৈশেষিকগণ ও নৈয়ায়িকগণ কহিয়া থাকেন সামান্য বা Universalএর সহিত সংযোগ হইতেই অস্তিত্বের উদ্ভব হয়, যথা,—"মনুষ্য" এই সামান্যের সহিত আমার সংযোগ হওয়াতে আমার অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং এই সংযোগের পূর্ব্বে অস্তিত্বের কোন নাম গন্ধ থাকে না। তাহা হইলে সামান্য বা Universal, বিশেষ বা Particular এবং উহাদের সহিত জড়িত কোন বস্তুই উল্লিখিত সংযোগের পূর্ব্বে অস্তিত্বের দাবী করিতে পারে না। সুতরাং তাহারা সকলেই অবাস্তব বা অলীক।

সংযোগ দ্বিবিধ

এইখানে দুই রকম সংযোগ কল্পিত হইয়াছে। এক প্রকার সংযোগে বিশেষ সামান্যের অংশ গ্রহণ করে অর্থাৎ সামান্য আসিয়া বিশেষের মধ্যে প্রবেশ করে। রস যেমন শিকড়ের মধ্য দিয়া গাছের সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে তদ্রূপ সামান্য বিশেষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অস্তিত্বশালী করিয়া তুলে। আর এক রকম সংযোগ আছে যাহাতে সামান্য ও বিশেষ পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত ঘেসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু কেহ কাহারও মধ্যে প্রবেশ করে না, যেমন চিনি ও কড়াতের গুঁড়া একত্র মিশাইলে কেহ কাহারও মধ্যে প্রবেশ করে না অথচ পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত ঘেসিয়া থাকে। বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণের মতে উক্ত প্রথম প্রকার সংযোগ হইতে অস্তিত্বের উৎপত্তি হয়। সুতরাং ঐ প্রকার সংযোগের পূর্ব্বে অস্তিত্বের অভাব ছিল। সেই জন্য ঐ সংযোগের পূর্ব্বে সামনা বিশেষ ইত্যাদি যে বিদ্যমান ছিল তাহা বলা সঙ্গত নয়। কিন্তু বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণ সেইরূপ কথাই বলেন। বৌদ্ধগণের মতে তাঁহাদের মত যথার্থ নহে।

সুতরাং সংযোগের পূর্ব্বে অস্তিত্বের অভাব।

ইহা হইতে বুঝা গেল সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়িত্বের বা সংযোগের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কারণ (১) বিশেষের সহিত সংযুক্ত না হইলে সামান্য কোন কার্য্য করিতে পারে না ; (২) বিশেষ সামান্যের সহিত সংযুক্ত না হইলে কার্য্যক্ষম হয় না ; (৩) সামান্য এবং বিশেষ না থাকিলে সমবায়িত্ব অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে ; এবং পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অস্তিত্ব = কার্য্য করিবার ক্ষমতা = কার্য্য কারণত্ব = Pratical efficiency.

যদি ধরা যায় যে সামান্য, বিশেষ এবং সমবায় ইহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অস্তিত্ব নিজ নিজ স্বরূপ হইতে উদ্ভূত তাহা হইলে অনেকগুলি স্বাধীন বিভিন্ন প্রকারের অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া যায় এবং সামান্য বা Universalএর মহিমা আর টিকিয়া থাকে না।

সামান্যের অসত্যতা সম্বন্ধে দোরোখা যুক্তি।

সামান্যের অসত্যতা নিম্নলিখিত দোরোখা যুক্তি দ্বারাও প্রমাণ করা যায়।

হয় সামান্য সকল বিশেষের মধ্যে বর্ত্তমান আছে নয় উহাদের মধ্যে বর্ত্তমান নাই।

যদি বলি বর্ত্তমান নাই তাহা হইলে সামান্য বিশেষ হইয়া পড়ে।

যদি বলি বর্ত্তমান আছে তাহা হইলে সূত্র যেমন মণিমালার মধ্যে অবস্থান করে সামান্যকে আমরা সেই ভাবে বর্ত্তমান থাকিতে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু সামান্যকে আমরা সর্ষপ, পর্ব্বত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ক্ষণস্থায়ী বস্তুর মধ্যে একভাবে সূত্রের মত চলিয়া যাইতে দেখিতে পাই না।

সুতরাং সামান্য যে বহু বিশেষের মধ্যে বর্ত্তমান কিম্বা অবর্ত্তমান ইহার কোনটিই স্বীকার করিতে পারি না।

এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাইতে পারে সামান্য নিম্ন স্তরের সমস্ত পদার্থে অর্থাৎ প্রত্যেক বিশেষেই বর্ত্তমান আছে কি না? যদি স্বীকার করা যায় সামান্য বিশেষেই বর্ত্তমান আছে তাহা হইলে সকল বিশেষই এক হইয়া যায়, উহাদের বৈশিষ্ট্যের কণামাত্রও থাকে না। সুতরাং সামান্য সকল বিশেষেই বর্ত্তমান আছে স্বীকার করিলে বিশেষের খিঁচুড়ী মানিতে হয়। কিন্তু এই প্রকার বিশেষের খিঁচুড়ী সম্ভবপর নয়। সুতরাং প্রশস্ত পাদ যে বলেন সামান্য সকল বিশেষেই বর্ত্তমান তাহা অসত্য।

সামান্য প্রত্যেক বিশেষে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না।

সমস্ত ঘটেই সামান্য থাকিতে পারে।

ঘট সম্বন্ধে দোরোখা যুক্তি।

যদি বলা যায় সামান্য সর্ব্বত্র অবস্থান করে না, ইহা শুধু এক শ্রেণীর সমস্ত বিশেষে অবস্থান করে, তাহা হইলে ধরা যাউক ঘট শ্রেণীর সমস্ত ঘটের সহিত ঐ সামান্যের কি সম্পর্ক দাঁড়ায়। মনে করা যাউক একটি নূতন ঘট প্রস্তুত হইল। এখন এই ঘটের মধ্যে সামান্য কেমন করিয়া প্রবেশ করিল? পূর্ব্বে যে সকল ঘট বর্ত্তমান ছিল সামান্য হয় সেই সব ঘট হইতে আসিয়াছে নয় সেই সব ঘট হইতে আসে নাই। এই দুইটির একটি মানিতে আমি বাধ্য। যদি স্বীকার করি পূর্ব্বের ঘট হইতেই আসিয়াছে তাহা হইলে মানিতে হয় সামান্য কোন বস্তু বিশেষ, কারণ একমাত্র বস্তুরই গুণ ও গতি থাকা সম্ভবপর, কিন্তু সামান্যকে কেহ বস্তু বিশেষ বলিয়া ভাবিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে উহা বিশেষে পরিণত হয়। সুতরাং আমরা বলিতে পারি না সামান্য আগেকার ঘট হইতে নূতন ঘটে চলিয়া আসে।

নূতন ঘটে সামান্য কোথা হইতে আসে।

আবার যদি স্বীকার করি আগেকার ঘট হইতে সামান্য নূতন ঘটে আসে না তাহা হইলে মানিতে হয় সামান্য এই নূতন ঘটের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না। তাহা হইলে সামান্য যে সর্ব্ব ঘটেই বিরাজিত এ কথা আর বলা চলে না।

ধ্বংস প্রাপ্ত ঘট হইতে সামান্য কোথায় যায়।

এই সম্পর্কে আরও প্রশ্ন উঠে ঘট যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তখন সেই সঙ্গে ঐ ঘট মধ্যস্থিত সামান্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, না বাঁচিয়া থাকে, না অন্যত্র চলিয়া যায়? যদি বলি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে সামান্য অবলম্বনশূন্য হইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অবলম্বন বা বিশেষের আশ্রয় ব্যতীত যে সামান্য থাকিতে পারে এ কথা কেহ স্বীকার করে না। সুতরাং ঘট ধ্বংসের পর যে সামান্য বাঁচিয়া থাকে এ কথাও কেহ স্বীকার করিতে পারে না। যদি বলি ঘট ধ্বংসের সহিত সামান্যও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সামান্য ক্ষণস্থায়ী হইয়া পড়ে, উহার সনাতনত্ব আর মানা চলে না। আর যদি বলি সামান্য ধ্বংস প্রাপ্ত ঘট হইতে অন্যত্র চলিয়া যায় তাহা হইলে সামান্য বস্তু বিশেষ হইয়া পড়ে, কারণ বস্তু বিশেষেরই গুণ ও গতি থাকা সম্ভবপর, সুতরাং সামান্য ও বিশেষে আর প্রভেদ থাকে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে সামান্য স্বীকার করিলে কোন দিক দিয়াই অগ্রসর হওয়া যায় না। অতএব আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে সামান্য অসত্য। এই জন্যই বৌদ্ধগণ বিদ্রূপ করিয়া কহিয়া থাকেন—

সামান্য সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের উক্তি।

(ক) যে একস্থানে অবস্থান করিয়া এবং সে স্থান হইতে বিন্দুমাত্রও না নড়িয়া অন্য স্থানে আপনাকে জন্মাইতে বা প্রকাশ করিতে পারে তাহার বাহাদুরী নিশ্চয়ই খুব বেশী।

(খ) এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার যে একটি সত্তা (যেমন সামান্য) এক বস্তুতে অবস্থান করে অথচ সেই বস্তুর সহিত তাহার কোন বন্ধন বা সংযোগ থাকে না অথচ ঐ বস্তুর সহিত সেই সত্তা অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজড়িত।

(গ) আরও মুস্কিল এই যে ঐ সত্তাটি কোথাও চলিয়া যায় না, পূর্ব্ব হইতেও কোন বস্তু বিশেষে থাকিতে পারে না এবং পরও ইহা বস্তু বিশেষ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে পারে না।

এক বহুর মধ্যে থাকিতে পারে কি না?

সুতরাং সামান্য স্বীকার করা যে কত বড় মুস্কিলের ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহা সত্বেও যদি প্রতিপক্ষ জিজ্ঞাসা করেন কি হইলে তবে এক বহুর মধ্যে থাকিতে পারে তবে বৌদ্ধগণ বলিবেন বহু এবং একের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য না থাকে তাহা হইলেই এক বহুর মধ্যে থাকিতে পারে। এই সম্পর্কে আরও বলা যাইতে পারে যে 'বহু' বা 'অনেক' স্বীকার করিলেই পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়! সুতরাং পার্থক্যবিহীন বহু সম্ভবপর নয়। তাহা হইলে পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে এক কখনই বহুর মধ্যে থাকিতে পারে না। এইখানেই মাধবাচার্য্য বৌদ্ধগণের সামান্য বিষয়ক আলোচনা শেষ করিয়া দিয়াছেন।

সার্ব্বজনীন দুঃখবাদ।

এ জগতের সমস্তই যে দুঃখ পরিপূর্ণ দুঃখ সংশ্রব ব্যতীত এ জগতে যে কিছুই নাই তাহা বৌদ্ধগণ অতি সহজে প্রমাণ করিয়াছেন। সকল প্রকার দার্শনিকেরই এ সম্বন্ধে এক মত, কারণ তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে জন্মান্তর সম্পন্ন যত প্রকার অস্তিত্ব তাহা দুঃখ পরিপূর্ণ, এবং

দুঃখ কিসের মত? এই প্রশ্নের উত্তর।

সেইজন্যই তাঁহারা ঐ দুঃখের ধ্বংস সাধন করিতে ইচ্ছুক এবং সেই দুঃখ ধ্বংস সাধনেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা কোন পথ অবলম্বন করিলে দুঃখের নাশ হয় তাহা আবিষ্কার করিতে সচেষ্ট। সুতরাং সকলেই স্বীকার করে এ জগত দুঃখ পরিপূর্ণ, সেইজন্য দুঃখবাদ সত্য। যদি প্রতিপক্ষ এই সম্পর্কে প্রশ্ন করেন—দুঃখ যেন মানিলাম কিন্তু আসল কথা হইতেছে দুঃখটা কিসের মত। দুঃখ স্বীকার করিলেও বৌদ্ধগণকে দেখান উচিত দুঃখ কিসের মত।

এই প্রশ্নের উত্তরে বৌদ্ধগণ বলেন—এইরূপ প্রশ্নই সম্ভবপর নয়। কারণ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে সকলই ক্ষণস্থায়ী এবং সামান্য বলিয়া কোন কিছু নাই। উহা হইতে দাঁড়ায় এই প্রত্যেক বস্তু বা অস্তিত্ব বিভিন্ন প্রকারের, সুতরাং একের সহিত অপরের সাদৃশ্য থাকা সম্ভবপর নয়। সেই জন্য দুঃখের সহিত অন্য কোন বস্তুরই সাদৃশ্য থাকিতে পারে না। সুতরাং বুঝা গেল প্রত্যেক বস্তু বিভিন্ন প্রকারের, একের সহিত অপরের কোন সাদৃশ্য নাই। এইখানে একটু টীকা আবশ্যক। পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ কহিয়াছেন identity বা সমধর্ম্মত্বের উপর নির্ভর করিয়া সার্ব্বজনীন সত্য বা Universal truth পাওয়া যায়। সার্ব্বজনীন সত্য মানিলে সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিতে সামান্য মানিতে হয়। কিন্তু বৌদ্ধগণ সামান্য মানেন না। এইখানে পরস্পর বিরোধী সত্য বৌদ্ধগণ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া বোধহয়। আবার সমধর্ম্মত্ব বা identity মানিলে কেমন করিয়া বলা যায় প্রত্যেক বস্তুই বিভিন্ন প্রকারের অর্থাৎ একের সহিত অপরের কোন সাদৃশ্য নাই। এখানেও একটি বিষম খট্‌কা আছে বলিয়া বোধ হয়।

এখন চতুর্থ মহাসত্য শূন্যবাদের কথা হইবে। এই শূন্যবাদ মাধ্যমিকগণের বিশেষত্ব।

শূন্যবাদ

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে সকলই ক্ষণস্থায়ী বা momentory, সুখানুভূতি ভ্রমাত্মক কারণ সকলই দুঃখপূর্ণ, সামান্য জ্ঞান ও অনন্য পরতন্ত্র সত্তার জ্ঞান এতদুভয়ই ভ্রমাত্মক। এই চারিটি মহাসত্য হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে জগতের অভ্যন্তরে, বা কোন বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে কিছুই নাই। বস্তু, ব্যক্তি এবং জগতের গুণাবলী পরিবর্ত্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী, সাদৃশ্যবিহীন এবং ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন। সুতরাং ঐ সকল গুণের উপর বহিস্থিত বস্তু, ব্যক্তি বা জগতের কোন দাবীদাওয়া থাকিতে পারে না। তাহা

বস্তুর গুণ ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ ∴ বস্তুতে অবস্থিত নহে।

হইলে দাঁড়াইল এই যে বস্তু, ব্যক্তি বা জগতের গুণ জ্ঞান ভ্রমাত্মক, কারণ সাধারণতঃ আমরা ঐ সকল গুণ বস্তুতেই আরোপ করিয়া থাকি। এইটুকু স্বীকার করিলে প্রশ্ন উঠে তাহা হইলে গুণাতিরিক্ত বস্তুতে কি আছে, এবং সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কি ?

বৌদ্ধগণ বলেন বস্তু সম্বন্ধে গুণাতিরিক্ত আমাদের কোন জ্ঞান নাই। গুণাতিরিক্ত কোন কিছু আমরা জানি না। সুতরাং বস্তু বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা একেবারে ফাঁকা বা শূন্য। কারণ বস্তুতে গুণও নাই গুণাতিরিক্ত কোন কিছু নাই। এই জন্যই মাধ্যমিকগণ বলিয়া থাকেন শূন্যবাদ সত্য, বুদ্ধদেব শূন্যবাদই শিক্ষা দিয়াছেন। শূন্যবাদ যে সত্য তাহা আমরা প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারাই বুঝিতে পারি। সন্ন্যাসী যেমন অন্যের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় বুদ্ধদেবও তদ্রূপ ধীরে ধীরে জাগতিক পরিবর্ত্তনশীলতা ও ক্ষণস্থায়ীত্বের উপর নির্ভর করিয়া এবং ক্রমে ক্রমে সুখ, সামান্য এবং অনন্য-পরতন্ত্র-সত্তা অস্বীকার করিয়া অবশেষে শূন্যবাদ আসিয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং মাধ্যমিকদের মতে বুদ্ধদেব শূন্যবাদী।

গুণাতিরিক্ত জ্ঞান অসম্ভব।

Reality বা বস্তু বলিয়া যে কোন কিছু নাই তাহা মাধ্যমিকগণ রৌপ্য দ্বারা বুঝাইয়াছেন। রৌপ্য আমরা সত্য বস্তু বলিয়া জানি। তর্কের জোরে মাধ্যমিকগণ দেখাইয়াছেন যে আমাদের এই রৌপ্যতে সত্যবস্তু জ্ঞান সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যায় জাগ্রত অবস্থায় কিম্বা নিদ্রিত অবস্থায় আমরা রৌপ্য বা ঐরূপ কোন বস্তুই দেখিতে পারি না। যাহা দেখা যায় তাহাই যদি সত্যবস্তু বলিয়া ধরিতে হয়। তাহা হইলে রৌপ্য সম্পর্কিত দৃষ্টিও সত্যবস্তু হইয়া পড়ে, যে রংএর উপর রৌপ্যের বিশিষ্ট স্বভাব প্রতিষ্ঠিত তাহাও সত্যবস্তু হইত, যে রৌপ্য ঐ রংএর উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভ্রম করিয়া বিশ্বাস করি তাহাও সত্যবস্তু হইত, ঐ রং এবং রৌপ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক বা সংস্রব তাহাও সত্যবস্তু হইত, উহাদের অঙ্গাঙ্গী ভাবে সমাবেশনও সত্যবস্তু হইত—ইত্যাদি যত কিছু রৌপ্য সম্পর্কিত জ্ঞান সত্য হইত। কিন্তু উহাদের প্রত্যেকটাই যে সত্যবস্তু তাহা কেহ স্বীকার করেন না। সুতরাং যাহা আমরা রৌপ্য সম্পর্কে দেখি তাহাই সত্য বলিতে পারি না। যদি প্রতিপক্ষ বলেন দ্রষ্ট বিষয়ের কতকাংশ

Reality বা বস্তু অসত্য

E. J. রৌপ্য বস্তু অসত্য।

যাহা দেখা যায় তাহাই সত্য নহে।

অসত্য এমনও ত হইতে পারে। ইহার উত্তরে বৌদ্ধগণ বলেন এই রকম অর্দ্ধেক সত্য সম্ভবপরও নয়, স্বীকার্য্যও নয়, কারণ আমরা মনেই করিতে পারি না যে একটী মুরগীর একাংশ রন্ধন করিবার নিমিত্ত পৃথক করিয়া রাখিয়া অপরাংশ ডিম পারিবার জন্য রাখা কখনও সম্ভবপর বা সত্য হইতে পারে। এই জন্যই বুদ্ধদেব কহিয়াছেন যে আমাদের রৌপ্য-জ্ঞান সমষ্টি যথা—রৌপ্যবস্তু, রং (যাহার উপর রৌপ্যবস্তু প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া আমরা ভ্রম ক্রমে দেখি), উহাদের সম্পর্ক এবং সংযোগ, রৌপ্য সম্পর্কিত দৃষ্টি এবং ঐ দৃষ্টির বিষয় এই জ্ঞান সমষ্টির যে কোন একটি অসত্য হইলে (অর্থাৎ সত্য বস্তু না হইলে) উহাদের প্রত্যেকটিই অসত্য হইয়া পড়ে অর্থাৎ সমগ্র রৌপজ্ঞান সমষ্টিই অসত্য হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য উহাদের প্রত্যেক অংশেই শূন্যতা বিরাজ করে।

কোন বস্তুর অর্দ্ধেক সত্য আর অর্দ্ধেক অসত্য হইতে পারে না।

সর্ব্ব-দর্শন সংগ্রহস্থিত এই অংশটি অত্যন্ত জটীল এবং অস্পষ্ট। এই সকল দুর্বোধ্য উপমা ও ব্যাখ্যা না দিয়া মাধ্যমিকগণ বলিতে পারিতেন—পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে (১) নিত্যবস্তু নাই (২) সকলই ক্ষণস্থায়ী (৩) সামান্য অসত্য এবং (৪) সুখ জ্ঞান ভ্রমপূর্ণ। সুতরাং বস্তু, ব্যক্তি বা জগতের মধ্যে নিত্যবস্তু বা Noumenon বলিয়া কিছুই নাই অর্থাৎ একদিকে আত্মা নাই, অন্যদিকে বস্তুর মধ্যে কোন নিত্য পদার্থ বা Matter নাই, সুতরাং সকলই শূন্য, সকলই ফাঁপা। কিন্তু পূর্ব্বে ক্ষণস্থায়ীত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, দুঃখ স্বীকৃত হইয়াছে এবং বিশেষও স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে জাগতিক শূন্যতা মাধ্যমিকগণ কি করিয়া প্রতিপন্ন করেন? ইহার মীমাংসা মাধ্যমিকগণ করেন নাই। তবে বোধ হয় তাহারা বলিতেন এই যে ক্ষণস্থায়ীত্ব জ্ঞান, দুঃখ জ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞান ইহাদের কোনটীই Positive জ্ঞান নহে। ক্ষণস্থায়ীত্ব হইল নিত্যতার অভাব, দুঃখ হইল সুখের অভাব আর বিশেষ হইল সামান্যের অভাব সুতরাং কোনটিই Positive বা ভাব জ্ঞান নহে, সকল কয়টিই অভাব জ্ঞান বা Negative Knowledge. দেকার্ত্তে তাঁহার বিশ্বগ্রাসী সংশয়কে (Doubt) পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন কিন্তু মাধ্যমিকগণ শূন্যবাদ পরিত্যাগ না করিয়া তাহার মধ্যেই বোধ হয় ডুবিয়া

সকলই শূন্য বা অসত্য বলিলে দুঃখ প্রভৃতি শূন্য বা অসত্য হয় কিনা।

শূন্যবাদ ও নাস্তিকতা।

মরিয়া ছিল নয় যোগাচার প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং সম্ভবতঃ বেদান্তেও জন্ম দিয়াছিল। এই যে নিত্যবস্তু বা Reality যাহা শূন্য বা অসত্য বলিয়া মাধ্যমিকগণ উড়াইয়া দিলেন তাহা কি আমাদের জগতস্রষ্টা ও নিয়ন্তা পরমেশ্বর বা ভগবান? যদি তাহাই হয় তবে বৌদ্ধ দর্শন যে নিরীশ্বর দর্শন হইয়া পড়ে তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। কপিল বলিয়াছিলেন ঈশ্বর অসিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা তাঁহাকে সাব্যস্ত করা যায় না। মাধ্যমিকগণ আরও একপদ অগ্রসর হইয়া কহিলেন ঈশ্বর শুধু অসিদ্ধ নয়, তিনি একেবারে অসত্য, অন্তঃসারবিহীন বিরাট-শূন্য।

নিত্যবস্তু সম্বন্ধে চৌ-কোণা যুক্তি।

মাধ্যমিকগণ আরও বলেন যে গোড়ার এই নিত্যবস্তু বা ultimate principle (God ও বলা যাইতে পারে) একেবারেই শূন্য, কারণ ইহাকে আমরা সত্যও বলিতে পারি না, অসত্যও বলিতে পারি না, একসঙ্গে সত্য এবং অসত্য তাহাও স্বীকার করিতে পারি না, আবার ইহাও একসঙ্গে পারি না যে উহা সত্যও নয় অসত্যও নয়। অর্থাৎ (১) সত্য, (২) অসত্য, (৩) সত্য-অসত্য, (৪) সত্য নয়—অসত্য নয়, এই চারিটির কোনটিই আদিস্থিত নিত্যবস্তুর প্রতি আরোপ করিতে পারি না। সেইজন্য আদিস্থিত নিত্যবস্তু শূন্য।

এই সম্বন্ধে ঘটের উপমা।

নিত্যবস্তু ঘটের মত হইতে পারে কি না?

এই সকল কথার কোন যুক্তি না দিয়া মাধ্যমিকগণ একটি উপমা দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ উপমার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা কঠিন। (ভাষায় প্রকাশ করা আরও কঠিন।) মাধ্যমিকগণের মতে আদিসত্ত্বা, নিত্যবস্তু বা বাস্তবতা যদি ঘটের মত হইত তাহা হইলে কুম্ভকারের কার্য্য বা বাস্তবতার কর্ম্মকর্ত্তার কার্য্য একেবারেই অপ্রয়োজনীয় হইত। কিন্তু আমরা জানি কুম্ভকারের কার্য্যটি অপ্রয়োজনীয় নয় কারণ ঐ কার্য্য না হইলে ঘটের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে পারি যে আদিসত্ত্বা, নিত্যবস্তু বা বাস্তবতা ঘটের মত নয়। বাস্তবজ্ঞান সাধারণতঃ ঘটজ্ঞানের ন্যায় বলিলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু বাস্তবতা ঘটের ন্যায় হইলে কেন যে কুম্ভকারের কার্য্যটি অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে তাহা মাধ্যমিকগণ দেখান নাই। পূর্ব্বে যে সকল যুক্তি দ্বারা তাঁহারা রৌপ্যের অবাস্তবতা প্রতিপন্ন করিয়া শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন

সে সকল যুক্তি অনায়াসে তাঁহারা ঘটের প্রতি প্রয়োগ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা সে ভাবে অগ্রসর না হইয়া ঘট সম্পর্কে নূতন যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। বোধ হয় এই সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্যের মর্ম্ম এই—যাহা বাস্তব তাহা চিরকালই বাস্তব বলিয়া ধরা কর্ত্তব্য। যাহা অতীত-কালে ছিল না, বর্ত্তমানে আছে, আবার ভবিষ্যতে লুপ্ত হইবে তাহা ভঙ্গুররূপে ক্ষণস্থায়ী, তাহাকে বাস্তব বলা অসঙ্গত। আমাদের বাস্তবতা জ্ঞান ঘট জ্ঞানের অনুরূপ।

বাস্তবতা সম্বন্ধে বৌদ্ধ মত।

কিন্তু ঘট বাস্তব কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ঘট যদি বাস্তব হইত তাহা হইলে উহা চিরকালই বর্ত্তমান থাকিত, কুম্ভকারের তাহা হইলে কোন প্রয়োজন হইত না। কিন্তু ঘট চিরকাল থাকে না। কুম্ভকার তাহার জন্মদাতা এবং ভবিষ্যতে ঘট ধ্বংস প্রাপ্ত হয় সুতরাং ঘট বাস্তব নহে।

যাহা বাস্তব তাহা চিরকালই বাস্তব।

ঘটকে আমরা অবাস্তবও বলিতে পারি না, কারণ তাহা হইলে উহা বরাবরই অবাস্তব থাকিত, কোন ব্যক্তি বা অবস্থা ঘটকে অবাস্তব রাজ্য হইতে টানিয়া আনিয়া বাস্তব রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত না। কিন্তু আমরা দেখি কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করে এবং সেই ঘট আমরা ব্যবহার করি। সুতরাং ঘট যে অবাস্তব নহে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

যাহা অবাস্তব তাহা চিরকালই অবাস্তব।

এইরূপ যুক্তির আভাস আমরা নিম্নলিখিত দুইটি সূত্র হইতে পাই। মাধ্যমিকগণ এই সূত্র দুইটি ঘট সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথম সূত্র—বাস্তব বস্তুর কোন কারণ থাকিতে পারে না। অর্থাৎ কারণের সহিত বাস্তবতার সংশ্রব সম্ভবপর নয়। আকাশ একটি বাস্তব বস্তু। ইহা চিরকাল ধরিয়া আছে ও থাকিবে। ইহার কোন কারণ নাই বা কারণ থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় সূত্র—যাহা প্রকৃত পক্ষে অবাস্তব তাহাকে কোন কারণই বাস্তবে পরিণত করিতে পারে না। যেমন আকাশ-কুসুম অবাস্তব। কোন কারণ দ্বারাই ইহার বাস্তবতা সম্ভবপর নয়।

সুতরাং বুঝা গেল যাহা বাস্তব তাহা চিরকালই বাস্তব, আর যাহা অবাস্তব তাহা চিরকালই অবাস্তব। কিন্তু এইরূপ বাস্তব কিম্বা অবাস্তব বস্তু বিশ্বের কোথাও আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। সুতরাং বিশ্ব যে শূন্যময় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

বস্তু সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাষা বা Self-Contradiction.

কোন বস্তু সম্পর্কে আমরা বলিতে পারি না যে ইহা এক সঙ্গে বাস্তব ও অবাস্তব। কারণ বাস্তব ও অবাস্তব এই দুইটি শব্দ পরস্পর বিরোধী বা বিরুদ্ধ ভাষা। সেইরূপ আমরা একসঙ্গে বলিতে পারি না ঐ বস্তুটি বাস্তবও নহে, অবাস্তবও নহে। কারণ বাস্তব নহে এবং অবাস্তব নহে এই দুইটি বাক্যও পরস্পর বিরোধী বা বিরুদ্ধ ভাষা।

সুতরাং বুঝা গেল এ বিশ্বে যে সমস্ত বস্তু দেখি তাহাদের কোনটির সম্পর্কেই আমরা বলিতে পারি না যে উহা (১) বাস্তব, (২) অবাস্তব, (৩) বাস্তব অবাস্তব উভয়ই (৪) বাস্তবও নয় অবাস্তবও নয়। সুতরাং বিশ্ব শূন্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জন্যই বুদ্ধদেব লঙ্কাবতার সূত্রে কহিয়াছেন—

লঙ্কাবতার সূত্রের মর্ম্ম।

(ক) যে সমস্ত বস্তু আমাদের জ্ঞানের গোচরীভূত তাহাদের প্রকৃত স্বভাব আমরা একেবারেই জানিনা। অর্থাৎ বস্তু বলিতে যাহা আমরা জানি তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বা অসত্য। জার্ম্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট বলিয়াছেন প্রকৃত সত্তা বা Noumenon আমরা জানিতে পারি না। বুদ্ধদেবও তদ্রূপ কহিয়াছেন বস্তুর প্রকৃত স্বভাব আমরা জানি না।

(খ) বস্তু সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা নিবন্ধন আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে বস্তুর কোন স্বভাব বা গুণ নাই (বস্তু=শূন্য) অর্থাৎ বস্তু যে কি তাহা বুঝা যায় না—উহা কেবল শূন্যময়।

বস্তুজ্ঞান ও নারীর দেহ সম্পর্কিত জ্ঞান।

(গ) বস্তু যখন জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় তখনই তাহা নানা প্রকারে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বভাবও নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং জ্ঞান দ্বারা কোন বস্তুর প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। এই কথা বুঝাইবার জন্য বৌদ্ধগণ স্ত্রীলোকের দেহের উপমা দিয়াছেন। একটি স্ত্রীলোক দেখিয়া একজন ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী, একটি প্রেমিক পুরুষ এবং একটি কুকুর

ভিন্ন ভিন্ন রকম ধারণা করে। সন্ন্যাসী ভাবে উহা একটি জঘন্য মৃত দেহ, প্রেমিক ভাবে উহা তাহার সৌন্দর্য্যমণ্ডিতা পত্নী বা উপপত্নীর দেহ, আর কুকুর ভাবে উহা তাহার খাদ্য। সুতরাং এই নানা প্রকার ধারণা হইতে কিছুতেই বুঝা যায় না ঐ রমণীদেহের প্রকৃত স্বভাব কি। জ্ঞানের বিষয়ীভূত হওয়া মাত্র ঐ রমণীদেহ নানা আকার ধারণ করিয়া বসে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বভাব হারাইয়া শূন্যে মিশিয়া যায়।

বাস্তব, অবাস্তব, বাস্তব-অবাস্তব, বাস্তব নয়—অবাস্তব নয় —এই চারিটি দিক হইতে বিচার করিয়া একে একে সকল ধারণা ও বস্তুকেই শূন্য বলিয়া দেখান যাইতে পারে। সুতরাং মাধ্যমিকগণের শেষ কথা হইল এই যে ভাবনা চিন্তা বস্তু ব্যক্তি যাহা কিছু আমরা জানি বা অনুমান করি তাহা শূন্যময়। ইহা ব্যতীত শিখিবার বা শিক্ষা দিবার আর কিছুই নাই। এই শূন্যবাদে পৌঁছিবার পর ছাত্র ও শিষ্যগণের কেবল মাত্র দুইটি কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে। তন্মধ্যে প্রথম কর্ত্তব্য হইল নানা রকম প্রশ্ন করিয়া প্রতিপক্ষের দাম্ভি প্রদর্শন করা, নিজ নিজ অধিকৃত জ্ঞান পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা এবং অনধিকৃতজ্ঞান আয়ত্ত করা বা আবিষ্কার করা। আর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হইল বুদ্ধদেব যে সকল কথা কহিয়া গিয়াছেন তাহা স্বীকার করা এবং তদনুরূপ কার্য্য করা।

'মাধ্যমিক' এই নামের তাৎপর্য্য।

মাধ্যমিকগণ প্রশ্ন করিয়া অনধিকৃতজ্ঞান আয়ত্ত বা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ প্রশ্ন করা বিষয়ে তাঁহারা পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু বুদ্ধদেব যাহা বলিয়া গিয়াছেন সেই সকল কথা স্বীকার করা বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। এই জন্য জ্ঞানী হিসাবে তাঁহাদিগকে মধ্যমশ্রেণীভুক্ত বলা হয়। তাঁহারা মধ্যম বা সাধারণ রকমের জ্ঞানী, এই জন্য তাঁহাদের নাম হইয়াছে—মাধ্যমিক।

ক্রমশঃ—

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

মুক্তি।

—।—

আজকে আমার মুক্তি ব্যথার দীঘল শ্বাসের পালা
নিবিড় মেঘের বিজ্‌লী চমক—মনের গরল ঢালা ;—
ব্যথার ব্যথী হায় দরদী
বুকের চুয়া অশ্রু যদি গো
বাঁধনটানের অচিন্ ছোঁয়ায় আজকে পরায় মালা
তোমার লাগি তবু যে সই হবে না দীপ্ জ্বালা।

আলোক ছায়ার কাঁপন লাগি মায়ার কবাটখানি
ছায়াপথের আঁচল পেতে—সর্‌চে সরম টানি'।
কনক শিখার আলোক মাখা
নিবিড় নীরব আঁধার ঢাকা গো
উদাস মনের পুলক জোয়ার শিথিল ঠোঁটের বাণী
কাজল সজল মেঘের বুকে কর্‌চে কানাকানি।

চোখের জলের মুক্তি আমার বিদায় ব্যথার গানে
নেনা দেনার শেষ কিরে আজ যুগ্ যুগান্তের টানে !
মরণ বীণে সোনার তারে
সুর যে ঝরে অশ্রু ধারে গো
মুক্তি-ব্যথার গৌরবে আজ প্রাণ পেয়ালা-পানে,—
সকল সাধের পূর্ণ হবে বিষের চুমুক পানে।

তরুণ বুকের আলোকপুরী তোমার পরশ লাগি
জীবন পথের অনেক চলায় উঠ্‌তে ছিল জাগি।
হারিয়ে ফেলা মনের দোরে
তোমার ছোঁয়া আজকে ভোরে গো
পুরাতনের আলস ভাঙি—নবীন অনুরাগী,
চাচ্ছে হানে সকল কথায় মুক্তি অসীম মাগি।

বন্দে আলী মিয়া।

অনুবাদ-রহস্য।

কোন শব্দের বা বাক্যের ভুল অর্থ বা অনুবাদ সময়ে সময়ে খুব আমোদপ্রদ হইয়া থাকে। ভুল ব্যাখ্যা দুই প্রকারের—এক প্রকার আমোদ করিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ; অন্য প্রকারের কারণ অজ্ঞতা। ইচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যা যুবক, প্রৌঢ় এমন কি বৃদ্ধদের মুখেও শুনা যায়। অমরনাথবাবুর নাম Immortal husband, কৃষ্ণকুমারবাবুর নাম Black Prince, কৃষ্ণচন্দ্র Black moon, ডাকঘর Call house, বউবাজার Wife market ইত্যাদি বহু পুরাতন দৃষ্টান্ত। অমৃতবাজার পত্রিকায় পাঠক অবগত আছেন যে ঘোড়ার ডিমের ইংরাজী Horse's egg. টোলের ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ আমোদ বিশেষরূপে প্রচলিত। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি। অজ্ঞান তিনিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া ইহার অর্থ অজ্ঞান যে লোক সে তিন মণ দশ সের ভারী আর জ্ঞানী যে জন সে সোলার মত লঘুকায়। সন্দিদেশ দিধঃ সখীন্ ইহার অর্থ সখীর হাত দিয়া কয়েকটা সন্দেশ পাঠাইয়া দিল।

একদিন প্রসঙ্গক্রমে এপ্রিল-ফুল করার কথা উঠিল। কেহ কেহ বলিলেন যে পূর্ব্ব হইতে সাবধান থাকিলে কেহ কাহাকে ফুল করিতে পারে না। অমরনাথবাবু যাঁহাকে কেহ কেহ

Immortel husband বলিয়া ডাকিতেন তিনি বলিতেন "কাল্‌ইত ১লা এপ্রিল, আচ্ছা কালই আমি তোমাদিগকে ফুল বানাইব।" পরদিন অমরবাবু প্রাতঃকালেই আসিলেন। সকলেই তাঁহাকে পূর্ব্বদিনের কথা মনে করাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন "অত তাড়াতাড়ি কি হয়? একটু বিশ্রাম করি—চা খাই—তামাক খাই তার পর হবে এখন। একবার ভ্যাক্‌সিনেশন ক্যাচাও দেখি।" তিনি দুই তিনবার ভ্যাকসিনেশন ক্যাচাইবার কথা বলিলেন কিন্তু কেহই তাহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। তখন তিনি বলিলেন "এই ত সকলেই ফুল হইলেন। ভ্যাকসিনেশন ক্যাচাও অর্থাৎ তাম্মাকের জন্য টিকে ধরাও। টিকের ইংরাজী ভ্যাকসিনেশন্ আর ধরার ইংরাজী ক্যাচ্।"

নিম্নোক্ত গল্প দুইটীও উল্লিখিত গল্পটীর মত সত্য।

কয়েকটী বালক নোনা ফল খাইতেছে দেখিয়া হরিশবাবু বলিলেন "দেখেছেন মশায়, ছোঁড়ারা Double negativeগুলো খাচ্ছে। ও গুলোকে ইংরাজীতে বলেছে 'No' বাঙ্গলায় বলেছে 'না' অর্থাৎ কখনই খাওয়া উচিত নয়।

অবিনাশবাবু মাংস খান না শুনিয়া তাঁহার এক বন্ধু বলিলেন "সে কি, আপনার নাম অবিনাশ অথচ আপনি মাংস খান না এ বড় আশ্চর্য্য।" সেখানে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ও অবিনাশবাবু উভয়েই প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "অবিনাশ শব্দের সঙ্গে মাংস খাওয়ার কি সম্বন্ধ? বন্ধু তখন বলিলেন "অবি শব্দের অর্থ ভেড়া—যিনি ভেড়া নাশ করেন তিনিই অবিনাশ।"

যাঁহারা সংস্কৃত ভাল জানেন তাঁহারা অদ্ভুত দক্ষতা সহকারে যে কোন সংস্কৃত শ্লোকের বিকৃত অর্থ করিতে পারেন। নিম্নে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

সমস্ত শ্রীমদ্ ভাগবতের ব্যাখ্যা একজন পণ্ডিত কালীপক্ষে করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা রামমোহন রায় এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন।

শুক্লাম্বর ধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্। প্রসন্ন বদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে। একজন বলিলেন ইহা বিড়ালের ধ্যান, আর একজন বলিলেন ইহা গর্দ্দভের ধ্যান। প্রথম ব্যক্তি এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন—শুক্লা অর্থাৎ গৌরী অম্বা অর্থাৎ মাতা যাঁর তিনি শুক্লাম্ব অর্থাৎ গণেশ। শুক্লাম্বং বাতি অর্থাৎ বহতি তিনি শুক্লাম্বর অর্থাৎ মূষিক। সেই শুক্লম্বরকে যে ধরে সে শুক্লম্বর-

খর অর্থাৎ বিড়াল। দেবং শব্দের অর্থ দ্যুতি বিশিষ্ট বা উজ্জ্বল ইত্যাদি। যদি বল বিড়ালের বদন প্রসন্ন হইল কেন? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে যে বিড়াল ইঁদুর ধরিয়াছে তাহার মুখ প্রসন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকার বলিলেন যে শুক্লাম্বর ধর শব্দের অর্থ রজক ধৌত বিগলিত মল কাপড়ের ভারবাহী গর্দ্দভ।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, সকল কল অর্থাৎ machine বা mechanism অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই শরীরের নাম হইয়াছে কলেবর। ইহা যে ইচ্ছাকৃত ভুল অনুবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই।

অজ্ঞতা বশতঃ অনিচ্ছাকৃত ভুল অনুবাদ প্রায়ই হাস্যকর হয়। কিন্তু কখন কখন তাহা বিষম অনিষ্টকর হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত প্রকারের দুই একটা দৃষ্টান্ত প্রথমে দিতেছি।

প্রায় ২০ বৎসর হইল তিব্বত অভিযানের সময়ে গবর্ণমেণ্ট নেপালীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে পার্ব্বত্য প্রদেশে ভারবহনের জন্য কোন্ পশু সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। নেপালীরা উত্তর দিল যে সে জন্য উঁট‍ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নেপালী ভাষায় অশ্বতরকে উঁট বলে। বঙ্গদেশে উষ্ট্রকে উট বলে কিন্তু বঙ্গের পশ্চিমে সর্ব্বত্র উঁট বলে। নেপালীদের উঁট কথার অর্থ উষ্ট্র ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট কয়েক শত উষ্ট্রই অভিযানে পাঠাইলেন। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান সমতলবিচারী সেই নিরীহ জীবগুলি সেই ভয়ানক শীত প্রধান পার্ব্বত্য দেশে গিয়া সমস্তই মরিয়া গেল।

এস্থলে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। নেপালে উঁট শব্দের অর্থ অশ্বতর হইল কেমন করিয়া? কেবল যে নেপালেই এরূপ হইয়াছে তাহা নহে। অন্যত্রও দেখা যায় যে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। আসামে দাদাকে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ককাই এবং কাকাকে অর্থাৎ খুড়াকে দদাই বলে। আসামী ভাষায় সুপারির নাম তাম্বুল। মলয়ালম ভাষায় চক্ষুকে মুখ এবং মুখকে চোক্ এবং নাককে কান এবং কর্ণকে নাক বলে। গ্রীক ভাষায় কাল শব্দের অর্থ সুন্দর এবং ফুল্ল শব্দের অর্থ পত্র। মাড়বারিদিগের সহিত দাবা খেলিতে গিয়া দেখিলাম তাঁহারা গজকে উঁট বলেন। পূর্ব্ববঙ্গে থোড়কে মোচা এবং মোচাকে থোড় বলে। রাঢ়ে স্ত্রীকে মেয়ে বলে। এরূপ হয় কেন?

যাহা হউক এই অবান্তর কথা ছাড়িয়া দিয়া ভ্রান্ত অনুবাদ কিরূপ ঘোরতর অনিষ্টের কারণ হইতে পারে তাহার আর একটা উদাহরণ দিতেছি। স্বর্গগত অধ্যাপক ম্যাকস্মূলার দেখাইয়াছেন যে ঋগ্বেদের এক স্থলে "অগ্রে" পাঠ ছিল। সেই "অগ্রে" স্থলে লিপিকরপ্রমাদ

বশতঃ "অগ্নে" পাঠ হইয়া গেল। এই পাঠের যে অর্থ হইল তাহারই ফলে ভারতবর্ষে সহগমন বা সতীদাহ প্রথার উদ্ভব হইল।

লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ হাস্যকর একটা অনুবাদের গল্প শুনিয়াছি। রাধিকাচরণ মিত্রের মুখে যিনি হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। একটা মোকদ্দমার মূল বাঙ্গলা আবেদনে এই মর্শ্মে একটা কথা ছিল যে "এইরূপ সামান্য কারণে কি ভ্রাতার সহিত ভগিনীর বিবাদ হইতে পারে?" লিপিকর "বিবাদ" স্থলে বিবাহ" লিখিলেন। ইংরেজীতে তাহারই অনুবাদে marriage হইল। মকদ্দমার কাগজ পত্র নিম্ন আদালতগুলি ভ্রমণ করিয়া যখন হাইকোর্টে উপস্থিত হইল তখন ভ্রাতার সহিত ভগিনীর marriageএর কথা জজদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তখন তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে মূল বাঙ্গলায় বিবাহের পরিবর্ত্তে আছে "বিবাদ।"

অজ্ঞতা বা অন্যমনস্কতা বশত হাস্যকর অনুবাদের দুই একটা দৃষ্টান্ত এই শারদীয় উৎসবের সময়ে পাঠক পাঠিকার উপভোগ্য হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। কয়েক মাস গত হইল সঞ্জীবনী পত্রিকায় গিনিপিগের বাঙ্গলা পক্ষিবিশেষ বলিয়া লেখা হইয়াছিল। প্রবাসীর গম্ভীর সম্পাদকও তাহা লইয়া একটু আমোদ করিয়াছিলেন।

ঝি শব্দের প্রকৃত অর্থ কন্যা। "এতবড় ঘর বড় আইবড় ঝি। বিবাহ না হলে পরে লোকে কবে কি?" শ্যামাচরণ সরকারের ব্যাকরণে উদ্ধৃত এই কবিতা হইতে এবং বউ ঝি বা ঝি বউ সমাস হইতে পষ্টই বুঝা যায় যে ঝি কন্যাকে বুঝায়। অন্য পরিবার হইতে আনীতা বালিকা অর্থাৎ বউ কোন দোষ করিলে ও তাহাকে মারিলে লোক নিন্দা হইবে বলিয়া নিজ বাড়ীর কন্যা অর্থাৎ ঝিকে মারিলে বউএর শিক্ষা হইবে এই বিশ্বাস অথবা ভ্রান্তিই বোধ হয় "ঝিকে মেরে বউকে শেখান" প্রবাদের মূল। চাকরাণীর প্রতি কন্যার মত ব্যবহার করা উচিত এই বিশ্বাসেই তাহাকে দাসী, বা চাকরাণী বলিয়া না ডাকিয়া ঝি বলিয়া ডাকা হইত। বাঙ্গালীর এই হৃদয় ভাব বড়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু কালে ঝি শব্দ চাকরাণীর প্রতিশব্দ হইয়া পড়িয়াছে। ঝি শব্দের প্রকৃত অর্থ যে কন্যা তাহা এখনকার যুবকেরা এবং সম্ভবত প্রৌঢেরাও জানেন না। উল্লিখিত প্রবাদের ঝি যে কন্যাকে বুঝায় তাহাও সুতরাং তাঁহারা অবগত নহেন। দুই তিন মাস গত হইল একবার দৈনিক বসুমতীতে উল্লিখিত প্রবাদটী উদ্ধৃত হইয়াছিল। Statesman

পত্রে তাহার অনুবাদে ঝির অনুবাদে maid-servant বলা হইয়াছিল। অনুবাদ লেখক যে বাঙ্গালী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত অনুবাদ ষ্টেট্সম্যানে প্রকাশিত হইবার তিন চারি দিন পরে দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে Cook crowing কথার বাঙ্গলা অনুবাদে লেখা হইয়াছিল "কাক ডাকা।"

শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই বোধ হয় জানেন যে কুলেরই সংস্কৃত নাম বদরী। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল হইল বিদ্যাপতির যে কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার প্রথম কবিতাটীতেই বদরী শব্দ আছে। যে স্থানে তাহা আছে তাহার ভাবার্থ এইরূপ "প্রথমে বদীর মত ছোট, ক্রমে নারাঙ্গীর মত বড় হইল।" এখানে বদরী যে কুলকে বুঝায় তাহাতে কাহারও সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু পুস্তকখানির পাদটীকায় লিখিত আছে "বদরী অর্থাৎ মেঘ।"

দাশুরায়ের সময়ে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ত বলিয়াছিলেন যে বদরী বলে কচুকে। দাশুরায় লিখিয়াছেন

ভজহরি নিতাইদাস, বিদ্যাপতি শ্রীনিবাস
　　বিদ্যা ইঁহাদের অগোচর নাই কিছু।
এক একজন বিদ্যাবন্ত, করেন কিবা সিদ্ধান্ত
　　বদরীকে ব্যাখ্যা করেন কচু॥

আবার দাশুরায়ের এই স্থানের কচু শব্দের ব্যাখ্যা যাহা রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ইংরেজীতে লিখিত বঙ্গভাষার ইতিহাসে লিখিয়াছেন তাহা আরও কৌতুকাবহ।

Rewrite শব্দের অর্থ নূতন করিয়া লেখা অথবা পরিবর্ত্তিত ভাবে লেখা। কিন্তু দীনেশ বাবু তাঁহার কতকগুলি ভূতের গল্পের ভূমিকায় I have rewritten ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন "আমি ফিরে লিখেছি।"

Mother Seegel's syrupএর বাঙ্গলা বিজ্ঞাপনে Humours of the blood এর বাঙ্গলা ছিল—হয়ত এখনও আছে—"রক্তের রসিকতা।"

কখন কখন লোকে কোন শব্দের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গিয়া তাহার নূতন অর্থ সৃষ্টি করে। অব্যূঢ় শব্দের অর্থ অবিবাহিত। এই শব্দ হইতেই যে আইবুড় এবং আইবড় হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। আইবুড় ভাতের অর্থ অবিবাহিত অবস্থার শেষ ভোজন। কিন্তু নূতনার্থক

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা অঞ্চলে বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রে এই আইবুড় ভাত বা অব্যূঢ়ান্নের অনুবাদ হইত "আযুর্ব্বৃদ্ধ্যন্ন" বলিয়া। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতিকে বেদে অসুর বলা হইয়াছে। তাঁহাদের বাসভূমির নাম ছিল অসুর দেশ যাহাকে ইংরেজীতে আসীরিয়া বলে। আর্য্যেরা যখন গৃহ বিবাদ করিয়া দুই দলে বিভক্ত হইলেন তখন একদল সুর নাম গ্রহণ করিয়া অসুর দলকে সর্ব্বদোষান্বিত বলিয়া গালাগালি দিতেন। এইরূপে দুই এক পুরুষের মধ্যে সুর দল অসুর শব্দের অর্থ ভুলিয়া গেলেন। পরবর্ত্তী সময়ের টীকাকার দেখিলেন যে বেদে ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি অসুর পদবাচ্য রহিয়াছেন। তখন টীকাকারেরা ক্ষেপনার্থক অস্ ধাতু হইতে অসুর শব্দটা নিষ্পন্ন করিয়া লিখিলেন যে তাঁহারা দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ কুশল ছিলেন বলিয়া অসুর নামে অভিহিত হইতেন।

এইরূপে যবন শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি ভুলিয়া গিয়া পৌরাণিকেরা লিখিলেন যে, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের যুদ্ধকালে বশিষ্ঠের গাভীর প্রস্রাব হইতে যে সেনা সৃষ্ট হইয়াছিল তাহাদেরই নাম যবন।

পুরাণকারদিগের কল্পনাশক্তি কেমন ক্ষীণ হইয়াছিল তাহার আর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিতেছি। কুমারিল ভট্ট প্রদর্শন করিয়াছেন যে সূর্য্য বা আদিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাহার নাম সবিতা, তিনি প্রজা পালন করেন বলিয়া তাঁহার নাম প্রজাপতি, তিনি পরমৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট বলিয়া তাঁহার নাম ইন্দ্র। সুতরাং ইন্দ্র, প্রজাপতি এবং সূর্য্য একজনেরই নাম। সূর্য্য হইতে ঊষার উৎপত্তি হয় বলিয়া কোন কোন কবি ঊষাকে সূর্য্যের কন্যা বলিয়া বর্ণনা কলিয়াছেন। আবার সূর্য্য ও ঊষা সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকেন বলিয়া অন্য কবি তাঁহাদিগকে স্ত্রী পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করেন। অহল্যা শব্দের অর্থ রাত্রি। অহল্যাকে জীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয় করেন বলিয়া সূর্য্যকে অহল্যাজার বলা হয়। কালে এই সকল সঙ্গত অর্থ লোকে ভুলিয়া গেল। পরে পৌরাণিকেরা ইহার ব্যুৎপত্তি আবিষ্কারের ভার লইয়া যে জঘন্য ও অসঙ্গত গল্প রচনা করিলেন তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন।

কিন্তু কেবল আমাদের দেশের সাহিত্যেই যে এইরূপ কল্পিত অনুবাদ আছে তাহা নহে। অন্য দেশের সাহিত্যেও ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহার একটী মাত্র এ স্থলে উল্লেখ করিব।

য়িহুদীদের দেশে ১০০০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে যখন সলমন রাজা ছিলেন তখন সেই দেশ সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। তখন য়িহুদীরা ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিতে আসিতেন। তাঁহারা লঙ্কা হইতে অন্যান্য বস্তুর সহিত হস্তিদন্ত ময়ূর ও বানর লইয়া যাইতেন। য়িহুদীদের দেশে এই শেষোক্ত তিন বস্তু ছিল না সুতরাং সে গুলির হিব্রু নামও ছিল না। তামিল ভাষায় এই গুলির যে নাম ইহুদীরা তাহাই ব্যবহার করিত। বাইবলে এই বাণিজ্যের বর্ণনায় সেই তামিল শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৩০০ বৎসরে ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হয়। হিব্রু ভাষারও তাহাই হইয়াছিল। সুতরাং ৩০০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দের য়িহুদীরা সলমানের সময়ে লিখিত হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেল বুঝিতে পারিত না। বিশেষত যে সকল য়িহুদী আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকিত তাহারা মোটেই হিব্রু জানিত না। তাহাদের ভাষা ছিল গ্রীক। তাহাদের হিতের জন্য হিব্রু বাইবল গ্রীকে অনুবাদ করা নিতান্ত উচিত বলিয়া স্থির হইল। ৭০ জন পণ্ডিত য়িহুদী এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু তাঁহারাও হস্তিদন্ত, ময়ূর এবং বানর দ্যোতক তামিল শব্দ তিনটার অর্থ জানিতেন না। তাঁহারা এই শব্দ ত্রয়ের অনুবাদ করিলেন "কাটা এবং ভাঙ্গা পাথর" বলিয়া।

স্নান, দান, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য করিবার পূর্ব্বে কিছু খাওয়া উচিত নহে। কিন্তু অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে এই ব্যবস্থা আছে যে ইক্ষুরস, দুগ্ধ, পান, ফল এবং ঔষধ খাইবার পরও এই সকল কার্য্য করিতে পারিবে। এই ব্যবস্থার সংস্কৃত শ্লোকটী এই—

ইক্ষুরসঃ পয়শ্চাপি তাম্বুলং ফলমৌষধম।
ভুক্ত্বাপ্যেতানি সংকুর্য্যাৎ স্নানদানাদিক ক্রিয়াঃ।

একজন ব্যাখ্যাকার বলিলেন যে শ্লোক মধ্যে যে "চাপি" কথা আছে তাহা চ+অপি নহে কিন্তু চা+অপি। সুতরাং চা খাইয়াও স্নানদানাদি করা যাইতে পারে।

যখন মেঘদূত পড়িতে আরম্ভ করিলাম তখন প্রথমে ভাবিলাম যে স্বাধিকার প্রমত্তঃ কথারি অর্থ "ক্ষমতার গৌরবে গর্ব্বিত।" কিন্তু পরেই দেখিলাম যে টীকাকার বলিতেছেন যে নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্মে যে ভুল করিয়াছে তাহাকেই স্বাধিকার প্রমত্তঃ বলে। আমার আশঙ্কা হয় যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত "স্বাধিকার প্রমত্তঃ" শীর্ষক প্রবন্ধে এই কথাটা প্রথমোক্ত ভুল অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন।

সপ্তর্ষি মণ্ডলকে ইংরেজীতে Great Bear এবং লাটিনে Ursa Major বলে। Ursa এবং Bear উভয় শব্দেরই অর্থ ভালুক। কোথায় ঋষি এবং কোথায় ভালুক! একই বস্তুর নাম ভিন্ন দেশে কেন এত বিভিন্ন হইল? আমার অনুমান হয় যে আদিতে ব্যাবিলন বা কালডিয়ার নামটা এক ছিল। পরে ভারতীয়দিগের দ্বারা তাহা ঋষি রূপে পরিবর্তিত হইল। ঋক্ষ শব্দ এখনও হিন্দুস্থানে রচ্ছ বা রিচ্ছ্ রূপে উচ্চারিত হয়। এই ঋচ্ছ শব্দই লাটিনে বর্ণান্তরিত হইয়া Ursa শব্দ হইয়াছে যেহেতু লাটিনে চ ছ নাই যেমন সংস্কৃত মঞ্চ লাটিনে Mensa হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা আমার অনুমান মাত্র। অন্য কোন কারণে যদি সপ্তর্ষিগণ বড় ভালুক হইয়া গিয়া থাকেন তাহা কোন পাঠক জানাইলে সুখী হইব।

কখন কখন অনুবাদ ঠিক্ হইলেও অনুবাদে ভাষা নির্ব্বাচনের ফলে তাহা বিশেষ রূপ হাস্যকর হইয়া থাকে। ইহার একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে পাদরি লালবিহারী দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গলার পরীক্ষক হইতেন। একবার তাঁহার একটা প্রশ্নে তিনি "লম্ফ" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছিলেন—শুনিয়াছি একজন পরীক্ষার্থী তাহার এইরূপ উত্তর লিখিয়াছিলেন—লম্ফ অর্থাৎ দুই পায়ে ভর দিয়া ক্ষণকালের জন্য পৃথিবী ত্যাগ।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

শরতে।

—:*:—

লঘু মেঘগুলি ঐ ভাসে আকাশে—
কভু চাঁদ পড়ে ঢাকা, কখনো হাসে!
নভোনীলে আঁখি রেখে'
ভাবি আমি থেকে থেকে,—
যত দুঃখ এসেছিল জীবন জুড়ি'
সেও যেন চাঁদে মেঘে লুকোচুরি!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

স্বাস্থ্যের কথা।

দাঁত পড়ার কারণ

মানুষের একটা বয়স আসে যখন তাহার দন্ত সকল নড়িতে আরম্ভ করে। কাহারও এই অবস্থা যৌবনে ঘটে কাহারও বা বৃদ্ধাবস্থায় হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ জীবন যাপন করিলে বৃদ্ধাবস্থাতেই দন্ত নড়িতে আরম্ভ করে, যৌবনে দন্ত নড়া অস্বাভাবিক। আমাদিগের আহার বিহার ও বর্ত্তমান সভ্যতাই এরূপ অবস্থার মূল কারণ। যুবাবস্থায় দন্তরোগ কিম্বা দন্ত নড়া যাহাতে না হয় তাহা অতি সহজেই করা যাইতে পারে এবং দন্ত দুই একটি নড়িলেও অন্যগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে! যাহাদের এই বয়সে দন্ত নড়া বা দন্ত রোগ হয় তাহাদিগের

অধিক বয়স পর্যান্ত দন্তরক্ষা করার ইচ্ছা থাকিলে প্রতি ছয় মাস অন্তর দন্ত চিকিৎসক দ্বারা দন্ত পরীক্ষা করা উচিত। ইহাতে দন্ত ক্ষয়, দন্ত নড়া বা দন্তের কোনও রোগ ভাল করিয়া ধরিবার পূর্ব্বেই দন্ত চিকিৎসক বুঝিতে পারিবেন এবং তদনুসারে চিকিৎসা করিলে দন্ত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যাইবে।

বর্ত্তমান সভ্যতার ফলে আমরা যে ঘনীভূত খাদ্য সেবন করি তাহাই হইল প্যাইওরিয়া (pyorrhoea) নামক দন্তরোগের কারণ, অনেক বিখ্যাত চিকিৎসক এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। যে সকল জাতি মোটা ও স্বাভাবিক খাদ্য সেবন করে তাহাদিগের সহিত উচ্চতম সভ্যতা প্রাপ্ত জাতির দন্তের সহিত তুলনা করিয়া জানা যায় যে এই কারণই ঠিক। আমরা বর্ত্তমান সময়ে যে সকল খাদ্য আহার করি তাহাতে ভিটামিন (vitamine) এবং চূণের লবণ সকলের অভাব আছে। শরীরে যে সকল ভিটামিনের প্রয়োজন তাহার সবটা পাওয়া যায় দুগ্ধ, ডিম্ব, অমার্জ্জিত চাউল বা গম, অনেক পরিমাণ ফল ও ঋতু অনুযায়ী যখন যাহা পাওয়া যায় সেইরূপ শাক সব্জী সেবন করিয়া। রন্ধন করিতেই যে খাদ্যের সকল ভিটামিনই (vitamine) নষ্ট হইল তাহা নহে, তবে ইহা মনে রাখা উচিত যে প্রত্যহ টাটকা ফল ও শাক-সব্জী কাঁচা সেবন করিলে অধিক উপকার হইবে এবং উহা রন্ধন করা অপেক্ষা কাঁচা খাওয়াই উচিত। এই সকল জিনিষে যে ভিটামিন আছে এবং প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ আছে তাহাতে হাড় দাঁত গঠিত হয় এবং প্রচুর পরিমাণ আঁশযুক্ত পদার্থ আছে তাহার জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা হয় না। কোষ্ঠবদ্ধতা ঘনীভূত খাদ্য আহারে হইয়া থাকে। এই কোষ্ঠবদ্ধতার জন্যই মানুষের বিবর্ণ চেহারা হয়, মাথা ধরে, মানসিক অশান্তি, দন্তরোগ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগ হইয়া থাকে।

পরিস্কৃত ময়দা, মাংস এবং চিনিতে চূণের ভাগ অত্যন্ত কম। আমাদিগের শরীরে যতটা চূণের প্রয়োজন তাহা উপরোক্ত খাদ্য উদর পূর্ণ করিয়া সেবন করিলেও পাওয়া যায় না। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে "বন্ধুকে ফল সেবন করিতে দিলে উহার খোসা সমেত দাও কিন্তু শত্রুকে ফল দিলে খোসা ছাড়াইয়া দিও" এই কথার বিশেষ কারণ আছে, কারণ ফলের খোসাতেই মানুষের শরীররক্ষাকারী সমস্ত প্রকার লবণ ও খণিজদ্রব্য বর্ত্তমান আছে। সকল শস্য ও শাকসব্জীর আবরণেই ইহা প্রচুর বর্ত্তমান, এই জন্যই আলু রন্ধন করিতে খোসাসহ রন্ধন করিবার পরামর্শ সকলে দিয়া থাকে এবং সেই জন্যই এইরূপে রন্ধন করা আলু খাইতে

সুস্বাদু হয়। শাকসব্জী রন্ধনের সময়ে এই সকল খনিজদ্রব্য রক্ষা করিবার জন্য যত কম পারা যায় তত কম জল দিয়া উহা রন্ধন করা উচিত এবং এই শাকসব্জী দিয়া ঝোল বানাইলে যতটা পারা যায় ঐ ঝোল খাদ্যের সহিত মিলাইয়া সেবন করা উচিত।

যতটা খনিজ দ্রব্য শরীরের পক্ষে উপকারী তাহা সকল খাদ্যে সমান মত পাওয়া যায় না। কোন খাদ্যে একটা জিনিষ অধিক আছে এবং অপর জিনিষ কম আছে। দুগ্ধের মধ্যে চূণের ভাগ অত্যন্ত বেশী, আবার ডিম্বে প্রচুর পরিমাণ চূণ, পটাসিয়াম ফসফেট (potassium phosphate) এবং লৌহ আছে, মাংসে অনেক পরিমাণ পটাসিয়াম ফসফেট আছে কিন্তু অতি কম চূণ আছে, আলু ও অন্যান্য সব্জীতে অনেক পরিমাণ পটাসিয়াম আছে। পরিষ্কৃত চিনি, সাদা ময়দা, ছাঁটা চাউল প্রভৃতিতে খনিজ দ্রব্যের ভাগ অত্যন্ত কম। ফল, শাকসব্জীর বহিরাবরণে, অঙ্কুরিত শস্যে যেমন খণিজ দ্রব্য থাকে তেমনি প্রচুর পরিমাণ ভিটামিনও থাকে। তাহা ছাড়া দুগ্ধ, ডিম্ব, মাখন এবং মাংসেও ভিটামিন আছে।

যে সকল খাদ্যে ভিটামিন নাই সেই সকল খাদ্য সেবনে কি অনিষ্ট হয় তাহার অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। যে সকল জন্তুকে এই সকল খাদ্য খাওয়াইয়া রাখা হইয়াছিল দেখা গিয়াছে যে তাহাদের দন্তের রোগ ও দন্তের দোষ ঘটিয়াছে, দন্তের মাড়ি সরিয়া গিয়া দন্ত লম্বা হইয়াছে, অসমান হইয়া বসিয়াছে এবং দন্ত নড়িয়া গিয়াছে। তাহাদিগের মাড়ি লাল ও নরম হইয়া গিয়াছে। শাক সব্জী না খাইয়া দন্তের যে দুরবস্থা হয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাহারা ১৯১৬ সালে উত্তর মেরু আবিষ্কার করিতে গিয়াছিল; শাক সব্জী অভাবে তাহাদের দন্তে বেদনা হইয়াছিল, দন্ত নড়িতেছিল এবং মাড়ি নরম হইয়া এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে ইচ্ছা করিলে হাত দিয়া দাঁত খুলিয়া ফেলা যাইত।

শিশুর দন্ত শক্ত করিতে হইলে তাহার মাতাকে দুগ্ধ ডিম্ব এবং ফল ও শাক সব্জী যা পাওয়া যায় তাহাই সেবন করিতে দেওয়া উচিত। শিশুর প্রথম বয়সে দুগ্ধ যেমন সেবন করিবে সেই সঙ্গে কমলার রসও সেবন করিতে দেওয়া উচিত। এক বৎসর বয়স হইলে অল্প শাক সব্জী খাইতে দেওয়া আবশ্যক। দুগ্ধই হইল শিশুগণের বয়োবৃদ্ধি কালের একমাত্র ও প্রধান খাদ্য, উহার মধ্যে যে সকল খণিজ দ্রব্য আছে তাহা সকলেরই জ্ঞাত। এই বয়সের শিশুগণকে চিনির পরিবর্ত্তে

গুড় ও মধু প্রভৃতি দেওয়া উচিত কারণ উহাতে অনেক পরিমাণ শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য বর্ত্তমান।

শিশুর যে খাদ্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যও প্রায় তাহাই, দন্ত রক্ষার পক্ষে উভয়েরই প্রায় একরূপ খাদ্য সেবনে দন্তের চতুর্দ্দিকস্থ পেশী সকল ব্যায়ামের জন্য সবল হইবে ও তাহাতেই সেগুলি সুস্থাবস্থায় থাকিবে। নরম খাদ্য দুই দন্তের ফাঁকে থাকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা অধিক এবং তাহার জন্য দন্তের মাড়ি ফুলিয়া উঠিলে এই পাইওরিয়া রোগ হইয়া থাকে। এই প্রকার খাদ্য যত কম খাওয়া যায় ততই মঙ্গল। চিনি, বিস্কুট, সাদা ময়দার রুটি, রক্ষিত ফল প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে। অতিরিক্ত শর্করা সেবনেই পাইওরিয়া রোগের বিস্তৃতি এত হইয়াছে। শর্করা খাইতে হইলে অন্যান্য জিনিষ আহারের সময় উহা সেবন করা উচিত। আহারের শেষে চিনি খাওয়া উচিত নহে। অনেকে বিশেষতঃ যখন তখন লজেঞ্জস, চকোলেট প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য সেবন করেন ইহার ফলে মুখে যে জীবাণু থাকে তাহাদিগের আরও খাদ্য জুটিয়া যায় এবং তাহাতে তাহারা দন্তের ক্ষয় আরও বেশী করিয়া করিতে পারে।

যে সকল জন্তুকে ভিটামিনহীন খাদ্য প্রদান করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছিল তাহাদিগকে কমলার রস সেবন করিতে দিয়া দেখা গেল যে কমলার রসে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন আছে। যে সকল জন্তুর ভিটামিনহীন খাদ্য সেবনে দন্ত নড়িয়া গিয়াছিল মাড়ি লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়া উহা দিয়া রক্ত পড়িতেছিল কিন্তু যে সকল জন্তুদিগকে একই প্রকার খাদ্য দেওয়ার সহিত কমলার রসও সেবন করিতে দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের ঐরূপ কোনও রোগ হয় নাই।

অবশ্য কেবল যে খাদ্যের দ্বারাই দন্ত সুস্থ অবস্থায় থাকিবে তাহা নহে প্রত্যহ রীতিমত করিয়া দন্ত পরিষ্কার করা প্রয়োজন। দন্ত প্রত্যহ মার্জ্জন করা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার উপায়ে পরিষ্কার রাখা যায় না। কোন প্রকার জীবাণু নাশক গুঁড়া দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করা উচিত, তাহাতেই দন্ত ভাল অবস্থায় থাকিবে এবং স্থায়ী হইবে।

'সঞ্জীবনী।'

বধূ-বরণ।

এতদিন ছিলে ভুবনের তুমি
আজ ধরা দিলে ভবনে,
নেমে এলে আজ ধরার ধূলাতে
ছিলে এতদিন স্বপনে।
শুধু শোভাময়ী ছিলে এত দিন
কবির মানসে কলিকা নলিন,
আজ পরশিলে চিত্ত-পুলিন
বিদায়-গোধূলি-লগনে।
ঊষার ললাট-সিন্দূর-টিপ
সিঁথিতে উড়াল পবনে।

(২)

প্রভাতের ঊষা কুমারী, সেজেছ
সন্ধ্যায় বধূ উষসী,
চন্দন টোপা-তারা-কলঙ্কে
ভরেছে বে-দাগ মু'শশী।
মুখর মুখ আর বাচাল নয়ন
লাজ-সুখে আজ যাচে গুণ্ঠন,
নোটন-কপোতী কণ্ঠে এখন
কূজন উঠিছে উছসি'।
এত দিন ছিলে শুধু রূপ-কথা
আজ হ'ল নারী রূপসী॥

(৩)

দোলা চঞ্চল ছিল এই গেহ
তবু ঝটপট বেণী-ঘা'য়,
তারি সঞ্চিত আনন্দ ঝলে
ঐ উর-হার-মণিকায়।
এ ঘরের হাসি নিয়ে যাও চোখে,
সেথা গৃহ-দীপ জ্বেলো এ আলোকে,
চোখের সলিল থাকুক এ-লোকে।—
আজি এ মিলন-মোহনায়
ও-ঘরের হাসি-বাঁশীর বেহাগ
কাঁদুক এ ঘরে সাহানায়।

(৪)

বিবাহের রঙে রাঙা আজ সব,
রাঙা মন রাঙা আভরণ,
বল নারী—"এই রক্ত আলোকে
আজ মম নব জাগরণ!"
পাপে নয়, পতি পুণ্যে সুমতি
থাকে যেন, হয়ো পতির সারথি।
পতি যদি হয় অন্ধ, হে সতী
বেঁধোনা নয়নে আবরণ,
অন্ধ পতিরে আঁখি দেয় যেন
তোমার সত্য আচরণ॥

———

নজরুল ইস্‌লাম।

ভগ্ন-বীণা।

—※—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাহিত্যচর্চ্চার মধ্যে দিয়ে আমার এই মেডিক্যাল কলেজের দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল বেশ; মনুর সঙ্গে আমার পরিচয়টা ক্রমশই বন্ধুত্বের দিকে এগিয়ে চলেছিল। তার সমস্ত নামটা মনোরমা—তার সম্বন্ধে শুধু এতটুকু খবরই আমি জানতে পেরেছিলাম। কোন সময় হতে যে এই তরুণীটী আমাকে লতার মত জড়িয়ে ধরে নিজকে প্রেমের বাতাস ও আলোতে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছিল সে খবর আমি তখন ঠিক বুঝতে পারি নি। আমার জীবনের এই অধ্যায়ে সাহিত্য-রসবোধের শক্তি এতটা জেগে উঠেছিল যে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম। এই ভাবগুলিকে সুবিহিত আকার দেবার জন্য প্রাণ যেমন আকুল হয়ে উঠত।

একদিন "ফাল্গুনীটা" ফিরিয়ে দেবার সময় সে আমায় জিজ্ঞাসা করল—

"রমাবাবু এ "ফাল্গুনীর" অন্তরের কথাটা কি আমায় বলে দিতে পারেন। আমি দুবার পড়েছি তবুও এর অর্থটা যেন ধরতে পারি নি।"

আমি বললাম "দেখুন কথাটা বড় শক্ত, পরিষ্কার করে বলতে পারব কিনা সন্দেহ হচ্চে। এই যে জগতে পরিবর্ত্তনের স্রোতে অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে এর যথার্থ তত্ত্বটা কি, কবি সে কথাটাই এখানে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। সত্যের রূপ শাশ্বত কিন্তু তার প্রকাশ বিচিত্র। কতকগুলি Symbol-এর সাহায্যে এ তত্ত্বটাই কবি ফুটিয়ে তুলেচেন। প্রকৃতি সুন্দর, মানুষ সুন্দর। এই অসীম প্রাণ প্রবাহের অন্তস্তলে আনন্দ—সেই উপনিষদের সুর "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" এই যে শীতের বৈরাগ্যসূচক শুভ্ররূপ, বসন্তের রক্তরাগরঞ্জিত সৌন্দর্য্যের উন্মাদনাময় সাজ—এ একই জীবনের পরিণতির ধারা একই—সত্যের প্রকাশ।"

—এ কথাগুলি বলেই আমি একটু নীরব হলেম। তারপর আবার আরম্ভ করলাম "দেখুন গত বছর যে ফাল্গুনীর অভিনয় হয়েছিল কবির ভবনে, আমি সে অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম।"

মনু আত্মহারা হয়ে চীৎকার করে উঠল—"সত্যি সত্যি বলছেন রমাবাবু?"

তার এই আকস্মিক উত্তেজনায় সে একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল!

আমি বললাম "হাঁ, দেখুন আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল কবির বাউলের বেশ। এই বাউলের বেশই আমাদের দেশের সনাতন রূপ। স্তিমিত জ্যোৎস্নার আলোতে একটা মোহময় জগতে তার নৃত্যে তার সঙ্গীতে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছিল সে আমাদের দেশের চিরন্তন ভাব। নাই সেখানে পশ্চিমের দ্বন্দ্বসঙ্কুল রক্তাক্ত জীবন-পথ, নাই সেখানে ভোগের অতৃপ্তি জনিত ভীষণ সংগ্রাম। এ চিরশান্তির রূপ—এ রূপের ভিতর সকল বিরোধ ডুবে গেছে, সকল দ্বন্দ্ব থেমে গেছে, প্রকৃতির সঙ্গে মানবের এক মিলন ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে। ভারত সভ্যতার জন্ম নিয়েছে অরণ্যের মধ্যে, প্রকৃতির চিরশ্যামল সুস্নিগ্ধ নবীন অঙ্কে পালিত হয়েছে তাই এ সভ্যতার রূপ স্বতন্ত্র—এ সভ্যতার আদর্শ যেন বাউল,—তার আসন ভূমিতল, আশ্রয় সুনীল আকাশ।"

আমার স্বরটা যখন পর্দ্দায় পর্দ্দায় নেমে আসছিল মনু তখন মাথাটা উঁচু করে আমার চোখের উপর চোখ রেখে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তাকিয়েছিল। তার সেই দুটো কালো চক্ষুর ভিতর দিয়ে তখন কি দীপ্তিই ফুটে উঠেছিল, কি প্রাণভরা প্রশংসার দীপ জ্বলে উঠেছিল যে তোমায় আমি বোঝাতে পারব না। আমি একে আমার সাহিত্য সাধনার সব চেয়ে কাম্য পুরস্কার বলে সাদরে গ্রহণ করলাম। আজ আমার কি আনন্দ, এ কী পুলক!

** ** **

সেই পুলক স্পন্দনের রেশটুকু স্মৃতির সৌরভে মসগুল করে আমি আবার হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে ফিরে এলাম।

মেডিক্যাল কলেজের সেই কটেজ ছেড়ে আসবার সময় আমার বেশ একটু কষ্টই হচ্চিল বিদায়ের সময় মনু কতকগুলি শাদা আর লাল ফুল একটা কিছু দিয়ে বেঁধে আমার হাতে ছোট্ট ফুলের তোড়াটী দিয়ে বল্ল—

"রমাবাবু, কবিকে আজ সম্বর্দ্ধনা করচি এই ফুলের তোড়াটী দিয়ে। কবি প্রকৃতির সন্তান; প্রকৃতির সব চেয়ে সুন্দর সৃষ্টি তাই এ ফুলের উপহার আমার কবিকে দিচ্চি। ফেলে দেবেন না, শুকিয়ে গেলেও না। এটা যতদিন থাকবে ততদিন আমাকেও আপনার মনে হবে।" কি বিষাদ ভরা তার সেই হাসিটী!

আমি বললাম "দেখুন আপনার কোনদিনও ভুলতে পারব না। আপনার দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে মাথায় তুলে নিলুম। দেখবেন ভুলবেন না, আমার কোন চিহ্নই ত আপনার কাছে রেখে গেলুম না।"

কথাটা শুনেই মনু আমার মুখের দিকে একটু তাকাল।

কি—অশ্রুভরা চাহনী! সেই চাহনীর স্পর্শে আমার হৃদয়ের গোপন তারটী ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠ্‌ল।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম—সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে রঙের ঝরণার শত মুখে শত ধারে রঙ্ ঝরে পড়ছে। গাছের অগ্রভাগে চেয়ে দেখলাম সেখানে সোণালী আলোর কি খেলাই চলেছে—বাতাসে আলোতে এ কী কৌতুক।

**

সে দিন ভোরের বেলা ব্রাউনিংএর কবিতার বইখানা নিয়ে বসেছিলাম। প্রথমেই চোখ পড়ল "Statue and Bust" নামক কবিতাটীর উপর। গল্পটার আখ্যান-ভাগ এক ডিউক আর এক পরিণীতা নারীর মধ্যে ভালবাসা;—নারীর স্বামী তার এই গুপ্ত প্রেমের কথা জানতে পেরে তাকে এক নির্জ্জন প্রাসাদ কক্ষে আবদ্ধ করে রাখেন। প্রতিদিন বাতায়ন পথে নারী বসে থাক্‌ত আকুল প্রাণে, তার প্রণয়ীর দেখা পাবার আশায়। দুজনাতে দেখাও হত,—ডিউক যখন অশ্বারোহনে জানালার নীচ দিয়ে চলে যেত;—কিন্তু সে শুধু চোখের দেখা। কত শারদ যামিনী মিলনের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় বিরহ বেদনায় তাদের বিফল হয়ে গেছে। কালই তারা পলায়ন করবে, কালই তাদের মিলন হবে—এ সুখ চিন্তায় তাদের নিশি ভোর হত, কিন্তু সে কাল ত আর এল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল তাহা—তারা উপলব্ধি করলেন "প্রেম অলীক স্বপ্ন মাত্র, এ স্বপ্নের মোহে তাদের সমস্ত যৌবন অতিবাহিত হয়ে গেছে।

"Gleam by gleam.
The glory dropped from their youth and love
And both perceived they had dreamed a dream."

প্রত্যাখ্যাত প্রেমের এ কী নিদারুণ প্রতিহিংসা ! প্রেম যখন হৃদয় দুয়ারে অতিথি বেশে এসে উপস্থিত হয় তখন তাকে ফিরিয়ে দেওয়ায় কি ভীষণ অভিশাপ !

আজ সে যে আমারই দুয়ারে এসেছে ; আজ যদি তাঁকে আর ফিরে পাব না। কত দুঃখ, কত বেদনা, কত আবেদন, কত মিনতি চোখের জলের প্রবাহে অবিরল ধারায় নেমে আসবে কিন্তু তাঁর সে প্রচণ্ড অভিমান ত ভাঙ্‌বে না। জীবনের উপর রেখে যাবে এক ব্যর্থতার আগুন-ভরা চিহ্ন।

আমার এতকালের তপস্যা কোন্ সুদূর বাল্যকাল হতে যে সাধনাকে প্রকাণ্ড করে ভেবেছিলাম—তার সঙ্গে যৌবনে মুকুলিত এই প্রেমের এক বিরোধ বেঁধে গেল। আমার প্রিয়-কবির কথা দুটী আমার কাণে কেমন গুণ গুণ সুরে বাজতে লাগল—

"হায়,
বিদ্যাই দুর্লভ শুধু,—প্রেম কি হেথায়
এতই সুলভ ?"
————রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন।"

** ** ** **

দুপুর বেলায় মনটা এত অশান্ত হয়ে উঠেছিল যে ঘরে বসে থাকা আমার দায় হয়ে পড়ল। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। সে দিনের আকাশ ঠিক আজকের আকাশের মতন গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন, হু হু করে দক্ষিণ দিক হতে ঠাণ্ডা বাতাস উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। মেসের নীচ থেকে কে যেন চীৎকার করে বলছিল "অরু, তোর Proxyটা আজ দিতে ভয় হল, ক্লাশে আজ খুব কম ছেলে হয়েছে যে। শুনিচিস্ নম্বার টেন্ (No. 10) Storm Signal দিয়াছে।"

আমি একেবারে রাস্তার উপরে এসে পড়লাম. কোথায় যাব ঠিক ছিল না। একটু পরেই দেখতে পেলাম যে আমি সেই কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মনু একটা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই বিক্ষুব্ধ বিপ্লব চেয়ে দেখছে। দৃষ্টিতে তার সেই শূন্যতা, মৌন শান্ত বেদনা

আমাকে দেখতেই কাছে এসে চীৎকার করে বলল "শিগ্গীর ভেতরে চলে আসুন, দেখ্চেন না, ঝড় আস্চে।"

হু হু শব্দে এক ঝাপটা বাতাস বড় বড় গাছগুলিকে বিপর্যাস্ত করে পাগলের মত ছুটে আসল, আমি শুধু শুনতে পেলাম "আপনি আসুন।"

—এ কী আকুল আহ্বান, আমার মনে হ'ল সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে এই সঙ্গীত অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হচ্চে "এসো তুমি এসো।" আমার ভিতরকার চিরন্তন পুরুষ আহ্বানরতা চিরন্তন প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য কবে যে যাত্রা করেছে,—কত দীর্ঘ পথ যে অতিক্রম করেছে, কেউ তা বলতে পারবেনা।

আর এক ঝাপ্টা বাতাস—"আপনি আসুন।"—ওগো কত দূর থেকে তুমি আবার ডাক্চ, মনে হয় আর কবে যেন শুনেচি তোমার এ সম্ভাষণ, কত জীবনের কুহেলি ভেদ করে তারার ম্লান আলোকটুকুর মত তোমার এ ডাক,—লোক লোকান্তর যুগযুগান্তরের মধ্য দিয়ে আমিও তাই আজ ছুটে এসেছি—কত বাহু-হার, কত নীরব চাহনীর কথা, কত মিলন-ব্যথা, কুহেলিময় রাত্রিদিন ওগো তোমারি জন্য নিয়ে আমি যাত্রা করেছি—তুমি কত দূরে—কত দূরে?

কঠেজে গিয়ে উঠলুম, পাশের ঘরে দুটো টুল ছিল। সেই টুলের উপর গিয়ে মনু বসল, আমি অপর টুলটায় বসলেম।

"মনু,"—

সে আমার পানে চকিত নয়নে একবার তাকাল;—দেহ তার নিস্পন্দ, একেবারে যেন মার্ব্বেল পাথরের মূর্ত্তি।

আমি স্থির অবিচলিত কণ্ঠে বললাম "মনু।" আজ বাইরের ঐ প্রলয়ের অভিনয়ের মত আমার মনে একটা উন্মাদ নৃত্য চলেছিল।

"তোমাকে আমার চাই"—

মনু দুহাত দিয়ে তার চোখ দুটো ঢেকে ধরল।

"—তোমাকে আমার চাই, তোমায় দেখে অবধি আমার অপূর্ণতা আমার ভিতরে জ্বলে উঠেছে, ওগো আমায় পূর্ণ করো—সার্থক করো"—

আমি টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম। কাছে গিয়ে তার হাত দুখানা চোখ থেকে ছাড়িয়ে নিজের হাতের মধ্যে নিলাম।

মন্নুর এ কী রূপ—চোখের কোণে শিশিরের মত টল্ টল্ করছে, দু ফোঁটা অশ্রুজল চিত্তভরা বেদনার আলোতে মুখের উপর এক অপরূপ দীপ্তি। তারপর মন্নুর আঁখির পাতা পড়তেই ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল, হাওয়ার ঝরা বৃষ্টির জলের মত পবিত্র কয়েক ফোঁটা চোখের জল। সুধীর, সে চোখের জল পবিত্র—ভাগীরথীর করুণা প্রবাহের মত এ প্রেম প্রবাহও পবিত্র।

আত্মহারা হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হোমশিখার মত রক্তিম বয়ানে সেও আমার পানে চেয়ে রইল। এক মুহূর্ত্তে শরতের জোছনা, ছায়াপথের তারার আলো, বীণার ঝঙ্কার, প্রভাতের অরুণিমা, কত স্পর্শ, কত বর্ণ, কত গন্ধ এক সঙ্গে এক সুরে আমার মনের উপর দিয়ে খেলে গেল।

আমি কাতর কণ্ঠে বলে উঠলাম—"মন্নু!"

"ওগো উপায় নেই, তুমি যাও"—চোখে তার আকুল অহ্বান, বক্ষে প্রেমের বাধাহীন উচ্ছ্বাস কণ্ঠে সুধার স্নিগ্ধতা। মন্নু মেজের উপর লুটিয়ে পড়ল। "তুমি যাও', এই ভীষণ ঝঙ্কার মধ্যে আমি বেড়িয়ে পড়লাম। স্থির অবিকম্পিত চরণে আমি পথ চলছিলাম। আর কোন দিকে চোখ যাচ্ছিল না;—শুধু সামনে।

মত্ত হাতীর বল নিয়ে এক দমকা বাতাস ঘুরতে ঘুরতে ছুটে এল একটা শব্দ হল আমি চেয়ে দেখলাম—একটা পামগাছের উচ্চ চূড়া ভেঙ্গে আমার পেছনে ঝুপ্ করে পড়ল। * * * তারপর দিন বটেজের সামনা দিয়ে যখন যচ্ছিলাম দেখলাম, হাস্নাহানা ফুলের গাছটা ঝড়ে কেমন এলিয়ে পড়েছে।

** ** **

সুধীর, তারপর পরীক্ষা দিয়েই এই আত্মীয় স্বজন ছাড়া জব্বলপুরে চলে এসেছি। এখানে এসে মন্নুকে কয়েকখানা চিঠি লেখেছিলাম। তার উত্তরও ঠিক সময়েই পেয়েছি—ক্ষমা চেয়েছিলাম সে আমাকে ক্ষমা করেছে।

এই জব্বলপুরে এসেও অরক্ষণীয়া মেয়েদের পিতার হাত থেকে আমি রেহাই পাই নি। M. A. পাশ করা পাত্র—কতজন যে তার মেয়েটাকে আমার হাতে সমর্পণ করবার জন্য ব্যস্ত

হয়ে পড়েছিল তার সংখ্যা নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলকে আমার হতাশ করতে হয়েছে।

মনু আমায় কলকতা যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পত্র লিখেছিল। আমি কয়েকটা দিনের জন্য গিয়েছিলাম। দেখলাম সে এখন পিতৃমাতৃহীন ছোট শিশুদের মা। আমায় দেখে একটী শিশুকে বুকের উপর নিয়ে সে এসে দাঁড়াল, মুখে তার পূর্ণতার হাসি, বেদনার একটু চিহ্নও, একটা রেখাও কোথাও দেখতে না পেয়ে হৃদয়ে যেন অধীরতা জেগে উঠল। বুঝতে পারলাম মাতৃত্বের গৌরবে নারীত্বের অপূর্ণতা আজ পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

জব্বলপুরেই বাকী জীবনটা কাটাব মনে করেছি; এখানে একবার বেড়াতে আসিস। এখানকার (Marble rock) মার্ব্বেল রকটা একটা দেখবার জিনিষ।

তোর বিয়ের নিমন্ত্রণ চিঠি পেয়েছি অনেক দিন। উৎসবের আহ্বানের উত্তরে আজ আমি আমার আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি।

"তোর ভিতরকার চিরন্তন পুরুষের সঙ্গে তোর প্রিয়ার চিরন্তন প্রকৃতির এই শুভ মিলন কল্যাণে কল্যাণে পরিপূর্ণ হোক।"

"তোর যৌবন ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব অতুলনীয় রত্নসজ্জায় প্রিয়াকে তুই সাজিয়ে তোল। এই প্রেম-অভিষেক ভবিষ্যতের আকাশে মানব-প্রেমের স্মৃতি গীতকে যেন নূতন মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত করে তোলে—সে ঝঙ্কার দিকে দিকে কালে কালে যেন স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়—এই আমার আশীর্ব্বাদ।"

তুই কোথায় আছিস জানিনে। তাই এ মাসিক পত্রিকার সাহায্যে আমার শুভেচ্ছা তোকে জানাচ্ছি। ইতি—

তোদের—রমা।

বঙ্গপল্লী।

—:*:—

কোন পাপে আজি লভিনু জনম
বাঙ্গলায় গাঁয়ে আমি ?
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে লভিতে মরণ
এসেছি মরতে নামি।
বাঁচিয়ে বাঁচি সে এ মরার চেয়ে ;
মরা ঢের ভালো গলে দড়ি দিয়ে
এর চেয়ে আরো ভালো শতগুণে
সাহারার মরুভূমি !
কোন পাপে আজি লভিনু জনম
বাঙ্গলার গাঁয়ে আমি !

যারা বাস করে, দগ্ধ এ পুরে
তারা যে নরক-বাসী !
খাক্ হ'য়ে যায় প্রাণ জ্বলে পুড়ে
ঘুরে কঙ্কালরাশি !
যত রোগ সব পায় হেথা প্রাণ
পাপের হেথায় সেরা অভিযান !
দুয়ারে মৃত্যু সদা দেয় হানা
সকল বিপদ নাশি' !
যারা বাস করে, দগ্ধ এ পুরে
তারা যে নরক-বাসী !

কুকুর, বিড়াল, হ'য়ে জন্মানো
• ঢের ভালো এর চেয়ে,—
মরিতে হয় না শুকা'য়ে কখনো
কিছু নাহি খেতে পেয়ে !
মানুষ না হওয়া, মানুষ হইয়ে
কত বড় তাপ, জাগিছে হৃদয়ে !
যেতে চায় প্রাণ উদাস-পুলকে,
হতাশার গান গেয়ে !
কুকুর, বিড়াল হ'য়ে জন্মানো
ঢেড় ভালো এর চেয়ে ?

কোন পাপে আজি লভিনু জনম
বাঙ্গলার গাঁয়ে আমি ?
মৃত্যুর মাঝে লইয়ে জীবন
জ্বলে মরি দিন যামী !
কীট, পতঙ্গ জনমিয়া কত ;—
বাঁচার লাগিয়ে বাঁচে শত শত !
মানুষ তাদের মাড়িয়ে দে'খায়
মান-সম্ভ্রম-কামী !
কোন পাপে আজি লভিনু জনম
বাঙ্গলার গাঁয়ে আমি !

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্যের কথা।

(আলোচনা)

বাংলা সাহিত্যে বর্ত্তমানে যে যুগ আসিয়াছে তাহাতে সাহিত্যের বিচিত্রতা বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ প্রভৃতির আদর্শগুলি সুস্পষ্ট ভাবে সাহিত্যস্রষ্টা বা সাহিত্যামেদীর সম্মুখে উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয় এবং এতদ্বিষয়ে প্রভূত আলোচনাও আবশ্যক। এই বিপুল সাহিত্যসৃষ্টির যুগে এ ভয় ক্রমেই প্রবলতর হইতেছে যে,—আদর্শচ্যুতিতে মিথ্যা সাহিত্যও কোন দিন সৎসাহিত্যের স্থান অধিকার করিবে—এবং সাধারণ সাহিত্যিকও প্রতিভার অসাধারণত্ব দাবী করিয়া বসিবেন। কালের অমোঘ নিয়মে মিথ্যা কথনও সত্যের আসন চিরদিনের জন্য অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না তথাপি সাময়িক মিথ্যার আশ্রয় উন্নতির বা বিকাশের ধারাকে অবরুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হয়।

কিছুদিন হইল আমাদের মাসিক পত্রিকাগুলি বস্তুতান্ত্রিকতা (Realism) ও ভাবতান্ত্রিকতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল—কোনও চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া বর্ত্তমানে তাহারা প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছে। বাস্তবিক এ প্রকার বিষয়ে কোনও একটা মিমাংসায় উপনীত হওয়া অতিশয় দুরূহ। অনেকেই ইতিপূর্ব্বে এতদ্বিষয়ে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিয়াছেন এ প্রবন্ধে আমরাও সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথার অবতারণা করিব।

মানব জীবনই সাহিত্যের প্রধান বস্তু—তাহার অসংখ্য সম্বন্ধ যেমন বিশ্বের সহিত বিশ্বের ঈশ্বরের সহিত, স্বীয় আত্মার সহিত অপরের সহিত ভাব জগতের নানা ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল সম্বন্ধের মধ্যেই জীবনের বিচিত্রতা পরিস্ফুট হয়,—আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব সুখদুঃখের তীব্রতা, বিরহমিলনের বেদনা—আকাঙ্ক্ষার অধীরতা ও ত্যাগের প্রশান্তি প্রভৃতি বিচিত্র রসের প্রকাশ সম্ভাবিত হইয়া থাকে। এই প্রকার রসের বিভিন্নতাই সাহিত্যের নানা বিভাগের সৃষ্টি করে। বহুল ব্যবহৃত "আর্ট" কথার অর্থ—সত্যপ্রকাশের, রস সঞ্চারের এক সুন্দর সার্থক ভঙ্গিমা। ভঙ্গিমার বিচিত্রতা এবং মূলের কথা—স্রষ্টার রসানুভূতির গভীরত্ব, পদার্থের মধ্যে এক অভিনবত্ব মনোহারিত্ব বা সৌন্দর্য্য বিকশিত করে। যেমন নানা বর্ণের বিকাশে সন্ধ্যার আকাশ এক অপরূপত্বের ছায়া লইয়া আমাদের প্রাণের দ্বারে আঘাত করে তেমনই জীবনের

সত্য কবির প্রাণের বিশিষ্ট সম্পদে গরীয়ান হইয়া বিশ্বমানবের, সকলের প্রাণের কথার প্রতিধ্বনি হইয়া উঠে। স্রষ্টার অনুভূতির বিশিষ্টতাই আর্টের বিশিষ্টতা। ইহা পদার্থের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে সত্যের প্রকাশের উপর—পদার্থের স্বরূপতার উন্মেষের উপর।

পদার্থের স্বরূপ কি? জগতের সকল পদার্থই দুই ভাবে দেখা যাইতে পারে। কখনও পদার্থগুলি তাহাদের বস্তুগত রূপ লইয়া আমাদের চোখের উপর একটা ছাপ রাখিয়া যায় আবার কখনও বা আমরা আমাদের মনের কোন একটা বেগবান ভাবের আলোকে তাহাদিগকে দেখিয়া থাকি। এ বিশ্ব নানা বর্ণে নানা গন্ধে পরিবর্তনের এক ধারাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে—রৌদ্র ছায়া, বর্ষা, বসন্ত, তাহাদের কুহকময় স্পর্শ দ্বারা ধরণীর পৃষ্ঠ মদির আবেশময় করিয়া তুলিয়াছে কোন কবি মোহমুগ্ধ কণ্ঠে এই বৈচিত্র্যকেই লক্ষ্য করিয়া ষড় ঋতুকে আবাহন করেন আবার কোন কবি ঐ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধপূর্ণ জগৎ আমাদের প্রাণের ভাবরাশির উপর যে আলোড়ন তোলে বা তাহাদের কোমল স্পর্শে আমাদের মর্ম্মের নিগূঢ় তন্ত্রীতে যে অপরূপ ঝঙ্কার সৃষ্টি করে তাহাকেই প্রকাশ করেন। তাই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি "শ্রাবণ ঘন গহন—" কবিতায় বর্ষার নিবিড়তার মাঝে ভগবানের গোপন অভিসারের পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল—আর কবি হৃদয় এই জগতের বিচিত্রতার মধ্যে নিজের জীবনের পথকে অনুসরণ করিয়া মিলনের আশায় মত্ত হৃদয়ে আনন্দলাভ করিয়া সার্থক হইয়াছিল। বস্তুর সঙ্গে ভাবের এই মিলনে বস্তুর যে রূপটা আমাদের চোখে পড়ে তাহাই শিল্পীর পক্ষে সে বস্তুর স্বরূপ এবং এ স্বরূপতার প্রকাশই শিল্পীর ধ্যান ও সাধনা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি - বস্তুর এই স্বরূপতার উন্মেষই "আর্ট"—এই লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলে—কোন প্রকার প্রকাশকেই "আর্ট" সংজ্ঞাভুক্ত বলা যাইতে পারে না—আর্টের প্রকার ভেদ প্রধানতঃ দুই—বস্তুতন্ত্র (Realism) ও ভাবতন্ত্র (Idealism) বাস্তবজীবনে যাহা ঘটে তাহার অবিকৃত প্রতিকৃতি প্রকাশকেই অনেকে Realistic art মনে করেন এবং ভাবের আলোতে রঙীণ জীবনের প্রকাশকে Idealistic art বলা হয়। বস্তুতঃ এই দুই প্রকার আর্টের বিশিষ্টতা ঐখানে নয়। যে আর্ট কেবল মানবজীবনের শোক দুঃখ প্রকাশেই ব্যাপৃত,—যে প্রকাশের মধ্যে জীবনের আলোড়নের পশ্চাতে একটা আদর্শ স্থাপন ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নাই তাহাকেই Realistic art বলা হয়—এবং যে আর্ট জীবনের সুখদুঃখের মধ্যে একটা আদর্শ

প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায় তাহাকেই বলা হয় Idealistic art শেষোক্ত আর্ট জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ, বেদনা আনন্দ জীবনের চিরন্তন: ব্যাপারগুলি এমন একটা উচ্চস্থান হইতে পরিদর্শন করে যে সে সুখে অধীর হয় না, বেদনায় মুহ্যমান হয় না—এক প্রশান্তি, স্থৈর্য্য আত্ম-নির্ভরতা তাহার মধ্যে অবস্থান করে—জীবনের ঘটনার স্রোতে বাহিত না হইয়া এক সমুন্নত আদর্শের উপর, এক বিশাল ভাবভিত্তির উপর তাহার সৃষ্ট জগৎকে স্থাপন করে। Realistic art মানবজীবনের সুখদুঃখ প্রভৃতির অনুভূতিকেই শিল্পের চরম বস্তু একান্ত অবলম্বন স্বরূপ বরণ করিয়া থাকে—ব্যথা বেদনার তীব্রতায় আনন্দ ও পুলকের অসহনীয়তায় প্রাণ মগ্ন হইয়া যায় চিন্তার সেখানে অবসর থাকে না—ভাবুকতা (Philosophising) সেখানে আসন পায় না—হৃদয়ের আলোড়নে মনের খেলা চিন্তাবৃত্তি সব স্তব্ধ, মূক।

একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত হইতেই ব্যবধানটা পরিষ্কার বোঝা যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" Idealistic art-এর এবং শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" Realistic art-এর সুন্দর নিদর্শন। উভয় উপন্যাসেরই বর্ণনীয় বিষয় বাল্যপ্রণয় ও তাহার পরিণাম। শৈবলিনীর প্রেমের জন্য, যাহাতে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর পরবর্ত্তী জীবন সুখময় হয় তজ্জন্য প্রতাপ আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল এবং দেবদাসের ব্যর্থপ্রেম তাহার হৃদয়ে সমাজ বিদ্রোহিতা ও আত্মবিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আত্মধ্বংসের পথে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই দুই এর মধ্যে বৈষম্য কোথায়? দেবদাসের স্রষ্টা ঐ ব্যর্থপ্রণয়ের মর্ম্মন্তুদ বেদনার মাঝে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন বেদনার সংঘাতে বিচূর্ণিত যে দুটী হৃদয়ের চিত্র আমাদিগকে দেখাইয়াছেন তাহা পড়িতে গেলে আমাদের হৃদয়েও ব্যথা জাগিয়া উঠে এক গভীর ক্রন্দন হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে রণিয়া রণিয়া বাজিতে থাকে। চন্দ্রশেখরে আমরা বেদনার দাবদাহের সৃষ্টি পাই না—বেদনা গভীর হইয়া জাগিয়া আছে সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের এক উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসও সুস্পষ্ট বর্ত্তমান সেখানে সংযমের সাধনার চিত্রও উজ্জল রূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে—সেই সংযমের দৃঢ়তায় আমাদের চিত্ত ব্যর্থতায় গভীরত্ব পরিমাপ করে না—দৃঢ়বন্ধনে বেদনার আলোড়নের থামিয়া যায়।

মানবজীবনের Tragedyর দিকটা উভয় উপন্যাসেই বেশ সুপরিস্ফুট। সমাজের কঠোর নিয়মের বশ্যতায়—আমাদের ব্যক্তিত্ব যেখানে প্রতি পদে পদে প্রতিহত হইতেছে—আমাদের

ব্যক্তিগত বাসনা আকাঙ্ক্ষা যেখানে দলিত কুসুমের মত সমাজের উত্তপ্ত স্পর্শে ম্রিয়মান হইয়া ঝরিয়া পড়ে সেখানেই আমাদের জীবনে Tragedy. এই Tragedyই আমরা অতিশয় বেদনার সহিত দেবদাস ও চন্দ্রশেখরে অঙ্কিত হইতে দেখিতে পাই। বাল্যের যে প্রেম খেলাধূলার মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করে,—কৈশোরে যাহা একটা নূতন জগতের বারতা লইয়া সলজ্জ চকিত হাসির মধ্যে পরিণতি আকাঙ্ক্ষা করে—যৌবনে সেই প্রেম দেবদাস ও পার্ব্বতীতে, প্রতাপ ও শৈবলিনীতে সারাজীবনের একটা মিলনাশা ও মোহন সুখস্বপ্ন লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন আর জীবনে সত্য হইয়া বিকশিত হইল না—পূর্ব্ব গগনে উষার রক্তিমরাগের মত ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। তারপর যাহা থাকিল সে কেবল এক অসহ্য বেদনা। এই বেদনায় দেবদাস গিয়াছিল—নিজকে ভোগের পূজায় বলি দিতে—আর প্রতাপ প্রণয়াস্পদের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে। দেবদাসের প্রতি কার্য্যের মধ্যে পাই আমরা এক রূঢ় দীপ্ত আত্মদ্রোহীর চিত্র, জীবনের সুরাপাত্র যাহা একদিন উছলিত ফেণায়িত তরঙ্গে তাহার ওষ্ঠাধরের কাছে আসিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল; এক আকস্মিক আঘাতে প্রহত হইয়া সে পাত্র শত খণ্ডে বিচূর্ণিত হইয়া গেল। হতাশার তীব্র জ্বালায় এই ব্যর্থ জীবনের প্রতি কেমন যেন তাহার একটা প্রকাণ্ড অনাদর জন্মিয়াছিল তাহার জন্যই সে নিজকে ধ্বংশ করিবার জন্য আয়োজন করিয়া বসিল। ভোগের কদর্য্যতার মাঝে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে গেল কিন্তু কুৎসিতত্বও হৃদয়ের সত্য প্রেমের সংস্পর্শে সুন্দর ও মঙ্গলময় (শিবম্ সুন্দরম্) হইল। এখানেই শিল্পীর শিল্পকুশলতা ধন্য ও সার্থক। কিন্তু 'চন্দ্রশেখরের' প্রতাপ দৃঢ়তা ও সংযমের সহিত এ বিফলতাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। সমস্ত কাব্যখানির মধ্যে তাই আমরা দেখিতে পাই এক বলিষ্ঠ সংযমী পুরুষের চিত্র প্রলোভন দ্বারা যে সংযমকে জয় করিয়াছে, বাসনাকে আত্মোৎসর্গ দ্বারা পরাভূত করিয়াছে এবং স্থৈর্য্য ও মহত্বে এক বিশাল গৌরব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এখানে শিল্পী বা স্রষ্টা সজাগ, স্থির সংযমী— তুলিকার প্রতি টানে কি চিত্র অঙ্কিত হইবে তাহা তিনি অবগত আছেন, ধ্যান ও সাধনায় তাহার দৃষ্টি সুদূরগামী নানা ঘটনার বৈচিত্র্যের মাঝেও বেদনার মর্ম্মান্তিকতার মাঝেও এক অপরাজেয় স্থৈর্য্য বলবতী ও জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে। দেবদাসের শিল্পী উত্তেজনার নেশায়

ছুটিয়া চলিয়াছেন তাহার চিত্র এক উদ্বেল ভাবরাশির সৃষ্টি করে এক উন্মাদনাময় আবেশ আনয়ন করে।

এই সকল লক্ষণের জন্যই চন্দ্রশেখর Idealistic art এবং দেবদাসকে Realistic art এর নিদর্শন এবং উপরে উক্ত লক্ষণানুসারেই সাহিত্য দুই ভাগে বিভক্ত। সাহিত্যের এই শ্রেণী বিভাগ স্রষ্টা বা শিল্পীর সৃষ্টির পক্ষে কিছুই সাহায্য করে না সত্য কিন্তু সাহিত্যামোদীর পক্ষে স্রষ্টার সৃষ্টির প্রেরণা, অনুভূতির প্রকারভেদ প্রভৃতি বিষয় অনুধাবন ও বিশ্লেষণ কার্য্যে প্রভূত আনন্দের বিষয় হইয়া থাকে। সাহিত্য এই ভাবে নানা প্রকারে কখনও আমাদের প্রাণস্পর্শ করিয়া, মর্ম্মে আঘাত করিয়া কখনও বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া চিরদিন আনন্দের অনন্ত উৎস হইয়া রহিয়াছে। সাহিত্যের আনন্দকে পণ্ডিতেরা ব্রহ্মজ্ঞানজনিত আনন্দের সহোদর স্বরূপ বলিয়াছেন "ব্রহ্মাস্বাদঃ সহোদরঃ"। বিখ্যাত সমালোচক ম্যাথু আর্ণও (Matthew Arnold) বলিয়াছেন "The strongest part of our religion is unconscious poetry" সাহিত্যের পবিত্র মন্দিরে পূজার জন্য অর্ঘ্য বহিয়া আনিতে হইলে সাধনা বা ধ্যানের দ্বারা যোগ্যতা অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য, যাহার স্থান গৌরবে মহনীয়তায় ধর্ম্মের সন্নিকটবর্ত্তী যাহার মধ্যে বিশ্বজনের প্রাণে যাহা কিছু সত্য যাহা কিছু সুন্দর বা মঙ্গলময় পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া রহিয়াছে তাহার পূজার জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই চলিবে না আকাঙ্ক্ষার সফলতার জন্য "সত্য শিব সুন্দরম্"এর সাধনা আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু উচ্চ, যাহা কিছু সত্য তাহাই সাহিত্যের প্রাপ্য,—এ ধারণা যদি পূজারীগণ সর্ব্বদা মনে পোষণ করিতেন তবে বর্ত্তমান যুগের অনেক আর্টই এ ভাবে নিবেদিত হইতে পারিত না। আমাদিগকে এ কথা বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে যে, সাহিত্য সাধনা ধর্ম্ম সাধনার সহোদর। সমকক্ষ সত্যের আরাধনা ও প্রকাশ এ সাধনার বিষয়। এ ব্রত উদ্যাপনে চাই দৃঢ় নিষ্ঠা ভক্তি ও ধ্যান।

শ্রীঅশ্রুমান্ দাশগুপ্ত।

ব্যাথা ?

—০—

ভালবাসি যারে তার কাছে মোরা,
ফুলদল সম কোমল অতি
সেই আমরাই অরাতি দলনে
অশনি ভীষণ—ভীমা গতি !

দানে যে আমরা মুক্ত হস্ত
আপনা ভুলিয়া পতির পায়
দেহ, মন, প্রাণ, ইহপরকাল
সকলি সঁপিয়া দিই গো তায় ।

পরেরে এমন করিতে আপন
কে পেরেছে ওগো মোদের মত !
চিরবাঞ্ছিত শৈশব গৃহ
ছাড়ি গিয়ে তুমি পরেরে যত ।

সেবায় আমরা কল্যাণময়ী
নিদ্ নাহি আসে আঁখির আগে,
সন্তান মাথা কোলে লয়ে মাতা
দীর্ঘ দিবস রজনী জাগে ।

অতিথির সেবা করি অকাতরে
স্বর্গও মানি তুচ্ছ অতি
সান্ত্বনা দিতে বিশ্ব জগতে
নারীর হৃদয়ে স্বতঃই গতি।

এ কথা যে হায়! বুঝিল না কেহ
এ কি আম দের ব্যথার বাণী ?—
ভেবো না, আমরা নিজ মহিমায়
সদাই নিজেকে ধন্য মানি।

শ্রীলা—

কর্ত্তব্যের অর্ঘ্য।

(১)

সন্ধ্যার আঁধার তখনও ধরণীর বক্ষে ছড়াইয়া পড়ে নাই—ঘন কাল মেঘ পশ্চিম আকাশের কোণে উঁকি দিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া দিয়াছে; বাতাসের রণ রণি—শন শনি আর বিদ্যুতের মুহুর্মুহু চমকে সকলেই বিব্রত।

রায়-পল্লীর একটী ভাঙ্গা বাড়ীর ক্ষুদ্র কক্ষের মেঝের উপর একখানি জীর্ণ শয্যায়—একটী রমণীর রোগজীর্ণ দেহ শায়িত। পার্শ্বে একটী সপ্তম বর্ষীয় বালক ও অষ্টবিংশ বর্ষীয় যুবা বসিয়া রহিয়াছে। যুবকটীর মুখ বিমর্ষ, চক্ষু জলে ভরা;—বালকটী রমণীর শিথিল রোগজীর্ণ হাত দুইখানি নিজের হাতে লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। রমণী অতি কষ্টে মুদ্রিত নয়ন উন্মোচন করিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট যুবকটীর দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিল; ক্ষীণকণ্ঠে বলিল —ঠাকুরপো, সময় হ'য়ে এলো, তুমি যদুকে দেখো!

যুবক বলিল—ও কথা কেন বউদি—সেরে উঠবেন! রমণী বলিল—না ভাই, আর না—যাবার সময় হয়েছে! উঃ—শেষের কথা কয়েকটী বলিতে গিয়া স্বর জড়াইয়া গেল, চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

যুবকটী ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—অমন কচ্ছেন কেন বৌদি, যেমন করে পারি সারিয়ে তুলবো—ভয় কি?

যুবক নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল—তাহার স্নেহস্পর্শে রমণীর ম্লান মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—কি যেন গভীর তৃপ্তিতে একটী নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নয়ন পল্লব নিমীলিত করিল! বালক "মা মা" বলিয়া রমণীর বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। যুবক নীরব নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুধু এ দৃশ্য দেখিতেছিল—তাহার চিন্তার স্রোত জমাট বাঁধিয়া ক্ষণকালের জন্য কোন অজানা প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে কে জানে!

হঠাৎ নীরব নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে যেন শ্মশানের প্রেতের ন্যায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—অমন করে মরা আর আগলে বসে বাড়ীটার অমঙ্গল টেনে এনে কাজ কি? কি আহ্লাদে ছেলে, মা মরেছে তবু তার বুকের উপর পড়ে আছে। যাও—ছেলেটাকে টেনে রেখে মরাটার সংকারের ব্যবস্থা করগে!

রমণীর কঠোর শাসন ধ্বনিতে যুবকের সজ্ঞা ফিরিয়া আসিল—চাহিয়া দেখিল সম্মুখে তাহার স্ত্রী সরলা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখে কুটিলতাপূর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে; স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—কি গো,—কথা যে বড় কচ্ছ না, মরাটা কি ঘরেই রাখবে নাকি?

যোগেশ কিছুই না বলিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তাহার ভ্রাতৃজায়া মানদার সংকারের ব্যবস্থা করিতে।

(২)

তারপর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। পিতৃমাতৃহারা যদুনাথ এখন দ্বাদশবর্ষীয় বালক,—খুড়ীমাতার অনাচরে অত্যাচারে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া কেবল খুল্লতাত যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়াই বাঁচিয়া আছে। যদুকে আদর যত্ন করিবার যোগেশ ছাড়া এ জগতে আর কেহই নাই,—এই জনপূর্ণ জগতের মধ্যে কেবল তাহার খুল্লতাতকেই আপনার জন বলিয়া ভাবিতে পারিত।

একটু আধটু মনে পড়ে তাহার মাতার মৃত্যুর কথা—তারপর যখন সে সেই স্নেহময়ী জননীর দাহ-কার্য্য শেষে অশ্রুসিক্ত নয়নে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল তখনকার খুড়ীমাতার কঠোর শাসনের কথা!

এই দীর্ঘ পঞ্চবর্ষ—বালক যদুনাথের উপর নানা রকম অত্যাচার চালাইয়া আসিয়াও সরলা শান্ত হয় নাই; নিত্য নূতন অত্যাচারে বালককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। যোগেশ পূর্ব্বে দুই এক দিন নিষেধ করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে সুফল না হইয়া কুফলের মাত্রাই বেশীর ভাগ দেখা যাইত—তাই ইদানীং যোগেশ সরলাকে কোন কথাই না বলিয়া যদুকে বলিত—কি করবি বাবা, একটু স'য়ে থাক!

একদিন রাত্রিতে যদুর ভয়ানক জ্বর হইল—অতি কষ্টে রাত্রিটা কাটাইয়া দিল, প্রাতে জ্বর ছাড়িয়াছে; শরীর বড় দুর্ব্বল, উঠিয়া বসিতে বড় কষ্ট হয়। বাহিরের আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা—মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ আকাশ গাত্রে চমক দিয়া খেলিয়া যাইতেছে; রাত্রে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল—তখনও গুঁড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল, এমন সময় ঘরের ভিতরে শ্রীমতী সরলাসুন্দরী প্রবেশ করিয়া অঙ্গভঙ্গি সহকারে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—কি—এখনও যে ওঠা হোল না? গয়লা বাড়ীতে দুধ আনতে যাবি কখন—বেলা কি বসে থাকবে নাকি?

বালক ভীতকণ্ঠে উত্তর দিল—আমার রাতে জ্বর হয়েছিল কাকী মা!

সরলা বলিল—তাতো জ্বর হবেই—আজ ঠাণ্ডা দিন কি—নে!

যদু বলিল—না কাকী মা সত্যি জ্বর হয়েছিল—উঠ্‌তে বড় কষ্ট হচ্ছে!

সরলা বলিল—হুঁ ছেলের ন্যাকামো দেখ! আলসে ছেলে হ'লেই এমনি হয়। বলি—নচ্ছার সত্যি কথা বলতে কি কোন দোষ আছে নাকি? মজাটা দেখাচ্ছি—যদি না উঠবি!

যদুনাথ অশ্রুসিক্ত নয়নে বিছানা হইতে উঠিয়া ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচ দিয়া গ্রাম্য পথের বুকে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল—কেহই তাহার সন্ধান রাখিল না! ** **

যোগেশ অনেক রাত্রিতে নিজের কার্য্যস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহার শেষে ঘুমাইয়া পড়িল—যদুনাথের কোনই সন্ধান সে দিন হইল না।

(৩)

দীর্ঘ এক যুগ তারপর কাটিয়া গিয়াছে। যোগেশের অশ্রু-পিচ্ছিল জীবন এ গতির বাধা দিতে পারে নাই। যোগেশ যত্নর নিরুদ্দেশের পরদিন পাগলের ন্যায় অনেক সন্ধান করিয়াছিল কিন্তু নিরুদ্দেশের সন্ধান পায় নাই। সাত আট দিন পরে সেখানকার অনেকের মুখেই শুনিতে পাইল শ্যামপুকুরে কয়েকদিন হইল একটী বালক আত্মহত্যা করিয়াছে—তাহার আত্মীয় স্বজন, কাহারও সন্ধান না পাওয়ায় গ্রামবাসীরা পুলিশে জানাইয়া মরাটী পোড়াইয়া দিয়াছে।

কয়েকদিন বড়ই মনকষ্টে যোগেশ কাটাইয়া দিল; ক্রমে ক্রমে পুরাতন স্মৃতিগুলি মন হইতে প্রায় মুছিয়াই গিয়াছিল। মানুষের চিরদিন সমান যায় না, সুখের পর দুঃখ—দুঃখের সুখ বিধাতার দান।

যোগেশ সামান্য বেতনে একটি চাকুরী করিত; বিলাসিনী উচ্ছৃঙ্খলা স্ত্রীর জন্য একটি পয়সাও হাতে রাখিতে পারে নাই। অভাবের তাড়নে—দুশ্চিন্তায় যোগেশের শরীর মন ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, একদিন সে রোগ শয্যা গ্রহণ করিল,—যন্ত্রণা, রোগের তাড়ন, সংসারের অভাবে সে জর্জ্জরিত—ঘরের আসবাব কিছু কিছু বিক্রয় করিয়া কোন রকমে একমাস চলিয়াছিল—এখন নিরুপায়! রোগের ঔষধ ত নাই—রোগীর পথ্যই বা দেয় কিসে, কি দিয়া সংসার চলে বা খায় কি! যে সরলা বাপের বাড়ী যাইবে বলিয়া অনেক সময় নানারূপ অভিনয় করিত, সেইখানে—ভাইয়ের নিকট কয়েকখানি পত্র লেখায় উত্তর পাইয়াছে—"আমার অবস্থা খারাপ সাহায্য করতে পারবো না।" সে সত্যই আজ নয়নে অন্ধকার দেখিল—সত্যই সে নিজকে সহায়হীন মনে করিল—সে স্বামীর রোগশয্যা পার্শ্বে গিয়া ধীরে ধীরে বসিল, কম্পিত কণ্ঠে বলিল "এখন কি হবে গো!"

ক্ষীণ কণ্ঠে যোগেশ বলিল—কি!

সরলা বলিল—তোমার পথ্যেরই বা কি করি· আমিই বা কি খাই?

যোগেশ বাধ বাধ কণ্ঠে বলিল—সরলা আমার আর প্রয়োজন হবে না! তবে তোমার জন্য ভাবনা—

সরলা বলিল—তোমার কোন চিকিৎসাই হ'ল না—শেষে না খেয়ে মরবে তাও দেখবো!

যোগেশের নয়ন হইতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল—ধীরে ধীরে বলিল—কি করবে সরলা, পূর্ব্বে যদি এমন বিপদ আপদের কথা ভাবতে—তবে কি আজ এমন ভাবে চোখের জল ফেলতে হ'ত—না অনাহারে মরতে হ'ত; হাজার হোক ভাইপো ত—যেমন করে—যোগেশ আর বলিতে পারিল না, কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

সরলা তাড়াতাড়ি রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আর সে কথা বলে কি হবে গো, যা হবার তা তো হয়েছে—এখন অদৃষ্টে যে কি আছে কে জানে!

সরলা চাহিয়া দেখিল,—যোগেশের শ্বাসকষ্ট হইতেছে, কি যেন বলিতে চাহিয়াও বলিতে পারিতেছে না; ব্যস্ত হইয়া স্বামীকে বাহুপাশে ধরিয়া বলিল—অমন কচ্ছ কেন গো—অমন কচ্ছ কেন?

বাহু বেষ্টনে যোগেশের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুঃখ কষ্টের সংসার হইতে চিরবিদায় লইল—সরলা উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—"কোথা গেলে গো—আমার কি হল গো"—যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে!

(৪)

জীবন বড় সাধের,—আবার আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনের ভার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বহ, সরলার কি আছে! সে অক্ষম,—দীন,—আশাহীন,—অন্ধকার,—অদূরদর্শী সরলা উপায় না পাইয়া হতাশ জীবনের শেষ কামনা করিতেছিল আত্মহত্যা! সে যে মহাপাতক! হাঁ, সেই তাই করিবে—সে জীবনে কবে পুণ্য করিয়াছে—যে আজ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পুণ্যকামী হইবে! দুষ্ক্রিয়ায় তার ভয় নাই,—আত্মহত্যায় সে দৃঢ়নিশ্চয়! সেই তার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত!

জীবনের পরপারের যাত্রী সরলা উদ্বন্ধনের উদ্যোগে রুদ্ধ কীলক গৃহে উন্মত্ত! কে ডাকিল এমন সময়! কাকিমা!

যদুর কণ্ঠ স্বর—প্রেতভূমি হইতে প্রেত কি এ-প্রেত কার্য্যের সাহায্যার্থী করিতে,—প্রতিশোধ লইতে উপস্থিত! এ কি যদুর প্রেতাত্মা!

কাকিমা—আবার কাকিমা সম্বোধন। সরলার মূর্চ্ছিত হইয়া সশব্দে ধরা বক্ষে লুণ্ঠিত হইল। ভগ্নগৃহের ফাঁক দিয়া যদু দেখিল কাকীমা মূর্চ্ছিত! যদু জীর্ণ দ্বার সজোড়ে উদ্ঘাটন করিয়া গৃহ প্রবেশ করিল।

অনেক শুশ্রূষার পর সরলার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সে চক্ষু উন্মিলন না করিয়াই বলিল—সত্যাই কি তুই এসেছিস্—না না সে যে অনেক দিন মরেছে,—যদুর প্রেতাত্মা তুই।

যদু কাকিমার কপোলে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—মরি নি মা—আমি তোমাদের যদু, তোমাদের জন্যেই বেঁচে আছি,—অন্নের দৈন্য ঘুচেছে—প্রফেসারী করি,—ছেলে তোমাদের নিতে এসেছে!

যার জন্যে এসেছিস্ যদু, সে যে নাই—এসে দেখ গো যদু তোমার—

কেঁদ না মা—সব শুনেছি সেটাই আমার বুকে শেল হয়ে বেধেছে—স্বর্গের দেবতা স্বর্গে গেছেন,—তুমি ত আমার আছ মা!

শ্রীসুখ শুমে হন দেব।

শরতে

ধানের ক্ষেতে ছড়িয়ে প'ল
মা কমলার আঁচলখানি,
হতাশ প্রাণে কে আনিল
বেঁচে থাকার মধুর বাণী!
বুকের মাঝে গুমটো হাওয়া
রুদ্ধ ছিল দীর্ঘ শ্বাসে
আজকে তারে মুক্তি দিল
সিক্ত করি শিউলি বাসে!
আনন্দ তার শুভ্রতাকে, প্রকাশ করে
কাশের ফুলে

আকাশ বধূ উঠ্‌লো হেসে
কালো মেঘের ঘোমটা খুলে।
নিখিলে আজ পড়্‌লো সাড়া
দুয়ার খোলো, দুয়ার খোলো
রুদ্ধ বুকের অন্ধকারে
আজকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালো।
দুকূল ভরা নদীর ঘাটে
শরৎ এসে বাঁধলো তরী
ফেল্ রে মুছে অশ্রুকণা
পুলক নে' আজ বক্ষ ভরি।

শ্রীনিমানন্দ ঠাকুর।

প্রাচীন প্রসঙ্গ।*

দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান পীরগাছা থানার তাম্বুলপুর গ্রামে কোন ব্রাহ্মণের বসতি ছিল না। কি প্রকারে এই গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণের বসতি হইল তাহার কিম্বদন্তীমূলক বিবরণ অদ্যাপি লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, পুকুরিয়া পরগণার বাসুদেব চক্রবর্ত্তীর পুত্র বলরাম চক্রবর্ত্তী ২০।২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগী না হওয়ায় বাসুদেব

---

* উত্তর বঙ্গের প্রাচীন কাহিনী "পরিচারিকায়" ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইবে। যদি কেহ এই বিষয়ে উপকরণ সংগ্রহে লেখককে সহায়তা করেন, কিংবা আলোচ্য প্রসঙ্গে কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদ লক্ষ্য করেন, উহা লেখককে অনুগ্রহ প্রকাশে জানাইলে লেখক পরম উপকৃত হইবেন।

পুত্রকে প্রায়ই ভর্ৎসনা করিতেন। যখন ভর্ৎসনা ও তিরস্কারে কোন ফল হইল না, তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিতান্ত বিরক্ত হইয়া একদিন স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি ইহাকে ভাতের সহিত ছাই দিও, নচেৎ ইহার কিছুতেই চৈতন্যোদয় হইবে না। স্বামীর আদেশ অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে, ইহা বুঝিয়াও গৃহিণী কয়েক দিবস ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন পুত্রের অন্নের থালার এক পার্শ্বে একখানি ধৌত অঙ্গার সন্নিবেশ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য পালন করিলেন। পুত্র বলরাম অন্নের পার্শ্বে অঙ্গার দেখিয়া উহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। মাতৃদত্ত অন্ন পরিত্যাগ করিলে জননীর প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিবে, ইহা মনে করিয়া তিনি আহার করিলেন বটে, কিন্তু আহারান্তে তিলার্দ্ধ গৃহে অবস্থান করিলেন না। ধুতি ও উত্তরীয় লইয়া নিরক্ষর ব্রাহ্মণপুত্র বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। ক্রমাগত ৫।৬ বৎসর বহুস্থান ঘুরিয়া বলরাম সামান্য লেখাপড়া শিখিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে জ্যোতিষ বিদ্যায় বিশেষ ভাবে পারদর্শী হইলেন। এইবার তিনি কোচবিহার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কোন ক্রমে কোচবিহার রাজের সহিত সাক্ষাত ও পরিচয় হইলে তিনি রাজসরকারে কোনরূপ যোগ্য কার্য্য লাভের অধিকারী হইবেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আহারান্তে রাজদর্শনাশায় প্রতিদিন নিয়মিত রাজদ্বারে বসিয়া থাকিতেন। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইল। এক দিবস নরপতি শিকারে বহির্গত হইবার সময় ব্রাহ্মণকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আজ আমার যাত্রা শুভ, সম্ভবতঃ আশাতীত শিকার মিলিতে পারে। তিনি দ্বারপালকে আদেশ করিলেন, শিকার হইতে ফিরিবার সময় আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে সযত্নে রাজবাটীতে রক্ষা করিবে—তাঁহার আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিবে। এই কথা বলিয়া নরপতি বহির্গত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন নরপতি প্রকৃতই আশাতীত শিকার প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের কথা আর তাঁহার মনে হইল না। অনন্তর আর এক দিবস শিকারে বহির্গত হইবার সময় ব্রাহ্মণকে তদবস্থায় দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মৃতিপটে উদিত হইল। নরপতি বলিলেন, "আপনাকে বোধ হয় আর এক দিন এইখানেই দেখিয়াছি। আপনি কেন এইরূপ রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন?" তখন দ্বারপাল মহারাজকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিতেই তিনি ব্রাহ্মণের লেখাপড়া ও বিদ্যাবুদ্ধির বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ! আমি সামান্য লেখাপড়া জানি, কিন্তু জ্যোতিষ বিদ্যা আমার বিশেষ

ভাবে পারদর্শিতা আছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বলুন ত, আজ আমি কয়টী শিকার পাইব ?" ব্রাহ্মণ তখন মাটীতে যথারীতি গণনা করিয়া বলিলেন, "অদ্য আপনি দুইটী মাত্র শিকার প্রাপ্ত হইবেন।" বাস্তবিক তাহাই হইল। পরদিবস নরপতি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণকে সভায় আনয়ন করিবার জন্য আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার সবিশেষ পরিচয় অবগত হইয়া মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে রাজসরকারে নিযুক্ত করিলেন।

একদিবস রাজমহিষী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে নরপতি বহু অভিজ্ঞ ও কৃতবিদ্য চিকিৎসক দ্বারা মহিষীর চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু তাহাতেও কোনরূপ ফল না হওয়ায়, কি উপায়ে রোগমুক্তি হইবে, জ্যোতিষ সাহায্যে তাহা জানিবার জন্য ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণ সবিশেষ গণনার পর বলিলেন, "মহারাজ! এই সকল কৃতবিদ্য চিকিৎসক রাজরাণীর রোগমুক্তি করিতে পারিবেন না। আপনি অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য কবিরাজদিগকে আহ্বান করুন, তাঁহারাই রাণীকে রোগমুক্ত করিবেন।" ব্রাহ্মণের উপর রাজার অগাধ বিশ্বাস ছিল, সুতরাং নরপতি তাহাই করিলেন। প্রত্যুতঃ রাজমহিষী অচিরাৎ রোগমুক্ত হইলেন।

রাজমহিষী রোগমুক্ত হইলে নরপতি ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ প্রীত হইয়া বলিলেন, "আপনাকে বৎসরের অধিকাংশ সময় রাজসভায় অতিবাহিত করিতে হইবে। মাত্র ২।১ মাসের জন্য স্বগৃহে বাস করিবেন। মহারাজের অনুরোধে ব্রাহ্মণ বলরাম চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "মহারাজ তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক মাসের বিদায় প্রদান করুন, আমি বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া লই।" অতঃপর নরপতির আদেশে ও অর্থব্যয়ে মানাসের তীরদেশে তাম্বুলপুর গ্রামে নিজ বাসস্থান নির্ণয় করিলেন। নরপতি প্রচুর ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি প্রদান করিলে বলরাম চক্রবর্ত্তী স্বচ্ছন্দভাবে তাম্বুলপুর গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। এই বলরাম চক্রবর্ত্তী হইতে তাম্বুলপুরে ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছে।

কথিত আছে, এক সময়ে কাপের সংস্পর্শে কৌলীন্য নষ্ট হইবার আশঙ্কায় মুক্তারাম লাহিড়ী ও প্রাণনাথ বাগ্‌চী স্বদেশ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক তাম্বুলপুরের বলরাম চক্রবর্ত্তীর গৃহে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। ৫।৬ বৎসর অতিবাহিত হইবার পর ইহাদিগকে অনুসন্ধানে প্রেরিত লোক যখন বলরাম চক্রবর্ত্তীর বাটীতে উভয়কে প্রাপ্ত হইল, তখন মুক্তারাম লাহিড়ী বলিলেন

যখন বহুকাল যাবৎ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্নভোজী অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছি, তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কুলমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া যাইব। তখন লাহিড়ী মহাশয়ের প্রস্তাবে লাহিড়ী মহাশয় স্বয়ং বলরাম চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে এবং প্রাণনাথ বাগ্‌চীর দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। এই সময় হইতে তাম্বুলপুর গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণের সৃষ্টি।

এই বংশের শিবনাথ লাহিড়ী, কান্তনাথ লাহিড়ী ও বিশ্বনাথ লাহিড়ীরা সহোদর ছিলেন। বিশ্বনাথ লাহিড়ী অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। শিবনাথ লাহিড়ী ও কান্তনাথ লাহিড়ীর প্রত্যেকের এক এক পুত্র সন্তান ছিল। এই বংশের রামনাথ লাহিড়ী ও দুর্গানাথ লাহিড়ী পৃথগান্ন ভুক্ত ছিলেন। রামনাথ লাহিড়ী মহনার রাধাপ্যারী দেব্যা মহাশয়ার সরকারে দেওয়ানের কার্য্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন, পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি হইতে তাঁহার বার্ষিক প্রায় তিন সহস্র টাকা আয় হইত। ইনি প্রকৃতভাবে প্রজারঞ্জক ছিলেন। কাহারও প্রতি কোন প্রকার অবৈধ অত্যাচার হইলে নিতান্ত অনুতপ্ত হইতেন, দুষ্ট লোককে অর্থ দণ্ড করিয়া নারায়ণ বিগ্রহের সেবা করিতেন। এই বিগ্রহ সঙ্গে করিয়া রামনাথ লাহিড়ী মহাশয় কাশী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করেন। শেষকালে এই বিগ্রহের জন্য তিনি একটী ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই মন্দির সংস্কারাভাবে ভগ্ন ও সর্পাদির আবাসস্থলে পরিণত হয়।

পত্নী বরদাসুন্দরীর কোন সন্তানাদি না হওয়ায় রামনাথ লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক পরলোক গমন করেন। তদনুসারে এক দত্তক গ্রহণ করা হয়। বরদাসুন্দরী এই দত্তক পুত্রের পূর্ব্ব মাতুল প্রাণগো বিন্দ মজুমদারের তত্ত্বাবধানে কিছুকাল সম্পত্তি পরিচালনা করেন।

ইঁহার ও ইঁহার পরবর্ত্তী ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর গহিত আচরণের ফলে ভূসম্পত্তি ইত্যাদি অনেক নষ্ট হওয়ায় নাবালক প্রিয়নাথ লাহিড়ী মহাশয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। লাহিড়ী মহাশয়ও অপুত্রক বিধায় তাঁহারই ইচ্ছানুসারে এক দত্তক গ্রহণ করা হয়। অতঃপর জামাতা রামকমল মৈত্র দত্তকের অধিকার অপ্রমাণ করিয়া স্বয়ং উত্তরাধিকারী হন। বর্ত্তমানে ইঁহারই পুত্রগণ সম্পত্তি পরিচালনা করিতেছেন।

শ্রীকেশবলাল বসু।

বিবিধ।

—:*:—

(সঙ্কলিত।)

নিজ শরীরে রোগের ঔষধ।—সার ক্রস পোর্টার বলেন যে অনেক সময়ে ঔষধ ব্যবহার করা সত্ত্বেও যে রোগী রোগ নির্ম্মুক্ত হয় তাহার কারণ ঔষধ ব্যবহার নহে। চিকিৎসক যদি রোগীর নিকট স্পষ্ট করিয়া বলেন যে তিনি রোগ আরাম করিবেনই তাহা হইলে রোগ আরাম করার দিকে অর্দ্ধেক অগ্রসর হওয়া যায় কারণ রোগী চিকিৎসকের উপর আরাম হইবার জন্য আস্থা স্থাপন করে এবং তিনি আশ্বাস দিলে রোগীর আশা ও উৎসাহ হয়, তাহাতেই রোগ আরামের দিকে স্বতঃই অগ্রসর হয়। রোগ আরামের অপর অর্দ্ধেক হইল রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থার দিকে আনয়ন করা যথা, মুক্ত বায়ু, পরিষ্কার জল এবং টাটকা খাদ্য।

উষ পান।—চিকিৎকদিগের মধ্যেও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করার জন্য যতগুলি ঔষধ ও উপায় জানা আছে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইল প্রাতে এক গ্লাস জলে লেবুর রস মিশাইয়া সেবন করা। ইহা সেবনে অনেকের কোষ্ঠসাফ হয়। ইহা সেবনে শরীরাভ্যন্তরের সকল অপরিষ্কার জিনিষ সাফ হইয়া যায় সেইজন্য মানুষের চেহারা উজ্জ্বল হয়, নিষ্প্রভ চক্ষে জ্যোতিঃ বাড়ে ও স্বাস্থ্য উত্তম হয় এবং সেই জন্যই সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি পায়। প্রাতঃকালে চা পান করিবার পরিবর্ত্তে উষ্ণ বা শীতল জল পান করিলে উপকার হইবে। কিন্তু কিছুমাত্র আহার না করিয়া চা'র ন্যায় উত্তেজনাকারী জিনিষ সেবন করায় শরীরের স্বাস্থ্যের অত্যন্ত হানি হয়।

যক্ষ্মার নূতন ঔষধ।— হ্যাভাস এজেন্সীর একটী সংবাদে প্রকাশ, পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক কালমেটী যক্ষ্মার একটী নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ঔষধটী ২৩০ প্রকার বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা তৈয়ার করা হয়। ইতিমধ্যেই অনেক প্রাণীর উপর এ ঔষধের পরীক্ষা কার্য্য হইয়া গিয়াছে। ২১৭টী শিশুর শরীরে যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু এই ঔষধ ইনজেকসনের ফলে ১৮ মাস পর্য্যন্ত আর ঐ ব্যাধির কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই।

যমজের বংশ —ইংলণ্ডের অন্তর্গত মন্মথ সায়ারের অধিবাসী এক ডাক্তার লিখিয়াছেন, তাঁহার চিকিৎসাধীন একটী প্রসূতি সম্প্রতি পঞ্চমবার যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। প্রসূতিটী নিজেই যমজের একজন, এবং তাঁহার মাও নাকি যমজ-সন্তানের একজন হয়ে জন্মিয়াছিলেন। মাতা নিজেও বাইশটি যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। কন্যা কি অতদূর পারিবেন না? ব্যাপার মন্দ নয়।

স্রোতের শক্তি।—সম্প্রতি আমেরিকার কান্তি উপসাগরের স্রোত অবরোধ করিয়া তাহার শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক কল কারখানা সমূহ চালাইবার জন্য এক নূতন প্রণালীর সৃষ্টি হইতেছে। যদি বাস্তবিকই এইপ্রণালীটি কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে তাহা হইলে পৃথিবীতে কলকারখানা প্রভৃতি চালাইবার জন্য আর কোনও বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তির আবশ্যক হইবে না। শুধু কলকারখানার জন্য কেন, নগর আলোকিত করিবার জন্যও এই শক্তি প্রয়োজনীয় হইবে। বর্ত্তমান জগতে সর্ব্বত্রই এক মহাসমস্যার কথা উঠিতেছে যে, ভবিষ্যতে খণিজ কয়লার অভাবে পৃথিবীর কার্য্যাদি কিসের দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে? এই প্রণালীটি কার্য্যক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও সপ্রমাণ হইলে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সহায়তা করিবে।

সিন্ধুতে প্রাচীন কালের দ্রব্য আবিষ্কার। সিন্ধু প্রদেশের সুক্কুর হইতে ৪০ মাইল দূরে মাহেঞ্জোডারো নামক স্থানে কতকগুলি প্রাচীনকালের দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। মৃত্তিকার নিম্ন হইতে চিত্রলিপি সহিত শীলমোহর, মাটীর পাত্র, ঝিনুকের কাজ, মণিমুক্তা খচিত অলঙ্কার, দুইটী দাবার গুটি, একটি ছাঁচ এবং আরও অনেক মূল্যবান জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধু প্রদেশে যে সভ্যতা ছিল, এগুলি তাহারই নিদর্শন।

চাবির কথা —তালা চাবি প্রায় সকলেই ব্যবহার করে কিন্তু ইহার রহস্যজনক ইতিহাস হয় ত অনেকেই জানে না। অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীতে ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। জগদ্বিখ্যাত বৃটীশ মিউজিয়ামে মিশরের যে সকল দেবমূর্ত্তি আছে তাঁহাদের হাতে একটি করিয়া ক্রস্ চিহ্নযুক্ত চাবি আছে। ইহার মধ্যে আথা নামক অতি প্রাচীন দেবতা যিনি

আছেন তিনি স্বর্গের দরজা খুলিতে বা বন্ধ করিতে পারিতেন বলিয়া প্রাচীন মিশরবাসীরা বিশ্বাস করিতেন।

প্রাচীন রোম্যান ও গ্রীকদের নিকটও চাবির অদ্ভুত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইহারা চাবিকে অতিশয় ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। ইহাদের দেবতাদিগকে তাঁহারা 'Key-bearer' বলিতেন। তাঁহাদের জুনাস্ দেবতা ছিলেন 'দরজার দেবতা' অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে যুদ্ধ বা শান্তির দরজা বন্ধ করিতে পারিতেন। আদিম খৃষ্ট মণ্ডলীর মধ্যেও চাবির যথেষ্ট সম্মান ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে সেণ্টপিটার্সের হাতে একটি স্বর্ণের অপর একটি লৌহের চাবি ছিল।

মধ্যযুগে য়ুরোপে দোষী নির্দেশ করিবার জন্য চাবি ব্যবহার হইত। চৌর্য্যাপরাধীর দোষ নির্দ্ধারণের জন্য তাহাকে দাঁড় করাইয়া তাহার সম্মুখে বাইবেল খোলা হইত এবং তাহার উপর একটি চাবি রাখা হইত। এইরূপ প্রকাশ যে, সে ব্যক্তি প্রকৃত দোষী হইলে ঐ চাবিটা আস্তে আস্তে তাহার নিকট সরিয়া যাইত।

শরৎ আহ্বান

নন্দিত আজ মন্দ পবন
শত শত ফুল গন্ধে
শ্যামল কুঞ্জে গান গেয়ে পাখী
শরৎ দেবীরে বন্দে।
নীল নভোতলে মাঠ বন জলে
হেরি অপরূপ কান্তি
শেফালি ও কাশ শুভ্র বিকাশ
শিশিরের নব শান্তি।

নব উৎসবে শারদ লক্ষ্মী
এসো মা নূতন বর্ষে
মাতোয়ারা করি লক্ষ হৃদয়
নবীন পুলক হর্ষে।
এসো মা সবুজ ধান্য ক্ষেত্রে
তটিনীর গীতি ছন্দে।
কাকলিয়া গিরিকানন এসো মা
সুরের অলকানন্দে।
নবদূর্ব্বায় শোভি বনপথ
বিপুল বিটপি বক্ষে—
এসো মা নবীন রসের গাগরী
লইয়া তোমার কক্ষে।
মলিন অধরে নলিন হাস্য
ফুটায়ে, উজল অঙ্গে
এসো মাতঃ গাহি জাগরণী গান
ক্লান্ত সুপ্ত বঙ্গে।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভাগী।

—:*:—

(১)

পিতা আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন অভাগী।

মাতা আনন্দময়ীর শত বাধা স্বত্বেও পিতা কেন যে এই নামটাকে জনসমাজে প্রচার করিয়া দিলেন—তাহা কেহ জানিত না।

অন্য লোকে মনে করিত সুযোগ্য ডিপুটিবাবুর একমাত্র কন্যা, দশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির ভবিষ্যত অধিকারিণী—সে অভাগী হইতে যাইবে কেন?

বস্তুতঃ কথাটা তাহা নহে, হাজার বড়লোক হলেও তাঁহাদের যেমন সখ থাকে ছেলের নাম টম মেয়ের নাম মেরী প্রভৃতি রাখিতে হইবে; বিনয়ভূষণেরও সেই রকমের একটা ঝোঁক চাপিয়াছিল যে বড়মানুষের মেয়ের নাম 'অভাগী' রাখিতে হইবে। এই ডাকনাম এক বিবাহ বাড়ীতে আত্মীয় আত্মীয়া দাসদাসীর মধ্যে যখন প্রচার হইতে সুরু করিল,—তখন আনন্দময়ী মেয়ের আসল নাম ভুবনেশ্বরী বহাল রাখিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কোন ফল হইল না। বাঙ্গালা দেশের মনুষ অত চেষ্টা করিয়া ভুবনেশ্বরী—উচ্চারণ করিবে,—তাই! কি মনে করিয়া তারা অভাগী বলিয়াই ডাকিত। এতো গেল নামকরণ!—এখন অভাগীর কথা কিছু বলি।—

(২)

পূজায় বিনয়ভূষণ সপরিবারে বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন নারায়ণগঞ্জে—তখন নারায়ণগঞ্জে কংগ্রেসের সোরগোলে সহর মাতোয়ারা;—কোন হাকিম আসিয়াই এই সবডিবিসনের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না,—এমন সময় গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বিনয়ভূষণকে জেলাম্যাজিষ্ট্রেট তার করিয়া আনাইলেন।

সপরিবারে নতুন জায়গায় আসিয়া বিনয়ভূষণের কেমন একটু বাধবাধ লাগিতে লাগিল। দিন কয়েক একটু একটু করিয়া সহিয়া একদিন হঠাৎ বিনয়ভূষণের মুখোস খুলিয়া গেল।

তখন অগ্রহায়ণের প্রথম শীতের মৃদুস্পর্শে সহিয়া সহিয়া মানুষ একেবারে তার কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। গরম চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া বিনয়ভূষণ বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন সকাল বেলার ঘোমটাটানা ধরণী তাহার সম্মুখে ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতেছে।—পিছনে একটু দূরে একটা টেবিলের কোণ ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া কন্যা অভাগী,—নবোদিত সূর্য্যের পানে মুখ ফিরাইয়া ম্লানমুখী অভাগী শিশিরভারাক্রান্ত হেমন্তরাণীর সব পাওয়া ও সব দেওয়া ছবিখানির মত দাঁড়াইয়া।—তার মুখ শুষ্ক, হৃদয় বেদনাপ্লুত,—সুন্দর আনত চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু গণ্ড বহিয়া একটা অস্পষ্ট বাঁকা রেখা টানিয়া দিয়াছে।—

পিতাপুত্রীর এমন হইবার কারণ ছিল, ভোর হইতে না হইতে ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবককে বিনয়ভূষণের ডাকবাঙ্গালার সম্মুখে হাজির করিয়াছিল তাহারা চলিয়া গেলে—কি ভাবিয়া বিনয়ভূষণের দৃষ্টি বাহিরের দিকেই আকৃষ্ট ছিল জানি না—পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া মেয়েকে দেখিয়াই হাসিয়া বলিলেন, কিরে মা ?

অভাগী চোখ মুছিয়া বলিল "না বাবা কিছু না।"

"ও কিরে তুই কাঁদছিস নাকি ?"

"না।—আচ্ছা বাবা এরা সব কারা।" বিনয়ভূষণ মেয়ের এই প্রশ্নে কেমন যেন বাধা পাইলেন। সেখানে দুর্ব্বলতা সেইখানে জোর দিয়ে চলা যেমন মানুষের স্বভাব ;—বিনয়ভূষণেরও আজ তাহাই হইল, তিনি সিগারেটের ধোঁয়ার আশ্রয়ে একটু সময় লইয়া বলিলেন "এই—এরা সব বদছেলে মা।" মেয়ে আবার বলিল "এরা কি করেছে বাবা ?"

অভাগী ক্ষণকাল ভাবিল, তারপর গায়ের র‍্যাপারখানা একটু ভাল করিয়া জড়াইয়া ভাঙ্গা গলায় করুণ ভাবে প্রশ্ন করিল,—"এর নাম বিদ্রোহ বাবা ? আর সে বিদ্রোহ এই পাঁচ বছরের বালকেও করেছে ?"

বিনয় কথা খুঁজিয়া না পাইয়া—অভিভাবকের তাচ্ছিল্যতার ভাণ করিয়া মেয়ের পিঠচাপড়াইয়া বলিলেন,—"পাগলী মা আমার। এ তুই বুঝবিনে এ বড় শক্ত কথা।"

অভাগী এবার জোর দিয়া বলিল "বাবা মায়ের বুকের স্তন্যপান ছেড়ে যে সব শিশু আজ জেলকে বরণ করেছে তাদের ব্যথাটুকু বুঝবার শিক্ষাও আমায় দাও নাই নাকি ?"

না রে—আচ্ছা মা তুই চট্‌করে ছটি পান আন্ ?—এসব কথা বার্ত্তায় তোর দরকার কি ?

ক্ষণকাল পরে কন্যা পান দিয়া গেল, বিনয়ভূষণ অভাগীর বিবাহের জন্য মনোনীত একজন পাত্রের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতে বাহির হইলেন।

(৩)

বিকাল বেলার দিকে ডিপুটিসাহেবের ডাকবাংলা সংলগ্ন ফৌজদারী কোর্ট হইতে ঘন ঘন বন্দেমাতরম্ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল,—খোলা জানালার পাশে দাঁড়াইয়া উদ্বেগ-বিস্ময়ে অভাগী এই সব দেখিতেছে,—তাহার এক একবার মনে হইতেছে এই বন্দেমাতরম্ শব্দের সমবেত শক্তি বুঝি তাহার পিতার হৃদপিণ্ডে সজোরে আঘাত করিতেছে।—আবার মনে হইতেছে তারই ছোট্ট ভাইয়ের মতো ছেলেরা ভাবে কেমন জাতীয় মঙ্গল-ঘটস্থাপন করিতেছে—চারিদিকে ঝড় উঠিয়া তাহাদের মঙ্গল আয়োজন ব্যর্থ করিতেছে—তাহারা জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় চিহ্ন অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে।—এ বড় মহিমাময় দৃশ্য।

অভাগী একবার চক্ষু মুছিয়া লয় আবার ভাবে,—আবার মোছে হঠাৎ তাহার অস্ফুট কণ্ঠস্বর হইতে বাহির হইল "হায় আমি যদি পুরুষ হইতাম।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে যখন বাড়ীর চাকর হরিচরণের নিকট শুনিল সব ভলেন্টিয়ারদেরই জেল হইয়াছে এবং পাঁচ বছরের বালক ছুটিরও ছুইমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে—তখন অভাগী এক সঙ্গে ধর্ম্ম, পিতা ভগবান, স্বদেশ কত কি সব ভাবিয়া লইল যার ছবি মনের তলায় বায়োস্কোপের মত ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, বাহিরে প্রকাশ পাইল না।

সন্ধ্যার পর অভাগী পিতার ডাকে সাড়া দিল না, মাতা খাইতে ডাকিলে মাথা ব্যথা বলিয়া খাইতে গেল না—এমনি করিয়া কোন মতে সে দিনের নির্জ্জনতাটুকু তার ধ্যানের ভিতরে শেষ হইল।—তারপর ঘুমাইয়া পড়িল। পাশের গির্জ্জায় ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিতেই অভাগী উঠিয়া বসিতেই গতকল্যের সব ছবি মনে পড়িল—সে নিদ্রিত পিতার দিকে চাহিয়া ভাবিল 'বাবা চেষ্টা করে এই ছেলেগুলো বাঁচত। এরা ত রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নাই—এরা চাইছে দেশকে দেশের ধনে সমৃদ্ধ করতে—এই কি এদের দোষ?'

বালিকা ভাবনায় কূল পাইল না।

(৪)

ডিপুটীবাবু ব্যয় বাহুল্য করিয়া কন্যায় বিবাহ দিলেন। হায় বিধাতা! মাস অতীত না হইতেই অভাগী সত্যই হইল অভাগী! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

বিনয়ভূষণ চেষ্টা করিয়া নারায়ণগঞ্জ হইতে বিদায় লইয়া রাণাঘাট বদলী হইলেন। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া অভাগী এই পবিত্র গঙ্গাতীরে আসিয়া অনেকটা শান্তি পাইল। ভোরের বেলায় উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া অভাগী তার ধ্যান পূজা লইয়া থাকিত। একটি বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন বর্ষার পূর্ণজোয়ার, প্রাতে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, বেলা ৯ টার সময় আনন্দময়ী সংবাদ দিলেন, 'ওগো অভাগী যে এখনও এল না।'

চাকর গঙ্গার ঘাট হইতে ফিরিয়া বলিল "গঙ্গার ধারে দিদির কাপড় আর ঘটি আছে, তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না।"

সবাই জলে নামতে দেখেছে—তারপর কোন সংবাদ জানে না। তখন চারিদিকে অনুসন্ধান চলিল; এবাসা ওবাসা শেষে পুলিশ প্রাণপণে খুঁজিয়া যখন সারাদিনের মধ্যেও অভাগীর দেহের কোন সন্ধান করিতে পারিল না—তখন বিনয়ভূষণের মত পাষাণও আকুল হইয়া উঠিলেন, স্ত্রী আনন্দময়ী শয্যা লইলেন।

*　　*　　*

তারপর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে, অভাগী গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ নাই। বিনয়ভূষণ ও তাঁহার স্ত্রী সেই নদীয়া জেলাতেই আছেন যদি অভাগীর কোন সংবাদ আসে।

শোক তাপ কালে দম্পতির এখন অনেকটা সহিয়া গিয়াছে।

বিনয়ভূষণ, তেমনি খান দান, কোর্টে যান, কয়েদ দেন, জেল পরিদর্শন করেন। নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যে ত্রুটি নাই। অন্তর কিন্তু আর ও সকল কর্ম্মে সায় দেয় না।

এমন সময় উপর হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিয়া পাঠাইলেন—

"বর্ত্তমান আন্দোলনকে বিশেষভাবে ধ্বংশ করিতে হইবে। আপনার এলাকায় ইব্রাহিমপুর একদল (নারী-কর্ম্ম-মন্দিরের) রমণী ইব্রাহিমপুরে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করিতেছে অবিলম্বে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবেন।"

নারী-কর্ম্ম-মন্দিরের মহিলাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দিয়া যেন বিনয়ভূষণ বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। কে জানে কোন পাপে মেয়ে জামাই হারাইয়াছেন—আজ নারী-নির্য্যাতন করিয়া আবার কি অনিষ্টের আয়োজন করিতেছেন—অদৃষ্টে কি আছে কে জানে?

ইব্রাহিমপুর দুই মাইল দূরে, তিনঘণ্টা মধ্যেই সংবাদ আসিল ১২ জন মহিলাকে জেলের মহিলা বিভাগে আনা হইয়াছে।—আনা যে হইয়াছে তাহা বিনয়ভূষণের অবিদিত ছিল না, কেন না হাজার কণ্ঠে হিন্দু মুসলমানের জয়ধ্বনি বহু পূর্ব্বেই তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। ডিপুটিবাবু জনতা কমিলে জেলে যাইবেন মনে করিয়া—জলযোগ করিতে নিজের বাসায় গেলেন।

জলখাবারের রেকাবী স্বামীর সম্মুখে রাখিয়া মুখচোরা আনন্দময়ী স্বামীকে বলিলেন—"দেখ এ চাকুরীটে ছেড়ে দাও, পাঁচ বছরের ছেলেকে জেলে দিয়ে, কুলবধূদের ধরে এনে পেট ভরান আর ভাল লাগে না।"

বিনয় ঢোক্ গিলিয়া বলিলেন "তা উপরওয়ালার হুকুম।"

"হুকুম তো বুঝলেম, একে একে সবই তো খোয়ালেম,—আজ এই মেয়েদের কথা ভেবে কেবলি অভাগীকে মনে পড়ছে। না, তুমি চাকরী ছাড় —ভয় হচ্ছে আমাদের যা আছে তাও বা হারাই।"

বিনয়ভূষণ কোন জবাব না দিয়া গম্ভীর মুখে চুরুট টানিতে টানিতে বাহির হইয়া গেলেন। আজই মহিলা আসামীদের বিচারের দিন, ইহাদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলিবেন, কি ব্যবহার করিবেন ভাবিতে ভাবিতে ডেপুটিবাবু জেলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রহরী শশব্যস্তে আসিয়া জেলের দ্বার খুলিয়া দিল। দরজার ঝন ঝন শব্দে কেন যেন আজ তাঁহার নির্ভীক পাষাণ বক্ষও দমিয়া গেল।

মহিলাবিভাগ খোলা হইল, বিনয়ভূষণ দেখিলেন—অন্যান্য মহিলার মাঝখানে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া "অভাগী"

বিনয় হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না,—একদৃষ্টে তাঁর জলে-ডোবা মেয়ে আজ সত্যই 'ভুবনেশ্বরী' সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আবেগ একটু কমিলে 'মা' বলিয়া বিনয়ভূষণ অভাগীকে ধরিতেই অভাগী সরিয়া গিয়া বলিল 'স্পর্শ করবেন না।'

বিনয় হতবুদ্ধির মত হার মানিয়া বলিল "তুই যে আমার মেয়ে।"

অভাগী বলিল "মেয়েকে তার বাবার বেশেই নিও, এখন ছুঁয়ো না বাবা। এখন তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর।"

আজ বিনয়ভূষণের কি যেন হইল, কি যেন হারাইল, কি যেন পাইল—এমনি ভাবে কোন্ শয়তান তাঁর হাত ধরিয়া প্রত্যেক মহিলাকে ১৫ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়াইল—তিনি যেন নিজে কিছু নয়!

বিচারের পর বিনয় অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে, রুদ্ধ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "শুধু একটা কথা মা, তুই না গঙ্গায় ডুবে মরেছিলি। কি করে বাঁচলি।"

পিতার ব্যথিত বদন দেখিয়া অভাগী বলিল—"মরি নাই বাবা, গঙ্গায় নাইতে নেবেই দেখি নারী-কর্ম্ম-মন্দিরের এই সেবাব্রতধারিণী ব্রহ্মচারিণীদের। তখন দেশ চিনলেম, সেবার মধুরতা টের পেলাম—তাই তোমাদের ভুলে এমন আনন্দের অধিকারিণী হতে পেরেছি। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি "ধর্ম্ম ও জন্মভূমি যমজ সন্তান—এর একটিকে ছেড়ে অন্যটির সাধনা চলেনা।—তুমিই ত আমায় ধর্ম্মে মতি রাখ্তে বলেছিলে বাবা।"

বিপুল জনতা, রমণীর বিচারের ফলাফল দেখিতে স্কুল কলেজ আদালত ভাঙ্গিয়া লোক-সমাগম হইয়াছে। উদ্বেগ-উত্তেজিত জনতার শৃঙ্খলা রক্ষা করা বিনয়ের পক্ষে আজ অসম্ভব। মাতালের মত টলিতে টলিতে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া করুণা-ভিক্ষুকের মত বেলা ৫টার সময় বিনয়ভূষণ যখন সেই জনতার ভিতর দিয়া চলিলেন—চতুর্দ্দিকে তখন জয়ধ্বনিতে জনসাধারণ আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে। সকলেই দেখিল গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কর্ম্মচারী বিনয়ভূষণের দুই গণ্ড অশ্রুধারা প্লাবিত। কোন মতে পা ভাঙ্গা রোগীর মত নিজের ডাক-বাঙ্গালায় পৌঁছিয়া বিনয়ভূষণ জেলা ম্যাজিষ্ট্রের কাছে একখানা টেলিগ্রাম করিলেন—

"আমি চাকুরী পরিত্যাগ করিলাম। আমার চার্জ্জ লওয়া হউক।"

শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু।

শোক-সংবাদ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় বিগত ৭ই ভাদ্র তারিখে ৺কাশীধামে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয়ের পরিচয় বাঙ্গলার কাহারও নিকট অবিদিত নাই, তিনি সত্যই ছিলেন পণ্ডিতরাজ, তাঁহার উদারতা, সহানুভবতা, নির্ভীকতা সর্ব্বজনবিদিত। গোঁড়ামী তাঁহার মধ্যে একটুকুও ছিল না, তিনি কোনও সম্প্রদায় বিশেষের মুখ চাহিয়া কোন কথা কখনও বলিতেন না। শাস্ত্রের যথার্থ ব্যখ্যাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। বৃদ্ধ পণ্ডিতরাজ সুযুক্তিপূর্ণ সুচিন্তিত বহু প্রবন্ধে শাস্ত্রানুযায়ী আপনার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়া গোঁড়া পণ্ডিত মণ্ডলীকে অনেক সময়ে বিক্ষুব্ধ করিয়াছেন, তথাপি শাস্ত্রের যুক্তিতে তাঁহার কেশস্পর্শ করিতে পারে নাই, বরং সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি সুকবি ছিলেন, বাগ্মীতাও ছিল তাঁহার অসাধারণ, সর্ব্বোপরি তাঁহার অভিমানশূন্যতা, অমায়িকতা ও স্নেহপ্রবণতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। এরূপ উদার অমায়িক পণ্ডিতরাজ আজ স্বর্গে। তাঁহার স্থান সেই সাধকবাঞ্ছিত রাজ্যে! তথাপি মর্ত্ত্যবাসী আমরা তাহার শোকে অধীর।

* * *

সুপ্রসিদ্ধা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীও আজ পরলোকে। 'অশ্রুকণা'য় তিনি বঙ্গবাসীকে যে বিরহ ব্যথার পুতঃ অশ্রুতে সিক্তিত করিয়া পবিত্র করিয়াছিলেন, আজ তাহা শেষ হইল! প্রথম বয়সে তিনি তাঁর 'প্রাণের দেবতা' 'যেথায় বেঁধেছে ঘর' সে গৃহে প্রয়াণ করিবার জন্য অধীর হইয়া প্রতীক্ষা করিয়া ছিলেন, আজ তিনি তাঁহার সহিত মিলিত। দুঃখ করিবার কিছু নাই। এলোকে তিনি হইয়াছেন অমর,—আজ অমরালয়েও তিনি তাহাই।

নিবেদন।

আমরা নানা কারণে পরিচারিকা প্রকাশে পিছাইয়া পড়িয়াছি। ভাদ্রে প্রকাশিত হইতেছে শ্রাবণের সংখ্যা। বঙ্গদেশময় আগমনীর সুর প্রাণে প্রাণে বাজিয়া উঠিয়াছে। আশ্বিনে অম্বিকার অর্চ্চনা আশায় বঙ্গবাসী অধীর; আমরা তাই এই সংখ্যায় আশ্বিন মাসোপযোগী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিলাম।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৮ম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৩১ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

করবী।

—:*:—

ও করবি ! ও করবি !

কার পরশে উঠ্‌লি ফুটে

তুই রে গরবী !

অনুরাগের রাঙা ফাগে

হৃদয় (যে) তার সোহাগ মাগে ;

অভিমানে বাজ্‌লো কি হায়—

করুণ পূরবী !

অস্তাচলে কে যায় বাহি
সাঁঝের তরণী—
রক্ত-বেদন রাঙায় একি
গহন সরণী,
নিমেষ-হারা হাওয়ার আশে,
প্রাণ যে কাঁদে নীরব ভাষে;
মৌন ব্যথায় ব্যথিয়ে ওঠে
শ্যামল ধরণী!

শ্রীসরোজকুমার সেন।

বঙ্কিমচন্দ্র।

---:*:---

আজিকার এই সভায় আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিকে আপনাদের সভাপতি করা উচিত ছিল। কেন না বঙ্কিম-সাহিত্য আমার অপেক্ষা আপনাদের মধ্যে অনেকেই বেশী জানেন। বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সভাপতি করিলে আপনারা তাঁহার নিকট অনেক নূতন বিষয় শুনিতে পারিতেন। আমার নিকট আপনারা সে আশা করিতে পারেন না। বিশেষতঃ আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি এত অধিক ব্যতিব্যস্ত যে আজকাল আমি কোথায় থাকিব তাহার স্থিরতা নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একজন ব্যক্তি নয়,—যদিও তিনি খুব প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পুরুষই ছিলেন,—বঙ্কিমচন্দ্র একটা যুগ। বঙ্কিম-সাহিত্য একটা যুগের সাহিত্য এবং ইতিহাস—দুই-ই। দুঃখের

বিষয় এইরূপ একটা গভীর ও জটিল বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার মত শুভ অবসর সম্প্রতি আমার নাই। কিন্তু বাংলার একটা যুগ-সাহিত্যের যিনি স্রষ্টা, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যদি আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়া থাকেন, তবে আপনাদের সে আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

(২)

দশ বৎসর অতীত হয়, যখন "নারায়ণ" পত্রের সম্পাদনের ভার আমার উপর ছিল, তখন ঐ পত্রিকার ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা "সচিত্র বঙ্কিম-স্মৃতির সংখ্যা" বলিয়া প্রকাশ করা হয়। ঐ স্মরণীয় সংখ্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হইতে ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি ১৬ জন বিখ্যাত লেখক বঙ্কিমসাহিত্যকে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করিয়াছিলেন। আজিকায় এই সভায় বঙ্কিম সংখ্যার "নারায়ণ" খানিকে পুনরায় মুদ্রিত করিয়া যদি আপনারা বিতরণ করিতেন, তাহা হইলে আমি খুব সুখী হইতাম।

(৩)

সমগ্র এবং সম্পূর্ণ বঙ্কিম-সাহিত্যের সমালোচনা একটা ক্ষুদ্র বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে আপনারা আশা করিতে পারেন না। তাহার জন্য একখানি বড় গ্রন্থ লিখিতে হয় এবং অদ্যাবধি সেই গ্রন্থের অভাব বাংলা সাহিত্যের দুরপনেয় কলঙ্ক। আপনারা অনেকে হয়ত জানেন অথবা শুনিয়াছেন যে, আমি বাংলার ও বাঙ্গালী সভ্যতার বিশেষ পক্ষপাতী বলিয়া সাহিত্যে আমার একটা দুর্ণাম আছে। এজন্য অনেক সাহিত্য-রথী আমার মধ্যে বিশ্বাত্মবোধের একান্ত অভাব নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন এবং উষ্মার সহিত সে কথা তাঁহারা ভাষায় ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমি সে জন্য লজ্জিত নই। এমন কি আজ বাংলার যুগ-সাহিত্যের একজন স্রষ্টা, নেতা ও ত্রাতার স্মৃতি-শেখরের দিকে উর্দ্ধে করজোড়ে তাকাইয়া বাঙ্গালীকে, আবার আমি বলিতে সাহস করিতেছি যে, ভাই বাঙ্গালী,—তুমি তোমার বাংলাকে ভুলিও না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে বলিয়া গিয়াছেন। যদি তুমি বাংলাকে ভুল, বাংলার অতীতের ইতিহাস খুঁজিয়া না দেখ—বাংলার শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্ম না বুঝ,—

বাংলার ন্যায়-দর্শন, বাংলার স্মৃতি, বাংলার তন্ত্র ও দীক্ষা-প্রণালী, বাংলার সমাজ-বিন্যাস, বাংলার সাহিত্য—এক কথায় বাংলার সভ্যতাকে প্রাণপাত করিয়া বুঝিবার চেষ্টা না কর, তবে তুমি বাঙ্গালী হইলেও বঙ্কিম-স্মৃতিকে অপমান করিবার জন্য এ সভায় উপস্থিত থাকিও না। মনে রাখিও—"বন্দেমাতরম্" বাংলার গান—ভারতবর্ষের নহে। তথাপি ভারতবর্ষকে এই মহাগীতি এই মহা-মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মনে রাখিও বাঙ্গালী আবার বাঙ্গালী হইতে না পারিলে ভারতবর্ষে তাহার স্থান নাই, পৃথিবীর এই মহাপ্লাবনে সে হয়ত বা এবার ভাসিয়া যাইবে, কুল পাইবে না। বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে এ প্লাবন শুধু ত্রয়োদশ শতাব্দীর সপ্তদশ অশ্বারোহীর অভিযান নয়। (যদিও বাঙ্গালী-প্রধানদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব প্রথমে ইহার অসত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।) ইহা পলাশী-প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকতার জীর্ণ দ্বারে ক্লাইবের পদাঘাতও নয়। আমি মানস-চক্ষে দেখিতেছি ইহা তাহা অপেক্ষাও নির্ম্মম,—তাহা অপেক্ষাও ভয়াবহ,—তাহা অপেক্ষাও শোণিত পিচ্ছল। ইহা অংহিসা নহে—কিছুতেই নহে! আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী কি বাঙ্গালী পড়ে নাই? উপন্যাস ও আর্ট হিসাবে ইহার সমালোচনা এখন স্থগিত থাকুক। বঙ্কিমের পরে বাংলাদেশ উপন্যাসে ছাইয়া গিয়াছে। বাংলার আধুনিক উপন্যাস-সমুদ্র যদি কেহ মন্থন করিতে চান তবে দেখিবেন রিরংসার বিষে,—এবং তাহাও আমি বলি, ফেরঙ্গ-রিরংসা,—বাংলার তরুণ তরুণী আকণ্ঠ নিমজ্জমান। এত যে বিষ,—তাহা যদি সমাজে ও সাহিত্যে সত্যি হয়, তবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি—"লাখে না মিলিল এক" একটাও নীলকন্ঠ আমি বাংলায় পাইলাম না—এই আমার আক্ষেপ। স্বদেশীর আমল হইতে আমি দুই চক্ষে চাহিয়া আছি—এবং সেই হইতে বঙ্কিম-চন্দ্রের সঙ্কেত বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, ভারতের অন্য কোন প্রদেশের নাম গন্ধ ইহাতে নাই। ইহাতে Comteএর Positivism থাকিতে পারে, Europeএর দুর্দ্ধর্ষ' Nation-idea থাকিতে পারে, Middle Ageএর সন্ন্যাস থাকিতে পারে,—পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিত্রণে অসঙ্গতি থাকিতে পারে, বিলাতী Romanticism থাকিতে পারে, আর্টের মাপ-কাঠিতে একটা উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনার অপরিহার্য্য ত্রুটী থাকিতে পারে—পারে কি, হয়ত আছে। কিন্তু তথাপি ইহাতে বাঙ্গালী আছে—এমন বাঙ্গালী আছে যে

অনুশীলন করিলে প্রাদেশিক আদর্শে এমন কি ভারতীয় আদর্শেও কাহারও নিকট মাথা নত না করিয়া সে দাঁড়াইতে পারে। আমি আবার বলি—বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী হইতে বলিয়াছেন—অন্য কিছু হইতে বলেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ (যদিও এই সভার সভাপতিত্বের সম্মান তাঁহার জীবিত কালে একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য এবং মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয় যে সম্প্রতি কোন মতেই তাঁহার নাগাল আমরা পাইতেছি না) এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাংলা দেশের বা বাঙ্গালীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আজকাল কেবল ম্যাপেই বাংলা দেশ আছে। যদি কখনও বাংলা দেশের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়, তাহা হইলে তখন বাংলা সাহিত্য পড়িয়া এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বাংলা এমন একটা দেশের সাহিত্য যে দেশ কোনও কালে বর্ত্তমান ছিল না।"

আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে চাই যে, বঙ্কিম-সাহিত্য এইরূপ বক্ষ্যমান আধুনিক বাংলা সাহিত্য নয়। ইহা এমন একটা সাহিত্য যে বঙ্গ দেশ লুপ্ত হইলেও এই সাহিত্য পড়িয়া জ্ঞানীরা নিশ্চিত বুঝিতে পারিবেন যে—হ্যাঁ, বাংলা নামে একটা দেশ ছিল। বঙ্কিম-সাহিত্যের ইহার গৌরব—ইহাই মস্ত বিশেষত্ব।

(৪)

আমি বঙ্কিম-সাহিত্যকে একটা যুগ-সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু যুগ-সাহিত্যের নানা দিক্ আছে। সেই নানা দিক্—বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপে যুগ-সাহিত্যের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে এবং সেই পূর্ণাবয়ব দেহের ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে জীবন্ত ও প্রাণময় করে।

বঙ্কিম সাহিত্যের উপর Europe এর সাহিত্য, দর্শন, ও ধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তথাপি বঙ্কিম সাহিত্য—আত্মস্থ,—সমাহিত, তেজঃপূণ, অথচ প্রশান্ত ও গম্ভীর। ইহা সমুদ্র বিশেষ।

বঙ্কিমযুগের সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, এবং তাহার সমসাময়িক পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার যুগের একটা প্রেরণা কার্য্য করিয়াছে। ধর্ম্মসংস্কারে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ; সমাজসংস্কারে সিংহ-প্রতিম বিদ্যাসাগর; রাজনীতিক্ষেত্রে

হরিশ্চন্দ্রের প্রভাব, বঙ্কিমযুগের উপর অস্পষ্ট নহে। বঙ্কিম-সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী—এই সমস্ত ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক্‌পাল সংস্কারকদিগকে তখনও ভুলিয়া যায় নাই। ইহাদের দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা তখনও সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিল।

বঙ্কিম-সাহিত্য কোন কোন দিকে এই সংস্কারযুগকে বাধা দিয়াছে এবং কোন কোন দিকে ইহাকে উন্নততর এক বিশালক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সম্পর্কে বিচক্ষণ সমালোচকগণ—(যেমন ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি) বঙ্কিম-সাহিত্য-যুগকে হিন্দু ধর্ম্মের এক নব জাগরণের যুগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বঙ্কিম-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহারা নবীন চন্দ্রের মহাকাব্যগুলি এবং চন্দ্রনাথ বসুর সমালোচনা সাহিত্যকেও অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া বঙ্কিম-যুগ-সাহিত্য, বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার যুগের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার মত দেখা দিয়াছে। তথাপি বঙ্কিম সাহিত্যকে আমি একটা সমন্বয় যুগের সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাই। ইহা কেবল প্রতিক্রিয়া যুগের সাহিত্য নহে। বঙ্কিম শুধু গীতার সমন্বয় করেন নাই, বাঙ্গলা সাহিত্যেরও একটা সমন্বয় করিয়াছেন।

(৫)

সাহিত্যক্ষেত্রে—বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মত ও সিদ্ধান্তে বঙ্কিম ও গিরিশচন্দ্রে যতই পার্থক্য থাকুক ;—বঙ্কিম ও গিরিশ-যুগের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মাণ বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ প্রতিভার বর-পুত্র এই দুই মহাকবিই Europeএর সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াও—সাহিত্যের দুইটি বিভিন্নক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া সব্যসাচীর মত, বাঙ্গালীর যুগ-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই স্রষ্টা ও কবি। বাঙ্গলা—এমন কি জগতের সাহিত্যের ইতিহাসেও ইঁহারা উভয়ে অত্যন্ত উচ্চস্তরের কবি। ইঁহারা সুবিধা মত পাশ্চাত্যকে হুবহু নকল করেন নাই। যেমন ইঁহাদের পরবর্ত্তী নাটক নভেলে অন্যান্য ঔপন্যাসিক ও নাটক-রচয়িতাগণ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং মহা দুঃখের বিষয় যে তাহা করিয়াও তাঁহারা বাহবা পাইতেছেন।

বাঙ্গলা Europe নহে। বাঙ্গালীর সাহিত্য কেবল Europeএর সাহিত্যের প্রতিধ্বনি হইতে পারে না। বাঙ্গলা সাহিত্যের এরকম দুর্ভাগ্য আমি কল্পনাও করিতে পারি না। বাঙ্গলা

তাহার সুরে ও রূপে ফুটিয়া উঠিবে। সেই প্রস্ফুটিত, পূর্ণবিকশিত বাঙ্গলা সাহিত্যের গন্ধে বাঙ্গলা ও জগৎ ভরপুর হইবে। যদি তাহা না হয়,—যদি বাঙ্গলার নিজস্ব বলিয়া কিছু না থাকে তবে,—বাঙ্গলা সাহিত্য লুপ্ত হইলেই বা ক্ষতি কি?—তবে, বঙ্কিমচন্দ্র লুপ্ত হইলেই বা ক্ষতি কি—? ভাই, বাঙ্গালী, বঙ্কিমচন্দ্র কি সত্যই অরণ্যে রোদন করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিম ও গৈরিশ সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও বাঙ্গালীর সাহিত্য হইয়াছে। এই দুই মহাকবির সৃষ্ট বাঙ্গালীর সাহিত্যের মধ্যে একটা মৌলিক ও যৌগিক সম্পর্ক আছে; বা থাকা সম্ভব বলিয়াই আমি আপনাদের মধ্যে কোন অভিজ্ঞ ও নিপুণ সমালোচককে এই দুই অপূর্ব্ব সাহিত্যের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী যোগ, তাহা সুস্পষ্ট ফুটাইয়া দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সাহিত্যক্ষেত্রে আমার মত অক্ষমের এই অনুরোধ কেবল মাত্র অরণ্যে রোদন বলিয়া অস্বীকৃত ও অগ্রাহ্য হইবে না।

(৬)

বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠন করিয়াছে। যতই অপপ্রয়োগ হউক,— স্বদেশী যুগে বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গলায় তাহাই করিয়াছে যাহা ফরাসী দেশে, Voltaire এবং Rousseau সাহিত্য করিয়াছিল। এই দিক্ হইতে বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনা এখনও আরম্ভ হয় নাই। আমার বিবেচনায়, আর অধিক বিলম্ব না করিয়া তাহা আরম্ভ করা উচিত। আমি অনুরোধ করি যে, বাঙ্গলায় বঙ্কিম-সাহিত্যের সহিত, ফ্রান্সের—Voltaire ও Rousseau সাহিত্যের একটা তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থ আপনাদের মধ্যে শীঘ্রই কেহ লিখিতে প্রবৃত্ত হউন। কেননা আমার মনে হয়, কোন কোন দিকে বঙ্কিম বাঙ্গলার Voltaire ও Rousseau— যদিও এরূপ তুলনা সমস্ত দিক্ দিয়া সমীচিন নয়।

(৭)

বাংলার ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ এই উভয় শতাব্দীকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। হয়ত বা এই উপন্যাসগুলি তাঁহার অজ্ঞাতসারে উদ্দেশ্যমূলক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অজ্ঞাতসারেই বা বলি কি করিয়া? যিনি "কৃষ্ণকান্তের উইল" "বিসবৃক্ষ" লিখিতে পারেন—সামাজিক উদ্দেশ্যবাদ তাহার মধ্যে থাকা সত্বেও, এবং যিনি

"কপালকুণ্ডলা" সৃষ্টি করিতে পারেন—তিনি যে কত বড় কারিগর, কত বড় স্রষ্টা, তাহা পরিমাণ করা সহজ-সাধ্য নহে। যদি তাঁহার উপন্যাস রচনায় কোন উদ্দেশ্যবাদ আসিয়া থাকে তবে আমি বলিব—তাহারও উদ্দেশ্য ছিল। কেবল ছিল নয়—এখনও আছে।

(৮)

বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব" সম্পর্কে বড় আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। যে মানুষ নয়, সে বাঙালী হইবে কি করিয়া? ১২০৩ সাল হইতে বঙ্কিমচন্দ্র দিবস গণনা করিয়া গিয়াছেন। দিবস মাস হইয়াছে,—মাস বৎসর হইয়াছে,—বৎসর শতাব্দী হইয়াছে,—শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার তিনি গণিয়াছেন। কিন্তু যাহা তিনি চাহিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার মিলে নাই। "মনুষ্যত্ব মিলিল কই? এক জাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণ সেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না।" এখন আপনারা বুঝুন বঙ্কিমচন্দ্র কি চাহিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের কি পাইতে হইবে। তিনি আমাদিগকে কেবল 'ঘ্যান্ ঘ্যান' করিতে নিষেধ করিয়াছেন—আমাদের "মধু সংগ্রহ" করিতে বলিয়াছেন—এবং আবশ্যক মত "হুল" ফুটাইতেও বলিয়াছেন। কথাটা সমীচিন কি না আপনারা প্রণিধান করিবেন। দেশ ও জগতের জন্য—অন্নবস্ত্রের সংস্থান আমাদিগকে করিতেই হইবে এবং তাহার জন্য প্রয়োজন বোধে হুলও ফুটাইতে হইবে।

(৯)

যেমন রাজা রামমোহন রায়ের হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নামে এক অতিপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গুরু ছিলেন তেমনি কিম্বদন্তী আছে যে বঙ্কিমচন্দ্রেরও একজন অখ্যাতনামা তান্ত্রিক গুরু ছিলেন। ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার আভাস দিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসের আদর্শ তাঁহার যে সমস্ত চিত্রাঙ্কনে উজ্জ্বল ও নিখুঁত হইয়া ফুটিয়াছে, তাহা নাকি তাঁহার গুরুর আদর্শে। অবশ্য এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমি কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি না। তবে আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ ভারতীয় কিম্বা গৌড়ীয় নহে ইহাই আমার মনে হয়। East India Companyর মাল লুটিয়া অতর্কিতভাবে কোম্পানীর নিরীহ সিপাহীদিগকে খুন করিয়া,—দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশবাসীকে অন্ন দেওয়া; পরোপকারের—বিশেষতঃ দেশাত্মবোধের এই ভয়াবহ

উৎকৃষ্ট আদর্শ কেন তিনি অঙ্কিত করিলেন—বুঝিতে পারি না। সন্ন্যাসীর যে আদর্শ বাঙ্গালায় আছে তাহা হয় শৈব, না হয় শাক্ত, না হয় বৈষ্ণব। আধার ভেদে সব আদর্শই এখন মলিন। তথাপি আদর্শ হিসাবে শৈব শাক্ত বৈষ্ণবের সন্ন্যাস আদর্শ "আনন্দমঠে" স্থান পায় নাই। উহা পাশ্চাত্যের সংঘাতে গঠিত। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সন্ন্যাসের এক অভিনব মিশ্রন। সমাজ ও রাষ্ট্রে উহার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বাঞ্ছনীয় নহে—আমার এইরূপ বিবেচনা হয়।

আমি আর আপনাদের অধিক সময় নষ্ট করিব না। বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনায় সর্বজন-বিদিত "কমলাকান্তের" দুর্গোৎসবের উল্লেখ করিয়া আমি আপনাদিগকে অব্যাহতি দিব।

কি স্বপ্ন একদিন এই মহাকবি দেখিয়াছিলেন! তাঁহার ঋষি-কল্প ধ্যানে মাতৃভূমির পূতোজ্জ্বল আলেখ্যখানি সহস্র সূর্যের দীপ্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সপ্তমী পূজার দিন অহিফেনের নেশায় কমলাকান্ত এই ধ্যানমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিল। কি সে মূর্ত্তি?—

"তরঙ্গ-সঙ্কুল জলরাশির উপর সুবর্ণমণ্ডিতা সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা। হাঁ এই মা। এই জননী জন্মভূমি—কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি। এই মন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্ত রত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্ন-মণ্ডিত দশভুজ, দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু-বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীর জন-কেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত। * * আমি এই কালস্রোতে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা।

"এস, ভাই সকল! আমরা অন্ধকার কাল স্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কাল সমুদ্র তাড়িত-মথিত-ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি,—সেই প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব। মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

ইহার পর আর আমি অধিক বলিতে পারি না—কোন বাঙ্গালীই বলিতে পারে না। আসুন—আমরা একবার হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া—দেশ-মায়ের পায়ে মাথা নোয়াইয়া সমস্বরে বলি—বন্দেমাতরম।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

বুকের বেদনা।

বুকের বেদনা, তোরে বড় ভালবাসি !
মনের গহণ বনে ব্যর্থতার বাঁশি
বাজাস্ উদাস স্বরে, মরম-নিভৃতে।
হৃদয় যমুনাতীরে দাঁড়ায়ে চকিতে,
ফুকে দিস্ তোর বাঁশি—উচ্ছ্বাসের ধারা,
হা হা করি হতাশায়—মহাশূন্যে হারা !
তবু তোর সুরখানি, করুণতা মাখা—
রুদ্রের রোদনধ্বনি, আঁখি জলে আঁকা,
বিজনে বিহ্বল করে আপনি আপনা
তাই ভালবাসি তোরে, বুকের বেদনা॥

শ্রীপ্রভাকর মিত্র।

কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিম-সাহিত্যে সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। আত্মশক্তি।

ভগ্নবীণা।

জব্বলপুর,
১লা আষাঢ় ; ১৩২৮।

ভাই সুধীর,—

অনেক দিন হল তোকে কোন পত্র লিখি নি ; কেন, এর উত্তর এ চিঠিতেই পাইবে। আজ আষাঢ়ের প্রথম দিনটার প্রাতে উঠে দেখলাম আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ, গাছের আগায় গাঢ় নীল ছায়া। হাতমুখ ধুয়ে পুরাণো চিঠির তাড়া নিয়ে বসলাম। উপরে জায়গাটার নাম পড়েই বোধ হয় একটু চমকে উঠেছিস্। আজ এই দূর দেশে তোদের মত প্রাণের চেয়ে প্রিয় যাঁরা তাদের চিঠিগুলিই এই নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইগুলির মধ্য দিয়েই আমি তোদের স্নেহের স্পর্শ ও ভালবাসার বিহ্বল দৃষ্টিটুকু অনুভব করতে পাই। এতদিন পরে মনটা আজ কেমন আকুল হয়ে পড়েছে—সহানুভূতি আমার চাহই—! তাই আজ গত জীবনের ঘটনাগুলিকে মালা করে গাঁথতে বসলুন! স্মৃতির বাগান থেকে চয়ন করতে গিয়ে পাচ্ছি আজ শুধুই লালফুল,—আজ তোকে লালফুলের মালা উপহার দেব ; এ আমার প্রাণের রক্তে রাঙা।

আজ এই যে আমি হাতে করে বসে আছি—এক তাড়া খামের চিঠি, কালো এক গুচ্ছ চুলে বাঁধা—এ চিঠিগুলি যে লেখেছে তারই কথা তোকে বলব। যে আমার যৌবনের রক্তিম ঊষায় তার "যৌবনজাগ্রত বিকচোন্মুখ দেহপদ্মটাকে" আমায় উপহার দিয়েছিল তারই কথা আজ তোকে জানাব।

তোর বোধহয় মনে পড়ছে—যে যখন আমি স্কুলে ছিলাম তখন থেকেই কবি হবার দিকে আমার একটা বিশেষ রকম ঝোঁক ছিল। কাব্য লেখবার জন্য চেষ্টাটা আমার তত বেশী সে সময়ে ছিল না, যতটা এ চেহারাটাকে কবি-জনোচিত করবার জন্য। জীবনে তখন ব্যথতার মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করবার কোন সুযোগই আমার ঘটে উঠেছিল না তবু যে কল্পনার বলে গুনে করতে চেষ্টা করতাম যে নিরাশ প্রণয়ের দাবদাহে আমার জীবনের শ্যাম-

প্রান্তর নীরস, শুষ্ক মরুভূমি। হায় কে জানত যে অন্তর্যামী ভগবান্ আমার এই ভাবের সৌখীনতা করুণার চোখে দেখবেন না! তাই নিষ্ঠুর ভাবে আমার জীবন-বীণার তার সৌভাগ্যের মধ্যাহ্নে টেনে ছিঁড়ে দিলেন। সেই ভগ্নবীণা হাতে নিয়ে আজ করুণ পূরবীর সুর তোলা বৃথা।

* * * * * *

কবির মত নয়ন আর মন নিয়ে এসে আমি কলকাতার রূপে মুগ্ধ হতে পারি নি। কোথায় সে সবুজ ঘাসের কমনীয়তা ছায়ায় ঘেরা আম্রবনের নবমুকুলের ভেসে-আসা গন্ধ, আর ভোরের বেলার বাঁশগাছের কচিপাতার উপর ঝিকমিকে আলোর খেলা, মধুর বাতাসের পুলক শিহরণ। কোথায় সে উদার, নির্মল, সুনীল আকাশ, তার স্নিগ্ধ প্রশান্তি আর গভীর নীরবতা।

উঃ আজ কি ভয়ানক মেঘ করেছে। ঠিক হয়েছে—এ রকম আকাশের দিকেই এ চোখ দুটো রেখে হৃদয়ের এত বড় দুঃখটা বলা যায়। সুধীর, তাই তোকে এত সহজে বেদনার ছিন্ন ভিন্ন প্রাণের ছবিটা খুলে দেখাতে পারব। সেও ছিল এক বর্ষার দিন, শ্রাবণ মাসের অবিরল ধারাসারের বর্ষা। সে দিন মেঘরাজের দেউড়ীর অর্গলটা কেমন মুক্ত পেয়ে মেঘগুলি আকাশ পথে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল—কোথায় তাদের গতি, না ছিল তাদের গর্জ্জন। ঝম্ ঝম্ শব্দে অজস্র বারিপাত হচ্ছিল। এই অশ্রান্ত বর্ষণের মাঝখানে বসে মন যেন কোন এক গোপন ব্যথায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সেই "স্নিগ্ধ সজল মেঘকজ্জলদিবসে" কি এক আকাঙ্ক্ষা যেন রঙীন মদিরার মত ফেনিয়ে ফেনিয়ে আমার কণ্ঠ পর্য্যন্ত উঠছিল। হৃদয়ের মাঝে এ কী শূন্যতা, আর একে পূর্ণ করবার জন্য প্রয়াস। মনে হল কবির কথাগুলি—

"আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে
চমকে দীপ্ত দামিনী
শূন্য নয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী।"

* * * * * *

সেবার [illegible] ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়েছিল একটু মহামারক ভাবে। এই ইনফ্লুয়েঞ্জার [illegible] আমি হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল ছেড়ে মেডিক্যাল কলেজের কটেজে এসে উঠলুম। কতকগুলি

বই যে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম—সে বোধহয় তুই বেশ টের পাচ্ছিস্, কারণ হিসাব করে দেখলে দেখবি যে, সে আমার এম-এ, পরীক্ষার বছর। ঐ বর্ষার দিনেই বিকালবেলা যখন মেঘের ফাঁক দিয়ে এক জাল রশ্মি এসে মেডিক্যাল কলেজের উঁচু উঁচু গাছগুলির মাথায় সোণার মুকুট পরিয়ে দিয়ে গেল; তখন আমি জানালার ধারের চেয়ারটা ছেড়ে উঠে পড়লাম। দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়াতে দেখতে পেলাম এক তরুণী ছিন্ন মেঘে ভরা আকাশের দিকে কেমন ছল ছল চোখে চেয়ে রয়েছে—সেই দৃষ্টির সামনে জগৎটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে—দৃষ্টি তার এতই শূন্য এতই উদাস। আমি দ্বিধাহীন, সঙ্কোচহীন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভাবছিলাম, এ কী দেখছি—এই যে পল্লবিত লতাগুচ্ছের মত "লাবনি"ময় সুকুমার মুখখানি এত সুষমায় ভগবান্ ভরে দিয়েছেন। শ্রাবণের মেঘ যখন পুকুরের ওপারের গাছগুলির উপর ঝুঁকে পড়ে সন্তানহারা মার মত অবরুদ্ধ বেদনায় মৌন নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে, তার মধ্যে যে গভীরতা আর গাম্ভীর্য্য আছে আজ নারীর যে রূপ আমার চোখে পড়েছিল তার ভাবটা প্রায় সে রকম। ঠিক যে কার মতন তোকে আমি পরিস্কার করে বোঝাতে পারব না। ছোটবেলায় বাড়ী গিয়েছিলাম, পদ্মার উপর দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। অষ্টমীর চাঁদ আকাশে উঠেছে তারা-ভরা আকাশ, নদীর নীল চঞ্চল বক্ষের উপর নীলিমার ছায়া একটু প্রগাঢ় করে বিস্তৃত করে দিয়েছিল। আমি নৌকার গলুইএর উপর তরঙ্গহীন হয়ে বসেছিলাম অনেক দূর হতে "নিরাশ হৃদয়ে আশ্বাসের পদসঞ্চারের মত ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ, মৃদু—অতি মৃদু" ঝুপ ঝুপ শব্দ একটু শোনা যাচ্ছিল। আমার চারদিকে রহস্যময় এক অপরূপ জগতের সৃষ্টি চলছিল। সে দিনটা আমি আজও ভুলতে পারি নি। প্রকৃতি সে দিন তার বিপুল রহস্য নিয়ে, অসীম ভাব নিয়ে, আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে দিনের প্রকৃতির রূপের সঙ্গে নারীর রূপের এতটা মিল আছে ভেবে বড়ই আশ্চর্য্য হচ্ছি।

সুধীর, এই যে তার চিঠিগুলি আমার সামনে খোলা পড়ে রয়েছে—তার ব্যথায় কোমল কালো চোখ দুটী যেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এখন তোকে আর লেখতে পারছি না। দাঁড়া একটু, ঐ চিঠিখানা একবার পড়ে নি কতবার পড়ছি, তবুও পড়ে পড়ে আমার তৃষ্ণা ত মিটছে না।

এ কি, এ জায়গার অক্ষরগুলি এমন অস্পষ্ট হয়ে গেছে কেন?

মনু, তোমায় দেবার মত আজ আমার কি আছে শুধু তপ্ত কয়েক ফোঁটা চোখের জল।

* * * * * *

আমার বাবা গবর্ণমেণ্টের অধীনে এত বড় একটা উচ্চ পদের কর্ম্মচারী ছিলেন যে তাঁর বদলী হবার গণ্ডীটা শুধু বাংলা দেশেই আবদ্ধ ছিল না সমস্ত ভারতবর্ষটা তিনি কার্য্যগতিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। আমিও ছুটীর অবকাশে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতাম, কাজে কাজেই ভারতের সকল মুল্লুকই আমার একরকম দেখা হয়েছিল। আমি যেখানেই যেতাম না কেন, মনটা আমার পড়ে থাকত এ বাংলা দেশে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববাংলায়। আমাদের বাড়ী হল বিক্রমপুর। বাড়ীর সঙ্গে আমার পরিচয়টা মাত্র তিন বার হয়েছে। কিন্তু এ অল্প সময়ের পরিচয়ে তার সে ছবিটা আমার প্রাণে আঁকা হয়ে গিয়েছিল সে ছবির তুলনা ত আর কোথায়ও পাই নি। রবিবাবুর "ছিন্নপত্র" বোধহয় পড়েছিস্। না পড়লে একবার পড়ে দেখিস্ তবেই আমাদের নদী তীরের গ্রামগুলির সরল সৌন্দর্য্য, তুই বুঝ্‌তে পারবি—নদীর পারের সূর্য্যোদয়ের ও সূর্য্যাস্তের বর্ণোচ্ছ্বাস, নদীবক্ষে তরলিত জোছনার সোহাগ বন্ধন, আর প্রান্তরে ধানগাছের হরিৎশোভা, সরিষাক্ষেতের, তিলক্ষেতের ফুলগুলির আনন্দ-হিল্লোল। এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্যই যে শুধু, আমাদের দেশটাকে আমার ভাল লাগত, তা নয়, বাংলার গ্রামের লোকগুলির মুখে আমি যে রূপের ছায়া, ভাবের আনাগোনা দেখতে পেতাম সে কোথাও আর আমার চোখে পড়ে নি। সরলতা, ভাবুকতা আর মাধুর্য্য এই ত্রিধারায় সে মুখ যেন পূর্ণ স্নিগ্ধ, করুণ। আজ ঐ চিঠির মাঝ দিয়ে যে মুখখানা আমার মনে পড়ছে, সে যে সৌন্দর্য্যের চরমসীমা। রংটা তার শ্যামবর্ণ হলেও কেমন একটা স্নিগ্ধতা তাতে ছিল সে যেন মাটীর দীপের আলোর ম্লানিমাটুকুর মত —প্রভাতের শুকতারার হাসিটুকুর মত। নারীর রূপটাকে তোরা কি ভাবে দেখিস্ জানি না, আমার কাছে সে ভাবের প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। সমগ্র দেহের ভিতর দিয়ে যে ভাবটা তরঙ্গিত হয়ে উঠে মুখের ভিতর মিলে যায় সে ভাবটাই নারীর রূপ। তার দেহবল্লরীর প্রতি লীলায়িত ভঙ্গীতে আমি দেখতে পেয়েছিলাম একটা সরল প্রাণের ব্যঞ্জনা, আর মুখখানাতে স্থির বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য।

আমাকে উঠ্‌তে দেখেই মনু ছুটে এসেছিল। এসেই একটু হাসির রেখা তার অধরপ্রান্তে টেনে এনে সপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করল "আপনার কি কিছু চাই?"

আমি সলজ্জভাবে বল্লাম "না।" একটা ধন্যবাদ জানান দরকার সে কথাটাও আমি তখন ভুলে গিয়েছিলাম।

"আপনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন আপনার ঘরে ঢুকেছি বলে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনার ঐ বইগুলো দেখে আমার নাড়াচাড়া করবার বড়ই লোভ হয়েছিল।" মধুর সরল নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে আমার লজ্জা কেটে গিয়েছিল; আমি বল্লাম "আপনার ক্ষমা চাইবার কোনও কারণ নেই—আপনি যে দয়া করে এসেচেন সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

সে হেসে স্বরটা একটু উচু করে বল্‌ল "ও আপনি ভুল করেছেন, আমি আপনাকে একটুও দয়া করি নি এ যে আমাদের Duty."

ইংরাজি শব্দটা শুনে একটু অবাক হয়েছিলাম নিশ্চয়ই। বাঙালী মেয়ের মুখ হতে ইংরাজি কথা এত সহজে বের হতে এই আমি প্রথম শুনলাম!

আমি বল্‌লাম "যাই হোক, ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না, বড়ই একা বোধ করছিলাম।"

"আপনার বুঝি এবার পরীক্ষার বছর?"

"হাঁ, এ বইগুলি বুঝি এত বড় ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। পরীক্ষার বই বেশী কিছু আনি নি। হোষ্টেল থেকে রওনা হবার সময় ভেবেই এসেছি যে আমি Solitary imprisonmentএর শাস্তি ভোগ করতে চল্লাম। তাই যে বইগুলি আমার খুব ভাল লাগে তার দু চারখানা নিয়ে এসেছি।"

"এতটা ভয় হবার আপনার কোন কারণ ছিল না। আপনার টেবিলে রবিবাবুর তিন চারখানা বই আছে দেখেছি। আপনি বুঝি রবিবাবুর—একজন বড় ভক্ত।"

"হাঁ, ভক্ত নিশ্চয়ই তবে এক ভিন্ন ভাবে।"

"সে কি রকম?"

আজকাল "রবিবাবুর ভক্ত" এ কথাটা একটু উপহাসের ছলে বলা হয়, আপনি যে সে ভাবে আমায় এ কথাটা বলেছেন তা আমার মনে হয় না। তবে একটু পরিষ্কার করে বলবার জনাই বলছি—আমি কবিবরের মধ্যে যা কিছু সত্য আর সুন্দর শুধু তারই জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে থাকি।"

"না আপনাকে আমি ঠাট্টা করে বলি নি। আমিও তাঁরই একজন ভক্ত। তবে কিনা আমি তাঁর বেশী কিছু পড়ি নি। আপনার "ফাল্গুনী"খানা আমায় আজ রাত্রির জন্য দিন।"

"খুব আনন্দের সঙ্গে; বেশ আপনার পড়া হয়ে গেলে ঐ বইটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে।" সন্ধ্যার কালো ছায়ায় মেডিক্যাল কলেজের বড় বড় প্রাসাদগুলি কেমন অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দূরে কলেজষ্ট্রীটের উপরের কোন কোন ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী হতে মঙ্গলশঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

মণু বইখানা হাতে নিয়ে নমস্কার করে বলল—"রমাবাবু, আজ তবে বিদায় হই; কাল আবার Duty দেবার সময় দেখা হবে।"

এ কথা বলেই তড়িৎ পদক্ষেপে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাবার সময়ের এই ছোট Duty কথাটা আমার চোখের সামনে যেন এক ঝলক আলো ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আমি আঁধার ঘরে বসে বসে ভাবছিলাম এ তরুণীটা কে? জানি সে মেডিক্যাল কলেজের এক নার্স—কিন্তু কেন পিতামাতা ভাইবোনদের স্নেহ-সঙ্গ ছেড়ে আজ এই তরুণ বয়সে সংসারের দীপ্ত প্রখর আলোর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে? মেডিক্যাল কলেজে পড়ে বন্ধুদের কাছ থেকে এদের সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছি, জানি না সত্য কিনা। কিন্তু আমার কল্পনা ঐ সূত্রটুকু অবলম্বন করে নানা রঙের জাল বুনতে সুরু করল। মনে হল বোধ হয় কোন এক জ্যোৎস্না-গর্ব্বিত রজনীতে যে দিন কামিনী ফুলের গন্ধে বাতাস মাতাল হয়ে বয়ে যাচ্ছিল আর বিবশ ফুলগুলি ঝরে পড়ে গাছের নীচটায় কুসুম-শয্যা পেতে দিয়েছিল—এই রকম এক পাপিয়ার স্বরলহরীতে প্লাবিত নিশীথে এই নারী প্রেমাকুল হৃদয় নিয়ে বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় কম্প্রবক্ষে অভিসারে যাত্রা করেছিল। নারীর জীবনে এ এক স্বপ্ন। তারপর একদিন জীবনে যখন তুফান উঠল—একটা কালো মেঘ বিদ্যুৎভরা—কড় কড় শব্দে গর্জ্জন করতে করতে যমের মত ছুটে এল, তখন স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। নারী দেখতে পেল তার বাঞ্ছিতের পূজার আয়োজন তার দেহটাকেই পূজা করেই সার্থক হতে চাচ্ছে—তার প্রেমকে কেউ চায় না। আজ এ সংসারে সে সম্পূর্ণ একা—পুরাতন জীবনের কথা ভাবতে গেল—অশ্রুনদীর বানে সে ছবিটা কোথায় ভেসে গেল। তাই বোধ হয় অন্য উপায় না দেখে এ মেডিক্যাল কলেজে নার্স হয়েছে। জানি না আমার এ চিন্তা যথার্থ কিনা। তবুও এ তরুণীটির জন্য আমার হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠল।

ক্রমশঃ—

সুরের ফুল।

—:❋:—

(গান)

তেথা যে সুর ভেসে যায় বাতাসে
ফুল হয়ে রয় আকাশে।
এই ত গাহে কাননে আজ পাপিয়া
বাস ওড়ে সব-ছাপিয়া,—
মন মজে যার আভাসে!

সুরে সুরে পরাণ আঁকড়ি,—
ফুলের রঙীন পাপড়ি!
এরা যে দলে দলে গা মেলেছে
দিকে দিকে বাস ঢেলেছে,—
ফোটে নবীন প্রকাশে!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

বিবিধ।

(সঙ্কলিত)।

সাহারার নিম্নে সমুদ্র।

আফ্রিকার সুবিশাল মরুভূমি সাহারা সভ্যতা বিস্তার পথে এক মহা অন্তরায় ; আফ্রিকায় বাণিজ্য ব্যবসাদি প্রসারের ঘোর প্রতিবন্ধক। উহা দুরাধিগম্য,—বহুবার চেষ্টা করিয়াও মোটর ইত্যাদি যান সাহায্যে উহাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করা হইলেও তাহা ফলবতী হয় নাই। ভূমধ্যসাগর অত সন্নিকটে হইলেও এক সাহারা দুরাধিগম্য বলিয়া আফ্রিকায় ইয়রোপীয় বণিক বাণিজ্য প্রসারের সুবিধা করিতে পারে নাই। সাহারার বাণিজ্য পথ বিস্তারের প্রয়াস প্রতিবারেই বিফল হইয়াছে। অনন্ত বালুকারাশি, দিবসে অসহ্য উত্তাপ ও রাত্রে অত্যন্ত শীত এবং বারিবিন্দুর অভাবে সাহারা মনুষ্যের গতায়তের অযোগ্য। সম্প্রতি জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিকের অদম্য চেষ্টা ফলবতী হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি শক্তিশালী কূপ-খনন-যন্ত্র সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছেন যে বিশাল সাহারার নিম্নে এক মহাসমুদ্র বর্ত্তমান। প্রায় ৪০০ ফিট খননের পর বারির অস্তিত্ব সাহারার নিম্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাহারার বহু স্থানে পরীক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার যুক্তির সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। এই সমুদ্র মধ্যে বিবিধ জীবের বাস। কূপোত্থিত জলের সহিত কর্কট জাতীয় জীব উত্তোলিত হইয়াছে ; ইহারা অন্ধ। সাহারার নিম্নের সমুদ্রে আলোর অভাব ইহাদের অন্ধত্বের কারণ। কত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সকল জীব সমুদ্র তলে আবদ্ধ হইয়াছিল ও কি প্রকারেই বা ইহারা সেই জীবনধারণের অযোগ্য স্থানে জীবন রক্ষায় সমর্থ হইয়াছে তাহা মহা সমস্যার বিষয় ও বৈজ্ঞানিকগণের আলোচনার বিষয়।

মঙ্গলগ্রহের তথ্য নিরূপণে বৈজ্ঞানিকগণের আয়োজন।

ভ্রাম্যমান গ্রহগণের মধ্যে মঙ্গলগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর সন্নিধানে অবস্থিত। আগামী আগষ্ট মাসে মঙ্গল পৃথিবীর আরও নিকটবর্ত্তী হইবে। এই সুযোগে জ্যোতির্বিদগণ মঙ্গলের তথ্য নিরূপণ করিতে বিশেষ ভাবে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন ও তাহার জন্য আয়োজনেরও ত্রুটি হইতেছে না। আল্পস্ পর্ব্বতের ১৪,০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত জানফ্রাউ নামক শিখরে যন্ত্রাদি স্থাপিত হইতেছে। এই পর্ব্বত শিখর হইতে ঐ সময় মঙ্গলগ্রহ তিন কোটী পঞ্চাশ লক্ষ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত থাকিবে। ইহার পূর্ব্বে মঙ্গল পৃথিবী হইতে ২৫ কোটী মাইলের দূরে আসিয়াছিল; সে সময় বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছিলেন মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা বহু পুরাতন; সেখানকার অধিবাসীরা পৃথিবীর অধিবাসী হইতে জ্ঞানে উন্নত। মঙ্গলে আমাদের ন্যায় মানুষের বসতি আছে কিনা তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই কিন্তু মঙ্গল যে প্রাণীর বাসের উপযুক্ত ও উহা উদ্ভিদাদির প্রাণ ধারণের উপযুক্ত তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ সন্দেহহীন। কয়েক বৎসরের পূর্ব্বে সৌর মণ্ডলের কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে রহস্যজনক একটি আলোকরশ্মি পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল ইহা হইতে বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টায় মঙ্গলগ্রহবাসীগণের উহা একটি সঙ্কেত। মঙ্গলের অধিবাসীগণের জ্ঞান শক্তি আমাদের বিজ্ঞান বল হইতে আরও প্রখর। তাহারা হয় ত আমাদের পৃথিবীর অনেক খবরই রাখে। এবারে মঙ্গলকে এত নিকটে পাইলে নানারূপ বৈজ্ঞানিক সঙ্কেত দ্বারা আলাপ পরিচয় হইয়া উভয় গ্রহের অধিবাসীর মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে ইহাই বৈজ্ঞানিকগণের আশা।

চন্দ্রে গমনের চেষ্টা।

আমাদের এই পৃথিবী হইতে চন্দ্রালোকে যাওয়ার পরিকল্পনা অনেক কাল হইতে হইতেছে। এক এক জন বৈজ্ঞানিক এক এক প্রথায় চন্দ্রালোকে গমনের উপায় ঠাওরাইতেছেন। কিন্তু

এ পর্য্যন্ত কেহই কল্পনার দৌড় দেখানের বেশী সফলতা লাভ করেন নাই। পৃথিবীর উভয় মেরুর কয়েক বর্গ মাইল ছাড়া আর সকল স্থানেই মানুষ গিয়াছে এবং ঐ যে স্থানটুকু বাকি আছে, তাহাও বোধ হয় অতি অল্প কাল মধ্যে মনুষ্যের গম্য হইবে। পৃথিবীর সমস্ত স্থান দেখা হইয়া গেলে, নূতন স্থান দেখিবার প্রেরণা মানুষকে পৃথিবীর বাহিরে কোথাও লইয়া যাইবে। পৃথিবীর বাহিরে অথচ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে চন্দ্র ছাড়া আর কোন গ্রহ উপগ্রহ নাই, কাজেই স্বভাবতই মনে হয় মানুষ প্রথমেই চন্দ্রালোকে গমনের চেষ্টা করিবে। বহু প্রাচীন কাল হইতে মানুষ তাহার কল্পনার পুষ্প রথে চড়িয়া চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছে। মানুষের কল্পনার চোখে চন্দ্রের মত রম্য স্থান আর নাই। কিন্তু বাস্তব ইহা কতদূর সত্য বা মিথ্যা তাহা ঠিক করিয়া বলা চলে না। খুব জোরালো দূরবীক্ষণ সাহায্যে চন্দ্রকে যেন পৃথিবীর ৫০ মাইলের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মনে হয়, যদিও পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ইহা হইতে বহু সহস্র গুণ।

যুক্ত রাষ্ট্রের ক্লার্ক ইউনিভারসিটীর অধ্যাপক আর এচ গডার্ড পৃথিবী হইতে চন্দ্রালোকে এক অসীম শক্তিপূর্ণ হাউই (হাওয়াই) প্রেরণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন। তিনি যে হাউই নির্ম্মাণ করিবেন, তাহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৬০৬ মাইল হইবার কথা। এই গতিতে কিছুক্ষণ চলিলেই হাউইটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমার বাহিরে গিয়া পড়িবে। হাউইটাকে ক্রমাগত গতিশীল রাখিবার জন্য একটা হাউইর মধ্যে আর একটা, এরূপ পর পর অনেকগুলি হাউই থাকিবে এবং এক একটা বিদীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হাওয়াইর গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাহিরে গিয়া পড়িবা মাত্র উহা আপন বেগেই চন্দ্রের দিকে ভীষণ গতিতে চলিতে থাকিবে. এবং ক্রমশঃ চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সীমার মধ্যে গিয়া পড়িবে, তখন ইহা মানুষের চক্ষের অদৃশ্য রহিবে না। হাউই ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি দূরবীক্ষণ চন্দ্রের বিশেষ বিশেষ স্থানে যেখানে হাউই পড়িবার সম্ভাবনা আছে, সেইখানে লক্ষ্য স্থির করিয়া রাখা হইবে।

ইহা সকল হইলে মানুষের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য গ্রহে উপগ্রহে প্রাণী আছে কি না এবং তাহাদের সহিত কোনরকম যোগ স্থাপন করিয়া কথাবার্ত্তা চালান

যাইতে পারে কি না? চন্দ্রে প্রাণী আছে কিনা ইহা লইয়া অনেক রকম বাদানুবাদ চলিতেছে। একদল বৈজ্ঞানিক বলেন, চন্দ্রে বায়ুমণ্ডল নাই, সুতরাং সেখানে কোনরূপ প্রাণীও থাকিতে পারে না। চন্দ্রে যে সমস্ত ছায়াপাত হয়, তাহা অতি পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ, বায়ুমণ্ডল থাকিলে ছায়া ওরকম তীক্ষ্ণ ও পরিষ্কার হইতে পারে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ অধ্যাপক পিকারিং বলেন, চন্দ্রে খুব পাতলা একটু বায়ুমণ্ডল আছে, এমন কি মাঝে মাঝে চন্দ্রে খুব সামান্য বরফও পড়ে। ইহাতে মনে হয়, চন্দ্রালোকে অতি কষ্টে বিশেষ বিশেষ প্রাণী বাস করিতে পারে।

চন্দ্রালোকের টেম্পারেচর বা উত্তাপ লইয়াও নানা প্রকার বাদানুবাদ আছে। কোন প্রকার বায়ুমণ্ডল না থাকিলে সূর্য্যকিরণ সোজাসুজি অপ্রতিহত ভাবে চন্দ্রে গিয়া পড়ে। তাহাতে চন্দ্রের টেম্পারেচর ফুটন্ত গরম জল অপেক্ষাও বেশী হয়। অধ্যাপক পিকারিং বলেন, যদি চন্দ্রে কোন প্রকার প্রাণী থাকে, তবে তাহা ছোট ছোট গাছ এবং লতাপাতা। তাঁহার মতে চন্দ্রের মত স্থানে অন্য কোন প্রকার প্রাণী থাকিতে পারে না। কিন্তু এইচ জি ওয়েলস্ ভিন্ন কথা বলেন। তিনি বলেন, চন্দ্রের উপর কোন প্রকার লোক থাকিতে পারে না ইহা সত্য, কিন্তু চন্দ্রালোকে যে সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর আছে, তাহার ভিতর যথেষ্ট পরিমাণে বায়ুমণ্ডল আছে এবং তাহার তলায় মানুষ বা অন্য কোন প্রকার প্রাণী সহজেই থাকিতে পারে, কারণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ বিশেষ অসহ্য হইয়া কোন স্থানে পড়িতে পারে না।

কিন্তু চন্দ্রে কি রকমের লোক থাকা সম্ভব? চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর অপেক্ষা অনেক কম। সেই কারণে, আমারা চন্দ্রালোকে বিশ বাইশ মণ ভারী জিনিষ অনায়াসে পীঠে লইয়া দৌড়াইতে পরিব। লাফও যে বড় কম দিতে পারিব তাহা নয়, এক লাফে ৪০ ফুট চলিয়া যাইব, উচু দিকেও মাটী হইতে ২০।৩০ ফুট উঠিতে পারিব। চন্দ্রের লোকদের খু। পাতলা বায়ুমণ্ডলে বাস করিতে হয় তাই তাহাদের শ্রবণ শক্তি অতি তীক্ষ্ণ, কারণ পাতলা হাওয়ার মধ্য দিয়া তাহাদের বড় বড় কাণে শব্দ ধরিতে হয়। তাহাদের কথাবার্ত্তা চালাইবার হয়ত এমন কোন উপায় আছে যাহাতে শব্দের কোন দরকার হয় না। হয়ত কোন বিশেষ

প্রকার সঙ্কেতে তাহারা কথা চালায়। কিন্তু এই সমস্ত 'যদির' কথা। অধ্যাপক গর্ডাভের হাউই যদি সফল হয়, তবে অনেক তথ্য জানিতে পারা যাইবে।

'সময়'।

গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের উপরে ম্যালোরী ও আভিন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে অভীষ্ট সিদ্ধি।

চূড়ার উপরে দুইটী কালবিন্দু। মিঃ ওডেলের কথা।

রয়টার ১৪ই জুন।

গৌরীশঙ্কর অভিযাত্রীদলের নেতা লেফট্‌ন্যাণ্ট কর্ণেল ই এফ নর্টন লিখিয়াছেন—আমাকে আর একটী মৃত্যুর খবর দিতে হইতেছে। মান বাহাদুর নামে যে নেপালী আমাদের সঙ্গে ছিল, সে জুতা তৈয়ারী করিত। গত ২৫এ মে নিউমানিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া সে মারা গিয়াছে। জীবিত থাকিলেও বেচারার পা দুইটী নষ্ট হইয়া যাইত। দুঃখের সহিত আমাদিগকে আজ গৌরীশঙ্কর হইতে ফিরিতে হইতেছে। আমরা সফলতা লাভ করিতে পারি নাই ; আর ম্যালোরী আর্ভিন মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্ব্বে চূড়ার উপর উঠিতে পারিয়াছিলেন কিনা, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে কে পারিবে? তাঁহাদিগকে শেষবার ২৮,২২৭ ফুট উচুতে দেখা গিয়াছিল, ঐস্থান হইতে পর্ব্বতের চূড়া ৮ শত ফুট। আমি ও সোমার্ভেল অক্সিজেন না লইয়াই ২৮১২৮ ফুট উচুতে উঠিয়াছিলাম ; জগতের ইতিহাসে এত উচুতে কেহ কখনও উঠিতে পারে নাই। কিন্তু এই ফলের বিনিময়ে আমাদিগকে যে মূল্য দিতে হইয়াছে, তাহা বড়ই বেশী।

মিঃ ওডেলের বর্ণনা।

গৌরীশঙ্কর অভিযাত্রী দলের অন্যতম সদস্য মিঃ ওডেল লিখিয়াছেন—৭ই জুন বেলা ১২-৫০ মিনিটের ঠিক পরে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, পর্ব্বতের সমগ্র চূড়া আলোকমালায় উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিল। ঐ সময় আমার দৃষ্টি একটী কালো বিন্দুর উপর পতিত হইল, ঐ কৃষ্ণ বিন্দুটী উপরে অগ্রসর হইল; আর একটি কালবিন্দু দেখা যাইতে লাগিল. উহা বরফের ভিতর দিয়া অপর কালো বিন্দুটির সহিত চূড়ার উপর মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইল। প্রথম বিন্দু আরও অগ্রসর হইয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের উপর দিয়া চূড়ার উপর গিয়া উঠিল! দ্বিতীয় বিন্দুটিও পরে তাহাই করিল। তার পর এই বিমোহন দৃশ্য অন্তর্হিত হইল, মেঘের আড়ালে লুকাইয়া গেল। ঐ কালী বিন্দু দুইটী কি? মেলোরী এবং তাঁহার সহচর আভিন ছাড়া আর কিছু নয়। অতদূর হইতে দেখা যাইতেছিল তাঁহারা ক্ষিপ্র গতিতে উপরে উঠিতেছিলেন; তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছিলেন, বেলা ফুরাইয়া আসিয়াছে, চূড়ার উপর উঠিয়া তথা হইতে নামিয়া রাত্রিতে থাকিবার জন্য ৬নং তাঁবুতে আসিবার মত সময় তাঁহাদের বড় নাই।

স্বরাজ।

গৌরীশঙ্করকে হার মানতেই হইবে।

রয়াল জিয়োগ্রাফিকেল সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড গৌরীশঙ্কর অভিযান সম্বন্ধে 'টাইমস' পত্রে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—গৌরীশঙ্করের পরাজয় সুনিশ্চিত। তাহার কারণ এই যে, মানুষের জ্ঞান ক্রমেই বাড়িতেছে, কিন্তু পর্ব্বতের পক্ষে তাহা সীমাবদ্ধ। গৌরীশঙ্কর বীরের মত অনেক ভাষণ ভীষণ অস্ত্রের সাহায্যে লড়াই করিতেছে। দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালার দ্বারা সে বেষ্টিত, তাহার পক্ষে তুষার আছে, ঝড় বৃষ্টি আছে। কিন্তু অন্ধভাবে সে লড়াই করিতেছে। অভিজ্ঞতা তাহাকে জ্ঞানী করিতে পারে না, সময় বুঝিয়া নিজেকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার বিচার শক্তি তাহার নাই। কিন্তু মানুষ তাহার কৌশলপূর্ণ বুদ্ধিবলে পর্ব্বত এবং তাহার সহায়দিগকে জব্দ করিবার ফিকির বাহির করিবেই। পরাজয়ের প্রতি আঘাত মানুষের মনে নূতন উৎসাহ উদ্যম জাগাইতেছে, সে নির্ভীক ভাবে পুনরায় লড়াইএর জন্য রুখিয়া দাঁড়াইতেছে। কাজেই গৌরীশঙ্করের পরাজয়ের

দিন ঘনাইয়া আসিতেছে ; সেই দিনের আগমন ধীর হইতে পারে, কিন্তু সুনিশ্চিত। চল্লিশ বৎসর আগে আমাদের এমন উচ্চ আশা ছিল না, তখন ২১ হাজার ফুটের বেশী উচ্চে উঠিবার ধারণাই মনুষ্যের ছিল না। কুড়ি বৎসর আগে মানুষ ২৩ হাজার ফুট উচ্চে উঠে, তাহার পর ১৫ বৎসর পূর্ব্বে মানুষ ২৫ হাজার ফুট উচ্চে, দুই বৎসর পূর্ব্বে ২৭ হাজার ফুট উচ্চে এবং গত মাসে গৌরীশঙ্কর অভিযাত্রীরা অন্যূন ২৮ হাজার ফুট উচ্চে উঠিয়াছিল। অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাব অনুসারে দেখিলেও বলা যায়, ২৯ হাজার ফুট উপরেও মানুষ উঠিবে এবং গৌরীশঙ্করকে হার মানিতেই হইবে।

আবার গৌরীশঙ্কর অভিযানের আয়োজন।

গৌরীশঙ্কর অভিযানে বার বার ব্যর্থমনোরথ হইয়াইও মানুষ পশ্চাৎপদ হইবার নয়। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে আগামী জানুয়ারী মাসে আবার কয়েক জন সুইজারল্যাণ্ডবাসী যুবক গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গে উঠিবার চেষ্টা করিবেন, আয়োজন আরব্ধ হইয়াছে। এবারে ইঁহারা নাকি এমন সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, সরঞ্জাম সঙ্গে আনিবেন যাহার বলে গৌরীশঙ্কর জয় নিশ্চিত।

নূতন তৈল।

আদিতে তৈলের উপাদান ছিল তিল ; নামেই তাহা প্রকাশ। সরিষা প্রভৃতি তিলকে শেষে স্থানচ্যুত করিয়াছে। এখন তেলের রাজা কেরোসিন। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গলায় কেরোসিনের প্রথম আবির্ভাব হয়, তখন কিন্তু ইহার সুবাসের জন্য লোকে দূরে থাকিয়া ইহাকে দণ্ডবৎ করিতে চাহিত তখন পল্লীতে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কতই না অদ্ভুত তথ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। বিলাতী শৃগালের মস্তিষ্কের সার নাকি ইহার ছিল মুখ্য উপাদান,—তাই গন্ধটি ইহার অমন মনোহর ! এখনও এই বিশ্বাসে অনেকের চক্ষে ইহা অপবিত্র। ঠাকুর ঘরে ইহার স্থান নাই, সর্ষপ তৈলের অথবা ঘৃতের দীপই মন্দিরের অন্ধকার নাশের অধিকারী।

এদিকে কিন্তু সভ্যভব্য নব্যনব্যাদের শিরে: পর্য্যন্ত কেরোসিন প্রকৃত সুগন্ধি তৈলরূপে স্থান পাইতেছে। অনেক সুগন্ধি তৈলের উপাদান এই কেরোসিন। [illegible] প্রকার তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা রবার হইতে উৎপন্ন। শিঙ্গাপুরে [illegible] ছাটকাট হইতে যন্ত্র-সাহায্যে এক প্রকার তৈল বাহির করা হইতেছে, [illegible] প্রদান করে ও কলকারখানার এঞ্জিনে ব্যবহার করা চলে। অনেকে আশা করিতেছেন সত্বরই এতৈল প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিবে। যত হয় ততই ভাল।

চির-আশা।

(গান)

নয়ন তোমারে পায় না হেরিতে আমি যে গো চিরঅন্ধ
তাই বলে ওগো চিরবাঞ্ছিত! দুয়ার করো না বন্ধ।
বেসুরা, বেতাল,—বাজে না কো আর,
ভেঙ্গে গেছে বীণা, ছিঁড়ে গেছে তার,
জেগে আছে শুধু চির-হাহাকার, থেমে গেছে সুরছন্দ ;
তাই বলে সখা! তোমার সভার দুয়ার করো না বন্ধ।

কিছু নাই মম, আছে শুধু এই ভিক্ষাপাত্র শূন্য,
ভরে দাও মোরে ভরে দাও, তুমি অক্ষয় ওগো পূর্ণ।
তোমার পূজায় ফুটিয়াছে যারা,
সুরভি তাদের ছোটে মাতোয়ারা,
আমার কুসুম এ যে রূপ-হারা ; নাহিক কোনই গন্ধ ;
তাই বলে সখা! মন্দির দ্বার কোর না কোর না বন্ধ।

বিশ্ব আমারে নাহি চাহে যদি, তুমি ত চাহিবে তবু ;
যদিও আমার নাই কিছু নাই তুমি ত রয়েছ প্রভু !
তুমিই বাজাবে এ বীণাখানি,
কুসুমে গন্ধ তুমি দিবে জানি,
তুমিই আমারে লবে বুকে টানি, নাহি নাহি তাহে সন্দ ;
সেই আশা ধরে রব হেথা পড়ে, দুয়ার করো না বন্ধ।

শ্রীঅজিতনাথ লাহিড়ী।

প্রেম।

—০:*:০—

মানবকে ভাল না বাসিয়া ভগবানকে ভালবাসা যায় না ; তাহাতে সুখী হইতে পারা যায় না। ক্ষুদ্র প্রেম অবহেলা করিয়া বৃহৎ প্রেম চাহিতে গেলে কোনটিই পাইবে না। ক্ষুদ্রকে ভাল বাসিয়া আগে প্রেমের শিক্ষা সম্পূর্ণ হউক, তখন আপনা হইতে মন মহানের প্রতি ধাবিত হইবে। প্রেমাস্পদের সত্বার অনুভূতি জাগ্রত না হইলে, তাহার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার অসম্ভব। ভগবান এক হিসাবে অতিন্দ্রিয়—অদৃশ্য—তাঁহার প্রকাশ তাঁহার সৃষ্টিতে—সৃষ্ট বস্তুর রূপে গুণে—তাঁহার অনুভূতি তাঁহার বিভূতিজ্ঞাপক জগতের মধ্যে দিয়াই সম্ভব ! মানুষ মানুষের প্রাণের নিকটতম প্রতিকৃতি—তাহার গুণাগুণ রূপমাধুর্য্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়, মানুষের মধ্যে দিয়াই ভগবানের অস্তিত্ব প্রকাশ ; মানুষকে যে ভালবাসে নাই, সে ভগবানকেও ভালবাসিতে পারে না। আসঙ্গলিপ্সার বলে মানুষ প্রার্থনা করে মানুষের সঙ্গ,—বুঝিতে চায় অন্যের প্রাণকে, অন্যের গুণে মুগ্ধ হইতে, অন্যকে আপনার করিয়া লইয়া কৃতার্থ হইতে। তাই একটি প্রাণ আর একটি প্রাণের দিকে ধাবিত হয়। এই প্রাণে প্রাণে গাঁথাগাথি, হৃদয়ে হৃদয়ে জড়াজড়ি, আত্মাতে আত্মাতে মিশামিশির নাম প্রেম।

একজনের সত্তা অন্য সত্তায় মিশে। আপনা ভুলিয়া মিশে। প্রেমিক প্রেমের পাত্রকে দেখিতে চাহে, দেখিতে ভালবাসে; তাহার সেবা মনস্তুষ্টি ও সুখবিধান করিতে সে সদা সচেষ্ট—

কি মধুর আকর্ষণ, দুটি হৃদি দুটি প্রাণে,
গলিয়া মিলিয়া হয় একটিতে অবসান !

দুইটি আত্মাতে এক প্রাণ, এক মন, এক ইচ্ছা ইহাই ত প্রেম। প্রেমিক বলে, "আমি আত্মোৎসর্গ করিব যাহা' হয় হউক।" আত্মোৎসর্গই প্রেমের অভিব্যক্তির পরাকাষ্ঠা। প্রেম উহা অপেক্ষা অধিক দূর গমন করিতে অক্ষম। জ্যোতিঃতে মুগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় প্রেমানলে আত্ম-বিসর্জ্জন করাই প্রেমের ধর্ম্ম। যেখানে প্রেম সেখানে কেবল আত্মাহুতি, স্বার্থবলি,—

"তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ।"

প্রেম আত্মার ধর্ম্ম। তবে আত্মা অরূপ অগুণ বলিয়া কোন দ্বিতীয় বস্তুর সাহায্য ভিন্ন ভালবাসার সঞ্চার হয় না। আমি আমার প্রিয় ব্যক্তির আত্মাকেই ভালবাসি কিন্তু সে ভালবাসা 'দেহের উপর আসক্তিতে স্থাপিত! দেহ উপলক্ষ মাত্র, আত্মাই প্রেমের প্রকৃত কারণ। কারণ আত্মা দেহের সান্নিধ্য ত্যাগ করিলে আর দেহকে ভালবাসি না। এমন কি আত্মাহীন মৃত দেহ স্পর্শে আমরা স্নান করিয়া শুদ্ধ হই।

এই যে প্রেম, এই যে ভালবাসা ইহা হৃদয়গত হইলেও বস্তু ব্যতীত তাহা প্রতিফলিত হয় না। ভাবের অভিব্যক্তির জন্য বিষয় গ্রহণ চাই। "আমি তোমায় ভালবাসি" ইহার অর্থ তোমার যে তুমিত্ব সেইটুকুই আমার প্রিয়। কিন্তু কাজে কর্ম্মে হয় কি ?—"তুমি" কে ত দেখিতে পাই না, বা ধরিতে পারি না, তাই তুমি যাহাকে অবলম্বন করিয়া আছ অর্থাৎ তোমার বলিতে যাহা কিছু তাহাই ভালবাসি। যথা তুমি এই ফুলটী ভালবাস তাই এ ফুলটী আমার প্রিয়। ফুলটীকে ফুলের জন্য ভালবাসি না। ফুলে তোমার আনন্দ, সেই হৃদয়টুকু বা তুমিত্বটুকুর জন্যই ফুল আমার প্রিয়।

প্রেম শোধক। যদি যথার্থ ভালবাসা থাকে তবে তুমি যতই মলিন হও না কেন, ভালবাসা নিজের গুণেই তোমাকে বিশুদ্ধ করিয়া লইবে। প্রেম অগ্নির ন্যায়, যাহা ময়লা তাহা দগ্ধ করিয়া সার বস্তুতে পরিণত করাই প্রেমের ধর্ম্ম। দৈহিক পিপাসা যতই প্রখর হউক, স্বার্থ সাধনের ইচ্ছা যতই গভীর হউক, প্রবল প্রেমের সম্মুখে কিছু টিকিতে পারে না।

প্রকৃত প্রেমে কোন্ পাপ টিকিতে পারে না। প্রেমাবেগে সকল পাপ-পঙ্ক ধুইয়া যায়। আমরা পার্থিব জীব। ভালবাসিতে গেলেই তাহার সহিত পার্থিবতা জড়াইয়া যায়—কিন্তু তাহাতে কি? প্রেমিকা পাপপুণ্য জানে না!

যে ভালবাসায় একবার বিন্দুমাত্র পাপ স্পর্শ করে তাহা আর পবিত্র হয় না, এ যাহারা বলে তাহারা মূর্খ। তাহা যদি হইত তাহা হইলে দাম্পত্য প্রেমেও কোন পবিত্রতাই সম্ভব হইত না। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হইতে পারিত না। প্রেম স্বর্গের ভাষা। সাধুব্যক্তিগণই ইহার রসে সিক্ত, সাধুরাই ইহার ভাষা বুঝিতে পারে।

"এ তিন আখর যাহার মরমে সেই সে বলিতে পারে।"

প্রেমের ধনকে হঠাৎ দেখিলে প্রাণের ভিতর অতীত সুখ স্মৃতির ভাবের তারে কি যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠে। যেন কোথায় কবে কত সুখ ভোগ করিয়াছিলাম, ভালবাসার ধনের ভিতরে কত যেন অজানা আনন্দের প্রচুর্য্য আছে, কত লোকলোকান্তরের স্মৃতি বিজড়িত আছে বলিয়া বোধ হয়।

প্রেমে আমিত্বের বিলোপ সাধন হয়। আমারটুকু বিস্মৃত হইয়া সাত্ত্বিক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মমতার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই প্রেম।

আমার আমিত্ব, বিশেষত্ব, স্বার্থ, সুখ, দুঃখ, স্নেহ, মমতা, প্রাণ, মন, কামনা ও আমার বলিতে যাহা কিছু সমুদয় প্রিয় পাত্রে সংন্যস্ত করিয়া উভয়ের একপ্রাণ হওয়ার নাম ভালবাসা। বিনামূল্যে আত্মবিক্রয় ও ক্রন্দন ইহার ধর্ম্ম এবং অশ্রুই ইহার প্রতিদান। এই ভালবাসার বৃদ্ধি আছে নিবৃত্তি নাই, উহাতে শান্তি আছে কিন্তু সকলের ভাগ্যে ঘটেনা বা বড়ই সাধন সাপেক্ষ। অনন্তমুখী তীব্র আশা আছে, কিন্তু কেবলই হা হুতাশ ও নিরাশা। ইহারই পরিণামে শান্ত ভাবের উদয় হয়। এরূপ ভালবাসায় সাধকের সুখ ও শান্তি ভোগের বাসনা আছে;—মুখে প্রকাশও করেন বটে কিন্তু অন্তরে নিজে ভোগ করিতে চাহে না। যে উপায়ে হউক প্রাণ দিয়া প্রিয়তমকে সুখ ও শান্তিতে রাখিতে পারিলেই অপার আনন্দ বোধ করেন।

প্রকৃত প্রেমে জ্বালা নাই, উন্মত্ততা নাই কিন্তু গভীরতা আছে স্থায়িত্ব আছে। প্রেম স্বর্গের সোপান। জ্ঞান পথ প্রদর্শক, প্রেমই পথ। জ্ঞান আত্মার শোভা, প্রেম আত্মার সৌরভ। প্রেম অনন্তের দ্বার। প্রেমবিন্দুর মধ্যে প্রবেশ কর, অনন্তের ছায়া দেখিতে পাইবে। বিন্দুর

অন্তরালে সিন্ধুর ছায়ার আভাস পাইবে। সিন্ধু ও বিন্দুর একতার তাৎপর্য্য প্রেমের অভিধানেই মিলে। প্রেম জলধির গর্ভে সত্য সত্যই অগণ্য মণিমুক্তা থাকে। সাত রাজার ধন যে মাণিকের কথা লোকে বলে যদি কাহারও মিলে তবে উহা হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।

রজতকাঞ্চন টাকাকড়ি সংসারের ধন, প্রেম স্বর্গের ঐশ্বর্য্য। প্রেম অমূল্যনিধি অর্থের বিনিময়ে উহা লাভ করা যায় না।

প্রেম স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যে সেতু,—যোজক। প্রেমই সেই কৌশের রজ্জু যাহা স্বর্গকে মর্ত্ত্যের এবং মর্ত্ত্যকে স্বর্গের দিকে আকর্ষণ করে। প্রেম শান্ত হইতে নির্গত হইয়া অনন্তকে ছুটিয়া ধরে। সসীমের প্রেমের ফাঁদে অসীমও জড়িত ও আবদ্ধ হয়েন। প্রেম সসীমকে অনন্তের সহিত মিলিত করে, সান্ত অনন্তকে বলেন, "তুমি আমাতে এবং আমি তোমাতে, তুমি আমার এবং আমি তোমার।" কীটাণুকীট ও প্রীতি এবং প্রিয়বাদ দ্বারা পরমাত্মার সংযুক্ত হয়!

প্রিয় বস্তুর রূপের নাহি ওর। প্রেমের চক্ষে প্রিয় বস্তু অনুপম: অতুলন। জগতের মধ্যে এমন সুন্দর, এমন স্বর্গীয়, এমন মধুর ও এমন আপনার আর কিছুই নাই। প্রেম হৃদয়ের দ্বারা দেখে। হৃদয়ই উহার দর্শনেন্দ্রিয়। প্রণয়ীর পক্ষে প্রিয়বস্তু কত কতই রমণীয়। প্রেমচক্ষু ব্যাভিচারি নহে, উহা পরকীয়া ভূমিতে বিচরণ করে না। প্রিয়বস্তু প্রণয়ীর পক্ষে এমনই সুন্দর এমনই মিষ্ট! তাহাই যদি না হইবে তবে উহা বলপূর্ব্বক চিত্ত অপহরণ করিবে কি প্রকারে? হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রেমিক স্তুতি পূর্ব্বক বলেন, "হে প্রাণারাম তোমাকে স্তুতি করা, অর্চ্চনা করা আমার কর্ত্তব্য আমার ধর্ম্ম।" প্রেম প্রিয়বস্তুকে মধুময় দর্শন করে।

প্রিয় সঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তবিনোদক। তাহার সহবাসে নরকও স্বর্গতুল্য হয়। দুঃখভারও আনন্দের সহিত বহন করা যায়।

যাহা প্রিয়বস্তুর সহিত মিলিত করে তাহাই সুখ, শান্তি, অমৃত ও জীবন। তাহা হইতে যাহা বিচ্ছিন্ন করে, তাহাই অসুখ, অশান্তি, গরল ও মৃত্যু।

প্রেম অবিনশ্বর। উহা অক্ষয়, অজর, অমর। প্রেম বিনষ্ট হইতে পারে না উহা মনে করাই পাপ। প্রেম-সাগরে তরঙ্গ নাই, চঞ্চলতা নাই; উহা প্রশান্ত, গম্ভীর, নিস্তরঙ্গ অমৃতসিন্ধু। যে প্রেম কখনও আছে, কখনও নাই, যাহা জোয়ার ভাটার মত আইসে যায় তাহা

প্রেম নামের যোগ্য নহে। প্রেমিক বলিয়া থাকেন আজীবন তোমার প্রতি আমার প্রণয় অটুট রহিবে এবং যাবৎ সমুদয় সাগর নীর শূন্য না হয় এবং অরুণ তেজে পর্ব্বত সমূহ দ্রবীভূত না হয় তাবৎ আমি তোমাকে ভালবাসিব, তোমার প্রতি আমার অনুরাগ থাকিবে।

অশনিপাতে গিরিশৃঙ্গেরও বিচ্ছেদ হয় বটে কিন্তু কোন বিপৎপাতে প্রেম-মিলিত দুটী আত্মার যোগ ভগ্ন হয় না। প্রেমে এক প্রাণ অন্য প্রাণকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করে। দুইটী হৃদয়ের যোগে এক অভিনব হৃদয় উৎপন্ন হয়, শরীর স্বতন্ত্র থাকে বটে, কিন্তু আত্মা স্বতন্ত্র থাকে না। তখন হয়, "একই পরাণ বিহি কৈল ভিন্ন ভিন্ন দেহা।"

তাহাতে আমাতে প্রকৃতিগত সম্পূর্ণ মিল অসম্ভব কিন্তু প্রেম মহা সংস্কারক,—বিভিন্ন প্রকৃতিকে এক করিতে কেবল প্রেমই সমর্থ। তোমার আমার প্রকৃতি এক হইলে তোমার হৃদয়দ্বার আমার নিকট খুলিবে এবং আমার হৃদয়দ্বার তোমার নিকট খুলিবে। তখন তুমি আমার দর্পণ হইবে আমি তোমার দর্পণ হইব। তুমি আমাতে তোমার ছায়া দেখিবে এবং আমি তোমাতে আমার ছায়া দেখিব। তুমি আমার ধ্যানেতে সুখ অনুভব করিবে আমি তোমার ধ্যানে সুখ অনুভব করিব। ব্যথারব্যথী না হইলে কেই বা ব্যথা বুঝিবে। এবং কেই বা ব্যথা দেখাইবে?

প্রেম নিঃস্বার্থ। প্রেমের মধ্যে স্বার্থপরতার পূতিময় দুর্গন্ধ নাই। প্রেমিক কেবল দিতে চাহে কিছু লইতে চাহে না। প্রেম নিজস্ব সমুদয় ভালবাসার ধনকে দিয়াই সুখী। প্রেমিক প্রেম ভিন্ন অন্য কিছুরই প্রত্যাশা করে না। এমন কি প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম, সুখের বিনিময়ে দুঃখ পাইলেও তাহার অনুরাগ খর্ব্ব হয় না। প্রেমিক দেওলিয়া, তাহার নিজের কিছুই নাই, তিনি প্রিয়তমকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন। প্রেমিকের হৃদয়টুকু তাহার প্রিয়তমের,—তথায় আর অপর কোন প্রাকৃত জনের দাঁড়াইবার স্থান নাই।

প্রেমিকই সন্ন্যাসী। তাহার ধন, জন, দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মা সকলই তার প্রিয়তমে চিরদিনের তরে ন্যস্ত। সে কিছুরই চিন্তা করিবার অবসর পায় না, কারণ প্রিয়তমই যে তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।

প্রেমেতে আত্মসুখেচ্ছার নির্ব্বাণ ব্যতীত অসুখ, অতৃপ্ত ও অশান্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। প্রেম আত্মার অহং নষ্ট করে। গভীর প্রেম কাননে বিচরণ করিতে গিয়া আত্মা আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

যাহার হৃদয় সরল নহে, সে কখনও প্রেমিকা হইতে পারে না। যাহার হৃদয় যতটুকু মিষ্ট যতটুকু সরল, অকপট সে তত প্রেমিকা।

প্রেমই একমাত্র পদার্থ, একমাত্র সার বস্তু। জীবনে, সংসারে, পৃথিবীতে, ব্রহ্মাণ্ডে, পরলোকে যার হৃদয়ে প্রেম নাই তার সকল গুণই বৃথা। সে অসার অপদার্থ।

প্রেম ও হৃদয়ের দ্বারা পরমেশ্বর ধর্ম্মের ও জীবনের পরিমাণ করেন। যে পরিবারে সকলেই বিশুদ্ধ প্রেম ডোরে বাঁধা, তাহা কতই সুখের স্থান। উহাই মর্ত্তে স্বর্গধাম। সেখানে বিবাদ বিসম্বাদ নাই, দ্বেষাদ্বেষি নাই, অমঙ্গল কামনা নাই, কেবলই আনন্দ হাসিখুসি, মঙ্গল ইচ্ছা ও শুভানুষ্ঠান। সেখানে কেবল দেব ভাবেরই স্ফুর্ত্তি।

যে প্রিয়তমের সুখের জন্য সকল কষ্ট সহ্য করিতে ও প্রিয়জনের ইচ্ছায় স্বীয় ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিতে না পারে সে প্রেমিকা নহে। প্রেম না জন্মিলে আত্মার বিকাশই হয় না। প্রেম আত্মাতরুর পারিজাত কুসুম। মনুষ্যত্ব হইতে প্রেম বাদ দিলে মানব পশু অপেক্ষা হিংস্র জঘন্য।

প্রথমাবস্থায় প্রেম বিরহ সহ্য করিতে পারে না। বিরহের অবস্থা জীবন্মৃতের অবস্থা, মরমে মরিয়া থাকার অবস্থা। এ অবস্থা কি মর্ম্মান্তিক কষ্টকর! যাহাকে তিল আধ না হেরিলে মরমে মরিয়া থাকিতে হয়, যাহাকে নিকটে পাইলেও সদা হারাই হারাই ভয় হয়, সেই নয়নের তারা চক্ষের অন্তরাল হইলে কতই যাতনা অনুভূত হয়। দর্শন সুধা ব্যতীত এ যাতনা কিছুতেই যায় না।

প্রেমিকাহৃদয়ে প্রিয়তমের মূর্ত্তি চিরাঙ্কিত রহে। কাল তাহা ক্ষয় করিতে পারে না। যে সর্ব্বদাই প্রিয়তমকে আপন হৃদয়ে না দেখে সে প্রেমিকা নহে। প্রেম আত্মবিস্মৃতি ঘটায়; উহা প্রিয়তম ভিন্ন পৃথিবীর আর সকলই ভুলিতে পারে। স্মৃতিই প্রেমের প্রাণ, বিস্মৃতিই মৃত্যু।

প্রেমের ভাষা নীরবতা। খাঁটি প্রেম নীরব। হৃদয়ের ভাব প্রকাশ বিষয়ে নীরবতাই ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

প্রেমে নিজ সুখের আকাঙ্খা থাকে না। স্বার্থগন্ধিত প্রেম হৃদয়ের এক কলুষিত অবস্থা। রূপজমোহ অতি নিকৃষ্ট বস্তু। উহা ইন্দ্রিয় লালসার সঞ্চার। উহা মোহ মাত্র। মোহ মানবকে কেবল নীচ ও জঘন্য করে ; প্রেমে আত্মসুখ লালসা নাই।

প্রথমে বস্তুবিশেষের প্রতি প্রেম অর্পিত না হইলে উদার সার্ব্বজনীন প্রেম জন্মেনা। প্রেম নিরালম্ব ভাবে শূন্যকে ধরিয়া থাকিতে পারে না শূন্য যাহার আধার, সে প্রেম কাল্পনিক। প্রথমে একটী বস্তুকে অবলম্বন না করিলে প্রেম গভীর হয় না।

প্রেমের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিকাশ ও পরিণতি এবং আত্মার বিকাশ ও পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের মলিনতা হ্রাস হয়।

মানুষের আত্মা অবিনশ্বর। দেহের সহিত উহার ধ্বংশ হয় না। উহা অপূর্ণ কিন্তু পূর্ণতার দিকে উহার গতি। আর প্রেমই ইহার পথ প্রদর্শক।

প্রেমের নিকট ধন রত্ন লোষ্ট্রবৎ। কিন্তু আবার একবিন্দু অশ্রুকণা বা প্রিয়তম প্রদত্ত একটী ফুল প্রেমের নয়নে অমূল্য।

এই প্রেম লোকে নারীর কাছেই শিখিয়া থাকে। প্রেম নারীর জীবন। গৃহ নারীর রাজত্ব। গৃহই প্রেমের বিদ্যালয়। ভুমিষ্ঠ হইয়া অবধি এই পাঠশালায় নারীর চরণ প্রান্তে উপবেশন করিয়া প্রেম রহস্য শিক্ষা করিতে হয়। শিশুকালে জননী, শৈশবে ভগিনী, যৌবনে পত্নী হইয়া নারী নানারূপে আজীবন তাহাদের সেবা করিয়া অবিরাম আত্মোৎসর্গ প্রদর্শন পূর্ব্বক মানবকে প্রেমের সুখময় ও দুঃখহারী পাঠ অভ্যস্থ করাইতেছেন। এবং স্বীয় হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু রুধির দান করিয়া বীরতা, ধীরতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি দেবদুর্লভ সদ্‌গুণ নিচয়ের প্রকট প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। নারী হৃদয়ই প্রেমের প্রিয় আশ্রম, নারীই প্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ইহা বুঝিয়া যাহাতে নারী নারী নামের যোগ্যা হইতে পারে, সেই আদর্শে জীবনকে গঠিত করার চেষ্টা করা উচিত।

আত্মার সহিত প্রেমের সম্বন্ধ। মানবের আত্মা সসীম বটে, কিন্তু অসীমেই উহার স্থিতি। মানবাত্মা বিন্দু প্রায় মনে হয়, কিন্তু অনন্তের বীজ, অনন্তের ভাব, অনন্ত সিন্ধু উহার অন্তরে নিহিত রহিয়াছে। শান্ত হইয়াও অনন্তের সহিত উহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। মানবাত্মার যে একটী অজ্ঞাত পিপাসা আছে, একটা কি জানি কিসের প্রতি হৃদয়ের অদৃশ্য টান আছে, সে সজ্ঞানে,

অজ্ঞানে, প্রাণের টানে যাহার দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহে, তাহাতে পূর্ণ অনন্ত এবং অবিনশ্বর বস্তু ব্যতীত তাহাকে আর কিছুতেই তৃপ্ত করিতে পারে না। এই অবিনশ্বর বস্তু ব্যতীত প্রাণের সাধ কিছুতেই মিটাইতে পারে না। যে বস্তুর ভিতরে তলান যায় না, যাহার অন্ত পাওয়া যায় না, তাহাই কেবল গভীর মধুর পিপাসা দূর করিতে পারে। তাহারই প্রতি প্রেম চিরস্থায়ী এবং নিত্যবর্দ্ধনশীল। প্রেমিকের হৃদয় মন্দিরে সদা "সত্যং শিবং সুন্দরং রূপভাতি।" প্রেমের চক্ষে প্রিয়বস্তু সর্ব্বসদ্‌গুণের আকর এবং পূর্ণতার আধার। প্রেমিকের চিত্ত আদর্শ পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের ভাবে পূর্ণ।

প্রেম নিরাশা জানে না। প্রেমচক্ষু পশ্চাতে চাহিয়া দেখেনা। যদি কখন দেখে তবে সে কেবল আনন্দের ঘুমন্ত স্মৃতিকে জাগাইবার জন্যে। অতীত যেমনই হউক না ভবিষ্য আকাশ প্রেম নয়নের অগ্রে উজ্জ্বল এবং বিস্তৃত ও আলোকময়।

কাম এবং প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্বর। প্রেম সন্দেহ বা অবিশ্বাস বুঝে না, প্রেমালোকপূর্ণ হৃদাকাশে সন্দেহের ঘনরাজি কদাচ স্থায়ী হইতে পারে না। যদি কখনও উহা উদিত হয় তবে গতিশীল মেঘখণ্ডের মত নিমেষ মধ্যে তাহার অন্তর্ধান হয়। সন্দিগ্ধ চিত্ত প্রেমের নিকেতন নহে। প্রেমের আলয় আশাময়, শান্তিময় এবং আনন্দময়।

প্রেম ভয়শূন্য। যে মৃত্যুর ভয়ে মানুষ শিহরিয়া উঠে, পবিত্র প্রেমের বলে পতিপ্রাণা সাবিত্রী সেই যমকে সম্মুখে দেখিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এই সংসারারণ্যে কত বলহীনা রমণী প্রতিমুহূর্ত্তে এই প্রকার সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতেছেন।

প্রেমিক যেমন নিজের সম্বন্ধে নির্ভীক প্রিয়তমের সম্বন্ধে তদ্রূপ নহে, সতত তাহার এই আশঙ্কা যে পাছে বা প্রিয়তমের কোন প্রকার দুঃখ, ক্লেশ বা ক্ষতি হয়। 'কি জানি আমার জন্য প্রিয়তমের হৃদয়ে পাছে কোনও আঘাত লাগে'—ইহাই তাহার ভাবনা। সদাই তাহার হারাই হারাই ভয়।

যে হৃদয়-তন্ত্রী প্রেম-কম্পিত হয় না, যে হৃদয়ে প্রেমের প্রতিধ্বনি শ্রবণ করা যায় না, তাহা মরু অপেক্ষাও শুষ্ক, ভুজঙ্গ অপেক্ষাও ভীষণ এবং বিজন কান্তার অপেক্ষাও ভয়াবহ। সে হৃদয় প্রস্তর অপেক্ষা সুকঠিন। এরূপ হৃদয় যাহার, কোন দুষ্কার্য্যই তাহার পক্ষে অসাধ্য নহে।

ধর্ম্মই যেমন ধর্ম্মের পুরস্কার তেমনি প্রেমলাভই প্রেমের পুরস্কার। প্রতিদান লাভের একটু অস্ফুট কামনা প্রেমের মধ্যে সুগূঢ়রূপে নিহিত আছে। উহা লাভ করিলে নীহারসিক্ত ম্রিয়মান কুসুমের ন্যায় প্রেমিকের প্রাণ সজীব হইয়া উঠে। তদবস্থায় তিনি যে দিকে নেত্রপাত করেন সেইদিক হইতেই মিষ্টতা ক্ষরিত হয়। কিন্তু প্রেমের প্রতিদানে একটু প্রেম না পাইলে তাহার অন্তর বাহ্য দশদিশি বিরহ-হুতাশে পূর্ণ হয়।

প্রেমপ্রতিদান লাভ করা প্রেমের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু গৌন ভাবে উহা লব্ধ হইলে সুখসিন্ধু উথলিয়া উঠে—হৃদয়ের শূন্যতা দূর হয়। প্রতিদান হইতে প্রেম পুষ্টি লাভ করে বলিয়াই হৃদয়ের স্বাভাবিক—আকাঙ্খা ও নিরন্তর প্রার্থনা সে প্রতিদান হইতে হৃদয় যেন বঞ্চিত না হয়। পরমাত্মার সহিত সহবাস লাভের কামনায় ন্যায় জীবের এই প্রেম প্রতিদান কামনা পবিত্র।

কিন্তু প্রতিদান সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। জলদ্বারা যেমন জল বাহির করা যায় তেমনি প্রাণদ্বারা প্রাণ টানা যায়। প্রাণ দান না করিলে প্রাণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু প্রাণদান করিলেই যে সর্ব্বদা তাহার প্রতিদান পাওরা যায় তাহাও নহে। কতকত সতী স্ত্রী দেহমন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক পতির সেবা করেন—পতিকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ পদাঘাত ব্যতীত তাঁহাদের প্রাণপণ সেবার অন্য কোনই প্রতিদান লাভ করে না। কিন্তু তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। প্রেমদান করিতে পারাই লাভ। যিনি প্রতিদান না পাইয়াও প্রেম দান করিয়া আপনাকে লাভবান জ্ঞান করেন, সতী, পতিপ্রাণা সাধ্বী যেমন স্বামীর ভালবাসা না পাইলেও স্বামীর সেবা করিতে পারিলে নিজেকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করেন, সেইরূপ যিনি পারেন তিনিই ধন্য। পৃথিবী কেবল দাদনের স্থান লোকরন্তরে সুদে আসলে পাওয়া যায়।

অনেকে বলেন সংসার ত্যাগ না করিলে প্রেমিক হওয়া যায় না। কারণ সংসারে থাকিয়া সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান আসে না। সেইজন্য সংসারে সুখ নাই। কিন্তু প্রথমেই আমি বিশ্বপ্রেমিক হ'তে পারি না। প্রেম ক্রমে ক্রমে শিখিতে হয়। সংসারই ইহার সাধনার স্থান। সংসারের মধ্যে পরিবারে যে মাধুর্য্যরসের আস্বাদন পাওয়া যায়, সেথায় যে সহৃদয়তা, যে সমবেদনা, যে সহানুভূতি পাওয়া যায় তাহা বিশ্বসংসারে ঘুরিয়া কোথাও লাভ করা যায় না

প্রেম আত্মার অঙ্গরাগ। যেখানে প্রেম সেইখানে সৌন্দর্য্য। সেইখানে সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ, অতএব সেইখানে স্বর্গ। স্বর্গ প্রেমিকের বাহিরে বা তাহা হইতে দূরে নহে। স্বর্গ প্রেমিকের অন্তরে।

প্রেমিক সংসারের নেত্রে উন্মত্ত। প্রেম সংসারের বিচারে এক প্রকার উন্মত্ততা হইলেও, উহার সুখের সহিত কোন সুখেরই তুলনা হয় না। কোন দেশে, কোন কালেই সাধারণ লোকেরা প্রেমিককে গ্রহণ করিতে পারে নাই। গুণীই গুণ গ্রহণে সমর্থ। জহুরী ব্যতীত কেহই হীরকের জল চিনিতে পারেনা। কপটাচারী ব্যক্তি সরলতার, অসতী ব্যভিচারিণী রমণী সতীত্বের, মূর্খ ব্যক্তি জ্ঞানের মর্য্যাদা বুঝেনা। কৃপণ ব্যক্তি দয়ালু-ব্যক্তির দানের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেনা। সেইরূপ প্রাকৃত জনে প্রেমের রহস্য বুঝিতে পারেনা।

হৃদয় প্রেমের স্থান। মানব হৃদয় কন্দরই সর্ব্বমাধুর্য্যের আগার। সংসার-সংগ্রামশ্রান্ত দেহমনপ্রাণকে সেই একটী ক্ষুদ্র লোকচক্ষের অতীত নির্জ্জন বা পূর্ণ নিকুঞ্জকুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তিময় মানবহৃদয় পর্য্যঙ্কে শায়িত না করিলে প্রাণ সুশীতল হয় না। প্রাণের ব্যথা প্রাণেই থাকিয়া যায়।

স্ত্রীজাতিই ভগবৎরাজ্যে প্রেমের প্রস্রবণ। কিন্তু তাহাদের দুর্ব্বলতা হইতে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। প্রেম স্বভাবতঃ লজ্জাবতী-লতার ন্যায় সূক্ষ্মচর্ম্ম—কোমলত্বক। উহা অজ্ঞাত করস্পর্শ সহ্য করিতে পারেনা। হৃদয় প্রেমের স্বর্গীয় শিখা প্রজ্জলিত হইলে লজ্জা কোথায় চলিয়া যায়! কিন্তু তাই বলিয়া প্রেম লজ্জাহীনতা বাসনা করে, তাহা নহে। প্রেম চাহে অযথা লজ্জা দূর হউক। তাহার ব্রীড়া মাত্র অবশিষ্ট থাকুক।

প্রেমিক একজনের ব্যতীত অন্য কাহারও নহে। জীবনে মরণে তার এক ধ্যান, এক জ্ঞান, প্রেমিক প্রেমের ধনকেই সুখী করিতে ব্যস্ত। যাহারে করিলে প্রীতি সকলেরই প্রিয় হয়।

যাহার হৃদয়ে প্রেম জন্মিয়াছে তাহার আত্মার বর্ণ এবং প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয় ও প্রিয়জনের অনুরূপ হয়। প্রণয়ীগণের অন্তঃ প্রকৃতির গতি ক্রমে ক্রমে একই প্রকার হয়। একই বস্তুর প্রতি তাহাদের বিরাগ এবং একই বিষয়ের প্রতি তাহাদের অনুরাগ জন্মে। একীকরণ ও সদৃশীকরণই প্রেমের ধর্ম্ম। প্রেম উচ্ছাস নহে উহা শক্তি, বিক্রম, সমুদয় সত্বের অভিব্যক্তি। উহাই জীবনী শক্তি। ক্ষুদ্র বৃহৎ, জ্ঞানী অজ্ঞান, রাজা প্রজা, পশু পক্ষী, দেব মানব সকলেরই সমাজে প্রবেশ করিবার প্রেমই যেন অনুমতি পত্র।

পৃথিবীতে এই প্রেমবিদ্যা শিক্ষা করিবার অভাব নাই। প্রত্যহই নানা বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইতেছে। প্রতিবারই প্রেমানুশীলনের সুযোগ উপস্থিত হইতেছে। কুব্যাবহারের পরিবর্ত্তে সদ্ব্যাবহার, নিষ্ঠুর বাক্যের পরিবর্ত্তে মিষ্টবাক্য, ক্রোধের পরিবর্ত্তে স্নেহদ্বারাই প্রেম-নৈপুন্য লাভ করিতেছে। বিরক্তি, অশান্তি বানপ্রস্থ অবলম্বন করুক।

সম্মুখে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দরতম বস্তু রাখিয়া তৎপ্রতি চিত্ত অর্পণ করিতে হইবে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সৃষ্ট এবং স্রষ্টার যে প্রেম ভোগ করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি, তাহা অনুক্ষণ স্মরণ এবং মনন করিতে হইবে।

প্রেমিকসঙ্গ নিত্যকর্ত্তব্য। প্রেম বৃক্ষ প্রেম ফল ধারণ করে। সর্ব্বদা প্রেমিকের সহবাসে থাকিয়া অনন্ত প্রেমচুম্বক অনন্ততাড়িতাধার প্রেমময়ের সংস্পর্শে থাকিয়া স্থায়ীভাবে তাড়িতান্বিত হইবে। প্রেমই ধর্ম্ম। প্রেম সুস্থ আত্মার স্বাভাবিক কার্য্য। যাহাতে ভগবান প্রীত, সেই বিষয়েই প্রেমিকের আনন্দ ও তৃপ্তি। তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিবার জন্য প্রেমিক উপাসক অনুক্ষণ তাঁহাতেই নয়ন তাপিত রাখেন। প্রেমিকের "যাঁহা যাহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" ধর্ম্মের পরিচয় প্রেমে। প্রেমেই জীবনের সফলতা। জীবের প্রতি প্রেমই আমাদের পরমাত্মার নিকট উপস্থিত হইবার সোপান। জীবাত্মার মধ্য দিয়া পরমাত্মার নিকট উপনীত হওয়া যায়। পরমাত্মাকে বা তাঁহার প্রিয় জীবকে ভালবাসা একই কথা। যে একজনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে পারে, সে ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন করে। প্রেম অনুজ্ঞার দাস। স্বামীর ইচ্ছা প্রকাশের পূর্ব্বেই, প্রভুর অভিপ্রায় ইঙ্গিতে বুঝিয়া পতিব্রতা সতী তাহার স্বামীর প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। ভয় বা লজ্জায় সতী রমণী কাজ করে না; সে অনুরাগের সহিত সে কার্য্য করিয়া থাকে।

একজনকে ভালবাসা এবং ঈশ্বরের নিয়ম পালন করা একই কথা। ইহাই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ, পূর্ণ বিকাশ আত্মার স্বাভাবিক পরিণতি।

একমাত্র প্রেমই সর্ব্ব কর্ত্তব্যের সন্ধিস্থল। প্রেম হইতে যাবতীয় নীতি ও ধর্ম্ম পুষ্টি লাভ করে। প্রেমে কাম গন্ধ নাই। পবিত্র প্রেম ভিন্ন হৃদয়ের মলিনতা কিছুতেই ধৌত হয় না। আত্মাতে নির্ম্মল হইবে এই বিধি, প্রেম ভিন্ন অন্য কিছুরই দ্বারা পালিত হইতে পারে না। প্রেম

ভিন্ন লক্ষ লক্ষ জপ বৃথা। প্রেমময় ভগবান ধ্রুব নক্ষত্র, যাহার জ্যোতি নিরিক্ষণ করিয়া, সাধুগণ এই ভীষণ সংসার সাগরে জীবনতরী চালিত করেন এবং বিপথগামী না হইয়া গম্যপথে আনন্দময় ধামের দিকে অগ্রসর হয়েন।

ধর্ম্মশাস্ত্রের এক একটী বিধি প্রেম হৃদের এক একটী তরঙ্গ। প্রেম তরঙ্গে মানুষের মন অনন্ত আনন্দ সাগরে সন্তরণ করে,—সেই আনন্দই তাহার আত্মার ধর্ম্ম!

চিন্ময়, চিরানন্দের অনুভূতি একবার ঘটিলে, আত্মা কি আর চায় তুচ্ছ স্থূলকে,—পার্থিব আনন্দকে?—সে তখন তৃষার্থ চাতকের মত পঙ্কিল বারি তুচ্ছ করিয়া কেবল স্ফটিক জল, স্ফটিক জল বলিয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে নব নীরদের নিকট বারি ভিক্ষা করে। সংসার তীরে বাস করিয়াও গৃহসংসারে, নিত্য-আচরিত সাংসারীক ব্যাপারে তৃপ্তিলাভ না করিয়া কেবল তাঁহারই প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন এবং প্রেমকণা লাভের উদ্দেশ্যে চিদাকাশে উড্ডীয়মান হইয়া নিরন্তর সতৃষ্ণ নয়নে প্রেমময়ের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন। তিনি ঈশ্বর ছাড়িয়া অন্য বস্তুর স্মরণাপন্ন হন না। ঈশ্বরই তাঁহার প্রাণ বায়ু, হৃদয়ের শোণিত, আত্মারথের রথী এবং দেহ যন্ত্রের যন্ত্রী। প্রেমিক ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

আনের পরাণে আনের অন্তরে
আমার পরাণ তুমি।
ওগো ক্ষণেক না হেরিলে তোমায়
মরমে মরি হে আমি।

পরমেশ্বর অন্যের প্রাণে থাকেন, কিন্তু তিনি প্রেমিকের প্রাণ। উভয়ের মাঝের সব ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। আত্মা ও পরমাত্মা পরস্পরের মধ্যে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করে এবং পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া অপূর্ব্ব, অতুল আনন্দ সাগরে মগ্ন হয়েন।

ঈশ্বর প্রেমিকের জ্ঞান, প্রেমিকের প্রাণ। তিনিই তাহাকে জ্ঞান প্রদান করেন। গুরু অন্তর্য্যামী হ'য়ে ভগবান আপনি শিক্ষা দেন।

যিনি প্রেম লাভ করিয়াছেন তিনি জ্ঞানসার লাভ করিয়াছেন। কারণ প্রকৃতি তার পরিবার। জ্ঞান উপায় উদ্দেশ্য নহে।

পার্থিব বস্তুতে কোনও সৌন্দর্য্য নাই। কিয়ৎকাল চন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া অন্য বস্তু দর্শন করিলে উহা বড়ই মনোহর এবং দিব্য জ্যোতি মণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ সংসারের কোনও বস্তু ভগবৎ প্রেমিকের চিত্তাকর্ষক না হইলেও, প্রেমিক তাহার প্রতি বীতরাগ নহেন। পরমাত্মার প্রতি যে দৃষ্টি স্থির, উহা সংসারের উপর পতিত হইলেও সংসারকে পবিত্র এবং মধুময় রূপে দর্শন করেন। সংসার তাঁহারই প্রিয়তমের রাজ্যান্তর্গত বলিয়া উহাকে তিনি বড় ভালবাসেন। ভগবৎ প্রেমপ্রসূত পার্থিব প্রেম এক অলৌকিক রসে পরিপূর্ণ।

ভগবৎ প্রেমিক সংসারকে ঘৃণা করেন না। তিনি মায়াতে মুগ্ধ হয়েন না। তিনি সংসারিকতাকে ঘৃণা করেন এবং তাহাকে দূরে পরিহার করেন। তিনি নির্লিপ্ত, অনাসক্ত, এবং নিষ্কলঙ্ক ভাবে সংসারে বিচরণ করেন।

প্রেমিক মুক্ত আত্মা, তাঁহার নরক নাই। প্রেমেই মুক্তি, প্রেম দ্বারা ভগবানকে লাভ করা অতি সহজ। উচ্চতম স্বর্গের জ্ঞানেতে উজ্জ্বল এবং ধর্ম্মেতে উন্নত, দেবতাগণ ব্রহ্মের দর্শনলাভে বঞ্চিত। কিন্তু যে প্রেমিক তাঁহার আগমনের জন্য নিজের হৃদয়-কমলকে নির্ম্মল ও পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদাই তাহাকে দর্শন করিয়া ধন্য এবং কৃতার্থ হয়েন।

যিনি প্রেমধনে ধণী "তস্য তুচ্ছং সকলং!" প্রেমিকের হৃদয় পরমেশ্বরের প্রিয় বাসস্থান। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান বটেন। কিন্তু কাঙ্গালের অশ্রুকণার নিকট তাহার অনন্তশক্তি পরাস্ত। ঈশ্বর প্রেমিক মুক্তিও চাহেন না। তিনি মুক্তিদাতাকেই চাহেন। কেবল ঈশ্বরের দিকেই তাহার চিত্ত ধাবিত হয়। সংসারের ঐশ্বর্য্য তাহার নিকট ধুলী। একজন প্রেমিক বলিয়াছিলেন—"লোকে পুণ্যের ডালা মস্তকে করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে।" যে প্রেমিক একথা বলিতে পারে, তার ইহলোকেও সুখ পরলোকেও সুখ।

প্রেম আত্মার ধর্ম্ম। প্রেমিক আত্মস্থ, সদা আত্মরাজ্যে বিচরণশীল। এই কারণে যাহাই কেন করুক না তাহার এই যে সে কর্ম্মান্তে চট করিয়া আত্মরাজ্যে উড়িয়া পড়ে। বিষয় সুখে তাহার ভাবনা ধাবিত হইলেও ভোগান্তে তাহার মন পুনরায় আত্মভাবে নিবিষ্ট হয়। সেই জন্য প্রেমিক ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন অন্যায় কাজ করিলেও সে আত্মবিসর্জ্জন করে না। তিনি সদা ব্রহ্ম সংলগ্ন। বিষয়ে ক্রীড়া করিলেও তার ভাব আলাদা। সেটী একটু লক্ষ করিলেই ধরা যায়। প্রেমিকে ভাব ঢুলু ঢুলু নেত্র, ভুল ভুল অসংলগ্ন বাক্য; তার

গভীর অনন্ত স্নেহ দেখিয়াই ধরা যায় যে সে এ জগতের লোক নয়। প্রেমের পাত্রকে অপাত্র ভাবিয়া প্রেমকে রোধ করা যায় না। কারণ অপাত্রকে সুপাত্র করিয়া লইবার ক্ষমতা প্রেমের আছে! এই কারণে পাত্রাপাত্র ভেদে প্রেম কেবল দিতে জানে। সে কিছু চায় না। নিজের বলিতে যাহা কিছু সব দিতে চায়। দিতে না পারিলেই তাহার যত দুঃখ। কিন্তু প্রেমের সাধক যখন স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্মে পৌঁছায় তখন অহর্নিশি সমভাবেই দিতে পারে। কারণ সে আর বাহিরের রূপগুণের বিচার করেনা, অপেক্ষা করেনা। সে স্মৃতির রাজ্যে বিচরণ করে। স্মৃতির অর্চ্চনা করিয়া দিবসযামিনী সুখে কাটায়। প্রিয়তমের মনোমত স্মৃতি গঠন করিয়া মনোমত ভাবে তাহাকে ভালবাসে। তাহার নিকট অন্তর্জগৎ খুলিয়া যায়। তাই বহির্জগতের কিছু না পাইলেও বা অভাব বোধ করিলেও তাহার প্রেমাবেশ প্রতিহত বা নষ্ট হয় না। তাহার প্রেম—

"অনুগত বাঢ়ল অবধি না গেল

শ্রীমতী দীনতারিণী দাস।

ঝড়ের দোলা।

--তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে ঝড়ো হাওয়া দোদুল দোল্
মেঘের জটা ছাইচে আকাশ ডুডুম্-ডুডুম্-ডমরু বোল্।
বিজলী খেলে চোখের কোণে ইন্দ্ররাজের বজ্রবাণ
পাগ্‌লা কবির শনন্ শনন্ উদাস করা ভয়াল গান্।
উল্কা ছোটে দিগ্‌বিদিকে—ওড়না খসা চুমকী ওই
বিশ্বঘরের প্রদীপ নেবা—আঁধারে কী মিল্‌বে থৈ ?

লক্ষ ফণী গর্জ্জে ওঠে—সাগর পারের অগ্রদূত্
গরল ঢালা অনল শিখা—কোন্ দেবর্ষির মন্ত্রপুত ?
বক্রপথের পথিক নির্ঝর হিমাচলের স্নেহের দান্
রুদ্র তেজে প্রলয় জুড়ি' ঝড়ের দোলায় গাইচে গান
শ্মশানেতে আপন ভুলি' বাজায় মহেশ পিণাক—ঢোল,—
তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে ঝড়ো হাওয়া দোদুল দোল্ ।

ধ্বংস করো ধ্বংস করো—ভাঙো আজি আকাশখান্
সৃষ্টি আজি লুপ্ত হবে—ছুট্বে মাতাল রুধির বাণ ।
অঘোর কাঁদে বাদ্‌লা নিশা মানভরা তার পাগ্‌লা বুক্
গভীর হয়ে বেদন বাজে প্রলয় রাতের আল্গা দুখ্ ।
ঝল্‌সে মরে আগুন ছোঁয়ায় বিশ্বরাজের সৃষ্টিখান্
ওই যে শিঙা ফুঁক্‌রে ওঠে—শিউরে কাঁপে গোরস্থান ।
প্রলয় মাতন মাত্‌লে আজি মহাপাপের বজ্রাঘাত্—
দৈত্য দানব ভয়াল হাতে টুট্‌লো মায়ের বুকের পাত্ ।
কাল বশেখীর আঁচল আড়ে অস্তাচলের বেদন শ্বাস্
বজ্র চোখের ঝিলিক্‌মারা দিঠির দাহে সৃষ্টি নাশ্ ।
আকাশ ছাওয়া গরল ধূঁয়ায় মরক লাগা কাঁদন রোল্
তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে ঝড়ো হাওয়া দোদুল দোল ।

বন্দে আলী মিয়া ।

স্বাস্থ্যের কথা।

-:*:---

গড়ে বাঙ্গালীর আয়ু পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। জন্ম মৃত্যুর হার আলোচনা করিলে ভয় হয়। যদি এই হারে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার ক্রমেই বাড়িয়া চলে তাহা হইলে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব একদিন লোপ পাইবে। জীবন যদি নাইই থাকিল বাঙ্গালীকে যদি ধ্বংসের দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইতে হইল তাহা হইলে সমস্তই বৃথা। আশা উন্নতি ইহার মূল্য পরিণামে শূন্য সুতরাং যাহাতে আয়ু পরিমাণ আবার বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা সর্ব্ব প্রথমে কর্ত্তব্য। জীবনকে আমরা ভালবাসি, বেশীদিন বাঁচিবার ইচ্ছা সকলেরই, কিন্তু কি করিয়া এই আয়ু বৃদ্ধি হইতে পারে সে জ্ঞান, সে চেষ্টা আমাদের অধিকাংশেরই নাই, যাহারা অজ্ঞ তাহাদের ত কোনই বালাই নাই কিন্তু যাঁহারা স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখেন তাঁহারাও নানা কারণে স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা করিতে পারেন না। স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি পালন করা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের মধ্যে দিয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার উপর আমাদের দারিদ্র্য, খাদ্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা, খাঁটি দ্রব্যের অভাব, ভেজালের অত্যাচার দিন দিন এরূপভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে যে ইচ্ছা থাকিলেও স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করা সুকঠিন। স্বাস্থ্যধর্ম্ম পালনের প্রতিকূল এমন অনেক বিষয় আছে যাহার প্রতিকার আমাদিগের চেষ্টার বাহিরে; যেমন খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, আর্থিক অবস্থার অবনতি প্রভৃতি চেষ্টার ফলে নিরাকৃত হওয়া সম্ভব হইলেও সে চেষ্টা আমাদের দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থায় হওয়া কঠিন কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার প্রতিকার আমরা নিজেরাই করিতে পারি, অন্ততঃ সেগুলি প্রতিপালিত হইলেও অনেক রক্ষা। পূর্ব্বে আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী ধর্ম্মাচরণের সহিত এরূপভাবে বাঁধাবাঁধি ছিল যাহার ফলে অনেকেই অজ্ঞাতেও স্বাস্থ্যের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি পালন করিতেন। এক্ষণে আমরা স্বধর্ম্মে আস্থাহীন; ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া নিত্য আমাদিগকে যে সমস্ত কার্য্য করিতে হইত তাহা ছিল আমাদের দীর্ঘজীবন লাভের অনুকূল, এক্ষণে বিলম্বে শয্যাত্যাগ করাই হইয়াছে ফ্যাসান এবং ধর্ম্মসঙ্গত প্রাতঃক্রিয়ার পরিবর্ত্তে শয্যায় চা পানই হইয়াছে সভ্যতার অঙ্গ। এইরূপে নানা ভাবে

আমরা স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া শরীরকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবারই জন্য ব্যস্ত শরীর রক্ষার ব্যবস্থায় অমনোযোগী। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া আমরা যা' তা' দিয়া উদর পূর্ত্তির জন্য অস্থির হই কিন্তু শরীরের উপর ভক্ষিত বস্তুর প্রভাব কতখানি তাহা চিন্তা করিয়া একটুকুও দেখি না। এইরূপ আহার হইতে উপবাস যে শ্রেয়ঃ সে চিন্তা আমাদের নাই। উদরসর্ব্বস্ব আমারা, এই জন্য দেহের আধিব্যাধি লইয়া কন কষ্ট পাই না। খাই খাই শব্দ পূর্ব্বে এমন ছিল না, জাগরিত হইয়া যাহা সম্মুখে পাই, কুম্ভকর্ণের মত তাহার দ্বারাই উদরপূর্ত্তি করিতে এমন অস্থির আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ছিলেন না। আহার তাঁহারাও করিতেন, সে আহার এখনকার আহার্য্যের অপেক্ষা প্রকারে কম হইলেও এরূপ অপকৃষ্ট ছিল না, অনেকেই ছিলেন পরিমিতাহারী এবং যাহা কিছু তাঁহারা আহার করিতেন তাহা ছিল এমন বস্তু যাহা ভগবানকে সুপবিত্র বলিয়া উৎসর্গ করা চলে এবং যাহা হইত গ্রহণ কালে ভগবানের প্রসাদ। সময়ে অসময়ে যত্র তত্র যার তার পাচিত অন্ন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গ্রহণ করিতেন না ; আহার সম্বন্ধে তাঁহাদের বাছবিচার ছিল বিশেষভাবে। আজকাল শুনিতে পাই সেইটিই ছিল নাকি তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা ; তাঁহাদের সেই সঙ্কীর্ণতাই আজ ভারতকে করিয়াছে এত দুর্ব্বল। ভারতের যত ভোগ নাকি তাঁহাদের সেই বাছবিচারে। বাছবিচার ত বর্ত্তমানে এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছে তবু আমরা মরণের দিকে এত দ্রুত অগ্রসর হইতেছি কেন? পূর্ব্বে দেখিয়াছি ভ্রমণ কালে অস্থানে কদন্ন গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাদের একাধিক দিন অনাহারে থাকিতে হইত, তাহাতেও তাঁহাদিগকে অল্পায়ু করিতে পারে নাই কিন্তু আজ কাল ষ্টেশনে ষ্টেশনে চা বিস্কুট রুটি ফলমূল বহু প্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা থাকিলেও পিত্তহীন বাঙ্গালী জাতি পিত্ত সঞ্চয় হইবার ভয়ে সেগুলি যখন তখন গ্রহণ করিলেও দেহরক্ষা করিতে পারিতেছে কই? এখনকার অবস্থা দেখিয়া মনে হয় এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাঙ্গালীর পক্ষে বরং উপবাসই শ্রেয়ঃ, ইহাতে পরোক্ষে অনেক উপকার—অর্থ হিসাবেও, স্বাস্থ্য হিসাবেও। খাদ্য নামে বিষগুলি শরীরে প্রবেশ না করাইয়া বরং শরীরকে খাদ্যাভাবে সাময়িক ক্লিষ্ট করাও উচিত। উপবাসেও উপকারিতা আছে কিন্তু বিষ ভক্ষণে দেহের কি দশা তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। যার তার পাচিত অন্ন গ্রহণ করা উচিত কিনা,—ইহার ভিতর অস্পৃশ্যাস্পৃশ্যতার বা ঘৃণাদ্বেষের কথা কতখানি, তাহার বিচার্য্য স্থান এ নহে কিন্তু স্বাস্থ্যজ্ঞানহীন মূর্খ ভেজালমিশ্রিত করিয়া লাভবান্ হইবার জন্য লোলুপ খাদ্য-সরবরাহকারীকে কতদূর বিশ্বাস

করা যায় তাহা ভাবিবার। খাদ্য বলিয়া আমরা কি বস্তু খাই তাহা বুঝিয়াও অনেকে বুঝেন না কেবল লোভের ও উদরের অত্যাচারে। রসনার পরিতৃপ্তি ছাড়াও দেহরক্ষার হিসাবে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাই যে খাদ্য গ্রহণের প্রকৃত প্রয়োজন তাহা এখন এই মরণমুখ জাতিকে বুঝাইবার সময় আসিয়াছে। যে খাদ্য গ্রহণ করিলে দেহের অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহা অবশ্য-পরিত্যাজ্য, উপবাসও তাহা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ একথা আমাদিগকে এখন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে হইবে নতুবা আমাদিগকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না। সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলিতে এবিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত এবং যাহাতে এই স্বাস্থ্যনীতি প্রত্যেকের চিত্তে অঙ্কিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা অক্লান্তভাবে নেতাগণের করণীয়। কেবল অস্পৃশ্যের অন্ন গ্রহণ করিয়াই কৃতার্থ হইলে হইবে না, যাহাতে অস্পৃশ্য সর্ব্ববিষয়ে উন্নত-জ্ঞানসম্পন্ন হয়, যে দোষের জন্য একদিন তাহারা অস্পৃশ্য হইয়াছিল সে দোষ তাহা হইতে বিদূরিত হয় সেই ব্যবস্থা করিয়া অস্পৃশ্যের অন্ন গ্রহণ কর, সে অস্পৃশ্য তখন ব্রাহ্মণ, আর যে ব্রাহ্মণ মিঠাই-বিক্রেতারূপে ব্রাহ্মণত্ব জবাই করিয়া কসাইর মত বিষপ্রয়োগে জনসাধারণের জীবন বিপন্ন করিতেছে তাহাকে বর্জ্জন কর, হেয় দুষ্ক্রিয় কসাই-অধম পশু বলিয়া। চর্ম্মকারকে ভৃত্যরূপে গ্রহণ করিও না, যদি আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিতে পার কর—আত্মীয়কে যে শিক্ষায় শিক্ষিত দেখিলে সুখী হও, তাহার যে আচার লক্ষ্য করিয়া বল হাঁ ভদ্রঘরের ছেলে এ—সেই শিক্ষায়, অস্পৃশ্যকে আপনার জনের মত সেই জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর, তাহার অন্ন গ্রহণ কর কিন্তু তাহার জ্ঞান যেখানে কলঙ্কিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বুঝিতে সে এখন যাহা বুঝে তাহা অপরিষ্কারের নামান্তর তাহার অন্ন গ্রহণ করিয়া বিপন্ন হইও না। সর্ব্ব-অঙ্গের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে কিন্তু সে চেষ্টার মধ্যেও চাই আপনার প্রাণকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রথমে চাই সাধারণকে নানা জ্ঞানে উন্নত করা। আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা অপেক্ষা নিত্য-নৈমিত্তিক বিধি-ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টাই প্রথমে হওয়া উচিত একথা সকলে স্বীকার করিবেন। আমরা যখন বিনা বিচারে সর্ব্বজাতির অন্ন গ্রহণে প্রস্তুত তখন ইহারা যাহাতে কদন্নের পরিণাম কি ভয়ানক তাহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারে তাহার ব্যবস্থা না করিলে আমাদের জীবন যে প্রতিপদে বিপন্ন।

কেবল কথায়, বক্তৃতায়,—দশটা বিষয়ও যে ফল ফলিতেছে,—তেমনি এই খাদ্যসম্পর্কে কেবল কথায় আলোচনা করিলে তুল্য ফলই হইবে। লোলুপ ব্যবসায়ী ভেজালের কুফল বুঝিয়াও

বুঝিবে না কিন্তু আমরা যদি খাদ্য বিষয়ে সংযত হই, খাদ্য অখাদ্যের বিচার রাখি তাহা হইলে ইহার একটা প্রতিকারের পথ হইতে পারে। না খাইয়া থাকিব সেও ভাল, তথাপি স্বাস্থ্য-হানিকর অখাদ্য গ্রহণ করিব না,—এ প্রতিজ্ঞা যদি আমরা করিতে পারি তাহা হইলে সত্যই এমন দিন একদিন আসিবে যখন যত্রতত্র কুখাদ্যের অভাব হইবে না। ব্যবসায়ী ক্রেতার মন বুঝিয়াই পণ্যের ব্যবস্থা করে। এই যে খাদ্যে এত ভেজাল ইহাও আমাদিগেরই দৈন্যের পরিচায়ক; আত্মরক্ষা করিতে হইলে দৈন্যকে চিরকালই দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে, আর্থিক দৈন্য যত না অপকারী মানসিক দৈন্য, মনুষ্য-ধর্ম্মের দৈন্য অতি ভয়ঙ্কর—ইহাতে দেহমন আত্মাকে কলুষিত করে ইহা হইতে আত্মরক্ষা সর্ব্বপ্রথমে চাই। আহার, নিদ্রা, ভয়াদির সংযম শাস্ত্রে মনুষ্যত্ব লাভের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে সে শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া আমরা পশুর মত পরমুখাপেক্ষী মরণমুখী হইতেছি। মৃত্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার উপায় যদি কিছু থাকে তাহা সর্ব্ববিষয়ে সংযম। উদরসর্ব্বস্ব না হইয়া শরীর রক্ষার চেষ্টা তাহার জন্য কষ্ট—আমরা যদি করিতে না শিখি তাহা হইলে ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে আর কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না। মরণ আমাদের নিশ্চয়।

আহারের উদ্দেশ্য কি, কেন আমরা আহার করি? শরীর রক্ষার জন্য। শরীর রক্ষার জন্য আমাদিগের কি পরিমাণে কি ভাবে আহার করা কর্ত্তব্য তাহার আলোচনা বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের জ্ঞানও সীমাবদ্ধ ও প্রবন্ধ লেখায় অভ্যস্ত নই তজ্জন্য মনে হয় এ বিষয়ের মহোদয়গণ আলোচনা ও আন্দোলন করিলে দেশের এ অবস্থার সুফল ফলিতে পারে।
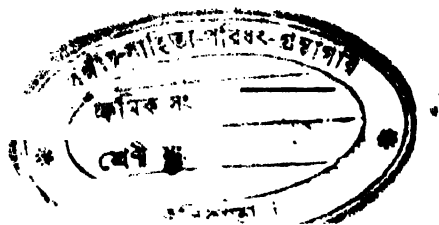
শ্রীসঞ্জয়।

বাংলার কথা।

-:•:-

অপ্রতিহত কালের গতি কেউ রোধ করতে পারে না। আজ যেখানে সমৃদ্ধিশালী জনপদ, কাল সেখানে বিশাল অরণ্যানি, আবার কাল যেখানে ভয়ঙ্কর জঙ্গল আজ আবার সেখানেই বৃহৎ নগরী। এই ত কালের গতি। জঙ্গল কেটে কলিকাতা হলো নগরী, আবার নগর গ্রাম ভেঙ্গে সুন্দরবন হলো জঙ্গল।

বাংলায় বনের অভাব নাই; সেই বনও আবার বহু মূল্যবান বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ।

সুন্দরবন, বনের জন্যই বিখ্যাত, আর তার সুন্দরি কাঠ যথেষ্ট আছে বলেইত ওর নাম সুন্দরবন। তা ছাড়া দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে বহু বন জঙ্গল আছে। বাংলার বনে শাল, সেগুন, শিশু, মেহেগনি প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ হ'তে আরম্ভ ক'রে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের বাঁশও আছে। তা ছাড়া আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের গাছও বাংলার যেখানে সেখানে আছে। তার কাঠও নেহাইত কম দামের নয়। তারই পর বাবলা, কড়াই প্রভৃতিও পথে ঘাটে, নদীর চরে যথেষ্ট।

বাংলার বন-সম্পদ প্রায় ১০,৬৯৬ বর্গমাইল ব্যাপিয়া আছে। আর এর বংশ বৃদ্ধি না হয়ে ক্ষয়ের দিকেই যাচ্ছে। কারণ খোদার উপর খোদকারী করাই যে আজকালকার মানুষের ধর্ম্ম। তাই রেল, ইষ্টিমার করে এই সব বনের কাঠ কেটে ভিন্ দেশে যখন চালান যেতে আরম্ভ করলো তখনই এদের বংশ নাশ অনিবার্য্য হয়ে উঠলো। তাই সরকার বাহাদুর এই বন সম্পদ রক্ষা করতে চেষ্টা করতে আরম্ভ করছেন। তবে এই সরকারের যেমন সবই হচ্ছে হবে এটাও সেই রকম ভাবেই চলছে।

তবে প্রকৃতিদেবী কিনা নীরবেই তাঁর সব গঠন কাজ চালান কিন্তু সব সময়ে তাঁর হাত অলক্ষ্যে থাকতে পায় না লোকে সময় সময় দেখ্‌তে পায়। আর তাই আমরা দেখ্‌ছি যে তিনি

তাঁর ম্যালেরিয়া রূপ বাহু বিস্তার ক'রে বাংলার অনেক পল্লী শ্মশান ক'রে তাতে বনদেবীর প্রতিষ্ঠা করছেন। এই যা আশার কথা।

*

বাংলার বন সম্পদ যে শুধু মূল্যবান বৃক্ষরাজীতেই পূর্ণ তা নয় তাতে অনেক রকম মূল্যবান প্রাণীও বাস করে। তারও বংশ রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠেছে। হাতীই সব চেয়ে মূল্যবান ও অতিকায় প্রাণী। সেকালে এরাই ছিল রাজার বাহন। অতিবৃহৎ ও সুদৃশ্যও বটে। চাটগাঁর পাহাড়ে, দার্জ্জিলিংএর পাহাড়ে আর কোচবিহারের পাহাড়ে এদের বাস। এরা পোষ মানে বটে কিন্তু লোকালয়ে এসে আর বংশবৃদ্ধি করে না। তাই জঙ্গল থেকেই এদের ধরে এনে পুষতে হয়। বৎসরে অনেক হাতী ধরা হয়। দামও খুববেশী। বড়লোক ভিন্ন কিনতে কিংবা পুষতে পারে না।

বাংলার গোধন আজ নষ্ট প্রায় হতে চলেছে। এর জন্য দায়ী শুধু মুসলমান বা অহিন্দু সম্প্রদায় নয়—হিন্দুও। আর সব চেয়ে বেশী দায়ী বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, যার জন্য আজ চাষারা বত গোচর ভেঙ্গে আবাদী জমী করছে।

এই গোধন রক্ষার প্রধান উপায় হচ্ছে তার ভাল খাওয়ার বন্দোবস্ত। আর তা ছাড়া ভাল জাতীয় স্বাস্থ্যবান ষাঁড়ের দ্বারা ভাল বাছুর উৎপাদন। দ্বিতীয়টীর চেষ্টা রংপুর, ঢাকা ও চুঁচড়ার সরকারের দ্বারা হচ্ছে। তা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে অনেকে করছেন। কিন্তু তা হলে কি হবে আসল যে খাদ্য তার যে কোনও ভাল বন্দোবস্ত হচ্ছে না। তার জন্য স্বরাজীদের চেষ্টা করে আইন করা উচিত যাতে জমিদারগণ যথেষ্ট গোচর রাখতে বাধ্য হন, আর চাষাও যেমন গরু রাখবে তার উপযুক্ত খাদ্য যাতে সংগ্রহ করে রাখে। নইলে শুধু Cross breedingএ কোনও ফল হবে না।

বাংলার গরু সাধারণতঃ /২ সেরের বেশী দুধ দেয় না। তবে ভাগলপুরী গাইগুলি /৫ ও /৬ সের পর্য্যন্ত দেয়। আবার কোনও কোনও জায়গায় নেপালী গরু আমদানী হয় বলে সেখানকার চাষারা প্রত্যেক বৎসরই গরু বদলায়। ১ বৎসর না খেতে দিয়ে গরুকে দিয়ে যথেচ্ছা খাটায় পরের বৎসর অল্পদামে সেই গরু বিক্রয় ক'রে আবার কিছু বেশী দিয়ে নতুন গরু কেনে। তাতে তারা গরুর খাওয়ার খরচা হ'তে নিষ্কৃতি পায়। এই রকম গরুকে না খেতে দিয়ে কাজ করানর প্রথার দিকে কৃষি বিভাগের বড় বড় কর্ত্তাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আজকাল প্রতি মহকুমার একজন ক'রে পশু চিকিৎসক রেখেছেন। কিন্তু সেই একজন লোকে গোটা মহকুমার Report লিখ্‌বে না গোটা মহকুমার পশুর চিকিৎসা করবে তা তারাই বুঝে উঠ্‌তে পারে না।

যে রকম ভাবে গরুর বংশ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে বোধহয় বাংলায় যোয়ান গরুর জন্যও পরের মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তে হবে। এখনইত দুধ বিদেশ থেকে আস্‌তে সুরু করেছে।

বাংলায় মহিষের অবস্থাও গরুর মত—তবে তারা ঐ এক রকমের জাত, দুধ /৫। /৬ সের করে দেয়। আর বোঝাও টানে বেশী।

ঘোড়া বাংলায় যা হয় তাতে কেবল অনশন অর্দ্ধাশন ক্লিষ্ট বাঙ্গালীরই চড়া সাজে, তা এতই ছোট ও ক্ষীণকায়। ভাল ভাল ঘোড়া—সবই বিদেশ থেকে ও বাংলার বাইরে থেকে আসে। ছাগল বাংলার সর্ব্বত্রই সকলেই পোষে ও এর ব্যবসায়ও ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই এক আধটু করে। ছাগলের দুধ খুব উপকারী কিন্তু পাওয়া ভারি মুস্কিল। কোনও কোনও জাতীয় ছাগল আধসের পর্য্যন্ত দুধ দেয়।

বাংলার ভেড়া বেশী বড় নয় ও এর লোমও তত ভাল নয়। ভেড়া পোষে অনেকেই। তবে দক্ষিণ বাংলায় ভেড়া কিছু কম। ভেড়ার লোমে কম্বল হয়। রাজসাহী ও ঢাকা central jailএ কয়েদীদের দিয়ে কম্বল তৈরী করান হয়। তা ছাড়া ছোট ছোট কম্বলের কারখানা মুর্শিদাবাদ জেলায় ও অন্য জেলায় ২।১টী ক'রে আছে।

ছাগল, ভেড়া, গোরু ও মহিষের চামড়ার ব্যবসায় খুব লাভের ও এর জন্যই শুধু বৎসরে যে কত জীব হত্যা হয় তার ইয়ত্তা নাই। চামার, মুচি প্রভৃতি শ্রেণীর লোক বিষ দিয়ে বহু গরু

মহিষ মারে আর চামড়া ব্যবসায়ী মুসলমানগণ মৃতপ্রায় দুর্ব্বল গরু মহিষ দিয়ে দুই কাজই চালায়।

হাঁস, মুরগী, বাংলার ঘরে ঘরে। তবে খুব ভাল জাতীয় নয়। চাটিগাঁর মুরগী খুব ভাল, আর বাজারে তার দর ও চাহিদাও খুব বেশী। নারায়ণগঞ্জে Mr. Luck, Rhode Island থেকে একরকম মুরগী আনিয়ে তার চাষ মন্দ করছেন না। Poultry খুব লাভের ব্যবসায়। তার শত্রুও আছে যথেষ্ট। চেষ্টা করলেই অনেকে নিজ নিজ বাড়ীতে বসিয়া এই ব্যবসায়ে দুপয়সা রোজগার করতে পারে।

'আত্মশক্তি।'

মহৎ উক্তির বিপত্তি

ভারতের সর্ব্বপ্রধান উপদেষ্টা,—জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী মহর্ষি মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ,—সহ্য কর অসহযোগী হও, হিংসার স্থান মানবাত্মায় নাই। মহাত্মার উক্তি বেদোক্তিসম, তাহা পালনীয়। উহা উপদেশ, উহা অশেষ কল্যাণের আকর। শঙ্কর একদিন সাধন শৈলের সুউচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় জীবন অতি চঞ্চল, যখনি জন্মগ্রহণ হইল তখনি তাহার মরণ পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছে। দিন যাইতেছে, রাত্রি আসিতেছে, সন্ধ্যা গত হইয়াছে, প্রাতঃকাল আবার উপস্থিত হইবে। সাধকের উক্তি, সাধকের যুক্তি অমূল্য হইলেও তাহার সারবত্তা সাধনক্ষেত্রে। জীবন প্রকৃতই পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় অতীব চঞ্চল হইলেও ইহার সেই পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করিতে কয়জন সমর্থ! জীবন—জীবনই। সাধকের চক্ষে জীবন জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু সাধারণের তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি কোথায়? যতই উচ্চ—যতই উন্নত—যতই মঙ্গলকর হউক না কেন সে শিক্ষা, তাহা যতক্ষণ হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে না পারে, তাহা গ্রহণ করিবার শক্তি যতক্ষণ সংগৃহীত না হয় ততক্ষণ তাহা অমূল্য অশেষ মঙ্গলপ্রদ হইলেও শিলাখণ্ডে ন্যস্ত বীজের ন্যায় নিষ্ফল।

হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর বিধান—হিন্দুর কেন, সর্ব্বজাতির সমস্ত শাস্ত্রে জগতের ধর্ম্মগ্রন্থে বহু প্রকারে বহু ভাবে কত শত সহস্র দেববাণীর ন্যায় মহাবাণী উক্ত হইয়াছে কিন্তু তাহাতে সাধারণকে মুক্তি দান করিতে পারে নাই। কেন? না, সে সকল মহৎ উক্তি গ্রহণ করিবার শক্তি দেশের বারো আনার নাই। সুতরাং মূলেই চাই গ্রহণ করিবার শক্তির সঞ্চার। শক্তির সঞ্চার ত কথায় হয় না, তাহার জন্য সাধনার আবশ্যক। সত্যই সে সাধনা অতি কঠোর সাধনা; কিন্তু সে কঠোরতায় আত্মনিয়োগ করিবার মত শক্তি ত এক দিনে মেলে না, তিলে তিলে, শনৈঃ শনৈঃ মানবকে সে সাধনায় অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। বড় বড় কথায় বড় বড় ভাবে মাতোয়ারা হইয়া এক দিনেই উচ্চ শিখরে আরোহণ প্রবৃত্তি, উন্নতি লাভের ত উপায় নয়ই বরং অধোগতির আশঙ্কায় তাহা জর্জ্জরিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রই; যে কারণেই হউক যাহার অধোগতি হইয়াছে সে হারাইয়া ফেলিয়াছে আপনাকে, তাহাকে যদি আবার জীবনপথে অগ্রসর করাইতে হয় তাহা হইলে তাহার ভাবেই তাহার ধারণা, কল্পনা, শক্তির অনুযায়ী, জীবনের সার, জীবনের লক্ষ্য, জীবনের গতি হৃদয়ঙ্গম করাইতে না পারিলে, মহৎ উক্তি বড় বড় কথা তাহার মতিগতি পরিবর্ত্তন পক্ষে ফলপ্রসূ নহে। ভগবান জীবনের চরম লক্ষ্য, কিন্তু যে ভগবানকে জানে না তাঁহার সত্তার উপলব্ধি জীবনে কখন যে করিতে পারে নাই, ক্ষণভঙ্গুর জীবনকেই যে মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, সংসারের অতি ক্ষুদ্র সুখদুঃখেই যে আনন্দিত ও অভিভূত হয়, দেহকেই যে মনে করে নিতান্ত আপনার, আত্মসুখই যাহার প্রধান লক্ষ্য, তাহার নিকট শঙ্করের সাধক শ্রেষ্ঠের অতি গূঢ়তম উপদেশ—"আমি নির্ব্বিকার নিরাকার, অনবদ্য, অব্যয়, আমি অসৎ স্বরূপ দেহ নহি", এই সকল বাণীর মূল্য কি? "আমি রোগহীন, ফলাভিলাষশূন্য, কল্পনারহিত ও সর্ব্বব্যাপী" ইহা হৃদয়ঙ্গম করা কি সাধারণের পক্ষে সম্ভব? আমি অহরহঃ রোগযন্ত্রণায় ভুগিতেছি দেহের মনের অশান্তির অবধি নাই, সর্ব্বদাই আধিব্যাধিতে জর্জ্জরিত কি করিয়া আমি অনুভব করিতে পারি—আমি রোগহীন! তাহা বুঝিবার শক্তি যে আমার নাই, আমি বুঝি না কি করিয়া আমি অব্যয়, বিনাশহীন, দুরন্ত ব্যাধি রাক্ষস যে প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার করাল কাল বদন ব্যাদান করিয়া চাহিতেছে আমাকে গ্রাস করিতে, কি করিয়া আমি বলিতে পারি আমি বিনাশহীন! যেদিকে তাকাই এ রাক্ষসের

সংসার, সদা উদ্যত আমার বিনাশ সাধনে, আমি যমের তাড়নে সর্ব্বদা কম্পিত কলেবর, প্রাণ ত্রাসে অস্থির, আমার কণ্ঠ হইতে কি নির্গত হইতে পারে—

'নিরাময়ো নিরাভাসো নির্ব্বিকল্পোঽহমাততঃ।'

আমার কর্ম্মফল বা যাহার কর্ম্মফলই হউক, আমি ভোগ করিতেছি, আমি ফল গ্রহণে বাধ্য হইতেছি, অনুভব করিতেছি তাহা পলে পলে, কিরূপ করিয়া আমি বলিব—আমি নির্ব্বিকল্প, আমি নিরাভাস! ওগো আমার দ্বারা সে কথা বলাইয়া লইবার পূর্ব্বে আমাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে দাও আমি সত্যই রোগহীন, আমি বিনাশহীন! বুঝিবার শক্তি নাই আমার, বুঝাইতে চাও আমাকে, তোমার মহৎ উক্তি! সকলে বলে, আমিও তাই বলি—তোমার উক্তি ঊর্দ্ধগতির সহায়ক, আত্মার অশেষ কল্যাণজনক। সকলে বলে—তাই বলি, সেও আমার দুর্ব্বলতা—সেও আমার শক্তিহীনতার পরিচায়ক, একটা প্রকাণ্ড মিথ্যার জীবন্ত অভিনয়! মন যাহা বলে না, দশে কি বলিবে বলিয়া দশের বিদ্রূপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য করি সেই মিথ্যা অভিনয়! অনুভব না করিয়া বলি—"সমস্তই মিথ্যা,—" আমার যে সে সমস্তই আত্মপ্রতারণা,—অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আমি সাজিতে চাই মহৎ, মহাজন উক্তিতে আমার মহৎ অনুরক্তি, দশকে বুঝাইয়া আমি জ্ঞানী হইতে চাই, কিন্তু কৈ, কোথায় আমার উক্তির সত্যতা। এই মিথ্যা অভিনয়ে কি আমার জীবন, ইহাই কি দান করিতে পারিবে আমার উন্নতি—আমার আত্মজনের উন্নতি—আমার দেশের উন্নতি? তাহা যদি পারিত তাহা হইলে এই উপদেশ-প্লাবিত বহু শাস্ত্রগ্রন্থে সমৃদ্ধ, সাধুগণের বিচরণভূমি পুণ্যভূমি ভারতবাসীর এ দুর্দ্দশা কেন! বুঝি না তোমাদের যুক্তি, বুঝি না তোমাদের মুক্তি—বুঝি না কিসে তোমাদের উন্নতি—ইহার পরিণাম কি, পরিণতি কোথায়! কেবল অনুভব করি সাধারণ ভাবে সংসারের সুখদুঃখে আমার সুখদুঃখ। দুঃখ আমার আত্মাকে লইয়া নহে, বর্ত্তমানের দুঃখ আমার দেহকে লইয়া,—এই রক্তমাংস প্রভৃতির আধার দেহই আমার—তোমরা বলিবে মোহে—বলিবে মায়ায় আমি মুগ্ধ—কিন্তু আমি দেহ লইয়াই অস্থির। দেহের সুখ বিধানই আমার চেষ্টা। মনের কথা খুলিয়া বলিতেছি—শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবে ঘোর পাপী, অজ্ঞান অন্ধ আমি। কিন্তু তুমি না উপদেষ্টা, সংস্কারক,—তোমার নাসিকা কুঞ্চিত

করিবার কোন অধিকার ? সহানুভূতি যে তোমার মহামন্ত্র। পতিত উদ্ধার নাকি তোমার ব্রত ;—ব্রতচ্যুত হইও না। দেহসর্ব্বস্ব আমি —বাঙ্গালার বারো-আনা, তাঁহার দেহরক্ষার উপায় কর। দেহের সুস্থতার বিধান করিয়া আত্মার অনুভূতি জাগ্রত কারাও। ক্ষুদ্রকে রক্ষা করিয়া ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব তাহার ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া তাহার স্বার্থ অবিকৃত রাখিয়া তাহাকে বুঝিতে দাও তাহার প্রাণে মহাপ্রাণ! তাহার আত্মস্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে রক্ষা করিতে হইবে দশের স্বার্থ, পরিবারের বন্ধন, সমাজের বন্ধন, সম্প্রদায়ের কল্যাণ আত্মকল্যাণ, জাতির উন্নতিতে আত্মউন্নতি। ধীরে ধীরে শনৈঃ শনৈঃ স্তরে স্তরে সোপানের পর সোপানে আমাকে সহানুভূতিতে আপ্লুত করিয়া তোমার পথে উন্নত কর। অকৃতজ্ঞ নহি আমরা, বুঝিতে পারি যদি মঙ্গল তোমার উপায়ে, কেন তোমার অনুগামী না হইব ? তোমার অনুগামী হইবার শক্তি যাহাতে আমার হয়, তাহার ব্যবস্থা কর সর্ব্বপ্রথমে। তোমার মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার বল আমায় দাও নতুবা তোমার উক্তি, তোমার যুক্তি যাহাই হউক আমার নিকট তাহা প্রলাপ বাণী। নিজের অশেষ দুর্দ্দশায় আমি পাগল হইতেও পাগল, কেন আর হুজুগে মত্ত হইয়া আমাকে অধিকতর উন্মত্ত করিতে চাও ; নিত্য শুনিতেছি সহ্য করাই নাকি শক্তি, অসহযোগীতাই নাকি জাতির জীবন, সে জীবন-মধু—সে অমৃত আমার হৃদয়ে কিরূপে সঞ্চারিত হইবে জানি না। শক্তিহীন আমি। আশা কর আমাতে ক্ষমা ? কোন কালে শক্তিহীন করিতে পারিয়াছে ক্ষমা ? শক্তিহীনের ক্ষমা যে ক্ষমা নহে, সে যে কাপুরুষতা। সে যে দুর্ব্বলের নিরুপায় হইয়া পড়িয়া পড়িয়া মরিয়া হইয়া আঘাত সহ্য করা। বাঁধিয়া মারিলে মার না খাইয়া আর উপায় কি ? আমাদের এই মার খাওয়া, এই অনন্ত নির্য্যাতন সহ্য করা, মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত অনুভব করিয়াও নিষ্ক্রিয় থাকা—আমাদের অসহযোগ ক্ষমা নহে তাহা ; ক্ষমতার অভাব, দুর্ব্বলতা। দোহাই তোমাদের আমাদের এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা আমাদের ভাবে কর, শক্তি অর্জ্জনের ব্যবস্থা কর প্রথমে,—অসহযোগই যদি আমাদের হয় মুক্তির একমাত্র উপায়, জাতীয় জীবন গঠনের একমাত্র পথ, তাহা হইলে যাহাতে আমরা প্রকৃত অসহযোগীতার আচরণ করিতে পারি, সে শক্তি অর্জ্জনের শিক্ষা আমরা লাভ করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা হউক, নতুবা সমস্তই বৃথা—সকলই নিষ্ফল। ঘৃণার সহিত বলিবে যে, 'যাহারা মহৎকার্য্য করিতে গিয়া অর্দ্ধাশনে ক্লিষ্ট প্রিয়জনদের কথা মনে করে, ঋণভারে দলিত পিষ্ট হইয়া উৎসাহহীন হয়—When they think

of their half starved families and their crushing debts—তাহাদের পক্ষে দেশসেবা বিড়ম্বনা।' জানি বিড়ম্বনা কিন্তু দেশের বারো আনা এই বিড়ম্বনাকেই যখন জীবন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তখন বারো আনার ভাবকে তুচ্ছ করিয়াছে মহৎ! হে চারি আনা! কি করিয়া তোমরা উন্নত করিবে দেশকে! তোমরা আত্মভাব বিভোর হইয়া বলিতেছ "এ কষ্ট সহিতেই হবে, এ অভাব চিরন্তন জেনে এর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতেই হবে। যে তা পারবে না তার এ পথে আসবার প্রয়োজন নাই, তার পথ ভিন্ন।" তাহা হইলেই তো তোমরা দেশের বারো আনার কেহ নও—বারো আনার পথ ভিন্ন, তোমাদের পথ ভিন্ন; তবে অভিন্নতা কোথায়? তোমাদের মহৎ উক্তির সার্থকতা কি? ভিন্নের কথা মুখে আনিও না, ওকথা মুখে প্রচার করিও না—আত্মশক্তির মহিমা প্রচার করিতে গিয়া বিস্মৃত হইও না আত্মশক্তি বারো আনা শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা শক্তি নামের অযোগ্য, তাহা অহঙ্কারীর উক্তি। দশকে লইয়া শক্তিসঞ্চয় কর, দশের শক্তির অনুযায়ী শক্তিবর্দ্ধনের উপায় করিয়া দেশকে শক্তিশালী করিতে পার যদি তাহা হইলে একতা সাম্যে মৈত্রীতে প্রেমে হইবে মুক্তি। নতুবা মহৎ উক্তি সুউচ্চ যুক্তি শুনিয়াও কেউ শুনিবে না, বুঝিয়াও কেউ বুঝিবে না, অনুভূতির অভাবে যে তিমিরে আজ আমরা দিশাহারা পথভ্রান্ত তাহাই থাকিয়া যাইব।

সাময়িক প্রসঙ্গ

——:*:——

কোচবিহারে বর্ষা বর্ষণ-বারিতে; নিম্ন বঙ্গের ন্যায় এদেশে নদীতে বান দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না; পাহাড়ে বৃষ্টির আধিক্য হইলে পাহাড়িয়া নদীতে বান ডাকে। কয়েক দিনের জন্য নদী-

গুলি পূর্ণ হয় ; খরস্রোত বহিতে থাকে। প্রবল স্রোতবেগে ক্ষুদ্র বৃহৎ কত কাষ্ঠ ভাসিয়া আসে। নদীর আকার ভীষণ হয়, তীরভূমি প্লাবিত হয় কিন্তু তাহাতে শস্যের ইষ্টানিষ্ট তেমন নির্ভর করে না। বৃষ্টিই এদেশে শস্যের সম্বল। এবারে বৃষ্টি বেশ হইতেছে, বাঙ্গলার তুলনায় বৃষ্টিপাত এখানে অনেক বেশী। এক দিন ৪ ঘণ্টায় প্রায় ১১ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়াছিল ; বাঙ্গলায় এরূপ বৃষ্টি হইলে নারায়ণ বটপত্রে ভাসেন, হাহাকার উপস্থিত হয়। জুলাই মাসে বৃষ্টির পরিমাণ ৩৪·৭৮ ইঞ্চি, শস্যের খুব উপকার হইতেছে।

* * *

খাদ্য দ্রব্যের মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। উষ্ণা চাউলের মণ ছিল ৬৷৷০ টাকা এখন ৭৷৷০ টাকায় উঠিয়াছে। তেল ⁄১।০ সের। কোচবিহারের তেল উৎকৃষ্ট, ১৫ বৎসর পূর্ব্বেও টাকায় ⁄৩৷৷০ সের বিক্রয় হইত! স্থানীয় মৎস্য দুষ্প্রাপ্য, চালানী ইলিসের উপর নির্ভর। তরিতরকারীও অগ্নিমূল্য।

* * *

গোবধের কথা কোচবিহারে বড় শুনা যাইত না। এ বিষয়ে এ রাজ্যে আইনের কড়াকড়িও ছিল। এখন নাকি কেহ বাদী না হইলে গোহত্যা আইন আমলে আসে না। আমরা আইনের সংবাদ তেমন জানি না কিন্তু দেখিতে পাইতেছি এখন আর গোবধ গুরুতর অপরাধ রূপে বিবেচিত হইতেছে না। মুসলমানগণ প্রকাশ্যে পারিবারিক উৎসবে পর্য্যন্ত গোবধ করিতেছে। ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে দেশের যে অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা বিবেচ্য। একেই ত এবারে গোবংশ গো-মড়কে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার উপক্রম ; তাহার উপর আবার যদি এরূপ ভাবে গোবধ হয় তাহা হইলে চাষী প্রজার দশা কি হইবে? বর্ত্তমানের আমোদ-উৎসব ভোগ-বিলাস লইয়াই দেশের অপরিণামদর্শী বারো আনা মত্ত, তাহারা ভবিষ্যতের ইষ্টানিষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। অদূরদর্শী কৃষক বর্ত্তমান আমোদের নেশায় তাহারা যে নিজেদেরই মরণের পথ পরিষ্কার করিতেছে তাহা তাহারা বুঝে না। যাঁহারা বুঝেন, তাহাদের ইষ্টানিষ্ট যাঁহাদের বিধি-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষিত হইলে এঅনিষ্টের প্রতিকার হইতে পারে।

ইহার প্রতিকার চেষ্টায় প্রথমেই হয় ত কথা উঠিবে ধর্ম্মের প্রশ্ন ; কিন্তু ধর্ম্ম ত আজ নূতন করিয়া মাথা তুলিতেছে না বরং সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ক্ষুদ্রতা পূর্ব্বেই ছিল, বর্ত্তমানে তাহা সর্ব্বতোমুখী হইয়া চলিয়াছে সুতরাং এ অবস্থায় ব্যবস্থা হইতে পারে।

বিগত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে উদার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সভাপতি সত্যই বলিয়াছেন—"হিন্দু মুসলমানের এ লড়াই ধর্ম্মের লড়াই নহে প্রকৃতপক্ষে উহা অধর্ম্মের লড়াই ; ধর্ম্ম উহার মূলে নহে—ধর্ম্ম-বিদ্বেষই উহার মূলে।"

* * *

এই যে দিল্লীতে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গাম হইয়া গেল, বিংশ শতাব্দীতেও যে অমানুষিক কাণ্ড, নরনারী হত্যা, গর্ভিণীর গর্ভবিদারণ—কি পৈশাচিক বীভৎস কাণ্ড, ভারতের রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে আচরিত হইল, তাহার মূলে কি ?—বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ-বহ্নিতে ছারখার হইয়া ভারত আজ মহা শ্মশান ! সেই শ্মশানে নিরন্ন নির্ব্বস্ত্র শিক্ষাবির্জ্জিত মূঢ় আমরা আবার কি মোহে নরকের নিম্নতম প্রদেশে নিমজ্জিত হইবার জন্য উন্মত্ত ! হিন্দু মুসলমান—ভারতের সন্তান, ভাই ভাই এ দুর্দ্দশার দিনেও কি বুঝিবে না আপনাদের পরস্পরের মধ্যে কি সম্পর্ক, কিসে তাহাদের মঙ্গল।

* * *

কলিকাতায় গো-হত্যা।—নিখিল ভারত গো-রক্ষিণী সভার সভাপতি হাইকোর্টের জজ মিঃ গ্রীভসের অনুরোধে ডাঃ মরেণো কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ট্যাঙরার কসাইখানা পরিদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন যে, বিগত ৭ই মার্চ তারিখে তিনি উহাতে ৩০০ গরু, ৫০ মহিষ ও ২৫টী বাছুরকে জবাইর জন্য রাখা হইয়াছে দেখিতে পান। ঐ দিন জবাইয়ের সংখ্যা কম ছিল। অন্যান্য দিন উহা অপেক্ষা বেশী পশু জবাই হয়। ষাঁড়ের মূল্য বেশী বলিয়া গাভী অধিক ছিল এবং তাহার ভিতর গাভীর সংখ্যাই বেশী ছিল। সংবাদ যে বৎসরে যতগুলি গরু জবাই হয়, উহার শতকরা ৭৬টীই গাভী এবং উহাদের অধিকাংশই ফুকা দেওয়ার ফলে অকর্ম্মণ্য। ভারতের একমাত্র কলিকাতা সহরেই দৈনিক এত গোহত্যার সংবাদে সকলেই চমকিত হইবেন এবং ঐ হত্যার মূলে আমাদের গোয়ালাদের ফুকা দিয়া গরুকে দুগ্ধহীন করা। অথচ এই গোয়ালারা হিন্দু—জলআচরণীয়—কোন পুণ্যে ?

গো-হত্যা সম্বন্ধে মহাত্মার বাণী। *

যদিও আমি স্বীকার করি যে, গোরক্ষা হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান কথা, সকল সম্প্রদায় এবং সমগ্র হিন্দুসমাজই উহা চায়, তবুও এই কারণে মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষের ভাব আমি উপলব্ধি করিতে পারি না। ইংরেজদিগের জন্য প্রত্যহ যে গোবধ হইতেছে, সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলি না। কিন্তু কোনও মুশলমান গোহত্যা করিলেই আমরা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠি। গো-মাতার নামে যে সব দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, উহা দ্বারা বৃথাই শক্তি অপচয় হইয়াছে। উহা দ্বারা একটি গরুকেও রক্ষা করা যায় নাই, বরং উহাতে মুশলমানেরা আরও রাগিয়া যাওয়াতে গো-হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দুরা গত বিশ বৎসর যাবৎ বিশেষ চেষ্টা করিয়া যাহা না করিতে পারিয়াছেন, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মুশলমানগণের চেষ্টায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী গরু রক্ষা পাইয়াছে। গো-রক্ষা আমাদের নিজেদের ভিতর হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত। জগতে আর অন্য কোনও স্থানেই ভারতবর্ষের মত গরুর প্রতি এত অযত্ন করা হয় না। গাড়োয়ানরা ক্লান্ত বলদগুলিকে লাঠির আগার লোহা দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে খোঁচায় দেখিয়া অনেক সময় আমার চক্ষে জল আসিয়াছে। আমাদের গো-মহিষাদি আধপেটা খাইয়া থাকে, ইহা সত্যই আমাদের কলঙ্কের কথা। হিন্দুরা বিক্রী করে বলিয়াই গরুর গলায় কসাইয়ের ছুরি পড়ে। ইহা দূর করিবার সাধু এবং প্রকৃষ্ট পন্থা—মুশলমানদিগকে বন্ধুভাবাপন্ন করিয়া গো রক্ষার ভার তাহাদের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া। গো-মহিষাদির খাদ্য, পশুক্লেশ নিবারণ লুপ্তপ্রায় গো-চারণ মাঠগুলির পুনরুদ্ধার, গো-প্রজননের উন্নতিবিধান, দরিদ্র গো-পালকদিগের নিকট গো ক্রয় এবং পিঁজরাপোলগুলিকে আত্মনির্ভরশীল আদর্শ গোশালায় পরিণত করার দিকেই গোরক্ষা সমিতি-গুলিকে বেশী মনোযোগ দিতে হইবে। আমি যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, হিন্দুরা যদি উহার কোনও একটা করিতে উপেক্ষা করে, তাহা হইলে তাহারা ভগবান এবং মানুষ উভয়ের নিকটই পাপী হইবে। তাহারা যদি মুশলমান কর্ত্তৃক গো-হত্যা বন্ধ করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তাহাদের কোনও পাপ হইবে না। কিন্তু গো-রক্ষা করিতে যাইয়া তাহারা যদি মুশলমান-দিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের গুরুতর পাপ হইবে।

দৈব-দুর্ব্বিপাকেও এবার আমরা কম বিপন্ন নহি। এ দিকে যে বঙ্গে লোক পানীয় জলের অভাবে হাহাকার করে সেই বঙ্গে অসময়ে অত্যধিক বন্যায় হাবুডুবু খাইতেছে। সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ বারি-গর্ভে নিমজ্জিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেক স্থলে গৃহাভ্যন্তরে পর্য্যন্ত জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া অধিবাসীবর্গকে কিরূপ বিপন্ন করিয়াছে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কল্পনা করিবার নয়। বিপন্নগণ নিরন্ন; ভবিষ্যতের অন্নের আশাও কম, শস্যাদি বন্যার জলে নিমজ্জিত। দেশের অবস্থা ভীষণ!

দক্ষিণত্যেও ভীষণ বন্যা। কাবেরীর জল বৃদ্ধি পাইয়া ভবানী ইরোদ প্রভৃতি স্থান প্লাবিত করিয়াছে, বহুগ্রাম জলমগ্ন। রেলগাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়াছে ত্রিচিনপলী সহরের অধিকাংশ স্থানেই জল উঠিয়াছে। স্থানীয় জোসেফ কলেজ, ন্যাশন্যাল কলেজ প্রভৃতির কতকাংশ জলে ডুবিয়া যাওয়ায় বিদ্যালয়গুলি বন্ধ দিতে হইয়াছে। বন্যা পীড়িতের অনেককেই এই সকল গৃহে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

* * *

এত জলেও বহুস্থানে পানীয়জলের অভাব। আমাদের কোচবিহারে অবিরত বৃষ্টিপাতের জন্য অধিবাসীগণ অতিষ্ঠ কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে তাহাতে পানীয় জলের অভাব দূর করিতে পারে না। বর্ষার পঙ্কিল অপরিস্কার জল অনেকগ্রামের সম্বল। গ্রীষ্মকালে অনেক স্থানে সামান্য মাত্র গর্ত্ত খুঁড়িয়া পল্লীবাসী পানীয় জলের ব্যবস্থা করে; সে পানীয়ে কোনক্রমে তৃষ্ণা নিবারিত হইলেও তাহা নানা প্রকার রোগবীজে-দুষ্ট। সরকারপক্ষ হইতে পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য বহু চেষ্টা হইলেও কার্য্যতঃ তাহা ফলবতী হয় নাই। রাজ্যময় কূপ খননের জন্য সরকার হইতে বাৎসরিক দশ সহস্রের অধিক মুদ্রা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া বহু কূপ খনন করা হইয়াছিল এবং সে চেষ্টা এখনও হইতেছে কিন্তু উপযুক্ত পরিদর্শন ও সংস্কারের অভাবে কূপগুলির দশা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে সরকারের সাধু উদ্দেশ্য নিষ্ফল করিতেছে। অধিবাসীবর্গেরও এদিকে দৃষ্টি নাই। তাহারা জল পরিস্কার রাখিবার চেষ্টা ত করেই না বরং তাহা নানা প্রকারে কলুষিত করিয়া সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হইলে সেই সেই স্থানে সরকার হইতে নলকূপের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা যায় সেগুলি রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টাই

হয়। এদিকে পল্লীর শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া আবশ্যক। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় কোন সরকারের চেষ্টায় কোন বিষয়ের প্রতিকার সম্ভব নহে, অধিবাসীগণের চেষ্টাই প্রধান।

প্রবাসীর পত্র।

—:§:—

Aix-les-Bains,
France,
16 –7—24

আমি ও আমার তিনজন সহপাঠী বন্ধু আজ ১০।১২ দিন হ'ল এখানে এসেছি, এ স্থানটি ফ্রান্সের মধ্যে এবং ফরাসী সীমান্তে অবস্থিত, চারদিকে কেবল উঁচু পাহাড়। পাশে একটা সুন্দর হ্রদ আছে। এই হ্রদের পাশে বসেই ফরাসী কবি লামার্তিন তাঁর অনেক বিখ্যাত কাব্য ও উপন্যাস রচনা করেছেন।

এখানে দুটো গরম জলের ঝরণা আছে (Mineral spring) যাতে করে গন্ধকময় জল আসে। এই জলে স্নান করলে বাত ও তার আনুসাঙ্গিক সমস্ত ব্যাধি সারে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে প্রকাণ্ড স্নানাগার নির্ম্মিত আছে। সেখানে রুগীদের জন্য স্নানের সময় ব্যায়াম ও Msasage (গা টিপে) দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কোন কোন ঘরে গরম বাষ্পের সাহায্যে স্নান করানো হয়। এই জন্য দূর দেশ থেকে অনেক লোকের সমাগম হয়। এখানকার ডাক্তাররা রুগী দেখে তার কি রকম স্নান দরকার ব্যবস্থা করেন, আমাদের দেশে এইরকম ঝরণা কত যায়গাই না আছে, ভুবনেশ্বর, উত্তকামণ্ড প্রভৃতি স্থানের নাম আমরা জানি; কিন্তু সেখানে যদি এই রকম সুব্যবস্থা করে দেওয়া হত, তবে সে সব স্থানের কত আয় বৃদ্ধি হত। ফরাসী দেশে এই রকম জলের ঝরণা অনেকই আছে; সেখানে আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্থান থেকে রুগীর আমদানী হয়।

জার্ম্মাণীর 'কার্লসবাড' এই জন্যই জগদ্বিখ্যাত। আমরাও এখানে এই ঝরণার জলে স্নান করি।

এখানে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে দুটো 'ক্যাসিনো' রাখা হয়েছে। সেখানে প্রচুর সঙ্গীত ও আমোদ প্রমোদ এবং জুয়ো খেলার ব্যবস্থা আছে। ফরাসী দেশে এই জুয়ো খেলার ব্যবস্থা করে যে অর্থশালী ইংরাজ ও আমেরিকানদের প্রকাশ্যে দোহন করার ব্যবস্থা করেছে; সেই ভেবে ভয়ানক ঘৃণা হয়; এই সব ক্যাসিনোর চার পাশে সুন্দর বাগান আছে। এখানে প্যারী থেকে

খুব ভাল গায়ক গায়িকারা আসেন; কারণ যত বড় বড় লোকের আমদানী এই সব স্থানেই হয়।

আমরা যাঁর বাড়ীতে আছি, তাঁর স্বামী সরকারী কায করতেন, যুদ্ধে বোধ হয় মারা গেছেন। তাঁর তিন কন্যা আছে। তাঁদের সঙ্গে আমাদের খুব আলাপ হয়েছে। আমাদের দেশে একটা ধারণা আছে যে ফরাসী মেয়েদের মধ্যে নৈতিক বন্ধন তেমন দৃঢ় নয়; কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিবাহের পূর্ব্বে মেয়েদের যার তার সঙ্গে যাওয়া নিষেধ। এমন কি যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করা হয়েছে তার সঙ্গেও দেখা করা প্রায় ঘটে না। সেদিন এঁদের একজন বলছিলেন যে, 'যে মেয়ের ভাই না থাকে তার কষ্টের অবধি নেই, কারণ সে অন্য কারও সঙ্গে গিয়ে নৃত্য গীতে যোগ দিতে পারে না।'

ফরাসীদেশ ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক গরীব, এদের সামান্য মজুর ও চাষীদের ঘর বাড়ী ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক খারাপ ও দারিদ্র্যব্যঞ্জক; এখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনেক কম; মজুরদের অবস্থা ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক খারাপ; কারণ এখানে রবিবার ও অন্য পর্ব্বদিনেও মজুরদের পরিশ্রম করতে দেখেছি। ফরাসীজাত ইংরেজদের মত গম্ভীর নয়,—ভয়ানক বেশী কথা বলে; হাত পা নেড়ে অঙ্গভঙ্গী করে বক্তব্য বুঝিয়ে দেয়। এরা কালোর সঙ্গে তফাৎ করে না; কিন্তু এদের সাধারণ কুলি ও মজুরদের ইংলণ্ডের মত তেমন Commercial honesty নাই; পথিককে ঠকাতে পারলে ছাড়ে না, কিন্তু এরা খুব মিশুক, আমরা যে বাড়ীতে আছি তার সকলের সঙ্গে এমন আলাপ হয়ে গিয়েছে যে ইংরাজ পরিবারে অনেক দিন থেকেও তেমন হয় না। আমাদের ম্যাদাম বলেন যে তোমরা আমার ছেলেদের মত। আমাদের একজনের টেনিস খেলায় হাতে আঘাত লেগেছিল। ম্যাদাম প্রত্যহ তার হাত ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছেন, একদিন যদি আহার একটু কম হয়েছে অমনি বলে উঠেন, মুশিয়ো তালুকদার তোমার কি অসুখ করেছে? হয়ত স্বভাবের এই সরলতার জন্য এদের চরিত্রে ইংরেজদের মত গাম্ভীর্য্যের স্থান পায় নাই।

এদের ভিতরে ভিতরে ইংরাজ বিদ্বেষ আছে; এরা বলে যে জগতে যেখানে যা কিছু সুন্দর বের হল, অমনি ইংরাজ তাকে নিতে ছুটল, এদের নিজের দেশেরই এই অবস্থা হয়েছে। এখানে যে সব ভাল ভাল হোটেল আছে, তা ইংরাজ ও আমেরিকানে ভর্ত্তী। এখানে অনেক সুন্দর যায়গা আমেরিকানরা কিনে নিয়ে বাড়ী তৈয়ার করেছে। সুতরাং ইংরাজ বিদ্বেষ হওয়া আশ্চর্য্য নয়, এদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল লেগেছে এদের কালোর উপর বিদ্বেষ না থাকায়। বাস্তবিক এই চঁচু চপল জাতের মধ্যে যে ফরাসী বিপ্লবের মত অগ্নি লুকানো ছিল, নেপোলিয়ান জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিশ্বাস হতেই চায় না। এরা দেশের নামে যে কি করে প্রাণ দিতে ছুটে যায়, দেশকে

সব চেয়ে বড় মনে করে তা ভাবতে গেলে এদের উপর যথেষ্ট ভক্তি হয়। কিন্তু এদের সামান্য সামান্য বিষয়ে সাধুতার অভাব, কর্ম্মে শিথিলতা প্রভৃতি দেখে অশ্রদ্ধাও হয়।

আমরা গরমে অস্থির হয়ে পড়েছি।

মাখন।

গ্রন্থ সমালোচনা।

অরুণিমা।—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। কাব্যগ্রন্থ ১৬ পেজি ১৩৯ পৃষ্ঠা। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। কাগজের মলাট—মূল্য ৸৹ আনা। বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি হইতে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন পাঠকপাঠিকার নিকট অপরিচিত নহেন, তাঁহার—'অরুণিমা'ও অপরিচিত নহে; ইহার অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ও আদৃত হইয়া তাঁহাকে যশস্বী করিয়াছে। গ্রন্থখানি নানা বিষয়ক বহু সুকল্পিত কবিতায়পূর্ণ; কবিতাগুলি সরল, স্বচ্ছ;—বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। লালিত্য মাধুর্য্যে, ছন্দের ঝঙ্কারে পাঠকের মনকে ভাবের টানে আকৃষ্ট, তন্ময় করিবার শক্তি কবির যথেষ্ট। স্বভাব বর্ণনায়, সৌন্দর্য্য সমাবেশে কবি সিদ্ধহস্ত।

'আলোর ভাতি, পাখীর গীতি, ঋতুর অভিনয়—
যা দেখেছি যা পেয়েছি সবই বুকে রয়।'

বুকের কথা, প্রাণের ব্যথা, দুঃখমধু, কারুণ্যের আনন্দ, অনুভূতি ছন্দেবন্ধে মুখরিত করিয়া 'দুখের সুখে প্রাণের যোগে' কবি গাহিয়াছেন—

'কাব্য লেখা—দুঃখে শুধু আঁকা,
তীব্র হিমে আগুন কাছে রাখা।
আঘাত খালি জিইয়ে তোলো প্রাণ,
দুখের বেগে আনন্দে গাই গান।'

গান গাওয়া তাঁর স্বার্থক হইয়াছে। কবি সংসারের ভিতর দিয়া মনে প্রাণে প্রার্থনা করিয়াছেন,—অজানার আকুল সন্ধান,—পরম জ্ঞানকে,—আনন্দকে; উক্তি তাঁহার—

'সত্য মিথ্যা কিছু নাহি চাই,
ভেঙে ভেঙে ভেসে ভেসে যাই।'

পরবর্ত্তী কালে তাঁহার এ মতিগতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বেন। সময়ের প্রভাবে, রাজধানীর কলরবে, স্বদেশীর, নরনারায়ণ ব্যাখ্যার যুগে যুগধর্ম্মী হইতে গিয়া সংসারের কথা, দশের ব্যথা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিলেও কবি আপনার চরম-লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁর প্রাণ চাহিয়াছিল—ঝাঁপায়ে পড়িতে মুক্তি পারাবারে ; টুটিয়া ভাঙ্গিয়া তিনি ছুটিতে চাহিয়াছিলেন—

'ভুবনের জীবনের সবার ওপারে।'

কবি কলিকাতার কোলাহলে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সমাজের অত্যাচার, সংসারের অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া উত্তপ্ত হইয়া সরোষে গাহিয়াছেন—

মার্ ধনীকে, চুরির মালে
লুট করে দে ফেলে,
লক্ষ পেটের অন্ন যাহা
লক্ষে দে তা ঢেলে।'
নেইক ধনী, সবাই সমান,
ধনীরে কর দীন।
বিলিয়ে দিয়ে অর্থ তারি
চুকিয়ে দে সব ঋণ।'

এ গানে প্রাণ থাকিলেও কবির আদি সুউচ্চ আদর্শকে হীন করিয়াছে। কবির এ অবস্থা থাকুলের সহিত তুলনীয়।

স্মৃতিপূজা—শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী, বাণীবিনোদ প্রণীত। কবিতা গ্রন্থ : ১৩ পেজি, ২৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ৵০ আনা। প্রকাশক হিতৈষিণী সভা, পুরাতন চক, বর্দ্ধমান। বিশেষত্বহীন।

(নব পর্য্যায়)
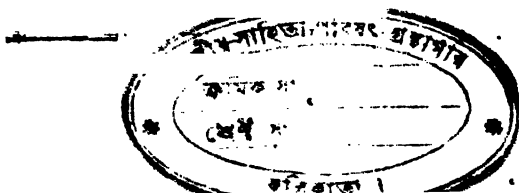
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৮ম বর্ষ। ভাদ্র, ১৩৩১ সাল। ১০ম সংখ্যা।

স্মৃতি-ছবি।

প্রীতি-ভরা স্মৃতি-ছবি,—
সবি তা'র প্রিয়তম।
সহজে কি ভোলা চলে,
রয় মনে বেশী কম!
কোনোটি মধুর ব'লে
র'য়েছে সবার-আগে,
কোনোটির রেখাগুলি
টানা যে অস্ফুট-দাগে;—
সুগ্রথিত সুখ দুখ
পাশাপাশি একদম!

মাতা পিতা পরিজন,
দিল-খোলা সখা-প্রাণ.
যত-মুখ, যত-কথা,
সব-হাসি, সব-গান,—
দুখ ও শোকের কথা
ভোলা ত যায় না মোটে,
সকলি র'য়েছে আঁকা
ছবি হ'য়ে হৃদিপটে ;—
এ আমার মন যেন
তা'রি চারু এলবম্ !

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

রাণী প্রভাবতী।

ঐতিহাসিক আলোচনার অভাবে কুচবিহার রাজবংশের ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রম সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ভিন্ন অতি অল্প লোকই সকল কথা অবগত আছেন। বেশী দিনের কথা নয় চারিশত বৎসর পূর্ব্বেই এই কুচবিহার রাজ্য এতদূর বিস্তৃত ছিল যে—ইহার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিলে সে অবস্থা অলীক বা স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। এক কালে প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ, ভুটান, আসাম, কাচার, জয়ন্তিয়া, মণিপুর, ত্রিপুরা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মহারাজ নরনারায়ণ ও তদীয় ভ্রাতা সেনাপতি শুক্লধ্বজের প্রতাপে উত্তরবঙ্গের নরপতি ও শাসনকর্ত্তৃগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিতেন, কথিত আছে সম্রাট আকবরশাহ গৌড়জয়কালে মহারাজ নরনারায়ণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়েই কুচবিহার রাজ্য সমৃদ্ধি ও

গৌরবের চরম সীমায় উপনীত হয়। কালের অমোঘ নিয়মেই সে গৌরব ও সে পরাক্রম আজ অস্তমিত কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বিস্মৃতির সুখ স্বপ্নে নিমগ্ন কুচবিহারবাসী গৌরবের সেই অতীতকাহিনী ভুলিয়াও স্মরণ করেন কিনা সন্দেহ।

ঐ গৌরবের যুগেই কুচবিহার রাজবংশের সহিত—রাজপুতনার মহাপরাক্রান্ত রাজবংশের এক বিবাহ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। মহারাজ নরনারায়ণের কন্যা প্রভাবতী প্রসিদ্ধ মারবার রাজ্যের রাজলক্ষ্মীরূপে বরিত হইয়াছিলেন। ইতিহাস বিশ্রুত সম্রাট আকবরের বিশাল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ—মহারাজ মানসিংহ কুচবিহার রাজকন্যা প্রভাবতীর পাণিগ্রহণ করা—সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। এই রাণী প্রভাবতীই আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়।

শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাঠে আমরা অবগত হই যে মহারাজ মানসিংহ যখন বঙ্গে আগমন করেন—তিনি দুই জন বাঙ্গালী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বঙ্গের বারভুঞার অন্যতম কেদার রায়ের কন্যা প্রথমা এবং রাণী প্রভাবতী দ্বিতীয়া। মাড়ওয়ারী ভাষায় লিখিত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাণী প্রভাবতী বঙ্গের নৃপতি মল্লরাজের কন্যা। কুচবিহারের ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকায় জ্ঞানেন্দ্রবাবু এই সামান্য বৃত্তান্ত হইতে রাণী প্রভাবতীর পরিচয় নির্ণয় করিতে পারেন নাই এবং উক্ত গ্রন্থে স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন। ১৬১৪ খৃঃ যখন মহারাজ মানসিংহ ইহলোক ত্যাগ করেন,—তাঁহার ২০ জন মহিষী সহমরণে গিয়াছিলেন। রাণী প্রভাবতীও সহমরণে যান। জ্ঞানেন্দ্রবাবু আরও লিখিয়াছেন যে বাংলার ইতিহাস আলোচনা করিয়া মল্লরাজ নামে তৎকালের কোনও রাজার বিষয় তিনি অবগত হইতে পারেন নাই। আমাদের মনে হয় যে কুচবিহারের ইতিহাসকে তিনি তাঁহার আলোচনার বিষয়ীভূত করেন নাই;—যদি করিতেন তাহা হইলে অতি সহজেই তিনি জানিতে পারিতেন, তৎকালে যে মহাপরাক্রান্ত রাজা কুচবিহারের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন—তিনিই ইতিহাসে মল্লদেব নামে খ্যাত। মাড়ওয়ারী ইতিহাসে এই—"মল্লদেবকেই মল্লরাজ" নামে ভুল ক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে। মহারাজ নরনারায়ণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়

তাঁহার সভা-পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশেই তিনি "প্রয়োগরত্নমালা" নামক বিখ্যাত ব্যাকরণ প্রনয়ণ করেন। সেই ব্যাকরণের প্রথম অংশেই আমরা শ্লোক দেখিতে পাই তাহাতে মহারাজ নরনারায়ণকে মল্লদেব নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

"শ্রীমল্লদেবস্য গুণৈকসিন্ধোর্ম্মহী মহেন্দ্রস্য যথা নিদেশম্ যত্নাৎ প্রয়োগোত্তম রত্নমালা বিতন্যতে শ্রীপুরুষোত্তমেন।"

কামাখ্যার নাটমন্দিরের সম্মুখে রৌপ্যফলকের উপর যে লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে তাহাতেও মহারাজ নরনারায়ণের নাম—শ্রীমল্লদেবরূপে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়।

"কামাখ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে—শ্রীমল্লদেবো নৃপঃ।"

এতএব মহারাজ নরনারায়ণই যে শ্রীমল্লদেব নামধারী ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোনই কারণ নাই।

মহারাজ নরনারায়ণের জীবদ্দশায় এই বিবাহকার্য্য সংঘটিত হয় নাই। ১৫৯৩ খৃঃ বা তন্নিকটবর্ত্তী কোনও সময়ে এই শুভ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। বীরভ্রাতা শুক্লধ্বজকে তিনি আসামের বা পূর্ব্ব-কামরূপ প্রদেশ দান করেন। বর্ত্তমান বিজনী তুরাং ও বেলতলার জমিদারগণ শুক্লধ্বজের বংশধর। ১৫১৯ খৃঃ মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন—এবং নিজেকে মোগল সম্রাটের অধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কুচবিহারের ইতিহাস নামক প্রামাণিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের এই কার্য্যে তাহার আত্মীয় স্বজন সকলেই অতিশয় রুষ্ট হন এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের সহিত কুচবিহারের তৎকালীন রাজাদিগের সম্পর্ক শত্রুতামূলক ছিল না। এতদাবস্থায় কেবল মাত্র বশ্যতা স্বীকার মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের পক্ষে এমন কি গুরুতর অপরাধ হইয়াছিল যাহার জন্য তাহার আত্মীয়বর্গ বিদ্রোহী হইয়া উঠিবেন? আমাদের মনে হয় এই ঘটনার সঙ্গে আরও কিছু ঘটনা সংশ্লিষ্ট ছিল যে জন্য তিনি তাহার আত্মীয় স্বজনের রোষভাজন হইয়াছিলেন। সেই বিশিষ্ট কারণটার বিষয় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রবাবু অবগত হইতে পারেন নাই। মোগল সম্বন্ধে দোষ দুষ্ট মহারাজ মানসিংহের করে ভগিনী সম্প্রদান-রূপ বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন কার্য্য মহারাজের

আত্মীয়গণ বংশগৌরবের পক্ষে হানিজনক বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই এই গৃহ-বিবাদের সূচনা হয়। যে ঘটনাবর্ত্তে পড়িয়া মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের করে ভগ্নী সমর্পণ করেন সে অবস্থায় স্বীয় ক্ষমতা ও সিংহাসন রক্ষার জন্য ঐ কার্য্য ভিন্ন তাঁহার আর গত্যন্তর ছিল না। শুক্লধ্বজের বংশধর দুর্দ্ধর্ষ পূর্ব্ব আসামের অধিপতি পরীক্ষিতনারায়ণ মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রণকুশলতার অভাব জানিতে পারিয়া প্রবল শত্রু হইয়া উঠিলেন। নিজের অক্ষমতা ও দৌর্ব্বল্যের বিষয় মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন তাই বিপৎ কালে সাহায্য প্রাপ্তির আশা করিয়া মোগলের শরণাপন্ন হইলেন। তখন বাংলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন মহারাজ মানসিংহ। সিংহাসন নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মানসিংহের সহিত আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। হিতে বিপরীত ঘটিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই কার্য্যে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ তাহার বিপক্ষতাচরণ করেন। মহারাজ অনন্যোপায় হইয়া মানসিংহের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। এই সূত্রে মানসিংহের প্রেরিত মোগল সৈন্য কুচবিহার রাজ্যে প্রবেশ করে এবং বিদ্রোহ দমন পূর্ব্বক প্রভূত ধনরত্নসহ বাংলায় ফিরিয়া যায়। বাস্তবিক মহারাজ মানসিংহের প্রভাবেই কুচবিহারাধিপতি দিল্লীর সম্রাটের সহিত সম্মানজনক সন্ধি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় কৃত কুচবিহারের ইতিহাস অন্যান্য সকল বিষয়েরই উল্লেখ দেখিতে পাই কিন্তু এই বিবাহ সম্বন্ধের কথা সেখানে পাওয়া যায় না। কুচবিহারের আরও ২।৩ খানি ইতিহাস আলোচনা করিয়াও এ মতের পরিপোষক কোন খবর অবগত হইতে পারি নাই। তবে কি উপরে লিখিত রাণী প্রভাবতীর বিষয় আমাদের স্বকপোলকল্পিত? সৌভাগ্যক্রমে কুচবিহার State Libraryর বর্ত্তমান অধ্যক্ষ বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাকে Gait প্রণীত "A History of Assam" খানার অনুসন্ধান দেন। তাহাতে দেখিতে পাই যে—

"Lakshmi Narayan turned his attention the Muhammadans and in 1597 he declared himself a vassal of the Mogul Empire. In 1597 he gave a daughter in marriage to Rajah Mansingha, at that time the Governor of Bengal, and soon afterwards the latter sent a detachment into Koch Bihar to protect him."

Gait সাহেবের এই উক্তিতে প্রমাণিত হইল যে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ মহারাজ মানসিংহের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বিবাহ সম্বন্ধের উপরেই এই আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। Gait সাহেব বলিতেছেন যে লক্ষ্মীনারায়ণ কন্যা দান করিয়াছিলেন এখানেই তাঁহার সহিত আমাদের মত ভেদ দেখা যায়। আমরা বলিতেছি যে মহারাজ মানসিংহ লক্ষ্মীনারায়ণের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ইনিই রাণী প্রভাবতী।*

শ্রীঅশ্রুমন্ দাশগুপ্ত।

খেয়ার কড়ি।

——:•:——

জীবন ভরে উপায় ক'রে
মজুত কর্লে কত?
হিসেব ক'রে দেখ্না ওরে
সন্ধ্যা সমাগত।
পথের ধূলায় অন্ধ আঁখি
নূতন কুলায় যাবে পাখী
বাতাসটুকু থম্লে নকি
আস্বে নীরবতা।

* পরম শ্রদ্ধাভাজন ইতিহাসজ্ঞ শ্রীযুক্ত অমৃতনারায়ণ গুপ্ত বি-এ, মহাশয়ের অনুরোধে এই প্রবন্ধ লিখিলাম। এ বিষয়ের অনুসন্ধান ও আলোচনার পথ তিনিই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দেখাইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। লেখক।

ভাঙ্গা হাট　　　　সন্ধ্যা বেলা
সাঙ্গ আজ　　　　ধূলো খেলা
ঘাটে বাঁধা　　　　পারের ভেলা
তোর্　খেয়ার কড়ি কোথা ?

শ্রীজ্ঞানদাশঙ্কর সান্যাল।

বৌদ্ধ-দর্শন

যোগাচার।

(৩)

যোগাচার নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায় মাধ্যমিকগণের চারিটি সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজগতের শূন্যতাও স্বীকার করেন কিন্তু তাহারা অন্তর্জগতের শূন্যতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন জ্ঞান জগত, মনোজগত বা অন্তর্জগত শূন্যময় বলিবার কোন কারণ বা যুক্তি নাই বা থাকিতে পারে না। আত্ম প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান বা অনন্য পরতন্ত্র জ্ঞান স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য নতুবা জগত জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িবে অর্থাৎ সমস্ত জগতই অন্ধ হইয়া যাইবে। এই জন্যই ধর্ম্মকীর্ত্তি কহিয়াছেন, যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অস্বীকার করে তাহার পক্ষে কোন কিছু প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। আর একটু বিশ্লেষণ করিলেই যোগাচারগণের যুক্তির সহিত দেকার্ত্তের যুক্তি মিলিয়া যাইত। দেকার্ত্তে এক বিরাট শূন্যময় সংশয়কে ভিত্তি করিয়া জ্ঞান-মন্দির স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন সংশয় বা জ্ঞানকে অবিশ্বাস করা যায় না কারণ সংশয়ও এক রকম জ্ঞান, চিন্তা বা Consciousness বা মনের অবস্থা। সুতরাং

যোগাচার মতে অন্তর্জগত সত আর সব অসত্য বা শূন্য।

যোগাচার ও দেকার্ত্তে (Descartes)

সংশয় স্বীকার করিলেই জ্ঞান বা চিন্তা বা Consciousness স্বীকার করিতে হয়। যোগাচারগণও সেইরূপ বলিতে পারিতেন অন্তর্জগত বা জ্ঞান রাজ্য অস্বীকার করিতে পারি না, কারণ অস্বীকার করাও জ্ঞানের কার্য্য। সুতরাং যিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞান অস্বীকার করেন তাহার পক্ষে কোন কিছু প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও অস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, কারণ অস্বীকার করিলে তাহার মত স্ববিরোধিতা বা বিরুদ্ধ ভাষা (Self Contradiction) দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে।

বাহ্যজগত যে শূন্যময় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে এমন বিষয় বা বস্তু যে বহির্জগতে থাকিতে পারে না তাহা নিম্নলিখিত উভয় কোটিক প্রশ্ন বা দোরোখা যুক্তি বা Dilemma দ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যায়।

বাহ্য জগতের শূন্যতা সম্বন্ধে উভয় কোটিক প্রশ্ন

প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানের বিষয় হয় কোন বাহ্য বস্তু বা বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, নয় উহা কোন বাহ্য বস্তু বা বিষয় হইতে উৎপন্ন হয় না। প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানের বিষয় কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না কারণ উৎপন্ন বস্তু মাত্রই ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য বা অবাস্তব। প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানের বিষয় কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় না এ কথা বলা যাইতে পারে না, কারণ যাহা উৎপন্ন হয় নাই তাহা অলীক বা অবাস্তব। সুতরাং প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানের বস্তু বাস্তবস্তু নয়, অবাস্তবস্তু নয়, এবং সেই জন্য উহা শূন্যময়। প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানের বস্তু শূন্যময় হইলে বহির্জগতের বস্তু বা বিষয় শূন্যময় হইয়া পড়ে।

যোগাচারগণ আরও বলেন—তোমরা কি স্বীকার কর যে যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে যাহা আর বিদ্যমান নাই তাহা কি জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে এবং তাহা হইতে জ্ঞান কি উৎপন্ন হইতে পারে? যদি বাস্তবিকই তোমরা উহা স্বীকার কর তাহা হইলে তোমরা যে ভয়ানক বোকামী কর তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। কারণ কোন বস্তুকে যদি তুমি জ্ঞানের বিষয় স্বীকার কর তাহা হইলেই তোমাকে মানিতে হয় যে ঐ বস্তু বর্ত্তমানে বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বেই তুমি ঐ বস্তুটিকে অতীত বা অবর্ত্তমান ধরিয়া লইয়াছ। সুতরাং তোমার স্বীকারোক্তি হইতে ইহাই দাঁড়ায় যে একই বস্তু এক সঙ্গে অতীত ও বর্ত্তমান, যাহা

অতীত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান সম্ভব কিনা।

একেবারে অসম্ভব। সুতরাং তুমি কিছুতেই স্বীকার করিতে পার না যে অতীত বস্তু জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে অবিদ্যমান বস্তু জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে স্বীকার করিলে ইন্দ্রিয়াদি বস্তু যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না তাহাও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে স্বীকার করিতে হয়। [কেন স্বীকার করিতে হয় তাহা যোগাচারগণ বলেন নাই। চক্ষু এই ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা ঘট পট ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করি কিন্তু আমাদের নিজ নিজ চক্ষুকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। অবিদ্যমান বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য বিদ্যমান কিন্তু কার্য্যতঃ অবিদ্যমান ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি স্বীকার করিতে বাধ্য হই। অর্থাৎ অবিদ্যমান চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে কল্পনার সাহায্যে এই মুহূর্তে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে স্থাপন করিয়া ঐ ইন্দ্রিয় সমূহকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। যোগাচারগণ বোধ হয় এইরূপ যুক্তিই প্রদর্শন করিতেন।]

প্রত্যক্ষের বিষয় অবিমিশ্র বস্তু (= অণু) অথবা মিশ্র বস্তু হইতে পারে কিনা।

এই সম্পর্কে যোগাচারগণ আরও বলেন প্রত্যক্ষের বিষয় হয় মাত্র একটি অণু নয় বহু অংশ বিশিষ্ট একটি Complex বস্তু। প্রত্যক্ষের বিষয় যে বহু অংশ বিশিষ্ট Complex বস্তু হইতে পারে না তাহা, অংশ প্রত্যক্ষ করা হয় না সমগ্রটি প্রত্যক্ষ করা হয় এই উভয়-কোটিক প্রশ্ন দ্বারা যোগাচারগণ নিরসন করিয়াছেন। কি এই উভয়-কোটিক প্রশ্নের সম্পূর্ণরূপ কি তাহা মাধবাচার্য্য প্রকাশ করেন নাই। সম্ভবতঃ ঐ উভয়-কোটিক প্রশ্নটি নিম্নলিখিত আকার ধারণ করিবে। আমরা ঐ জটিল বা Complex বস্তুর হয় অংশ প্রত্যক্ষ করি নয় উহার সমগ্রটি প্রত্যক্ষ করি। আমরা কেবলমাত্র অংশ প্রত্যক্ষ

মিশ্র বা জটিল বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

করিতে পারি না, কারণ অংশ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সমগ্রটি প্রত্যক্ষ করিতে হয়। সমগ্রের সহিত অংশের তুলনামূলক প্রত্যক্ষ না হইলে অংশ অংশ নামের যোগ্য হয় না, অংশ সমগ্রের রূপ অর্থাৎ অণুর রূপ ধারণ করে। সুতরাং অংশ আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। জটীল সমগ্র বস্তুটিই আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না কারণ অংশ প্রত্যক্ষ না হইলে সমগ্র প্রত্যক্ষ করা যায় না এবং অংশ প্রত্যক্ষ না হইলে সমগ্র অণু হইয়া পড়ে। কারণ অংশ শূন্য সমগ্র অণু

অণুতে কোন প্রভেদ নাই, সেই রকম সমগ্রশূন্য অংশ আর অণুতে কোন প্রভেদ নাই। সেই জন্য জটীল বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

আবার অণুও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। কারণ অণু এত সূক্ষ্ম যে উহা প্রত্যক্ষীভূত হওয়া অসম্ভব। আরও একটি কারণ এই যে অণুর পক্ষে এক সঙ্গে অপর ছয়টি বস্তু বা ইন্দ্রিয়ের সহিত একত্রিত হওয়া অসম্ভব, অর্থাৎ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে একযোগে স্পর্শ করা অণুর পক্ষে অসম্ভব। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন এই ছয়টি আমাদের ইন্দ্রিয়। যদি অণুর সহিত এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ একযোগে সম্ভবপর হয় তাহা হইলেই যোগাচারগণের মতে অণু আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ সংযোগ সম্ভবপর হয় যদি অণুর ছয়টি দিক, কোণ বা পার্শ্ব থাকে। এই ছয় পার্শ্ব স্বীকার করিলে উহাদের এক একটি পার্শ্ব স্বতন্ত্র অণু হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ আমরা যে অণুর বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম তাহা ছয় ছয়টি অণুর সমষ্টি হইয়া পড়িবে। সুতরাং অণু প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না।

আমরা অণু প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে হইলে বস্তুর যে অপর ছয়টি বস্তুর সহিত একযোগে সংযুক্ত হইবার ক্ষমতা থাকা কেন প্রয়োজন তাহার যুক্তি মাধবাচার্য্য একেবারেই উল্লেখ করেন নাই। কি রকম যুক্তি দ্বারা যোগাচারগণের প্রদর্শিত উক্তি অনেকটা প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। আমরা জানি মন এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তুর সংযোগ না হইলে ঐ বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তু যে ভাবে সংযুক্ত হয় মনের সহিত উহা সে ভাবে সংযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যক্ষীভূত হইতে হইলে বস্তুর অন্ততঃ দুইটি বিভিন্ন প্রকারের দিক থাকা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় যদি একটি হইত তবে অণুর দুইটি দিক হইলেই চলিত। কিন্তু ইন্দ্রিয় একটি নয় পাঁচটি। প্রত্যক্ষীভূত বস্তু এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত একভাবে সংযুক্ত হইতে পারে না। চক্ষুর সহিত বস্তু যে ভাবে সংযুক্ত হয় কর্ণের সহিত ঐ বস্তু সে ভাবে সংযুক্ত হইতে পারে না। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য বস্তুর বা অণুর পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন দিক বা পার্শ্ব থাকা প্রয়োজন। সুতরাং মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইবার নিমিত্ত বস্তু বা অণুর ছয়টি বিভিন্ন প্রকার দিক বা পার্শ্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু

ইহা স্বীকার করিলে অণুর অণুত্ব আর থাকে না উহা ছয়টি বস্তুর সমষ্টি হইয়া পড়ে। সুতরাং যোগাচারগণ বলিতে পারেন অণু প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে সমষ্টি বা জটীল বস্তুও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং বহির্জ্জগতস্থিত কোন বস্তু বা বিষয় প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং বহির্জ্জগত যে শূন্যময় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

জ্ঞানের সহিত আলোকের উপমা।

এই সকল কারণেই যোগাচারগণ কহিয়াছেন জ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত আর কোন বিষয় হইতে পারে না। আলোক যেমন স্বপ্রকাশ অর্থাৎ আলোক যেমন নিজে নিজেকেই প্রকাশ করে জ্ঞানও তদ্রূপ আপনাকেই প্রকাশ করে। জ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। জ্ঞানের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা বহির্জ্জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। জ্ঞান রাজ্যের বহির্ভাগে জ্ঞান অতিক্রম করিয়া কোন জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে কোন তারতম্য বা পার্থক্য নাই, উভয়ই এক। জ্ঞান নিজেই আপনাকে প্রকাশ করে কাহারও সাহায্য গ্রহণ করে না।

জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় এক; ইহার প্রমাণ

জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় যে এক তাহা নিম্নলিখিত যুক্তি দ্বারা যোগাচারগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় যদি এক না হইত অর্থাৎ যদি তাহারা বিভিন্ন বস্তু হইত তাহা হইলে উহাদের মধ্যে কোন সংযোগ বা সংশ্রব থাকা সম্ভবপর হইত না, এবং কোন শক্তি দ্বারা উহাদিগকে একত্রিত বা সংযুক্ত করা যাইতে পারিত না! তর্কের খাতিরে উহাদের মধ্যে সংশ্রব স্বীকার করিলেও ঐ সংশ্রব চিরস্থায়ী হইতে পারে না, কারণ উহারা বিভিন্ন ইহা স্বীকার করার ফলে উহাদের মধ্যে একত্ব বা identity থাকিতে পারে না, এবং একত্ব না থাকিলে কোন সংশ্রবই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং আত্মা এবং আত্মজ্ঞান একই বস্তু, অর্থাৎ জ্ঞানাতিরিক্ত কোন আত্মা নাই। আত্ম প্রকৃতপক্ষে একটি চিন্তা বা idea মাত্র। তদ্রূপ নীল রং প্রভৃতি যে সকল ক্ষণস্থায়ী বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি সে সকল বহির্জ্জগত-বস্তু নহে, উহারা আমাদের জ্ঞান অথবা চিন্তা বা idea মাত্র।

জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় এক বলিয়া স্বীকার বা প্রমাণ করিলে প্রশ্ন উঠে—আমরা কেন ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করি? উহাদের একত্ব কেন আমরা অনুভব করি না? যোগাচারগণ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন—জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে যে অবকাশ বা পার্থক্য অনুভব করি তাহা আমাদের ভ্রম বা illusionএর জন্য। প্রকৃত পক্ষে উহাদের মধ্যে কোন অবকাশ নাই। অনেক সময় আমরা দুইটি চন্দ্র দেখিতে পাই যদিও প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র একটির অধিক নাই। এই রকম দুইটি চন্দ্র দেখা যেমন ভ্রমজনক তদ্রূপ জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে অবকাশ বা পার্থক্য অনুভব করা এবং তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া ভাবা ভ্রম বা illusionএর কার্য্য। নদীস্রোত যেমন অবকাশ বিরহিত জ্ঞান-স্রোতও তদ্রূপ অবকাশ শূন্য। তথাচ আমরা নদীস্রোতকে ভ্রমক্রমে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া ফেলি তেমনই আবার জ্ঞানস্রোতকে ভ্রমক্রমে বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া বসি। এই পার্থক্য বা বিভিন্নতার কল্পনার জন্যই আমরা ভ্রমে পতিত হই। সুতরাং যোগাচারগণের মতে জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানস্রোত অবকাশ রহিত, পার্থক্যশূন্য। ইহার আদি নাই, বোধহয় অন্তও নাই। অথচ মনের স্বভাবই এই জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়কে পৃথক করিয়া দেখা এবং পৃথক বলিয়া চিন্তা বা অনুভব করা। এইখানে প্রশ্ন উঠে—তবে কি যোগাচারগণ জ্ঞান-রাজ্যকে ক্ষণস্থায়ী বলিয়া স্বীকার করেন না? যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, যাহাতে পার্থক্য নাই অবকাশ নাই তাহাই কি নিত্যবস্তু নহে? পূর্বেই দেখা গিয়াছে নিত্যবস্তু বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন না। কিন্তু সার্ব্বজনীন ক্ষণস্থায়ীত্ব তাহারা স্বীকার করেন। সুতরাং এইস্থানে নিশ্চয়ই একটু গোলযোগ আছে বলিয়া বোধহয়।

জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে পার্থক্য অনুভব করি কেন।

ভ্রম বা illusionএর [illegible]।

জ্ঞান-রাজ্য ক্ষণস্থায়ী কি না?

যোগাচারগণের এ সিদ্ধান্তের উত্তরে প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন যোগাচারগণের তাহা হইলে ওয়ার পয়সা খরচ করিয়া বাজার হইতে রসগোল্লা কেনার দরকার নাই। ঘরে বসিয়া রসগোল্লার চিন্তা করিলেই তাহাদের রসগোল্লা খাওয়া হইবে পেটও ভরিয়া যাইবে। কারণ তাঁহারা প্রকৃত রসগোল্লা এবং কল্পিত রসগোল্লার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। তখন

প্রকৃত রসগোল্লা ও কল্পিত রসগোল্লার মধ্যে পার্থক্য।

কল্পিত রসগোল্লার রস, শক্তি ও হজমক্রিয়ার মধ্যেও কোন পার্থক্য নাই (ইউরোপীয় দর্শনে এইরূপ কথা আমরা ক্যাণ্ট, বার্কলি ও দেকার্ত্তের দর্শনে পাই)। প্রতিপক্ষের এই সকল কথার উত্তরে যোগাচারগণ কহিয়াছেন যদিও জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই তথাপি মন যে কেবল একই বিষয় কল্পনা করিবে বা একই রকম ভ্রমে পতিত হইবে তাহার কোন কারণ নাই। মন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর কল্পনা করিতে পারে এবং একই বস্তুর কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে করিতে পারে। চক্ষু রোগগ্রস্ত মানুষ কখনও এক গাছি কেশ ও একটু সূত্রের মধ্যে কোন তারতম্য দেখিতে পায় না, কখনও আবার উহাদের মধ্যে তারতম্য দেখিয়া বসে, কখনও আবার কেশগাছিকে ভাবে লাঠি আর লাঠিগাছকে ভাবে কেশ। সুতরাং কল্পনার ভিতর এবং ভ্রম বা Illusion এর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্য থাকার জন্যই যখন শুইয়া শুইয়া রসগোল্লার কথা ভাবি তখন রসগোল্লার কল্পনা এক মূর্ত্তি ধারণ করে আর যখন হাতে করিয়া রসগোল্লা মুখের মধ্যে স্থাপন করি তখন রসগোল্লার কল্পনা আর-এক-মূর্ত্তি ধারণ করে। সুতরাং তথাকথিত প্রকৃত রসগোল্লাও একটি কল্পনা বা Idea, আবার কল্পিত রসগোল্লাও একটি কল্পনা। সেই জন্য কল্পিত—রসগোল্লার রস, শক্তি ও হজমক্রিয়া এক হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন কল্পনার প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং প্রতিপক্ষের উক্তির কোন মূল্য নাই। সুতরাং বুঝা গেল যোগাচারগণের মতে এই অনাদি চিন্তা কল্পনার দ্বারা আহত হইয়া আপনাকে বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করিতে সক্ষম।

মহোদয়। উল্লিখিত চারিটি মহাসত্য সম্বন্ধে ক্রমাগত চিন্তা করিয়া মানব যখন কল্পনা-স্রোত বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-রাজ্যকে যখন বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন বিষয় রূপ ভ্রম বা Illusion হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হয় তখনই তাহার সমস্ত ভ্রম বা Illusion বিদূরিত বা নষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সে মহাজ্ঞান বা মহোদয় লাভ করিয়া বসে। হেমন্ত ঋতুতে পদ্ম সকল যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ মহোদয়ের শুভাগমন হইলে ভোগবাসনা বা তৃষ্ণার বিলয় হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানব নির্ব্বাণ লাভ করিয়া বসে। মুক্তিকোপনিষদে আমরা এই মহোদয় কথাটি পাই। সে মহোদয়ের ভাব

আর যোগাচারগণের মহোদয়ের ভাবের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। মুক্তিকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৭শ্লোকে দেখি—

উপায় এক এবাস্তি মনসঃ স্বস্য নিগ্রহে।
মনসোঽভ্যুদয়ো নাশো মনোনাশ মহোদয়ঃ॥

অর্থাৎ মনকে নিগ্রহ করিবার কেবল মাত্র একটি উপায় আছে। সেই উপায় হইল মনের অভ্যুদয়, আধিপত্য, অজ্ঞান, ভ্রম বা বাসনার নাশ। মনের এই বাসনা বা অভ্যুদয়ের নাশই মহোদয়।

ক্রমশঃ—

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

মানব।

—:*—

হে মানব! হে বিশ্বমানব!
উচ্ছ্বসিত প্রমত্ত গরব!
সভ্যতার নাগপাশে মর্ম্মে তব নিগূঢ় বন্ধন;
নিশিদিন, সীমাহীন, চিররুদ্ধ অস্ফুট ক্রন্দন,
বক্ষে তব উচ্ছ্বাসি' অপার—
নিদারুণ গুপ্ত হাহাকার!
ছুটি চলে যেতে চায়; দীর্ণ করি' মরম পঞ্জর;
থেমে যায় কণ্ঠহারা অর্দ্ধপথে আসি নিরন্তর!
পিঞ্জর-পিয়াসী তব হিয়া,—
মুক্তি আশে উঠে না জাগিয়া?

ক্ষণেকের তরে হেরি' সীমাহীন অপার আকাশ—
শিহরিয়া উঠো ভয়ে, ভাবিয়াছ তোমার পিয়াস
পিঞ্জরের প্রতি অণু মাঝে,
আকর্ষণ-সতত বিরাজে ;
ভুলিয়াছ সব সাধ, সব ভাষা মিথ্যার পরশে ;
অনিবার গন্ডী শুধু আকাড়িয়া রয়েছে হরষে—
রূপ, রস, গন্ধ পরশন,
লভিয়াছে তোমার মরণ !
সভ্যতার মহাযজ্ঞে প্রাণ তব অহুতি প্রধান
আপন কক্ষের তলে রচি নিজ দেবতার স্থানে !
—হে মানব ! হে বিশ্বমানব !
আজি তব মরণ উৎসব !

সহ নাই ঝঞ্ঝাবাত, ভিজ নাই বৃষ্টির ধারায়
মুক্ত অকাশের নীচে পোড় নাই সূর্য্যের আভায় !
বিহগের কলতানস্বরে ;—
বসুধার সঙ্গীত বিহরে !
স্রোতস্বিনী বক্ষমাঝে কখনও পড়নি ঝাপাসে
সন্ধ্যার অকাশতলে আপনারে ফেলনি হারায়ে !
কেমনে বুঝিবে মুক্তিকথা
অফুরন্ত আনন্দ বারতা ;
ছানি উঠে অই মহা-সৌন্দর্য্যের অনন্ত আগারে
মানবের আকিঞ্চন পুরাইতে শত শত ধারে !

—হে মানব ! হে বিশ্বমানব !
ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা এ স্বরগ ;

শিখ'নো কথার বুলি, গাহিয়াছ রচিত-সঙ্গীত !
কভু কি গো অশ্রুনীরে বুঝিয়াছ মরম-ইঙ্গিত ?
প্রাণ যাহা চাহে বার বার
ছলনায় ঢাকি' আনিবার ;
মিথ্যারে বরেছ নিত্য অপমান সর্ব্বস্ব বলিয়া
স্বার্থের প্রকারে রাশি অনিবার রচিয়া রচিয়া !
ভুবনের প্রাণ খোলা হাসি
কভু কি গো উঠেছে আভাসি ?
মর্ম্মের দহন ঢালি' কাঁদিতে কি পারিয়াছ আর ?
চাহ তুমি ; চেপে ধরে আনিবার সভ্যতা প্রাকার !
—হে মানব ! হে বিশ্বমানব !
রিক্ত তব মানস-সৌরভ !

বক্ষের উচ্ছ্বাস আসি' কণ্ঠপাশে হয় কণ্ঠহারা !
আনন্দ সঙ্গীত তাও সুরে গানে রচে নব-কারা !
অট্টালিকা প্রাসাদ প্রাঙ্গণ
রচে চিরপিঞ্জর-অঙ্গন !
কত গান, কত রস, অবিরত বিশ্ববক্ষে রয়েছে ছাপিয়া
ভুলে গিয়ে হিংসাবেষ, রাখো শুধু রাখো সঞ্জীবিয়া !

বিগ্রহের উল্লাস-পরশ,
ভুলায়েছে জীবন-তরস !
অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে রচো কত অশুভ জঞ্জাল
মাতৃস্নেহে ভাবিয়াছ যমদণ্ড নিয়ত ভয়াল !
—হে মানব ! হে বিশ্বমানব !
ভুলে গেছ ভুলে গেছ সব !

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

বিবাদ।

নিভাননিকে পড়া দেখাইয়া দিয়া সীতানাথ যখন বাসায় ফিরিল তখন রাত্রি ১২টা। ঘরের দরজায় পা দিয়া সীতানাথ ডাকিল “ভাই রমানাথ দোরটা খোল ভাই।” একবার দুইবার তিনবার ডাকার পর ভিতর হইতে ফোঁস ফোঁসানী শব্দ করিতে করিতে একটি যুবক দোর খুলিয়া দিয়া বিরক্তির স্বরে বলিল, “এখন বুঝি আসা হল ?”

সীতানাথ চোরের মত উত্তর করিল “হুঁ।”

রমানাথ আর একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল “বেশ ত, রাত বুঝি আর হয় না ! পড়তে বসলে দেখি ঘুম পায়, আর এখন ঘুম পায় না, না ?”

সীতানাথ কোনও কথার উত্তর দিল না।

রমানাথ বিদ্রূপের স্বরে আবার বলিল, “তবে খাওয়াটাও ওখান থেকে সেরে এলেই পারতে না, তাও বুঝি বাদ নেই ?”

এইবারে সীতানাথ হাসিল, বলিল “তাকি আর বলতে, তা নিশ্চয়।”

"তবে নাও এখন শোওগে। আর জালাতন ক'রো না।" এই বলিয়া রমানাথ দোর দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সীতানাথ গম্ভীর মুখে বলিল, "ভাই একটা কথা শোন না।"

বিরক্তির ভাবে রমানাথ বলিল, "এখন আমি তোমার কথা শুন্‌তে পারবো না। এত রাত্রে গল্প করবার সময় নয়। কাল শোনা যাবে।"

সীতানাথ বলিল, "তুই কেবল ঘুমুতেই দাস। কথা বল্‌তে সময়ই বা লাগবে কত। এই দোষ তোর সয় না।"

"আচ্ছা কি বল্‌বে বল দেখি, শুনি।"

"আজ ওবাড়ী পড়াতে গিয়ে শুনলাম নেত্তার বিয়ে।"

রমানাথ বিরক্তির স্বরে বলিল, "তা বেশ ত বিয়ে, তাতে তোমার কি? তাই বুঝি রাত বেশী করে এলে?"

"না না তা নয়। তবে শোনই না। ভাই ঐ নেত্তাকে আমার বড় পছন্দ হয়। তোর ত আত্মীয়, আমার।—" বাধা দিয়া রমানাথ বলিল, "তা বুঝ্‌তে পেরেছি, আর বল্‌তে হবে না। যখন তুমি আমার কাছ থেকে তার পড়ানর ভার জোর করে নিয়েছ, তখনই আমি তা বুঝতে পেরেছি। তুমি না হয় তাকে নিতে চাইলে, কিন্তু তোমার বাপমা তাতে রাজী হবেন কেন? নেত্তার বাপের অবস্থা ত তেমন ভাল নয়। তোমার বাপ যে তোমার বিয়ে দিয়ে বাড়ীতে দালান তুল্‌বেন।"

"তা তুলুন! তুমি আমায় দেবে কিনা তাই বল। তার পরে আমার বাপমার মত আমি জানবো। আমি রাজী হ'লে তাঁরাও রাজী হবেন।"

"বাধ্য হয়ে, না?"

"তা যেমনেই হোক।"

"বৌ নিয়ে খুব কাঁদাকাটিও হ'বে, না?"

"যাও তোমার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না।"

"নাই বা পারলে। তাতে তোমার কি?"

"তবে দেবে না?"

"না হয় দিলাম, কিন্তু সে যদি তোমায় না চায়।"

"আর যদি চায়।"

"আমি বেশ জানি সে তোমায় চায় না।"

সীতানাথ দাঁড়াইয়া জোরের সহিত বলিল, "তুমি বেশ জান, সে আমায় চায় না।"

"না সে চায় না।"

"চায় না! তবে ত ভাল কথা।"

সে রাত্রে দুইজনে আর কথা হইল না।

পরদিন ভোরে উঠিয়া সতীনাথ কাপড়, বিছানা গুছাইয়া যখন রওনা হয় তখন রমানাথ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলি এত ভোরে বিছানা, কাপড় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথা? বলি, একটা মেয়ে মানুষের আশায় হতাশে সন্ন্যাসী হয়ে চল্লে নাকী?"

সীতানাথ কোনও কথারই উত্তর দিল না। কেবল মাত্র বলিল, তোমার বিছানার উপরে দুইখানা বই রেখে গেলাম, ও-বাসায় দিও। আর জিজ্ঞেস করলে বলো আমি বাড়ী গেলাম। আর কোনও কথার অপেক্ষা না করিয়া সে দ্রুত পদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। পথে বেহারা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার মাথায় মোট দিয়া সীতানাথ বাড়ী অভিমুখে রওনা হইল।

পথে ধীরেনের সহিত তাহার দেখা। ইহারা সীতানাথের সহাধ্যায়ী। ধীরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি সীতুদা কোথায় যাচ্ছ?"

"বাড়ী যাচ্ছি।"

"বাড়ী যাচ্ছ ত জিনিষপত্র সব নিয়ে যাচ্ছ কেন? এখানকার বাস উঠালে কি?"

"এক প্রকার।"

"যাও দাদা, তোমরা ত আর আমাদের মত গরদা ছেলে নও। পরীক্ষা দিয়েছ, বাড়ী যাবে বৈকি। কিন্তু দাদা পাছে পড়ে আছি বলে যেন ভুলে যেও না।"

"না ভুলবো না।"

বৈকালে যখন রমানাথ নেভাদের বাড়ীতে গেল, তখন প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। রমানাথ নেভার দূর সম্পর্কীয় মামা।

রমানাথকে দেখিয়া নেভা বলিল, "এই ত মামার কথা বলতেই মামা এসেছেন। আচ্ছা মামা বল দেখি, চারিদিকে জল, আর তার মাঝখানে স্থল, তাকেই দ্বীপ বলে, না মাঝখানে জল, আর চারিদিকে স্থল তাকেই দ্বীপ বলে?"

রমানাথ মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল, কি জানি! মাষ্টারের কাছ থেকে শুনে নিও।

নেভার মুখখানি কালী হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কেন মামা, তোমার কি অসুখ করেছে?"

"না।"

"ছোট্ট একটি "না" শুনিয়া বিষন্ন মুখে নেভা উঠিয়া গেল।

রমানাথ নেভার বিবাহের কথা বলিতে আসিয়াছিল। রমানাথের নিকট বরপক্ষ চিঠি দিয়াছে, বিবাহ যত শীঘ্র হয় তাহারই চেষ্টা করিতে।

ঘরে ঢুকিয়া রমানাথ বলিল, দাদামশায়, এই যে নেভার বিয়ের চিঠি!

"কি লিখেছে তুমি পড়!"

রমানাথ বলিল, বিবাহের দিন শীঘ্র স্থির করতে লিখেছে।"

"বেশ, সেত ভাল কথা। পুরুতঠাকুর কাল এসেছিলেন, তা আমি কালশুদ্ধির কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, কাল বেশ শুদ্ধই আছে। আর বিবাহের ১০ই খুব ভাল দিন আছে। তারপরে আর দিন ভাল নেই। তবে তাদের তুমি লিখে দাও, এই ১০ই তারিখেই হয়ে যাক্।

রমানাথ বলিল, "তা ভাল ক'রে বুঝুন।"

"না, আমার আর ভাল করে বুঝ্‌তে হবে না। এই সাত দিনেই কাজকর্ম্ম সেরে নিতে বেশ পারবো, তাতে তোমার কোনও ভয় নাই।" রমানাথ 'আচ্ছা' বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৩)

আজ নিভার বিবাহ। মাষ্টার সীতানাথের আর কোনও খোঁজ খবর নাই। নিভা সাহস করিয়া রমানাথকে মাষ্টারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেও পারে না, কারণ তাহার লজ্জা করে।

মাষ্টারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে কেমন যেন একটা বাধ বাধ লাগে। মামা হয়ত বুঝিতে পারিবে, মাষ্টারকে আমার ভাল লাগে। খবর আপনিই আসিবে। তিনি যে আমায় ভালবাসেন।

রমানাথ সেদিন সকালে আসিয়া আবার বাসায় গিয়াছিল। সকল দিন গেল রমানাথের কোনও খবর নাই। বৈকালে রমানাথ একটি কাগজের তোড়া হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তোড়াটি নেভার হাতের কাছে রাখিয়া সে নেভার নিকটে বসিল। তোড়ার পিঠের লেখাগুলি নেভার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। নেভা দেখিল 'উপহার।' এ উপহার কে দিল? জিজ্ঞাসা করিবার শক্তি নেভার নাই। নেভার বড়দিদি সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল "ওগুলি বুঝি উপহার!" রমানাথ উত্তর দিল "হাঁ সিতুদা পাঠিয়েছেন।"

"এ বিয়েতে সেত আসিল না।"

"না সে আসতে পারবে না, লিখেছে তার বাপের অসুখ তাই আসতে পারলে না।"

"আজ এক জোড়া বালা ও সাড়ী পাঠিয়েছে।"

"বেশ ভাল। নেভার গুরু ত বটে। তাই নেভাকে পুরস্কার দিয়েছে।"

নেভা বেশ ভালই বুঝিল যে মাষ্টার তাহাকে পুরস্কার দিয়াছে। আর রমানাথও বেশ বুঝিল যে, নেভাকে পুরস্কারই দিয়াছে।

সীতানাথ বাড়ী আসিয়া শুনিল, নেভার বিবাহ তাহার মামাত ভাই শরতের সঙ্গে। নেভা সুখী হইবে না, ইহা ধ্রুব সত্য, কিন্তু তবুও কোন কথা বলা চলে না। কারণ তখন কথা পাকা হইয়া গিয়াছে। বিবাহ দুই একদিনের মধ্যেই। তখন সে নেভাকে ও রমানাথকে পত্র লিখিতে বসিল। নেভাকে লিখিল:—আর দেখা হইবে না। তুমি সুখে সংসার কর, ইহাই তাঁর কাছে প্রার্থনা। সামান্য কিছু পাঠাইলাম, দরিদ্রের আশীব বলিয়া গ্রহণ করিও। ইতি

তোমাদের মাষ্টার।

রমানাথকে লিখিল:—ভাই রমানাথ! তুমি আমায় বঞ্চিত করিলে! লোকে লোকের গৃহ বাঁধিয়া দেয়, আর তুমি কিনা তাই ভাঙ্গিয়া দিলে! আর তোমাদের সহিত দেখা হইবে না।

আমি আজ এখান হইতে রওয়ানা হইব, কোথায় যাইব বলিতে পারি না। যাক্ তাহার নিকট হইতে ত ছটো কথার প্রত্যাশাও রহিল না। তবে আর কাজ কি। তুমি আমায় বলিলে যে, সে আমায় চায় না। কিন্তু পরে তুমি বুঝিতে পারিবে সে আমায় চায় কিনা। নিজে ত সাগরেই ভেসেছি। চিঠির উত্তর আর দিও না। ইতি

তোমার সতুদা।

নেভা চিঠি পাইয়া স্তম্ভিত হইল। আর রমানাথ চিঠি পাইয়া কাঁদিল। ভাবিল, সত্যই আমি তবে গৃহ বাঁধিতে দিলাম না। নেভা যদি সত্যই তাহাকে ভালবাসে তবে উভয়ের দুঃখের মূল কি আমিই ?

(৫)

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। নেভার পিতা নেভাকে লইয়া পশ্চিম যাইবেন মনস্থ করিয়া কলিকাতায় দু'চারি দিন বাসের জন্য বাসা ভাড়া করিয়া নেভাকে ডাক্তার দিয়া দেখাইতেছেন। সঙ্গে রমানাথ ও নেভার দুই দিদিও আছেন। রমানাথ নেভার জন্য অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন। নেভার বিবাহ ভাল হয় নাই। বিবাহের সময় নেভার পিতা ঘড়ি চেইন দিতে পারেন নাই জন্য তাহারা আর নেভাকে লইয়া যান নাই। নেভার শ্বশুরঘর করা প্রায় সেই হইতেই সাঙ্গ হইয়াছে। নেভা ম্যালেরিয়ায় কাতর, তাই তাহার পিতা তাহাকে ডাক্তার দিয়া দেখাইয়া পশ্চিমে যাইবেন বলিয়া কলিকাতায় কয়দিন বাস করিতেছেন।

সেদিন ভোরে উঠিয়া নেভা বলিল, "মামা! চল না আজ দক্ষিনেশ্বর কালীবাড়ী দেখে আসি।"

রমানাথ বলিল, "চল যাই।" যাহাতে নেভাকে কিছু সুস্থ করিতে পারেন, এবং নেভার প্রাণে কিছু শান্তি দিতে পারেন, রমানাথের ধ্যান, জ্ঞানই এখন তাই। তাই রমানাথ কোনও বাদবিচার না করিয়াই বলিলেন, "চল।" নেভা প্রস্তুত হইল। পিতার নিকট অনুমতি লইতে গেল, পিতাও সম্মত হইলেন। সঙ্গে নেভার দুই দিদিও চলিল।

গাড়ী যখন দক্ষিনেশ্বরে পৌছিল, তখন বেলা ১২॥০টা; বাসা হইতে আহারাদি করিয়া যাইতে বেলা কিছু বেশী হইয়া গিয়াছিল। নেভা দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া বলিল, "মামা, বড়

তেষ্টা পেয়েছে।" রমানাথ জল আনিয়া দিল। জল খাইয়া নেভা দৌড়া দৌড়ি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কখন গাছের তলায় বসিতে লাগিল, আবার কখন বা গঙ্গার ধারে আসিতে লাগিল। পঞ্চবটীর তলায় বসিয়া নেভা বলিল, "মামা! সেই দিন, আর এই দিনে কত তফাৎ, না?" রমানাথ কথার উত্তর দিল না। নেভা আবার বলিল, "সে দিনে প্রাণে কত শান্তি ছিল, আর এখন তার বিপরীত। তখন সরলতা ছিল, এখন শুধু কুটিলতা, তখন বুকভরা আশা ছিল, আর এখন শুধু নিরাশা। কেমন মামা, সেই দিনই ভাল, না এই দিনই ভাল?" রমানাথ কোনও কথারই উত্তর দিল না, তথা হইতে উঠিয়া গেল। রমানাথ বুঝিল, প্রাণে প্রাণে বুঝিল যে সীতুদার কথাই ঠিক। নেভা বসিয়া গান গাহিতে লাগিল। তাহার বড় দিদি তাহার নিকটে আসিয়া বসিল।

যখন তাহারা বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন রাত হইয়া গিয়াছে। সকলেই আসিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীর গল্প, সে স্থানটীর গল্প করিতে লাগিল। রমানাথ একটি কথাও বলিল না। সে তার নিজের পড়িবার ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "সীতুদা তোমার কথাই ঠিক।" এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, সে তোমাকেই চাহিয়াছেন। কেন আমি তাহাকে তোমায় দিলাম না। আমার গতি কি হবে? সত্যই আমি তোমার সাধের সংসার ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। সত্যই আমি তোমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছি।

সে রাত্রি কি ভাবে যে কাটিল, তাহা সে বুঝিতেই পারে নাই। প্রাতে উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট মত সে ডাক্তারের বাসায় গিয়া রোগীর অবস্থা বলিয়া ঔষধ আনিল। তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজগুলি সে সমস্তই করিল, কিন্তু আজ তাহার মন কিছুতেই কোন কাজে বসিল না। সে যেন বাজে কাজ করিতেছে।

দুপুরের আহারের পরে তাহারা সকলে মিলিয়া গল্প গুজোব করিতেছে, এমন সময় দোরের সুমুখে একজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে যেন সকলেই চেনে, অথচ তবুও কেহ চিনিতে পারিল না। লোকটার চেহারায় কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুখে গাম্ভীর্য্যে ছায়া পড়িয়াছে। শরীর কালা হইয়াছে। চেনা ব্রাহ্মণের পৈতায় দরকার হয় না। নিভা দেখিবা মাত্রই চিনিল এবং তাহার দেহ মাটিতে লুইয়া পড়িল।

রমানাথ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, চিনতে পেরেছি। সীতুদা! আমায় ক্ষমা কর। না জেনে অপরাধ করেছি, ছোট ভাই বলে ক্ষমা কর। সীতানাথ বসিয়া পড়িল।

শ্রীমতী বাণী দেবী।

বন্ধন মুক্তি।

যবে তোমাতে হয়েছে আমার প্রকাশ
আমাতে তোমার আর,
তবে নামিয়া গিয়েছে পলকে আমার
বুকের সকল ভার।
ফিরেছিলে তুমি এসে পাছে পাছে
তাই তোমা আজি পেয়েছে হে কাছে,
তট ভুলে যাওয়া তরিটী আমার
ফিরিয়া পেয়েছি পার॥
আমি মালা গেঁথে বসি ভাবিতেছিলাম
দিব এ কাহার গলে
তুমি রামধনুরূপে উঠিলে ভাতিয়া
তাই মম হৃদি তলে।
ব্যথারে বরণ করেছিনু তাই
অন্তরে মম ব্যথা আজি নাই,
আসিয়া গোপনে তুমি সযতনে
ঘুচায়েছ আঁধার!
নামিয়া গিয়াছে পলকে আমার
বুকের সকল ভার॥

শ্রীস্ফটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রবাসের পত্র।

—:※:—

স্পিজ (সুইটজারল্যাণ্ড)
২৫শে আগষ্ট ২৪।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

ছোটমামা, অনেকদিন আপনার পত্র পাই নাই। আপনাকে পত্র লিখতে ভয় করে, কারণ সে-পত্রখানা অমনি 'পরিচারিকা'য় প্রকাশ করবেন, লেখক হতে সকলেরই ইচ্ছা করে; কিন্তু যখন মনের সে ইচ্ছাটা ছাপার অক্ষরে অসহায় ভাবে প্রকাশ হয়, তখন নিজের অক্ষমতা দেখে নিজেরই দুঃখ হয়, তখন সেই সব আশা একবারে চলে যায়।

আপনাকে Aix-les-Bains থেকে এক পত্র লিখি, স্থানটা বেশী একটু গরম হওয়ার জন্য ত্যাগ করি। একলা একলা Lake Geneva এর তীরবর্ত্তী Evian বলে একটা সহরে যাত্রা করি। ফরাসীভাষা কিছুই জানি না; কিন্তু পথে একজন বন্ধু লাভ হয়। তিনি এক ফরাসী ভদ্রলোক, আমার দুরবস্থা দেখে পথে সমস্ত বদলকরার জায়গায় নিজ হাতে আমার লাগেজ টেনে নিয়ে গাড়ীবদল করিয়ে দেন। নিজে অসাধ্য চেষ্টা করে আমার সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমেই নিজের এই পরিচয় দেন যে তিনি যুদ্ধে কামান চালাতেন। পথে একজন আর্জেনটাইনবাসীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি দেখতে অবিকল ভারতবাসীর মত, এমন কি আমার চোখেও তফাৎ ধরা পড়ে নাই। সেই জন্য আমি এখন বুঝছি কেন এখানে অনেক সময়ই জিজ্ঞাসা করে,—আমি কি আমেরিকা থেকে আসছি এবং অর্থশালী আর্জেনটাইনের লোক ভেবে আমাদের ঠকাতে দ্বিধা করে না।

আমি 'এভিয়াঁ'তে যে হোটেলে ছিলাম সেখানে ভয়ানক একলা পড়ে গিয়েছিলাম। ফরাসী-ভাষা সামান্য জানি; আলাপ করার উপযুক্ত নয়; কিন্তু তবু হোটেলের সকলে আমার সঙ্গে আলাপ করার ভয়ানক চেষ্টা করত। ভাগ্যে সেই হোটেলে একজন ইংরেজ পরিবার ছিলেন। মা, ঠাকুরমা ও দুই ভাই। ভাই দুজন Cambridge এ পড়ে। আমি অক্সফোর্ডে পড়ি, কাজেই আলাপ হতে দেরী লাগল না, কিন্তু এইখানে আমি ইংরেজ রমণীর স্নেহ কোমল হৃদয়ের পরিচয়

পেয়েছি। আমি একলা চুপ করে বসে থাকতাম দেখে তিনি নিজে উপযাজক হয়ে আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে যেতেন; আমার খাওয়ার কষ্ট দেখে তিনি নিজে হোটেলের কর্ত্রীকে বলে খাওয়ার ভাল বন্দোবস্ত করে দেওয়ান। ইংরেজ পরিবার ডিনারের পর একসাথে বসে; কিন্তু কেউ কার সঙ্গে কথা বলে না, চুপকরে পড়াশুনা করে। এই সব পথে ঘাটে অযাচিত সাহায্য পেয়ে আমার মনে সেই কথাটাই বেশী করে জাগছে যে মানুষ-মানুষের মধ্যে তফাৎ নাই। অনেক দিন পরে এই সব দেশের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসবে; তার সঙ্গে এই মানুষের সহজ প্রীতির মণিরত্নটুকুও বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবে যাবে।

'এঁভিয়াঁ' দেখতে খুব সুন্দর। সম্মুখেই তার জেনেভাহ্রদ, যাকে কবিতায় বলে "লেক্ লিমান" ঠিক অপর পারেই লোজান সহর দেখা যেত, হ্রদের চার পাশে আল্পস। এই হ্রদের বিষয়ে কত কবি যে কত লিখেছেন, বায়রণ এর তীরে বসে Childe Harold একখণ্ড লিখেছিলেন। এ যে দেখতে কি রকম সুন্দর তা বর্ণনা করা যায় না।

এভিয়াঁ থেকে ছুটলাম এখানে। এটা লেকটুনের উপর (Lake Thun), বার্ণ থেকে ২৫ মাইল; জগদ্বিখ্যাত Bernese Oberlandএর মধ্যে। চার পাশে কেবল পাহাড়, কিছু দূরেই আল্পসের বরফে ঢাকা সব সাদা শিখর দেখা যায়। আল্পসের এই সব দৃশ্য দেখার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে শত শত লোক গ্রীষ্মকালে আসে; শীতকালেও বরফের উপর নানা রকম খেলা (Winter-sport) এর জন্য এখানে অজস্র লোকের আমদানী হয়। অতিকষ্টে একটা হোটেলে স্থান পাই; কিন্তু হোটেলকর্ত্তা প্রথমেই বলে যে দুইদিনের জন্য আমাকে ঐ ঘর ছেড়ে দিয়ে আর একটা বাড়ীতে থাকতে হবে; কারণ এক American family তাকে টেলিগ্রাম করেছে যে প্যারীস থেকে তারা যাত্রা করেছে। সুতরাং তাদের স্থান না দিতে পারলে ছেলে পিলে নিয়ে ভয়ানক বিপদে পড়বে। আমি পরদিন অন্য হোটেলের চেষ্টা দেখি। কিন্তু প্রায় সব হোটেলই জবাব দেয়, কেউ বলে পনরদিন পর ঘর খালি হবে, কেউ বলে কুড়িদিন পরে। শেষে অতিকষ্টে একটা হোটেলে একটা ঘর পাই। হোটেলকর্ত্রী আমাকে বলে যে আধঘণ্টার মধ্যে হয় ত আর কেউ এসে পড়বে, এখানে শুনেছি নাকি হোটেলওয়ালাকে নিজে থেকে নোটিশ দিয়া যাত্রীদের তাড়াতে হয়, তা না হলে আর একদল tourists আসতে পারে না,

এখানে যাত্রীদের এত ভিড়। সুইটজারল্যাণ্ডের আর কোন ঐশ্বর্য্য নাই; প্রাকৃতিক দৃশ্যই হচ্ছে এদের জাতীয় সম্পদ (National wealth); এরা বিদেশীয়কে লুট করে বেঁচে আছে। সেই জন্যে সমস্ত জিনিসের দাম অত্যন্ত বেশী, বিদেশে চিঠি পাঠানোর খরচ খুব বেশী; রেলের ভাড়া খুব বেশী। এখানে তৃতীয় শ্রেণীতে সব কাঠের বেঞ্চি; কিন্তু ভাড়া আমাদের দেশের Second classএর চেয়েও বেশী। কিন্তু এই প্রচুর অর্থ ব্যয়ের বদলে এখানে যাত্রীরা যে সুবিধা পায় তা অন্য কোথাও মিলে না। পথে ঘাটে, হোটেলের সব দাসীরা পর্য্যন্ত ইংরাজী জানে, যাতে যাত্রীদের সুবিধা হয়, তাই এদের সর্ব্বদাই দৃষ্টির বিষয়। এমন সুব্যবস্থিত হোটেলে দেখা যায় না। এখানে এক এক ফ্যামিলি মিলে এক একটা হোটেল চালায়। হোটেলের কর্ত্তার গৃহিনীও সাধারণ Waitressএর মত পরিবেশন করতে লজ্জা পান না, এখানে খাওয়ার ঘরে সমস্ত waitress ঠিক সামরিক কায়দায় চলাফেরা করে। সকলে একত্র দাঁড়ায় তারপর Head waitressএর আজ্ঞা মত একসঙ্গে একটা ডিশ নিয়ে টেবিলে টেবিলে যায়; পরে সেটা খাওয়া হলে একসঙ্গে ভুক্তাবশিষ্ট প্লেট তুলে নেয়। এই রকম শৃঙ্খলা দেখতে বাস্তবিক বড় ভাল লাগে, আমি ইংলণ্ড কিম্বা ফ্রান্সে কোথায় এ রকম দেখি নাই। এখানে সকলকে একসঙ্গে খেতে হয়; অন্য দেশে যার যখন ইচ্ছা; আমি শুনেছি যে এ দেশে waitressদেরও ইস্কুলে যেয়ে এই সব কাজ কি করে সুচারুরূপে করতে হবে তা শিখতে হয়। সত্যি যে কাষ করতে হবে; তাকে ভাল করে করাই দরকার, তা সে যত ছোট হক না কেন।

এই হোটেলে কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ইংরেজকে স্বদেশে যেমন গম্ভীর ও আলাপে অনিচ্ছুক মূর্ত্তিতে দেখেছি, এখানে যেন অনেকটা সে ভাব কেটে গিয়েছে। আমার সঙ্গে আলাপ হবার হেতু হচ্ছে আমার অক্সফোর্ড থেকে আগমন। এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে চীৎকার করে ডেকে বল্লেন 'Nelly, look, here is a man from Oxford, সেই সঙ্গে আমাকে জানালেন যে তিনি Glasgow Uiversity man এবং তাঁর ছেলে Dulwich কলেজে পড়ছে, তাকে Oxfordএ পাঠানোর ইচ্ছা আছে। বাস্তবিক ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড কেমব্রিজ অসাধারণ সম্মানের যায়গা, প্রত্যেক পিতামাতার আকাঙ্ক্ষা যে ছেলেকে ঐ একটা স্থানে পাঠাতে হবে। এদের বিশ্বাস যে Oxford Cambridgeএ না গেলে ছেলে মানুষ হয় না। লেখাপড়া করুক আর নাই করুক যদি তিন চার বছর ঐখান থেকে দাঁড় টেনে, কি ফুটবল খেলে কি ক্রিকেট

হকি প্রভৃতি কোনটাতে একটা 'ব্লু' (Blue) নিয়ে আসতে পারে তবে যে কোন degreeএর চাইতে তা ভাল। এই Blue দেওয়া হয় সব সেরা খেলোয়াড়কে, আমি একজন ইংরেজ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি কেন অক্সফোর্ডে এসেছ। সে বলেছিল যে তার বাবা এখানে পড়ে যান এবং Dad has sent me to see life here. অক্সফোর্ডে জ্ঞান চর্চ্চা খুবই হয়, তার চেয়ে বেশী হয় শরীর চর্চ্চা এবং বৃটিশ জাতির অস্থি মজ্জাগত জাতীয় গর্ব্বের ও জাতীয় Conservatismএর চর্চ্চা, এরা third class degree পেলেই খুব খুসী, কিন্তু যখন সরস্বতীর দরজা থেকে জরীর তাজ না হোক গাধারটুপি মাথায় দিয়ে সংসারে ফেরে, তখন এই ছয় ফুট লম্বা তিন মন ওজনের সব ছেলেরাই সুদানের মরুভূমিতে কিংবা হিন্দুকুশের দুরন্ত পাহাড়ে Union Jack কামড়ে পড়ে থাকে।

একজন মহিলাকে দেখলাম রবীন্দ্রনাথের গোরা পড়ছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কেমন লাগছে। তিনি বললেন যে ভারতবর্ষীয়দের জীবনের বেশ মজার Picture, তবে বইখানা বড় discoursive (তর্কে ভরা)। তিনি আমাকে 'গোরা' সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁকে বললাম যে গোরা একখানা নভেল নয়, কতকগুলি সমস্যার সমষ্টি। সমস্যা গুলোকে গল্পের মধ্যে ফেলে দিয়ে চিত্তাকর্ষক করা হয়েছে। কবির দ্বিতীয় বইখানি 'ঘরে বাইরে'তে এটা আরও বেশী। কিন্তু গোরাকে শেষকালে কবি সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী করে Universal religionএ নিয়ে এসেছেন এটা আমার কাছে কেমন লাগে। কেন হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কি বিশ্বজনের আদর্শ নাই? আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের কাছে দেশ কাল, পাত্র, বিগত ইতিহাস পিতামাতা heridity ভয়ানক সত্যবস্তু। সে সমস্তকে কাটিয়ে উঠে যদি দেশের হিত করতে হয়, তবে সাধারণের পক্ষে তা অসম্ভব হবে, কিন্তু কবি কোন দোষ করেন নাই, কারণ তিনি স্রষ্টা, বিচারক নন, তাঁর কাছে যে আদর্শই ধরা দিয়েছে, তার রূপ তিনি দিতে পারেন।

আমার সঙ্গে আরও কয়জন ইংরেজের আলাপ হয়েছে। তার একজন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব সহানুভূতিপন্ন। তিনি বলছিলেন, দেখ আমাদের মস্ত দোষ যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, কারণ ভরতবর্ষ ত এই Switzerlandএর মত কাছে নয় যে ছুটিতে বেড়াতে এসে দেখে যাব, তিনি ভারতবর্ষে বাণিজ্য Protection করা হয়েছে সেই নিয়ে বললেন যে এতে ভারতীয়

ইংরাজ বণিকদেরই সুবিধা বেশী হবে। যদি যে ব্যবসাতে ভারতীয়দের টাকা খাটছে সেই সব সংরক্ষণ করা হয়, তবেই যথার্থ Protection হবে।

এখানে কাছেই সমস্ত সুন্দর সুন্দর বেড়ানোর যায়গা আছে। আমি সেদিন ১৪০০০ ফিট উঁচু আল্পসের এক শিখরে উঠেছিলাম। সেখানে কি ভয়ানক শীত! রেলের ভাড়াও কি ভয়ানক। পাঁচ মাইল পথের জন্য ৪০ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ ২৫৲ টাকা দিতে হ'ল। কিন্তু শিখরে পৌঁছিয়ে দেখি যে সমস্ত কষ্ট ব্যর্থ হয়ে যাবে, কারণ ভয়ানক বরফের ঝড় বচ্ছিল, কিছু দেখা যায় না, গাইডেরা আমাদেক বাইরে যেতে নিষেধ করল। একদল ঝড়ের পূর্ব্বে বের হয়েছিল, তারা ঝড়ের হাতে পড়ে একবারে শীতে অবসন্ন ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে; অতি কষ্টে তাদের উদ্ধার সাধন করা হয়। কাগজে দেখছি পরশু দিন ঐভাবে একজন জার্ম্মান ডাক্তার শীতে মারা গিয়াছেন, শিখরটার নাম Jungfrau (জুঙ্গফ্রাও) আমাদের সকলেরই মন এত খারাপ হল যে কি বলব, কয়েকজন আমেরিকান মহিলা তীব্রস্বরে নিজেদের দগ্ধ কপালকে নিন্দা করতে লাগলেন, অথচ আসবার সময় কি কষ্টই স্বীকার করতে হয়েছে। ৬ ঘণ্টা ট্রেণে গিয়েছি। তিন চার যায়গায় বদল। আবার এত ভিড় যে দৌড়িয়ে অন্য ট্রেণে না গেলে যায়গা পাওয়া যায় না। চার পাঁচখানা ট্রেণ এই রকম করে ইউরোপীয় ও আমেরিকান যাত্রীতে ভর্ত্তি হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এত কষ্ট সব ব্যর্থ হল, যাওয়ার সময় বেশ রোদ ছিল; কিন্তু শিখরে উঠেই Snowstorm আরম্ভ হল।

তারপর আবার পাঁচ ঘণ্টা ধরে শীতে ও বৃষ্টিতে ভুগে, ট্রেণে দাঁড়িয়ে ফিরে এলাম, তখন দেখি মেঘ কেটে গিয়ে Jungfrauএর উপর চাঁদের আলো পড়েছে, সাদা glacier গুলো ঠিক যেন চন্দ্রশেখরের জটাজালের মত দেখা যাচ্ছে। Jungfrau যেন ঠাট্টা করে বলছে, কিহে বাপু, কেমন মজা দেখলে। তারপর আমি আর Jungfrauএর দিকে তাকাতে পারি না; ওকে দেখলেই ভয়ানক কষ্ট হয়। কাল আবার ঐ দিকে একটা যায়গায় গিয়েছিলেম, সেখানে একটা জলপ্রপাত আছে; রাত্রে তাকে ২০০০০ Candle powerএর রংবাতি দিয়ে আলো করা হয়। 'জুঙ্গফ্রও'এর একটা ফটো নেওয়ার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু দেখি আমার পূর্ব্বশত্রু সমস্ত অঙ্গ মেঘে ঢেকে ফেলেছে, ঘণ্টা খানেক বসে থাকলাম, দেখি যদি মেঘ কাটে, কিন্তু নিরাশ হয়ে চলে যেতে হল। কিছুদিন হল Jungfrauএর উপর টেলিস্কোপ বসিয়ে পণ্ডিতেরা মঙ্গলগ্রহ দেখছেন,

এই সময় নাকি মঙ্গলগ্রহ (Mars) পৃথিবীর সব চেয়ে নিকটে হবে, এবং ২০০ বছরের মধ্যে আর অত নিকটে হবে না। মঙ্গলগ্রহে লোক আছে কি না, এবং বিনা-তারে তাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করা যায় কি না, এই সব বিষয়ে পরীক্ষা হবে। কিন্তু Jungfrau বিরূপ হয়ে বসল, কিছুতেই মেঘাবরণ সরিয়ে দিয়ে ভাল করে মঙ্গলগ্রহকে দেখতে দিল না। অবশ্য অন্যান্য স্থান থেকে তা দেখা হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে মজার হয়েছে Wireless নিয়ে। অনেকদিন থেকে পণ্ডিতেরা Wirelessএ একটা অদ্ভুত Signal পাচ্ছিলেন, যা পৃথিবীর কোন পরিচিত স্থান থেকে পাঠান হয় না। সেদিন লণ্ডনের একদল মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টায় Wirelessএ পিয়ানোর মোটা সুরের মত সুরের সঙ্গীত শুনতে পেয়েছেন! অবশ্য এটা মঙ্গলগ্রহের না হয়ে অন্যান্য গ্রহের কিংবা বিশ্বের Electric কোন অবস্থার জন্য হতে পারে। কিন্তু এ যেন সেই গ্রীক দার্শনিক পিথোগোরাসের (Pythogoras)এর Spheral musicএর মত, কিংবা আমাদের দেশের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত শব্দ 'প্রণব' নাদেরই প্রতিরূপ।

সেবক—মাখন।

নিবেদন।

—:*:—

ওগো চিরনির্ভর আলো
তোমারে বেসেছি ভাল,
এ হৃদয়ে শুধু বেদনা দৈন্য
কোথায় সেথায় প্রেমের চিহ্ন,
শুধু তুমি আছ নাহি তা ভিন্ন
ক্ষণিক ঊষার আলো
সে দোষ কাহার বল ?

জীবন মরণ জীবন শরণ
সবই অই প্রিয় বুকে,
ও-হৃদয়ে মোর সকল তীর্থ,
জীবনের গুরু গভীর অর্থ,
বুঝিয়া লওহে করোনা ব্যর্থ,
কিবা সুখে কিবা দুঃখে
সবই প্রিয় বুকে,
চঞ্চল ব'লে কোরনাকো হেলা
সে তোমারই প্রেমবায়,
প্রতি নিশ্বাসে পরাণের আশে
বিশ্বাস ভরি চিত্ত হরষে
আপনারে কে যে লুটাইতে আসে
তোমারই—চরণ চায় ;
রেখ তারে পায় ।
সব দিয়ে দেখ দাঁড়ায়েছি আজ
তোমার হৃদয় পাশে
কিছু নাই হায় কিছু নাই মোর,
সকলি নিয়েছ ও-হৃদয় চোর,
ছিঁড়ে দেছি দেখ পরাণের ডোর,
জান কি কিসের আশে ?
শুধু হৃদয়ের অভিলাষে ।
মনোমন্দিরে দেবতা আমার
বন্দী করিয়া লও ।

পাই বা না পাই ফুড়াইতে চাই,
ও-হৃদয় মাঝে দাও শুধু ঠাঁই,
বিশ্ব বাসনা কিছু নাহি চাই,
শুধু তুমি মোর হও,
জীবন ব্যাপিয়া জীবনের আলো
সেথা রও সেথা রও।

শ্রীনিমানন্দ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতনে।

বিগত বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় যাইবার পথে একদিনের জন্য বোলপুরে নামিব মনস্থ করিয়া ৬ই পৌষ রাত্রি ৭॥০ টার গাড়ীতে ভাগলপুর হইতে রওনা হইলাম। পূর্ব্বে আরও কয়েকবার শান্তিনিকেতনে গিয়াছি; কিন্তু পৌষ-উৎসবের সময় একবারও যাওয়া হয় নাই, তাই এবার সেই আক্ষেপ মিটাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। বদ্ধপরিকর বলিলাম এই জন্য যে অনেক চেষ্টা করিয়াও একজনও সঙ্গী জুটাইতে পারি নাই। পূর্ব্বে যখনই বোলপুরে গিয়াছি তখনই একাধিক সাথী লাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। আর এ সব জায়গায় একলা যাইতে মন সরে না। যে আনন্দ উপভোগ করিতে সেখানে যাওয়া, তাহা বন্ধুবান্ধবের সহযোগে হইলেই যেন সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু তথাপি নিরুদ্যম না হইয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনকে আমার গমনেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম, এবং যথা সময়ে যাত্রা করিয়া রাত্রি ৪ টার সময় বোলপুর ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম শান্তিনিকেতনের একটি মোটর ব্যস্ হইয়াছে; কাজেই আশা হইয়াছিল যে ট্রেণের সময় তাহা ষ্টেসনে উপস্থিত থাকিবে।

কিন্তু সেই পৌষ-প্রখর, শীত-জর্জ্জর, 'ঝিল্লী-মুখর রাতে' এরূপ দুরাশা করা যে আমার খুবই অসঙ্গত হইয়াছিল তাহা সেখানে পৌঁছিয়াই বুঝিতে পারিলাম। একটু ইতস্ততঃ করিয়া, অবশিষ্ট রাত্রিটুকু ওয়েটিংরুমে কাটাইয়া দিব ভাবিতেছি, ঠিক সেই সময়ে দেখিলাম আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীমান যদুগোপাল আমারই মত অবস্থায় পড়িয়া ওয়েটিংরুমের দিকে আসিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক আমাকে জানাইলেন যে তিনিও সেই পথের পথিক, শুধু তাহাই নহে, তিনি শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বতন ছাত্র। আমার সুবিধাই হইল। দুইজনে ওয়েটিংরুমে ঘণ্টাখানেক কাটাইয়া ভোর বেলা দুইজনে একসঙ্গে পাড়ি দিব এইরূপ স্থির হইল। এই সঙ্কল্প করিয়া বিশ্রামকক্ষে বিছানা পাতিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময়ে দুইজন মহিলা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বোলপুরে মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র ওয়েটিংরুম নাই। কাজেই তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে বাহির হইয়া আসিতে হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তাঁহারাও শান্তিনিকেতনে যাইবেন, এবং কোনরূপ যানবাহনের ব্যবস্থা না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। অনুসন্ধানে নিকটেই একখানা ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া গেল। সেই গাড়ীখানা মহিলাদ্বয়ের জন্য ঠিক করিয়া দিয়া আমরা দুইজনে তখনই পদব্রজে রওনা হইয়া পড়িলাম।

সেদিন শুক্লা চতুর্দ্দশী, তাই শেষরাত্রি হইলেও জ্যোৎস্নার অভাব ছিল না। 'সে শেষ যামিনীর হাসির আবেশ' আর সেই ঘুমন্ত প্রকৃতির স্তব্ধ সৌন্দর্য্য, উপভোগ করিতে করিতে দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শান্তিনিকেতন আশ্রমে যখন উপস্থিত হইলাম তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। আশ্রমে প্রবেশ করিতেই উপাসনারত আশ্রমিকগণের বৈতালিক সঙ্গীত আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া আমার সমস্ত শরীর মন এক অপূর্ব্ব অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিল। অনেকক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়াইয়া এই সঙ্গীত সুধা পান করিতে লাগিলাম। তখন মনে হইতে লাগিল, সত্যই যেন আমি প্রাচীন ভারতে কোন ঋষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এবং রাত্রিশেষে ঋষিকুমারগণের সামগান শ্রবণ করিতেছি। এদিকে সকাল হইয়াও আসিল দেখিয়া আমার পথ প্রদর্শক শ্রীমানের সাহায্যে ক্ষিতিমোহনবাবুর বাসায় গিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলাম। সেখানে মুখহাত ধুইয়া একটা আস্তানা করিয়া লইবার জন্য অতিথিশালার দিকে চলিলাম। অধ্যাপকগণ সপরিবারে উৎসবে যোগদান করিবেন, বলিয়া সমস্ত দিনই তাঁহাদের গৃহ ছাড়িয়া থাকিতে হইবে। দশ বৎসর পূর্ব্বে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার

প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহার যখন সম্বর্দ্ধনা হয় তখন যে ত্রিতল গৃহে আমরা কয়েকজন কবিবরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম সেই গৃহটি এখন অতিথিশালায় পরিণত হইয়াছে দেখিলাম। ইহারই নিম্নতলের একটি বৃহৎ কক্ষে একজন ভলন্টিয়ার কর্ত্তৃক আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। হাঁসপাতালের bedএর মত সেখানে দুই লাইনে সারি সারি ঘন সন্নিবিষ্ট অনেকগুলি লোহার Cot রহিয়াছে। তাহারই একটি আমি পাইলাম। আরও দুইজন অভ্যাগত সেখানে ছিলেন। এই ত্রিতল গৃহের আসেপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট তাঁবু ফেলা ছিল, কিন্তু দু'একটি ছাড়া প্রায় সবগুলিই খালি পড়িয়াছিল। বুঝিতে পারিলাম কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ অতিথি-অভ্যাগতের সমাগম আশা করিয়াছিলেন, সেরূপ হয় নাই। ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, এবং শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র সোম ব্যতীত অপর কোন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইয়া একটু নিরাশ হইয়াছিলাম।

এবার শান্তিনিকেতনে অতিথিসংকারের ব্যবস্থায় বেশ একটু নূতনত্ব দেখিলাম। বিশ্বভারতীর সভ্য ব্যতীত অপর সকলকেই আহারাদির জন্য পয়সা দিতে হয়, এবং তাহাও নিতান্ত কম নয়, দৈনিক দেড় টাকা করিয়া। আশ্রমের চিরাচরিত পদ্ধতির এইরূপ ব্যতিক্রম হইতে দেখিয়া একটু ক্ষুব্ধ হইলাম, এবং ইহা কি আবশ্যকতা ছিল তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বিশ্বভারতীর অর্থের খুব প্রয়োজন তাহা জানি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারত হইতে যেরূপ অর্থসাহায্য পাইতেছেন তাহাতে এই পাশ্চাত্য পন্থার অনুসরণ দ্বারা সামান্য মাত্র অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে গিয়া আমাদের ভারতীয় আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে মাত্র, বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই। যদি বিশ্বভারতীয় সভ্য ও অপর অভ্যাগতদিগের মধ্যে একটা পার্থক্য রাখাই এই ব্যবস্থার হেতু হয়, তাহা হইলেও ইহা সমীচিন হয় নাই।

যাহা হউক, টিকিট কিনিয়া চা-পান শেষ করিলাম, এবং বেলা সাতটার পূর্ব্বেই মন্দিরের মধ্যে গিয়া আসন গ্রহণ করিলাম। দেখিতে দেখিতে স্বল্প পরিসর মন্দিরটির ভিতর বাহির লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আজ আচার্য্য। ঠিক সাতটার সময় তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দাঁড়াইয়া একটি ক্ষুদ্র উপাসনা করিলেন। তার পরে তিনি আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নায়কত্বে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে এবং স্ত্রীপুরুষ সম্মিলিত কণ্ঠে এই গানটি গাওয়া হইল :—

প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুম গন্ধে
বিহঙ্গম গীতছন্দে তোমার আভাস পাই।
জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতিদিন নব জীবনে
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে,　　　খচিত নিখিল বিচিত্রবরণে
বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি।
চারিদিকে করে খেলা বরণ কিরণ জীবন মেলা,
কোথা তুমি অন্তরালে ?
অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়, অন্ত তোমার নাহি নাহি॥

সঙ্গীত শেষে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। তাঁর সেই উদ্দীপনা পূর্ণবাণী আজও এই এক বৎসর পরে আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। তিনি যখন প্রাচীন ভারতের ঋষির 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পুরস্তাৎ' এই অভয়বাণী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন তখন তাঁহার শান্ত সৌম্য বদনমণ্ডল এক অপূর্ব্ব দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। আর আমার মনে হইতেছিল বুঝিবা সেই প্রাচীন ঋষিদেরই একজন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, প্রভাতে পাখীর কলকূজন যেমন বনভূমি জাগ্রত করিয়া তোলে, জগতের, প্রভাতে তেমনই আমাদের ঋষিগণ জগৎবাসীকে জাগাইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'শোন, শোন, বিশ্ববাসী সকলে, তোমরা যে অমৃতের পুত্র।' আমরা সেই বাণী ভুলিয়া গিয়াছি, তাই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। আমাদের সৌভাগ্য যে বহুকাল পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মনে প্রাচীন ঋষিদের প্রচারিত সত্য আবার প্রতিভাত হইয়াছিল। আজ তাঁহার দীক্ষা দিনে আমরা সকলে এই শান্তিনিকেতনে সমবেত হইয়াছি। ইহাই হইল তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

তিনি নীরব হইলে আবার গান আরম্ভ হইল। সে গানটি এই --

প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠ্‌ল বেজে যেই,
নীড়-বিরাগী হৃদয় আমার উধাও হ'ল সেই।
নীল অতলের কোথা থেকে　　　উদাস তাকে করল যে কে
গোপনবাসী সেই উদাসীর ঠিক ঠিকানা নেই।

'সুপ্তি শয়ন আয় ছেড়ে আয়' জাগে যে তার ভাষা,
সে বলে 'চল্ আছে যেথায় সাগর পারে বাসা।
দেশ বিদেশের সকল ধারা সেইখানে হয় বাঁধন হারা
কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই॥

গান থামিলে রবীন্দ্রনাথ আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এবার তাঁহার বিষয় ছিল বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যবিবৃতি। তিনি বলিলেন—তিনি যখন ছোট ছোট ছেলেদের তাঁহার ক্ষুদ্র ইস্কুলটিতে প্রথমে আহ্বান করিয়াছিলেন তখন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা। তারপরে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মনে বিশ্বভারতীর কল্পনা জাগিয়া উঠিল এবং ইহার প্রয়োজন যে কত বেশী তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক সুললিত ভাষায় বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বক্তৃতান্তে গীতাঞ্জলির সেই সুপরিচিত গানটি 'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে' গীত হইল। পরে পরে আরও দুইটি গান হইল। প্রথমটি এই—

জয় হোক্ জয় হোক্ নব অরুণোদয়
পূর্ব্ব দিগঞ্চল হোক্ জ্যোতির্ম্ময়।
এস অপরাজিত বাণী অসত্য হানি,
অপগত শঙ্কা, অপগত সংশয়।
এস নব জাগ্রত প্রাণ, চিরযৌবন জয় গান।
এস মৃত্যুঞ্জয় আশা জড়ত্ব নাশা
ক্রন্দন দূর হোক্ বন্ধন হোক্ ক্ষয়।

তার পরে 'কর তাঁর নাম গান যতদিন রহে এই প্রাণ' এই গানটি গাহিতে গাহিতে সকলে মন্দির হইতে অবতরণ করিলেন। গায়কদল সপ্তপর্ণী তলে উপস্থিত হইয়া এই বৃক্ষটিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

আমি এইবার শান্তিনিকেতনের একটি ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া যাহা কিছু দর্শনীয় আছে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কলা-ভবনের চিত্রশালা তখনও সাজানো হয় নাই, কাজেই তাহা দেখা হইল না। 'লাইব্রেরীও সে দিন বন্ধ ছিল। নূতন দ্রষ্টব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নূতন বাসভবন

সুবৃহৎ অট্টালিকা দেখিলাম। চারি বৎসর পূর্ব্বে বসন্তোৎসবের সময় যখন গিয়াছিলাম তখন ইহার অস্তিত্ব ছিল না। তখন একটি খড়ের ছাওয়া কুটির নির্ম্মাণ করাইয়া কবিবর তথায় বাস করিতেন। এখন তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। তারপরে ছাত্রাবাস, Work shop প্রভৃতি দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। বেলা তখন দশটা। স্নানাহার শেষ করিতে প্রায় বারটা বাজিয়া গেল। আহারের সময় বিশ্বভারতীর ফরাসী অধ্যাপক মসিয়ে বেনোয়া ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিয়া আমাদেরই সঙ্গে ভূমিতে বসিয়া খিচুড়ী খাইতেছিলেন দেখিয়া বিশেষ আমোদ উপভোগ করিলাম। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর মেলা দেখিতে গেলাম। তখনও ভাল করিয়া মেলা বসে নাই। স্থানীয় শিল্প, সুরুল শ্রীনিকেতনের কৃষি প্রদর্শনী, শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীর অঙ্কিত চিত্র এবং অন্যান্য কারুশিল্প প্রভৃতি অনেক জিনিষ এই মেলায় দেখিবার ছিল। এই মেলাক্ষেত্রের একদিকে যাত্রা হইতেছিল। খানিকক্ষণ বসিয়া যাত্রা শোনা গেল। আস্তানায় ফিরিয়া শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রকুমার ঠাকুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া ষ্টেশনে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। উৎসব আরও দুই দিন ধরিয়া চলিবে। কিন্তু আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাজেই এবার কবিবরের সঙ্গেও আলাপ করিবার সুযোগ ও সময় হইল না। অতিথিশালার সম্মুখেই শান্তিনিকেতনের মোটরবাস দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু যদিও তাহা ষ্টেসনে যাইবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল এবং আমি চালককে বলিয়া রাখিলাম যে আমিও একজন ষ্টেসন যাত্রী তথাপি আমি নিজের জিনিসপত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে গাড়ী চলিয়া গিয়াছে! আমার অবস্থা তখন রবীন্দ্রনাথের 'বিদেশী'র মতন। কবির বর্ণনা একটু পরিবর্ত্তন করিলে সেটা এইরূপ দাঁড়ায়:—

'ছাগো ষ্টেসনের পথে　　লবে কি তোমার রথে
আমারে? শুধায়ু এসে যেমান—
অমনি কথা না বলি　　মোটর সে গেল চলি
আমি হায় র'মু পড়ি সেখানেই।

হায় শান্তিনিকেতনের সেই প্রাক্-মোটর যুগ, যখন গরুর গাড়ীই ছিল আশ্রমের সাধারণ যান এবং যখন অতিথি অভ্যাগতগণ আশ্রমবাসিগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সেই গোযানে উঠিয়াই কত তৃপ্তি লাভ করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

মিলনে।

—:•:—

সারা জীবনের ব্যর্থ অন্বেষণে
প্রাণধনে ওরে—
খুঁজিয়া পেয়েছি আজ।
অন্তরদেবতা নহে রে অন্তর
বিরাজে অন্তর মাঝ।
মিলন-বাঁশরী শুনিয়া ধন্যা,
উথলিছে বুকে পুলক-বন্য',
ধন্য হইল জীবন আমার
সফল সকল কাজ।
সারা জীবনের ব্যর্থ অন্বেষণে
প্রাণধনে ওরে—
খুঁজিয়া পেয়েছি আজ।

দেখে দেখে রূপ মিটেনাক' তৃষা,
অধীর আনন্দে হারায়েছে দিশা,
দীন সাধনার আশু সার্থকতা,
ওরে হরিল সকল লাজ।
বহু অন্বেষণে প্রাণধনে ওরে
ধূলারেণুমাঝে—
কুড়ায়ে পেয়েছি আজ।

প্রেমময়ে প্রীতি মিলনসাধিকা,
গাঁথে দেববালা চিকণ মালিকা,
কৃতপ্রসাধন চন্দ্রমাকিরণে
ধরা'পরে ফুলসাজ।
বহু অন্বেষণে প্রাণধনে ওরে
সকলের মাঝে—
কুড়ায়ে পেয়েছি আজ।

নিখিলের স্মৃতি রূপরসগন্ধ,
মুছে যাক্ সব হয়ে যাক্ বন্ধ,
রুদ্ধ দুয়ারে প্রেম-আলাপন
গুঞ্জরি' উঠুক আজ।
সারা জীবনের ব্যর্থ অন্বেষণে
প্রাণধনে ওরে—
(আজি) পেয়েছি অন্তর মাঝ।

ভুঞ্জিতে চির ভূমানন্দ প্রশান্ত,
হলে নশ্বর জীবন-বাসর অন্ত,
ঊষার অরুণে তোমার ভবনে
লয়ে যেও রসরাজ।
সারা জীবনের বহু অন্বেষণে
জগত্জীবনে—
ওরে খুঁজিয়া পেয়েছি আজ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

সূর্য্যকিরণের গুণ।—যদিও ভারতবাসীকে বলিয়া দিতে হয় না যে সূর্য্যকিরণে থাকিলে তাহাদের উপকার হইবে কিন্তু এমন এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন সাধারণ সহরবাসী ব্যক্তিগণকে সূর্য্যকিরণের উপকারিতা সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ বর্ত্তমান কালে সহরবাসী ব্যক্তিমাত্রেই অফিসে কার্য্য করিতে যাইয়া দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময় গৃহের মধ্যে থাকিয়া কাটাইয়া দিতে বাধ্য হন; তাঁহাদিগের শরীরে সূর্য্যকিরণ লাগিবার উপায় থাকে না। ইহা ব্যতীত অল্প বেতনভোগী সহরবাসী ব্যক্তিগণের স্ত্রী পরিবার বৃহৎ অট্টালিকার পার্শ্বে রুদ্ধ গৃহে বাস করায় অট্টালিকার ছায়ায় থাকিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের গৃহে সূর্য্যালোক ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না এবং সহরে থাকার জন্য তাঁহাদিগের রাস্তায় বাহির হইয়া মুক্ত বায়ু সেবন করিবার সুবিধা হয় না; সেই জন্য কলিকাতার মতন সহরের স্ত্রীলোকের মধ্যে ক্ষয়রোগ এত প্রবল। এরূপ অবস্থায় এদেশবাসীকেও সূর্য্যালোকের গুণ সম্বন্ধে জানান প্রয়োজন হইয়াছে। ক্ষয় প্রভৃতি রোগে সূর্য্যালোকের কি অত্যাশ্চর্য্য গুণ তাহা সকলে জ্ঞাত নহে। এরূপ সুলভ ও সহজ প্রাপ্য চিকিৎসা কাহারও অবহেলা করা উচিত নহে। সেইজন্য সকলকেই সূর্য্যকিরণে যখন ও যেখানে সুবিধা সেখানেই কিয়ৎক্ষণ থাকা উচিত; এক ঘণ্টা অর্দ্ধ ঘণ্টা এমন কি কয়েক মিনট সূর্য্যকিরণ প্রত্যহ গাত্রে লাগিলেও উপকার হয়।

গাত্রে বাতাস ও সূর্য্যকিরণ লাগিলে যে উপকার হয় তাহার প্রধান করণ এই যে সূর্য্যকিরণ গাত্রে লাগায় যে ঘর্ম্ম উদ্গত হয় তাহাতে গাত্র হইতে অনেক পরিমাণ বিষাক্ত পদার্থ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। প্রকৃতির ইচ্ছাই এই যে এই বিষাক্ত পাদার্থ মুক্ত বায়ুতে বহির্গত হইয়া বাতাস ও সূর্য্যকিরণ লোমকূপে লাগিয়া উহা পুনরায় সতেজ ও বিষশূন্য হইবে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান সময়ে কি হইতেছে? শরীর হইতে যে জলীয় ভাবে বিষ বাহির হইতেছে তাহা আমাদিগের গাত্র বস্ত্র দ্বারা শোষিত হইতেছে ঐ গাত্রবস্ত্রে বায়ু লাগিতেছে না কিম্বা উহাতে আলোকও লাগিতেছে না, ইহা ব্যতীত লোমকূপের বায়ুস্পর্শে ঐ আর্দ্র গাত্রবস্ত্র সমস্ত-

ক্ষণ সংলগ্ন থাকায় উহা ক্রমাগত গাত্রে পুনরায় শোষিত হইতেছে ও তজ্জন্য রোগ হয় ও তাহার সহিত মনের অবসন্নতা, বিরক্তি ও মানুষের কষ্ট বাড়ে এবং এইরূপে মানুষের জীবন দুঃখময় হইয়া উঠে। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর সূর্য্যকিরণের কি প্রভাব ও তাহার প্রয়োজন কত অধিক তাহা এখন অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন। আমরা সূর্য্যেরকিরণেও ঐ কিরণ উদ্ভূত রাসায়নিক অবস্থার দরুণই বাঁচিয়া থাকি ইহা বিজ্ঞান সম্মত কথা। সূর্য্যকিরণ আমাদিগের গাত্রে গ্রীষ্মের সময় অধিক লাগে বলিয়া আমরা একটু বেশী কাল বর্ণের হইয়া থাকি কিন্তু যাহারা অল্প পরিসর রাস্তা বিশিষ্ট সহরে ছায়ার মধ্যে থাকে তাহাদের বর্ণ এই কারণে গাঢ় হয় না। কোন বিশেষ উপায় ও কারণে যাহা এখনও অপরিজ্ঞাত তাহাতে সূর্য্যকিরণ আমাদিগের পুষ্টি প্রদান করে ও রোগাক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

যাহারা স্বাস্থ্যবান তাহাদিগের সূর্য্যকিরণের দ্বারা তত অধিক লাভ না হইতে পারে কিন্তু যাহারা স্বাস্থ্যহীন ও রোগী তাহাদিগের পক্ষে ইহার প্রয়োজন ও আবশ্যকতা এত বেশী যে তাহা যতই বলা যায় ততই তাহা কম বলা হইল মনে হয়। ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য মনে হইতে পারে কিন্তু ইহা সত্য কথা যে সূর্য্যকিরণের অভাবে পরিপাক যন্ত্রকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয় ও সেজন্য উহা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহার কারণ হইল এই যে সূর্য্যের বেগুনী ও অতি-বেগুনী রশ্মি মানব শরীরে এরূপ প্রভাব বিস্তার করে যাহার জন্য চর্ব্বি প্রধান জিনিষ অধিক সেবন করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সূর্য্যকিরণের অভাব অথবা যে দেশে সূর্য্যকিরণ অল্প তথাকার অধিবাসীদিগকে অধিক পরিমাণে চর্ব্বি-প্রধান জিনিষ সেবনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত সহরবাসী প্রৌঢ় ব্যক্তির পক্ষে চর্ব্বি প্রধান জিনিষ হজম করা শক্ত। সহরবাসীগণই আজকাল অপেক্ষাকৃত কম সূর্য্যালোক পাইয়া থাকেন।

এই বেগুনী ও অতি বেগুনী রশ্মির মধ্যে এক আশ্চর্য্য ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও এই রশ্মি রাসায়নিক হিসাবে অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন তথাপি উহার কোন জিনিষ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করার শক্তি অত্যন্ত অল্প। আকাশে যদি অতি কম পরিমাণ ধূম থাকে তবে এই দুই রশ্মি তাহা ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। এমন কি সাধারণ জানালার কাচ ভেদ করিয়া এ রশ্মি আসিতে পারে না। তবে সকল রকম কাচ ভেদ করিয়া ইহা যে আসিতে পারে না এমন কথা নহে। এই সকল কারণে সহরবাসী অতি অল্প পরিমাণ এই দুই রশ্মি পায়।

গ্রামবাসীগণ এত অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকিয়াও কেন পুষ্ট থাকে তাহার কারণ হইল এই সূর্য্যকিরণ। এই জন্যই তাহারা অধিক মাংস ও চর্ব্বি প্রধান জিনিষ সেবন না করিয়া পুষ্ট থাকে এবং অপর দিকে সহরবাসী লোকগণ অধিক মাংস ও চর্ব্বি সেবন করিয়া থাকে কারণ তাহারা যে অবস্থায় থাকে তাহাতে স্বভাবতঃ চর্ব্বি প্রধান জিনিষের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য সহরবাসী লোকের পরিশ্রান্ত পাকস্থলী অতি কম বয়সেই রোগগ্রস্ত হয় কিন্তু সেই বয়সের গ্রামবাসী তখনও সুস্থ পাকস্থলী লইয়া জীবন যাপন করে এবং সেই বয়সে তাহারা যে ক্ষুধা থাকে সহরবাসীর তাহা থাকে না। সহরের সঙ্কীর্ণ গলিতে আর্দ্র ঘরে বাস করিয়া যে সকল বালক বালিকা রুগ্ন ও অপুষ্ট দেহ লইয়া বাস করে তাহারা যদি গ্রামে অথবা তদপেক্ষা উত্তম সমুদ্রতীরে যায় তবে তাহাদের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে এবং তাহারা স্বাস্থ্যপূর্ণ হয়। এই পরিবর্ত্তনের কারণ ঐ অতি-বেগুনী রশ্মি, স্থান পরিবর্ত্তন বা বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুর জন্য যে এই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে বলিয়া বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে তাহাই কারণ নহে।

গলগণ্ড। এক সময়ে ময়মনসিংহ জেলায় গলগণ্ড রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। তথাকার লোক এই রোগকে ঘ্যাগ বলিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস এই রোগ হয় জলের দোষে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শরীরে আইওডিনের ভাগ কম হইলে এই রোগ হইয়া থাকে। মানুষের গলায় থাইরয়ড্ নামে যে গ্রন্থি আছে সেই গ্রন্থি হইতে যে রস নিঃসরণ হয় সেই রসে আইওডিন থাকে। আমরা যে খাদ্য সেবন করি তাহাতে আইওডিন না থাকিলে থাইরয়ড্ গ্রন্থি আইওডিন নিঃসরণ করিয়া রক্তের সহিত মিলাইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় ঐ গ্রন্থি স্ফীত হইয়া উঠে এবং ক্রমে গলগণ্ড রোগে পরিণত হয়। এই গলগণ্ড অস্ত্র করিয়া বাহির করিয়া লইয়া তাহার সূক্ষ্ম অংশ লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এবং তাহার ফলে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, ঐ থাইরয়ড্ গ্রন্থি আপন কার্য্য সমাধা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু পুষ্টির অভাবে তাহা আর পারে নাই। এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, আমাদের যে খাদ্যে আইওডিন অধিক আছে সেই খাদ্য সেবন করাই এই রোগ আরাম করিবার একমাত্র উপায়। দুগ্ধে প্রচুর আইওডিন আছে, এই দুগ্ধ অথবা অন্য যে কোনও খাদ্যে আইওডিনের ভাগ অধিক আছে তাহা সেবন করিয়া এই

রোগ হইতে মুক্তি পাইতে হয়। কোন স্থানের বালকবালিকাগণের মধ্যে এই রোগ প্রবল ছিল তাহাদিগকে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আইওডিন অল্প মাত্রায় সেবন করিতে দিয়া প্রভূত উপকার পাওয়া গিয়াছিল। আমরা যে করকচ লবণ অথবা সৈন্ধব লবণ খাই, তাহাতে অনেক পরিমাণ আইওডিন আছে কিন্তু আমরা সভ্য হইয়াছি; এরূপ অপরিষ্কৃত লবণ কি করিয়া সেবন করি। ফলে হয় এই যে, আমরা ঐ লবণে আর আইওডিন পাই না, কারণ লবণ পরিষ্কার করিতে যাইয়া আইওডিন নষ্ট হইয়া যায়। আধুনিক সুপরিষ্কৃত, শুভ্র ও চিক্কণ খাদ্য প্রস্তুত করিতে যাইয়াও আমরা তাহা সেবন করিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া নিত্য আত্মহত্যা করিতেছি তাহা জানিয়াও ভ্রূক্ষেপ করি না।

বজ্রপাত—ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে যখন বজ্রাঘাত হয়, তখন সেই বিদ্যুৎ চমকে ও বজ্রের শব্দে অনেকেই আকস্মিক মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া উঠেন কিন্তু প্রতিশত বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে একটি বিদ্যুতও মানুষের হানি করে কিনা সন্দেহ কারণ একশতের মধ্যে হয়ত একটি বিদ্যুৎ পৃথিবীতে পৌছে, বাকীগুলি মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ চলে। এই যে বিদ্যুৎ মাটীতে আসিয়া পড়ে তাহার মধ্যেও কম সংখ্যক বিদ্যুৎ বিপজ্জনক। বিদ্যুৎ কোনও জিনিষ অবলম্বন করিয়া পৃথিবী পৌছাইতে চায় সেইজন্য গাছ, বাড়ী, লৌহের কোনও থাম বা ধাতু দ্রব্যের প্রস্তুত কোন প্রকার গৃহাচ্ছাদন প্রভৃতি বাহিয়া মাটিতে পেঁছায়। আমেরিকায় ৫০ বা ৮০ তলা বাড়ীতে অসংখ্যবার বজ্রাঘাত হইয়াছে কিন্তু এই সকল অট্টালিকার কোনও ক্ষতি হয় নাই তাহার কারণ এই সকল অট্টালিকা লৌহের মোটা থাম ও কাঠামোর মধ্যে তৈয়ারী তাহার জন্য বজ্রাঘাত হওয়া মাত্র উহা ঐ লৌহ অবলম্বন করিয়া মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। অট্টালিকার বাসিন্দাগণ সেজন্য বুঝিতেও পারে না কখন বজ্রাঘাত হইল। বজ্রাঘাতের সময় গৃহের ভিতরে থাকিলে নিরাপদে থাকা যায়। গৃহের বাহিরে থাকার সময় বজ্রাঘাত হইলে গাছ হইতে দূরে থাকিলেও অনেকটা নিরাপদে থাকা যায়। ধাতু নির্ম্মিত বেড়া, কাষ্ঠের গৃহ ও তাহার উপর করগেটেড লৌহের ছাদযুক্ত গৃহের নিকটে বজ্রাঘাতের সময় না থাকিলে অনেকটা নিরাপদ হয়। খোলা মাঠে আচ্ছাদনহীন নৌকায় থাকার সময় বজ্রপাত হইতে থাকিলে, সেই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ অবস্থা হইল শয়ন করিয়া থাকা।

যদিও ইহা দেখা গিয়াছে যে বজ্রাঘাতের দরুণ আগুন লাগিয়াছে কিন্তু বজ্রাঘাতে যত লোকের মৃত্যু হয় তাহাপেক্ষা অনেক বেশী লোকের মৃত্যু হয় প্রত্যেক বিভিন্ন প্রকার রোগে। হিসাবে দেখা যায় যে রেল সংঘর্ষে, মোটর গাড়ীর নীচে পড়িয়া অথবা জলে ডুবিয়া অথবা অন্যের দ্বারা হত হয় অনেক অধিক সংখ্যক লোক। প্রত্যেকবার বজ্রাঘাত ও ঝড় হইলে যে বিদ্যুৎ উপন্ন হয়, তাহা পৃথিবীর আদি কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মানুষ দ্বারা যত প্রকারে যত শক্তির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাপেক্ষা অনেক বেশী। প্রতি বিদ্যুৎ চমকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহার শক্তি তৎকালে সমস্ত পৃথিবীর বিদ্যুৎ যন্ত্র যে শক্তি উৎপন্ন করিতেছে তাহাপেক্ষাও অধিক। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা ২০০০০০০০ অশ্বশক্তি উৎপন্ন হইতেছে। সাধারণতঃ প্রতি বিদ্যুৎ চমকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহার ১০০০০০০ ভাগে যে শক্তি আছে তাহা ২৫০,০০০০০০ অশ্ব শক্তির সমান। বজ্রাঘাতের এত শক্তি থাকা সত্বেও ভীত হইবার কারণ নাই।

বালক বা বালিকার জন্ম নির্ণয়।

জেকো শ্লোভাকিয়ার একজন চিকিৎসক একটি ঔষধ (সিরাম, serum) আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা দ্বারা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার চার মাস পূর্ব্বে তিনি বলিতে পারিবেন যে, যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে তাহা বালক কি বালিকা। মাতার এক বিন্দু রক্ত লইয়া তিনি পরীক্ষা করেন এবং তাহা লইয়া তিনি যে নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার দ্বারা তিনি শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই বলিতে পারেন যে বালক জন্মিবে কি বালিকা জন্মিবে। প্রথমে এই উপায় দ্বারা সত্যই বালক বা বালিকার জন্ম, পূর্ব্ব হইতেই জানা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করা হয়। তৎপরে এক্ষণে ফ্রান্সে এই পরীক্ষা হইতেছে। প্যারিসের লারিবোয়াসিয়ের হাসপাতালে ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য চিকিৎসক মণ্ডলী কয়েকজন চিকিৎসককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা এই জেকোশ্লোভাকিয়ার ডাঃ ফ্রিডর এই অপূর্ব্ব আবিষ্কারের পরীক্ষা করিতে যাইয়া দেখিয়াছেন যে প্রতিবারেই তাঁহাদের পরীক্ষা সফল হইয়াছে। এখন হইতে সকল দেশেই এই পরীক্ষা প্রচলন হইতে আরম্ভ করিয়াছে তবে ভারতে কোনও চিকিৎসক এই উপায় দ্বারা কাহারও পুত্র সন্তান হইবে কি কন্যা সন্তান হইবে তাহা পরীক্ষা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই।

(সঞ্জিবনী)

শরতের সাড়া।

:•:-

রঙ্গ জাফ্রানি ছুপ ছুপে লাল নীলাজ ফিরোজ আসমানি —
সরম হারা হাল্কা শরৎ মরাল টানে তোর গাড়ি।
সবুজ ফাগের রঙ্গ ছড়াল সবুজ পরীর পিচ্‌কারী,
চমকে লাগায় নুপুর বোলে ভর দুনিয়ার গুঞ্জার —
ভর দুনিয়ায় দৌলত তের ধন আওরৎ বিলকুল,
আহ্বানি তোর সব জন গায় মসগুল ধরা মসগুল।

সাব্বাস ওরে সাব্বাস্ তুই সাব্বাস তোর কারখানা!
ঐন্দ্রজালিক নুতন জালে সব্ কানা আজ সব্ কানা!
কুহেল পুরীর স্বপন জড়া কই সে নারী? কোনখানে?
সোনার কাঠি যেই ছুঁয়েছে উঠ্‌ল বসে আনমনে।
উঠ্‌ল বসে আনমনে গো উঠ্‌ল বসে আনমনে—
সোনার খাট পা থুয়েছে, ভাবছে বসে, কোনখানে?

প্রজাপতির রথে চড়ে চল্ল নারী কোন খানে?
রূপ সায়রে নাইতে নাকি? তেপান্তরের মাঝখানে—
রূপ সায়রে নাইতে গিয়ে ডুব দিয়েছে যেই নারী—
হাসির কোলে পাঁপরী মেলে পদ্ম ফোটে লাজ ভারি!
টুক্ টুকে লাল্ মেহেদি বাঁটা আলতা মাখা তোর গালে—
কার্ বা চুমায় ফুট্‌ল ও-ফুল সরম পড়া কার্ লাগে!

সবুজ মাখা শিশির ভেজা হিরণ জরির ওড়না খান—
পলকা তোলা ধানের শিষে জমিয়ে এল হাওয়ার গান,
ঘোমটা তোলা শিরিষ ফুলের উড়িয়ে নিতে সরম খান্.
কাশের বনে আজ নেমেছে সফেদ্ শাদা মেঘের বান্;
ও দেমাকী ও খেয়ালী, গরব তোমার রংনা গায়!
শেফালী যে আজ ঝড়েছে অর্ঘ্য দিতে তোমার পায়॥

শ্রীশৈলেন্দ্রলাল রায়।

নৃতত্ত্বের নূতন ধার॥

•ব্যাঘ্র অর্থে ব্যাঘ্র নামধেয় জীব বিশেষ। সে বাঘও আবার এক রকমের নয়, গোবাঘা, মানুষ-বাঘা, চিতা, শুল, কালো, ধূসর, 'রাজকীয়' ইত্যাদি ইত্যাদি নানাজাতীয়। বংশ হিসাবে বিড়ালটী পর্য্যন্ত ব্যাঘ্র। আকার, প্রকার, স্বভাব, বসবাস জন্মস্থান হিসাবে আবার আরও কত বিভাগ। মানুষ বড় জীব;—বিভাগ তাহাদের আরও বেশী, আরও বৈচিত্র, অদ্ভুত রকমের। সাম্য, সমতার প্রচার জোরগলায় চলিলেও সাম্যের কামনা কেবল কথায়। সাদা, কালো, পীত এ-বিভাগ বরং প্রীতির, বিজ্ঞানের অবদান কিন্তু নেটীব ও ফিরিঙ্গীকে একজীব বলিতে হইলে শরীরে শক্তির প্রয়োজন। হটেনটট্, নিগ্রো, চাইনিজ, একই আদিপুরুষের সন্তান, একথা বিজ্ঞান বলে বলুন কিন্তু নিগ্রোর পক্ষে আমেরিকানের সহিত জ্ঞাতিত্ব স্থাপন প্রয়াসে ভীতির কারণ যথেষ্ট আছে। সত্য বটে মানুষ মানুষই,—মানুষ নহে কখনই কিন্তু সকল মানুষই এক, সমান একথা মুখে আনিয়া চিরতরে মূক হইবার সাধ অনেকের পক্ষেই নিষিদ্ধ বস্তু। ডারউইনের বড় ভাগ্যের জোর যে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল শ্বেতাঙ্গকুলে নতুবা আদি পিতার

অনুসন্ধানে বানরকুলকে টানিয়া আনার ফল তাঁহাকে কড়ায়-গণ্ডায় লাভ করিতে হইত, ধরায় অমরত্ব লাভ করিবার বহুপূর্ব্বে তাঁহাকে পাইতে হইত অমরধাম। বনমানুষও মানুষ আর সুসভ্য সহরে মানুষও মানুষ! কালো আদমি ও শ্বেতাঙ্গের তুলনা উপমার কথা নাই বা তুলিলাম, নব নৃতত্ত্বের নিয়মে আমাদের মধ্যেই কতখানি ঐক্য, সাম্য তাহা আলোচনা করিবার। ইহার প্রমাণ অনুসন্ধানে বেশী দূরে যাইবার আবশ্যক নাই, একবার সভ্যের চিরবাঞ্ছিত রঙ্গালয়ে উপস্থিত হউন, দেখিবেন ঠাট্টা তামসায় অবোধ নির্ব্বোধের অধিকাংশ ভূমিকায় হয় বাঙ্গাল নয় উড়িয়া। 'চাঁদ বুদা' হীন ভাষা না হইলে আসর যেন জমে না, উড়িয়ার 'ল' স্থানে 'ড়' উচ্চারিত না হইলে প্রাণভরা হাস্য-লহরী ছোটে না, বিদ্রূপের বাণ এই রূপে এখন যেন হাস্যের প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকপ্রিয় কথা সাহিত্যেও এই নীতি। এই ত প্রীতি,—নব নৃতত্ত্বের রীতি! যে জীব তেলর স্থানে 'ত্যাল', বেলের স্থানে 'ব্যাল', লবণের স্থানে 'ভূবণ' উচ্চারণ করে তাহারা যেন স্বতন্ত্র জীব; নব নৃতত্ত্ববিদের সেইটিই যেন প্রতিপাদ্য বিষয়।

নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নৃতত্ত্ব নিরূপণে আলোচনা করেন—

(ক) মানুষের আকার, গঠন, পেশী ও অস্থির পরিণতি।

(খ) চর্ম্মের বর্ণ।

(গ) কেশ ও শ্মশ্রুর বর্ণ।

(ঘ) চক্ষুতারকার বর্ণ।

(ঙ) নাসিকার আকার।

(চ) নিম্ন মাড়ীর আকার ও বক্রতার কৌণিক পরিমাণ।

(ছ) মস্তকের আকার।

(জ) দন্তের আকার ও পরিণতি।

লক্ষ্য তাঁহাদের আদি-মানব হইতে জন ও জাতীর পরিণতি, বংশানুক্রম নিরূপণ চেষ্টা, বিশ্ব-মানবের আদিম ইতিহাস সংকলন, সমতার প্রতিষ্ঠা; আর নব নৃতত্ত্ববিদের চেষ্টা তাহার বিপরীত-মুখী। যাঁহাদিগকে তাঁহারা মনে করেন উন্নত তাঁহাদের সহিত সান্নিধ্য ও সমতার প্রমাণে তাঁহার ব্যস্ত,—অনুন্নত জাতি তাঁহাদের চক্ষে উপেক্ষার বস্তু। উপেক্ষা যাঁহাদের হৃদয়ে নিহিত,

তাঁহাদের চক্ষে প্রকারান্তরে আদর্শও তাচ্ছিল্যের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, যেটা তাঁহাদের আদর্শ,—তাহাতে যতটুকু তাঁহাদের অনুকূল সেইটুকু তাঁহাদের গ্রহণীয়,—আদর্শের অপরাংশ নিতান্ত নিন্দনীয় ও তাচ্ছিল্যের। তাঁহাদের গবেষণার ধারাও সেই পথে। নব নৃতাত্ত্বিকের বিচার্য্য—

(ক) মানুষের আকারে বড় কিছু আসে যায় না; দর্শনীয় তাহাদের পোষাকপরিচ্ছদ, সভ্যতাব্যঞ্জক হাবভাব।

(খ) চর্ম্মের বর্ণ অবশ্য বিচার্য্য।

(গ) কেশের পারিপাট্য, বিলাসের বাহার। শ্মশ্রুর তিরোধান।

(ঘ) চক্ষুর চাহনী।

(ঙ) নাসিকা কুঞ্চিত কিনা? চক্ষু ও নাসিকায় চশমার অস্তিত্ব আছে কিনা?

(চ) দাড়ীর আদর বড় নাই। জিহ্বা ও কণ্ঠ অবশ্য বিচার্য্য। মিহি কি গুরুগম্ভীর স্বরে জিহ্বা কিরূপ বাক্য উচ্চারণে সমর্থ?

(ছ) মস্তক উন্নত কিনা?

(জ) কথায় কথায় দন্ত বিকাশের ভঙ্গিমা, হাস্য মৃদু মধুর কিনা—দুর্ব্বলের নিকট সিংহদন্ত-বিকাশে সমর্থ কিনা?

আরও বহু লক্ষণ ইঁহাদের বিচার্য্য। তন্মধ্যে প্রধান স্থান কাল বিবেচনায় দাঁ বুঝিয়া চলাফেরায় ইহারা সমর্থ কিনা। যে সকল জাতীতে এ সকলের সমন্বয় তাহারা এক জাতী, এক দলভুক্ত অর্থাৎ সকলেই আপনার মনে আপনি—যুক্ত নহে কারণ একাধারে সম্পূর্ণের সমন্বয় অসম্ভব। সুতরাং ইঁহাদের বহু দল,—যুক্তিতর্কের ধারাও বহু প্রকারের। কাজেই উল্লেখ করা অসম্ভব, তবে প্রকৃতি ইঁহাদের প্রায় একই প্রকারের—নীতি ইঁহাদের সাম্যের নাম বৈষম্য,—মনুষ্যের ইতিহাস সঙ্কলনের নামে নিজেদের গৌরব-মহিমা প্রচারই উদ্দেশ্য। তাঁহারাই কেবল মনুষ্য নামের অধিকারী,—অন্যে যেন বিভিন্ন জাতীয়,—মনুষ্য আকারে অন্য জীব!

বঙ্গে এ নব নৃতত্ত্ববিদের অভ্যুদয় হইয়াছে অনেক দিন। এক সময়ে ইহাদের একদলের প্রতিপাদ্যই ছিল—ইংরাজীনবীশ পণ্ডিত তাঁহারা—তাঁহারা ও ইংরেজ এক। শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণ হিসাবে যাহাই হ'ক—মূলতঃ পার্থক্য নাই। মানুষের আকারের পরিণতি বাহিরের বস্তু, মানসিক পরিণতিই আসল, তাহারাই মানুষের জাতিত্ব, নৈকট্য নির্ণয় হওয়া শ্রেয়। সেই হিসাবেই

অস্তিত্বলাভ করিয়াছিল তাঁহাদের নৃতত্ত্বের 'ক' ধারা। তাঁহা। ইউরোপীয় হাবভাব, পোষাক পরিচ্ছদের গৌরব সহস্রগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাহার দ্বারাই হইতে চাহিয়াছিলেন—ইংরাজানিক ইংরাজ। ইউরোপীয় সভ্যতাকে প্রশংসা করিয়াও তাঁহারা তৃপ্ত হইতেন না; মোচ কৈ 'কেলাবা ফুল' বলিয়া তাঁহারা দেশবাসীকে বুঝাইতে চাহিতেন—তাঁহারা বাঙ্গালী নহেন ইংরাজ। সত্য বটে, ইউরোপীয় নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণই প্রমাণ করিতেছেন—আদমের বংশধরই এ বিশ্বমানব,—ইংরেজের অকাট্য বাণী তাহাতে অনাস্থা স্থাপন করিলে অধোগতি। কিন্তু তাহাতে কি? ইউরোপীয় পণ্ডিতই ত বলিতেছেন—জলচর মৎস্য হইতে স্থলচর জীবের উৎপত্তি—বিবর্ত্তন ফলে মানুষও এই হিসাবে মৎস্যের বংশধর। Fins of the fish rise through the insignificant legs of some reptiles to the more perfect and available wings or legs of birds and thence, ultimately, to the sturdy members of rhinoceros and elephants. হ'ক, তাই বলিয়াই কি বলিতে হইবে মাছ ও মানুষ এক জাতীয়! সুতরাং প্রমাণিত হইল, নৃতত্ত্ব আলোচনায়—'মানুষের আকার, গঠন, পেশী ও অস্থির পরিণতি'—নির্দ্ধারণের কোন মূল্য নাই। মূল্য সভ্যতার পরিমাণে, তাহার পরিস্ফুরণে, যে বাঙ্গালী তাহা লাভ করিতে সমর্থ সে কেন ইংরেজের সমজাতীয় বলিয়া দাবী করিবে না।

সে দাবী দাওয়ার পরিণাম কি দাঁড়াইয়াছে বর্ত্তমান তাহার সাক্ষী। সে জাতিত্বের ফলে কিরূপ জাতিবিরোধ উপস্থিত তাহা বর্ণনার বিষয় নয়—এখন প্রত্যক্ষ করিবার। ও মোহ কাটিতেছে সুতরাং ও সম্প্রদায়ের ইতি কথার এখানেই ইতি।

নিজেদের জাতিত্বের কথাই এখন হ'ক।

(খ) সূত্র—চতুর্বর্ণ—আমরা বরং সহ্য করিতে প্রস্তুত কিন্তু বর্ণ লইয়াই যত গোল। ভারতের উচ্চ আর নিম্নবর্ণ! একদল বলিতেছেন বর্ণ বলে নাইর মূল উঠাইয়া দাও, ওটা স্বার্থপর ব্রাহ্মণের সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া উপবিভাগের প্রাধান্য দিয়া কেন নিরয়গামী হইতেছ,—বেশ কথা, শুনিতে ভাল, কার্য্যক্ষেত্রে ভাই ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে যুক্ত হইতে পারিলে বড় সুখের কিন্তু কালে এ সমস্যা সমন্বয়ের চেষ্টা হইতেছে কতটুক!

শুনিতেছি সাড়া পড়িয়াছে, ভারতে সর্ব্ব জাতীর মধ্যে সকলেই উন্নত হইতে চায়, কি মহা জাগরণ.—উন্নতির সুস্পষ্ট লক্ষণ ! একত্ব !

দূরের কথা জানি না বাঙ্গলায় এ জাগরণের অভিব্যক্তি দেখিতেছি কি আকারে ? যে স্বার্থপর ব্রাহ্মণ আচার নিষ্ঠা, উদারতা ধর্ম্মানুরাগ সাধু জীবন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া উপবীতসর্ব্বস্ব হইয়া এরূপ বিপদ ঘটাইয়াছে, তাহার বাহ্যিক আকার তাহার পূর্ব্বপুরুষলব্ধ স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য অপর বর্ণ লালায়িত। যে উপবীত এখন গো-রজ্জু হইতেও হেয়, তাহা গলায় পরিতে অন্য বর্ণ উৎসুক ! বুঝিতাম—উপবীত গ্রহণে অন্য জাতী প্রকৃত ব্রাহ্মণেরই ন্যায় ক্রিয়াপরায়ণ হইতেছেন তাহা হইলে আক্ষেপের আর ছিল কি ? কিন্তু তাঁহারাও যে উপবীত গ্রহণে যে সেই,—ব্রাহ্মণের সমতা জাতিত্ব লাভেও সেই পতিত ব্রাহ্মণ ব্যতীত তাঁহারা আর কি হইবেন ! জাগরণ কি ইহাই ? না স্বপ্ন মোহে আস্ফালন !

আরও কত প্রকারে বর্ত্তমানে আমাদের 'মূলার উদ্গার'' প্রকাশ পাইতেছে, কাহারও কিছু হজম হইতেছে না, তাহার ফলে আমরা স্বাস্থ্যহীন হইতেছি জীবন রক্ষা যদি নাই হয় তবে আর আমরা 'বড় বংশের' বংশধর ইহার প্রমাণে ফল !

. নব নৃতত্ত্বের প্রধান সূত্র যদি সত্যই মানসিক পরিণতিতে ও তাহাই মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরিচয়, তবে তাহারই প্রমাণ কার্য্যতঃ আবশ্যক ! পোষাক, পরিচ্ছদ অর্থ, ঐশ্বর্য্য, দুটী সভ্যজনোচিত বাক্য মানসিক উন্নতির পরিচায়ক নহে, তদ্বারা আমাদের মানবিকতার প্রমাণ হইবে না, ছোট বড়; উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ যিনি যাহাই হউন যদি মনুষ্যোচিত ভাবে মহানুভাবতার অধিকারী হইতে পারেন তিনি নিগ্রো, হটেনটট্, হাড়ী বা ডোম যাহাই হউন তিনি নব নৃতত্ত্বের সাধনায় শীর্ষস্থানীয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন। নব নৃতত্ত্বে প্রমাণের ধারাই যখন বিপরীত, মানবের আদি স্থানের অনুসন্ধান অপেক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠাই যখন উদ্দেশ্য—তখন তাহাই হউক। উন্নতচিত্ত মানব হউন সার্থকনামা—ভারত তাহা মানিয়া লইবে,—জাতি বর্ণের উপাসক ভারতবাসীর সে উদারতা আছে তাহা বহু ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা যদি না হইত তবে মহাত্মা গান্ধী আজ সর্ব্বজাতীর নিকট দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন না।

শ্রীসত্যসখা চক্রবর্ত্তী !

অনন্তলাল।

— ✿ —

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চাটুয্যে বাবুদের তিলডাঙ্গার কাছারিতে আজ প্রাতঃকাল হইতে দুইজন মুহুরি টাকা গণিয়া পত্রাদি লিখিয়া সদরে চালান্ পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছে। নায়েব মহাশয় নিকটে বসিয়া তত্বাবধান করিতেছেন ও তামাক খাইতেছেন। একজন বাঙ্গালী নগ্‌দী ও একজন দ্বারবান টাকা লইয়া রতনপুরে মালেক জমিদার বাড়ী যাইবে। তাহারা পদব্রজে তিলডাঙ্গা হইতে দশ ক্রোশ উত্তরে, মেমারিতে যাইয়া রেলগাড়ী ধরিবে, —নামিতে হইবে ভদ্রেশ্বর ষ্টেশনে। তথা হইতে রতনপুর গ্রাম নিকটেই। এই রতনপুরে জমিদার চাটুয্যে বাবুদের নিবাস।

মুহুরিরা মুখ নত করিয়া লিখিতেছে এবং নায়েব মহাশয় ধূমপান করিতেছেন ও সম্মুখস্থ একটি থামের দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন নগ্‌দী একটি ১৮।১৯ বৎসর বয়স্ক বালককে সঙ্গে লইয়া তথায় প্রবেশ করিল। বালককে দেখিয়া নায়েব মহাশয় বলিলেন,—"এস, বাড়ুয্যে—, বাবা এস।" পরে প্রণাম করিয়া একটি পৃথক আসনে বসিতে বলিলেন। নায়েব জাতিতে কায়স্থ।

বালকের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, শরীর, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, দেখিলেই বলবান বলিয়া বোধ হয়, ললাট প্রশস্ত কিন্তু এই বয়সে তাহাতে যেন চিন্তার রেখা পড়িয়াছে; নাসিকা উন্নত, লোচনদ্বয় আকর্ণবিস্তৃত মুখমণ্ডল প্রশান্ত, এবং আকৃতি নাতিহ্রস্ব নাতিদীর্ঘ।

বালক উপবেশন করিলে নায়েব বলিলেন,—'কেমন তোমার রতনপুরে যাওয়া প্রস্তাবে মা ঠাকুরুণের মত হয়েছে ত?"

"আজ্ঞে, হয়েচে।"

"তবে তুমি খাওয়া দাওয়া করে তয়ের হয়ে এস। এরা একটু বেলা থাকতে রওনা হবে। চৈত্র মাসের রৌদ্রে রাস্তা হাঁটিতে পারবে না—বেলা পড়লে বেরুবে, সমস্ত রাত চলে ভোরে মেমারি পৌঁছিবে, প্রাতে গাড়ীতে উঠলে বেলা এক প্রহরের সময়ে ভদ্রেশ্বরে নামতে পারবে।

"আমার যাবার যোগাড় সব হয়েছে।

"বেশ তবে সকাল সকাল এস। দেরী করোনা যেন।"

বালকের নাম ব্রজেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায়। সে এই গ্রামের ৺তারাগতি বন্দোপাধ্যায়ের পুত্র। ৺তারাগতির পিতা ৺হরিশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় গ্রামের মধ্যে একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার তিনখানি লাঙ্গলের চাস,—বিস্তর ধান্য এবং তেজারতি ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্পত্তি তিন পুত্রে তিন অংশ করিয়া লইল; তারাগতি নিজ অংশ যাহা পাইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সংসারের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু অবশেষে ভ্রাতৃবিরোধের ফলে মামলা-মোকদ্দমায় তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়া ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। তাহারই শোকে তিনি অকালে লোকান্তরিত হন।

অতি কষ্টে পড়িয়াও তিনি পুত্রের লেখাপড়া বন্ধ করিয়াছিলেন না, তাঁহাদের গ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ দূরে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। ব্রজেন্দ্রলাল প্রতিদিন পদব্রজে তথায় যাইয়া অধ্যয়ন করিয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিত। তাহার বিদ্যানুরাগ সংচরিত্র ও নম্রতা দেখিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সকলেই তাহাকে স্নেহ করিতেন। সে বৎসর তার এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা, টেষ্ট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সে সম্বাদ প্রকাশিত হইবার দুই চারি দিন পরেই তারাগতি পরলোকে গমন করিলেন। মাতা ও পুত্র অভিভাবকশূন্য হইয়া পড়িল। ব্রজেন্দ্রের খুল্লতাতেরা পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করিল না।

শ্রাদ্ধাদি শেষ হইয়া গেলে ব্রজেন্দ্র সে অবস্থাতেও প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। পরীক্ষার পনের ষোল দিন থাকিতে একদিন রাত্রে তাহার কম্প দিয়া জ্বর আসিল। সান্নিপাতিক জ্বর,—জীবনের আশা ছিল না সুতরাং পড়াশুনা বন্ধ করিয়া ব্রজেন্দ্র ঘরে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইল। অচল সংসার,—সে দু'একটি ছেলে পড়াইয়া যৎ সামান্য যাহা উপার্জ্জন করে, অতি কষ্টে তাহার দ্বারা সংসার চালায়—এত অনটনের মধ্যেও দু'একখানি পুস্তক কিনিয়া সে পড়িত।

এই প্রকারে বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর হইতে তাহার প্রায় দেড় বৎসর অতীত হইল। অর্থের অভাবে লেখাপড়া বন্ধ করিতে হওয়ায় সে বড়ই মন-কষ্টে থাকিত। মাতার মনে দুঃখ হইবে বলিয়া সে সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিত না। কিন্তু মুখ দেখিয়া সন্তানের মনের ভাব বুঝিয়া জননীর পরিতাপের সীমা ছিল না।

গ্রামস্থ নায়েব মহাশয়ের পুত্র প্রতিদিন ব্রজেন্দ্রের নিকট ইংরাজী পড়িতে আসিত। ব্রজেন্দ্রের মাতা একদিন তাহার দ্বারা নায়েবকে ডাকাইয়া কোনও স্থানে পুত্রের লেখাপড়া শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নায়েব তাঁহাদের অবস্থা সমস্তই অবগত ছিলেন, এবং ব্রজেন্দ্রের সুশীলতায় তাহাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। তিনি ব্রজেন্দ্রের একটা উপায় করিবার জন্য আজ জমীদার ভবনে পাঠাইতেছেন।

জমীদার স্বীকৃত হইয়াছেন, —এখন ব্রজেন্দ্রের অদৃষ্ট।

ব্রজেন্দ্র কাছারি হইতে বাটী ফিরিয়া সে একটি পুরাতন ছত্র মেরামত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার জননী ইতিপূর্ব্বেই তাহার পরিধেয় দুইখানি বস্ত্র সাজিমাটিতে সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছিলেন। এই দুইখানি ব্যতীত আর একখানি নূতন বস্ত্র প্যাট্রার মধ্যে ছিল। সেখানি লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ তিনখানি বস্ত্র, দুইখানি চাদর, একটি জামা, পুরাতন জীর্ণ একটি ছত্র, একজোড় পুরাতন পাদুকা এবং কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক লইয়া বালক রতনপুর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

পুনরায় বেলা দুই প্রহরের সময় তাহাকে ডাকিবার জন্য নায়েব মহাশয় কাছারি হইতে একজন নগ্‌দী পাঠাইলেন। নগ্‌দী বাহির হইতে ডাকিল, "ঠাকুর বাড়ী আছেন?"

ব্রজেন্দ্র তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। নগ্‌দী বলিল, "আর দেরী করবেন না, চলুন।"

মাতা পুত্রের এই প্রথম ছাড়াছাড়ি! ছেলের পা উঠে না, মাতা চক্ষের জল গোপনে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন; যাই যাই করিয়াও বিদায় গ্রহণে বিলম্ব হইতেছিল। নগ্‌দীর ডাকে তাহার চমক ভাঙ্গিল। মাতার চরণ-রেণু সম্বল—সে বিদায় লইল।

যথাসময়ে কাছারি হইতে একজন বাঙ্গালী নগ্‌দীচরণ একজন দ্বারবান ও ব্রজেন্দ্র রতনপুর যাত্রা করিল। তিলডাঙ্গা হইতে দক্ষিণে মেমারি পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাস্তা। তাহারা এই রাস্তা ধরিয়া করিয়া চলিল। অধিক পথ চলা অভ্যাস ব্রজেন্দ্রের ছিল না, চারি পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িল, আরও পাঁচ ক্রোশ চলিতে হইবে। তাহারা সম্মুখস্থ চটিতে যাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লইল। অতি প্রত্যূষে সকলে মেমারি যাইয়া

পঁহুছিল। গাড়ী আসিতে অধিক বিলম্ব ছিল না। যথা সময়ে সকলে ভদ্রেশ্বর ষ্টেসনে অবতরণ করিল, এবং তথা হইতে বেলা এক প্রহরের সময়ে রতনপুর যাইয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রতনপুরের জমিদারেরা বনিয়াদি বড়লোক। বাঙ্গলা দেশে তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর জমিদার পদবাচ্য। বহুদিন পূর্ব্বে মুসলমানদিগের রাজত্বকালে এই বংশের এক ব্যক্তি দিল্লী মহানগরীতে বাদশাহের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত এ বংশে লক্ষ্মীর কৃপা অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক্ষণে অনন্তলালবাবু এ-বংশের একমাত্র বংশধর। অনন্তলাল বাবু একজন সুপণ্ডিত হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগী ও দয়ার্দ্র চিত্ত। সর্ব্বদা তিনি ভদ্রলোকে পরিবৃত হইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার সভা অতিথি, সাধু, যাচক এবং মোসাহেবে পূর্ণ থাকিত। বাল্যকাল হইতে উদরাময় রোগে কষ্ট পাইয়া তিনি অহিফেন সেবনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রাতে ও অপরাহ্নে যখন তিনি অহিফেন সেবন পূর্ব্বক চা পান করিতেন, তখন তাঁহার মজলিসে যেন আনন্দের ঢেউ খেলিত। তাঁহার সদর বাড়ীতে ত্রিতলের উপর একটি মাত্র কুঠরী। এই কুঠরীতে তাঁহার মজ্‌লিস্।

একখানি প্রকাণ্ড সতরঞ্চে ঘরের মেজে সম্পূর্ণরূপে আবৃত। তাহার উপর উত্তর দিকে ঘরের অর্দ্ধখানি ব্যাপিয়া সাদা চাদর পাতা একটি ফরাশ, ফরাশের উপর বড় বড় কতকগুলি তাকিয়া ও স্থানে স্থানে বৈঠকের উপর দুই তিনটি বাঁধা হুঁকা। এই ফরাশের পূর্ব্বসীমায় একটি পৃথক আসন—প্রথমে একখানি লাল কম্বল তাহার উপর একজনের শয়ন করা চলে এরূপ একখানি গালিচা, গালিচার উপর উত্তমরূপে টান করা একখানি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং তদুপরি শ্বেতবর্ণ দুইটি বালিশ। আসনের এক পার্শ্বে কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক এবং "থিয়জফিষ্ট" নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা রহিয়াছে। এই চর্ম্মাসনের পাদদেশে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে সতরঞ্চের উপর একটি প্রকাণ্ড শ্বেতপ্রস্তরের টেবিল। টেবিলের উপর একটি বড় ঘড়ি টকটক করিতেছে। উপরে প্রাচীরগাত্রে দশমহাবিদ্যার দশখানি বড়চিত্র।

প্রাতঃকালে বেলা প্রায় সাড়ে ছয়টার সময়ে ফরাসের উপর দশ বার জন ভদ্রলোক, কেহ বসিয়া কেহ অর্দ্ধ শয়ন অবস্থায় এবং দুই একজন শয়ন করিয়া আছেন, দুইজন তামাক

খাইতেছেন একজন অন্যের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে তর্ক করিতেছেন এবং দুইজন তাহা শ্রবণ করিতেছেন টেবিলের নিম্নে ঘরের দক্ষিণদিকস্থ দেওয়ালে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া সাদা মোটা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত শ্যামবর্ণ একব্যক্তি উপবেশন পূর্ব্বক গলদেশ হইতে লম্বমান একটি প্রকাণ্ড ঝোলার মধ্যস্থ বড় বড় কাঠের মালা জপ করিতেছে—এই ব্যক্তির চক্ষু মুদ্রিত তাহার ঝোলার ভিতর হইতে খট খট শব্দ নির্গত না হইলে নিশ্চয় অনুমান হইত যে সে বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যাইতেছে। সকলে এমন সময়ে অনন্তলাল গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে উপবেশন করিল। যে ব্যক্তি পাথরের টেবিলের নিম্নে বসিয়া মালাজপ করিতে-ছিল সে উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মজলিস্ হইতে দুই চারিজন "বাবু নমস্কার" বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনিও তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মালাসংযুক্ত ব্যক্তির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন "আজ শরীরটা ভাল নাই।" পরে, যাইয়া ব্যাঘ্রাকৃতির উপর উপবেশন করিলেন।

অনন্তলালের বর্ণ গৌর, শরীর দোহারা মুখমণ্ডল সুদৃশ্য এবং গুম্ফ পরিশোভিত নাশিকা কিঞ্চিৎ স্থূল এবং নাতিহ্রস্বনাতিদীর্ঘ, চক্ষু আয়ত এবং জ্যোতিঃ সম্পন্ন মস্তকের কেশ নূতন ছাঁটা এবং তাহাতে টেরিকাটা, পরিধান থানকাপড়, গাত্রে গর্ণেটের চায়নাকোট একহস্তে দুইখানি পুস্তক এবং অন্য হস্তে চাবির গলে বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। তিনি আসনে উপবেশন করিলে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল।

"শরীর ভাল নাই কেন? রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি?"

অনন্তলাল বলিলেন, "না পেটটাও ভাল নাই।"

বাবুর শরীর ভাল নাই—শুনিয়া মজলিসের অধিকাংশ লোক তাহার কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বলিল, "বোধহয় রাত্রে আহার কিছু গুরুতর হয়েছিল," কেহ বলিল "বোধহয় রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই,—সেই জন্য পেট ভাল নাই।"

কেহ বলিল, "তাই সম্ভব"—ইত্যাদি

অনন্তলালের পাদদেশে, ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনের দক্ষিণদিকে অহিফেনের একটি কৌটা, ডিষ্টিল্ড ওয়াটারের একটি বোতল একটি ছোট নিক্তির বাক্স রৌপ্য নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্রবাটি এবং কতকটা কার্পাসের তুলা রক্ষিত ছিল। তিনি কৌটা হইতে আফিম বাহির করিয়া নিক্তিতে নথা

প্রয়োজন ওজন করিয়া লইয়া তাহাতে কার্পাসের তুলা জড়াইলেন। পরে ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটারের বোতল হইতে ঐ ক্ষুদ্র বাটিতে কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া তাহাতে ঐ তুলাসংযুক্ত আফিম গুলিতে লাগিলেন। আফিম গুলিতে গুলিতে হঠাৎ একবার তাঁহার হাই উঠিল। অমনি মজলিসস্থ একব্যক্তি তিনটি তুড়ি দিল। আফিম গোলা শেষ হইলে অনন্তলাল আর একবার হাই তুলিয়া হস্তস্থিত তুলাটুকু বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। আবার তিনটি তুড়ি। তখন অনন্তলাল হাসিয়া বলিলেন,—"কত তুড়ি দেবেন? আজ অনেকবার হাই তুলতে হবে যে!"

নিকটে ভৃত্য দাঁড়াইয়াছিল। সে আফিমের সরঞ্জাম তথা হইতে অপসারিত করিল ও একখানি ছোট অয়েলক্লথ লইয়া সেই স্থানে বিছাইয়া দিল। পরে চা-দানি কাপ প্রভৃতি চার-সরঞ্জাম লইয়া যাইয়া তদুপরি সাজাইতে লাগিল। তখন অনন্তলাল বলিলেন,—"এখন জল আনিস্‌নি। আজ একটু পরে চা খাব।"

এই বলিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহমধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের অধিকাংশই আফিম ও অনন্তলালের নিকট প্রতিদিন তিনবার করিয়া চা সেবনে অভ্যস্ত। আজি উহার বিলম্ব আছে শুনিয়া, তাঁহাদের স্ফূর্ত্তি যেন অনেকটা কমিয়া গেল বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ হইল। যাঁহারা তামাকু সেবন করিতে ছিলেন হুঁকার গড়গড়ানি শব্দে বাবুর নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে এই ভয়ে তাঁহারা হুঁকা বৈঠকে রক্ষা করিলেন। গৃহ নিস্তব্ধ হইল। কেবল শ্বেত টেবিলের উপরস্থ ঘড়ির এবং নিম্নস্থ ঝোলার টক্ টক্ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অনন্তলাল উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন "এতক্ষণে শরীরের বেয়ারা ঘুচল।"

যিনি ইতিপূর্ব্বে তুড়ি দিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "বোধ হয় এতক্ষণে কালাচাঁদও ধরেচে।"

"হাঁ, নইলে উঠতে পারতুম না। আজ তিলডাঙ্গার চালান্ আসবার কথা আছে নয়হে হরিশ?

এই বলিয়া অনন্তলাল বাবু স্বয়ং চা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি চা নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া মজলিসস্থ—সকলেকে পরিবেশন এবং স্বয়ং পান করেন। এ কার্য্যে তিনি সিদ্ধহস্ত।

যে ব্যক্তি মালা জপিতেছিল, সে উত্তর দিল, "আছে ত। বোধহয় এই বেলাতেই এসে পঁহুছিবে।"

যথাসময়ে ভৃত্য গরম জলের কেটলি আনিয়া চা-দানিতে ঢালিতে লাগিল। যথা প্রয়োজন দেওয়া হইলে সে কেটলি লইয়া চলিয়া গেল। অনন্তলাল একবার ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে মজলিসের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন,—"বিপিন বাবু আফিম আর চা এই দুটো জিনিসে আমার ছোট বেলা হতে ঘৃণা। কিন্তু এখন এ দুয়েরই বাধ্য হতে হয়েচে। একজন মহাত্মা বলেচেন, "এ অভ্যাস আমার একদিনে ছাড়িয়ে দেবেন।"

বিপিনবাবুর সমগ্র নাম বিপিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি অনন্তলাল বাবুর মাতামহের জ্ঞাতি সম্পর্কে ঠাকুরদাদা। ইঁহার নিবাস রতনপুরের পাঁচ ছয় ক্রোশ পশ্চিমে। বিপিনবাবুর অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল। চারি পাঁচ হাজার টাকা লাভের জমিদারি ছিল। কিন্তু ইঁহার পিতাঠাকুরের অপব্যয়ে অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল, বিপিনবাবু পৈত্রিক চাল বজায় রাখিতে গিয়া তাহাও নষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার একটি মাত্র পুত্র কলিকাতার এক মার্চেণ্ট আফিসে সামান্য বেতনে চাকুরী করেন। বিপিনবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন, চাকুরী করিবার বয়স নহে। তবে এক চাকুরী মোসাহেবী, একার্য্যে তিনি বিলক্ষণ পটু। আজি কয়েক বৎসর হইতে অনন্তলাল বাবুকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে আর একজন বড় লোকের নিকট অনেক দিন কাটাইয়াছেন। অনন্তলালের সভায় ইঁহার উপর কথা বলে এমন সাধ্য কাহারও ছিল না। বাটীর আমলারা এবং চাকরেরাও সকলে ইঁহাকে ভয় বা ঘৃণা করিত। অনন্তলাল কখন কখন তাঁহার বাক্য-কৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া লোকের নিকট প্রশংসা করিতেন। প্রশংসার অন্য কিছুই না পাইয়া, সকলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেন —"আর জানেন ওঁর স্ত্রীর মত এমন সুন্দরী স্ত্রী গ্রামের মধ্যে আর কারও নাই। এখন প্রাচীনা হয়েচেন কিন্তু এখনও তাঁকে দেখ্‌লে যুবতী বলে ভ্রম হয়।"

বিপিনবাবু তখন মুখখানি নত করিয়া বলিলেন,—"বাবু আপনার বুড়ো ঠান্‌দিদিকে একবার দেখাতে পার্‌লুম না। দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারতেন।"

এই বিপিনবাবুই অনন্তলালের হাই উঠিবার সময়ে তুড়ি দিতেছিলেন।

বিপিনবাবু আফিম্ খাইতেন। কিন্তু কি পরিমাণে খাইতেন বলা কঠিন। কেন না প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, রাত্রে ভোজনের পূর্ব পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে একটু করিয়া মুখে দিতেন। অনন্তলাল ইহাকে ' গুচি দেওয়া" বলিতেন।

কোন মহাত্মা এক দিনের মধ্যে অনন্তলালের আফিম্ ও চার অভ্যাস ছাড়াইয়া দিবেন শুনিয়া বিপিনবাবু বলিলেন,—"এক দিনে চা ছাড়্‌তে পারেন কিন্তু এত দিনের আফিমের মৌতাং তিনি এক দিনে কেমন করে ছাড়াবেন ?"

অনন্তলাল বলিলেন ,—"সেকথা বল্‌তে নিষেধ আছে নইলে বল্‌তে পারতুম"।

পরে তিনি ঘড়িতে দেখিলেন চা-দানিতে গরম জল দিবার পর পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হইয়াছে। তখন পাঁচ সাতটী পেয়ালাতে চা ঢালিয়া প্রস্তুত করিয়া তিনি সকলকে এক এক পেয়ালা পরিবেশন করিলেন ও স্বয়ং এক পেয়ালা লইয়া তাহার সদ্ব্যবহারে মন দিলেন।

একজন ভদ্রলোক দুই দিন হইতে অনন্তলালের নিকট কিছু প্রার্থী হইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি চা পান করিতে করিতে বলিলেন,—"বিপিনবাবু আপনি বোধহয় মহাত্মাদের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা জানেন না। এক দিনে আফিম্ ছাড়ান ত সামান্য কথা তাঁদের দ্বারা অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হয়।"

বিপিনবাবু উত্তর করিলেন, ' আপনার ত এই বয়স ক'জন সাধুই বা দেখেছেন ? অনন্তলাল-বাবুর মুখে কোন অবিশ্বাস্য কথা বেরুতে পারে এ আমার ধারণাই নাই। তা ছাড়া বাবু যে কথা বলেচেন তার কত ওজন তা বোধহয় আপনার জ্ঞান নাই, যেহেতু আপনি স্বয়ং আফিম খান না এখুনি আমার এই দশা হয়েচে—পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীতে সদাব্রত ছিল। অনেক সাধু মহাত্মার পায়ের ধুলো আমাদের বাড়ীতে পড়েচে। আমার ছোটভাই এক সাধুর সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বার বৎসর নিরুদ্দেশ হয়ে ছিল—"

এই সময়ে অনন্তলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা মশায়, আপনার ভাই যখন সাধুর সঙ্গে পালিয়ে যান, তখন তাঁর বয়স কত ছিল ?"

বিপিনবাবু মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে আঠার বছর। সে গল্প করে একদিন সাধুর সঙ্গে হরিদ্বারে বেড়াচ্ছে এমন সময়ে তিনি বল্লেন,—"বেটা, আজ কোন তিথি ?" আমার ভাই বল্লেন 'মহারাজ আজ শিবচতুর্দ্দশী। সাধু চমকিয়া বলিলেন,—'শিবচতুর্দ্দশী। আজ যে আমাকে কাশী পঁহুছিতে হবে।" কেথায় হরিদ্বার, আর কোথায় কাশী! তখন রেল হয় নাই যে, চাপ্‌বেন আর যাবেন। ভায়া বল্লেন, সে কেমন করে হবে, প্রভু? 'আল্‌বৎ হোগা'—এই বলে সাধু একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়ে ভায়াকে নিজের কোলে বসালেন ও উভয়ের অঙ্গ কাপড়ে ঢেকে ভায়াকে চোক্ বুজে তাঁকে ধরে থাক্‌তে বল্লেন। ভায়া বলে যে, দুই তিনবার যেন শরীরটা নড়লো। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে দেখে, দুজনে কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে বসে আছে।"

পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি ইহার উপর আর বুনিতে পারিলেনা না। নীরবে চা খাইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে সকলের পেয়ালা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু বিপিনবাবুর চা অভুক্ত অবস্থায় তখনও তাঁহার সম্মুখে বর্ত্তমান। তাঁহার অলৌকিক কাহিনী সমাপ্ত হইলে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু অনন্তলাল মুখ নত করিয়া চা পান করিতেছিলেন। তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে সময়ে তাহার ওষ্ঠে মৃদু মৃদু হাসা পরিস্ফুট হইতেছিল। গৃহস্থ সকলেই অন্যমনস্ক হইয়া এই আশ্চর্য্য গল্পের বিষয় চিন্তা করিতেছেন বুঝিয়া বিপিনবাবু হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বাহিরে যেখানে তাঁহার জামা ঝুলিতেছিল, তদভিমুখে গমন করিলেন। তাহা দেখিয়া অনন্তলাল বলিলেন,—"আবার বুঝি গুলি দিতে গেল গো! আচ্ছা আফিমই কতবার খায়? বেশী নেশা করে করে শেষে মদাত্যয় রোগ হয়ে মরবে।"

বিপিনবাবু জামার পকেট হইতে আফিমের কৌটা বাহির করিয়া এক গুলি সেবন পূর্ব্বক দ্রুতগতি আসিয়া চা পান করিতে আরম্ভ করিলেন, এমন সময়ে কর্ণে কলম্-গোঁজা ও খাতা বগলে তিন চারিজন আমলা যাইয়া অনন্তলালকে প্রণাম পূর্ব্বক সতরঞ্চের উপর উপবেশন করিল। চা পান সমাধা হইলে, অনন্তলাল বালিশের নিম্ন হইতে রুদ্রাক্ষের মালা বাহির করিয়া জপ

করিতে আরম্ভ করিলেন। মালাগাছটি প্রকাণ্ড। সচরাচর রুদ্রাক্ষের যে সকল জপমালা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চতুর্গুণ লম্বা।

বোধহয় অনন্তলাল শক্তিমন্ত্রধারী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমলারা বগল হইতে খাতা বাহির করিয়া, আপন আপন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। একজন একখানি খাতার মধ্য হইতে তিন চারিখানি পত্র বাহির করিয়া এক এক খানি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিল। অনন্তলাল মুখ নত করিয়া মালা জপিতেছিলেন। তাঁহার মনোযোগ জপে অথবা মজলিসস্থ লোকদিগের কথোপকথনে, কি পত্রে কোথায় ছিল বলা কঠিন। পত্র কয়খানি শেষ হইয়াছে এমন সময়ে, তিলডাঙ্গার নগদী দ্বারবান ও ব্রজেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। নগদী একখানি পত্র একজন আমলার হস্তে দিল এবং আমলা উহা লইয়া অনন্তলালের নিকট রক্ষা করিল। পরে দ্বারবান টাকার তোড়াটি তাঁহার চর্ম্মাসনের নিকট নামাইয়া দিয়া, পুনরায় যাইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল। তখন অনন্তলালের দৃষ্টি প্রথমে টাকার তোড়ার দিকে, পরে তাহাদিগের উপর ন্যস্ত হইল। তখনি নগদী ও দ্বারবান ভূমিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ব্রজেন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল এবং নিকটে তাহার পুঁটুলিটি ও তালিদেওয়া ছাতাটি দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিয়া, সতরঞ্চের উপর উপবেশন করিল।

অনন্তলাল বলিলেন,—"খাজাঞ্চী, পত্র খুলে চালান্ মিলিয়ে নাও।"

এই বলিয়া তিনি মালা জপিতে আরম্ভ করিলেন। তাড়াতাড়ি মালা শেষ করিয়া তিনি হঠাৎ একবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দ্রুতগতি ব্রজেন্দ্রের নিকটস্থ হইয়া তাহার পুঁটুলিটি বগলে ও তালিদেওয়া ছাতাটি মাথায় লইয়া গৃহের পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত পায়চারি করিতে আরম্ভ করিলেন। সে পায়চারিতে একটু নূতনত্ব ছিল। যাইতে যাইতে তাঁহার গুল্ফ নিতম্ব

স্পর্শ করিতে লাগিল। তাঁহার এই অদ্ভুৎ আচরণে তথাকার কেহই বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইল না। ইহাতে বোধ হয় এরূপ খেয়ালে অনন্তলাল অভ্যস্ত। কেবল তিলডাঙ্গার নগদী দুইজন এবং ব্রজেন্দ্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। একজন মোসাহেব বলিল,—"বা! বেশ মানিয়েচে।"

বিপিন বাবু বলিলেন,—"ওকে বিলক্ষণ মানায়?

তখন অনন্তলাল পুঁটুলি ও ছাতি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন ও বলিলেন,—"আমার কিন্তু অমনি করে পথ চল্‌তে ভারি ইচ্ছা হয়।"

এই সময়ে ব্রজেন্দ্রের উপর সকলের দৃষ্টি পড়িল। একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"ও ছাতি আর পুঁটুলিটি কি তোমার?"

ব্রজেন্দ্র বিনীতভাবে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হাঁ।"

"তোমার বাড়ী কোথায়?"

"আজ্ঞে, তিলডাঙ্গায়।"

অনন্তলাল একজন আমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে দিন তিলডাঙ্গার নায়েব যে ছেলেটির কথা বল্‌ছিল, একি সেই?"

তিলডাঙ্গার নগদী জোড়হাত করিয়া বলিল, "হাঁ ধর্ম্মাবতার।"

তখন তিনি ব্রজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?"

ব্রজেন্দ্র দণ্ডায়মান হইয়া যোড়হস্তে বলিল,—"শ্রীব্রজেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।"

অনন্তলাল বলিলেন,—তোমাকে দাঁড়াতে হবে না বোসো,—বসে বল।

ব্রজেন্দ্র উপবেশন করিল।

অনন্তলাল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কতদূর পড়েচ?"

"আজ্ঞে এণ্ট্রেন্স ক্লাসে টেষ্ট এগজামিন দিয়ে আর পরীক্ষা দেওয়া হয় নি।"

"টেষ্টে ফেল্ হয়েছিলে?"

"আজ্ঞে না, ক্লাসের মধ্যে ফাষ্ট হয়েছিলাম।"

তবে পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না কেন ?”

“আজ্ঞে, সেই সময়ে,—পরীক্ষা দেওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বে আমার বাবার মৃত্যু হ'ল। তারপর, তাঁর শ্রাদ্ধের কয়েকদিন পরে আমার ভয়ানক জ্বর হয়। সেই জন্য পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। সেই অবধি এপর্য্যন্ত এই দেড় বৎসর কাল পড়া বন্ধ করে বাড়ীতে বসে আছি।”

অনন্তলাল দেখিলেন ব্রজেন্দ্রের চক্ষু দুটি ছল ছল করিতেছে। তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। ভৃত্যগারা তাঁহার ভাণ্ডারীকে ডাকাইলেন। সে উপস্থিত হইলে বলিলেন,—এই ব্রাহ্মণের ছেলেটি এখান থেকে স্কুলে পড়বে; এর এখানে থাকবার বন্দোবস্ত করে দাও। একে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

“যে আজ্ঞা” বলিয়া ভাণ্ডারী ব্রজেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া নীচে চলিল। তখন অনন্তলাল ডাকিলেন,—“গাঙ্গুলি মহাশয় !

বাহিরে পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম কৃষ্ণবর্ণ একব্যক্তি তামাক সাজিয়া হাত ধুইতে ধুইতে গঙ্গাদেবীর স্তব আওড়াইতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে আধময়লা একখানি থান ও কাঁধে গামছা ;—নাম পঞ্চানন গাঙ্গুলি। ইনি অনন্তলাল বাবুর বাজার সরকার। প্রতিদিন বেলা এগারটার মধ্যে স্নানাহার শেষ করিয়া কলিকাতায় যান এবং তথা হইতে অনন্তলালের ফরমাশমত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে রতনপুরে ফিরিয়া আসেন।

গাঙ্গুলি মহাশয় উত্তর করিলেন; “আপনি এই স্নান করে এলেন ?”

গাঙ্গুলি মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিলেন,—“আজ্ঞে হাঁ—আ—আ—খেয়েও এসেচি।”

অনন্তলাল ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—“খেয়ে এসে স্তব আওড়াচ্চেন্? আপনার নিষ্ঠা খুব বেশী দেখচি। সে যাক এখন আপনি এই ছেলেটির জন্যে এক যোড় জুতো, জামা, কাপড়, চাদর আর একটি ছাতি এনে দেবেন। এর কাছে মাপ নিয়ে যাবেন।

“যে আজ্ঞে।”

তখন বিপিন বাবু বলিলেন, “জুতো বড়বাজার থেকে নেবেন।”

অনন্তলাল বলিলেন, “না, নেহাৎ খেলো নেবেন না, একটু ভাল দেখে নেবেন।”

"যে আজ্ঞে" বলিয়া গাঙ্গুলি মহাশয় যাইয়া কলিকায় ফুংকার দিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর আওড়ান বন্ধ হইল।

ভাণ্ডারী ব্রজেন্দ্রকে লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

বেলা দশটা বাজে দেখিয়া একজন আমলা নাম স্বাক্ষর করাইবার জন্য কয়েকখানি পত্র অনন্তলালের হস্তে দিল। তিনি তখন অন্যমনস্ক হইয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। সেই অবস্থাতেই পত্রগুলিতে নাম স্বাক্ষর করিয়া আমলার হস্তে দিলেন। তাহারাও স্ব স্ব কাগজপত্র লইয়া কাছারিবাড়ী চলিয়া গেল। তিলডাঙ্গার লোক দুইজনও তাহাদের সঙ্গে চলিল। পরে স্নানের সময় হইয়াছে দেখিয়া অনন্তলাল উঠিলেন এবং সভাভঙ্গ হইল।

ক্রমশঃ—

শ্রীনলিনীনাথ গুপ্ত।

শোক সংবাদ

নীহারবালা দেবী আর ইহজগতে নাই! আমরা শোকসন্তপ্ত! কেবল পরিচারিকার সুলেখিকা হিসাবে ও সহায়রূপে তিনি আমাদের অতিপ্রিয় ছিলেন না, কোচবিহারে মহিলাগণের উন্নতিবিধায়ক নানা সদনুষ্ঠানে প্রাণস্বরূপ থাকিয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমে, সহৃদয়তায়, কর্ম্মানুরাগে, আদর্শ চরিত্রে তিনি আমাদের আত্মীয়ার ন্যায় ছিলেন। কোচবিহারের মহিলা-সমিতির উন্নতির জন্য তিনি কি নাই করিয়াছেন! নীহার ছিলেন বাল-বিধবা, সংসারে প্রবিষ্ট না হইতেই তাঁহাকে হইতে হইয়াছিল ব্রহ্মচারিণী। প্রকৃতই তিনি ছিলেন ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ। বিধাতা যেন তাঁহাকে এই মহৎব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই সংসারের মহাপরীক্ষায় মহা দুঃখের ভিতর দিয়া তাঁহাকে কঠোরব্রত উদ্‌যাপনের উপযোগী করিয়াছিলেন। ভ্রাতা ভগিনী

তাঁহার অনেকগুলি। ইহাদিগের মাতার অধিক যত্নে লালন পালনের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। পারিবারিক সমস্ত কর্ম্ম, বিধিব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হইত। কিরূপ সুশৃঙ্খলা সহিষ্ণুতার সহিত তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম যথাযথ ভাবে সুসম্পন্ন করিতেন তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই জানেন। তাঁহার এই সেবাব্রত নিজ পরিবারেই আবদ্ধ ছিল না। অনেক পরিবারেরই শিশুগণের তিনি মাতৃ স্বরূপা ছিলেন। পিতৃসেবায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। পিতার মহাপ্রস্থানে তাঁহার মনপ্রাণ দেহ ভঙ্গিয়া দিয়াছিল, পিতৃশোক তিনি সামলাইতে পারিলেন না, তাহার ফলেই বুঝি কন্যার মহাপ্রস্থান। নীহার বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন নাই কিন্তু নিজের চেষ্টায় অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াও বহু বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা ভঙ্গী ছিল সুন্দর, চিত্তাকর্ষক। অকালে লোকান্তরিত না হইলে তাঁহার নিকট হইতে আশা করিবার অনেক ছিল। তাঁহার ইচ্ছা তিনিই জানেন। শান্তিময়ের ক্রোড়ে মুক্তাত্মা অনন্তশান্তি লাভ করুন।

নিবেদন।

নানা কারণে পরিচারিকা নিয়মিত সময়ে প্রকাশ করিতে না পারায় আমরা লজ্জিত। পরিচারিকা নিয়মিত প্রকাশের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আমরা আশা করি বর্ত্তমান বর্ষের বাকী দুই সংখ্যা যথাসত্বর প্রকাশ করিয়া আমরা নব-বর্ষে নিয়মিত সময়ে ৯ম বর্ষের পত্রিকা প্রকাশে সমর্থ হইব। আমাদের ত্রুটীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

বিনীত—কার্য্যাধ্যক্ষ।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
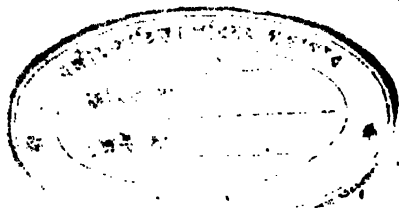
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৮ম বর্ষ।	আশ্বিন, ১৩৩১ সাল।	১১শ সংখ্যা।

সফলতার দেশ

সফলতার দেশ যে সেটা
নাইক কিছুই বাজে,
তুচ্ছ ঝরা তুঁতের পাতা
রেশম হয়ে রাজে।
ক্ষুদ্র বীজ হয় বনস্পতি
ভস্ম ও যে হয় বিভূতি
প্রভাতের এই প্রসূত কুসুম
নির্ম্মাল্য হয় সাঁঝে।

(২)

সাধনা হয় সিদ্ধি সেথা
আশীর্ব্বাদই বর
শুক্তি ক্ষত লবণ জলে
মুক্তা মনোহর।
লাজ ডুবে যায় লাবণ্যেতে
উথলে সুধা সে বন্যাতে,
মৃগীর ব্যথা কস্তুরী হয়
সৌরভ নির্ঝর।

( )

মরুর স্বপন মেরুর বুকে
সত্য যেমন হয়,
আমার স্বপন সেই দেশেতে
ফলবে সুনিশ্চয়।
কথা সেথায় দৈববাণী
ব্যথা সেথায় গীতের রাণী
বিন্দুতে আর ইন্দুতে হয়
হৃদয় বিনিময়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বৌদ্ধ-দর্শন

সৌত্রান্তিক।

এইবার তৃতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় সৌত্রান্তিকগণের বিষয় আলোচনা করিব। সৌত্রান্তিকগণের মতে বহির্জ্জগত যে নাই তাহা অসত্য কারণ বহির্জ্জগতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। অথচ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের ৩৫ পৃষ্ঠায় পাই যে সৌত্রান্তিকগণ এমন কোন বহির্জ্জগতস্থিত বস্তু স্বীকার করেন না যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। এই দুইটি উক্তির মধ্যে যে বিরোধ আছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বহির্জ্জগত মানিয়া যদি বলা হয় বহির্জ্জগতের কোন বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না তাহা হইলে বহির্জ্জগতকে একরকম অস্বীকার করাই হয়। বিবেকবিলাস স্থিত সৌত্রান্তিক মত সম্বন্ধে উল্লিখিত দ্বিতীয় উক্তি পরিত্যাগ করিয়া উপরোক্ত প্রথম মতটিই সৌত্রান্তিকগণের প্রকৃত মত ধরিয়া তাহাদের মতামত সম্বন্ধে এখন আলোচনা করিব।

সৌত্রান্তিকগণ বহির্জ্জগৎ স্বীকার করেন। কিন্তু এই বহির্জ্জগত প্রত্যক্ষের বিষয় নহে অনুমানের বিষয়।

যোগাচারগণ বলেন জ্ঞানের কর্ত্তা এবং জ্ঞানের বিষয় আমরা সকল সময়েই এক সঙ্গে অনুভব করি বা পাই। সেই জন্য জ্ঞানের কর্ত্তা (Subject) এবং জ্ঞানের বিষয়ের (Object) মধ্যে কোন পার্থক্য বা তারতম্য নাই—উহারা উভয়েই এক। সৌত্রান্তিকগণ বলেন এই যুক্তি স্বীকার করা যাইতে পারে না কারণ এমন অনেক বিষয় আছে যে উহাদের জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানের কর্ত্তা এক সঙ্গে প্রতিভাত হয় বলা সন্দেহজনক। সৌত্রান্তিকগণ আরও বলেন যে বিরুদ্ধগুণ সম্পন্ন বিষয় সম্পর্কেও আমরা জ্ঞানের কর্ত্তা ও জ্ঞানের বিষয় এক সঙ্গে অনুভব করি বা হৃদয়ঙ্গম করি। সুতরাং জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় এক হইলে ঐ বিরুদ্ধগুণ সম্পন্ন বিষয় এক হইয়া যায়! ক, খ, গ যদি পরস্পর বিভিন্ন বস্তু হয় তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি না ক=প, খ=প, গ=প, কারণ তাহা হইলে ক=খ=গ=প হইয়া পড়ে। সুতরাং জ্ঞানের কর্ত্তা ও জ্ঞানের বিষয় এক হইতে পারে না।

জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় এক হইতে পারে না।

জ্ঞানের কর্ত্তা ও জ্ঞানের বিষয় আমরা এক সঙ্গে অনুভব করিতে পারি না।

সৌত্রান্তিকগণের মতে জ্ঞানের কর্ত্তা ও জ্ঞানের বিষয় এক সঙ্গে অনুভূত হয় না এবং হইতে পারে না। জ্ঞান সর্ব্বদাই দ্বৈতভাব সম্পন্ন—ইহাই আমরা জানি এবং ইহাই আমরা সকল সময়ে অনুভব করি। জ্ঞানের কর্ত্তা ও জ্ঞানের বিষয়কে এক সঙ্গে, একই সময়ে এবং একই স্থানে অনুভব করা অসম্ভব। সুতরাং যোগাচারগণ যে বলেন আমরা জ্ঞানের কর্ত্তা এবং জ্ঞানের বিষয় এক সঙ্গে অনুভব করি তাহা অসত্য। সৌত্রান্তিকগণের মতে দুই বস্তুর জন্য দুইটি স্থানের প্রয়োজন এবং তাহাদের জ্ঞানের জন্য দুইটি সময়ের প্রয়োজন।

জ্ঞানের কর্ত্তা ও বিষয় এক হইলে সমস্ত বিষয়ই মানসিক অবস্থা বলিয়া ভাবিতাম।

সৌত্রান্তিকগণ আরও বলেন যদি তর্কের জন্য স্বীকারই করা যায় যে জ্ঞানের কর্ত্তা বা জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে কোন তারতম্য বা অবকাশ নাই তাহা হইলে জ্ঞানের সকল বিষয়ই মনের অবস্থা বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত এবং জ্ঞানের কোন বিষয়কেই মন বা জ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তু বলিয়া ভাবা অসঙ্গত। কিন্তু আমরা জ্ঞানের বহু বিষয়কে জ্ঞানাতিরিক্ত বা বহির্জগতস্থ বস্তু বলিয়া চিন্তা করি। যোগাচারগণ এইরূপ চিন্তা ভ্রমজনিত বলিয়াছেন। জ্ঞানের কর্ত্তা ও জ্ঞানের বিষয় প্রকৃত পক্ষে এক হইলে এই রকম ভ্রম হইবার একেবারেই সম্ভাবনা থাকিত না, বরং উভয় বস্তুকেই আমরা জ্ঞান রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করিতাম। সুতরাং বুঝা গেল যোগাচারগণের উক্তি সত্য নহে। অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ত্তা এবং জ্ঞানের বিষয় এক নহে। সুতরাং বহির্জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা অন্যায় এবং অযৌক্তিক।

এই সম্পর্কে যোগাচারগণ কহিয়া থাকেন যে নীলবর্ণ থাকার বিশিষ্ট বস্তু বাস্তবিক পক্ষে বহির্জগতের বস্তু নহে, জ্ঞান রাজ্যের বস্তু এবং ভ্রম বা illusionএ পড়িয়া আমরা ভাবি ঠিক যেন উহারা বহির্জগতেরই বস্তু এবং এই ভ্রমপূর্ণ ভাবনার জন্যই ঐ সকল বিষয়ে আমরা মনের ধর্ম্ম আরোপ করি না বা উহাদিগকে জ্ঞান রাজ্যের বস্তু বলিয়া চিন্তা করি না। এই কথাই বৌদ্ধ-গ্রন্থে অন্য প্রকারে পাওয়া যায়।

জ্ঞান রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত। উহার একাংশ, অপরাংশ হইতে বহির্ভাগে অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই দ্বৈতহীন জ্ঞান রাজ্য মধ্যস্থিত অবকাশ সমন্বিত দ্বৈত ভাব ভ্রমজনিত।

প্রকৃত পক্ষে যাহা জ্ঞান রাজ্য মধ্যে অবস্থিত, ভ্রমে পড়িয়া আমরা ভাবি তাহারা যেন বহির্জগতের বস্তু।

এই সকল কথা এবং যুক্তির অসারতা সৌত্রান্তিকগণ সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যদি বাহ্যজগতই না থাকিল যদি জ্ঞান রাজ্যের বাহিরে কোন বস্তু না রহিল তাহা হইলে বহির্জগতের ভাব বা idea আমাদের মনের মধ্যে উদয়ই হইতে পারে না কারণ সে রকম ভাবনার কোন কারণই থাকিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানের কর্ত্তা ও জ্ঞানের বিষয়কে এক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া পুনরায় বলা চলে না যে ভ্রমবশতঃ জ্ঞান-রাজ্যের একাংশ বহির্জগৎস্থিত বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ বহির্জগতের ভাবনা বা idea আমাদের মনে আসিতেই পারে না এবং অন্তর্জগতের বস্তু বহির্জগতের বস্তু বলিয়া ভ্রম করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কোন প্রকৃতস্থ মানব যেমন বলিতে পারে না বহুমিত্র পুত্রহীনা মাতার সন্তানের ন্যায় দেখাইতেছে তদ্রূপ জ্ঞানের কর্ত্তা ও জ্ঞানের বিষয় এক বলিয়া স্বীকার করিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিতে পারে না জ্ঞানের একাংশ বহির্জগতস্থিত বস্তুর ন্যায় ভ্রমক্রমে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং যোগাচারগণ যখনই বলেন জ্ঞানের একাংশ বহির্জগতস্থিত বস্তুর ন্যায় ভ্রমক্রমে প্রতীয়মান হয় তখনই তাঁহারা প্রকারান্তরে বহির্জগত স্বীকার করিয়া বসেন। তাঁহাদের মনে যে বহির্জগতের চিন্তা বা idea আছে তাহা তাঁহারা ঐ কথা বলিয়া অজ্ঞাতসারে স্বীকার করিয়া বসেন এবং এই রূপ চিন্তার কারণ স্বরূপ তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া বহির্জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং যোগাচারগণের নিক্ষিপ্ত তীর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের নিজের হৃদয়কেই বিদ্ধ করে।

বাহ্যজগত না থাকিলে বাহ্যজগতের ভ্রম হওয়া অসম্ভব।

সৌত্রান্তিকগণ আরও দেখাইয়াছেন যে যোগাচারগণের যুক্তি বৃত্তাভ্যাস বা Argument in circle দোষে দুষ্ট। কারণ যোগাচারগণ বলেন জ্ঞানের কর্ত্তা এবং জ্ঞানের বিষয় একই বস্তু, কারণ উহাদের সম্পর্কে আমাদের যে দ্বৈত বা পার্থক্য জ্ঞান তাহা ভ্রম বা Illusion ঘটিত। প্রতি পক্ষ যদি জিজ্ঞাসা করেন কেমন করিয়া আপনারা জানিলেন যে জ্ঞানের কর্ত্তা ও জ্ঞানের বিষয় সম্পর্কিত দ্বৈতজ্ঞান ভ্রম বা Illusion ঘটিত? তাহা হইলে যোগাচারগণ কহিবেন উহাদের দ্বৈতজ্ঞান ভ্রম বা Illusion ঘটিত কারণ জ্ঞানের কর্ত্তা ও জ্ঞানের বিষয় দুই নয়, এক। সুতরাং যোগাচারগণ অদ্বৈত ভাব প্রমাণ করেন ভ্রম বা Illusion দ্বারা

যোগাচারগণে যুক্তি বৃত্তাভ্যাস দোষে দুষ্ট।

আবার ঐ ভ্রম বা Illusion প্রমাণ করেন জ্ঞানের অদ্বৈত ভাব দ্বারা। এই রকম দুই যুক্তির নামই Argument in circle বা বৃত্তাভ্যাস।

সৌত্রান্তিকগণ পুনরায় দেখাইয়াছেন যে সকলেই বহির্জ্জগতস্থিত বস্তু সমূহকে নিঃসংশয় চিত্তে জ্ঞানের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করে এবং ঐ সকল বস্তু যে অন্তর্জ্জগত-স্থিত মানসিক অবস্থামাত্র একথা কেহ কখন ভাবেও না। প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে আমরা দেখিতে পাই সকলেই অন্তর্জ্জগতস্থিত মানসিক অবস্থা সমূহ অগ্রাহ্য করিয়া বহির্জ্জগতস্থিত বস্তু সমূহ লইয়াই ব্যাপৃত থাকে। সুতরাং যোগাচারগণ যে বলেন জ্ঞানের বিষয় ও কর্ত্তা এক তাহা একেবারে অসত্য। গোবর দ্বারা প্রস্তুত দুগ্ধান্ন বা পায়স যেমন অসত্য এবং অসম্ভব তেমনই যোগাচারগণের উক্তি অসত্য এবং অসম্ভব।

ব্যবহারিক জীবনে সকলেই বহির্জ্জগত স্বীকার করেন।

প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন যে বহির্জ্জগত স্বীকার করিলে সেই জগতের সহিত জ্ঞানের কর্ত্তা বা জ্ঞান রাজ্যের একত্র সমাবেশ বা সংশ্রব সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে এই সংশ্রব বা একত্র সমাবেশের অভাবের জন্য বহির্জ্জগত স্বীকার করিলেও উহা জানা সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তরে সৌত্রান্তিকগণ বলেন যে ঐরূপ যুক্তি সত্য নহে। কারণ বহির্জ্জগতের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বা সংশ্রব আছে। এই ইন্দ্রিয়ের সহিত আবার জ্ঞানের কর্ত্তার সংযোগ বা সংশ্রব আছে। সুতরাং কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইবার সময়ে বহির্জ্জগতস্থিত বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আপনার রূপ ছাপ (Form) ঐ জ্ঞানের উপর মুদ্রিত করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানের কর্ত্তা অর্থাৎ Subject জ্ঞানের ঐরূপ ছাপ বা Form দেখিয়া বহির্জ্জগতস্থিত বিষয় বা Object এর অস্তিত্বের কথা জানিতে পারে এবং সেই সঙ্গে তাহার স্বরূপও অনেকটা জানিতে পারে।

বহির্জ্জগতের সহিত জ্ঞানের সংশ্রব সম্ভবপর কি না।

এইখানে Lockeএর Tabula rassaর ভাব সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। লকের মতে আমাদের মন একটি সাদা শ্লেটের মত। বহির্জ্জগতের বস্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঐ শ্লেটের উপর নিজ নিজ রূপের ছাপ আঁকিয়া ফেলে। এবং সেই ছাপ দেখিয়া মন বুঝিতে পারে বহির্জ্জগতে কোন কোন বস্তু বিদ্যমান আছে এবং তাহাদের স্বরূপ কি? সৌত্রান্তিকগণও ঠিক এই কথাই লকের

সৌত্রান্তিকগণ ও Locke.

বহু পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন। অথচ স্কটল্যাণ্ডের এক মহা পণ্ডিত তাঁহার নব প্রকাশিত পুস্তকে বলিয়াছেন বুদ্ধদেব ন্যায় শাস্ত্র জানিতেন না এবং বৌদ্ধদর্শনে ন্যায় শাস্ত্রের নিয়ম পাওয়া যায় না। অথচ সৌত্রান্তিকগণ যে ভাবে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন সে ভাবে যুক্তিপ্রদর্শন করিতে ইউরো-আমেরিকার বড় বড় উপাধিধারী প্রতিষ্ঠযশা পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সুবৃহৎ পুস্তকাবলীতে সমর্থ হয় নাই। সৌত্রান্তিকগণের প্রদর্শিত যুক্তির জন্য বর্ত্তমান সময়ের যে কোন দার্শনিক আপনাকে নিঃসন্দেহ চিত্তে ধন্য মনে করিতেন।

প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন বহির্জগত স্বীকৃত হইলে অতীত বিষয়ের জ্ঞান সম্ভবপর হয় না; কারণ যাহা অতীত তাহার সহিত ইন্দ্রিয় বা মনের কোন সংযোগ থাকিতে পারে না, এবং এই সংযোগের অভাব হইবে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও অভাব স্বীকার করিতে হয়।

অতীত বিষয়ের জ্ঞান সম্ভবপর কি না?

ইহার উত্তরে সৌত্রান্তিকগণ বলেন যে প্রতিপক্ষের কথা হইতেই বুঝা যায় যে অতীত বিষয়টি অতীতকালে প্রত্যক্ষের বস্তু ছিল। সুতরাং তখন উহার সহিত ইন্দ্রিয়ের এবং মনের সংযোগ ছিল এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও উহা জ্ঞানের উপর আপনার ছাপ আঁকিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমানে যদিও ঐ বস্তুটি উপস্থিত নাই তথাপি জ্ঞানরাজ্যে উহা যে আপনার ছাপ আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। সেইজন্য ঐ ছাপ দেখিয়া আমরা অতীত বিষয়টি অনুমান করিতে পারি। অর্থাৎ এখনও ঐ অতীত বিষয়ের জ্ঞান আমাদের পক্ষে সম্ভবপর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে একজনের চক্‌চকে চেহারা দেখিয়া আমরা যেমন অনুমান করি ঐ ব্যক্তি পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিয়া আসিতেছে, ভাষা হইতে যেমন লোকের

জ্ঞানের আকৃতি দেখিয়া আমরা বহির্জগত অনুমান করি।

জাতি অনুমান করা যায় এবং চঞ্চল গতি দেখিয়া যেমন প্রেম অনুমান করা যায় তদ্রূপ জ্ঞানের আকৃতি বা form দেখিয়া জ্ঞানের বিষয় বা বহির্জগতস্থিত বস্তু অনুমান করা যায়। এই জন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধগণ বলিয়া গিয়াছেন যে বহির্জগতস্থিত বস্তু বা জ্ঞাতব্য বিষয় তাহার অর্দ্ধেক সত্তা দ্বারা জ্ঞানের উপর আপনার আকৃতি অঙ্কিত করিয়া দেয় কিন্তু ঐ কার্য্যের জন্য ঐ অর্দ্ধেক সত্তার স্বরূপ কোন প্রকারেই নষ্ট হয় না। সেইজন্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রকৃতির জন্যই আমরা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারি।

এই অংশটুকু গাফ্ মহোদয় বোধহয় নির্ভুলরূপে তর্জ্জমা করিতে পারেন নাই। বহির্জগতের বস্তুর অর্দ্ধেক সত্ত্বা জ্ঞানের উপর উহার আকৃতি অঙ্কিত করে এরূপ কথা সৌত্রান্তিকগণ বলিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হয়। বোধহয় এই স্থানটুকুর তাৎপর্য্য এই—জ্ঞানের অর্দ্ধেক অংশের উপর অর্থাৎ যে অংশকে আমরা object বা জ্ঞানের বিষয় বলিয়াছি তাহার উপর জ্ঞাতব্য বিষয় বা বহির্জগতস্থিত বস্তু আপনার আকৃতি অঙ্কিত করে এবং এই আকৃতি মুদ্রিত করার জন্য জ্ঞানের এই অর্দ্ধাংশ তাহার প্রকৃতি হারাইয়া ফেলে না অর্থাৎ উহা জ্ঞানের বিষয়ই রহিয়া যায়। সুতরাং জ্ঞানের এই অর্দ্ধাংশের আকৃতি দেখিয়া জ্ঞানের অপরাংশ অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ত্তা বহির্জগতের বস্তুর প্রকৃতি অনুমান করিতে পারে।

গাফ মহোদয়ের তর্জ্জমা যথার্থ কি না?

সৌত্রান্তিকগণের মতে আন্তর্জাগতিক অনুভূতি হইতে কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না, কারণ উহা সর্ব্বত্রই এক প্রকারের এবং জ্ঞান যদি পার্থক্য রহিত হয় তাহা হইলে জ্ঞানের সকল বিষয়ই পার্থক্য বিরহিত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ত্তা ও জ্ঞানের বিষয় এক বলিয়া স্বীকার করিলে সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই এক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্ঞান এক প্রকারের। কিন্তু আমরা জানি জ্ঞাতব্য বিষয় বিভিন্ন প্রকারের, সুতরাং আমরা মানিতে বাধ্য জ্ঞানের কর্ত্তা ও বিষয় এক নয়।

কেবলমাত্র মানসিক অনুভূতিতে জ্ঞান জন্মে না।

বহির্জগস্থিত বস্তুর প্রমাণের জন্য সৌত্রান্তিকগণ নিয়লিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি একটি বস্তু বিদ্যমান থাকা কালীন অন্যান্য বস্তু সময় সময় আবির্ভূত হয় তাহা হইলে ঐ সকল বস্তুর আবির্ভাবের কারণ প্রথমোক্ত বস্তুটি হইতে পারে না, উহাদের আবির্ভাবের কারণ ঐ বস্তুটি হইতে স্বতন্ত্র। ঐ বস্তুটি এই সকল বস্তুর কারণ হইলে ইহারা সকল সময়েই এই বস্তুটি বিদ্যমান হইলে আবির্ভূত হইত। সূর্য্য যখন উদয় হয় তখন কখনও মেঘ দেখা যায় আবার কখনও মেঘ দেখা যায় না, সুতরাং মেঘের কারণ সূর্য্য হইতে পারে না। মেঘের কারণ সূর্য্য হইলে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকল সময়েই মেঘ দেখিতে পাইতাম। এইরূপ সহজ বোধ্য উপমা না দিয়া সৌত্রান্তিকগণ জটীল উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। গাফ্ মহোদয়ের তর্জ্জমার গুণে উহা আরও জটীল হইয়া পড়িয়াছে।

বহির্জগতের প্রমাণ।

কার্য্য কারণত্ব।

সৌত্রান্তিকগণ কহিয়াছেন—মনে করুন আমার এখন কোন কথা বলিবার বা ভ্রমণ করিবার কোন ইচ্ছা নাই। সুতরাং এই সময়ের কোন কথাবার্ত্তা বা ভ্রমণের কর্ত্তা আমার মন বা জ্ঞান হইতে পারে না, সেইজন্য উহাদের কর্ত্তা মনের বহির্স্থিত কোন বস্তু বা ব্যক্তি। কারণ জ্ঞানের কর্ত্তা বরাবরই বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু জ্ঞানের বিষয় এ ক্ষেত্রে কথাবার্ত্তা বা ভ্রমণ সময় সময় আবির্ভূত হইতেছে। সুতরাং জ্ঞানের কর্ত্তা দ্বারা এই সকল জ্ঞানের বিষয় সৃষ্ট হইয়াছে বলা নিতান্ত অসঙ্গত। এইরূপ নানা প্রকারের কার্য্যকারণত্ব আমাদের মনের সম্মুখে আবির্ভূত হয় এবং সময় সময় এই সকল কার্য্যকারণত্ব নীল বর্ণ বা অন্য কোন আকারে দেখা দেয়। কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণস্থায়ী কার্য্যকারণত্বের সঙ্গে আমরা উহাদের জ্ঞানের কর্ত্তাকে বরাবরই অনুভব করিয়া থাকি! সুতরাং ঐ সকল ক্ষণস্থায়ী কার্য্যকারণত্বময় নীল রং প্রভৃতির স্রষ্টা কিছুতেই আমাদের জ্ঞানের কর্ত্তা বা মন হইতে পারে না। কারণ ঐরূপ হইলে আমরা সদা সর্ব্বদাই কার্য্যকারণত্বময় নীল রং প্রভৃতি জ্ঞানরাজ্যে দেখিতে পাইতাম। সৌত্রান্তিকগণের মতে জ্ঞানের কর্ত্তার অনুভূতিই আত্মারূপে প্রতীয়মান হয় এবং কার্য্যকারণত্বময় বহির্জ্জাগতিক বস্তু সমূহ নীল রং প্রভৃতিরূপে প্রতীয়মান হয়। এই জন্যই প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে আছে—

অন্বা কি ?

জ্ঞানের কর্ত্তার অনুভূতিই আত্মারূপে প্রতীয়মান হয়। আর কার্য্যকারণত্বের আবির্ভাবই নীল রং প্রভৃতিরূপে প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং সৌত্রান্তিকগণের মতে জ্ঞানের কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ আন্তর্জাগতিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে উহার সম্পূর্ণতা বিধান নিমিত্ত জ্ঞাতব্য বহির্জগত স্বীকার করা কর্ত্তব্য। এবং এই বহির্জগতই যে কার্য্যকারণত্বময় বস্তু বা বিষয় সমূহ উপস্থাপন করে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই বহির্জগতই কার্য্যকারণত্বের কর্ত্তা। যোগাচারগণের মতে বহির্জগত জ্ঞানেরই অংশ বিশেষ এবং জ্ঞান বা চিন্তাদ্বারা সৃষ্ট এবং সময় সময় চিন্তা দ্বারাই জ্ঞান রাজ্যে উপস্থাপিত হয়। এই মত সৌত্রান্তিকগণের মতে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কিন্তু বহির্জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এবং বহির্জগত জানা যায় বলিয়াও সৌত্রান্তিকগণ এমন কথা বলেন না যে বহির্জাগতিক বস্তু প্রত্যক্ষ করি বা অপরোক্ষ ভাবে জানি। তাঁহাদের মতে বহির্জগত আমরা

চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধদার্শনিকগণের মতের সারাংশ।

গৌণ ভাবে অর্থাৎ অনুমান বা Inference দ্বারা জানি। এই জন্য সৌত্রান্তিকগণকে Representationists বলা হয়। এইখানেই সৌত্রান্তিকগণের সহিত বৈভাষিকগণের পার্থক্য। এই জন্যই বিবেকবিলাসে বলা হইয়াছে সৌত্রান্তিকগণ বহির্জগত স্বীকার করে না, কারণ বহির্জগত তাঁহারা শুধু অনুমান করেন, অপরোক্ষ ভাবে বা Directly জানেন না। গাফ মহোদয়ের এ সম্বন্ধে টীকা টিপ্পনী ইত্যাদি দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা না দিয়া বিষয়টি অস্পষ্ট রাখিয়া দিয়াছেন। যোগাচারগণ শুধু জ্ঞানই স্বীকার করেন জ্ঞানাতিরিক্ত কিছুই স্বীকার করেন না, সেই জন্য তাঁহাদিগকে Subjective idealists বলা হইয়াছে।

সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতের পার্থক্য।

যোগাচারগণকে বিজ্ঞানবাদী বলা হইয়া থাকে। বৈভাষিক নামক বৌদ্ধগণ বহির্জগত স্বীকার করেন। কিন্তু সৌত্রান্তিকগণের সহিত ইঁহাদের অনৈক্য যে নাই তাহা নহে। সৌত্রান্তিকগণের মতে বহির্জগত জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত এবং জ্ঞান হইতে অনুমেয় কিন্তু জ্ঞান হইতে বিভিন্ন অর্থাৎ বহির্জগত জ্ঞানরাজ্যের Complement. বৈভাষিকগণের মতে বহির্জগত জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত নহে, উহা জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং ভিন্ন। অর্থাৎ বহির্জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, উহা জ্ঞানরাজ্যের অপরপিঠ বা Complement নহে।

ক্রমশঃ—

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

দূরের তরী।

(গান)

দূরের তরী! —স্রোতের 'পরি!—
আসুচে নেচে কোন অপ্সরী!—
শুভ্র অমল পালের বাসে,
হচ্চে মনে,—ফুলটি ভাসে;

চম্‌কে পুনঃ জড়োয়া-জরি !
দূরের তরী !
(আয় নেচে আয় গো,—
ঢেউএর 'পরি, মনটি ভরি' !)
আস্‌চে উজল ধবল বেশে
একটি কি রাজহংস ভেসে' ?—
আব্‌ছা-দেখা রূপের রেখা,
স্বপ্নেরি কোন্ সুরের লেখা,
অনুভূতির থির-বিজরী !
দূরের তরী !
(আয় নেচে আয় গো,—
ঢেউএর 'পরি, মনটি ভরি' !)

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ।

অনন্তলাল ।

—:*:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

জমীদার মহাশয়ের স্নেহ-অনুগ্রহ-দৃষ্টি লাভ করিতে ব্রজেন্দ্রের বেশী বিলম্ব হইল না। তিনি তাহার অবস্থিতির জন্য সুসজ্জিত ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পরদিন তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি প্রাতে ও বৈকালে আমার লাইব্রেরীতে বসে পড়াশুনা করবে। লাইব্রেরী ঘরের ভার তোমার ওপোর রইল। পড়াশুনা মন দিয়া আরম্ভ কর। এই মাসেই তোমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেব।"

জনৈক ভৃত্য ব্রজেন্দ্রকে পুস্তকাগার দেখাইয়া দিল।

অনন্তলালের পুস্তকাগার একটি দেখিবার জিনিষ। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সংস্কৃত, ইংরাজী ফরাসী, জার্ম্মান, আরবি, ফার্সি ও বাঙ্গলা ভাষার মূল্যবান পুস্তক সকল সংগ্রহ করিয়া, নিজ আলয়ে, এক প্রকাণ্ড হল মধ্যে বহুমূল্য কাচের আলমারি সমুহে রক্ষা করিয়াছিলেন। এ বয়সেও তিনি প্রকৃত ছাত্র ছিলেন—এক দিকে যেমন স্নো-সাহেবের তেল অঞ্জলি তাঁহাকে স্নেহাভিষিত করিত, অপর দিকে, বিদ্যাদেবীর স্নেহরসে তিনি অতুল আনন্দ লাভ করিতেন; অনন্তলালের স্বভাব ছিল কেমন জলে তেলে মিশান।

ব্রজেন্দ্র দেখিল হলমধ্যে শ্বেতপ্রস্তরের একটি বৃহৎ গোল টেবিল; টেবিলের চতুর্দ্দিকে বড় চেয়ার এবং তন্মধ্যে একখানির উপর প্রায় দ্বাত্রিংশৎ বৎসর বয়স্ক একজন গৌরবর্ণ যুবক বসিয়া আছেন। ইঁহার গাত্র অনাবৃত, শরীর কিঞ্চিৎস্থূল পরিধানে ফরাশ ডাঙ্গার কালাপেড়ে কোঁচান কাপড়, পায়ে বার্ণিশকরা নূতন চটি, মস্তকে বাঁকা টেরি, এবং স্কন্ধদেশ শ্বেতবর্ণ যজ্ঞোপবীত। টেবিলের উপর পানে পরিপূর্ণ রৌপ্যানির্ম্মিত একটি বাটা রহিয়াছে। বাটার পার্শ্বে চাবির থলে। তাঁহার পার্শ্বদেশে তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক বসিয়া একখানি বাঁধান খাতায় কি লিখিতেছিল। যুবকের গাত্রে আধময়লা জামা, পরিধানে ঐরূপ একখানি বিলাতী কাপড়, মাথায় চেড়া সিঁথি ও পদে বার্ণিশকরা পুরাতন বুট জুতা। তাহার চক্ষুদুইটি কিঞ্চিৎ বসা ও তাম্রবর্ণ। একজন হিন্দুস্থানী কুলী বাহিরে বসিয়া পাখা টানিতেছিল। বাবুটি পান চিবাইতেছিলেন ও যুবকের লেখা দেখিতেছিলেন।

পুস্তকগারে প্রবেশের পূর্ব্বে ভৃত্যমৃদুস্বরে বলিল "জামাইবাবু বসে আচেন।"

অনন্তলালের পুত্র সন্তান হয় নাই—কেমন মাত্র একটি কন্যা। তিনি বহু অনুসন্ধানের পর এক এ, পাশ করা এবং উচ্চবংশজাত এই পাত্রের সহিত কন্যারে বিবাহ দিয়া, জামাইকে নিজগৃহে রাখিয়াছিলেন। জামাতার নাম রসরাজ মুখোপাধ্যায়। কন্যার বিবাহের অল্প দিন পরে অনন্তলালের পত্নিবিয়োগ হয়। তাহার পর আর তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। কন্যার একটি পুত্র,—নাম চিন্তামনি, বয়স নয় বসৎর।

ব্রজেন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জামাইবাবুকে নমস্কার করিল। তিনি প্রত্যভিবাদন করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতেই ভৃত্য তাহার পরিচয় দিল। তখন জামাইবাবু ব্রজেন্দ্রকে

একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া লিখিতেছিল, লেখা বন্ধ করিয়া সে আগন্তুকের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকাইয়া দৃষ্টি নত করিল।

লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রজেন্দ্র চমৎকৃত হইয়া গেল। একস্থানে, এমন সুন্দর বাঁধান, এত অধিক পুস্তক সে কখনও দেখে নাই।

জামাইবাবু তাঁহার সহচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিধুবাবুর টপ্পা আর জান ?"

"আজ্ঞে না, যে কয়খানি জান্‌তুম লিখে দিলুম। এখন একবার আমি উঠি—কাজ আছে—আবার ওবেলা আস্‌ব।"

এই বলিয়া সে ব্যক্তি প্রস্থান করিল।

তখন রসরাজ যত্নপূর্ব্বক খাতাখানি নিকটে রাখিয়া, ব্রজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

ব্রজেন্দ্র নাম বলিল।

রসরাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদূর পড়েচ ?"

ব্রজেন্দ্র বলিল, "টেষ্ট্‌ এগজামিন্‌ দিয়ে আর এপিয়ার হওয়া হয় নি।"

"কেন ?"

"শরীর অসুস্থ হয়েছিল।

"তুমি কি প্রথম থেকে এণ্ট্রেন্স স্কুলে পড়েছিলে ? তোমাদের ভিলডাঙ্গায় কি ইংরাজী স্কুল আছে ?"

"আজ্ঞে, না আমি প্রথমে নবদ্বীপের স্কুলে পড়েছিলাম।"

"সেখানে তোমার কে আছেন ?"

"সেখানে আমার মামার বাড়ী।"

"আমারও মায়ের মামার বাড়ী নবদ্বীপে। আমি ছোট বেলায় মায় সঙ্গে একবার নবদ্বীপে গিয়েছিলাম। তোমার মামার বাড়ী কোন পাড়ায় ?"

ব্রজেন্দ্র বলিল "আগমেশ্বরী তলায়। মামাদের এখন আর কেউ নাই, কেবল আমার মাতামহী আছেন।"

রসরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মাতামহের নাম কি ছিল ?"

৺শ্রীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।"

"শ্রীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় তোমার মাতামহ? তিনি যে আমার মার মামা। তোমার পিতাঠাকুরের নাম কি ছিল? তারাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় না?"

ব্রজেন্দ্র বিস্মিতের ন্যায় উত্তর দিল আজ্ঞে হাঁ!

রসরাজ অপেক্ষাকৃত উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "তিনি যে আমার মেসো হতেন! অনেক দূরে বাড়ী; তোমার বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার ও প্রান্তে আর আমার বাড়ী নদে জেলার এ প্রান্তে; সর্ব্বদা খবর পাবার যো নাই। আর আমিও অনেকদিন হতে রতনপুরেই থাকি, বাড়ী বড় যাই না, তা হলেও কখন তোমাদের খবর পেতাম।"

তখন ব্রজেন্দ্র চেয়ার হইতে উঠিয়া রসরাজের পদধূলি গ্রহণ করিল। রসরাজ অল্প হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, "হয়েচে থাক্। তুমি এখানে এসেচ, ভাল হয়েচে। এইখানে থেকে পড়াশুনা কর।"

উভয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত ভৃত্য আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া বলিল,—"এই বইখানি বাবু আপনাকে নিয়ে যেতে বল্লেন। কাগজে লেখা আছে— "শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, শ্রীধরস্বামী কৃত টীকা ও শঙ্কর [illegible] ভাষ্যসমেত।"

রসরাজ কাগজ পড়িয়া বলিয়া দিলেন "[illegible] পূর্ব্বদিকের বড় বড় ছয় সাতটি আলমারিতে কেবল সংস্কৃত বই আছে; তুমি একটু [illegible]।"

ব্রজেন্দ্র উঠিয়া পুস্তক খুঁজিতে গেল, এবং অনতিবিলম্বে দেবনাগরী বড় বড় অক্ষরে ছাপা সুন্দর বাঁধন একখানি পুস্তক লইয়া আসিল। রসরাজ বলিলেন, "বই দেখি;"—পরে পুস্তক হস্তে লইয়া মলাটে সোনার জলে লেখা পড়িয়া বলিলেন, "হাঁ এই বটে; দাওগে।"

ব্রজেন্দ্র যাইয়া পুস্তকখানি অনন্তলালের হস্তে দিল। তিনি পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পুস্তক খুলিয়া তন্মধ্য হইতে একটি শ্লোক বাহির করিতে ব্যস্ত হইলেন। একজন ভদ্রবেশধারী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। টেবিলের নিম্নে বসিয়া মালা জপিতে জপিতে হরিশ তাঁহাকে বলিতেছিল, "ওগো ত্যাগ ভিন্ন কিছু হবেক নি।" পরে কাপড়ের ভিতর হইতে বাম হস্তটি বাহির করিয়া উহা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিতে লাগিলেন, "সব ত্যাগ, বিষয় বাসনা ত্যাগ, ভোগ বাসনা ত্যাগ, ত্যাগ ভিন্ন কিছু হবেক্ নি।"

ইতি মধ্যে অনন্তলাল পুস্তক হইতে অভিলষিত শ্লোকটি বাহির করিয়া ভদ্রলোকটিকে বলিলেন "আপনি বলছিলেন, ভিতরে যদি বৈরাগ্য থাকে, তা হলে বাইরে নেংটি মারবার প্রয়োজন হয় না কিন্তু বাইরে ত্যাগেরও প্রয়োজন। যে জিনিষ বাইরে ত্যাগ না করবেন তা মন থেকে কিছুতেই যাবে না আপনি বলছিলেন আমাদের দেশের সন্ন্যাসীরা জুতা জামা ইত্যাদি ত্যাগ করে কৌপিন পরে কেন ও সকল ভিতরে ত্যাগ করলেই হল। কিন্তু সে সকল পরতে গেলেই সময়ে সময়ে মনেও তার অভাব না এসে যায় না, চিন্তা করতে হবে। চিন্তা করতে গেলেই আসক্তি হবে,—তা হলেই পতন। ভগবান অর্জ্জুনকে বলেচেন,

'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃসংমোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

(গীতা—দ্বিতীয় অধ্যায়)

'অর্থাৎ মনের দ্বারা বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের আশক্তি উৎপন্ন হয়। আশক্তি হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধের উদয় ক্রোধ হইতে সংমোহ, সংমোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মনুস্য অধঃপাতে যায়।'

"সেই জন্যই সন্ন্যাসীরা অন্তরে যেমন্ তেমনি বাহিরেও ত্যাগ করে কৌপিন পরে থাকেন।"

অনন্তলালের কথা শেষ হইলে বিপিনবাবু বলিলেন,—"বাবু যেমন বললেন, তেমনি রামকৃষ্ণপরমহংসও বলেচেন যে গীতার অর্থ 'গীতা' শব্দ উল্টো করলে যা হয় তাই, অর্থাৎ ত্যাগী।"

অনন্তলাল বলিলেন, তা ছাড়া তিনি আরও বলেচেন যে, বাবুর মত সাজ্ গোজ্ করলেই শরীরে রাজসিক ভাবের উদয় হয়, তখন টপ্পা গাইতে ইচ্ছা করে। কথাটা খুব ঠিক।"

এই বলিয়া তিনি ব্রজেন্দ্রকে পুস্তকখানি প্রত্যার্পণ করিলেন ও বলিলেন, "যেখানে ছিল সেই খানে রাখ গে।"

সেই দিন স্নানের পর জামাই বাবু ব্রজেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ভোজনার্থ অন্দরে গমন করিলেন। প্রতি দিন ভোজনের সময়ে তাঁহার স্ত্রী সরলা নিকটে বসিতেন। আজি একজন

অপরিচিতকে দেখিয়া, তিনি তাহার সাক্ষাতে বাহির হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া রসরাজ বলিলেন, "ব্রজেন্দ্রকে লজ্জা কর্‌তে হবে না—এ আমার ভাই—মাসির ছেলে।"

এই বলিয়া তিনি সম্পর্ক বুঝাইয়া দিলেন; সে তাঁহার ভাই হয় শুনিয়া সরলা ও তাহার সহিত আরও দুই চারিজন স্ত্রীলোক যাইয়া তাঁহাদের নিকট উপবেশন করিল। তাহাদের মধ্যে একটি কিশোরী ছিল। তাহাকে দেখিয়া রসরাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শিশির কুমারী যে। কি মনে করে?"

বালিকা মুখখানি নত করিয়া রহিল, কিছুই বলিল না। তাহার পার্শ্বে উপবিষ্টা একটি স্ত্রীলোক বলিল, "আমরা যেমন তোমার ভাইকে দেখ্‌তে এসেচি, তেমনি শিশিরও এসেচে। কেমন শিশির?"

স্ত্রীলোকেরা ব্রজেন্দ্রের নিবাস ও রসরাজের সহিত তাহার সম্পর্ক সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছে এমন সময়ে অনন্তলাল বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পরিধানে একখানি লোহিতবর্ণ পট্টবস্ত্র এবং গলদেশে ঐ রংয়ের পট্টবস্ত্রের একখানি উত্তরীয়। তাঁহাকে দেখিয়া রসরাজ বলিলেন, "শ্বশুর মহাশয় হোম কর্‌তে আসচেন।"

তাঁহার কথায় স্ত্রীলোকেরা সসম্ভ্রমে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ব্রজেন্দ্র এতক্ষণ মুখনত করিয়া ভোজন করিতেছিল। রসরাজের কথায় সেও মুখ তুলিল। অনন্তলালের দিকে চাহিতে গিয়া ব্রজেন্দ্রের চক্ষু শিশির কুমারীর দিকে পতিত হইল। এরূপ গঠন মাধুর্য্য মনুষ্য শরীরে সে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। ভগবান যেন এদেহে রূপের ডালি সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ব্রজেন্দ্র নিমেষের মধ্যে সেরূপরাশি হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অনন্তলালের উপর ন্যস্ত করিল, এবং তিনি নিকটস্থ হইলে পুনরায় মুখ নত করিয়া ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

শিশিরকুমারী সম্পর্কে অনন্তলালের ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁহার মাতুল কলিকাতাবাসী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর অল্প দিন পরে পুত্রও কালকবলে পতিত হইলেন। তাঁহার কেবল মাত্র একটি কন্যা ছিল। তিনি মৃত্যুকালে অনন্তলালের হস্তে কন্যার লালনপালনের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। কন্যা অনন্তলালের বাটীতে প্রতিপালিত হইতেছিল।

শিশিরের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রম হইয়াছে মাত্র। যেমন হংসমধ্যে একটি রাজহংস, মৃগযুথের মধ্যে যুথপতি এবং পদ্মবনে একটি শতদল পদ্ম থাকিলে লোকে স্বতঃ প্রবৃত্ত সেই দিকে দৃষ্টিপাত করে সেইরূপ স্ত্রীগণ মধ্যে শিশির কুমারী থাকিলে দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষিত হইত। শিশিরকুমার যুবতী নহে কিন্তু এই কৈশোর বয়স্কা বালিকার যে লাবণ্যের বিকাশ হইয়াছিল তাহা যৌবন অপেক্ষা মনপ্রাণশীতলকারী, সে লাবণ্যে অতি কোমল, তাহাতে তীব্রতার লেশমাত্র মাত্র নাই। সে বিম্বোষ্ঠ দুইটির মধুর হাস্যে যেন কতই মুদুমাধুরী উদ্গীরণ করিত।

শিশিরকুমারী শৈশব হইতে অতি যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাহার যখন যাহা ইচ্ছা হইয়াছে তখনি তাহা পূর্ণ হইয়াছে। পিতার পরলোক গমনের পর তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অনন্তলালও সাধ্যমত ক্রটি করিতেন না। তাহার বিপুল সম্পত্তি হইতে মাসে মাসে তাহার জন্য টাকা আসিত। অনন্তলাল সে টাকা সরলার নিকট রাখিয়া দিতেন শিশিরের যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তাঁহার নিকট চাহিয়া লইত।

অনন্তলাল রসরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?"

"আজ্ঞে, আমার মায়ে আর ব্রজেন্দ্রের মায়ে সাক্ষাৎ মামাতো পিসতুত ভগ্নি—আমার মার মাতুল ব্রজেন্দ্রের মাতামহ।"

"ব্রজেন্দ্রের মামার বাড়ী কোথায়?"

"নবদ্বীপে।"

অনন্তলাল আর কিছু না বলিয়া, হোমঘরে যাইয়া প্রবেশ করিলেন।

ভোজনান্তে আচমন করিতে করিতে ব্রজেন্দ্র রসরাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু এত বেলায় আহ্নিক করতে এলেন? সন্ধ্যা, আহ্নিক, হোম শেষ করে ভোজন করতে তাঁর অনেক বেলা হবে।"

রসরাজ উত্তর করিল, "সন্ধ্যা, আহ্নিক কিছুই করবেন না; কেবল হোম—তাও পুরোহিত সব কাজ সেরে রেখেচেন। ইনি কেবল অঞ্জলী ভরে যব নিয়ে, হোমকুণ্ডে ফেলে দেবেন তা হলেই হল। তার পরেই এসে ভোজন করবেন।"

এরূপ সংক্ষেপে হোম করিবার পদ্ধতি ব্রজেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করে নাই, সুতরাং তাহাকে বিস্ময়ে আবিষ্ট করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পর দিবস প্রাতঃকালে, দ্বিতলে রসরাজের বসিবার ঘরে ব্রজেন্দ্র ও রসরাজ রতনপুরের স্কুলে ব্রজেন্দ্রের পড়িবার কথা হইতেছিল। এমন সময়ে একজন দ্বারবান আসিয়া বলিল যে, বাবুর ঘরে বাজার সরকার মহাশয় ব্রজেন্দ্রকে ডাকিতেছেন। ব্রজেন্দ্র ত্রিতলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অনন্তলাল আফিম্ ও চা সেবন সমাধা করিয়া, মালা জপিতেছেন এবং মজ্‌লিসস্থ লোকদিগের গল্পে এক এক্‌বার যোগ দিতেছেন। বাজার সরকার গাঙ্গুলী মহাশয় বাহিরে বারাণ্ডায় মাদুরে বসিয়া গতকল্য কলিকাতা হইতে যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন, তাহার হিসাব মিলাইতেছেন।

ব্রজেন্দ্র নিকটস্থ হইলে গাঙ্গুলী মহাশয় তাহাকে ছাতি, জুতা, জামা ইত্যাদি বাহির করিয়া দিলেন।

লোকে বলিত গাঙ্গুলি মহাশয় কলিকাতায় যে দরে যে দ্রব্য ক্রয় করিতেন, রতনপুরে আসিয়া, কাগজে লিখিবার সময়ে তদপেক্ষা অনেক বেশীদর লিখিতেন। কিন্তু অনুমান ভিন্ন একথার বিশেষ প্রমাণ কিছুই পাওয়া যাইত না। তিনি কোন জিনিসের মূল্য কখনই কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না। তিনি ব্রজেন্দ্রের জন্য যে জুতা যোড়াটি ক্রয় করিয়াছিলেন, একজন তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করায় হাসিতে হাসিতে একবার ঐ ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কত হয় বল দিকি ?"

পরে সে কথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। ঘরের মধ্য হইতে অনন্তলাল তাঁহার উত্তর শুনিয়া, মৃদুস্বরে সমবেত ভদ্রলোকদিগকে বলিলেন "উত্তর শুনলেন ? কোন জিনিসের দর জিজ্ঞাসা করলে কিছুতে বল্‌তে চাবে না। অমন চোর আর দুটি নাই।"

পরে ডাকিলেন, "গাঙ্গুলি মশায় কেমন সব আন্‌লেন দেখি ?"

তখন বাজার সরকার ব্রজেন্দ্রের জুতা জামা ইত্যাদি লইয়া তাড়াতাড়ি যাইয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তলাল সে সকলে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "যে একবার বিলিতি দোকানের জিনিস ব্যবহার করেচে তার আর এ সব দিশি জিনিস ব্যবহার করতে ইচ্ছাই হবে না। সেখানে দাম বেশী, স্বীকার করি কিন্তু জিনিসও পছন্দসই। পোষাক

পরিচ্ছদ তৈয়ার করতেও তারা জানে, ব্যবহার করতেও তারা জানে। কদর্য্য নেংটিমারা ভাব কেবল আমাদের দেশে লোকের। আমাদের দেশে যে যত নেংটে সে তত তত্ত্বজ্ঞানী। আমার বিশ্বাস কদর্য্য পোষাকে মনের ভিতর কদর্য্য ভাবেরই উদয় হয়। ত্যাগ ত মনে—বাহিরে কি ?"

ব্রজেন্দ্র একাগ্রচিত্তে তাঁহার কথা শুনিতেছে এমন সময়ে খাতা বগলে আমলারা যাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন সে জামা কাপড় ইত্যাদি লইয়া ত্রিতল হইতে রসরাজের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইল। যাইতে যাইতে সে ভাবিতেছিল যে, 'অনন্তলাল গতকল্য প্রাতঃকালে ভগবদ্ গীতা হইতে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ত্যাগ সম্বন্ধে যে মতের সমর্থন করিয়াছিলেন, আজি প্রাতে আবার তাই খণ্ডন করিয়া বিপরীত মতের সমর্থন করিতেছেন। তিনি গতকল্য প্রাতে বলিতেছিলেন যে, "যে জিনিস বাইরে ত্যাগ না করবে তা মন থেকে কিছুতেই যাবে না, অতএব বাইরে ত্যাগেরও প্রয়োজন ;"—আবার অদ্য প্রাতে বলিতেছেন যে, "ত্যাগ ত মনে বাইরে কি ?" —তবে কি অধিক লেখাপড়া শিখ্‌লে মানুষ এমনি হয় ?

** ** ** **

পাঁচ সাত দিনের মধ্যে ব্রজেন্দ্র রতনপুরের স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল। তাহার সুশীলতা ও অধ্যয়নশীলতায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা শীঘ্রই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার ভর্ত্তি হইবার পর হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার ছয় মাস মাত্র বিলম্ব ছিল। সেই জন্য তাঁহারা প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে বোধহয় এবার ব্রজেন্দ্র পরীক্ষা দিতে পারিবে না। কিন্তু অনেক দিন বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন বন্ধ থাকিলেও, বাড়ীতে প্রতিদিন চর্চ্চা থাকায়, অধীত বিষয় সকলের কিছুই সে বিস্মৃত হয় নাই। শিক্ষকেরা ক্রমে আশান্বিত হইলেন।

অদ্য রবিবার। আজি আহারাদির পর ব্রজেন্দ্র লাইব্রেরীতে টেবিলের পার্শ্বে, একখানি কেদারায় বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে, রসরাজ টেবিলের অপর পার্শ্বে অন্য একখানি কেদারায় পান চিবাইতে চিবাইতে একাগ্রচিত্তে একখানি বাঙ্গলা নাটক পাঠ করিতেছেন এবং বাহিরে বসিয়া একজন কুলি পাখা টানিতেছে, এমন সময়ে পুস্তক, খাতা ও শ্লেট হস্তে শিশিরকুমারী যাইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং রসরাজের নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"মুখুয্যে মশায় আমায় পড়া বলে দেন না।"

রসরাজ তাহাকে নিকটস্থ একখানি কেদারায় বসিতে ইঙ্গিত করিলেন ও পুনরায় নিবিষ্ট মনে পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। শিশির উপবেশন পূর্ব্বক, পুস্তক খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে রসরাজ তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আজ তুমি ব্রজেন্দ্রের কাছে পড়িবলে লও; আমি একটু ব্যস্ত আছি।"

"পরে ব্রজেন্দ্রকে বলিলেন,—শিশিরের পড়াটা বলে দাও ত ভাই।"

এই বলিয়া তিনি পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

শিশিরকুমারী একবার ব্রজেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, লজ্জায় মুখখানি নত করিল। তাহার বিলম্ব দেখিয়া রসরাজ আবার বলিলেন,—যাও, লজ্জা কি?"

তখন শিশির অধোবদনে ধীরে ধীরে ব্রজেন্দ্রের নিকটস্থ হইয়া, একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল এবং শ্লেট ও খাতা টেবিলের উপর রাখিয়া, পুস্তক লইয়া, অস্ফুট স্বরে পাঠ করিতে লাগিল।

ব্রজেন্দ্র নিজের পাঠ বন্ধ রাখিয়া, একবার বালিকার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার বোধ হইল, সেদিন ভোজনের সময়ে, যে মুখের সৌন্দর্য্যে সে বিস্মিত হইয়াছিল, এখন তাহাতে যেন তদপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইয়াছে। তবে, তখন এত অধিক সময় পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই, সে দেখা এক নিমিষের জন্য। যেমন সুনিপুণ চিত্রকরের দ্বারা অঙ্কিত কোন মনোহর চিত্র অনেকক্ষণ না দেখিলে, তাহার সমগ্র সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, সেইরূপ সেদিন ক্ষণকাল মাত্র চাক্ষুষ করিয়া এ মুখশোভার অতি অল্পই সে দেখিয়াছিল।

নিজের পাঠ্য পুস্তক সম্মুখ হইতে সরাইয়া রাখিয়া, ব্রজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বই পড়?"

শিশির উত্তর করিল,—"পুরাণ কথা।"

"বই কোথায় পড় দেখি।"

শিশির সাবিত্রীর উপাখ্যান বাহির করিল।

পণ্ডিতদিগের সভা মধ্যে কোন দুরূহ বিষয়ের মীমাংসার ভার পড়িলে, বিদ্বান ব্যক্তিরও হৃদয় যেরূপ কম্পিত হইতে থাকে, এই বালিকাকে তাহার সরল পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করাইতে ব্রজেন্দ্রের হৃদয়ও সেইরূপ কম্পিত হইতেছিল। পুস্তকখানি লইয়া, একবার দেখিয়া সে পুনরায় শিশিরের সম্মুখে রক্ষা করিল ও বলিল,—"পড় দিকি।"

শিশিরকুমারী ঈষৎ হাস্য বিম্বোষ্ঠ দমন করিয়া, সলজ্জভাবে তাহার পাঠ আবৃত্তি করিতে লাগিল। বসন্ত সমাগমে কোকিলকণ্ঠ নিঃসৃত মধুর কাকলির ন্যায় তাহার কণ্ঠস্বর ব্রজেন্দ্রের কর্ণকুহরে যেন সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে বালিকার আবৃত্তি অশুদ্ধ হইতেছিল। কিন্তু ব্রজেন্দ্রের মনোযোগ সেদিকে ছিল না। সে মুগ্ধ হইয়া, নিবিষ্ট চিত্তে সেই মধুর স্বরলহরী শ্রবণ করিতেছিল।

বালিকা আবৃত্তি সমাপণ করিল। তখন ব্রজেন্দ্রের মনে পড়িল যে, আবৃত্তির সময়ে তাহাকে শুদ্ধাশুদ্ধ বলিয়া দেওয়া হয় নাই। বালিকা কি পড়িল, তাহাও সে ভাল জানে না। কেবল সেই স্বর লহরীর কোমল ঝঙ্কার তখনও তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সে বলিল,—"আর একবার পড় ত।

শিশির তাহার কুবলয়দলনিন্দিত বিশাল লোচনের স্নিগ্ধ দৃষ্টি একবার ব্রজেন্দ্রের মুখের দিকে ন্যস্ত করিল। সে দৃষ্টির অর্থ—"কেন, এই ত পড়িলাম, আপনি কি শোনেন নি?" তাহার পর সে পুনরায় পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইবার ব্রজেন্দ্র মনোযোগের সহিত তাহার অশুদ্ধ উচ্চারণ সংশোধন পূর্ব্বক পাঠের অর্থ বুঝাইয়া দিল, এবং শ্রুতিলিখন লিখাইয়া ও তাহা সংশোধন করিয়া দিয়া, পড়ান শেষ করিল। শ্লেট ও পুস্তক হস্তে শিশিরকুমারী প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে রসরাজ বলিল,—"পড়া হ'ল? কাল থেকে রোজ পাঁচটার পর এসে ব্রজেন্দ্রের কাছে পড়া বলে নেবে।"

'বেশ" বলিয়া বালিকা পুস্তকাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে অন্দরাভিমুখে যাইতে যাইতে ভাবিতেছিল যে, এমন যত্ন করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহই তাহাকে পড়ায় নাই। জামাইবাবু যত্ন করিয়া পড়ান্ সত্য, কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবুর মত নহে। সে কল্য হইতে প্রতিদিন পাঁচটার পর আসিয়া তাহার কাছে পড়িবে।

শিশির যাইবার পর ব্রজেন্দ্র পুনরায় পুস্তক লইয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পাঠে মনের অভিনিবেশ কিছুতেই হইল না। শিশির গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা যাহা করিয়াছে—প্রথমে রসরাজের নিকট, পরে তথা হইতে উঠিয়া গিয়া, তাহার পার্শ্বে উপবেশন, পাঠ আবৃত্তি, শ্রুতিলিখন, বিশাললোচনের স্নিগ্ধ দৃষ্টি ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ সংযত হইয়া, সে অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিল।

সেই হইতে প্রত্যহ অপরাহ্নে ব্রজেন্দ্র বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবৃত হইয়া সুস্থ হইলে, শিশির তাহার নিকট অধ্যয়ন করিত।

ইতিপূর্ব্বে ব্রজেন্দ্র প্রতিদিন বিদ্যালয় হইতে আসিয়া, কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর কিছুক্ষণ পাঠ অভ্যাস করিত। তাহার পর ভ্রমণে বাহির হইত, সন্ধ্যার সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নূতন উৎসাহে অধ্যয়ন আরম্ভ করিত। এক্ষণে শিশিরের শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়া সে প্রতিদিন অপরাহ্নে আর বাহির হইত না বা ভ্রমণের অবসর পাইত না। কিন্তু তজ্জন্য তাহার ক্ষোভ ছিল না।

একদিন রসরাজ তাহাকে বলিল, "ব্রজেন্দ্র, তোমার টাকার দরকার,—শিশির কুমারীর অর্থের অভাব নাই। ভবিষ্যতে সে বিস্তর সম্পত্তির অধিকারিণী হবে। তার শিক্ষকতা করে, তুমি মাসে মাসে বেতনস্বরূপ কিছু পাও এই আমার ইচ্ছা। অতএব আমি ভেবেচি এ সম্বন্ধে শ্বশুর মহাশয়কে বলে তোমার কিছু কিছু বেতন ধার্য্য করে দেব।"

কিন্তু ব্রজেন্দ্র এ প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, আমার খরচ চলে যাবে, বাবুই সব দিচ্ছেন। এখন আমার দরকার নাই। যখন দরকার হবে, তখন আপনাকে বল্‌ব।"

রসরাজ আর কিছু বলিল না। শিশিরের শিক্ষকতা করিয়া বেতন গ্রহণ করিতে হইবে, এ প্রস্তাব ব্রজেন্দ্রের অসহ্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

একদিন অপরাহ্নে বেলা পাঁচটা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে শিশির পুস্তক ও শ্লেট হস্তে লাইব্রেরী ঘরে উপস্থিত হইল। কিন্তু তখনও ব্রজেন্দ্র তথায় আসে নাই। সে প্রতিদিন চারিটার পর বিদ্যালয় হইতে আসিয়া নিজ শয়নকক্ষে পুস্তকাদি রাখিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর লাইব্রেরী ঘরে গমন করিত। বালিকা ভাবিল আজি বোধহয় বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিতে তাহার বিলম্ব হইয়াছে, পুস্তকাদি টেবিলের উপর রাখিয়া সে ব্রজেন্দ্রের গৃহের দ্বারদেশে গমন করিল। তখনও ব্রজেন্দ্র বিদ্যালয় হইতে আসে নাই। অল্পক্ষণ পরেই তাহার পদশব্দ হইল। সে নিকটস্থ হইলে বালিকা জিজ্ঞাসা করিল,—"মাষ্টার মশায়, আজ স্কুল হতে আসতে আপনার এত দেরী হল যে?"

"আমাদের আজ থেকে টেষ্ট এগজামিন্ আরম্ভ হয়েচে।"

এই বলিয়া ব্রজেন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। শিশির বাহিরে একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিল।

ব্রজেন্দ্র পুস্তকাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর হস্ত ও পদ প্রক্ষালন করিল পরে নিজ পাঠ্যপুস্তক হস্তে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া পুস্তকাগার অভিমুখে অগ্রসর হইল। এসময়ে কিছু জলযোগের প্রয়োজন, কিন্তু ইদানী তাহার তাহা ঘটিত না। রসরাজের অনুজ্ঞা-ক্রমে, প্রথমে কিছুদিন পর্য্যন্ত, ব্রজেন্দ্র বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে ভৃত্যেরা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া, তাহার গৃহে রক্ষা করিত। কিন্তু পরে একার্য্যে তাহাদিগের অবহেলা হইতে লাগিল এবং ক্রমে উহা আনিয়া দেওয়া একেবারে বন্ধ করিল। ব্রজেন্দ্রও তাহাদিগকে কিছু বলিত না, বা রসরাজকে একথা জানাইত না। সে প্রকৃতির লোক সে ছিল না। ধনবান-দিগের খান্সামা বা তাহাদিগের অন্নজীবি ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই নীচাত্মা ও পরশ্রীকাতর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যদি গৃহস্বামীর প্রকৃতি অস্থির চিত্ত ও অব্যবস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। অনন্তলালের আলয়ে অনেকটা তাহাই হইয়াছিল। ব্রজেন্দ্র পল্লীগ্রামবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া বড়লোকের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছে,—স্বচ্ছন্দে লেখাপড়া শিখিতেছে এবং সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে, ইহা তাহাদিগের অসহ্য। তাহাদিগের নিকট হইতে তাহাকে সময়ে সময়ে বিদ্রূপ ও কর্কশবাক্য সহ্য করিতে হইত। মোসাহেবদিগের ঐ সকল বিদ্রূপ শ্রুতিগোচর হইলে, স্বয়ং অনন্তলাল তাহাদিগকে নিষেধ করা দূরে থাক, বরং আনন্দই অনুভব করিতেন। ইহা তাঁহার স্বভাব।

এ বয়সে ব্রজেন্দ্র ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিল। সে সকলই নীরবে সহ্য করিত।

ব্রজেন্দ্র পুস্তককাগারে যাইয়া উপবেশন করিবার পর, শিশিরকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "শিশির, তুমি অনেকক্ষণ পড়তে এসে বসে আচ?"

শিশির বলিল, "আজ্ঞে হাঁ,—মাষ্টার মশায়, আপনি স্কুল থেকে এসে কিছুই খেলেন না?"

"না।"

"কেন? চাকরেরা আপনার খাবার আনে না?"।

"প্রথম প্রথম আনৃত, এখন আর আনে না। বোধহয় তারা নানা কাজে ভুলে যায়। আমারও দরকার হয় না, আমিও বলি না।"

শিশির পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি দেড়টার পর স্কুলে কিছু খেয়ে ছিলেন?"

ব্রজেন্দ্র বলিল, "না, তাতে আমার কোন কষ্টও হয় না। আজ তোমার কোথায় পড়া আচে দেখি?"

বালিকা অন্যমনস্ক হইয়া নিজ পাঠ্যপুস্তকখানি খুলিয়া, যেখানে তাহার পড়া বাহির করিল।

** ** ** **

শিশিরকুমারীর সেবার জন্য একজন পরিচারিকা ছিল। সে শিশিরকে মানুষ করিয়াছিল। প্রতিদিন বেলা তিনটার সময়ে সে থালায় থাবার লইয়া তাহার বালিকা কর্ত্তৃঠাকুরাণীকে ভোজন করাইতে যাইত। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরদিবস, যথা সময়ে পরিচারিকা থাবার লইয়া আসিলে, শিশির তাহার কিছুই স্পর্শ না করিয়া বলিল, "এই থাবার থালাশুদ্ধ তুমি মাষ্টার মশায়ের ঘরে রেখে এসো। এই রকম প্রতিদিন রেখে আস্‌বে। ভাণ্ডারীকে বল্‌বে, কাল থেকে আমার থাবার যেন বেশী করে দেয়।"

দাসী বলিল, "কেন, ব্রজেন্দ্রবাবুর থাবার ত ভিতর থেকে যায়।"

"আমি যা বল্লুম তুমি তাই করগে।"

এই বলিয়া বালিকা পরিচারিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে যে কার্য্য ভাল বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা হইতে শীঘ্র পশ্চাৎপদ হয় না, তাহার প্রতিকূল ব্যবহার সহ্য করিতে পারে না। ইহা পরিচারিকার অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং সে কেবল মাত্র বলিল. "আমি আজই ভাণ্ডারীকে বল্‌ব।"

পরে, মিষ্টান্ন লইয়া ব্রজেন্দ্রের কক্ষাভিমুখে গমন করিল।

ঐ দিবস অপরাহ্নে শিশির যথারীতি পুস্তক হস্তে লাইব্রেরী ঘরে যাইয়া প্রবেশ করিল। তখনও ব্রজেন্দ্র বিদ্যালয় হইতে আসিয়া পঁহুছায় নাই। তাহাদিগের টেষ্ট্‌ এগজামিন্‌ হইতেছে, অতএব এখন বিদ্যালয় হইতে আসিতে তাহার বিলম্ব হইবে স্থির করিয়া শিশিরকুমারী আপন মনে পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ব্রজেন্দ্র যাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ও জিজ্ঞাসা করিল, "শিশির, তুমি কতক্ষণ এসেচ?"

"আজ্ঞে, আমি অনেকক্ষণ হ'ল এসেচি, এসে নিজে নিজে পড়্‌চি।"

"তুমি কি আমার খাবারের কথা বউ দিদিকে বলেছিলে ?"

সরলাকে ব্রজেন্দ্র বউ দিদি বলিত। শিশির বলিল, "আজ্ঞে না।"

"আজ খাবার দিলে কে ?"

"ভিতর থেকে ঝি দিয়ে গিয়েচে।"

ব্রজেন্দ্র সে সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিল, "কি পড়চ ?"

শিশির বলিল,—"পুরানো পড়া।"

"আজ আর নতুন পড়া পড়বে না ?"

"এখন আপনার পরীক্ষার সময়; আমাকে পড়াতে গেলে আপনার অনেক সময় নষ্ট হবে। যতদিন পরীক্ষা শেষ না হবে, ততদিন আমি আর নতুন পড়া পড়বো না, যা পড়িচি তাই প্রথম থেকে আরম্ভ করে নিজে পড়বো, যেটা দরকার হবে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে যাব।"

ব্রজেন্দ্র এ প্রস্তাবে অনিচ্ছা সত্বে স্বীকৃত হইল। সেইদিন হইতে প্রত্যহ বৈকালে শিশির-কুমারীর পরিচারিকা ব্রজেন্দ্রের জলযোগের নিমিত্ত তাহার ঘরে মিষ্টান্ন রাখিয়া আসিত। পরিচারিকাকে ব্রজেন্দ্র চিনিত। অতএব শিশিরের আদেশক্রমে মিষ্টান্ন সে রাখিয়া যায়, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

শিক্ষকতার এ প্রতিদানও ব্রজেন্দ্র চাহে না। কিন্তু শিশির অসন্তুষ্ট হইবে ভাবিয়া, দাসীকে নিষেধ করিল না। একদিন রসরাজ শিশিরের শিক্ষকতার জন্য ব্রজেন্দ্রকে মাসে মাসে বেতন দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে তাহা লইতে অস্বীকৃত হইয়াছিল। যেরূপ যত্নের সহিত সে শিশিরকে শিক্ষা দান করিয়া থাকে, অর্থের বিনিময়ে সে যত্ন, সে আগ্রহ কলুষিত হইয়া যাইবে। তাহার তাহা ইচ্ছা নহে। যে সাধক নিষ্কাম সে তাহার অভীষ্ট দেবতার সেবা করিয়া কিছুই প্রতিদান চাহে না; বারে বারে সেবার অধিকার পাইলেই কৃতার্থ হইয়া থাকে। ব্রজেন্দ্রও তাহার অভীষ্টদেবীর শিক্ষকতা করিয়া কিছুই চাহে না। এই কার্য্য হইতে বঞ্চিত না হইলেই সে কৃতার্থ হয়। কিন্তু দারিদ্র্য তাহার এই উচ্চভাবের এই স্বার্থশূন্য অনুরাগের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে ভাবিয়া, ব্রজেন্দ্র নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

টেষ্ট পরীক্ষায় সে ক্লাশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিল। পরে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ব্রজেন্দ্রের পরীক্ষার দিন ক্রমে নিকট হইতে লাগিল, এবং ফিস দাখিল করিবার সময় হইল। একদিন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় আদেশ করিলেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের ফিসের টাকা সাত দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

ব্রজেন্দ্র রতনপুর আসিয়া অবধি তাহার সমস্ত খরচপত্র অনন্তলাল প্রদান করিতেন। তাহার যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হইত, সে তাহা রসরাজকে বলিত। রসরাজ উহা অনন্তলালের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিতেন। রসরাজের নিজেরও সর্ব্বদা অর্থের প্রয়োজন। খাজাঞ্চির নিকট উহা না পাইলে, তাঁহাকে শ্বশুরের নিকট পর্য্যন্ত যাইতে হইত। ব্রজেন্দ্রের জন্য দরবার করিতে যাইয়া, তিনি কখন কখন নিজের কার্য্যও সিদ্ধ করিয়া আসিতেন। ব্রজেন্দ্র ফিসের টাকার জন্য রসরাজকে বলিল। অদ্য শ্বশুর মহাশয়ের নিকট রসরাজের নিজেরও কিছু কাজ ছিল। অতএব তিনি সেইদিনই অপরাহ্নে ব্রজেন্দ্রের টাকা সংগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন।

আজি বীরভূমি অঞ্চল হইতে একজন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী কিছু ভিক্ষার জন্য অনন্তলাল বাবুর বাটী আসিয়াছেন। তিনি মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করিয়া, বেলা দুইটার পর অনন্তলালের বসিবার ঘরে হরিশের নিকট একটি পৃথক আসনে বসিয়া, করমালা জপ করিতেছেন। হরিশ পূর্ব্বোক্ত টেবিলের নীচে, স্বস্থানে, দেওয়ালে হেলান দিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছে। তাহার সেই বড় ঝোলাটি গলদেশ হইতে বক্ষে ঝুলিতেছে। দক্ষিণ হস্তটি ঝোলার ভিতর রক্ষিত অনেকক্ষণ অন্তর তন্মধ্য হইতে এক একবার খট্ খট্ শব্দ নির্গত হইতেছে।

হরিশ্চন্দ্র জাতিতে শৌণ্ডিক। তাহার উপাধি 'সাহা।' অনেকদিন হইতে সে অনন্তলালের নিকট অবস্থান করিতেছে। তাহার আচার আচরণ অভ্যাগত বৈষ্ণবদিগের ন্যায়। সে বাহিরে কোঁচা, কাছা দিয়া কাপড় পরিত কিন্তু ভিতরে কৌপিন ছিল; নিরামিষ ভোজী; তৈল মাখিত না; নারায়ণের প্রসাদ ভিন্ন খাইত না। মাঝে মাঝে তাহার দেশেও যাইত। কেহ কেহ বলিত, অনন্তলালের নিকট হইতে তাহার কিছু কিছু মাসহারা বন্দোবস্ত ছিল।

সাধু সন্ন্যাসীদিগের উপর হরিশের বড় ভক্তি। তাহারা অনন্তলালের নিকট কিছু যাচঞা রিতে যাইলে, সে তাহাদের হইয়া তাঁহার নিকট সুপারীশ করিত। কেবল সাধু সন্ন্যাসী নহে, নন্তলালের নিকট যে কেহ [illegible] করিতে যাইত, হরিশ সাধ্যমত তাহার সহায়তা করিতে বিরত হইত না। তাঁহাকে [illegible] খয়রাৎ করান তাহার একটি প্রধান কার্য্য ছিল। ইহারা দুইজন ব্যতীত, অনন্তলালের চর্ম্মাসনের পার্শ্বে ফরাসের উপর পাঁচছয় জন লোক শয়ন করিয়া আছে, চর্ম্মাসন শূন্য; অনন্তলাল তখনও অন্দর হইতে আইসেন নাই। গৃহ নিস্তব্ধ; কেবল শ্বেত প্রস্তরের টেবিলের উপর ঘড়িটি টক্ টক্ শব্দ করিতেছে। ঘড়িতে আড়াইটা বাজিবার অল্পক্ষণ পরে কাঠের সিঁড়িতে পদশব্দ হইল। তখন হরিশ মৃদুস্বরে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারীকে বলিল,—"বাবু আস্‌চেন।"

ব্রহ্মচারী ঠাকুর গেরুয়াবস্ত্রে [illegible] করিয়া আবৃত করিলেন ও একাগ্রচিত্তে করমালা জপ করিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে অনন্তলাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে সিন্দুরলিপ্ত একটি ত্রিশূল ছিল।

যেমন রণক্ষেত্রে যোদ্ধারা শূল হস্তে শত্রুকে বিঁধিবার জন্য ধাবমান হয়, অনন্তলালও তেমনি ত্রিশূল হস্তে ফরাশস্থ ভদ্রলোকদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। ব্রহ্মচারী তাঁহার আচরণে ভীত হইয়া, গৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতেছেন এমন সময়ে হরিশ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আসন ত্যাগ করিতে নিষেধ করিল। ভদ্রলোকেরা সকলেই নিদ্রিত কেবল বিপিনবাবু জাগিয়াছিলেন। অনন্তলালের রণাভিনয়ে তিনি "বাবা রে! মলুম্ রে!!" বলিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বসিলেন। অনন্তলাল নিদ্রিত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের প্রতি তিনবার করিয়া সজোরে ত্রিশূল চালনা করিলেন। কিন্তু উহা একজনেরও অঙ্গ স্পর্শ করিল না।

রণাভিনয় শেষ করিয়া অনন্তলাল চর্ম্মাসনের উপর উপবেশন করিলেন। ত্রিশূলটি তাঁহার পার্শ্বদেশে রক্ষিত হইল। তিনি আসন গ্রহণ করিবা মাত্র ভৃত্য চা'র সরঞ্জাম লইয়া আসিয়া তাঁহার পাদদেশে সতরঞ্চের উপর সাজাইয়া দিল।

আসনে উপবেশন করিয়া, অনন্তলাল একবার সম্মুখস্থ টেবিলের নিম্নে হরিশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সাহাজী চক্ষু মুদিত করিয়া [illegible] দেখিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে

বিপিনবাবুকে বলিলেন, "আজ Adjutaut (হাড়গিলা পাখী) খুব Bone swallow কর্‌চে (খুব হাড় গিল্‌চে) ; এখুনি আবার চোক্ বুঁজে থেকে সব হজম করে ফেল্‌বে।"

হরিশ সাহা তাহার বড় ঝোলার মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া ঝোলাস্থিত মোটা মোটা মালা খট্ খট্ শব্দে জপ করিতেছে দেখিয়া অনন্তলাল বড়ই আমোদ অনুভব করিতেন, এবং রহস্য করিয়া বলিতেন, ঠিক যেন হাড়গিলা পাখী মোটা মোটা হাড় গলাধঃকরণ করিতেছে।

হরিশ ইংরাজী জানিত না, তথাপি বুঝিতে পারিল যে, অনন্তলাল তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। বিপিনবাবু তাঁহার কথার কোন টিপ্পনী না করিয়া, কেবলমাত্র ঈষৎ হাস্য করিলেন। অনন্তলালের কথায় হরিশের মনে যে কষ্ট না হইল, বিপিনবাবুর ঐ হাসিটুকুতে তদপেক্ষা অধিক দুঃখ হইল। সে যাহা হউক, অনন্তলালের মানসক্ষেত্র বেশ প্রফুল্ল আছে বুঝিয়া সে বলিল, "এই ব্রহ্মচারীঠাকুর বীরভূম জেলা থেকে এসেচেন। ইনি একটি আশ্রম করচেন. সেই জন্যে আপনার কাছে কিছু প্রার্থী।"

বিপিনবাবু ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, গৃহ ছেড়ে আবার গেরো করচেন কেন?"

অনন্তলাল বলিলেন, "যথার্থ বলেচেন। কৌপিনধারীর ত ঘরকরা ধর্ম্ম নয়! শাস্ত্রে আচে যে, যেমন সর্প নিজে ঘর করে না, ইন্দুরের ঘরে বা গর্ত্তে বাস করে, তেমনি কৌপিনধারী সন্ন্যাসীরাও নিজে ঘর করেন না, অন্যের ঘরে কাল যাপন করে থাকেন। তাও এক যায়গায় অধিক দিন তাঁকে থাকতে নাই। ঘর করলেই ঝড় লাগ্‌বে, ঝড় লাগিলেই দীপ দুল্‌বে। যেখানে ঘর করবেন, সেইখানেই সংসার পাতাতে হবে।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আজ্ঞে, সে সংসার আমার হবে না, সে প্রভুর সংসার। গৃহস্থ যে সংসার পাতায়, তা তার নিজের জন্য, তার ছেলে মেয়ের জন্য; আর, এ সংসার সকলের জন্য—অতিথির জন্য।"

অনন্তলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আশ্রম আপনার চলবে কেমন করে? সে জন্য ত আপনাকে ব্যস্ত হয়ে বেড়াতে হবে, তখন [illegible]নের সময় পাবেন না?"

ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "তার যোগাড় আগেই করেচি। আশ্রমের জন্যে ধেনো জমি ২০ বিঘা কেনা হয়েচে। সেই জমি [illegible] আবাদ করতে দিয়ে, ভাগে যে ধান পাবো,

তাতে এদিকের সব খরচ চলে যাবে, দুচার জন অতিথি গেলে খেতে পাবে। আশ্রমে দুধের জন্যে যে গাই গরু থাকবে সেই জমির খড় হতে তারা প্রতিপালিত হবে। আর, ঘর ছাওয়াবার দরকার হলে, সেই খড় হতেই হবে। তা ছাড়া, আমার একজন শিষ্য আশ্রমের নামে কিছু টাকা একজন ভদ্রলোকের কাছে গচ্ছিৎ রেখে দিয়েচে, তারও কিছু কিছু উপসত্ব বেরুবে। এতেই আশ্রম চল্‌বে।"

অনন্তলাল বলিলেন, "মহাশয় আপনি সন্ন্যাসী, আর আমরা সংসারী। সংসারী হয়ে সন্ন্যাসীকে উপদেশ দিতে নাই। তবে মনে যদি কিছু না করেন, তা হলে বলি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আজ্ঞে বলুন না। আমি দেখচি আপনি একজন সাধক। আপনার বলবার কোন দোষ নাই।"

তখন অনন্তলাল তাঁহার সভাসদ্‌দিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন,— দেখুন, ভগবান অর্জ্জুনকে বলেচেন,

"ইদমদ্য ময়ালব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
* * * * *
অনেক চিত্তবিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥"

"অর্থাৎ অদ্য এই ধন লাভ করিলাম। এই অভীষ্ট আমার শীঘ্র সিদ্ধ হইবে। এই ধন আমার সঞ্চিত আছে, এই ধন আগামী বর্ষে আরও বর্দ্ধিত হইবে। * * * * এইরূপ নানা প্রকার সঙ্কল্প কলাপে বিভ্রান্ত মোহজালে সমাবৃত, বিষয়ভোগে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত পুরুষগণ অশুদ্ধ নরককুণ্ডে পতিত হয়।"

"আপনি আপনার আশ্রম সম্বন্ধে যা বললেম, তার ভাব অনেকটা এই রকম। ঘোর সংসারী যারা, তারাই আপনার মত জল্পনা কল্পনা করে থাকে। আমরাও বিষয়ী; কিন্তু ও রকম ভাবনা মনে পোষণ করতে গুরুদেব আমাদেরও নিষেধ করেচেন। ওতে হৃদয় বিবেকবৈরাগ্য শূন্য হয়ে পড়ে। সেইজন্য, ও রকম চিন্তা যাতে মনোমধ্যে উদিত না হয়, আমরা সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা করি।"

"তাঁহার মুখে এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া ব্রহ্মচারী দেখিলেন কিছু প্রাপ্তির আশায় বোধহয় নিরাশ হইবে। তখন বিষণ্ণ বদনে তিনি হরিশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

হরিশ বলিল,—"বাবু, ব্রহ্মচারী অনেকদূর থেকে আশা করে এসেচেন; ওঁকে কিছু দিয়ে দেন, এত কথায় কাজ কি?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে ডাকহরকরা যাইয়া, একখানি রেজেষ্টারি পত্র অনন্তলালের হস্তে দিল। তিনি নাম স্বাক্ষর করিয়া দিয়া পত্রখানি গ্রহণ করিলেন।

বিপিনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বোধহয় পত্র থেকে স্বামীজী লিখ্‌চেন?"

অনন্তলাল উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে হঁা।"

পরে, তিনি মনে মনে পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে ভৃত্য চার কেট্‌লিতে গরম জল দিয়া গিয়াছিল। অনন্তলাল পত্রের কতক অংশ পাঠ করিয়া একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সময় অর্থাৎ পাঁচ মিনিট অতীত হইয়াছে। তখন বালিশের তলায় পত্র রাখিয়া দিয়া, কেট্‌লি হইতে ছয় সাতটি কাপে চা ঢালিতে লাগিলেন। পরে মজলিসস্থ ভদ্রলোকদিগকে এক এক কাপ পরিবেশন করিয়া দিয়া, স্বয়ং এক কাপ লইয়া পান করিতেছেন, এমন সময়ে জামাইবাবু যাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, বিপিনবাবু ও সভাস্থ আরও দুই একজন "জামাইবাবু, আসুন," বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল এবং তিনিও অল্প হাস্য করিতে করিতে যাইয়া, মজলিশের এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

চা পান শেষ হইলে, অনন্তলাল খাজাঞ্চীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া সভাস্থ সকলে নিঃশব্দ হইল। অনতিবিলম্বে খাজাঞ্চী যাইয়া প্রণাম করিল। অনন্তলাল তাহাকে লইয়া বাহিরে এক জনশূন্য স্থানে উঠিয়া গেলেন, ও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাশীতে স্বামীজীকে গত মাসের টাকা পাঠান হয় নাই?"

খাজাঞ্চী বলিল,—"আজ্ঞে, মহাজনদিগের বাৎসরিক সুদের অনেক টাকা বাকী পড়েছিল। এ কিস্তিতে সে সব দিতে হ'ল বলে গত মাসে কাশীতে টাকা পাঠান হয় নাই। এইবার মহাল থেকে টাকা এলেই, আগে তাঁকে পাঠিয়ে দিব।"

অনন্তলাল বলিলেন,—"না, অত দেরী করলে চলবে না। কোথাও থেকে ধারধোর করে শিগ্‌গীর তাঁর দু'মাসের ২০০্ টাকা পাঠিয়ে দিও।"

"যে আজ্ঞা, হুজুর," বলিয়া খাজাঞ্চী বিদায় হইতেছে, এমন সময়ে রসরাজ বাহিরে গিয়া বলিলেন,—"ব্রজেন্দ্রের এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার ফিস দাখিল করতে হবে। এ সপ্তাহে না দিলে আর নেবে না।"

তাহার কথা শুনিয়া অনন্তলাল খাজাঞ্চীর দিকে চাহিলেন। সে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"সে টাকা আজই দিতে পারব।"

অনন্তলাল নিশ্চিন্ত হইয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে আবার ফিরিয়া বলিলেন,—ঘরের ভিতরের এই ব্রাহ্মণটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে পাঁচটি টাকা দিয়ে, বিদায় করে দাওগে।"

এই বলিয়া, তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। খাজাঞ্চী ব্রহ্মচারীকে ডাকিল,—"ঠাকুর, আমার সঙ্গে আসুন।"

ব্রহ্মচারী একবার হরিশের মুখের দিকে চাহিলেন এবং তাহার ইঙ্গিত পাইয়া, বিনাবাক্যব্যয়ে খাজাঞ্চীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

রসরাজের নিজেরও কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল। তিনি শ্বশুরের সাক্ষাতে সে কথা খাজাঞ্চীকে বলিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে অনন্তলাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অগত্যা তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইল।

অনন্তলাল গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বামীজীর পত্র হস্তে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই স্বামীজী লোকটা যে কত বড়, তা ধারণা করতে পারি না। এঁর চেয়ে আমি লেখাপড়া অনেক বেশী শিখিচি অনেক বেশী বই পড়িচি কিন্তু আধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে এঁর কাছে আমি অতি শিশু। ইনি এ পর্য্যন্ত আমাকে যে সব পত্র লিখেচেন, সেগুলি পুস্তকাকারে ছাপলে ধর্ম্মজগতে একটি উজ্জ্বল রত্ন প্রকাশিত হবে। তবে সে সময় এখনও হয় নাই।"

সভাস্থ একজন বলিল, "বোধহয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে পড়াশুনা স্বামীজীর অনেক বেশী আছে।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "আরে পড়াশুনা নিয়ে কি করবে? এক জন্মের পড়া শুনায় কি ঐ সব হয়? তা হলে সব পণ্ডিতই তত্ত্বজ্ঞানী হতো। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কত জন্মের জ্ঞান একত্রিত হয়ে আচে। আমাদের বাবুর যে এতটা বৈরাগ্য এতটা জ্ঞান, এ কি এক জন্মের পড়াশুনায় হয়েচে? তা নয়।"

অনন্তলাল বললেন, "ইনি আর জন্মে যে কে ছিলেন, তা যদি আমি আপনাদের কাচে বলি, তা হলে আপনাদের গা শিউরে উঠ্‌বে। স্বামীজী এবার আমারও পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত লিখে পাঠিয়েচেন। সে বড় অদ্ভুৎ ব্যাপার। আমি এ জন্মে হাজার দাতা হলেও অন্য জন্মের তুলনা হতে পারবো না।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "আপনি অন্য জন্মে এর চেয়ে অধিক দাতা ভোক্তা ছিলেন বলচেন, কিন্তু আমরা ত এ জন্মে আপনার চেয়ে দাতা ভোক্তা লোক দেখিনি। সে যা হোক বাবু, আমরা কি সে সকল কথা শুনতে পাই না?"

"না, তা বলতে নিষেধ আচে।"

এই বলিয়া, অনন্তলাল মনে মনে স্বামীজী লিখিত পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ব্রজেন্দ্র লাইব্রেরীতে একটি বৃহৎ আলমারীর পার্শ্বে আসনে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছিল। রসরাজও টেবিলে বসিয়া টপ্পা গানের খাতাখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ অনন্তলাল একজন ভদ্রলোকের সহিত লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেন।

এই ভদ্রলোকটি অনন্তলালের বাল্যবন্ধু। উভয়ে এক কলেজে এবং একশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম চতুর্ভুজ মল্লিক, জাতি সুবর্ণ বণিক এবং নিবাস হুগলি; বয়ঃক্রম অনন্তলালের সমান হইবে। চতুর্ভুজ বাবু কলেজ ছাড়িয়া, পাটের দালালি করিতে আরম্ভ করেন, এবং তদ্দ্বারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, এক্ষণে স্বয়ং পাটের ব্যবসায় করিতেছেন। কলিকাতায় ইঁহার প্রকাণ্ড গুদাম এবং আফিস্ আছে। চতুর্ভুজ বাবু একজন বুদ্ধিমান এবং চতুর ব্যক্তি। ব্যবসার দ্বারা কেমন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। ইনি প্রায়ই বাল্য বন্ধু অনন্তলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

রসরাজ তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহারাও একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

রসরাজ যখন উঠিয়া যান, তখন তাঁহার হস্তস্থিত টপ্পার খাতায় অনন্তলালের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি উপবেশন করিয়া আপন মনে বলিলেন, "ঘরে এত ভাল ভাল বই থাক্‌তে বাবাজী কোথায় টপ্পার খাতা, কোথায় কদর্য্য বাঙ্গালা নাটক, এই সকল নিয়ে সময় নষ্ট করচেন। লেখাপড়া শিখে ও সকল পড়তে কেমন করে প্রবৃত্তি হয়, তা আমি বুঝতে পারি না। আর রতনপুরের যত বখাটে ছেলের সঙ্গে ইয়ারকি।"

তাঁহার বাক্যাবসানে চতুর্ভুজ বাবু বলিলেন, "তুমিই ওর মাথা খাচ্ছ। কোন একটা কাজে লাগিয়ে দাও না কেন?"

অনন্তলাল বলিলেন, "তাওত দিয়ে ছিলাম, করলে কই? রাইটার্স বিলডিঙ্গে ঢুকিয়ে দিলাম। কানাইলালকে মনে আচে? এক সঙ্গে কালেজে পড়্‌ত, এখন রাইটার্স বিলডিঙ্গে একজন বড় বাবু, আট শ টাকা মাইনে পায়। পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে তার মেয়ের বে দিয়ে দিলুম। তা ছাড়া, অনেক খোসামুদীর পর, সে নিজের কাছে নিয়ে কাজ শেখাতে সম্মত হল। সেখানে কিছুদিন থাক্‌লে অনায়াসে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ হতে পারতো। কিছু দিন গেল, তারপর আর গেল না। জমিদারি দেখ্‌বার জন্যে বললাম,—আমলাদের পাঠিয়ে দিলাম; কিছু দিন কাছারি কর্‌লে তারপর একদিন বল্‌লে—"ওতে আমার মাথা গরম হচ্চে।"

চতুর্ভুজ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ওহে! তোমাদের বড় লোকের জামাই এই রকমই হয়ে থাকে। যাক, এখন যার জন্যে এলাম সেই কথা হোক্‌। দেখ, তুমি যদি আগে আমার কথা শুনতে তা হলে এতদিন তোমার দেনা পরিশোধ হয়ে যেতো। কথায় বলে—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।' ব্যবসায়ে যত কাঁচা পয়সা রোজগার হয় তত কি আর কিছুতে হয়? তার মধ্যে আবার এই পাটের ব্যবসায়ে যেমন পয়সা আচে, তেমন অল্প কাজেই আচে। তুমি টাকা দাও আমি পাটের ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিয়ে, কিছু দিনের মধ্যে তোমার দেনার কিনারা করে দিচ্চি। শুধু দেনার কিনারা কেন এতে তুমি যা খুসি তাই করতে পারবে; চাই কি, আরও বিষয় বাড়াতে পারবে—দৌহিত্রের জন্যে কিছুই ভাবতে হবে না। কল্‌কাতার বাজারে একটা গদিয়ান হতে পারলে তোমার কত বাজার-ক্রেডিট্‌ হবে, তা জান?"

অনন্তলাল মৃদুস্বরে বলিলেন,—তুমি ত অনেক দিন থেকে বলচ কিন্তু আমি সাহসে কুলাতে পারি নি, এক ত যথেষ্ট ঋণ আচে, তার ওপোর আবার অনেক টাকা নতুন ঋণ করতে হবে যদি ফেল্‌ হই—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া চতুর্ভুজ বাবু বলিলেন,—"যদি ফেল হই। এতেই ত বাঙ্গালীর কিছু হয় না। এ কাজে সাহস চাই। "ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশ্যন্তি মুখে মৃগাঃ।"

অনেক বাদানুবাদের পর, অনন্তলাল চতুর্ভুজ বাবুর পরামর্শ মত কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। এখন প্রধান সমস্যা, টাকার যোগাড়। অনন্তলাল বলিলেন,—"অনেক টাকার দরকার। সংগ্রহ করতে এক মাসের কমে হবে না।"

তিনি ভাবিতেছিলেন, যদি ব্যবসায়ে লাভ হয়, তাহা হইলে অনায়াসে তাঁহার দেনা পরিশোধ হইয়া যাইবে, জমিদারির আয় তিনি যথেচ্ছা ব্যয় করিতে পারিবেন, নূতন জমিদারি ক্রয় করিয়া তাঁহার আয় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কাশীতে একখানি ভাল বাড়ী ক্রয় করিয়া, পাঁচজন বন্ধুবান্ধব লইয়া, পরম সুখে বাস করিতে পারিবেন, একজন ধনবান বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন, ইত্যাদি।

অনন্তলাল তাঁহার গুরুর আজ্ঞাক্রমে যে বিষয় বাসনা, যে আশা স্বয়ং হৃদয়ে পোষণ করেন না বলিয়া গত কল্য সেই ব্রহ্মচারীকেও নিষেধ করিয়াছিলেন, আজি তাহাই তাঁহারি হৃদয়কে অধিকার করিল। তাহার প্রতিষেধের কোন যত্নই তিনি করিলেন না। প্রতিষেধের চেষ্টা দূরে থাকে বরং তাহাতে আনন্দই অনুভব করিতে লাগিলেন। ফলতঃ কল্য যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন আজি স্বয়ং তাহার বিপরীতাচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চরিত্রের ইহাই বৈচিত্র্য।

চতুর্ভুজ বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা সমস্ত স্থির হইল। এখন টাকার যোগাড় করিতে হইবে। একার্য্যে হরিশ সাহা প্রধান সহায়। ত্রিতল হইতে তাহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য অনন্তলাল একজন দ্বারবান পাঠাইলেন। অবিলম্বে হরিশ লোইব্রেরীর ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহার সহিত উপস্থিত ব্যবসায় সম্বন্ধে ঋণ গ্রহণের পরামর্শ হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে কলিকাতার মহাজনাদিগের নিকট হ্যাণ্ডনোট ভাল জমিদারি বন্ধক না রাখিলে প্রয়োজন মত টাকা পাওয়া যাইবে না। অতএব তাহাই রাখিবার স্থির হইল। সমস্ত কথাবার্ত্তা শেষ হইলে হইলে, তাঁহারা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনন্তলালের আচরণ দেখিলে বোধ হইত যেন ঋণ গ্রহণ করিতে তিনি কিছুমাত্র ভীত বা কাতর নহেন। কাশীধামে তাঁহার যে স্বামীজী ছিলেন এ নির্ভীকতা সেই স্বামীজীর বাক্যে অকপট বিশ্বাসের ফল। স্বামীজী প্রায়ই তাঁহাকে দীর্ঘপত্র লিখিতেন। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া যে রহস্য আবিষ্কার করিতেন তাহাই পত্রাকারে অনন্তলালের নিকট প্রেরিত হইত।

অনন্তলাল অকপটচিত্তে সেসকল বিশ্বাস করিতেন। ঐ সকল পত্রে ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ, তাঁহাদের উভয়ের পূর্ব্বজন্মে সংঘটিত নানা ঘটনা ভবিষ্যৎ জীবনে অবশ্যম্ভাবী অনেক কথা এবং আর আর অনেক অলৌকিক বিষয় লিপিবদ্ধ হইত। তাঁহার অতীব সতর্কতার সহিত ঐ সকল বিবরণ অন্যের চক্ষের অন্তরালে রাখিতেন। পাছে কাহারও হস্তে পড়িবে এই ভয়ে স্বামীজীর পত্র রেজেষ্টারী না করিয়া অনন্তলালের নিকট প্রেরিত হইত না।

একদিন স্বামীজী লিখিয়াছিলেন যে, যদি দান খয়রাৎ ও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে অনন্তলালের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলেও তাঁহার অর্থের অভাব হইবে না। তাঁহার জন্য কোন নিভৃত স্থানে প্রভূত অর্থে সঞ্চিত হইয়া আছে। যথা সময়ে অর্থাৎ তাঁহার অভাব হইলে তিনি সে সমস্তই প্রাপ্ত হইবেন। এই কথায় অকপট বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই দিন হইতে তিনি অর্থ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করিতেন না।

সেই দিন সন্ধ্যার পর ব্রজেন্দ্র নিজের শয়নকক্ষে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল—"আপনাকে দিদিমণি ডাক্‌চেন।"

ব্রজেন্দ্র পুস্তক বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ পরিচারিকার সহিত সরলার কক্ষাভিমুখে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল একখানি গালিচার উপর রসরাজ এবং পালঙ্কের উপর বিছানায় নিদ্রিত পুত্রের গাত্রে হস্ত দিয়া সরলা বসিয়া আছেন।

সরলার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর। তাঁহাকে দেখিলে মূর্ত্তিমতী সরলার বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার বর্ণ গৌর; শরীর কৃশও নহে, অতিশয় স্থূলও নহে। সরলা সুন্দরী। তাঁহার দৃষ্টিতে যৌবনসুলভ চঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই। মুখমণ্ডল যেন সর্ব্বদাই চিন্তাগ্রস্ত। তাহাতে নিরাশার ছায়া।

ব্রজেন্দ্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে রসরাজ বলিলে, "এস ভাই।"

সে যাইয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ্ঞে শ্বশুর মহাশয় চতুর্ভুজ বাবুকে সঙ্গে করে লাইব্রেরী ঘরে গেলেন আর আমিও সেখান থেকে চলে এলুন। তার পর তাঁদের কি কথা হল তুমিত শুনেচ?"

"আজ্ঞে, শুনেচি। চতুর্ভুজ বাবুর সঙ্গে পাটের ব্যবসা করবার কথা স্থির হলো। সে জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। বাবু তেতলা হতে হরিশ সাহাকে ডাকিয়ে আনালেন এবং অনেক

পরামর্শের পর একখানি ভাল জমিদারি বন্দুক রেখে টাকা ধার নেবার কথা স্থির হল। টাকার যোগাড় হলে তারপর ব্যবসার আরম্ভ হবে।"

সরলা বলিল। "সে ব্যবসায় দেখ্‌বে কে? বিপিনবাবু না হরিশ সাহা? আমার পিতামহ সে সব জমিদারী দিয়ে গিয়েচেন তার এক একখানি স্বর্ণথাল বললেও অত্যুক্তি হয় না, তাই দেখা হচ্চেন না আমলারা লুটে পুটে খাচ্চে। এমন সব বিষয় থাক্‌তে এতটাকা ঋণ হয়েচে তার ওপোর আবার অনেক টাকা নূতন ঋণ হবে। বাবার কাছেই শুনেচি যে, ব্যবসা বাল্যকালে থেকে না শিখলে হয় না। আর, জমিদারি করার চেয়ে ব্যবসা করতে গেলে অধিক পরিশ্রমের দরকার। এই চতুর্ভুজ বাবু অনেক দিন থেকে আমাদের বাড়ী আস্‌চেন। এর কথা আমরা বিশেষ জানি। এঁর হাতে পড়লে এ টাকাও যাবে, তার সঙ্গে আরও কিছু যাবে।"

সরলার কথাও জামাই বাবুর মনোযোগ ছিলনা। আজি কালি খাজাঞ্চীর তহবিলে প্রায়ই টাকা থাকিত না। মহাজনের সুদ্‌ সংসার খরচ এবং বাবুর নিজ খরচ চালাইয়া প্রতিমাসে দেনা করিতে হইত সুতরাং রসরাজ পূর্ব্বের ন্যায় পাঁচজন ইয়ারবন্ধু লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে বা কলিকাতায় বেড়াইতে যাইতে পারিতেন না। ইহার উপর আবার নূতন ঋণ হইতেছে শুনিয়া, তাঁহার নিজের জন্য বড়ই ভাবনা হইয়াছিল।

সরলা পুনরায় বলিলেন "চিন্তামণির জন্যই আমার ভাবনা। এ বড় লোকের দৌহিত্র শেষে যদি দুঃখ পায় তাহলে বিশেষ কষ্টের কারণ হবে। আমি বাবার প্রকৃতি বেশ জানি যত দিন তাঁর খেয়াল না মিটবে তত দিন কন্যা বা দৌহিত্র কারও ভবিষ্যতের দিকে তিনি চাইবেন না। তিনি আমার পিতা মহাগুরু, তাঁর দোষগুণ বিচার নয়। তিনি যা করেন, সে সমস্তই ভাল। তাঁর কোন দোষ নাই, সবই আমার অদৃষ্টের দোষ।"

সরলার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল; তিনি কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। রসরাজ নীরব।

ক্রমশঃ—

শ্রীনলিনীনাথ গুপ্ত।

বে-দরদী।

"চাতক সম তৃষায় আঁখি রইবে চেয়ে পথের পানে"
এই কথাটাই আজকে আমায় সবার চেয়ে বেদন হানে,
ভালবাস? মিথ্যে কথা—সবই তোমার বঞ্চনা—
স্বপন জরীর মিহিন জালে বুনছি শুধু কল্পনা!
শিবের দেউল্ অশথ্ তলা ঐতো হোথা পুকুর ধারে,
অতীত স্মৃতির সাক্ষী তারা তাদের আমি ভুলবো না'রে!
হাটে বাটে নামটি শুনে, আপন মনে সরম মানি—
কেউ জানে না, কেউ জানে না, সবার চেয়ে তোমায় জানি
রক্ত রবির রাঙা আভায়, রাঙা মাটি'র পথের পানে
সকাল সাঁঝে নিমেষহারা রইতে চেয়ে কিসের টানে?

নেই কি মনে—
নেই কি মনে।

বে-দরদী! আজ বুঝেছি সবই তোমার বঞ্চনা,—
অতীত সুখের জমাট স্মৃতি, করছে আমায় উন্মনা!
শপথ তোমার ভাঙলে তুমি সাপ হ'য়ে সেই দংশবে
সারা জীবন বিষের জ্বালায় জ্বলবে প্রিয়া জ্বলবে!
ভুল বুঝেছ, লক্ষ্মী মণি! ভুল বুঝেছ আমায় তুমি—
ঐ তো হোথা তোমার ছবি, নয়ন ধারায় নিত্য চুমি'!
আর পাবনা তোমায় আমি নিবিড় করে দিবস-রাতে
নামটি শুধু রইলো লেখা রক্ত-রাঙা জীবন পাতে!

আমার দোলা পরকে দিলে, পরের হাতে আমার বীণা—
কেমন করে জানবো তুমি আমায় ভাল বাসুচো কিনা!
প্রাণ-পোড়ানী ব্যথায় আমার ফুটবে নাকি তোমার বাণী
মরণ আজি হাত ছানি দ্যায়, নীরব কেন হায় পাষাণি!
হায় গো বালা—
হায় গো বালা!
প্রেম নিকষে পরখ্ করে পড়লো ধরা বঞ্চনা—
বে-দরদী! বিফল আশায় হতাশ পথিক উন্মনা!

শ্রীসরোজকুমার সেন।

জুয়া-খেলা।

জুয়ারী বিশেষণটা কাহারও আকাঙ্ক্ষিত না হইলেও—কার্য্যতঃ অনেকেই ও-আখ্যাকে জীবনের সঙ্গী করিয়া তুলিয়াছে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও জুয়ার নেশা অনেকেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না,—ধনী জুয়ার কল্যাণে পথের ভিখারীতে পরিণত হইয়াও,—আবার দাঁ মারিয়া 'বড়লোক' হইবার মোহে—মুখের শেষ গ্রাসটি পণ রাখিতেও পশ্চাতপদ নয়,—ঘোড়দৌড়ের মাঠে, গ্রাম্য মেলায়, হাটে বাজারে—নানা আকারে জুয়াখেলার প্রসার; কোনস্থলে ইহার নামটা বেশ জাঁকাল সভ্য ভব্যের মুখরোচক,—কোথায়ও বা নিছক জুয়াখেলা, ফলে সবই এক, আশার টোপ গাঁথিয়া লোককে সর্ব্বস্বহীন করিবার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় দেশের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা এখন বিশেষ ভাবে আলোচ্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে, অর্থনীতি, সমাজ ও জুয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, যথাশক্তি আলোচনা করিবার ইচ্ছা।

প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিৎ Adam Smith, এবং তাঁহার মতাবলম্বী John Stuart Mill প্রভৃতি মনে করেন যে, যে-পরিশ্রম (Labour) কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উৎপাদক কেবল তাহাই সার্থক (Productive) এবং বিচার সঙ্গত। এই মনীষিগণ সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা (Labour)কেই এই দিক হইতে বিচার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে, গায়কের গান, বাদকের বাদ্য, প্রভৃতি কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সৃষ্টি করে না বলিয়া নিতান্তই নিরর্থক। কিন্তু, এই নীতি (Principle) অনুসারে বিচার করা ন্যায়সঙ্গত হয় না। বাদকের বাদ্য কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উৎপাদন করে না সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো বাদ্যযন্ত্র, মনে করুন, বেহালা, প্রস্তুত করেন, তাঁহার পরিশ্রম (Labour) এই মত অনুসারে সার্থক। কারণ বেহালা-নির্ম্মাতার প্রচেষ্টার ফল হইতেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু,—বেহালার নির্ম্মাণ। কিন্তু, তাঁহার প্রচেষ্টা সেইখানেই শেষ হইয়া যায় না; সেই প্রচেষ্টা সার্থক হয় তখনি, যখন বেহালা বাদকের হস্তে "সুরজালের" সৃষ্টি করিবে। বাদকের পরিশ্রম যদি নিরর্থক হয়, তবে বেহালা নির্ম্মাতার পরিশ্রমেরও কোনো মূল্যই থাকে না। বলাবাহুল্য, এই মনীষিগণের মতে জুয়াখেলায় যে পরিশ্রম (Labour) ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহার কোনো [illegible] ty) নাই। কিন্তু, আমরা দেখিয়াছি, যে Adam Smith প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মত এখন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা চলে না। সুতরাং আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ([illegible] g প্রভৃতি) মনে করেন যে, যে-পরিশ্রম মানব সমাজে প্রকৃত উপলব্ধ কোনো অভাবের পূরণ করে, কেবল তাহাই সার্থক (Productive). বাদকের বাদ্য মানুষের বাদ্য শুনিবার বাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকে; সুতরাং, ইহার সার্থকতা আছে। আমরা এই দিক হইতে এখন জুয়াখেলার বিচার করিতে চেষ্টা করিব।

আপাত দৃষ্টিতে ইহাই উপলব্ধি হবে যে জুয়ায়, [illegible] বিশেষের মনে জুয়াখেলার জন্য যে আগ্রহ ও অভাববোধ আছে, তাহার পূরণ [illegible]। সমষ্টি-বিশেষ জুয়াখেলায় কেবল খেলার জন্যই একটা প্রয়োজনীয়তা যদি সত্যই [illegible] বোধ করিতে থাকে; তাহা হইলে জুয়ারীর পরিশ্রমের (Labour এর) একটু মূল্য থাকিতে পারে। নিছক খেলার কথা বলিলাম এইজন্য যে, অর্থনীতি সকল প্রচেষ্টাকে বিচার করিয়া থাকে সমগ্র সমাজের তরফ হইতে। যে প্রচেষ্টা একদিকে সমষ্টি বিশেষের প্রকৃত উপলব্ধ অভাব নিবারিত করিয়া থাকে, অন্যদিকে যাহা সমাজের কোনো অপচয় করে না কেবল তাহাই নির্ব্বিচারে সম্পাদ্য হইতে পারে। এই দিক

হইতে দেখিলে, বলিতে হইবে যে, যখন জুয়াখেলার সমষ্টি-বিশেষের সমগ্র আগ্রহ শুধু নিছক খেলার আমোদের জন্যই ব্যয়িত হয়, তখনই ইহার দরকার আছে। কিন্তু যখন এই খেলার মূলে আছে অন্যের ধন হস্তগত করিবার একটা আগ্রহ, তখন অর্থনীতির দিক্ হইতে ইহার মূল্য নাই; পক্ষান্তরে, ইহা ন্যায়-বুদ্ধিরও বিরুদ্ধে। অবশ্য এরূপ হইতে পারে যে, দুইটি বিভিন্নমুখী উদ্দেশ্য একই প্রচেষ্টার মূলে বিদ্যমান আছে। জুয়াখেলার সমষ্টি-বিশেষের আংশিক নিছক খেলার আমোদ, পরধন হস্তগত করা, এতদুভয় উদ্দেশ্যই নিহিত থাকিতে পারে। যখন এই দুই উদ্দেশ্য একই প্রচেষ্টার মূলে নিহিত থাকে, তখন ইহার বিচার করা একটু কঠিন। কিন্তু জুয়াখেলায় খেলার আমোদ প্রায়ই পর্যবসিত হইয়া থাকে, পরধন হস্তগত করার অভিপ্রায়ে। সুতরাং, প্রায়ই, জুয়াখেলায় ব্যয়িত পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে নিরর্থক হইয়া পড়ে।

এতদ্ব্যতীত, অর্থনীতির তরফ হইতে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যে-আগ্রহ ও প্রচেষ্টা ও ধন এই খেলার জন্য ব্যয়িত হয়, তাহা যদি অন্য কোনোদিকে যাহাতে বাস্তবিক পক্ষে সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তার (Utility) বৃদ্ধি হয়, সেইদিকে নিয়োগ করা যাইত, তাহা হইলে এই খেলার অভাব-পূরণ-জনিত প্রয়োজনীয়তা হইতে অধিকতর প্রয়োজনীয়তার সৃষ্টি হইতে পারিত।

অর্থনীতির দিক হইতেই, আর এক ভাবে, বিষয়টির আলোচনা করা চলে। অর্থনীতিতে একটি নিয়ম আছে যে, মানুষের অধিকারে যে আয় (Income) আছে, তাহার যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই তাহার প্রয়োজনীয়তা (Utility) হ্রাস হইতে থাকে। মনে করুন, এক ব্যক্তির দশটি টাকা আছে। এই ব্যক্তিকে যদি আর একটা টাকা দেওয়া হয় তখন তাহার আয় বৃদ্ধি পাইল; কিন্তু এই একাদশ টাকাটির প্রয়োজনীয়তা (Utility) তাহার দশম টাকার প্রয়োজনীয়তা (Utility) হইতে কিছু কম। পুনর্ব্বার, যদি এই ব্যক্তিকে আর একটি টাকা দেওয়া হয়; তখন তাহার আয় আরও কিছু বাড়িল; এবং ইতি মধ্যে তাহার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কোনোই পরিবর্ত্তন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই দ্বাদশ টাকার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বের একাদশ টাকার প্রয়োজনীয়তা হইতে নিশ্চয়ই কিছু কম হইবে। একই-রূপ সামাজিক, পারিবারিক প্রভৃতি অবস্থায় দুইজন বিভিন্ন আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির

ব্যয়ের দিকে একটু নজর দিলেই, আমাদের বক্তব্য নিয়মটির সত্যতা সহজেই উপলব্ধ হইবে। মনে করুন, এক ব্যক্তির আয় এক শত টাকা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির আয় তিন শত টাকা। পূর্বোক্ত ব্যক্তির নিকট এক টাকার প্রয়োজনীয়তা শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট এক টাকার প্রয়োজনীয়তা হইতে নিশ্চয়ই কিছু বেশী।

উপরোক্ত নিয়ম (যাহাকে অর্থনীতিতে Law of Diminishing utility বলা হয়) হইতে দেখা যাইবে যে জুয়াখেলা সম্পূর্ণ ন্যায় (Fairness) ও সাম্যের (Evenness) সহিত নির্বাহিত হইলেও ইহা অর্থনৈতিক ক্ষতি ও অপচয়। মনে করুন, এক ব্যক্তির ছয় শত টাকা আয়। এখন ধরা যাক যে সে একশত টাকা বাজী রাখিল। এখন ঐ ব্যক্তি একশত টাকা পাইতে পারে, অথবা হারিতেও পারে; এখন ঐ ব্যক্তির লাভ ও ক্ষতির আশা ও আশঙ্কাজনিত ভবিষ্যৎ সুখ হইতেছে, সাতশত টাকা আয় জনিত সুখের অর্দ্ধেক এবং পাঁচশত টাকা আয় জনিত সুখের অর্দ্ধেকের সমান এবং এই ভবিষ্যৎ সুখ ছয়শত টাকা আয়ের সহজ এবং অবশ্যম্ভাবী সুখ হইতে অনেক কম। কারণ আমরা দেখিয়াছি পাঁচশত টাকা হইতে ছয়শত টাকা পর্যন্ত একশত টাকার প্রয়োজনীয়তা, ছয়শত টাকা হইতে সাতশত টাকা পর্যন্ত একশত টাকার প্রয়োজনীয়তা হইতে অনেক বেশী; অর্থাৎ যে ব্যক্তির পাঁচশত টাকা আছে তাহার নিকট অতিরিক্ত একশত টাকার প্রয়োজনীয়তা, সমান অবস্থার যে ব্যক্তির ছয়শত টাকা আছে, তাহার নিকট অতিরিক্ত একশত টাকার প্রয়োজনীয়তা হইতে অনেক বেশী।

সুতরাং বুঝা গেল, যে জুয়াখেলার খেলোয়ারগণের অর্থনৈতিক লোকসান হইয়া থাকে। অবশ্য এরূপ হইতে পারে যে, নিছক ক্রীড়াজনিত আমোদ অথবা সুখ ভবিষ্যত অর্থনাশের ক্ষতির আশঙ্কার সমান অথবা বেশী। এক্ষণে সমাজ দর্শনের (Social Philosophyর) দিক হইতে বিষয়টির আলোচনা করা যাক।

জুয়াখেলায় খেলোয়ারের মনে আনন্দের সঞ্চার হয় সন্দেহ নাই; এবং Egoistic Hedonisomএর দিক হইতে বিচার করিলে, ইহাতে আপত্তি করিবার কোনো প্রকৃষ্ট কারণ নাই। কিন্তু এই প্রকার নিছক আমোদ, (অথবা Pleasure) সমাজের কল্যাণ অকল্যাণের দিকে সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া সন্ধান করা, আধুনিক যুগে টিকিতে পারে না। Egoistic Hedonismএর আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং স

সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া, শুধু, এইটুকু বলিলেই বোধহয় যথেষ্ট হইবে, যে আধুনিক দার্শনিক Green প্রভৃতির মতে, সেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই যুক্তিযুক্ত, যাহা ব্যষ্টির কল্যাণ করে, এবং, অন্যদিকে যাহা সমাজের কল্যাণের সহিতও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে। এ ছাড়া জুয়াখেলায়, আমোদের আশার সহিত অর্থনাশজনিত দুঃখ বোধের আশঙ্কা জড়িত আছে; এবং Benthamএর মতে Quantityর দিক দিয়াও এই সুখ বোধের মাত্রাও অনেক কম।

জুয়োখেলার ফলে সমাজে সমষ্টি বিশেষের হৃদয়ে এক প্রকার অশান্তি, আশাময়ী তীব্র মত্ততার সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা; এবং তাহার ফলে যে সকল কর্ম্মে ও অনুষ্ঠানে একাগ্র ও একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কেন না, সমষ্টি বিশেষের এই অশান্ত মত্ততা কেবল ঐ সমষ্টিতেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না, তাহা দুষ্ট বীজাণুর ন্যায় সমাজ দেহেও সঞ্চারিত হয়। ব্যষ্টির মনোভাব যেমন সমাজের মনোভাবের উপর নির্ভর করে, তেমনি সমাজের মনোভাবের উপরেও ব্যষ্টির মনোভাব, তাহার ছায়াপাত করে। তাহা হইলে ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে, যে সমষ্টি বিশেষের পরধনলিপ্সা সমাজের মনেও সংক্রামিত হইয়া তাহাকে দুর্ব্বল করিতে পারে।

কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, যে Evil there must be in Society, অর্থাৎ সমাজে অকল্যাণ থাকিবেই। সুতরাং জুয়াখেলা অকল্যাণ হইতে পারে; তথাপি ইহাকে থাকিতে দাও। ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে এই প্রকার Delphic oracleএর মত বাণীর আশ্রয় লইয়া তর্কের হাত এড়াইয়া যাওয়া সময়ে সময়ে খুবই সহজ ও সুবিধাজনক পন্থা; এবং এইরূপ নীতিকথার (Maximএর) দোহাই দিয়া সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল ও অকল্যাণ জয়ের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হওয়া সহজ হইতে পারে, কিন্তু তাহা ভীরুতারই নামান্তর। এতদ্ব্যতীত, এই প্রকার চিন্তাধারা আসল কথাটাকেই হারাইয়া ফেলে। যাঁহারা এইরূপ কথার দোহাই দেন তাঁহারা বেশ সুবিধাজনক ভাবে এ কথাটাও ভুলিয়া যান, যে মানুষের মধ্যে বিচার বুদ্ধি (Reason) বলিয়া একটি জিনিস আছে; এবং এইটি আছে বলিয়াই মানুষ মানুষ, অর্থাৎ সে অন্য ইতর জন্তু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই বিচার বুদ্ধির দ্বারাই মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে যে, তাহাতে ব্যষ্টি ও সমাজের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইতে পারে। এবং সমাজের উদ্দেশ্যই হইতেছে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সুষ্ঠু কল্যাণের দিকে

অগ্রসর হওয়া। আধুনিক সর্ব্বপ্রকার সামাজিক উন্নতির মূলেই এই উদ্দেশ্য নিহিত আছে; এবং এইটি ছিল বলিয়াই বিংশ শতাব্দীর সমাজ (Society) আজ অষ্টাদশ শতাব্দীকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। দাসপ্রথা এক সময়ে সমাজের কল্যাণই করিয়াছিল; কিন্তু যখন এই কল্যাণ অমঙ্গলের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে কলুষিত হইয়া উঠিল, তখন মানুষ পূর্ব্বোক্ত নীতির দোহাই দিয়া সুখে নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা না করিয়া, সমাজ-মনের এরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিল, যাহার ফলে এই কুপ্রথা উঠিয়া গিয়া সাম্যের হাওয়া সমাজের খোলা জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া বিষাক্ত বাতাস নিঃশেষে বাহির করিয়া দিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন Industrial Revolutionএর ফলে ফ্যাক্টরী প্রভৃতির জন্ম হয়; তখন একদিকে যেমন পণ্য দ্রব্য সস্তায় প্রস্তুত হইতে লাগিল, এবং তাহার ফলে সমাজের ধন সম্ভার বাড়িয়া গেল, অন্য দিকেও তেমনি আত্মনির্ভরশীল হস্ত নির্ম্মিত সমাগ্রী (Handicraft product) নির্ম্মাতৃগণের দুরবস্থা আসিয়া পড়িল। কিন্তু তখন সমাজ পূর্ব্বকথিত নীতিকথার দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা ভাল বিবেচনা না করিয়া, এই অকল্যাণ—যাহা Necessary eveil বলিয়া আজও পরিচিত—দূর করিবার উপায় ভাবিতে লাগিল; এবং ফলে, তাহাদের অবস্থাটা অনেক ভাল হইয়া আসিতেছে; এবং আজ পর্য্যন্তও (Capitalism ও Labourএর বিরোধের মূলে যে Necessary eveil আছে, তাহাকেও দূর করিবার জন্য মানুষ বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল ব্যাধিতে মৃত্যু মানুষ দৈবের বিধান বলিয়া নির্ব্বিচারে মানিয়া লইত, আজ আর তাহা দৈবের বিধান বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারিতেছে না। আজ মানুষ কৃতযত্ন হইয়াছে দৈবের বিধানকে নাকচ করিয়া দিয়া তাহাকে মানুষের ক্ষমতার ও শক্তির গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ করিতে। এই সকল প্রচেষ্টার মূলেই আছে মানুষ ও সমাজের Eveil there must be in Society এই কথার (maximএর) তীব্র প্রতিবাদ।

বস্তুতঃ, পূর্ব্বকথিত উক্তিকে (maxim) মানিয়া লইতে হইলে, মানুষকে সমাজের বিকাশ ও উন্নতি (Progress) অস্বীকার করিতে হয়।

আজকাল, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে এই জুয়াখেলা উঠাইয়া দিবার জন্য আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে সকল দেশ জুয়াখেলার আইনাধিকার দেয় তাহারাও একটা ট্যাক্স লইয়া থাকে। এই ট্যাক্সের উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্টের কোষাগারে ধন সমাগম নহে; পরন্তু, এই

...কে বিনষ্ট করাই এই ট্যাক্সের উদ্দেশ্য। যে সকল দেশে এই License প্রথা আছে সেই ... দেশের গবর্ণমেণ্টে যদি এই উপায়ে এই খেলাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা না করিয়া সমাজ মনেরই ... পরিবর্ত্তনের উপায় করিতে পারিতেন, যাহাতে এই খেলায় যে অর্থ নষ্ট হইতেছে, তাহা ...সা বাণিজ্য প্রভৃতির দিকে নিয়োজিত হয়; তাহাতে ঐ সকল গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য অধিকতর ... ও উত্তম ভাবে সিদ্ধ হইত; এবং আপাততঃ কোষাগারে অর্থ সমাগম বন্ধ হইলেও পরিশেষে ... দিকেই আরও লাভ হইত। ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে দেশের ধন অধিকতর বৃদ্ধি পাইবার ...বনা; এবং তাহাতে ইনকাম ট্যাক্সের আয় ও এক্সাইজ রেভেনিউ বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং ...তে আশু ক্ষতি হইলেও পরিশেষে অধিকতর লাভের পথই প্রশস্ত হইবে।

আমরা অর্থনৈতিক, ও নৈতিক, উভয় দিক হইতে বিষয়টির আলোচনা করিয়া দেখিলাম, ...হাতে জন সমাজের মঙ্গল হইত অমঙ্গলই অনেক বেশী ও কিছুতেই ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া ...না। বিশেষতঃ বাঙ্গলার ন্যায় দরিদ্র দেশে ইহার পরিণাম কি ভয়ানক তাহা প্রবন্ধ লিখিয়া ...ঝাইলেও চলে। পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে যেখানেই মেলা বসে, দশ জন লোকের সমাগম হয়, ... কৃষক হইতে সভ্য ভব্য ব্যক্তিগণ আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য উপস্থিত হন সেখানেই ...র জালে পড়িয়া কত লোককে পথে বসিয়া কাঁদিতে হয় এ দৃশ্য বাঙ্গলায় সর্ব্বত্র। ইহার ...কার কি প্রার্থনীয় নহে?

শ্রীব্রজেন্দ্রলাল সরকার।

সন্ধ্যা—ঘাটে।

—:*:—

চলেছ বউ ঘাটের পথে
সাঁঝের বেলা একলা আজি
পুলকেরি সুর ছড়ায়ে
পায়ে মল উঠছে বাজি।

সিধুর তোমার সিঁথির মূলে—
        রাঙা সিঁদুর টিপ্টী ভালে।
প্রদীপ শিখা কাঁপ্ছে যেন
        সাঁঝের বেলা তুলসী তলে।
আল্তা-পরা পা দুখানি
        ফুট্ছে যেন কমল দুটী।
ঘোমটা তোমার উড়িয়ে নিতে
        আস্ছে উতল পবন ছুটি।
ঘনিয়ে এল সাঁঝের আঁধার
        জোনাক জ্বলে লাখে লাখে
পথ দেখাতে তোমায় যেন,
        ঝিল্লি ডাকে ঝোপের ফাঁকে—
বল্ছে যেন "সীমন্তিনি !
        চল্রে ঘরে ত্বরা ক'রে
সাঁঝ পোহালো, গা ধুয়ে নে,
        নে' তোর জলের কলস ভরি'।"

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভুমানন্দ।

সতীশ সেবার যখন বিজ্ঞানের কুমার হইতে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ-দ্বারের পথেই পা ফস্কাইয়া ফিরিয়া আসিল, তাহাতে সকলেই তখন একটু বিরক্ত হইল তাহা হলপ করিয়া বলা যায়,—একটু কেন—বোধ হয় ভাল রকম 'একটুই' হইয়াছিল। চিরদিনই সে ছেলে ভাল ছিল। আধুনিক অভিধানে ভাল হওয়ার অর্থ যে শুধু বছরের পর বছর পরীক্ষায় পাশ করা ছাড়া আর কিছুই নয় তা বোধ হয় সভ্যতা-হিসাবে প্রেশারেরের এক্সিমনের চেয়ে কম খাঁটী নয়। চরিত্রবান্ ফেল-করা ছেলে যদি চরিত্রটকে হারাইয়াও পাশ করিতে আরম্ভ করে তবে তাহাই যে তাহার সচ্চরিত্রতার মস্ত প্রশংসাপত্র হইয়া দাঁড়ায় ইহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে হয় ত মনে মনে স্বীকার করিবেন কিন্তু মুখে স্বীকার করিবেন না। যাক্, ফেল করিয়াছিল করিয়াছিল কিন্তু মাস ছয়েক পূর্ব্বে সে তাহার জীবন-গ্রন্থির সঙ্গে আর একজনকে বাঁধিয়া ফেলিয়া চিরকুমার-ব্রতটা উদ্যাপনের মুখেই যে একেবারে ভঙ্গ করিয়া দিয়া প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইয়া পড়িল, ইহাতেই তাহার আপশোষ হইল অনেক বেশী। সেই-যে একটা ভুল সে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই—অনুস্বার-বিসর্গ-যুক্ত দু'এক ছত্র মন্ত্র পাঠ করিয়াই একেবারে করিয়া ফেলিল,—তাহার সংশোধন করিতে যাইয়া তাহাকেও পিছপাও হইতে হইলই—বরং সে এত দিন যে নসীব বলিয়া কাহাকেও মানিত না সেই নসীবের খামখেয়ালীটাকেও মাথা নোয়াইয়া তাহার মানিয়া নিতে হইল। এতদিন যে উদ্দাম জীবনটা মুক্ত প্রবাহে চালিয়া তরতর বেগে চারিদিক না তাকাইয়াই চলিয়াছিল তা এই বিবাহ-ব্যাপারটাতে যে হঠাৎ মন্দীভূত হইয়া গেল তা তার হাবভাবে এতই পরিষ্কার হইয়া পড়িল যে পিতামাতা আবার গবেষণা করিয়া করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন যে নূতন বধূমাতাকে ঘরে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পুত্ররত্নটিকেই হারাইতে বসিয়াছেন।

শুভদৃষ্টির সময়েই সতীশ ও তাহার পত্নী শান্তির মধ্যে যে দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল তাহা বাস্তবিকই শুভ হইয়াছিল কি না বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ ব্যক্তিদের তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকা সত্বেও আজ আমার কেন যে সে সন্দেহটা বড়ই বেশী রকম হইতেছে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা। মানুষ দেখিল দুইটী জীবন মন্ত্রের মোহিনী শক্তিতে এক হইয়া

গেল, কিন্তু অদৃষ্টদেব হাসিলেন শুধু ভাবিয়া তুয়ের মন্ত্র তফাং। মন্ত্রে "যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম" থাকা সত্বেও উভয়ের হৃদয় বিনিময় যে-বিধির একান্তই অনভিপ্রেত, ছিল তাহা কে জানিত! যাক্ বিবাহ যাহা হইবার তাহা সমাধা হইল। বিবাহ-রাত্রিটাও শেষ হইল, সঙ্গে সঙ্গে সতীশের যত শান্তি সবই যেন তার জীবন-পেয়ালা চুমাইয়া কোথায় নিঃশেষ হইয়া গেল। যে শান্তি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল সে যে অশান্তিরই জ্বালা-যন্ত্রণাগুলি সতীশের উপরে চাপাইয়া দিয়া দূরে সরিয়া গেল, তাহা আর কে বুঝিবে সহনসহ সতীশ ভিন্ন। যদিও সে আমাকে সকল কথাই বলিয়াছিল তাহার একান্ত অনুরক্ত বন্ধু বলিয়াই, তবু তার দুঃখ ও কষ্টের শতাংশের একাংশও কি আমি গ্রহণ করিতে পারিয়াছি? যার জ্বালা সেই বুঝে জানে কি পরে? সতীশের পিতার ইচ্ছা ছিল বধূমাতা যেন বয়সে খুবই কচি থাকেন কারণ নরমডালকে ইচ্ছামতই সোজা করান ও বাঁকান যায়। শক্তডালের বেলায় তা আর ঘটিয়া উঠেনা,—তা ভাঙ্গিয়া যায়। এই থিওরির উপরে অতি মাত্রায় বিশ্বাস তাঁর ছিল বলিয়াই ক'নে দেখার সময়েও তিনি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করিলেন, ছেলের বন্ধু বান্ধবের চোখকে আর তেমন বিশ্বাস করেন না বলিয়া উপান্ত তাহাদের বয়সের নির্ব্বাচন শক্তির খামখেয়ালীর উপর জোর দিয়া নিজেই সব কথাবার্তা সাব্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের পরে সতীশ যখন বন্ধুমহলে রবিবাবুর "নবদম্পতী" সম্বন্ধে কবিতাটির মধ্য হইতে দুএক লাইন আওরাইতে সুরু করিল তখন আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে সতীশের স্ত্রী পছন্দ হয় নাই। সেদিন মনে হইয়াছিল স্ত্রী বয়সে একেবারে খুকী বলিয়াই হয় ত সতীশের এত অপছন্দ। কিন্তু দুদিন বাদে সতীশকে আর তেমন দোষ দেওয়া গেল না কারণ তখন তার অপছন্দতার যথেষ্টই পরিচয় পাওয়া গেল। গোঁয়ার সতীশ যখন তার গোঁয়ার্তুমি ছাড়িয়া দিয়া বিবাহের বছরখানেক পরেই একেবারে নিয়তির বড় রকম ভক্ত হইয়া পড়িল তখন সকলেই সহজেই বুঝিল কত বড় ধাক্কা খাইয়া সতীশ তার আজন্মের স্বভাবটাকে পর্য্যন্ত বদলাইয়া ফেলিয়াছে—শুধু স্বভাব বদলান নয় তার সঙ্গে সঙ্গে যে সব মতগুলি এতদিন সে অতিমাত্রায় বিশ্বাসের সহিত পোষণ করিয়া আসিয়াছে তাহা পর্য্যন্ত একটা ঘটনার চাপে পড়িয়া যে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া গুঁড়া হইয়া গেল সে দিকে পর্য্যন্ত তাহার দৃক্‌পাত নাই। এমনই করিয়া মানুষকে পরিবর্ত্তনের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া পূর্ব্বের সব হারাইয়া

আবার নূতন কিছু অর্জ্জন করিবার দিকে মন বসাইতে হয়। তরুণ বয়সে যাহা অর্জ্জনে ব্যবসার বাজারে নিতান্তই ক্ষতি বলিয়া মনে হইত এক একটা ধাক্কা খাইয়া সেই ক্ষতিটাকেই যখন আবার আঁকড়িয়া ধরিতে হয় তখন সে যে ক্ষতি মোটেই থাকে না তাহা বলাই বাহুল্য। সতীশও ঠিক এমনই বদ্‌লাইয়া গেল যে আশে-পাশের লোক আশ্চর্য্য না হইয়া পারিল না। পরিবর্ত্তনের কষাঘাত এমনই অনেক সময়ে কঠোরও হইয়া পড়ে যে নিজের জমান নিজস্বগুলিকে হারাইয়া পরের সব দিয়াই চালাইয়া লইতে হয়।

(২)

ফেলের সংবাদটা যেদিন সতীশ ঘরে বসিয়াই পাইল সেদিন তার মনটা হঠাৎ এত দমিয়া গেল যে তাহাকে নাড়া দিয়া আবার তুলিয়া ধরা তাহার শক্তিতে হইল না। জীবনটা এমনই একটা ব্যর্থতা ও নিরাশায় ভরিয়া গেল যে পূর্ব্বের উৎসাহ যে কোথায় মিলাইয়া গেল তাহার খোঁজ করার দরকার বোধ একবারও হইল না। একটা ছোট্ট মেঘখণ্ড যেমন সমস্ত বিরাট আকাশটাকে ছাইয়া ফেলিয়া নিজের বুকের মধ্যে লুকাইয়া ফেলে তেমনি কোথা হইতে অলসতার একটা ছোট্ট বীজাণু তাহার পালোয়ানের মত শরীরটাতে ঢুকিয়া ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিয়া তাহার উদ্যোগী মনটাকে একেবারে নোয়াইয়া ফেলিল। তবু বাপ্‌মা যখন আরেক বছর চেষ্টা করিতে বলিলেন তখন সতীশ তাহার যুক্তিতর্কের ঝুড়ি তাঁহাদের দিকে তুলিয়া ধরাতেও কোন ফল পাইল না। স্নেহশীল পিতামাতার কাছে পুত্রের আর প্রেমময়ী পত্নীর কাছে স্বামীর তর্কে পরাস্ত হওয়াটা যে গৌরবের বিষয় তাহা অনেক স্থলেই শাস্ত্রকারেরা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আর আজকালকার বৃদ্ধ পক্ককেশ পিতারাই যে নবীন বয়সে মুখস্থ করিয়াছেন "পারিব না একথাটি বলিও না আর."—তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহহীন হওয়ার জন্যই তাহারা পুত্রের পাঠ্যাবস্থার এক্সটেন্‌সন করিয়া দিয়া তাহাকে কলেজ স্কুলের ঘানিতে যতদিন পারেন ঘুরাইয়া লন। সতীশের পিতাও তাহার ব্যবস্থা তদ্রূপই করিলেন। নেশাখোর মাতাল যেমন চলিতে চেষ্টা করিয়াও ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িয়া যায় তেমনি সে নিরুৎসাহ মনে ধীরে ধীরে আসিয়া আবার সেই আগেকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানেই চলিতে সুরু করিল। নিষ্প্রভ প্রদীপ যেমন বেশীক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারে না তাহার টিকিয়া থাকাটাও যে অধিকদিন হইবে না, সে বিষয়ে সতীশ বেশ স্থির হইয়াই রহিল।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া সতীশ যতবারই শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে ততবারই তার মানসিক অবস্থাটা অশান্তির কুয়াসায় ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হইয়াই চলিয়াছে। তার মুখ্য কারণ যে শান্তির কঠোর দুর্ব্ব্যবহার তাহাতে তিল মাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার ধৈর্য্যের সীমা যে খুবই বেশী ছিল তা অন্যে স্বীকার না করিলেও আমি স্বীকার করিবই করিব কারণ তাহা না হইলে সত্য-ধর্ম্ম হইতে আমি সরিয়াই যাইব। বহুবার সতীশ তাহাকে নরম ভাষায় বুঝাইতে চাহিয়াছে, কিন্তু সে হাসিয়া সতীশের কথাগুলি অবহেলা করিয়া তাহাকে অপমানজনক কথা বলিতে কখনও কসুর করে নাই। বুঝিবার বয়স যে শান্তির ছিল না তাহা নহে, সে সকলই বুঝিত তবে কেন এরূপ আচরণ তাহার স্বভাবটাকে সতীশের নিকট অপ্রিয় করিয়া তুলিতেছিল তাহার উত্তরে আজ এ কথাটা বলিলে বোধ হয় মানহানির মোকদ্দমার চাপে পড়িব না যে পিতামাতার অপরিমিত প্রশ্রয়ই তাহাকে কুশিক্ষার দোষে দূষিত করিয়া দিয়াছে। অভিমানী শান্তি যখন বাক্‌সংযম হারাইয়া সতীশকে যখন যা তা বলিতে সুরু করিল তখনও বাপমা তার তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়াটা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না। পিতামাতারও বা কি দোষ দেওয়া যায়? তাহারা তাহাদের সন্তানের উপর এত অধিক মাত্রায় স্নেহ বর্ষণ করিয়া আসিয়াছেন যে আজ একটু চোখ রাঙ্গাইতে হইলেই যে তাঁহাদের আবার অনেকটা অসম্ভবকেও সম্ভবের দিকে টানিয়া নিতে হইবে তাহা বুঝিয়া আর তেমন কিছু করিতে পারিলেন না। শান্তি সতীশকে তাহাদের বাড়ীতে গতায়াতের জন্য, বিশেষতঃ ফেল করার পরেও, নির্লজ্জ বলিয়া বিশেষিত করিতে মোটেই সঙ্কোচ বোধ করিত না। একদিন এমন কি তাহাদের বাড়ীর 'লিলি' কুকুরটার চরিত্রের সঙ্গে সতীশের চরিত্রের যে অনেকটা ঐক্য রহিয়াছে এই তত্ত্বানুধাবন করিয়া সতীশকে লিলির পাশেই ভাত খাইতেও নির্দ্দেশ করিয়াছিল। এসব অন্যায় সতীশ হাসিয়াই উড়াইয়া দিত; গ্রাহ্য করিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হইত না, তজ্জন্য বন্ধুমহলে স্ত্রৈণ বলিয়া তাহার যে একটা বদ্‌নাম রটিয়া গিয়াছিল তাহা সতীশ নীরবেই হজম করিয়া চলিত। স্ত্রীর প্রতি কঠোরতা দেখানটা যে একটা পৌরুষের কাজ এ ধারণা সতীশের কোনদিনই ছিল না। কিন্তু যেদিন শাশুরী আসিয়া তাঁহার দুহিতাকে সতীশের শয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া গেলেন শুধু কড়া ভাষায় সতীশকে দু'কথা শুনাইয়া যে, 'মেয়ের স্বাস্থ্যটা তাহাকে দেখিতে হইবে, শুধু সতীশের মন ও মেজাজ দেখিয়াই চলিলে তো হইবে না। সেদিন সতীশ নিজের অবস্থাটা বেশ করিয়া বুঝিতে পারিল

আর চোখের জলে সমস্ত 'বালিসটাকে ভিজাইয়া ফেলিল। শান্তির প্রতি নাকি সতীশের ব্যবহারটা এতই কদর্য্য হইতে চলিয়াছিল যে সে রাত্রিবেলা কখনও দুদণ্ড ঘুমাইতেও পারিত না। সতীশের নামের সঙ্গে সঙ্গেই এ খ্যাতিটা এতটা প্রসার লাভ করিয়াছিল যে সতীশকে পাড়ায় কেহ দেখিলেই মেয়ের পক্ষ হইতে দুকথা গরম গরম শুনাইয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। বেচারা সতীশ এত দিনে বুঝিল যে বিবাহ করিয়া এবং তৎপরে ফেল করিয়া যে সে কি ঘোর মহাপতক করিয়া ফেলিয়াছে তাহা অন্যের ধারণা করাটাও দুঃসাধ্য। আরও বুঝিল যে জামাতা চিরদিনই পরের বাড়ীর ছেলের মতনই থাকিয়া যায়—শ্বশুর বাড়ীতে এই দূরত্বটুকু থাকে বলিয়াই সে জামাতা, নাইলে তো ছেলের মতনই হইয়া যাইত।

পরেরদিনই সে শ্বশুর-শাশুরীর নিকটে বিদায় লইয়া নিজের বাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। জামাতৃ পদটা যে কতই নিন্দনীয় ও জামাতা জীবটা যে ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে একেবারে নিকৃষ্ট ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া সতীশ আর সেদিন ভাতের গ্রাসও মুখে বুঝিতে পারিল না। যাইবার আগে শান্তির সহিত একটিবার দেখা করিতে চাহিল। বলিবার যে তাহার কিছু ছিল তা নয়, তার মন মানিতেছিল না, তাই শেষবারের দেখাটা সতীশ কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিল না। কবি বলেন আত্মা যখন দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া যায় তখন পর্য্যন্ত সে ফিরিয়া ফিরিয়া পিঞ্জর পানে তাকাইতে থাকে, কারণ তাহাকেও শেষ দেখার মোহিনী শক্তি পাইয়া বসে। কবির কথা কল্পনা হইতে পারে যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইহাতে মোটেই নাই তবু আশার যে শেষ নাই ইহা যে মানুষের মজ্জাগত তাহা বেশ সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কোন গবেষণার তেমন দরকার হয় না; সতীশ শান্তির সঙ্গে তাহার পরমভাগ্যের ফলে দেখা পাইল। চোখের জল রাখিতে পারিল না। তাহার হাতটা সতীশ টানিয়া ধরিল। বিদ্রূপ করিয়া শান্তি হাসিয়া কহিল "মরাকান্না জুড়িয়া দিতে এখানে আসিলে কেন? ফেল করিয়াছ, কাঁদিতে লজ্জা করে না? সদর-দরজা খোলা রহিয়াছে, চলিয়া যাইতে কোনই বেগ পাইতে হইবে না।" একটা লোহার হাতুরি আসিয়া যেন সতীশের বুকের উপরে পড়িল নেশাখোরের মতন অচেনাবস্থায় যে টলিতে টলিতে সদর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। শান্তি নিষ্কৃতির আরামে একটু মুচ্‌কি হাসিল।

(৩)

বছর পাঁচ ছয় পরের কাহিনী কহিব। সতীশ সেই যে শ্বশুরবাড়ীর ত্রসীমানা ছাড়িয়া আসিয়াছে; তাহার পরে আর তাহা মাড়াইতে তাহার মন সরে নাই। ইচ্ছা যে তাহার বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়া তাহার প্রতিজ্ঞার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহিত, তাহা আমার কাছে তার যতগুলি চিঠিই আসিয়াছিল তাহাতে বেশ ফুটিয়াই উঠিয়াছিল। তবে বিবেক ও আত্মসম্মান এ দুইটি জিনিষকে সতীশ কখনও ছোট চোখে দেখিত না যে তাহা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাই শত ইচ্ছা থাকাতেও সতীশ তাহাকে চাপিয়া একেবারে নিস্তেজ করিয়াই ফেলিয়াছিল। ইহার মধ্যেই সে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া ভবঘুরের মত চাকুরী খুঁজিতে ছিল। মজঃফরপুরে সেবার যখন সতীশ চাকুরী করিতে যায় তখন বিদায়ের কালে আমার হাতটা তুলিয়া ধরিয়া তাহার বুকের উপরে রাখিয়া ঝর ঝর ধারে চোখের জল ফেলিয়া দিল। হাতটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া শুধু এই কথাকয়টি সে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—"ভাই, এ বুকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জীবনে এ অভাগাকে একেবারে ভুলিয়া থাকিস্ না। আমাদের এ ভালবাসা যেন চিরদিন এমনি অটুট থাকে।" তারপরে সেই যে বিদায় লইয়া সে দৃষ্টির বাইরে চলিয়া গেল,—সেই যাওয়াই যে তার শেষ যাওয়া হইবে তাহা জানিলে তাহাকে সেদিন বুকের কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে দিতাম না। এমনই মিলন ও বন্ধনের মাঝে অজানা অসীম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া যে ভগবান কি আনন্দ পান তা তার খামখেয়ালী স্বভাবটাই জানে।

এদিকে সতীশের বড় শ্যালক বিজেন বিবাহ করিয়া আসিল। বিবাহে সতীশকে আসিতে লেখা হইল একখানা দু'পয়সার কার্ডে দুলাইন ছাপাইয়া। সতীশ না আসিলে যে বিবাহে কোন বাধা হইবে না তাহা সে দুলাইন বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলিল। বেচারা সতীশও বুঝিল যে সে তো সে বাড়ীর জামাতা ভিন্ন কেহ নয়, তবে কেন তাহার এত আত্মীয়তা দেখাইবার ব্যস্ততা। সে চুপ করিয়াই গেল—বিবাহে তাহার আত্মসম্মজ্ঞান কিছুতেই যাইতে আদেশ দিল না। [illegible] সমবয়সীদের কাছে গল্প করিল তাহার স্বামীকে বিদ্রূপ করিয়া। সে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—বাবা যেচিয়া এমন লোককে আবার নিমন্ত্রণ করিলেন, আমি হইলে ত' এ ছোট

কিছুতেই হইতে যাইতাম না। ছোটলোককে নিমন্ত্রণ করিলেই তাহার চালটা বাড়িয়া যায়, নিমন্ত্রণ না করিলেই দেখা যাইত কুকুরের মত দুমুঠো ভাতের জন্য লোলাইয়া আসেন কিনা। ডোম, চাঁড়াল মুদ্দফরাস এদের কি আর কখনও নিমন্ত্রণ করিতে হয়। যাহা হউক সতীশ সে বিবাহে গেল না। তাহার অনুপস্থিতি যে কাহারও তেমন চোখে ঠেকিল তাহা নয়। শান্তিও সতীশ যে আসিল না ইহাতে খুবই আনন্দ পাইল। নূতন বৌদির সঙ্গে সে দু'দিনেই আলাপ জমাইয়া ফেলিল। তাহার স্বামীর নিন্দা লইয়াই তাহার কথাবার্ত্তা বেশীর ভাগ চলিত। স্বামী সতীশ যে তাহার মোটেই পছন্দ হয় নাই এ কথাটা বলিতে সে যতটা শান্তি পাইত এমন বোধহয় আর কিছুতেই তার হইত না। স্বামী তার দু'চোখের যে বিষ ছিল এটা তাহার আচার ব্যবহারে প্রকাশ করিতে তার গর্ব্ববোধই হইত। এই দর্পচূর্ণ করিবার আয়োজন যে নিয়তি অলক্ষ্যে বসিয়া করিতেছিলেন তাহা সে মুহূর্ত্তের জন্যও কি ভাবিয়া দেখিয়াছে! দ্বিজেনের স্বভাবটা ছিল বড়ই মেয়েলি কাহাকেও জোরে রাগিয়া একটা কথা বলিতে পারিত না। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিবার শক্তি তাহার শৈশবে তো একেবারেই ছিল না—তাহাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে এমন করিয়াই গঠন করিয়া তুলিল যে বড় হইয়া বিবাহের পরে সে বাহিরে স্ত্রৈণ নাম ভিন্ন আর কিছুই অর্জ্জন করিতে পারিল না। স্ত্রীর কথার উপরে কথা বলিবার শক্তি তাহার ছিল কিনা এ পরীক্ষাটাও তাহাকে জীবনে করিতে দেখি নাই—কারণ বিবাহের পর হইতেই দেখিয়া আসিয়াছি "দেহিপদপল্লবমুদারং" জপমন্ত্র স্মরণ করিয়া তাহার স্ত্রীর পাদপদ্মে অর্জ্জিত টাকা হইতে মায় আত্মসম্ভ্রমটুকু তিলে তিলে নিঃশেষ করিয়া সে ফতুর হইয়াই চলিয়াছে। তাহাকে যদি কেহ এ দোষটা সংশোধন করিতে উপদেশ দিতে যাইত তবে সে মনে মনে তাহার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিত কিনা জানি না, তবে মুখে কিছুই বলিত না দু'একবার একটু হাসিত। সকলেই, বুঝিয়াছিল স্ত্রৈণতা রোগ এতই দুরারোগ্য যে সকল ব্যারাম সারিতে পারে কিন্তু এ ব্যারামের ঔষধ পর্য্যন্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়ে নাই। প্রথম প্রথম স্ত্রী দ্বিজেনের কাণে তার ভগ্নির বিরুদ্ধে দু'এক কথা করিয়া লাগাইয়া তার ভবিষ্যতে যে বীরাঙ্গনার পাঠ অভিনয় করিতে হইবে তাহার সূচনা করিতে লাগিল। এত বড় একটা সংসারে তার ভগ্নীই যে অর্দ্ধেক জুড়িয়া আছে এবং বিবাহ হওয়া স্বত্বেও যে সে বাপের বাড়ী ছাড়িতে চাহিতেছে না এ সব যে মোটেই ভাললক্ষণ নয় তাহা পুনঃ পুনঃ সে দ্বিজেনকে

বুঝাইতে চাহিল। এ আপদ যত শীঘ্র বিদায় হয় তাহাই যে সংসারের পক্ষে ও সতীশের স্বার্থের দিক হইতে ভাল এটুকু বুঝাইতে তাহাকে বেশী বেগ পাইতে হইল না; কারণ দ্বিজেনের স্বভাবটা তার স্ত্রীর চোখের সামনে এতই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে সে তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্য দিয়াই যে তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া তাহার শক্তির অধীন করিয়া ফেলিতে পারিবে এ বিষয়ে যে তার কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ ছিল না, তা জোর গলায় অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। তাই সে সহজেই জাল ফেলিতেও পারিল আর অতি সহজেই জালটাকে গুটাইতেও পারিল। জাল ফেলাটাও যে ব্যর্থ মোটেই হইল না তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল।

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন এসিয়াটিক কলেরা রোগে দ্বিজেনের পিতা অজানা বিচারের সমন পাইয়া চলিয়া গেলেন। মাস ছয় পরেই স্বামীর শোকে দ্বিজেনের মাতাও পুত্র কন্যা রাখিয়া স্বামীর চিতার পাশেই শেষ-শয্যা পাতিলেন। এ দুজন চলিয়া যাওয়াতে চোখের নিমেষেই যেন সমস্ত পরিবারটা একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল। দ্বিজেনের স্ত্রীই তখন হইল পরিবারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তার প্রভুত্বটা যে এবার ষোল আনার স্থলে আঠার আনা হইয়া সকলের উপরে জারী হইবে এটা সকলেই বুঝিল। শান্তি এতদিনে বুঝিল কি হতভাগিনী সে। এবার ধীরে ধীরে তার অনুতাপ আগুণ ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া উঠিতে লাগিল। বুকের মাঝে চাপিয়া রাখিতে চাহিত কিন্তু পারিত না, আনাচে কোনাচে নির্জ্জনে বসিয়া শুধু কাঁদিত আর ভাবিত তার স্বামী থাকিতেও সে নাই, বাপ মা ছিল, তাঁরা আজ কোথায়! কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিজেনের স্ত্রী তার কর্ত্তব্যাবলীর একটা খসড়া করিয়া ফেলিল। তার প্রধান কাজই দাঁড়াইল যেমন করিয়াই হউক পরিবার হইতে শান্তিকে দূর করিতেই হইবে। শান্তির কপালও তার বাপ মার অন্তর্ধানের পর হইতেই যে ভাঙ্গিয়া পড়িল তাহা আর জোড়া লাগিল না।

(৪)

শান্তির বুকে অনুতাপের আগুণ দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। বাহিরে সে তেমন করিয়াই আগের মত হাসিয়া খেলিয়া সকলের সাথে মেলামেশা করিতে চাহিত কিন্তু পারিত না। যে তাহার ব্যবহারে কোন সময়ে এমনই পরিষ্কার হইয়া বাহির হইত যে

লোকের চোখ তাহা মোটেই এড়াইয়া চলিত না। শান্তি আমার দূর সম্পর্কে ভগ্নী হইত, তাই মাঝে মাঝে তাহাদের ওখানে যাইতাম। সতীশের সঙ্গে শান্তির আচরণের জন্য কত বার যে আমি তাহাকে মৃদু ভর্ৎসনার সহিত বুঝাইতে চাহিয়াছি তাহা বলা যায় না। কিন্তু সে সব কথাই সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত, উপরন্তু আমাকে সতীশের বন্ধু বলিয়া তেমন সু নজরে দেখিত না।

অনেক দিন ধরিয়া সতীশের কোন চিঠি-পত্র না পাইয়া তাহার উপরে রাগটা যেমন বাড়িয়াই চলিয়াছিল তেমনি একটা উদ্বেগের চাপে বুকটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। কেন যে সতীশ কয়েকটা পয়সা খরচ করিয়া পত্র লিখিতে পারিতেছে না তাহা আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। মাস পাঁচ ছয় তো চলিয়া গেল কিন্তু এ দীর্ঘ কয়েক মাসের মধ্যে তাহার পুঁজিতে কি দুটা পয়সাও ছিল না যে একখানা কার্ড কিনিয়া তাহার গায়ে লিখিয়া দেয় "ভাল আছি, চিন্তা নাই" তাই শত যুক্তি-তর্ক মনে মনে তাহার পক্ষের দিকে করিয়াও সতীশকে আমি এই কর্ত্তব্যহানির জন্য কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিলাম না। মনে মনে এতই বিরক্ত হইলাম যে ভাবিলাম গোটাদশেক টাকা তাহার নামে মণিঅর্ডার করিয়া দিয়া কুপনে লিখিয়া দিই "দশটি টাকা পাঠাইলাম কারণ মাস ছয়ের মধ্যে তোমার পকেটে চিঠি লেখার যে দু'টি পয়সাও নাই বুঝিতে পারিয়াছি। এবার এই টাকা কয়টি পাইয়া হয় ত মাসে মাসে অন্ততঃ একটি চিঠি লিখিতে দুই পয়সার অভাব বোধ করিবে না। প্রাপ্তি সংবাদ দিবে।" যাহা ভাবা তাহাই করাও হইল। মানঅর্ডার তো পাঠাইলাম কিন্তু সে যখন রেলের কোন ছোটকুঠুরীতে কাগজের চাপে মজঃফরপুরের দিকে চলিয়াছিল তখন আমার মনে হইল হয় ত সতীশ চিঠি লিখিত কিন্তু এই টাকা পাঠানর ব্যাপারে আত্ম-সম্মানের উপরে আঘাত মনে করিয়া একেবারেই চিঠি লেখা বন্ধ করিয়া দিবে। কিন্তু বেশীদিন এমন একটা অনিশ্চিত ভয় নিয়া থাকা যে কত দুঃসাধ্য ও অসহ্য তাহা জেলের কয়েদী বুঝিবে যখন সে বিচারকের কাছ হইতে দণ্ডাজ্ঞার জন্য উদ্বেগচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

সেদিন ভোরবেলা নদীধারে একটু বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিলাম। চাকর চা-তৈয়ের করিতেছিল তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, হঠাৎ নজরে পড়িল চিনি যে কাগজটার উপরে ছিল তাহার উপরে। সে কাগজ খণ্ড যে কোন সংবাদপত্রের একটা অংশ তা বেশ বুঝিতে

পাওয়া গেল। বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে 'শোকসংবাদ' এবং তাহার নীচেই যে কয়েক লাইন আছে তাহা এই—"মজঃফরপুরের বিখ্যাত কর্ম্মী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গতকল্য বেলা একটার সময়ে হঠাৎ হার্টফেল করিয়া মারা গিয়াছেন। তাহার পরিচালনায় মজঃফরপুরে তাঁত ও চরকা এমন সুন্দর রকমে চলিয়াছিল যে আমাদের বিশ্বাস বছর পাঁচ ছয় পরে আর মজঃফরপুরকে, নগ্নতা দূর করিবার জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের কাছে হাত পাতিতে হইত না। আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে সতীশবাবুর আত্মার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।" পড়িয়া যেন টলিতে টলিতে গিয়া বিছানায় পড়িলাম। মাথাটা ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল চাকর চা দিয়া গেল কিন্তু চিন্তা মাথাটাকে এমনই শ্রান্ত করিয়া ফেলিল যে চা পান করিতে আর সেদিন ইচ্ছা হইল না। চা ঠাণ্ডা হইয়া একেবারে বরফের মত হইয়া গেল। সতীশ সুদূর মজঃফরপুরে হার্টফেল করিয়া মারা গেল, একবারও শেষ দেখাটা হইল না। মোটেই বিশ্বাস হইতে ছিল না সতীশ নাই, সে আমার এত প্রিয় ও ভালবাসার ছিল যে সতীশের অভাবটাকে যেন একটা অসম্ভব কিছু ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ ডাকপিয়ন ডাকিল "বাবু", চাকর চিঠি লইয়া আসিল আর সঙ্গে আনিল আমার সেই মণিঅর্ডার ও দশটি টাকা। জানিলাম সতীশ মুখোপাধ্যায় দিন কতক হইল মারা গিয়াছেন, তাই এই মণিঅর্ডার বিলি হইল না। এতক্ষণে বুঝিলাম সতীশ বাস্তবিকই নাই। সেদিন কিছুই খাইলাম না, শরীরটাও এমনি খারাপ লাগিতে লাগিল যে ভাত খাইতে পর্য্যন্ত মন গেল না। সতীশকে হারাইয়া আমার অবস্থা যে কি দাঁড়াইল তাহা লেখনীর সাহায্যে লিখিয়া জানান যায় না। কেবলই শান্তির প্রতি মনটা বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল সমস্ত দোষটা শান্তির ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া তবে মনে একটু আরাম বোধ করিতে লাগিলাম। দিন দুয়েক পরে হঠাৎ একদিন শান্তির ওখানে যাইয়া হাজির হইলাম। বাহির হইতেই শুনিলাম দ্বিজেনের স্ত্রী শান্তিকে অশ্রাব্যভাষায় গালীদিতেছে। বারবারই তার স্বামীর কথা তুলিয়া তার চরিত্রের উপরে নানা প্রকার বাক্যবাণ ছুড়িতেছে। প্রতিবারই তর্জ্জনী হেলাইয়া সদর দরজা তাহাকে দেখাইয়া দিতেছে। দ্বিজেন ঘরের মধ্যে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে—স্ত্রীর বিরুদ্ধে তাহার ভগ্নীর পক্ষসমর্থন করিয়া একটি কথা বলিবার সাহসও তাহার হইতেছে না; দেখিয়া শুনিয়া শান্তির প্রতি এত অসন্তোষ পোষণ করা সত্ত্বেও সেদিন কেন জানি তার অবস্থা দেখিয়া দুঃখই হইল। বাড়ীর মধ্যে

প্রবেশ করা মাত্রই শান্তি একেবারে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া আমার ছপা জড়াইয়া ধরিল। ছচোখ দিয়া অশ্রুবণ্যা আমার পা দুখানাকে ভাসাইয়া দিতে যেন চাহিতেছিল। সে শুধু বলিল—"জ্যোতীশ দা, এতদিনে বুঝিয়াছি স্বামী কি। আমার গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অনুতাপের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া আমি একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। এ তুষের আগুণ কি নিবিবে না—তিনি কি আমাকে আর তার পায়ে স্থান দিবেন না। দায়ে ঠকিয়া যে শিক্ষা আমার হইয়া গিয়াছে তাহার চেয়ে বড় শিক্ষা যে আর কিছুই নাই এ কথাটা আমি তাঁহাকে বুঝাইতে পারিবই। জ্যোতীশদা, কালই আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যান. পায়ে ধরিয়াই হউক যেমন করিয়াই হউক তাঁহার মত উন্নতমনা লোকের কাছ হইতে আমি ক্ষমা পাইবই।" আমার মুখ হইতে কেবল ছটী কথা বাহির হইল—"শান্তি বড় দেরী হইয়া গিয়াছে।" পকেট হইতে কখন যে সেই খবরের কাগজখণ্ড পড়িয়া গিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করি নাই। দেখি তাহার বুকের উপরের—"শোক-সংবাদ" লেখাটার উপরে শান্তি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। তারপরে হঠাৎ আমার কাছ হইতে সরিয়া দৌড়িয়া যাইয়া একটী ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া চাপাস্বরে কাঁদিতে সুরু করিল। বুঝিলাম সে সকলই জানিতে পারিয়াছে—এমনি সময়ে যে সান্ত্বনা তাহার দুঃখের আগুণে ফুৎকার দিয়া তাহা আরও বাড়াইয়া দিবে ইহা বুঝিয়া সেদিন আমি চলিয়া আসিলাম। পরের দিন ভোর বেলায় খবরের কাগজে দেখিলাম—দেখিয়া বিশ্বাস হইল না, বুকটা ধরাস্ করিয়া উঠিল—তবু চোখ মুছিয়া আবার দেখিলাম, বড় বড় অক্ষরে রহিয়াছে—

"কেরোসীনে আত্মহত্যা।"

বহুদিন পরে ভ্রমনের ছলে একবার মজঃফরপুরে গিয়াছিলাম। বন্ধুবরের মৃতদেহ যেখানে দাহন করা হইয়াছিল, সেই শ্মশান ভূমিতে যাইয়া অস্তগমনোন্মুখী সূর্য্যের শেষ কিরণ সম্পাতে প্রকৃতির নির্জ্জনতায় অতীতের চিন্তায় ডুবিয়া গেলাম। আসিবার কালে; দেখিয়া আসিলাম, বন্ধুবরের স্মৃতির মর্ম্মের লেখা রহিয়াছে—পথিক ও দর্শককে উদ্দেশ করিয়া—

"জীবনের মরুভূমে কোন ক্লেশ পেওনা
মরীচিকা ভ্রমে কভু মরুভূমে যেও না।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নব আবিষ্কার।

গাছগাছড়ার খাদ্য যে অঙ্গারজান বাষ্প, এ কথা কিছু নূতন নহে, কিন্তু এই আঙ্গারজান বাষ্প কিরূপে ও কি হারে গাছপালায় আত্মসাৎ করে, তাহা সেদিন আচার্য্য বসু মহাশয় বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে সাধারণ মানুষের নয়ন ও শ্রবণের গোচর করিয়াছেন। উদ্ভিদ্-জগতের এই জীবগুলি তাঁহার ফাঁদে পা দিয়া তাহাদের ভোজন ব্যাপারের অনেক তথ্য স্বকৃত চিহ্নের দ্বারা লিখিয়া ফেলিতেছে ও স্বয়ং ঘণ্টা বাজাইয়া সব কথা ফাঁস করিয়া দিতেছে।

জীব মাত্রেরই দেহের ভিতরে ও বাহিরে অনবরত সর্ব্বদা চলাচল ঘটিতেছে। এই সঞ্চালন-ক্রিয়া কোনোরূপ পাকক্রিয়া ব্যতীত কোনোরূপেই ঘটিতে পারে না—গতিবেগ জন্মাইতে গেলে কোনো-না-কোনো বস্তুকে পুড়িয়া শক্তি উৎপাদন করিতে হইবে। সজীব যন্ত্রে এই প্রকার অন্তর্দাহ-ব্যাপারকে শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া বলে। এই দহন ব্যাপারে শক্তির বিলয় ঘটে ও যন্ত্রের ক্ষয়কালে অঙ্গারজান অ্যাসিড উদ্ভূত হয়। জীবকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ক্ষতিপূরণের জন্য ইহার ঠিক উলটা প্রণালীই দরকার—শরীরের ধসিয়া-যাওয়া অংশগুলি গড়িয়া ওঠা চাই ও খাদ্যবস্তু আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে শক্তি সঞ্চয় করা চাই। সকল প্রাণীই খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টায় নিয়ত ব্যাপৃত হইয়া থাকে—মাংসাশী জীব শস্যাশী জীবকে ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে, শস্যাশী জীবেরা আবার সজীব উদ্ভিদ্ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

উদ্ভিদ্ও যখন প্রাণী, তখন তাহার ভিতরও ধ্বংস ও সৃষ্টি, অপচয় ও উপচয় যুগপৎ চলিতেছে। গাছপালার উপর যে সবুজ রং থাকে তাহার গুণ এই যে, তাহাতে করিয়া উদ্ভিদেরা সূর্য্যতেজ ও অম্লজানযুক্ত অঙ্গারজান বাষ্প সঞ্চিত করে। এই প্রক্রিয়াকে আলোকোপচয় (photosynthesis) ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। কোনো কয়লার আগুনের সাম্নে দাঁড়ানো আর কিছুই না—শুধু লক্ষ-লক্ষ বছর আগে যে-সূর্য্য কোনো উদ্ভিজ্জের উপর তাপ বিকীরণ করিয়াছিল, সেই সূর্য্যের তাপের সম্মুখেই দাঁড়ানো। সেই বহু লক্ষাব্দ পূর্ব্বকার সূর্য্যতেজ অঙ্গারীভূত উদ্ভিজ্জের মধ্যে সঞ্চিত ছিল, এখন আবার তাহাকে পোড়াইয়া বাহির করা হইতেছে, এই মাত্র।

গাছের প্রধান খাদ্য জলে ও বাতাসে যে অঙ্গারজান বাষ্প মেশানো আছে তাহাই। এই অঙ্গারজান বাষ্পকে খাদ্যরূপে স্বদেহে টানিয়া লওয়া পরিপাক-ক্রিয়ার সব চেয়ে সোজা প্রণালী এবং ইহার তথ্যানুসন্ধানের কাজ খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু মুস্কিল এই যে, বাষ্পাকার অঙ্গারজান ও তাহাকে দেহসাৎকরণ-ব্যাপার উভয়েই অলক্ষ্য বস্তু। তজ্জন্য, অদৃশ্য-জগতের ঘটনাকে দৃশ্য-জগতে আনিয়া হাজির না করিলে চলিবে না, আর নিজেদের কোনো ভ্রমাত্মক ধারণা উদ্ভিদ্জগতে অধ্যাস না করিয়া, গাছকে দৃশ্য চিহ্ন দ্বারা নিজের হজম করার ক্রিয়ার ও বাহিরের ধাক্কায় পরিবর্ত্তনের কথা স্বয়ং লিখাইয়া লইতে হইবে।

এইরূপ অঙ্গারজান-গ্রহণের পরিমাণ দুই ভিন্ন প্রকারে মাপা যাইতে পারে। (১) যে-জায়গায় কোনো উদ্ভিদকে রাখা হয়, সেখান হইতে যে-হারে অঙ্গারজান অন্তর্হিত হইতেছে তাহা মাপিয়া। এই প্রকারের মাপ করিবার বাধা এই যে, ইহাতে জটিল বহুদিনব্যাপী রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধন করিতে হয়, তাহাতে সহসা কোনো পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে না। (২) কিন্তু আর-এক উপায়ে অঙ্গারজান গ্রহণের হার অব্যবহিত পরেই নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। অঙ্গারজান ভক্ষণকারী উদ্ভিদ্ আলোকের ক্রিয়াযোগে অঙ্গারজানকে বিশ্লেষণ করে ও সাধারণ অবস্থায় অঙ্গারজান টানিয়া লইবার সময় সমান আয়তনের অম্লজান বাষ্প ছাড়িয়া দেয়। কাজেই যে-হারে অম্লজান বাহির হয়, সেই হারে গাছে অঙ্গারজান খায়। একটি জলজ উদ্ভিদের কাটা দিক্‌টা যদি সাধারণ পুকুরের জলে ভরা কাচপাত্রে ডুবাইয়া রাখা যায়, ও পাত্রটি আকাশের উজ্জ্বল আলোকে রাখা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে উদ্ভিদের কাটা-দিক্ দিয়া বুদ্‌বুদ্ বাহির হইয়া আসিতেছে। আলোক ক্ষীণ হইয়া গেলে, অম্লজান কম বাহির হয়। আলোকের জোর হইলে ও উদ্ভিদের খাদ্যগ্রহণ ক্রিয়া দ্রুত হইলে অম্লজানও বেশী তাড়াতাড়ি বাহির হয়। কিন্তু কেবল বুদ্‌বুদ্ গণিয়া অঙ্গারজান গ্রাসের হিসাব করিলে ভুল হইবে, কারণ বুদ্‌বুদের কোনোটা ছোটো, কোনোটা বড়ো। কাজেই যদি কি-হারে সমান আয়তনের অম্লজান বাহির হইতেছে তাহাই মাপিয়া বাহির করা যায়, তবেই সঠিক পরিমাপের প্রণালীতে বুদ্‌বুদ্ গণা সম্ভব হয়।

এই সমায়তনের অম্লজান বা অক্সিজেন উদ্ভবের হার নির্দ্ধারণ করার পথে দুরতিক্রম্য বাধা আছে বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু সেই বাধাও আচার্য্য বসু মহাশয় নিরাকরণ করিয়া এতদুদ্দেশ্যে দুইটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। যে কাচ-পাত্রে অঙ্গারজান-ভরা জলে উদ্ভিদের কাটা খণ্ড

ডোবানো ছিল তাহাতে তিনি একটি বুদ্বুদ-নিঃসারক নল লাগাইয়া নলের মুখে একবিন্দু পারদ দিয়া তাহার কবাট করিয়া দিয়াছেন। আলোকোপচয়-ক্রিয়ার সাহায্যে যখন এক নির্দ্দিষ্ট আয়তনের অম্লজান বাষ্প বোতলের ভিতর উদ্ভূত হয়, তখন তাহার চাপে পারদ কবাট খুলিয়া যায় ও অম্লজান বাষ্প আকাশে বাহির হইয়া আসে। বারে-বারে কবাট উন্মোচন হওয়াতেই বোঝা যায় যে সম-আয়তনের বাষ্পের চাপে পারদবিন্দু যখন সবচেয়ে উর্দ্ধে উঠিতেছে তখন তাহার উপরে লম্বমান একটি বৈদ্যুতিক ধারার পথের খণ্ডিত অংশগুলিকে তাঁহা যোগ করিয়া দিতেছে ও তখন সেই পথে এক বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে,—দুইটি প্লাটিনাম তারের মুখ ফলকে আঁটা আছে, পারদবিন্দুটি দুটি তারের মাঝখানে আসিয়া পড়ায় দুই তারের যোগ হইতেছে। চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চালিত একটি লিখন-যন্ত্র এই বুদ্বুদ-নির্গমনের হিসাব একটি ঘূর্ণায়মান ঢোলক-বিশেষের উপর লিখিয়া ফেলিতেছে,—পারদ-উত্থানের সঙ্গে-সঙ্গে যেই এক-ঝলক বিদ্যুৎ তার দিয়া বহিয়া যাইতেছে, অমনি কাঁটা নড়িয়া উঠিয়া ঢোলকের গায়ের ভুসা-মাখানো কাগজে দাগ কাটিতেছে। কাগজের প্রত্যেকটি বিন্দু-পরিচ্ছিন্ন অংশ উদ্ভিদের এক-এক গ্রাস অঙ্গারজান গলাধঃকরণের হিসাব-চিহ্ন। খালি চোখে এই হিসাব দৃশ্য করিয়া আচার্য্য-বসু ছাড়েন নাই, বিদ্যুতের ঝলক তার-পথে চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টাও বাজিয়া উঠিতেছে, ও সমান-আয়তনের অঙ্গারজান উদ্ভবের বার্ত্তা অন্য আর-এক ইন্দ্রিয়পথে মানুষকে জানাইয়া দিতেছে। উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ-প্রক্রিয়া এইরূপে তাহার নিজের লিপিতেই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। এই যন্ত্র এত সূক্ষ্ম যে যদি এক গ্রামের লক্ষাংশের এক-অংশভাগ বস্তু ও অঙ্গারজান ও উদজানে মিলিয়া গঠিত হয় তাহা হইলে তাহাও এই যন্ত্রে ধরা পড়ে।

এই যন্ত্রের লিখিত হিসাবে দেখা গেছে যে দিনের বিভিন্ন সময়ে উদ্ভিদের পরিপাক-শক্তি বিভিন্ন থাকে। দিনের বেলা ৭॥০টা হইতে আরম্ভ করিয়া ৮টা, ৮॥০টা, ৯টা, ৯॥০টা, ১০টা, ১১টা, ১২টা, ১টা, ২টা, ৩টা, ৪টা, ৪॥০টা ও ৫টার সম পাঁচ মিনিট-কালব্যাপী এইরূপ হিসাব লইয়া দেখা গেছে যে প্রাতে ৭॥০টার সময় এই উদ্ভিদের খাদ্য গ্রহণ শক্তি সবচেয়ে ক্ষীণ থাকে—৫ মিনিটে তখন চারটি বিন্দুপরিচ্ছিন্ন অংশ ঢোলকের কাগজে আঁকা পড়িয়াছিল। তাহা হইলে ৭॥০টার গাছটি ৫ মিনিটে চার গ্রাস অঙ্গারজান মাত্র গলাধঃকরণ করিয়াছিল। এইরূপ

পাঁচ-পাঁচ মিনিটে ৮টায় ৫ গ্রাস, ৮॥০টায় ১০ গ্রাস, ৯টায় ১৩ গ্রাস, ৯॥০টায় ১৫ গ্রাস, ১০টায় ১৫ গ্রাস, ১১টায় ১৬ গ্রাস, ১২টায় ১৭ গ্রাস, ১টায় ১৮ গ্রাস, ২টায় ১৫ গ্রাস, ৩টায় ১৫ গ্রাস, ৪টায় ১০ গ্রাস, ৪॥০টায় ৬ গ্রাস, ৫টায় ১ গ্রাস মাত্র অঙ্গারজান আত্মসাৎ করে। বেলা যতই বাড়িয়া উঠে, উদ্ভিদের খাদ্যগ্রহণ শক্তি ততই বাড়িয়া উঠে, বেলা ১টায় তাহা সবচেয়ে বেশী হয়,—৫ মিনিটে ১৮ গ্রাস। পরে বেলা পড়িয়া আসিলে কাগজে দাগ পড়া কমিয়া যায়। সূর্য্যের আলো বাড়া-কমার সঙ্গে তাহার শক্তির এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়। ১টায় সূর্য্যের আলো সবচেয়ে প্রখর হওয়াতে তখনই গাছের শক্তি সবচেয়ে বেশী থাকে।

সূর্য্যালোকের হ্রাস-বৃদ্ধিতে গাছের সাড়া দিবার শক্তি অদ্ভুত। চোখে যাহা ধরা পড়ে না, তাহাও যন্ত্রের লিপিতে ধরা পড়ে। কাজেই এই যন্ত্র খুব সূক্ষ্ম আলোকমান যন্ত্রের কাজ করিতে পারে। আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার একটি যন্ত্রের সাহায্যে অন্ধকার হইলে গাছকে দিয়া বিজুলীবাতি জ্বালাইয়া লইতে ও দিনের আলো হইলে গাছকে দিয়া বিজুলীবাতি নিবাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই কাজ করাইয়া লইতে গাছকে শুধু একটু সোডা ওয়াটার দিলেই হয়; সোডা ওয়াটারে অঙ্গারজান বাষ্প পোরা আছে, গাছ তাহা হইতে অঙ্গারজান টানিয়া লওয়া না-লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতি নিবায়-জ্বালায়।

বাহিরের উত্তেজনায় গাছের অঙ্গারজান গ্রহণের শক্তি কমে, এই আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কারও এই যন্ত্রের সাহায্যে করা গেছে। আলোকের সাহায্যে গাছ সুস্থভাবে খাদ্যগ্রহণের ইতিহাস লিখিতেছে, এমন অবস্থায় যদি তাহাকে চিমটি কাটা যায় বা বৈদ্যুতিক ধাক্কা তাহার গায়ে দেওয়া যায়, তাহা হইলে লিপির গতি সহসা মন্থর হইয়া পড়ে। আঘাত সামান্য হইলে গাছ শীঘ্রই সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসে, গুরু হইলে আসিতে দেরি লাগে।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে, বিষের বা মাদক-দ্রব্যের প্রক্রিয়ায় গাছের খাদ্যগ্রহণ শক্তির জড়তা আসে, ইহা সাধারণভাবে সত্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যেসব বস্তুর বেশী মাত্রায় বিষের ম'ত হানিকর, তাহা অতি স্বল্প সূক্ষ্ম মাত্রায় হজম-শক্তি বর্দ্ধিত করে। একসহস্রলক্ষ-ভাগের এক ভাগ বিষ প্রয়োগ করিয়া একটি জীবনীশক্তিহীন গাছের খাদ্যগ্রহণ শক্তি ২০০ গুণ বাড়িতে দেখা গেছে।

"বিচিত্রা"

স্বর্গে আলাপন।

স্ত্রী, পুরুষ।

স্ত্রী।—তুমি আমায় চেয়েছিলে, এই এসেছি তাই। চল তবে, সে অনাস্বাদিত আনন্দ পৃথিবীতে গিয়ে আমরা ভোগ করি। এবার আমাদের অনুমতি হ'য়েছে।

পুরুষ। আমি তোমায় চেয়েছিলাম! কই, কিছুই ত আমার মনে পড়ে না! তোমার মতন কা'কেও যে দেখেছি কখন তা'ও স্মরণে আসছে না। তুমি ভুল করেছ নিশ্চয়ই।

স্ত্রী। কিন্তু ভুল ত এ জগতে হয় না। আচ্ছা মানস-চক্ষে একবার দেখ ত। ঐ খরস্রোতা ত্রিস্রোতা ছুটে চলেছে—ভরা বর্ষা, থৈ থৈ ঢেউ। গোধূলির আকাশে কাল মেঘ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। নদীর পাড় দিয়ে পায়ে-চলা পথে যুবক এক দ্রুতপদে চলেছে—মুখে তার কি একটা চিন্তাকুলতা, দৃষ্টিতে কি একটা উদাস আবেগ। চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল, এক নিমেষের জন্য বোধ হয়—এক নিমেষের জন্য শুধু তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল, ঐ যে অর্দ্ধাবৃতা যুবতী ঘাটের উপরে আনমনে বসেছিল তারই উপরে। এক নিমেষেরই জন্যে উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল, তারপর যুবতীও মুখ ফিরিয়ে নিল, যুবকও আপন পথে চলে গেল। বল ত সে যুবক কে, সে যুবতীই বা কে?

পুরুষ। তুমি, আমি? তোমার কথার সুরে কি একটা স্বপ্নের মত জিনিষ যেন আমার প্রাণের কোন গভীর অতল থেকে ভেসে উঠ্‌তে চাচ্ছে। হাঁ, এবার মনে পড়ছে। সে একখানা ছবি, আমার খুবই মধুর লেগেছিল। সন্ধ্যার শান্ত-শীতল আলো ছায়া—মেঘের নীচে দিয়ে কৃষ্ণায়মান জলরাশির ওপারে সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে—এপারে নারী এক, স্থির-বিদ্যুৎসন্নিভা, এলায়িত-কুন্তলা, পাশে অনাদৃত শূন্যকুম্ভ, যোগিনীর মত অচঞ্চল, এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ঐ দূরান্তরে; অনন্তের রহস্যের পানে। সকল ভুলে, এমন একখানি পট এক মুহূর্ত্তে চেয়ে দেখতে কা'র না সাধ হয়?

স্ত্রী।—কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্তের জন্য তুমি আমায় প্রাণ ভরে চেয়েছিলে, আমিও সেই এক মুহূর্ত্তেই জনাই স্বীকার ক'রে নিয়েছিলাম। সেই এক মুহূর্ত্তেই আমাদের কর্ম্মের বীজ উপ্ত হ'য়েছে। এখন তার ফল সংগ্রহের দিন উপস্থিত, তাই তোমায় ডেকে নিতে আমার উপর আদেশ হ'য়েছে।

পুরুষ।—কিন্তু সত্য সত্যই ত আর তোমাকে আমি চাই নাই। একটী নূতন কবিতা, একখানা অভিনব আলেখ্য, এক কলি অশ্রুতপূর্ব্ব গান—দিব্য শিল্পীর একটি অপরূপ শিল্প সৃষ্টিতে আমি মুগ্ধ হ'য়েছিলাম, তা'র রসাস্বাদনে উৎসুক হ'য়েছিলাম—এই শুধু! তার বেশীতে আমার লোভও ছিল না, আকাঙ্ক্ষাও ছিল না।

স্ত্রী।—তার বেশী দরকারও হয় না। ঐটুকু রসাস্বাদন, ঐটুকু আনন্দ ভোগই সকল সৃষ্টির উৎস। অন্তরাত্মার ঐটুকু রসানুভূতিই ডেকে আনে প্রাণের ভোগ। তোমার রস-পিপাসু অন্তরাত্মা তোমার প্রাণকেও রসাপ্লুত তৃষ্ণান্বিত ক'রে তুলেছিল। প্রয়োজন ছিল শুধু আমার দিক হ'তে সম্মতি, তাও সে পেয়েছে। তোমার প্রাণের তরঙ্গ আমার প্রাণকে দুলিয়ে দিয়েছে, আমার অন্তরাত্মায় ব'য়ে এনেছে তোমারই অন্তরাত্মা হ'তে একটা মধুমতি ধারা। তোমার জীব-পুরুষের কামনা জেগে উঠে স্পন্দিত ক'রে তুলেছে যে কর্ম্মের সূক্ষ্মগতি, আমার নারীশক্তি তা'কে গ্রহণ করে, মূর্ত্তি দিতে চলেছে। যে আনন্দ-শক্তিকে আমরা দু'জন মিলে অজ্ঞানে হোক্, সজ্ঞানে হোক—উদ্বোধন করেছি তার পূর্ণ তৃপ্তি চাই, ইচ্ছা করলেও আর ত তাকে আমরা ফিরাতে পারি না।

পুরুষ।—কিন্তু যে বিধাতা আজ আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাঁর নির্দ্দেশে আমি চলেছি বিশেষ একটা ব্রত নিয়ে। এবার আমার ভোগের জীবন নয়, আমার কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমার ধর্ম্মের ধারা হবে ভিন্ন রকমের। সেখানে নারীর স্থান হবে কিনা সন্দেহ। তাই আমার মনে হয় ক্ষণিকের স্বপ্ন হিসাবেই যে জিনিষের ভোগ হয়ে গেছে, তাকে আর জাগ্রতে ধ'রে ফুটিয়ে তোলবার কোন সার্থকতা নাই।

স্ত্রী।—কর্ম্মের গতি অত সহজ ও ঋজু নয়। জীবনের পাটে সহস্র সূত্র ওতঃপ্রোত ভাবে নানাদিকে নানা ভঙ্গীতে সংমিশ্রিত। তোমার জীবন-বিধাতা তোমায় যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন তা'

সত্য হ'তে পারে; কিন্তু ঐটুকুই যে সব সত্য তা তুমি ধ'রে নিয়েছ কেন। আমারও জীবন-বিধাতা বল্‌ছেন, তোমারই সাথে মিলিয়ে এবার আমার লীলা।

পুরুষ।—কিন্তু সে লীলা তোমার সার্থক হবে কি? যে কামনার জন্য তুমি আমায় ডাকছ, তার সমস্ত দাবী-দাওয়া আমার ব্রত মিটাতে পারবে কি? তৃপ্তির, স্বস্তির জীবন না হ'য়ে, হয়ত আমাদের হ'য়ে উঠবে অতৃপ্তির ব্যথার জীবন। যে সুখের আশে আমরা চলবো, তা হয়ত দুঃখই নিয়ে আস্‌বে। আমাদের মিলনের বুকে ব্যর্থতাই জেগে উঠ্‌বে।

স্ত্রী।—মিলনের আনন্দ মিলনে—সুখে দুঃখে নয়। সুখ দুঃখ, তৃপ্তি অতৃপ্তি, স্বস্তি ব্যথা—এ সবই ছোট জিনিস, বাইরের ব্যাপার। এই সব দ্বৈতের ভিতর দিয়েই অন্তরের আনন্দ রসানুভূতি লীলায়িত হয়ে ওঠে। ভিতরের যে সার্থকতা—আমার সার্থকতা তোমারও সার্থকতা; তার কখন এ সব অন্তরায় হ'তে পারে না। এ সবই হয়ত হবে তার আবশ্যকীয় মালমশলা।

পুরুষ।—কে জানে সৃষ্টির রহস্য কি? কি ভঙ্গীতে, কোন্ পথে চলেছে কর্ম্মের গতি? চল তবে অজানা শক্তির হাতে আমরা ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র। সে যখন আমাদের ঠেলে দিচ্ছে, তখন তাকে বাধা দেওয়ার সামর্থ্যও আমাদের নেই, ইচ্ছাও থাকতে পারে না।

"বিজলী"　　　　শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

গ্রন্থ সমালোচনা।

মধুমালতী—কবিতার বই। পল্লীব্যথার কবি শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় রচিত। সহৃদয় সাবিত্রী বাবু যে প্রাণ, যে দরদের প্রেরণায় বাঙ্গালার বারো আনা নিরক্ষর মূক পল্লীবাসীর দুঃখ-বেদনা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সুরতান ছন্দে 'পল্লীব্যবস্থায়' মূর্ত্ত করিয়া বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, 'মধুমালতীতে' কবি তাঁহার সেই অনুরাগভরা

আন্তরিকতায় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের 'ভাষা দিয়ে ভালবাসার কথা' যিনি কবিকে 'সঙ্গীত শত ইঙ্গিত দিয়ে আপনি দিয়েছে ধরা', 'মূক হয়ে শত নীরব ভাষায়' যিনি 'মুখর' তাঁহার গান, তাঁহার 'প্রেম মহিমায়' 'মাধুরীরঙ্গে' 'মরমতন্ত্রে' তাঁহার কমকণ্ঠস্বরে ভরপুর হইয়া কবি গাহিয়াছেন—

"যাহা ছিল তার সব দিয়ে গেল, কেমনে পরাণ ধরি,
শূন্য আমার, করিল পূর্ণ নিজেরে রিক্ত করি।"

প্রকৃতই পূর্ণপ্রাণে, সুন্দর ছন্দে, নিবিড় মিলনানন্দে, দুঃখ-মধুতে আবিষ্ট হইয়া কবি যে চিত্র মধুমালতীতে প্রকট করিয়াছেন তাহা—

"এত সুন্দর, এত সুগন্ধ মদির আবেশে ভরা,
এত পবিত্র, এত উজ্জ্বল, এত উন্মনা-করা
এত যে গভীর, এত গম্ভীর, এমন মৌনমূক
শুচিতায় ভরা স্নিগ্ধ প্রতিমা মহিমায় ভরা বুক।"

ভাষায় তাহা সমালোচনার অতীত, তাহা অনুভব করিবার। আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা—'মধুমালতীর' মাধুর্য্য উপভোগ করিবার সুযোগ ত্যাগ করিবেন না।

"তোমারে আজিকে মনে প্রাণে ওগো জেনেছি বুঝেছি ভালো,
ঢালো মধু প্রাণে ওগো মধুময়ী ঢালো তুমি আরো ঢালো!"

মধুঃ মধুঃ মধুঃ

গ্রন্থের সৌষ্ঠব গঠন মুদ্রণ প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা সুন্দর। মূল্য ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৮ম বর্ষ। } কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল। ১২শ সংখ্যা।

চির-প্রবাসী।

—:*:—

ওগো মশায়, ও বাঙ্গালী-বাবু,
একটু বসুন, ইচ্ছা করুন তামাক,
দেখ্‌তে ত আর পাইনে ভাল করে
একটুখানি গাড়ী না-হয় থামাক।

আপনার ওই কথার টানটা ব বু
একেবারে আমার দেশের মতন,
এই সুদূরে কাঠ-খোট্টার দেশে
একেবারে সুরের সাড়া নূতন।

ওঃ, কোথা বল্লেন, কোন্ গাঁয়েতে বাড়ী ?
সে ত মোদের কুজয় নদীর ওপার,
ছোট বেলায় দেখ্‌তে যেতাম গাজন
সে সব হল অনেক দিনের ব্যাপার।

তার পর বাবু এই যে মরিচ সহর
এটা যেন এই পৃথিবীর পাল্দার
কারো মুখে পাইনা দেশের খপর
বাইরে ঘরে একঘেয়ে সেই আঁধার !

জরুরী সব কাজ আপনার আছে
যাবেনই ত, প্রণাম তবে আসুন ;
একটা কথা ভুল হয়েছে বাবু—
আর একটীবার মিনিট দু'এক বসুন।

বলুন বাবু একটা কথা শুনি
বুড়া মানুষ মনটা বড় অবুঝ,
বাজার ঘাটে তেমনি কি বান ডাকে
বকুল গাছ কি তেমনি আছে সবুজ ?

আর আমাদের কুলুর নদীর ধারে
গাঙ্গুলীদের বাঁধা ঘাটের কাছে,
ক্ষেত্র তলার রসি দু'এক পূবে
দখিন-দ্বারী ঘরখানি কি আছে ?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সজীব-জগৎ এবং অজীব-জগৎ।*

যে দিন আমি তোমাদের এই নিমন্ত্রণ পাইলাম, সে দিন আমার মনে হইল যে জীবনের মহা-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে প্রবেশোন্মুখ তরুণ-বয়স্ক বিদ্যার্থিগণের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে মনের কথা বলার সৌভাগ্য আমার উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা আমার প্রতি যে ভার ন্যস্ত করিয়াছ, তাহাতে আমি আমার জীবনে যে সর্বোচ্চ জ্ঞান উপার্জন করিয়াছি, তদপেক্ষা নিম্নস্তরের কোন বস্তু তোমাদিগের নিকটে অর্পণ করিতে পারি না। তোমাদের দুর্বলতা অথবা অক্ষমতা সম্বন্ধে কোন কথাই আমি তোমাদিগকে বলিব না,—তোমাদের শক্তি-সামর্থ্যের কথাই বলিব; সহজ-সাধ্য কোন কার্যেরই আদর্শ আমি তোমাদের সম্মুখে আনিব না, পরন্তু যাহাতে তোমাদের রুচি সর্বাপেক্ষা কঠোর সাধনার প্রতি প্রবর্তিত করিতে পারি, তাহার জন্যই আমি আমার সমস্ত শক্তির বিনিয়োগ করিব। সভ্যতার প্রবাহ জগতে যাহাতে অব্যাহত এবং অবিনশ্বর গতি লাভ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে যৌবনের যাবতীয় ভাব-প্রবণতা এবং সমগ্র শক্তির উদ্বোধন করাই মানবেতিহাসের বর্তমান কালে প্রধান কার্য। তোমরা সত্যের অনুসন্ধান-ব্রতে ব্রতী; সত্যাবিষ্কারের উদ্দেশ্যে, তোমাদিগকে যে সাধনামার্গে অগ্রসর হইতেই হইবে, সেই সাধনার কথাই আমি তোমাদিগকে বলিব। অতীতকালের অভিজ্ঞতা হইতে, এই বিষয়ে, তোমাদের অনেক সাহায্য-লাভ হইবে,—কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা যে পুরাতনের দাসত্ব করিবে, তাহা নহে;—তোমরা বস্তুতঃ প্রাচীন-যুগের জ্ঞান-রাশির প্রকৃত অধিকারী হইবে।

মানুষ নিজেই তাহার নিয়তির প্রবর্তক।

যাহা প্রাপ্ত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, অথবা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যাহার আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে, সেরূপ কোন বস্তুর সম্বন্ধে কোন কথা আমি তোমাদিগকে বলিব না;

* লাহোর-নগরে পঞ্চনদ-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ-সভায় আচার্য সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয় কর্তৃক ইংরাজী-ভাষায় প্রদত্ত অভিভাষণের মর্মানুবাদ। ("বেঙ্গলী" সংবাদপত্রের ১৯২৪ খৃষ্টাব্দীয় ২১শে ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় ইংরাজী-ভাষায় অভিভাষণ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার দুই দিন পূর্বে, ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে, এই অভিভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল।)

কিন্তু, যাহা মানুষে করিতে পারে, এবং যাহা জগতেই করা হইয়াছে, তোমাদিগকে আমি এরূপ বস্তুরই কথা বলিব। তোমরা ভাবিয়াছ যে সত্যাবিষ্কার কিরূপে করা যায়, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিব ; তোমরা ইহাও জানিতে চাহিবে যে অজৈব-পদার্থ-সমূহের উপর শক্তির ক্রিয়ার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে কেন আমি জীব-জগতে "প্রত্যভিজ্ঞার" (১) প্রভাব পর্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

সত্যানুসন্ধানের সাধনা সম্বন্ধে প্রায়শঃই এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় যে এই কার্যের অনুকূল এবং উপযোগী দেশকাল আমাদের নাই, এবং প্রতিকূল অবস্থাসমূহের প্রভাব বশতঃ ই এ সম্বন্ধে আমাদের যাবতীয় প্রযত্নই ব্যর্থ এবং বিফল হইয়া যায়। অবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা মানুষের কাজ নহে ; পরন্তু অবস্থাগুলি যেরূপই থাকুক না কেন, সাহসের সহিত তাহা-দিগকে সেরূপ ভাবেই গ্রহণ করত তাহাদের সম্মুখীন হওয়া এবং তাহাদের উপর প্রভুত্ব-সংস্থাপন করাই প্রকৃত মানুষের কাজ। অদ্য হইতে বিংশ-শতাব্দী (পঞ্চাশৎ-শতাব্দী ?) পূর্বে, হস্তিনার রাজসভার সম্মুখে, বীর্য-প্রদর্শনের রঙ্গভূমিতে, যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার কথা তোমরা ভুলিয়া যাও নাই। সূতপুত্র বলিয়া পরিচিত কর্ণ সেই রঙ্গভূমিতে রাজপুত্র অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। অর্জুন সেই আহ্বানের উত্তরে সদম্ভে বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি অভিজাত-বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহার সহিত কোন রাজপুত্র দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।" কর্ণ ইহার উত্তর দিয়াছিলেন,—"আমার কুলের আমিই সৃষ্টিকর্তা, এবং কর্মের প্রভাবেই আমি কৌলীন্য-লাভ করিব" (২)। নিজের নিয়তি-নির্বাচন এবং নির্ধারণ সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে স্বকীয় স্বত্ব-সংস্থাপনের এই দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ সর্ব-প্রাচীন। যদি তোমরা অপরের অধীন অথবা মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চাও, তাহা হইলে তোমাদিগকে কেবল পরোপজীবী ভাবেই জীবনধারণ করিতে হইবে। শুধু সংগ্রামের ফলেই শক্তির উদ্ভব

(১) প্রত্যভিজ্ঞা = Response = সংজ্ঞা,—সাড়া।

(২) "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।" কর্ণের এই বাণীর উল্লেখ মহাভারতে নাই। মহাভারতে অর্জুন ও নিজে আপত্তি করেন নাই। তিনি কর্ণের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে প্রস্তুত হইলে কৃপাচার্য উক্তরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন ও দুর্যোধন তৎক্ষণাৎ অঙ্গরাজ্যে কর্ণকে অভিষিক্ত করিয়া আপত্তির নিরসন করিয়াছিলেন।

হইয়া থাকে ; তোমরাও নিজ নিজ প্রযত্নের দ্বারাই জীবনের উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারিবে। জ্ঞানের রাজ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতের মধ্যে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ও কেহ কেহ জীবনে নানাবিধ প্রতিকূল এবং কঠোর অবস্থায় পড়িয়াও ভীত অথবা হতাশ হন নাই ; প্রত্যুত, পুনঃ পুনঃ ভগ্ন-মনোরথ হইলেও সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের বলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

সিদ্ধি ও অসিদ্ধি।

বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত ব্যক্তির জীবন-যাত্রা সুগম নহে। তাঁহার জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে নহে, পরন্তু অশেষ সংগ্রামেই, অতিবাহিত করিতে হইবে। জয় এবং পরাজয়, লাভ এবং ক্ষতিকে সমভাবে গ্রহণ করত তাঁহাকে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে ; শূরের হৃদয় অনায়াসলব্ধ বিজয়ের জন্য কদাপি লালায়িত হয় না, পরন্তু দুর্লভ অথবা অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাকে যে কঠোর ক্লেশ এবং পরাজয় স্বীকার করিতে হয়, সেই আকর্ষণই তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। শক্তির সযত্ন প্রয়োগ ব্যর্থ হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, হতাশার নির্বাণ-ভূয়িষ্ঠ ভস্মস্তূপের অভ্যন্তর হইতে আবার যাহার রশ্মি জাগরিত হইয়া উঠে, সেই শক্তির রহস্য কোথায় ? নিগূঢ় ভাবে ইহার আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কারণ এবং কার্য-তত্ত্বের পরম্পরা যেরূপ নিশ্চিত ভাবে পরস্পর দৃঢ়-সম্বদ্ধ, ব্যর্থতা ও সফলতা ও তদ্রূপ ভাবে পরস্পর নিত্য-সম্বদ্ধ। কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, যে শক্তির অনির্বচনীয় পরিণামকে আমরা "সিদ্ধি" অথবা "সফলতা" শব্দের সাহায্যে অভিব্যক্ত করি, অসিদ্ধি অথবা ব্যর্থতাও সেই শক্তির প্রচ্ছন্ন এবং প্রসুপ্ত পূর্বাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অনুকূল অবস্থা।

জ্ঞানের সীমা পরিধি বিস্তারিত করিবার জন্য কতিপয় উপযোগী উপাদানের বিশেষ আবশ্যক। উহাদের মধ্যে কল্পনা-প্রবণ চিত্তবৃত্তিই প্রথম ; যে হেতু প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক-গবেষণার জন্য সাধকের স্বকীয় চিত্তক্ষেত্রই প্রকৃত পরীক্ষা-মন্দির ; সেখানেই সর্বপ্রকার পর্যবেক্ষণের প্রত্যেক খুঁটি নাটিটি পর্যন্ত সর্বপ্রথমে মানসনেত্রে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। সুস্পষ্ট আদর্শ না লইয়া লক্ষ্যহীন ভাবে গবেষণার চেষ্টা করা বৃথা। লোকে আগে ভাবিত যে

ভারতের মানব মন অত্যুদ্দাম ভাবের মোহে কেবল যেরূপ কল্পনা-কুশল, তাহাতে, বৈজ্ঞানিক বাস্তব সত্যাবিষ্কারের উপযোগী কোনরূপ মহৎ কর্মের উদ্ভব হওয়া এখানে সম্ভবপর হইবে না। পরন্তু, এই ভারতেই আবার শুধু ধ্যানের অভ্যাস-দ্বারা, সেই কল্পনা-শক্তিকে নিয়ত করিয়া, তাহাকেই আপাততঃ পরস্পর-বিরোধী তথ্যনিচয়ের মধ্য হইতে শৃঙ্খলা-সম্পাদনে সমর্থা করা যাইতে পারে। যদি কেহ বৃক্ষ-জীবনের আভ্যন্তরীণ রহস্য ভেদ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বৃক্ষের সহিত একীভূত হইতে হইবে এবং তদবস্থায় তাঁহাকে বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রবাহিত প্রাণ-শক্তির স্পন্দনগুলিকে নিজে অনুভব করিতে হইবে। গবেষণার ক্ষেত্রে ইহা কেবল প্রথম পদ-বিক্ষেপ মাত্র; তাহার পরে, বৈজ্ঞানিকের নির্দিষ্ট মার্গে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ আবিষ্কৃত এবং প্রত্যক্ষীভূত তথ্যসমূহের সহিত তাঁহার ধ্যান-লব্ধ বিষয়গুলিকে মিলাইয়া লইতে হইবে। কল্পনাশক্তিকে যদি এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা না যায়, তাহা হইলে সে সাধককে তাঁহার অভীষ্ট মার্গে বিবেক-বুদ্ধির অন্তরায়-স্বরূপ অত্যুৎকট নানাবিধ খেয়াল দেখাইতে থাকিবে। একটু টিপিয়া দিলেই আকাশ-পথে উড়িয়া যাইতে পারে এরূপ কৃত্রিম বা কলের ঘোড়া কল্পনায় সৃষ্টি করার মত মনোমদ খেয়াল আর কি হইতে পারে? প্রকৃত বস্তু অথবা বিষয়ের সাহায্যাভাবে, কল্পন-কুশল মানব-মন নিজের স্বাভাবিক স্থৈর্য হারাইতে হারাইতে অবশেষে এরূপ এক অবস্থায় আসিয়া পড়ে, যেখানে বাস্তব তত্ত্ব এবং খেয়ালগুলি পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া এমন একাকার হইয়া যায় যে তাহাদের একটিকে অন্য হইতে আর পৃথক্ করা যায় না। আমাদের দেশের অতীত যুগের মহর্ষিগণ আপনাদিগকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু সকলেই স্ব স্ব চিন্তার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা (৩) বলিয়াছেন, যদি সত্যের অনুকূল না হয়, তাহা হইলে, বেদ-বাণীকেও প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। তাঁহাদের নিকটে জগতের কোন পদার্থই "অনৈসর্গিক" ছিল না; তখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত অথবা অজ্ঞাত, অথচ দৃঢ় অধ্যবসায়ের প্রভাবে যাহাদের কারণতত্ত্ব ভবিষ্যতে কোন দিন আবিষ্কৃত হইবে, তদ্রূপ বস্তুকে তাঁহারা "রহস্যপূর্ণ" এই আখ্যা দিয়াছিলেন। অদ্য হইতে পঞ্চবিংশ শতাব্দী পূর্বে, তোমাদের তক্ষশিলার প্রাচীন-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, এইরূপ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতির

(৩) তাঁহাদের কেহ কেহ?—

সাহায্যেই বিদ্যানুশীলন করা হইত এবং সেই স্থলেই জীবক (৪) তদীয় আচার্যদেবের নিকট হইতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত তরু-গুল্মলতাদি প্রত্যেক উদ্ভিদ্ পদার্থের ভেষজ-গুণসমূহের অনুসন্ধান করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতীত কালে, ভারতের গৌরবময় যুগে, এদেশে আলস্যপূর্ণ তামসিক রহস্যবাদের প্রশংসা ছিল না,—পরন্তু তথায় কর্মের জয়গীতিই বিঘোষিত হইত; অধিক কি, সে কালের কোলাহলময় সংগ্রামভূমিতেও অতি প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকের আবির্ভাব হইত (৫)।

চিত্তের একাগ্রতার শক্তি।

উদ্দিষ্ট লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য চিত্তের একান্ত একাগ্রতার সহিত সাধনাই সত্যাবিষ্কারের দ্বিতীয় উপাদান। যাঁহাদের মন ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, যাঁহারা লোকে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির জন্য লালায়িত, সিদ্ধি তাঁহাদের লভ্য নহে। গুরু শিষ্যকে আদেশ দিতেছেন—"বৃক্ষের উপরিস্থ ঐ পক্ষীটিকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ কর;—কেমন, তুমি কি এখন ঐ বৃক্ষ এবং পক্ষীটিকে দেখিতেছ?" শিষ্য উত্তর দিতেছেন,—"না, গুরুদেব, আমি ঐ পক্ষীর যে চক্ষুটির উপর লক্ষ্যস্থির করিয়াছি, তাহার ঐ চক্ষুটি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতেছি না (৬)।" যিনি লক্ষ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে, কদাপি এক মুহূর্তের জন্যও সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, অবিরাম গতিতে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারেন, কোন পার্থিব ভোগ সুখের লালসায় সেই পথ হইতে কখনও বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হন না, সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর একনিষ্ঠ সাধনা যেন তোমাদের আদর্শ হয়।

তাহার পর, সত্যানুসন্ধানের সাধনা সফল করিবার নিমিত্ত, আরও দুইটি বিষয়ের আবশ্যক; তাহাদের মধ্যে একটি সর্বাবয়ব-সম্পূর্ণ এক পরীক্ষাগার এবং অপরটি অতিশয় সূক্ষ্ম এবং অভ্রান্ত নব নব যন্ত্রের উদ্ভাবন এবং নির্মাণ। ত্রিশবৎসরের পূর্বে, আমার অনুসন্ধানের কার্য যখন

(৪) জীবক ভগবান্ গৌতমবুদ্ধের চিকিৎসক ছিলেন।

(৫) যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রকাশ হইয়াছিল।

(৬) যুধিষ্ঠিরাদির অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষাকালে আচার্য দ্রোণের প্রশ্নে অর্জুনের উত্তর।

মহাভারত, আদিপর্ব, ১৩৩ অধ্যায়।

আরম্ভ হয়, তখন দেশে উল্লেখ-যোগ্য কোন পরীক্ষাগারের অস্তিত্ব ছিল না; আর নূতন যন্ত্রনির্ম্মাণ সম্বন্ধে লোকে বলিত যে এদেশের কারিগরদিগের নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য একেবারেই নাই। আমার শক্তি কতদূর তাহার পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, আমি ঐ সকল অসুবিধা মাথা পাতিয়া লইয়াই, যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলাম এবং শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়া ছিলাম যে মানব-মন নিজ অধ্যবসায় এবং শক্তির সাহায্যে অবশেষে অতিক্রম করিতে না পারে, এরূপ কোন বাধা অথবা অসুবিধা জগতে নাই। অধ্যবসায়ের ফলে রুদ্ধদ্বার সমূহ ক্রমশঃই উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল এবং আপাত প্রতীয়মান অসম্ভব ও সম্পূর্ণরূপে সুগম হইয়া উঠিল;—এমন কি, সাধারণ মিস্ত্রীরাই অভ্যাসের প্রভাবে সুচতুর শিল্পী হইয়া উঠিল। তাহারাই এরূপ অত্যাশ্চর্য্যময় সুকুমার এবং সূক্ষ্ম-যন্ত্র-সমূহ প্রস্তুত করিতে লাগিল যে জগতের অন্য কোন দেশে তাহাদের নকল প্রস্তুত করাইতে পারা গেল না। সেই জন্যই, আমার প্রতিষ্ঠানে (Bose Instituteএ) যে সকল নূতন নূতন তথ্যানুসন্ধানের কার্য প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাদের জন্য আবশ্যক যন্ত্রসমূহ এই ভারতেই প্রস্তুত করিতে হইতেছে।

ত্রিশ বৎসরের পূর্বে, আমার পরীক্ষাগারে, বৈদ্যুতিক প্রবাহ-সমূহ-সম্বন্ধে কতিপয় কঠোর সমস্যার সমাধান হইয়াছিল, এবং সেই সকল সমাধানের ফল পৃথিবীর যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান-কেন্দ্রেই অতিশয় অনুরাগ, আগ্রহ এবং সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়াছিল। ঐ সকল অনুসন্ধানের সফলতা অনেক পরিমাণে আমার দ্বারা "Galena Receiver" নামক যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলেই সংঘটিত হইয়াছিল। উক্ত যন্ত্র অতি দূরদেশ হইতে প্রেরিত তারহীন তড়িৎবার্তাসমূহ গ্রহণ করিবার পক্ষে যে অত্যন্ত উপযোগী তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। নিভৃত পরীক্ষাগারের মধ্যে অতিশয় ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার সহিত অনুষ্ঠিত অনুসন্ধানের দ্বারা ব্যবহারিক জগতে যে কত সুদূরব্যাপি ফল লাভ করা যায়, তাহা তোমরাও প্রত্যক্ষ করিবে।

এই জগৎ প্রলয়ের-বিশৃঙ্খলা-পূর্ণ নহে পরন্তু সৃষ্টির সুশৃঙ্খল বিকাশ।

আমাদের পরিদৃশ্যমান্ এই জগতে নৈসর্গিক ঘটনাগুলিকে আপাততঃ বড়ই বিশৃঙ্খল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জগতের সজীব এবং অজীব-পদার্থের মধ্যে এবং সজীব-পদার্থের মধ্যেও

আবার জন্তু এবং উদ্ভিদের মধ্যে আপাত প্রতীয়মান যে ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অপেক্ষা কঠোরতর সমস্যা বিজ্ঞানের পক্ষে আর নাই। প্রশ্ন এই যে, আপাত দৃষ্ট বিভিন্ন বিভিন্ন এই সকল পদার্থের ভিতর যোগের কোন ধারার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে কি না? একদা এই পৃথিবী ত অত্যুষ্ণ দ্রব-পদার্থময় একটি পিণ্ড-বিশেষ ছিল এবং আমরা "প্রাণ" বলিতে যাহা বুঝি, সেরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্ব তথায় ছিল না। সেই অ-প্রাণময় পিণ্ড হইতে কিরূপে প্রাণের উদ্ভব হইল? কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে অন্য কোন জগৎ হইতে যদৃচ্ছাগত সৃষ্টপদার্থের রেণুকণার ভিতর দিয়া প্রাণের বীজ প্রথমে আমাদের এই পৃথিবীতে পড়িয়াছিল; কিন্তু এই অনুমানের দ্বারা উক্ত গভীর-সমস্যাকে কেবল আরও পিছাইয়া লইয়া যাওয়া ভিন্ন উহার প্রকৃত সমাধানের কোন সাহায্য হয় না।

প্রকৃতির এই সৃষ্টির অভ্যন্তরে প্রকৃতই কি এরূপ কোন নিয়মিত শৃঙ্খলা বিদ্যমান্ আছে, মানব মন যাহা হইতে কোন দিন কারণ-কার্য-তত্ত্বের এক এবং অব্যভিচারী কোন নিয়মের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে? এই ব্যবহারিক জগতের সহস্র সহস্র বিবিধ বিস্ময়কর বৈচিত্রের অন্তর্নিহিত একত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য, ভারতের মানব-মনই তাহার অভ্যাস-বশতঃ বিশেষ উপযোগী। তারহীন তড়িদ্বার্তা গ্রহণের একটি যন্ত্র লইয়া, পরীক্ষা করিবার সময়ে আমি এই একত্ব-প্রবাহের প্রথম দর্শন লাভ করি। কার্য করিতে করিতে ঐ যন্ত্রের "প্রত্যভিজ্ঞা"-ক্রিয়া ক্রমশঃ দুর্বল হইতে লাগিল এবং অবশেষে উহা একেবারেই লুপ্ত হইয়া গেল; আর, উক্ত ক্রিয়ার সাক্ষ্যস্বরূপ যন্ত্রে যে সকল তরঙ্গের চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছিল, তদনুরূপ যন্ত্রে অঙ্কিত আমাদের মাংসপেশীগুলির ক্লান্তিসূচক তরঙ্গচিহ্ন-সমূহের সহিত তাহাদের আশ্চর্যরূপ সাম্য দেখিতে পাওয়া গেল। আরও দেখিতে পাওয়া গেল যে এই যন্ত্রগুলিকে কিছু বিশ্রাম দিবার পরে তাহাদের "প্রত্যভিজ্ঞা"-ক্রিয়া আবার বলবতী হইয়া উঠিল এবং ক্রমাগত উত্তেজনার ফলে পুনরায় ঐ ক্রিয়ার অবনতি ঘটিতে লাগিল। দিন কয়েকের জন্য বিশ্রাম পাইলে উহারা আরও অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠিবে এই ভাবিয়া উহাদিগকে কিছু অধিক বিশ্রাম দিয়াছিলাম,—কিন্তু তাহার ফলে, সক্রিয় হওয়ার পরিবর্তে আলস্য-জনিত জড়তায় উহারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলাম; তাহার পরে, কৃত্রিম জড়ীয়-শক্তি অথবা তড়িচ্ছক্তির প্রয়োগের দ্বারা উহাদিগকে উত্তেজিত করিবার পরে তবে উহাদের ঐ জড়তা

দ্রবীভূত করিতে পারা গিয়াছিল। ঐ যন্ত্রের উপর কতকগুলি বিশেষ রাসায়নিক উত্তেজক পদার্থের প্রয়োগ করার ফলে উহার "প্রত্যভিজ্ঞা"-শক্তি অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছিল, অপরপক্ষে বিষ-পদার্থ প্রয়োগের ফলে উহার ঐ শক্তির সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সজীব এবং অজীব জগতের মধ্যভাগে বৈষম্যের সীমান্ত রেখা ক্রমশঃ লুপ্ত এবং উহাদের মধ্যে সাম্যের প্রমাণ-সমূহ সুস্পষ্টভাবে বিকাশিত হইতেছে দেখিতে পাইয়া আমি প্রকৃতই বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিলাম। অজীব-বস্তুর উপর নানাবিধ অসংখ্যরূপ শক্তির লীলা প্রযুক্ত হইলে উহারা যখন নাচিয়া উঠে, তখন উহারা আর যাহাই হউক,—ক্রিয়াশূন্য যে নহে, তাহা ত নিশ্চয়। ইহা হইতে, সুতরাং, সপ্রমাণ হইতেছে যে জড়বস্তুর অভ্যন্তরে "প্রাণের" সম্ভাবনা এবং শক্তি নিহিত আছে।

উদ্ভিদের প্রাণ।

প্রকৃতির রাজ্যের এক প্রান্তে অজীব অথবা জড়পদার্থপুঞ্জ এবং অপর প্রান্তে অবস্থিত যাবতীয় জন্তু-জীবনের মধ্যে বিশাল উদ্ভিজ্জ-জীবনের লীলাক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে। আপাত প্রতীয়মান নিষ্ক্রিয় এবং প্রত্যভিজ্ঞাহীন উদ্ভিজ্জের জীবন-যন্ত্র-কৌশলের সহিত সূক্ষ্ম-সংজ্ঞা-সূচক গতি এবং স্পন্দনশীল-ইন্দ্রিয়-সংঘ-সমন্বিত সদা-চঞ্চল জন্তুগণের জীবন-যন্ত্রের যে কোনরূপ যথার্থ সাম্য থাকিতে পারে, তাহা পণ্ডিতগণ অস্বীকার করিয়া থাকেন।

অপরপক্ষে আবার, এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কোন প্রমাণ না পাইলেও, কেবলমাত্র ভাবের আবেগ বশতঃ উদ্ভিদগণের উপর, এমন কি, সর্ববিধ মানবীয় গুণের আরোপ করিয়া থাকেন (৭)। পরন্তু, কল্পনার এরূপ খেয়ালের দ্বারা প্রকৃত-জ্ঞানের কোনরূপ উন্নতি হইতে পারে না। জন্তু এবং উদ্ভিদের জীবনের মধ্যে প্রকৃতই যদি কোন সাম্য থাকে, তাহা হইলে, যাবতীয় প্রাণবান্ বস্তুর শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া সমূহের পরীক্ষা হইতে লব্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সেই সাম্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের যাবতীয় ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা, কিন্তু, জ্ঞানরাজ্যের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে মহান্ অন্তরায়। জগতে যত প্রকার শব্দ নিরন্তর উত্থিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক শব্দই আমরা শুনিতে পাই, এবং

(৭) "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ ॥৪৯॥" মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

শব্দের অনেক গ্রামই আমাদের নিকট অশ্রুত থাকে। আবার অগণ্য জ্যোতিস্তরের মধ্যে অত্যল্পমাত্রই আমরা দেখিতে পাই; যেহেতু, মানুষের চক্ষুকে উত্তেজিত করিবার শক্তি আলোকের একটিমাত্র স্তরেরই আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, জ্যোতির মহাসমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও আমরা প্রায় অন্ধই রহিয়াছি। আমাদের চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির অতীত অথচ চতুর্দিকে সতত বিদ্যমান্ বস্তু সমূহের বিশালতার তুলনায়, আমরা সামান্য যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা কিছুই নহে। মানুষ, কিন্তু, তাহার অতীব অসম্পূর্ণ ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান-গুলির সাহায্যেই চিন্তার সামান্য এক ভেলক নির্মাণ করত অজ্ঞাত অপার মহাসমুদ্রের দুঃসাধ্য রহস্যজাল ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে। এই সাধনামার্গে যে প্রকৃত বিঘ্ন আমাদিগকে পদে পদে ব্যাহত করিতেছে, তাহার কারণ এই যে, বৃক্ষের অভ্যন্তরে, আমাদের চর্মচক্ষুর অনধিগম্য গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন রহস্যময় অন্তরালের মধ্যে, তাহার জীবন-শক্তির লীলা-চাতুর্যগুলি অহরহঃ প্রকটিত হইতেছে।

উদ্ভিদের স্বাংকৃত লিপি।

উদ্ভিদ্ ত বাক্‌শক্তি বিরহিত; যাহার বলে সে তাহার প্রত্যভিজ্ঞা-সূচক কোন সঙ্কেত আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতে বাধ্য হয়, এরূপ প্রবল কোন শক্তির আবিষ্কার এবং তাহার পর, যাহাতে সেই সঙ্কেতগুলি স্বতঃই পরিবর্তিত এবং সুবোধ্য লিপির আকারে লিপিবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে তদুপযোগী যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে হইবে; এবং অবশেষে যাহাতে আমরা ঐ সঙ্কেত-লিপিগুলির মর্ম বুঝিতে পারি, তদ্রূপ শিক্ষায় আমাদিগকে শিক্ষিত হইতে হইবে। যে সকল যন্ত্র বাক্‌শক্তি-বিরহিত এবং প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত জীবনের রহস্যগুলিকে আমাদিগের নিকট সুপ্রকাশিত করিয়া দিতে সমর্থ, তাহারা নিশ্চয়ই যে কত অত্যাশ্চর্যরূপ সূক্ষ্ম এবং সুকুমার হইবে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্রতম জীব অথবা "জৈব-পরমাণু"কে ধরিতে এবং উহার নাড়ীর স্পন্দন-ক্রিয়াকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। অণুবীক্ষণের দৃষ্টিশক্তিও যখন অচল হইবে, তখন আমাদিগকে অদৃশ্যেরই অনুসরণ করিতে হইবে। তদুদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক শলাকার সহায়তায় বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নাবস্থিত প্রত্যেক স্তরের ভিতর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। জন্তু এবং উদ্ভিদ্ আহত হইলে উহাদের যে এক প্রকার

সঙ্কোচ-সূচক আক্ষেপ-ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং উভয়ের অন্তঃস্থিত গত্যুৎপাদক যন্ত্র-কৌশলের ক্রিয়াও যে মুখ্যতঃ তুল্যরূপ, তাহা উক্ত পরীক্ষা-শলাকা (Probe) এবং অন্যান্য নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে দেখাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। উদ্ভিদ্ দেহের ভিতরও সুবিস্তৃত স্নায়ুনগুলের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৃক্ষদেহের নিস্পন্দ বহিরাবরণের ভিতরে চঞ্চল সজীবতন্তু সমুদয় রহিয়াছে এবং উহাদের স্পন্দন হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সূচিত করিতেছে। মৃত্যুকালে জীবদেহে যেরূপ আক্ষেপ-বিশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, উদ্ভিদের অন্তিম সময়ে তাহার দেহেও তুল্যরূপ প্রবল আক্ষেপের আবির্ভাব হয়। এইরূপে, উভয় প্রকার জীবনের লাক্ষণিক বিকাশের মধ্যে আপাত প্রতীয়মান ভিন্নত্ব-বোধক যে ব্যবধান ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে এবং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে অতি নিম্নস্তরের সামান্য উদ্ভিজ্জাণু হইতে সর্বোচ্চ-স্তরের প্রাণী পর্য্যন্ত নিখিল জীব-জগৎ একতার অখণ্ড প্রভাবে আবদ্ধ এবং একীভূত হইয়া সর্বত্রই এক সুবিশাল পরম ঐক্যের অস্তিত্ব প্রকটিত করিতেছে।

বৃক্ষের উদাহরণ।

সমুদায় জীব যখন এক, তখন ইহার যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন বিকাশও স্বরূপতঃ একইভাবে চলিতে থাকিবে। অপেক্ষাকৃত সরল ও সামান্য উদ্ভিজ্জ-জীবনের কার্যগুলির গবেষণা হইতে, তাই, জন্তুজীবনের অতি জটিল ও রহস্যময় প্রতিক্রিয়া সমূহের কারণ নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা আশা করা যায়। আমাদের এই আশা সম্পূর্ণ ভাবে সফল হইয়াছে বলিতে হইবে; যেহেতু উদ্ভিজ্জদেহে কতকগুলি অপ্রত্যাশিত লাক্ষণিক বিকাশ প্রত্যক্ষ করার ফলে মানবদেহেও তদনুরূপ লক্ষণের বিকাশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর উভয় প্রকার জীবনের ক্রিয়াগুলির উপর ভেষজ, উত্তেজক এবং বিষ-পদার্থের তুল্যরূপ প্রভাব ও আমাদিগের অতিমাত্র বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি বিষয়ে এই সকল পরীক্ষার ফল বিশেষ প্রকার উপকার সাধন করিবে বলিয়া শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ বিবেচনা করিতেছেন।

এই গবেষণা হইতে ক্রমবর্ধনের ক্রিয়া সম্বন্ধে অনেকগুলি অত্যাবশ্যক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমাদিগকে যে বিশেষ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহার কারণ এই যে উদ্ভিজ্জের ক্রম-বৃদ্ধির গতি সাতিশয় মন্থর, এমন কি চিরপরিচিত শম্বুকের মন্থরগতি অপেক্ষাও

তাহা সহস্রগুণে মৃদু। এই জন্য, যাহার সহায়তায় এই গতির পরিমাণ প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে, সেইরূপ অতিশয় শক্তিশালী এক দৃগ্‌যন্ত্রের উদ্ভাবন আবশ্যক হইয়াছিল। আমার উদ্ভাবিত Magnetic Crescograph যন্ত্রের সাহায্য দ্বারা কোন বস্তুর আকার পাঁচকোটি হইতে দশকোটি গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেখান যাইতে পারে এবং ইহার এই শক্তি যে কিরূপ অদ্ভুত, অতুল্দান কল্পনা-শক্তির দ্বারাও তাহার ধারণা করা যাইতে পারে না। এই যন্ত্রের শক্তি বস্তুতঃই আমাদের মানসিক ধারণা-শক্তির বহির্ভূত; তবে, আমার ঐ যন্ত্রের সাহায্যে বাড়াইয়া লইলে সুবিখ্যাত মন্থর শম্বুকের গতি যে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে এ সম্বন্ধে আমরা একটা স্থূল ধারণা করিতে পারি। বর্তমান উন্নতযুগের কোনরূপ কামানের গোলার গতির সহিত ঐরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শম্বুক গতির তুলনা আদৌ করা যাইতে পারে না,—কারণ ঐ শম্বুক পৃথিবীর সর্বোচ্চ-শক্তিশালী কামানের গোলাকেও বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে। অধিকতর নৈকট্য-তুলনার জন্য নৈসর্গিক কোন গতিশীল পদার্থের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে হইবে। অতিশয় দ্রুত গতিশীলা ধরিত্রীর নিরক্ষবৃত্তের উপরিস্থ ধাবমান বিন্দুবিশেষের গতি অত্যাশ্চর্যময় বটে, কিন্তু আমাদের যন্ত্রে ঐ শম্বুক মেদিনীকে মন্থরগামিনী বলিয়া তাঁহার প্রতি কৃপা-দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে সমর্থ;—যেহেতু যে সময়ের মধ্যে পৃথিবী আপন কক্ষে একবার মাত্র আবর্তন করিবেন, আমাদের উক্ত শম্বুক ঐ সময়ের মধ্যে ঐ পথ চারিশত বার পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারিবে।

বৃদ্ধির নূতন অবস্থা।

অতিশয় সুকুমার "প্রত্যভিজ্ঞা"-শক্তি-সম্পন্ন যন্ত্রসমূহের সহায়তা দ্বারাই উদ্ভিদের বৃদ্ধির রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল; এক্ষণে সেই বৃদ্ধির গতি-বেগ বাড়াইবার উপযোগী বৈদ্যুতিক এবং রাসায়নিক উত্তেজক পদার্থেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং এই অত্যাবশ্যক বিষয়টির উপরে জগতের প্রয়োজনীয় খাদ্য-সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে। তবে, এই সকল উত্তেজক পদার্থের যথোপযুক্ত পরিমাণ অথবা মাত্রা-নির্ণয় করা পরমাবশ্যক; প্রয়োজনীয় মাত্রাকে অতিক্রম করিয়া না যায়, এরূপ অত্যল্প পরিমাণে কতিপয় পদার্থের প্রয়োগ হইতে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বর্দ্ধন-গতি বাড়াইবার পক্ষে অত্যাশ্চর্যরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে।

যে সকল ক্ষেত্রে, নৈসর্গিক নিয়মে, উদ্ভিদের ক্রমবর্দ্ধনের গতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তথায়ও যথোপযুক্ত উত্তেজনার প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অনেকস্থলেই তাহার সেই রুদ্ধগতি আবার নবশক্তি লাভ করিয়াছে। বৃদ্ধের পক্ষে নবযৌবন-লাভের যে চিরাগত স্বপ্ন চলিয়া আসিতেছে, এই স্থানে তাহার কথঞ্চিৎ সফলতা-লাভের আশা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ফলেও দেখিতে পাই যে ভবিষ্যৎ সুখে দৃঢ়বিশ্বাস এবং আশার উত্তেজনা পাইলে মানুষ চির-যৌবন লাভ করিয়া থাকে, অপর পক্ষে দুঃখের নিশ্চয়তা এবং হতাশার বিষে জর্জ্জরিত হইলে সেই আবার অগৌণে ক্ষয় এবং অকাল-বার্দ্ধক্যের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।

স্বয়ংক্রিয়তা।

জীবন-যাত্রার প্রণালী-সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্রে জীবন যন্ত্রের স্বয়ংক্রিয়তা অথবা স্বতঃসিদ্ধতার প্রকাশ এক নিগূঢ়সমস্যারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। দেখ, আমাদের মনে হয় যে হৃদ্‌যন্ত্র আত্ম-বলেই চলিতেছে,—চিন্তা এবং অন্তর্দৃষ্টি আপনা হইতেই স্ফুরিত হইতেছে। উদ্ভিদ্ লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে এই বিশেষ অস্পষ্ট বিষয় অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। উদ্ভিদের মধ্যেও যে স্বয়ংক্রিয়াশীল স্পন্দনের অস্তিত্ব আছে, আমরা তাহার আবিষ্কার এবং উৎপত্তির নিয়ম নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অনুসন্ধানের ফলে সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা গিয়াছে যে সৃষ্টির মধ্যে কিছুই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বয়ম্ভব নহে। বাহির হইতে নানাবিধ শক্তি আহরণ এবং নিজের অভ্যন্তরে উহাদিগকে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সুপ্তভাবে সঞ্চিত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা প্রত্যেক প্রাণবান্ পদার্থেরই আছে; এবং ঐরূপে সঞ্চিত শক্তিগুলি পরে যখন উদ্গত হইতে থাকে, তখন সেই গুলিই আপাততঃ স্বয়ংক্রিয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। জীবের জীবন-যন্ত্র-গুলিকে, স্পন্দন-ক্রিয়ার সাহায্যে নিষ্পন্ন তাহাদের বহ্যাং গতি হইতে স্বয়ংস্ফুরিত চিন্তার বিকাশ পর্য্যন্ত, যাবতীয় জটিল এবং বিস্ময়কর কার্য্য-সম্পাদনের উপযোগী ভাবে কর্ম্মক্ষম রাখিতে হইলে, তাহাদিগকে কলাকৌশলের পরাকাষ্ঠা দ্বারা সজ্জিত করার অতিরিক্ত আরও কিছু করিতে হইবে। যদি কোন জীবকে তাহার উপযোগী পরিবেষ হইতে পৃথক্ করা যায়, তাহা হইলে উহার জীবন-যন্ত্রের ক্রিয়া অনতিবিলম্বেই স্তব্ধ হইয়া যায়। উহাদিগকে পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল রাখিতে হইলে বহির্বিষয় হইতে স্বয়ং প্রবহমান অবাধ শক্তিস্রোতের নিয়মিত প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত

আবশ্যক। অতএব বহির্জগতের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ থাকিবেই থাকিবে। যাহাতে কেবল মাত্র আমারই একায়ত্ত অধিকার, তোমার কোন স্বত্বই নাই, জগতে এরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্ব আছে কি? বর্তমান কে অতীতযুগের চিন্তা এবং জ্ঞানের উপর, এবং আমাদের প্রত্যেককেই পরস্পর পরস্পরের উপর, সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয় না কি? সঙ্কীর্ণ নিঃসঙ্গতার ভিতর জীবকে অবরুদ্ধ থাকিতে হইলে তাহার জীবন কি ভয়ঙ্কর ই না হইত! সেই জন্য, আমার প্রার্থনা এই যে আমাদের প্রত্যেকেই যেন সমস্ত বিষয়েই "অহং বা আমি"র পরিবর্তে "বয়ং বা আমরা"র আদর্শ লইয়া চিন্তা করিতে, এবং একের হানি হইতে অপরের যে আদৌ কোন লাভ হইতে পারে এরূপ অজ্ঞানকে সমূলে উৎপাটন করিতে, শিখি। কারণ, জীবনের প্রবাহকে চিরস্থায়িভাবে রক্ষা করিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম এবং প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সাহায্য এবং সহযোগিতাই অনন্ত পরিমাণে অধিকতর কার্যকর।

সধর্ম-সমত্বা।

সমাজের কল্যাণার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল অসংখ্য সুপরিচালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান সমূহের পরস্পর সহযোগি-সমবায়ের দ্বারা সুঘটিত একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্রের সহিত বৃক্ষের তুলনা করা যাইতে পারে। যে ভূমি ইহার পরিপুষ্টি সাধন করিয়া থাকে, সেই ভূমি হইতে বৃক্ষ স্বকীয় শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে; আর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ হইতে উহার উপর যে বিবিধ প্রকার আঘাত আসিয়া পড়িতে থাকে তাহারাই মৃত্যুবৎ জড়তার কবল হইতে উহাকে জাগরিত করিয়া দিয়া থাকে। দেশ অর্থাৎ পরিবেশ এবং তাহার সহযোগি-কারণ নিচয়-প্রসূত প্রভাবের চরম ফল-স্বরূপ জীবনরূপ কুসুম বিকসিত হইয়া থাকে। বিপদের বহু তরঙ্গ বৃক্ষের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে; তাহারা কিন্তু ইহাকে নির্জিত করিতে সমর্থ হয় নাই—বরং তাহারা ইহার অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তিসমূহকে শুধু উদ্বোধিত করিয়া দিয়াছে মাত্র। ঐরূপ বিপৎ-সংগ্রামের ফলে ইহার জরাজীর্ণ এবং ক্ষয়োন্মুখ অংশগুলিই কেবল মাত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং পরিবর্তনশীল কাল ইহার পুনঃপ্রজনন অথবা পুনর্গঠনের শক্তিকে বিকসিত করিয়া দিয়াছে।

সুসংঘটিত-একত্ব।

বৃক্ষ কতকগুলি অসম্বদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন অংশের সমষ্টি মাত্র নহে; প্রত্যুত ইহা সুসংঘটিত একত্বের নিদর্শন। এই সৃষ্ট জগতের কোনও এক স্থানে কোন শক্তির ঘাত প্রযুক্ত হইলে উহার প্রভাব

বহুদূরবর্তী নিখিল পদার্থেই সঞ্চারিত হইয়া উহাদিগকে পুনরায় নূতন করিয়া গড়িয়া তুলে। বৃক্ষের জীবন-যাত্রা ব্যাপারে, তাহার শরীরের অন্তর্নিহিত জীবিত-কোষ গুলির শক্তি সম্পাদন-জন্য বহিরাগত উত্তেজনা সমূহ সঞ্চালিত হওয়ার উপায় নিশ্চয়ই আছে, এবং অতি দূরব্যবহিত শারীরযন্ত্রসমূহের পরস্পরের মধ্যে সুশাসন এবং সামঞ্জস্য ও নিশ্চয়ই রক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা আবিষ্কার করিয়াছি যে বৃক্ষের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা এবং পল্লবই স্নায়ু-বিধানের শৃঙ্খলদ্বারা পরস্পর পরস্পরের সহিত নৈকট্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ আছে। বৃক্ষশরীরের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এই স্নায়ুবিধানের যে কোন অংশে যে কোন আঘাত উপস্থিত হউক, সমগ্র বৃক্ষই উহা অনুভব করিবে। ব্যবহার এবং অব্যবহারের ফলে স্নায়বিকক্রিয়া সমূহের হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়েও অত্যাশ্চর্য-জনক অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে। কাচের আচ্ছাদনের ভিতর রাখিয়া কোন উদ্ভিদ্‌কে বাহ্য শীতাতপ প্রভৃতির ঘাত প্রতিঘাত হইতে সযত্নে রক্ষা করিলে বাহ্যতঃ উহাকে পরিপুষ্ট দেখায় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহার দেহ শিথিল এবং অপূর্ণাঙ্গ হয়;—যেহেতু উহার স্নায়বিক ক্রিয়াগুলি ক্ষয় পাইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে উহার স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তি সমূহ ক্রমশঃ যেরূপ ভাবে বর্দ্ধিত এবং বিকসিত হইতে থাকে, তাহা লক্ষ্য করিলে বিলক্ষণ আনন্দ অনুভূত হয়। আঘাত পাইবার পূর্বে যে সকল স্নায়ু নিজ নিজ ক্রিয়ার বিকাশ করিতে বিরত থাকে, এই রূপ আঘাতের ফলে তাহাদের সেই সকল ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠে। তুলার সুকোমল আবরণের অভ্যন্তরে সযত্নে রক্ষার দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকসিত হয় না, পরন্তু বিপদের পুনঃ পুনঃ আঘাতের ফলেই উহা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। উত্তেজনার একান্ত অভাব ঘটিলে স্নায়ুমণ্ডল নিষ্ক্রিয়াবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং উত্তেজনার প্রভাবেই কেবল উহারা শক্তিশীল হয়। আমাদের বর্ত্তমান চিত্ত-ভাণ্ডাগার যে অসংখ্য প্রসুপ্ত স্মৃতির সঞ্চয়ে প্রতিমুহূর্তে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, এবং যাহাদিগকে আমরা "অভিজ্ঞতা" এই নামের দ্বারা পরিচিত করিয়া থাকি, উহারা অতীত উত্তেজনাদ্বারা মুদ্রিত বস্তুসমূহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের চিন্তাশক্তি উত্তেজনার প্রভাবেই প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্বোধিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; এবং এই রূপে সঞ্চিত উত্তেজনা প্রবাহের প্রভাবেই স্নায়ুপদার্থগুলি অবশেষে স্বয়ংক্রিয় হইয়া উঠে। আর, সামান্য চিন্তারজন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা পর্যন্ত, চিন্তার প্রত্যেক স্তরেই এ অবস্থা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

সম-যোগিতা।

সমগ্র উদ্ভিদদেহের কল্যাণ-সাধনের উদ্দেশ্যে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির ভিতর সমযোগিভাবে কার্য করিবার যে কলা-কৌশলের অস্তিত্ব আমি সে দিন আবিষ্কার করিয়াছি, তাহা সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। বৃক্ষেরদেহে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীবিত কোষপুঞ্জ নিজ নিজ কর্তব্য কার্য সম্পাদন করিতেছে এবং বহির্দেশে তাহার জীবনের অনুকূল অথবা প্রতিকূল যে সকল নানাবিধ পরিবর্তন নিত্যই সম্বটিত হইতেছে, সে গুলিকে যথাযথভাবে অনুভব করিবার উপযোগী এবং তাহার শরীরের প্রত্যন্তভাবে অবস্থিত এরূপ কতকগুলি যন্ত্র বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতেছে। অনুভবের বোধ হইবামাত্র যদি তাহা অভ্যন্তরে পরিচালন এবং তৎক্ষণাৎ তদুপযোগী আবশ্যক কার্য সাধন করিবার শক্তি না থাকিত তাহা হইলে তদ্রূপ অনুভবের দ্বারা বিশেষ কোন উপকারই হইত না। বৃক্ষদেহের অভ্যন্তরে এরূপ কতকগুলি কেন্দ্র আছে, যাহাদিগকে কার্যকারিণী শক্তির মৌলিকস্থান বলা যাইতে পারে; আর অনুভূতি প্রাপ্ত হইলেই সেই সকল অনুভূতির একটি অন্তর্মুখ বেগ-প্রবাহ সেই সকল কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ঐ অনুভূতির সংবাদ পাইবামাত্র তখন প্রকৃত অত্যাশ্চর্যের এক ঘটনার উদ্ভব হয়;—পূর্ব-সময়ে ক্রমশঃ সঞ্চিত শক্তিসমূহ বিস্ফোরক বস্তুর স্ফোটনের দ্রুততা এবং বেগের সহিত বহির্নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই বহির্মুখ বেগ-প্রবাহের সাহায্যেই বৃক্ষ তাহার দেহের প্রত্যন্তদেশে অবস্থিত যন্ত্রগুলির-দ্বারা উপস্থিত বিপদের প্রতিকার করিতে সমর্থ হয়। বৃক্ষের জীবন রক্ষার জন্য উহার ইন্দ্রিয়গণের পক্ষে সর্বদা অশ্রান্ত সতর্কতা এবং যথাকালে তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রভাবে কার্য করিবার উপযোগিনী শক্তি রক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক; কারণ, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য-কৌশলময় যন্ত্রসমূহের মধ্যে পরস্পর সমযোগি-মিলনের কিঞ্চিন্মাত্র অভাব ঘটিলেই সাধারণ-তন্ত্রস্বরূপ সমগ্র বৃক্ষদেহের বিনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে।

উন্নততর অভিব্যক্তি।

অতিশয় সরল ও সামান্য হইতে জটিল এবং তদপেক্ষা জটিলতর জীবদেহের মধ্যে সংযোগের একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান তরঙ্গের এবং নিতান্ত অসম্পূর্ণাঙ্গ জীবাণুদেহের প্রাথমিক অবস্থা হইতে ক্রমশঃ তাহার উন্নততর সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির অস্তিত্ব এইরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু

হীনের সহিতও আমাদের জ্ঞাতিত্ব স্বীকারে কোনরূপ অবমাননার কথা থাকিতে পারে না; বরং মানুষ যে তাহার অবিশ্রান্ত ও অনন্ত উদ্যমের প্রভাবে, সান্দ্রমণ্ডবৎ নির্দিষ্ট আকার শূন্য এক পিণ্ডপদার্থ বিশেষমাত্র সেই প্রাথমিক অবস্থা হইতে তাহার এই বর্তমান উন্নত অবস্থায় উঠিয়া আসিতে পারিয়াছে, ইহা তাহার পক্ষে গৌরবেরই বিষয়। অভিব্যক্তির উন্নতিমার্গে জীবের এই আরোহণের পক্ষে স্নায়বিক-ক্রিয়াশক্তির সুষ্ঠুভাবে ক্রমশঃ প্রবর্দ্ধমান প্রসার অথবা সর্বাঙ্গসুন্দর-ভাবে বিকাশই সর্বাপেক্ষা সমধিক সাহায্য করিয়াছে। এবং উক্ত শক্তির সেই সর্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব-সম্পন্ন বিকাশের সাহায্যেই মনুষ্য স্বেচ্ছামতে নূতন নূতন উত্তেজনার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উন্নততর অভিব্যক্তির সাধনা সিদ্ধ করিতেছে।

জড়ীয় পরমাণুপুঞ্জের চাঞ্চল্য, জীবকোষ স্পন্দন, ক্রমবর্দ্ধনের কম্পন, স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে বেগের দ্রুততা এবং তজ্জন্য জায়মানা সংজ্ঞা,—ইহারা কত পৃথক্ পৃথক্, অথচ কেমন একীভূত! ইহা কত আশ্চর্যের বিষয় যে স্নায়বিক পদার্থের উত্তেজনার ফলে যে সমুদায় চাঞ্চল্য উৎপাদিত হয়, তাহারা শুধুই যে যথাযথভাবে যথাস্থানে প্রেরিত হয় তাহাই নহে, পরন্তু উহারা দর্পণে প্রতিভাসিত মূর্তির মত, জীবনের পৃথক্ এক ভূমিতে উপস্থিত হইয়া চৈতন্য এবং অনুরাগরূপে, চিন্তা এবং ভাবের আকারে, রূপান্তরিত এবং প্রতিফলিত হইয়া থাকে! পাঞ্চভৌতিক দেহ এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র উহার প্রাতিভাসিক প্রতিমূর্তি, এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি অধিকতর বাস্তব,—কোনটি নশ্বর এবং কোনটিই বা মৃত্যুর অতীত, তাহা কে বলিয়া দিবে?

তাঁহার মুখের কথাটি একবার বাহির করিলেই যথেচ্ছ ধনরত্নের অধিকারিণী হইতে পারেন, এইরূপ অনুরুদ্ধ হইলে বৈদিক যুগের এক নারী (৮) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই সকল ধনরত্নের দ্বারা আমি কি অমৃতা হইতে (অমরত্ব লাভ করিতে) পারিব?" অতীত যুগে এরূপ

(৮) বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথমা পত্নী ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী এই নারী। তিনি বলিয়াছিলেন, "যন্নু ম ইয়ম্ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাং কথং তেনামৃতা স্যাম্?" এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"না তাহা হইতে পারে না, ধনবান্ লোকেদের যেমন জীবনযাত্রা (সুখে) চলে তোমারও জীবনযাত্রা সেইরূপ (সুখে) চলিবে; কিন্তু ধনসম্পত্তির দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই (অমরত্ব লাভ সম্ভবপর নহে)।" এই কথা শুনিয়া

কত কত জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল, যাঁহারা জগতের সাম্রাজ্য-লাভ করিয়াছিলেন। সেই সকল প্রবলপরাক্রান্ত পৃথিবীজয়ী রাজবংশের যাবতীয় অতীত গৌরবের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ এখন ভূগর্ভ নিহিত কয়েকখণ্ড তুচ্ছ ভগ্ন পদার্থ কেবল পড়িয়া আছে মাত্র! পরন্তু রূপান্তর এবং আপাত-প্রতীয়মান ধ্বংসের অতীত হইয়াও পুনরাবির্ভূত হইতে পারে, এরূপ এক পদার্থ আছে; চিন্তার ইন্ধন হইতে জ্ঞানের যে অগ্নিজ্বালার উদ্ভব হয়, এবং যাহার শিখা যুগে যুগে আবির্ভূত এবং অন্তর্হিত মানবজাতির মধ্য দিয়া অবিরাম এবং অনির্বাপিতভাবে সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছে, তাহাই সেই পদার্থ। জড়বস্তু অথবা সম্পদের মধ্যে অমৃতের বীজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কিন্তু ভাবনা এবং ভাবের ভিতরই তাহার সন্ধান মিলিয়া থাকে। উন্নত ভাব এবং আদর্শ সমূহের বহুলপ্রচার এবং সযত্ন-সাধিত সেবাধর্মের মহিমা হইতেই মনুষ্যত্বের সত্য-সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, পরন্তু পার্থিব-বৈভব-লাভের প্রভাবে কখনও তাহা সিদ্ধ হইবে না।

(মর্মানুবাদক)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

ডাক্তার সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুজ মহাশয়ের প্রাগুক্ত অভিভাষণের টীকা স্বরূপ মনুসংহিতা হইতে উদ্ভিজ্জ-তত্ত্ব সংকলিত করিয়া দিতেছি। অনুরাগী এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনুগৃহীত হইব।

মনুসংহিতায় উদ্ভিজ্জ।

সৃষ্টির বিকাশ বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীশ্রীমনু মহারাজ জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং স্বেদজ জীবগণের কথা শেষ করিবার পর বলিতেছেন,—

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্? যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহি"—যাহা দ্বারা আমি অমৃতা হইতে (অমরত্ব লাভ করিতে) না পারিব, তাহা লইয়া আমি কি করিব? আপনি যাহা (যে ব্রহ্মজ্ঞান) জানিয়াছেন, তাহা (সেই ব্রহ্মজ্ঞান) আমাকে বলুন।" এই কথার উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে এই আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে।

(১) "উদ্ভিজ্জগণ স্থাবর; বীজ অথবা কাণ্ড হইতে উহারা উদ্গত হইয়া থাকে। যাহারা বহুসংখ্যক ফুল এবং ফল ধারণ করে, অথচ ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, তাহাদিগকে 'ওষধি' বলে। ৪৬।

(২) "পুষ্পের বহিঃপ্রকাশ ব্যতিরেকেই যাহাদের ফলোদ্গম হয়, তাহাদিগকে 'বনস্পতি', এবং যাহাদের ফুল ও ফল উভয়ই হয়, তাহাদিগকে 'বৃক্ষ' কহিয়া থাকে। ৪৭।

(৩) "বীজ অথবা কাণ্ড হইতে উৎপন্ন বিবিধ গুচ্ছ, গুল্ম, তৃণজাতি, প্রতান এবং বল্লীসমূহ (উদ্ভিজ্জ নামে পরিচিত) আছে। ৪৮।

(৪) "ইহারা সকলেই (উদ্ভিজ্জগণ) কর্ম্মপ্রভব বহুরূপ তমোগুণের দ্বারা আবৃত (হইলেও কিন্তু) অন্তঃসংজ্ঞাসযুক্ত এবং সুখদুঃখসমন্বিত বটে। ৪৯।"

মনুসংহিতা, প্রথমাধ্যায়, ৪৬শ হইতে ৪৯শ শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

(১) স্থাবর = যাহা একস্থানে স্থির থাকে, Immovable. বিপরীত—জঙ্গম = গতিশীল moving or movable.

বীজ = বীচি বা অাঁটি, Seed. কাণ্ড (গুঁড়ি, শাখা, নাল) = Stem, Branch; কাণ্ড শব্দে 'কন্দ' Bulb, Tuber, ও বুঝায়।

ওষধি = ফল পাকিলেই যে সকল গাছ মরিয়া যায়, অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের একবার মাত্র ফুল অথবা ফল হয়; যেমন ধান, গম, যব, বাঁশ, আনারস, কলা প্রভৃতি। কোলব্রুক সাহেব ইহার ইংরাজী An annual plant করিয়া পাদটীকায় Dying after ripening its fruit লিখিয়াছেন।

(২) বনস্পতি = অশ্বত্থ, বট, উড়ুম্বর (ডুমুর), কাঁটাল প্রভৃতি; One without apparent blossoms.

(৩) গুচ্ছ = (গুচ্ছক, গুৎস, গুৎসক) গুম্ব এবং শাখা হীন উদ্ভিদের ঝাড়, clump of grass etc.

গুল্ম = শাখা প্রশাখাহীন উদ্ভিদ্ Shrub। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা এবং মূল সংযুক্ত উদ্ভিদকে "ক্ষুপ" (a small tree, with short branches and roots) বলে।

উদ্ভিদ্গণ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত। তমোগুণের ফল সৎজ্ঞানের অভাব, নিদ্রা, আলস্য, মোহ, জড়তা, প্রমাদ প্রভৃতি; যথা শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ভগবানের বাক্য,—

"তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮॥
"অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এবচ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৩॥" চতুর্দশ অধ্যায়।

"অন্তঃসংজ্ঞা" ভিতরে জ্ঞান এবং সুখদুঃখবোধ আছে, কিন্তু আমাদের অসম্পূর্ণশক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়গণ তাহার পরিচয় প্রদান করিতে অসমর্থ। ডাক্তার সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার অগাধ প্রতিভার প্রভাবে উদ্ভিদের এই অন্তর্নিহিত সংজ্ঞা অথবা জ্ঞানকে, এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা অনুভূত সুখদুঃখকে, মানুষের ইন্দ্রিয়-গোচর করিয়া দিয়াছেন।

উদ্ভিদ্গণও সজীব অথবা প্রাণবন্ত পদার্থ বলিয়াই মনু মহারাজ উহাদের বধ অথবা বিনাশ-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের (প্রায়শ্চিত্তখণ্ডের) ৫৯ তম হইতে ৬৬ তম পর্যন্ত ৮ আটটি শ্লোকে তিনি গোবধ হইতে নাস্তিক্য (বেদনিন্দা) পর্যন্ত ৫২টি উপপাতকের নাম নির্দেশ করিয়াছেন; তাহার মধ্যে ৬৪ তম শ্লোকে "ইন্ধনের (জ্বালানী কাঠের) জন্য অশুষ্ক (কাঁচা) অর্থাৎ জীবিত বৃক্ষচ্ছেদনের" উল্লেখ করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে গোবধাদি উপপাতকের অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত আদিষ্ট হইয়াছে। তাহার পর তিনি বিধান দিতেছেন,—

"(১) ফল-প্রদানকারী বৃক্ষ, গুল্ম, বল্লী, লতা এবং পুষ্পিত বীরুধ্ (শাখা-প্রশাখা-সংযুক্ত লতা) ছেদন করিলে সেই পাপশান্তির জন্য শতবার (সাবিত্র্যাদি) ঋক্‌মন্ত্র জপ করিতে হইবে। ১৪২।

তৃণ = ঘাসের মত উদ্ভিদ্। A gramineous plant, including reeds, grasses and corn.

প্রতান = লতানে গাছের (লতার) শাখা।

বল্লী = (ব্রততি, ব্রতত্নী, প্রততি, লতা) A creeper.

"(২) মিষ্টরসাদি, বিবিধ অন্ন (খাদ্য), ফল এবং ফুল হইতে জাত জীবগণের (উদ্ভিজ্জাণু Fungus ?) বিনাশ-জনিত পাপে ঘৃত-প্রাশনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ১৪৩।

"(৩) কৃষি-দ্বারা উৎপন্ন হউক অথবা বনে স্বয়ংজাতই হউক এরূপ "ওষধি"গণের বৃথাচ্ছেদনের (আহার, ঔষধ অথবা যজ্ঞাদির উদ্দেশ্যে ভিন্ন অনর্থক ছেদন) জন্য পাপে পয়োব্রত (দুগ্ধপানরূপ ব্রত) অবলম্বন পূর্ব্বক একদিন গবানুগমন (গোরুর সঙ্গে সঙ্গে গমন ও পাহারা দেওয়া, "রঘুবংশের" দিলীপ রাজা যেমন করিয়াছিলেন) করিতে হইবে। ১৪৪।" *

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

হাতে-খড়ি।

চাষার ছেলের হাতে খড়ি
আজকে হবে মাঠে,
হলখানি তার কাঁধে ল'য়ে
গ্রাম-পথে সে হাঁটে।

আগে বুড়া জনক তাহার,
পাছে চলে ভাই কটী আর;
ঠাকুর ঘরে তার জননীর
আজকে বেলা কাটে।

* মনুসংহিতার সংস্কৃত-শ্লোকগুলির বাঙ্গলা অনুবাদ লেখক করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে মূল-শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হয় নাই।

শিখবে সে আজ কাস্তে ধরা
বইতে জোয়াল হাল,
বীজ রুইতে জল সেঁচতে
বাঁধতে ক্ষেতের আল।
জলে ভিজে রোদে পুড়ে,
ক্ষেতের পথে ঘুরে ঘুরে,
মোটা ভাত আর কাপড়েতে
কাটবে তাহার কাল।
বৃদ্ধ চাষা বীজ মন্ত্র
দিল ছেলের কানে,
ক্ষেতের কণা সোনা, চির
রাখিস্ বাবা প্রাণে।
সুখ স্বাস্থ্য, কুটীর ভরা
সম্পদ যা' দিচ্ছে হরি,
ক্ষেতটা চির রাখিস উজল
সবুজ কাঁচা ধানে।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনন্তলাল।

—
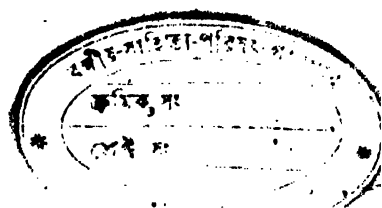
দশম পরিচ্ছেদ।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর দীর্ঘ অবকাশ। ব্রজেন্দ্র অনেকদিন বাড়ী যায় নাই কিন্তু সে এ সুযোগ গ্রহণ না করিয়া রতনপুরে অবকাশকাল অতিবাহিত করিল; কারণ পল্লীগ্রামে যাইয়া সমবয়স্ক বালকদের সহিত বৃথা গল্পে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা সে পুস্তক পাঠে অধিক আমোদ উপভোগ করিত। রতনপুরে বাবুদের পুস্তকাগারে তাহার বাসা। সে পাঠের খাতিরে রতনপুরে রহিয়া গেল। তাহার মাতৃদেবীকে সে কথা জানাইলে, তিনি দুঃখিত না হইয়া বরং উন্নতিলাভ করিতেছে ভাবিয়া আহ্লাদিত হইল। রতনপুরে ব্রজেন্দ্রের আর একটি আকর্ষণ—শিশিরকুমারী। শিশিরকে একবার চক্ষে দেখিয়া সে যে আনন্দ পাইত তাহার তুলনা জগতে আর সে খুঁজিয়া পাইত না। কিন্তু এ সুখের পরিণাম কি? ব্রজেন্দ্র তাহা জানিত ইহা লইয়া সে অনেক চিন্তাও করিয়াছে, সাবধানও হইতে চেষ্টা পাইয়াছে, কিন্তু অগ্নি দেখিয়া পতঙ্গের যে দশা তাহারও তাহাই।

নবদ্বীপে ব্রজেন্দ্রের মাতুলবংশে তাহার বৃদ্ধা মাতামহী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। তাঁহাকে দেখিতে ব্রজেন্দ্রের মাতা মাঝে মাঝে নবদ্বীপ যাইয়া কিছুদিন অবস্থিতি করিতেন। এক্ষণে পরীক্ষার পর ব্রজেন্দ্র বাটী যাইবে না শুনিয়া তিনি নবদ্বীপ গিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রের মাতুলালয়ের নিকটে বাড়ী যামিনীকুমার নামক এক ব্রাহ্মণ বালক কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিত। যামিনী ব্রজেন্দ্রের বাল্যবন্ধু। ব্রজেন্দ্র কখন কখন কলিকাতায় যামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহাদের মেসে গমন করিত। যামিনী সম্প্রতি নবদ্বীপ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে। সে আসিবার সময়ে তাহার সহিত ব্রজেন্দ্রের মাতা কয়েকটি দ্রব্য ও একখানি পত্র ব্রজেন্দ্রকে দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্র ঐ সকল আনিবার জন্য, একদিন অপরাহ্নে, পটুয়াটোলায় যামিনীদের মেসে গমন করিল।

মেস্ স্থিত। নিম্নতলায় রন্ধনশালা, ভোজনাগার ও জলের কল। উপরে পাঁচ ছয়টি কুঠুরি। এক একটি কুঠুরিতে তিন চারিজন অবস্থিতি করে। এক এক জনের এক একটি বিছানা, মশারি, ট্রাঙ্ক্ অথবা প্যাটরা; দেয়ালের পার্শ্বে দড়ির এক একটি আল্না, তাহাতে জামা, কাপড়, চাদর ইত্যাদি ঝুলিতেছে। প্রত্যেকের বিছনা আর্থাৎ মাদুরের উপর তোষক, বালিশ ইত্যাদি শয্যোপকরণ সকল স্তূপাকারে গুটান রহিয়াছে।

ব্রজেন্দ্র মেসে প্রবেশ করিয়া, উপরে যামিনীদের ঘরে যাইয়া, তাহার বিছানায় উপবেশন করিল। যামিনী পার্শ্বের ঘরে ছিল; ব্রজেন্দ্রের গলার আওয়াজ শুনিয়া, ক্যাম্বিশে আবৃত কাঠের চটি পায়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং দেশের সংবাদাদি প্রদানের পর, ব্রজেন্দ্রের মাতৃদত্ত দ্রব্যাদি বাহির করিয়া দিল।

উভয়ে কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে, পরিধানে থান কাপড়, স্কন্ধে সিল্কের চাদর, গলায় মালা, তিলককাটা. চটিজুতা পায়ে, স্থূলতনু, গৌরবর্ণ এক প্রৌঢ় গোস্বামী প্রভু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যামিনীর পার্শ্বের বিছানায় উপবিষ্ট—একজন দণ্ডায়মান হইয়া, "গোসাঞীজী যে! আসুন, আসুন, কোথা থেকে? আপনার দেশ থেকে নাকি? কল্‌কাতায় কবে এলেন?" বলিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিজের বিছানায় লইয়া বসাইল। গোসাঞীজী উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন,—"হাঁ কয়েক দিন হল আমাদের দেশ বল্লভপাড়া থেকে কল্‌কাতায় বড়বাজারে এক শিষ্যের বাড়ী এসেচি আজ বৌবাজারে আর একজন শিষ্যের কাছে বাকিকী আদায় করতে গিয়েছিলাম। বড়বাজারে ফেরবার সময়ে গোলদিঘির কাছে এসে দেখলাম সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই। মনে পড়্‌ল এখানে পটুয়াটোলায় তুমি রয়েচো। অতএব এইখানে সন্ধ্যাটা সেরে যাবো ভেবে এলাম।"

"ভাল করেচেন, আপনার আহ্নিকের যায়গা করে দিচ্চি" বলিয়া অন্য দুই একটি কথার পর গোসাইজীর বন্ধু আলনা হইতে একখানি কম্বলের আসন লইয়া তাঁহার নিকট বিছাইয়া দিল। তখন গোস্বামী বলিলেন,—"গঙ্গাজল আছে ত?"

"আজ্ঞে হাঁ গঙ্গাজল আছে এনে দিচ্ছি।"

পরে উচ্চৈস্বরে ডাকিল,—"বামুনঠাকুরুণ, ভাল ধোয়া গেলাশে করে, এক গেলাশ গঙ্গাজল আনুন ত।"

"যাই বাবু" বলিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরাণী নীচে রন্ধনশালা হইতে উত্তর দিলেন। অল্পক্ষণ পরে এক গেলাশ জল হস্তে প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর বয়স্কা এক গৌরবর্ণা স্ত্রীলোক আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহের দ্বার পূর্ব্বদিকে। গোস্বামী পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া কম্বলের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণঠাকুরাণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র উভয়ের চারিচক্ষু মিলন হইল। অমনি হঠাৎ ঝন্ ঝন্ করিয়া গেলাশটি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল ব্রাহ্মণঠাকুরাণীও তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্য ব্যয়ে গৃহে হইতে বাহির হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। তখন তাহার অবস্থা দেখিলে বোধ হইত যেন সে বিষম কম্পজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে।

এই ব্যাপার সংঘটিত হইবামাত্র গৃহস্থিত সকলে "কি হইল? কি হইল?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। গেলাশ পতনের ঝন্ ঝন্ শব্দ এবং তাহাদিগের চীৎকার শুনিয়া মেসের অন্যান্য ঘর হইতে দুই চারিজন বাহির হইয়া পড়িল। গোস্বামী প্রভু অবাক হইয়া এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন, তিনিও বিস্ময়ে অভিভূত।

ব্রাহ্মণঠাকুরাণীর অবস্থা দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি হঠাৎ কোন অসুখ করল!"

"হাঁ, বাবা," বলিয়া পচিকা কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে নামিয়া গেল; রন্ধনশালায় ও প্রবেশ না করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। গোস্বামীজীও গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন "এখানে আর সন্ধ্যা করব না,—বাসায় যাই।"—তাঁর বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলুন দিকি?"

"বিশেষ কাজ আছে, শিগ্‌গির বাসায় ফিরতে হবে।"

এই বলিয়া, বিছানা হইতে সিল্কের চাদরখানি লইয়া গোস্বামী প্রভু প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে ব্রাহ্মণঠাকুরাণী মেসে পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"ওগো, আমি আর থাকবো না, দেশে চল্লাম। এখুনি খবর পেলেম, আমার ছেলের বড় ব্যারাম!"

পরে তাহার কাপড় দুইখানি হস্তে লইয়া, সে প্রস্থানোন্মুখ হইল।

উপরতলা হইতে একজন বলিল, "কাল সকালে গেলে হবে না? তুমি চলে গেলে আমরা এতগুলি লোক উপবাসী থাকবো,—সেটা কি ভাল হবে? তা ছাড়া, তোমার মাইনে বাকী আছে, না নিয়ে যাবে?"

"না বাবু, আমি আর একটুও বিলম্ব করতে পারবো না। মাইনে এর পর এসে নেবে।"

এই বলিয়া পাচিকা সে স হইতে প্রস্থান করিল। তখন সকলে নিজ নিজ ঘর হইতে বাহির হইয়া পরস্পর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। একজন বলিল,—"এ ব্যাপারটা কি ? আমার বোধ হয় ঐ গোসাঞী ঠাকুরই এর মূল।"

আর একজন বলিল,—"আরে ভাই গোসাঞীদের তিনখুন মাপ। গোসাঞী যদি বোকা বা ন্যালাখ্যাপা হন, তাহলে ভক্তেরা বলবে—'প্রভু আমাদের বাউল, গোসাঞী যদি লেখাপড়া না শিখে মূর্খ হন অথচ ভুল শোলোক-টোলোক্ শিখে ফাজিল্ বক্তা হয়ে পড়ুন তা হলে বলবে আহা, প্রভু আমাদের কি সিদ্ধান্তই করেন। হবে না কেন, প্রভু যে আমাদের পণ্ডিত গোসাঞী।

রসিকতায় আর উদরাগ্নি নির্বাপিত হইবার নয়, সেদিনের মত আহারের পরিবর্তে তাহাদের ব্যবস্থা হইল জল খাবার !

ব্রজেন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া যামিনীর নিকট বিদায় লইল।

ব্রাহ্মণঠাকুরাণী নীচে রান্নাঘরে উনানে অন্ন চাপাইয়া গিয়াছেন, না দেখিলে উহা কয়লার আঁচে ধরিয়া যাইবে। অতএব তাহাদের মধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণ সকলের অনুরোধে অন্ন নামাইতে গেল। আজ রাত্রে রন্ধন-কার্য্য তাহাদিগেকেই করিতে হইবে।

ব্রজেন্দ্র সাড়ে সাতটার ট্রেণ ধরিবার জন্য যামিনীর নিকট বিদায় লইয়া, হাওড়া ষ্টেসন অভিমুখে প্রস্থান করিল।

একাদশ—পরিচ্ছেদ।

এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল যে, ব্রজেন্দ্র অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। তখন অনেকের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। যাহারা তাহাকে চিনিত না, তাহারা উপযাচক হইয়া, তাহার পরিচয় লইতে লাগিল।

অনন্তলালের মোসাহেবেরা এই সুযোগে তাঁহার একটু খোসামুদি করিয়া লইলেন। একজন বলিলেন,—"ব্রজেন্দ্রের উন্নতির মূলই আমাদের বাবু। বাবুর দয়া না হলে, ওকে যে পাড়াগেঁয়ে মেঠো ছেলে হয়ে থাকতে হত।"

বিপিন বাবু বলিলেন,—তা হলে হয় ত ছিপ হাতে পুকুরের পাড় আলো করে না হয় কোঁচায় টেপ্ গায়ে দিয়ে, বাগ্দিপাড়ার কেষ্ট হয়ে বেড়াতেন।”

অনন্তলাল বলিলেন,—“না, না, ব্রজেন্দ্রের সে দোষ নাই। ওর স্বভাবচরিত্র খুব ভাল।”

বিপিন বাবু পুনরায় বলিলেন—“বাবু, সাই তা আমি জানি। এখানে ভাল যায়গায় আছে, সহরে আছে, তাই সে দোষ নাই। পাড়াগাঁয়ে টো টো কোম্পানির বাড়ী ম্যানেজারী নিলে, এতদিন কি হ’ত কে বল্‌তে পারে?”

অনন্তলাল বলিলেন,—“সবই তার প্রারব্ধ, আমি তার নিমিত্তকারণ মাত্র।”

একজন বলিল,—এইবার কুড়িটাকা করে স্কলার্সিপ পাবে—এখন তা থেকে বিনা সাহায্যেই পড়্‌তে পারবে।”

অনন্তলাল বলিলেন,—“আহা, ব্যাচারা বড় গরীব। বাড়ীতে ওর মার বড় কষ্ট। যা কিছু জমি যায়গা ছিল, সব দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেচে। আমি সামান্য জমি দিয়েছি তার থেকে হতে কষ্টে সৃষ্টে চলে। স্কলারসিপের টাকা হতে ওর মাকে ইচ্ছা মত পাঠাতে পারবে। আর যত দিন পড়বে, সব খরচ এইখান থেকেই পাবে। তার জন্যে আর বৃত্তির টাকা খরচ করতে হবে না।”

বিপিন বাবু বলিলেন,—“এতেই ত আপনাকে দয়াময় বলা যায়।”

**　　**　　**　　**　　**

অনন্তলালের মজলিসে পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের দুই চারি দিন পরে এক দিন মধ্যাহ্নে ব্রজেন্দ্র রসরাজের সহিত বসিয়া ভোজন করিতেছে,—এমন সময়ে সরলা ও শিশিরকুমারী যাইয়া তাহাদিগের নিকট উপবেশন করিল। অন্যান্য নানা কথার পর সরলা বলিল,—“ব্রজেন্দ্র, তুমি কুড়ি টাকা করে বৃত্তি পাবে, তার মধ্যে কিছু কিছু তোমার মাকে পাঠিয়ে দিও।”

ব্রজেন্দ্র বলিল,—“আজ্ঞে হাঁ, দশটাকা করে পাঠাব।”

রসরাজ বলিল,—“এইবার ব্রজেন্দ্রকে অনেকগুলি বই কিনতে হবে তা নইলে কলেজে পড়া আরম্ভ করতে পারবে না। তা ছাড়া কলেজে ভর্ত্তি হতে আর প্রতিদিন কলিকাতায় যাতায়াতের জন্য মাসিক রেলওয়ে টিকিট কিনতে কিছু টাকার দরকার।”

৮

ব্রজেন্দ্র বলিল,—"আমি স্কলারসিপ থেকে ক্রমে সব করে নেব।"

রসরাজ বলিল,—"সে অনেক দেরী হবে—তাতে তোমার পড়ার ক্ষতি হবে। আজকাল খাজাঞ্চীর কাছে টাকা পাওয়া কঠিন। আমি শ্বশুর মহাশয়কে বলে দেখ্‌ব, কিছু সংগ্রহ করতে পারি কি না।"

ব্রজেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিল,—"আজ্ঞে না, বাবু আমাকে অনেক সাহায্য করেচেন আর আমি তাঁকে বিরক্ত করবো না। আপনি তাঁকে আমার জন্যে আর কিছুই বল্‌বেন না।"

বস্তুতঃ তখন কিছু অর্থ না পাইলে ব্রজেন্দ্র কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করিতে পারিবে না। কিন্তু তখন অনন্তলালের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় দেখিয়া সে মনস্থ করিয়াছিল যে, তাঁহাকে আর কিছুরই জন্য বিরক্ত করিবে না। ইহাতে যদি কিছু দিন অধ্যয়নের ব্যাঘাত হয়, তাহাতেও সে প্রস্তুত।

রসরাজ তাহার কথার কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া, নিঃশব্দে ভোজন সমাধা করিয়া উঠিলেন।

সেই দিনের ন্যায় আজিও অনন্তলালের নিকট রসরাজের নিজেরও কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল। খাজাঞ্চীর নিকট এখন সর্ব্বদাই টাকার অভাব। এ সময়ে অনন্তলালের নিকটও একবার যাইয়াই মনস্কামনা প্রায় সিদ্ধ হইত না। কিন্তু না যাইলেও উপায় নাই। পরমুখাপেক্ষীর অদৃষ্টে এই প্রকারই।

আজি আহারাদির পর সরলা নিজ কক্ষে বসিয়া আছে—এমন সময়ে শিশিরকুমারী আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। তাহাকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সরলা বলিল,—"শিশির, অমন করে বসলি কেন।"

তখন শিশির বলিল,—"দিদি, আমি তোমাকে একটি কথা বলতে এলাম। তোমার কাছে আমার যে মাসহারার টাকা আছে তাই থেকে তুমি মাষ্টার মহাশয়কে পঞ্চাশটি টাকা দিও। বই কিনতে, আর অন্যান্য খরচের জন্যে এখন তাঁর টাকার বড়ই প্রয়োজন। এ টাকা না পেলে এখন পড়া আরম্ভ করতে পারবেন না। আমাকে এতদিন পড়াচ্চেন কিন্তু কিছুই নেন না। আমি দিতে গেলেও নেবেন না। দিদি, তুমি হাতে করে দিও,—তা হলে কোনও আপত্তি করতে পারবেন না।"

এই অল্প বয়সে বালিকার হৃদয়ে দয়া ও সৌজন্য দেখিয়া, সরলার মনে আনন্দ হইল। আবার কি ভাবিয়া তিনি মৃদুহাস্য করিলেন। পরে বলিলেন,—"আমি টাকা তাকে দেব, কিন্তু সে নিতে স্বীকৃত হবে কি না, বলতে পারি না। শুনলে ত, আজ বলছিল যে, বাবার কাছেও কিছু চাবে না,—তার বৃত্তির টাকা হতে নিজেই সব কুলিয়ে নেবে।"

"আপনি দিলে অস্বীকার করবেন না।" এই বলিয়া শিশিরকুমারী প্রসন্ন বদনে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহান্তরে গমন করিল।

অদ্য বৈকালে রণরাজ বৈঠকে যাইয়া দেখিল, অনন্তলাল ব্যাঘ্রকৃত্তির উপর শয়ন করিয়া মনে মনে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। তাঁহার মজলিসের লোকেরা, কেহ মুখ নত করিয়া বসিয়া আছে, কেহ বাবুর মুখের দিকে এক এক বার নিরীক্ষণ করিতেছে, কেহ তামাকু খাইতেছে। কিন্তু কাহারও মুখে কথা নাই। হরিশ সাহা স্বস্থানে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মালা জপিতেছে। তাহার ঝোলা হইতে খট্‌খট্ শব্দ নির্গত হইতেছে। টেবিলের উপর বড় ঘড়িটি টক্‌টক্ করিতেছে।

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তথাকার বাবুর্গের দিকে চাহিতেই রণরাজ তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের তদানীন্তন মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। অদ্য মেজাজ ভাল নাই, ইহা উপলব্ধি করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। অতএব এক্ষণে ব্রজেন্দ্রের বা নিজের টাকার জন্য কোন কথা বলিতে গেলে কিছুই ফল হইবে না বুঝিয়া, তিনি হরিশের নিকট যাইয়া সতরঞ্চের উপর উপবেশন করিলেন। বিপিন বাবু তাঁহাকে নিজের পার্শ্বে বসাইবার জন্য দুই একবার অনুরোধ করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে রণরাজ মৃদুস্বরে হরিশকে ব্রজেন্দ্রের টাকার আবশ্যকতা বিবৃত করিলেন, এবং একথা সুযোগমত কোন সময়ে অনন্তলালকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

আজি তিনি চারি মাস হইল অনন্তলাল পাটের ব্যবসা করিবার জন্য তাঁহার একখানি উৎকৃষ্ট জমিদারি বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক চতুর্ভুজ বাবুর হস্তে দিয়াছেন। নানা প্রকার খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে বিস্তর টাকা ঋণ করিয়াছেন। ঐ ঋণের সুদবাবদে অনেক টাকা প্রতিবৎসর মহাজনদিগকে দিতে হইত। সম্প্রতি আবার মনোমুগ্ধকর আশায় মোহিত হইয়া পাটের ব্যবসায় করিতে যাইয়া তিনি নূতন ঋণে

জড়িত হইলেন। যতদিন ব্যবসায়ে আয় না হইবে, ততদিন তাঁহার এই নূতন ঋণের কুসীদ অর্পণ করিতে বহু অর্থ নষ্ট হইবে। ব্যবসায়ের কি কতদূর হইল জানিবার জন্য তাঁহার বড় ঔৎসুক্য হইল। তিনি চতুর্ভুজ বাবুকে একখানি পত্র লিখিলেন। তাহার উত্তর আসিল,—"এ তাড়াতাড়ির কর্ম্ম নহে; ব্যবসায় এখনও আরম্ভ হয় নাই,—আরম্ভ হইলে আয় হইতে পারিবে" ইত্যাদি। চতুর্ভুজ বাবুর পত্র পাঠ করিবার পর নিজ ভবিষ্যৎ জীবনের এক ভয়াবহ চিত্র অনন্তলালের মানসপটে উদিত হইল; তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। স্বামীজীকথিত সেই গুপ্ত ধনরাশি পাইবার আশা সখাণীও তখন মনোমধ্যে স্থান পাইল না।

অনন্তলাল সর্ব্বদাই ভগবদ্গীতা, উত্তর গীতা, রামগীতা, অষ্টাবক্রসংহিতা, শান্তিশতক প্রভৃতি ঘোর বৈরাগ্যের গ্রন্থসকল লইয়া আলোচনা করিতেন এবং অপরকে বিষয়বাসনা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু স্বয়ং কিছুই ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ধন ও মানের আকাঙ্ক্ষা, জাতি, বংশ ও বিদ্যার গৌরব, ভোগস্পৃহা প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। তিনি বাল্যকাল হইতে যে অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হইলেই তাঁহার কষ্ট হইত। যেমন বালক মাতৃক্রোড়ে স্তন্যপান করিতে করিতে কোন কারণে মাতার উপর ক্রোধ করিয়া "মর" বলিয়া তাঁহার মৃত্যু কামনা করে, কিন্তু একদিনের জন্যও মাতৃক্রোড়ের অভাব সহ্য করিতে পারে না, অনন্তলালের বিষয়ত্যাগের ইচ্ছাও সেইরূপ। তিনি সংসারে একটি সন্ন্যাসী সাজিয়া বৈষয়িক কার্য্য সমস্তই এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলারা যাহা করিত তাহাই হইত। বৈষয়িক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রতিপালিকেরই অর্থের প্রয়োজন হইত। এরূপে লোকের কষ্ট বা বিপদ হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। এই ভবিষ্যৎ বিপদের ছবি আসিয়া, আজি তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল।

কিন্তু ইহা তাঁহাকে হৃদয়ে অধিকক্ষণ স্থান পাইবে না। কিছুক্ষণ পরেই এ চিন্তা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া আবার পূর্ব্বপথ অনুসরণ করিবেন।

রসরাজ—মৃদুস্বরে হরিশকে যাহা যাহা বলিলেন অনন্তলাল প্রণিধান পূর্ব্বক সে সমস্তই শ্রবণ করিয়াছিলেন, রসরাজ—নীরব হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের বাঙ্গালী জাতির

Self-reliance (আত্মনির্ভরতা) একেবারেই নাই। এখন কুড়ি টাকা করে বৃত্তি পাবি বাপু, তাই থেকে সব করে নে—আমি আর কত দিন দেব?"

সে দিন ব্রজেন্দ্রের পক্ষে সাক্ষাৎ দয়ার অবতার হইয়া অনন্তলাল যে সকল কথা বলিয়া ছিলেন, আজি আবার তাঁহারি মুখে তাহার বিপরীত বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন কোন লোক বিস্ময়াপ্লুত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু বিপিনবাবু, হরিশ সাহা প্রভৃতি তাঁহার পুরাতন সভাসদদিগের মনে কিছুমাত্র বিস্ময় জন্মিল না। কারণ তাহারা জানিত যেমন প্রাবৃট্ কালে গগনমণ্ডলের দৃশ্য অধিকক্ষণ একভাবে থাকে না, তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী সেইরূপ অনন্তলালের মনও পরিবর্ত্তিত না হইয়া, অধিকক্ষণ একভাবে কিছুতেই থাকিতে পারেন না।

রসরাজ ইহার পর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। পরে, নিরাশ হইয়া নামিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পর দিবস প্রাতে সরলা ব্রজেন্দ্রকে ডাকাইয়া পঞ্চাশটি টাকা তাহার হস্তে দিলেন। ব্রজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "এ টাকা কেন?

"তোমার বই কিনতে আর কলেজে ভর্ত্তি হতে টাকার দরকার। এ থেকে সে সকল খরচ চালিয়ে নিও।"

ব্রজেন্দ্র বলিল, "আজ্ঞে না; এখন বাবুর টাকার অভাব। এ অবস্থায় আর আমাকে দিতে হবে না। আমি আমার স্কলার্শিপের টাকা থেকে সব করে নেব। আপনারা আমাকে অনেক দিয়েচেন। এখনও দিচ্চেন। আর এ টাকায় আমার দরকার নাই।"

সরলা বলিল, "এ টাকা আমাদের নয়, শিশিরের।"

সরলার এ কথায় ব্রজেন্দ্রের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। কিন্তু সে গম্ভীরতায় কালিমার বা বিষাদের রেখা ছিল না। তাহাতে যেন প্রসন্নতা জড়িত হইয়াছিল। সে উত্তর করিল, "শিশিরকে বলবেন আমি এ টাকা শীঘ্রই তাকে পরিশোধ করব।"

সরলা বলিল, "না, এ আর তোমাকে দিতে হবে না; তা'হলে শিশির বড়ই দুঃখিত হইবে।

ব্রজেন্দ্র আর বাঙ্ নিষ্পত্তি না করিয়া কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইল। সে এই অর্থে অনায়াসে তাহার প্রয়োজনীয় পুস্তক কয়েকখানি সংগ্রহ করিয়া যথাসময়ে কলিকাতার কোন কলেজে ভর্ত্তি হইল ও প্রতিদিন রতনপুর হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল।

শিশির এখন আর তাহার নিকট পূর্ব্বের ন্যায় পড়িতে যাইত না। কারণ কলিকাতায় যাতায়াত করিতে অনেক সময় নষ্ট হইত সুতরাং এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় শিশিরকে শিক্ষা দিবার সময় সে পাইত না। তার এক কারণ শিশিরের লজ্জা সে চতুর্দ্দশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে; এখন আর আপনাকে বালিকা ভাবে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজনসুলভ লজ্জা আসিয়া তাহাকে একটু গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে।

শিশিরের অধ্যাপনাকার্য্য যাইয়া আর এক নূতন কার্য্যে ব্রজেন্দ্রকে ব্রতী হইতে হইল। সে প্রতিদিন যখন কলিকাতায় যাত্রা করিত, সেই সময়ে শিশির কোথা হইতে আসিয়া কোন না কোন একটা দ্রব্য কলিকাতা হইতে আনিবার ভার তাহাকে অর্পণ করিত এবং অপরাহ্নে সে প্রত্যাগমন করিলে, স্বয়ং আসিয়া, তাহার নিকট হইতে উহা লইয়া যাইত।

** ** ** **

অনন্তলালের ঋণ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে আর পাত্রাপাত্র রহিল না। তিনি যাহার নিকট সুবিধা পাইতেন, তাহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেন। যখন দেখিলেন আর পরিশোধ করা দায় হইয়া পড়িবে তখনও নিবৃত্ত হইলেন না। শেষে সুদের পরিমাণ এত অধিক হইয়া পড়িল যে, তাঁহার সম্পত্তির আয় হইতে সংসার খরচ সঙ্কুলান করিয়া, সকল মহাজনকে সুদ দেওয়া হইত না, অথবা বাৎসরিক সুদ পরিশোধ করিয়া দিয়া, তাঁহার সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না।

ইহার উপর আবার চতুর্ভুজবাবুর পরামর্শে পাটের ব্যবসায় করিতে যাইয়া অনন্তলালকে যে নূতন দেনা করিতে হইয়াছিল, তাহার কুসীদ পরিশোধ করিতে তাঁহার আর্থিক অবস্থা

অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার পুরাতন মহাজনেরা উহা আর যথাসময়ে পাইত না। তাহাদিগের কর্ম্মচারীরা তাগাদা করিতে আসিতে আরম্ভ করিল। তিনি প্রথমে মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে শান্ত করিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন। শেষে আর মিষ্ট কথায় হয় না, তাহারা নালিশ করিতে উদ্যত হইল। তখন তিনি কলিকাতায় যাইয়া, মহাজনদিগের সহিত সাক্ষৎ করিয়া, অনুনয় বিনয় দ্বারা তাঁহাদিগকে শান্ত করিতে লাগিলেন। হরিশ সাহা ও বিপিনবাবু তাঁহার অনুগামী হইতেন। অনুনয়াদি যাহা যাহা করিতে হইত, এই দুইজন করিত। তিনি কেবল বসিয়া থাকিতেন।

এই দুঃসময়ে এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তলালের জামাতা রসরাজ একদিন কলিকাতায় থিয়েটার শুনিতে যাইয়া, দুইখানি নূতন গান লিখিয়া আনিয়াছন। কিন্তু রতনপুরে আসিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত চেষ্টা করিয়াও গান দুইটীর সুর আদায় করিতে পারিলেন না। তখন পরামর্শ স্থির হইল যে, পুনরায় একদিন বন্ধুদিগের সহিত ঐ পালা দেখিতে যাইয়া সুর স্থির করিয়া আসিবেন। কিন্তু সে পালা প্রতিবার হয় না। একদিন খবরের কাগজে দেখিলেন পরের শনিবারে ঐ নাটক পুনরায় অভিনীত হইবে। কিন্তু এ কার্য্য অর্থ বিনা সম্পন্ন হইবার নহে। অনন্তলালের তহবিলে আজিকালি সর্ব্বদাই অর্থের অভাব। অতএব থিয়েটারে যাইবার দুইদিন পূর্ব্বে রসরাজ খাজাঞ্চীকে বলিলেন যে, শনিবারে তাঁহার কিছু টাকার প্রয়োজন। খাজাঞ্চী বলিলেন যে, যদিও তাঁহার নিকট টাকা নাই, তথাপি উহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা তিনি করিবেন। শনিবার প্রাতঃকালে রসরাজ পুনরায় খাজাঞ্চীর নিকট টাকা চাহিলেন কিন্তু পাইলেন না। টাকা সংগ্রহ খাজাঞ্চী করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ অনন্তলাল তাহা লইয়া খরচ করিয়াছেন। সুতরাং সেদিন থিয়েটারে যাওয়া হইল না।

রসরাজ নদে জেলার ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায়দিগের বংশসম্ভূত। পূর্ব্বে তাঁহারা জমিদার পদবাচ্য ছিলেন। তাঁহার পিতাও চাকুরী না করিয়া, জমিদারীর আয় হইতে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়া গিয়া ছিলেন। রসরাজেরা দুই সহোদর। তাঁহার অগ্রজ কৃষ্ণনগরের আদালতে সেরেস্তাদারের কার্য্য করিতেন। তথায় জ্যেষ্ঠের নিকট অবস্থিত করিয়া, রসরাজ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। তথায় তিনি এক-এ পাশ করিয়া, কলিকাতায় আসিয়া বি-এ,

পড়িতেছেন সেই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর হইতে তিনি রতনপুরে অনন্তলালের বাটীতে বাস করিতেছেন।

রতনপুরে আসিয়া, রসরাজ কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। কিন্তু সে অধিক দিনের জন্য নহে। তিনি ভাবিলেন, আর পড়াশুনা করিয়া এ সুখের ব্যাঘাত জন্মান বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অতএব কিছুদিনের মধ্যে কলেজ ও সেই সঙ্গে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিলেন। রতনপুরে তাঁহার মনোমত বন্ধুবান্ধবের অভাব হইল না। তাহাদিগের সহিত তিনি আনন্দ সাগরে ভাসমান হইলেন।

নিজ আর্থিক অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতেছে দেখিয়া, অনন্তলাল বহুচেষ্টায় ও অনেক অর্থব্যয়ে কলিকাতায় রাইটার্স্ বিল্ডিঙ্গের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর দ্বারায়, তথায় জামাতার একটি ভাল কাজ করিয়া দিয়াছিলেন। কিছুদিন এই কার্য্য করিলে ভবিষ্যতে বিশেষ উন্নতি হইবার আশা ছিল। কিন্তু রসরাজের তাহা সহিল না। প্রতিদিন আফিস্ যাতায়াত করিয়া তাঁহার মাথা গরম হইতে লাগিল। তখন অনন্তলাল তাঁহাকে নিজ জমিদারী তত্ত্বাবধানের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সে কার্য্যও রসরাজ পারিয়া উঠিলেন না। এইবার অনন্তলাল হতাশ হইয়া তাঁহাকে কোনও কার্য্য করিতে বলিতেন না।

কিছুদিন পরে শ্বশুরের অভাব দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর হইতেছে দেখিয়া রসরাজ বুঝিতে পারিলেন যে, সকল সুখেরই শেষ আছে। তিনি ভাবিয়াছিলেন, জীবনের অবশিষ্ট কাল বসন্তের কোকিল হইয়া কাটাইবেন কিন্তু এখন দেখিলেন, তাঁহার এ বসন্ত অধিক দিন স্থায়ী হইবে না।

অদ্য সমস্ত ঠিক করিয়া অর্থের অনটনে কলিকাতায় যাওয়া হইল না দেখিয়া, বড়ই দুঃখ হইল। তিনি বন্ধুদিগের নিকট আপনাকে অপমানিত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। মুখ দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পতিপ্রাণা সরলার বিলম্ব হইল না। যে কয়টি টাকার প্রয়োজন তিনি তখন সংগ্রহ করিয়া, স্বামীর হস্তে দিতে গেলেন। কিন্তু রসরাজ আর তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি সেই দিন হইতে লোকের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। সরলা খাজাঞ্চীকে ডাকাইয়া অনেক অনুযোগ করিলেন। খাজাঞ্চী বলিলেন, জামাইবাবুর আদেশমত টাকার যোগাড় তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু অনন্তলালের

বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ উহা খরচ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার কোনও অপরাধ নাই।

এই ঘটনার অল্পদিন পরে, একদিন প্রাতঃকালে, হস্তী, ঘোড়া উষ্ট্র, গরু প্রভৃতি লইয়া, এক দল ঝুণ্ডু অর্থাৎ পশ্চিমদেশীয় অতিথি, অনন্তলালের সদরদরজায় উপস্থিত হইয়া, ভেরী ইত্যাদি বাজাইতে লাগিল। তিনি তাঁহার দলবলসহ উপর হইতে নামিয়া যাইয়া দেখিলেন, প্রায় একশত জন পশ্চিমদেসীয় সন্ন্যাসী তাঁহার সদর দরজা দিয়া বহির্ব্বাটির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছে। তাঁহার বাটীতে অতিথি আসিলেই ভোজন করিতে পাইত সেইজন্য, এই প্রকার ঝুণ্ডুর দল ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার তথায় উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনিও তাহাদিগের ইচ্ছামত আহার্য্য প্রদান করিয়া তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এ বারেও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তাঁহার আদেশ অনুসারে ভাণ্ডারী বাজার হইতে ঘৃত, আটা, তরকারী দাইল মিষ্টান্ন ইত্যাদি আনয়ন করিয়া, তাহাদিগের ভোজনের আয়োজন করিয়া দিল। তখন মহোৎসবের ধূম পড়িয়া গেল।

রসরাজ উপরে তাঁহার ঘরের জানালা হইতে, এই ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক সমস্তই দেখিতে ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, অনন্তলালের বাটীতে অতিথির যে যে সম্মান আছে তাহাও তাঁহার নাই। অমনি মানসক্ষেত্রে অভিমান দ্বিগুণ হইয়া উঠিল, এবং সে দিন হইতে তাঁহার আহারনিদ্রা বন্ধ হইল। অনেক বুঝাইয়া স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করিতে না পারিয়া, সরলা ব্রজেন্দ্রকে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। ব্রজেন্দ্র যাইয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কোন ফলই হইল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া, রসরাজ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"এ Worldএ (পৃথিবীতে) আর আমার থাকতে ইচ্ছা নাই।

এই বলিয়া তিনি উন্মত্তের ন্যায় হাত পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। ব্রজেন্দ্র কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। রসরাজের দুই তিনজন বন্ধু তথায় উপস্থিত থাকিয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিল। তাহারা তাঁহাকে উন্মত্ত স্থির করিয়া তথা হইতে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে এমন সময়ে অনন্তলাল তাহাদিগকে ডাকিতে পাঠাইলেন। তাহারা ত্রিতলে তাঁহার গৃহমধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিলে, তিনি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিহে এ ব্যাপার কি?"

সে বলিল "আজ্ঞে আজ জামাই বাবুর মনের অবস্থা বড়ই খারাপ হয়েচে। এ Worldএ তাঁর আর থাকতে ইচ্ছা নাই ব'লে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ্‌চেন।"

বিপিনবাবু বলিলেন, "এত সুখেও এ পৃথিবীতে থাক্‌তে ইচ্ছা নাই?"

অনন্তলাল বলিলেন, "পৃথিবীতে থাক্‌তে ইচ্ছা নাই ত যাবেন কোথা?" যদি স্বর্গের দেবতা হতেন, তা হলে এ পৃথিবীতে থাক্‌তে হ'তো না। তা যখন নন্, তখন পৃথিবী ভিন্ন আর গতি কি?"

হরিশ বলিল, "সে কথা থাক। এখন কিসে তাঁর মনটা ঠাণ্ডা হয়, তা আপনারা বলুন দিকি? মনের এরূপ অবস্থারইবা কারণ কি?"

রসরাজের বন্ধু বলিল, "মাঝে একদিন কলিকাতায় থিয়েটার শুন্‌তে যাবার স্থির করে খাজাঞ্চী বাবুর কাছে টাকা চেয়ে পেলেন না; সেই দিন থেকে মনের এই রকম গোলমাল হয়েচে।"

অনন্তলাল বলিলেন, "কই, আমি ত তার কিছুই জানি না। খাজাঞ্চীর কাছে টাকা না ছিল আমাকে বলে পাঠালেই দিতাম।"

"লজ্জায় আপনাকে বল্‌তে পারেন নি।"

"তার আর লজ্জা কি? আবার থিয়েটার কবে হবে? আজ কি বার?"

"আজ সোমবার। আবার থিয়েটার ত বুধবারে হবে। কিন্তু যে পালা দেখ্‌বার জন্যে সেদিন যেতে চাচ্ছিলেন, তা বোধ হয় সে দিন হবে না।"

"সে পালা কবে হবে, খবরের কাগজে দেখ ত, লিখেচে কি না।"

তখনি সংবাদপত্র আসিল। তাহাতে দেখা গেল, আগামী শনিবারে ঐ নাটক পুনর্ব্বার অভিনীত হইবে। তখন অনন্তলাল বলিলেন,—"তোমরা বাপু আর একবার তার কাছে যাও, গিয়ে যাতে স্নানাহার করে তাই করগে। শনিবারে যখন থিয়েটারে যাবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ আমার কাছে এসো, এসে য টাকার দরকার হবে, আমাকে বলে পাঠালেই আমি পাঠিয়ে দেব।"

হরিশ সাহা বলিল,—"চলুন আপনাদের সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।"

অনন্তলাল বলিলেন,—"না, তুমি এখন যেও না, ওরা যা হয় করুগ্ গে।"

রসরাজের বন্ধুগণ তখন আর অপেক্ষা না করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট গমন করিল। তখন বিপিনবাবু হরিশের দিকে একবার কটাক্ষ করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"সকল তাতেই অভাক্-মুচ্ছু দিগ্গিরি।"

বোধহয় তাঁহার এই অস্ফুটস্বর হরিশের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল। সে তাঁহার দিকে একবার তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, আর কিছু বলিল না।

অনন্তলাল বিপিনবাবুকে বলিলেন,—"এ এক গ্রহ হয়েচে। মেয়েটাও মোলো। যে দিন থেকে এই রকম করচে সেই দিন থেকে তারও আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়েচে। শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেচে।"

বিপিনবাবু বলিলেন,—"কি বিপদ!"

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে—এমন সময়ে ডাকহরকরা যাইয়া একখানি রেজেষ্টারি পত্র অনন্তলালের হস্তে দিল। তিনিও নিয়মত নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিয়া, পত্র উন্মোচন পূর্ব্বক মনে মনে পাঠ করিতে লাগিলেন। হরকরা চলিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পত্রখানি কিছু দূর পাঠ করিয়া, অনন্তলাল বলিয়া উঠিলেন,—"স্বামীজী রতনপুর আস্চেন। আগামী কল্য রাত্রের ট্রেণে এসে পঁহুছিবেন। তাঁর জন্যে একটি ঘর পরিষ্কার করে প্রস্তুত রাখতে হবে।"

তখন কোন্ ঘরটি পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহাই নির্ণয় করিতে সকলে ব্যস্ত হইল।

অনন্তলাল পুনরায় পত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। উহা শেষ হইলে বালিশের নিম্নে রাখিয়া দিয়া, বিপিনবাবুকে বলিলেন,—"ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ের চন্দ্রহাট নামক ষ্টেসন হতে ছ ক্রোশ দূরে এক গভীর বন আছে, এই বন চতুর্দ্দিকে পাঁচ ছয় ক্রোশ। সেই বনের মধ্যে এক মহাত্মা আছেন। স্বামীজী লিখেছেন, ইনি আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত সাতজন অমরের মধ্যে একজন। এঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই স্বামীজী এদেশে আস্চেন। আমাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে হবে।"

হরিশ বলিল,—"আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।"

অনন্তলাল বলিলেন,—"না একজন চাকর গেলেই হবে।"

বিপিনবাবু বলিলেন,—"হরিশ, তুমি গিয়ে কি করবে? তুমি ওঁদের কথাবার্ত্তার কি বুঝবে?"

হরিশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে কহিল,—"মশায়, আপনাকে ত আমি বলি নি, আপনি কেন লাফিয়ে উঠ্‌চেন?"

বিপিনবাবু অনন্তলালের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কথার শ্রী দেখলেন? তা হবেই যে। মোরগের মুখে কি কোকিলের ডাক বেরোয়?"

হরিশ বলিল,—"আপনি হচ্ছেন বসন্তের কোকিল—যেখানে বসন্ত পান, সেইখানে গিয়ে কুহুকুহু ডাক ছাড়েন, আমরা তা পারি না।"

অনন্তলালের অনেক কার্য্যে হরিশ সাহা দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার জন্য টাকার যোগাড় করা মহাজনদিগকে নিরস্ত রাখা প্রভৃতি ব্যাপারে হরিশই তাঁহার প্রধান সহায়। তাহাকে সন্তুষ্ট রাখা তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। অতএব তিনি বলিলেন,—"হরিশ, ঝগড়ায় কাজ কি? দেখি, যদি দরকার হয় তোমাকেও নিয়ে যাব।"

পরে স্বামীজীর জন্য ঘর পরিষ্কার করিবার ধুম পড়িয়া গেল। তাঁহার সেবার জন্য দুইজন নূতন ভৃত্য নিযুক্ত করিতে অনন্তলাল ভাণ্ডারীকে আদেশ করিলেন।

পর তারিখে রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময়ে বাটীর কম্পাস গাড়ী ষ্টেসন হইতে স্বামীজীকে লইয়া সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। একজন দ্বারবান তাড়াতাড়ি উপরে অনন্তলালকে সংবাদ দিতে গেল। তিনিও দ্রুতগতি নামিয়া যাইয়া গাড়ীর পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তন্মধ্য হইতে Statesman নামক ইংরাজী সংবাদপত্র হস্তে স্বামীজী বাহির হইলেন। স্বামীজীর বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর বর্ণ গৌর আকৃতি কিঞ্চিৎ হ্রস্ব, পরিধানে গোলাপী রংয়ের ভাল সিল্কের আলখেল্লা পদদ্বয়ে পশ্চিম দেশীয় উৎকৃষ্ট নাগরা জুতা, গোঁফদাড়ি কামানো মস্তকে কেশ আছে, কিন্তু তাহা অতিশয় দীর্ঘ নহে। কেশ মধ্যে একটি সরু সিঁথি আছে।

হিন্দু সন্ন্যাসীর হস্তে ইংরাজী খবরের কাগজ শুনিয়া, পাঠক মহাশয়ের বিস্ময়াদৃশ মনে হইতে পারে। কিন্তু স্বামীজী কেবল সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াই জ্ঞানী হন নাই। ইংরাজী ভাষা

এবং ইংরাজী বিদ্যাও ভাল জানেন। পরন্তু ইনি একজন বিলাত-প্রত্যাগত সন্ন্যাসী ; প্রথম যৌবনে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন। তথায় ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন কিনা সে সম্বাদ আমরা অবগত নহি। তবে, আমরা জানি দেশে প্রত্যাগমন করিয়া, কিছুদিনর মধ্যে সংসার ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র ও ইংরাজী কবিদিগের গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়া, অনন্তলালের ধারণা হইয়াছিল যে, আজিকার বাজারে কেবলমাত্র সংস্কৃতশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেই মানুষ জ্ঞানী হইতে পারে না। ইংরাজী জানিবারও বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ইংরাজীতে জ্ঞান না থাকিলে, সংস্কৃতশাস্ত্রের সূক্ষ্ম মীমাংসা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সকল উপলব্ধি করিবার শক্তি হয় না। পরন্তু কেবলমাত্র সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অনেক ভ্রান্ত মতের পক্ষপাতী হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ দুই ভাবের ভাবী ব্যক্তি যে মত গ্রহণ করে তাহা অভ্রান্ত। তাঁহার স্বামীজী সংস্কৃতজ্ঞ, ইংরাজীতে পণ্ডিত, তাহাতে আবার বিলাত প্রত্যাগত, তিনি সংস্কৃতের সহিত ইংরাজী বুকনি ভিন্ন কথা কহেন না, অনন্তলালকে যে সকল পত্র প্রেরণ করেন তাহার মধ্যে মধ্যে দুই চারি ছত্র ইংরাজী থাকে এবং ইংরাজী সংবাদপত্র ভিন্ন তিনি থাকিতে পারেন না। ইঁহার সহিত আলাপ হইবার পর অনন্তলাল দেখিলেন, তিনি যাহা খুজিতেছেন, এভাণ্ডে সে সমস্তই বর্ত্তমান। এইবার তিনি মনের মানুষ পাইয়াছেন। তখন হইতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া এই মনের মানুষের শরণাপন্ন হইলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীনলিনীনাথ গুপ্ত।
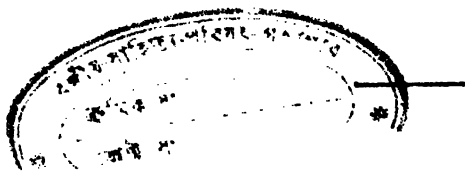
খোকার-হাসি ।

খোকার হাসিটি
স্বর্গ-অলকার হেম-মন্দার ফুল,—
(এ যে) ক্ষণে ক্ষণে হয়
শরৎ ঋতুর জ্যোৎস্না বলিয়া ভুল !
জুঁই-কুঁড়ি দু'টি লালচে পাতায়,
সাজায়ে রেখে কে মনটি মাতায়,—
কি দিয়ে এ হাসি গড়ল ধাতায় ?
শীতলতা বিলকুল !

আয় তোরা সব
দেখে যা হেথায়,—প্রবালের পাশ ঠিক
দুধ-দাঁত ক'টি
উজ্জল মোতি চমকে রে ঝিক্‌মিক্ !
চেয়ে চেয়ে আমি দেখেছি খানিক,
ফাটিয়া অধর গলিছে মাণিক,—
যার যাহা খুশী সে আজ তা' নিক্,
আমি নিই রাঙা গুল !

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ।

বৌদ্ধ-দর্শন

বৈভাষিক।

(৫)

কিরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বৈভাষকগণ তাঁহাদের মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন এখন তাহাই দেখা যাউক। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি বিজ্ঞানবাদী যোগাচারগণের মতে

যোগাচার মত। বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব নাই, এক অন্তর্জ্জগতেরই অস্তিত্ব আছে। এই অন্তর্জ্জগত হইল একটি স্রোত স্বরূপ এবং এই স্রোত নানাবিধ অনুভূতি বা Sensation দ্বারা গঠিত। এবং সেই শক্তিকেই আমারা চিন্তা শক্তি বলি যদ্বারা অনুভূতি বা Sensations এর (বেদনার) উত্থাপন মনোস্রোতের মধ্যে সম্ভাবিত

জ্ঞানস্রোত ও জলস্রোতের তুলনা। হয়। সুতরাং মন হইল Stream বা জলস্রোত, বেদনা, অনুভূতি বা Sensation হইল ঐ স্রোতের জল। এবং ঐ অনুভূতি বা Sensation, এর কর্ত্তা হইল ideation বা চিন্তাশক্তি, কোন বহির্জ্জাগতিক বস্তু নয়।

এই চিন্তাশক্তি সর্ব্বদাই আপনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যগ্র, অর্থাৎ ইহা যখনই অন্তর্জ্জগতে উপস্থিত হয় তখনই ইহার ফল, কার্য্য বা effectএর আবির্ভাব হয়। সুতরাং চিন্তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কার্য্য বা অনুভূতির আবির্ভাব হয়। সুতরাং এই ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি সমূহের কারণ বা কর্ত্তা হইল উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মানসিক অবস্থা বা চিন্তা। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই আন্তর্জ্জাগতিক মানসিক অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নাই। সুতরাং দেখা গেল যোগাচারগণের মতে একটি মানসিক অবস্থা পরবর্ত্তী মানসিক অবস্থার কারণ। যদি ক—খ—গ—ঘ—ঙ—চ············মানসিক স্রোত বলিয়া কল্পনা করি তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় 'চ'এর কারণ ঙ, 'ঙ'এর কারণ ঘ, 'ঘ'এর গ············। সুতরাং এই সকল ক্ষণস্থায়ী মানসিক অবস্থার প্রত্যেকটিরই কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক মানসিক অবস্থা হইতেই নূতন অনুভূতি বা বেদনা অন্তর্জ্জগতে উপস্থিত হইতে পারে। যদি ইহাদের কোন

একটির কার্য্যকারণত্ব অস্বীকার করা যায় তাহা হইলে সমগ্র মানসিক অবস্থার কার্য্যকারণত্ব অস্বীকার করিতে হয়। কারণ, উহারা জ্ঞানস্রোতের এক জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, বা একই রকম শক্তিশালী বিভিন্ন অবস্থা। এই সম্পর্কে আরও বলা যাইতে পারে যে কোন একটি অবস্থার কার্য্যকারণত্ব অস্বীকার করিলে সমগ্র জ্ঞানস্রোত বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং জ্ঞানস্রোত স্বীকার করিলে প্রত্যেক মানসিক অবস্থারই কার্য্যকারণত্ব আছে স্বীকার করিতে হয়। যদি বলা যায় প্রত্যেক মানসিক অবস্থারই কার্য্যকারণত্ব আছে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কোন বৈষম্য বা পার্থক্য থাকা স্বীকার করা যায় না, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রত্যেক মানসিক অবস্থাই (চিন্তা বা ideation) একই প্রকারের, সুতরাং তাহাদের কার্য্যও এক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা জানি ঐ সকল কার্য্য অর্থাৎ বেদনা বা অনুভূতি নানা প্রকারের। সুতরাং যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও স্বীকার করিতে হয় যে ক্ষণস্থায়ী

যোগাচার মত খণ্ডন। বিভিন্ন প্রকারের মানসিক অবস্থা (অনুভূতি বা বেদনা) যথা শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, বর্ণজ্ঞান, রসজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান এবং সুখ দুঃখজ্ঞান চারি রকমের কারণ দ্বারা সম্ভাবিত হয়। [ছয় রকম কারণ না বলিয়া কেন যে চারি রকম কারণের কথা বলা হইল তাহা বুঝা গেল না। পূর্ব্বের যুক্তি অনুসারে ছয় রকম কারণই স্বীকার করিতে হয়]।

সুতরাং যোগাচারগণের ন্যায় কেবল মাত্র জ্ঞান স্বীকার করিলেও ঐ জ্ঞানের বিভিন্ন অবস্থার জন্য আমাদিগকে বাধ্য হইয়া চতুর্ব্বিধ কারণ স্বীকার করিতে হয়।

জ্ঞানের চতুর্ব্বিধ কারণ। জ্ঞানের প্রথম কারণ হইল মন অথবা মনের কোন একটি সুপ্ত অবস্থা (data)। এই অবস্থার সহিতই জ্ঞানের নিকটতম সম্পর্ক। কিন্তু এই সুপ্ত অবস্থা হইতে জ্ঞান জন্মিতে পারে না যদি চিন্তাশক্তি বা মেধাশক্তি (Suggestion) ঐ সুপ্ত অবস্থা বা dateকে জাগাইয়া না তোলে। এই মেধাশক্তি এবং সুপ্ত অবস্থার সংযোগেও কোন জ্ঞান সম্ভবপর হয় না যদি উহারা রূপ, রস, গন্ধ, আলো ইত্যাদি মধ্যবর্ত্তী, বা mediumএর সাহায্য প্রাপ্ত না হয়। কিন্তু এই সুপ্ত চিৎশক্তি (data) মেধাশক্তি (Suggestion) এবং মধ্যবর্ত্তী (medium) এই তিনের সাহায্যেও জ্ঞান লাভ সম্ভবপর হয় না যদি উহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কোন ইন্দ্রিয় বিশেষের সাহায্য প্রাপ্ত না হই। সুতরাং বৈভাষিকগণের মতে জ্ঞানের

জন্য আমাদের সুপ্ত চিৎ শক্তির (data) প্রয়োজন, মেধাশক্তি বা Suggestionএর প্রয়োজন, মধ্যবর্ত্তী বা mediumএর প্রয়োজন এবং ইন্দ্রিয় বিশেষ বা dominantএর প্রয়োজন।

এই চতুর্ব্বিধ কারণের দিক হইতে এখন দেখা যাক আমরা কেমন করিয়া নীলবর্ণের জ্ঞান লাভ করি। যে মানস রাজ্য নীল রংএর জ্ঞান সমুদ্ভাসিত হয় সেই মানসরাজ্যে নীলবর্ণ সমন্বিত একটি সুপ্ত অবস্থা আছে যাহা হইতে এই নীল বর্ণের জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু নীলবর্ণ সমন্বিত সুপ্ত অবস্থা চিরকালই সুপ্ত অবস্থায় থাকিত যদি মেধা শক্তি ঐ সুপ্ত অবস্থাকে জাগ্রত না করিত। কিন্তু এই মেধা শক্তি ঐ নীলবর্ণ সমন্বিত সুপ্ত অবস্থাকে কিছুতেই জাগাইতে পারিত না যদি উহা আলোকরূপ মধ্যবর্ত্তীর সাহায্য না পাইত। সুতরাং এই আলোকরূপ মধ্যবর্ত্তীর কার্য্য হইল মেধাশক্তিকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে প্রণোদিত করা। এই মধ্যবর্ত্তীর সাহায্য না পাইলে মেধাশক্তি নীলবর্ণ সমন্বিত সুপ্ত অবস্থাকে না জাগাইয়া অন্য যে কোন সুপ্ত অবস্থাকে জাগাইতে পারিত। সুতরাং বিশিষ্ট জ্ঞানের জন্য মধ্যবর্ত্তীর নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু চক্ষু, এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না পাইলে মধ্যবর্ত্তী আলোক আনিয়া মেধাশক্তিকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে প্রণোদিত করিতে পারে না। সুতরাং বুঝা গেল আলোক চক্ষুর মধ্য দিয়া মেধাশক্তিকে আঘাত করে এবং এই আঘাতের জন্য মেধাশক্তি নীলবর্ণ সমন্বিত নির্দ্দিষ্ট সুপ্ত মানসিক অবস্থাকে জাগাইয়া তোলে, এবং সেইজন্য আমাদের মানসপটে নির্দ্দিষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট নীলবর্ণ জ্ঞান জন্মে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে Dominant বা 'কারণ' বলা হয়, কারণ উহাদের দ্বারাই বিশিষ্ট জ্ঞান সম্ভাবিত হয়। যাহার কার্য্য কারণত্ব আছে তাহাকেই কারণ বলা হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারণত্ব আছে। সুতরাং উহাদিগকে কারণ বলাই সঙ্গত।

নীলবর্ণের চতুর্ব্বিধ কারণ।

সুতরাং বুঝা গেল বৈভাষিকগণের মতে সুখাদি ষড়বিধ জ্ঞান দ্বারা মনোজগত গঠিত এবং ঐ ষড়বিধ জ্ঞানের প্রত্যেকটির জন্য চতুর্ব্বিধ কারণ স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। এই চতুর্ব্বিধ কারণের মধ্যে মানসিক সুপ্ত অবস্থা (Data) ও মেধাশক্তি (Suggestion) অন্তর্জগতের এবং মধ্যবর্ত্তী (Medium) ও ইন্দ্রিয় (Dominant) বহির্জগতের।

ষড়বিধ জ্ঞান দ্বারা মনোজগত গঠিত।

বিশ্ব পঞ্চ ভাগে বিভক্ত।

মন এবং মানসিক অবস্থা সমন্বিত বিশ্ব পঞ্চ ভাগে বিভক্ত যথা,—(১) রূপ-স্কন্দ বা বা রূপ-রস-গন্ধ শব্দ-স্পর্শময় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগত অথবা The world of sensations. (২) বিজ্ঞানময় জগত অথবা The world perceptions. (৩) সুখ দুঃখাদি সমন্বিত বেদনাময় জগত অথবা The World affections. (৪) শব্দময় বা বাঙময় জগত অথবা The verbal world এবং (৫) দুঃখ কষ্টাদি পরিপূর্ণ তৃষ্ণা ও কর্ম্মময় জগত অথবা The imprssional world. [The world of desire and will বলিলে The world of affection হইতে জগতের এই অংশের তারতম্য সহজেই বোধগম্য হইত !]

এই পঞ্চবিভাগীয় জগতের মধ্যে রূপময় জগত বলিতে আমরা ইন্দ্রিয় গ্রাম এবং ঐ সকল বস্তুরূপ আমরা ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে ব্যতিরেক বুঝিতে পারি না। বিজ্ঞানময় জগত বলিতে আমরা জ্ঞানময় স্রোত এবং তন্মধ্যস্থিত মানসিক অবস্থা নিচয় ও কার্য্যকারণত্বময় বস্তু সমূহের জ্ঞান বুঝি। উপরোক্ত রূপময় জগত ও জ্ঞানময় জগতের সংঘাতে মনো মধ্যে যে সকল সুখ দুঃখাদি বেদনা অনুভূত হয়, বেদনাময় জগত বলিতে আমরা ঐ সকল সুখ দুঃখাদি বেদনা বুঝি। বাঙ্ময় জগত বলিতে আমরা গো প্রভৃতি অর্থবোধক শব্দ সমূহ বুঝি। তৃষ্ণা ও কর্ম্মময় জগত বলিতে দুঃখ কষ্টাদি পরিপূর্ণ নানা প্রকার ইচ্ছা ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঘৃণা, গর্ব্ব, অহংকার, পাপপুণ্য ইত্যাদি বুঝি। এই সকল লোভ মোহ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বেদনাময় জগত এবং তৃষ্ণা-কর্ম্মময় জগতের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

ইহাই হইল বৈভাষিকগণের মনোবিজ্ঞান বা Psychology.

দুঃখ বাদ।

এই জগত দুঃখ পূর্ণ, দুঃখের আলয় এবং দুঃখের এই কথা বারম্বার চিন্তা করিয়া যে সমস্ত উপায় ও নিয়ম দ্বারা ঐ দুঃখের নিরোধ করা যাইতে পারে তাহা সকলের পক্ষেই জানা কর্ত্তব্য। এই জন্যই প্রাচীন বৌদ্ধগণ কহিয়াছেন বুদ্ধদেব দুঃখের কারণ ধ্বংস বা নিরোধ করিবার জন্য ভিক্ষুগণকে চারিটি নিয়ম ব উপায়ের কথা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের দুঃখ নিবৃত্তি, তৃষ্ণা বিনাশ বা নির্ব্বাণ প্রাপ্তির কথা আমরা চার্ব্বাক ও বুদ্ধ নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি।

দুঃখের বিষয় আমরা সকলেই অবগত আছি। দুঃখ সমুদয় বলিতে বৌদ্ধগণ দুঃখের কারণ বুঝেন। এই দুঃখের কারণ দ্বিবিধ। একটি হইল সংযোগ, অপরটি হইল কার্য্যকারণত্ব। যখন দুই কিম্বা বহু বস্তু বা ঘটনা বিশেষের একত্র সংযোগের জন্য দুঃখ উৎপন্ন হয় তখন আমরা সংযোগ কারণের সাক্ষাৎ লাভ করি। আর যখন কোন একটি বস্তু বা বিষয় হইতে দুঃখ সৃষ্ট হয় তখন আমরা কার্য্য-কারণত্বের সাক্ষাৎ লাভ করি।

দুঃখ সমুদায়।

কারণ কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈভাষিকগণ বলেন কোন কার্য্যের কারণ সাব্যস্ত করিতে হইলে দেখিতে হইবে অন্য কোন বিষয় বা বস্তু দ্বারা কার্য্যেটি সম্পন্ন হইতে পারে কি না। যদি দেখি নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা বস্তু সমূহের সমাবেশ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বা বিষয় কার্য্যটি সম্পাদন করিতে পারে না তখনই কেবল আমরা ঐ নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা বিষয় সমূহের সমাবেশকে ঐ কার্য্যের প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। সুতরাং দেখা গেল বৈভাষিকগণ Plurality of causes বা কারণের বহুলত্ব মানেন না। বৈভাষিকগণের মতে কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত কোন জ্ঞান বুদ্ধির প্রয়োজন নাই। কারণ কার্য্যটি সম্পাদন করিব এইরূপ জ্ঞান ও ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া 'কারণ' কার্য্য সম্পাদন করে না, তদ্রূপ কার্য্যটিও জানে না। যে সে তাহার 'কারণ' ইহাতে উৎপন্ন হইতে যাইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বৈভাষিকগণ কহিয়াছেন—বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইবার নিমিত্ত ছয়টি বস্তুর সমাবেশের প্রয়োজন। (১) প্রথমতঃ মৃত্তিকার প্রয়োজন কারণ মৃত্তিকা হইতেই অঙ্কুর দৃঢ়তা ও গন্ধ প্রাপ্ত হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ জলের প্রয়োজন কারণ জল হইতেই অঙ্কুর নমনীয়তা ও রস প্রাপ্ত হয়। (৩) তৃতীয়তঃ আলোকের প্রয়োজন, কারণ আলোক হইতেই অঙ্কুর বর্ণ ও উত্তাপ প্রাপ্ত হয়। (৪) চতুর্থতঃ বায়ুর প্রয়োজন কারণ বায়ু হইতেই অঙ্কুর স্পর্শ ও গতি প্রাপ্ত হয়। (৫) পঞ্চমতঃ ব্যোমের প্রয়োজন, কারণ ব্যোম হইতেই অঙ্কুর বৃদ্ধি ও শব্দ প্রাপ্ত হয়। (৬) ষষ্ঠতঃ ঋতুর প্রয়োজন, কারণ ঋতু কর্ত্তৃকই বীজের উপযুক্ত ক্ষেত্রী প্রস্তুত হয়। সুতরাং

কার্য্যকারণত্ব।

কার্য্যকারণত্বের মধ্যে জ্ঞানের প্রভাব আছে কি না।

বীজ ও অঙ্কুরের উদাহরণ।

বুঝা গেল ষড়বিধ বস্তুর সংযোগের জন্য বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে। এই সংযোগের মধ্যে জ্ঞানের কোন স্থান নাই। এই উদাহরণ হইতে আমরা আরও জানিলাম যে বৈভাষিকগণ জানিতেন যে আলোক হইতেই বর্ণ উৎপন্ন হয়।

যে কার্য্যকারণত্বে সংযোগ নাই, যাহাতে একটি বস্তু হইতেই কার্য্য সম্ভাবিত হয় তৎসম্বন্ধে বৈভাষিকগণ কহিয়াছেন যে ঐরূপ কারণ আমরা দুই রকমে সাব্যস্ত করিতে পারি। (ক) যখন দেখি কোন বস্তুটি কার্য্যটি সম্পন্ন হইতেছে তখনই ঐ বস্তুটিকে ঐ কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। (খ) আবার যখন দেখি কোন বস্তুর অভাবের জন্য কার্য্যটি সম্পন্ন হইতেছে না তখনই ঐ বস্তুটিকে কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। বৈভাষিকগণ এই সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন যে যদি কোন বস্তু এবং কার্য্যের মধ্যে কার্য্যকারণত্ব বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে বরাবরই ঐ বস্তুটি ঐ কার্য্যের কারণ রহিবে, অর্থাৎ যখনই ঐ বস্তুটি বিদ্যমান দেখিব তখনই উহা হইতে ঐ কার্য্যটি সম্পন্ন হইতেছে দেখিতে পাইব। আবার যখনই ঐ কার্য্যটিকে বিদ্যমান দেখিব তখনই দেখিতে পাইব যে উহা ঐ বস্তু হইতে উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং 'ক' যদি 'খ'এর কারণ হয় তাহা হইলে 'ক' থাকিলেই খ' থাকিবে এবং 'খ' থাকিলেই 'ক' থাকিবে। উভয়ের বিচ্ছেদ কখনই সম্ভবপর হইবে না। এখানেও প্রশ্ন উঠিতে পারে এইরূপ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত কোন জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন কিনা অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতীত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে কিনা? ইহার উত্তরে বৈভাষিকগণ বলিয়াছেন কার্য্যকারণত্বের মধ্যে জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ উপস্থিত হইলেই যখন কার্য্য সম্পন্ন হইতে বাধ্য তখন কার্য্যের জন্য জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং বৈভাবিকগণের মতে কার্য্যকারণত্ব rational নয় mechanical. উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা কহিয়াছেন—বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে অঙ্কুর হইতে শাখা জন্মে, শাখা হইতে ফাঁপা শীশ্ জন্মে, এই শীশ হইতে কুঁড়ির উদ্ভব হয়, কুঁড়ি হইতে পাঁপড়ী ইত্যাদি জন্মে, পাঁপড়ী হইতে ফুল জন্মে এবং ফুল হইতে ফল উৎপন্ন হয়। ইহাদের কোনটার মধ্যেই ফল উৎপন্ন হওয়ার জ্ঞান নাই। আবার ফলের মধ্যেও এ জ্ঞান নাই

কার্য কারণত্বের দ্বিতীয় প্রকার।

এই প্রকার কার্য্যকারণত্বের মধ্যে জ্ঞানের স্থান।

যে সে বীজ প্রভৃতি বস্তু হইতে উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং বহির্জগতস্থিত বিষয়ের কার্য্যকারণত্বে কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। অন্তর্জগতস্থিত বিষয় সমূহও দুই প্রকার কারণ দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। যথা—(ক) বহু বিষয়ের সংযোগ এবং (খ) একটি বিষয়ের আবির্ভাব। কিন্তু মাধবাচার্য্য এ বিষয়টির কোন ব্যাখ্যা দেন নাই।

দুঃখের যে দ্বিবিধ কারণের কথা বলা হইয়াছে ঐ দ্বিবিধ কারণ ধ্বংস বা নিরোধ করিলেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুঃখের দ্বিবিধ কারণ ধ্বংস হইলেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়। সুতরাং নির্ব্বাণ বলিতে আমার দুঃখের দ্বিবিধ কারণের ধ্বংস এবং তজ্জনিত বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ বুঝি। দুঃখের কারণ ধ্বংস করিবার কয়েকটি উপায় পথ বা যান আছে। এই উপায় অবলম্বন করিলে দুঃখ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধদেব নির্দ্দিষ্ট মহাসত্য সমূহ এবং তজ্জনিত জ্ঞানরাশিই দুঃখের দ্বিবিধ কারণ ধ্বংসের (একমাত্র) উপায়, পথ বা যান বলিয়া করিয়াছেন। নির্ব্বাণ সম্বন্ধে মাধবাচার্য্য কেবলমাত্র ইহাই বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবের জনৈক শিষ্য তাঁহার নির্ব্বাণ সম্বন্ধীয় সূত্রের অন্তিম তাৎপর্য্য বা মর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই শিষ্যটি সূত্রের অন্তিম তাৎপর্য্য বা ধর্ম্ম অভিলাষী এই জন্য সকলে তাহাকে সৌত্রান্তিক এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। এই নামোৎপত্তি কাহিনী বোধ হয় যথার্থ নহে। সকল বিষয়েই সৌত্রান্তিকগণ বুদ্ধদেবের বাণী বা সূত্র মানিয়া চলিতেন এবং ঐ সকল সূত্র হইতে সকল বিষয় মীমাংসা করিতেন এই জন্য তাঁহাদিগকে সৌত্রান্তিক বলা হইয়া থাকে বলিয়া আমরা জানি।

নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ লাভের উপায়। সৌত্রান্তিক নাম হইল কেন।

বর্ণ রস গন্ধ ইত্যাদি সমন্বিত জগতের অস্তিত্ব থাকা সত্বেও কতিপয় বৌদ্ধ (মাধ্যমিক) এই জগতের প্রতি অবিশ্বাস উদ্রেক করিবার জন্য ঘোষণা করিয়াছিলেন জগত শূন্যময়, অর্থাৎ অন্তর্জগত বা বহির্জগত বলিয়া কিছুই নাই। বুদ্ধদেব এই সকল শিষ্যকে প্রাথমিক শিষ্য এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি এই সকল বৌদ্ধগণ মাধ্যমিক সম্প্রদায় ভুক্ত। আর এক সম্প্রদায় বৌদ্ধ আছেন যাঁহাদের মতে কেবল জ্ঞানময় জগতই সত্য। বহির্জগত ইহাদের মতে শূন্যময় বা অসত্য। আমরা দেখিয়াছি ইহারা যোগাচার নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আর এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় অন্তর্জগত ও বহির্জগতের সত্যতা স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে বহির্জগতের অস্তিত্ব

বৌদ্ধদর্শনের চতুর্বিধ শাখা।

জ্ঞানময় জগতের উপর নির্ভর করে। আমরা দেখিয়াছি এই বৌদ্ধ সম্প্রদায় সৌত্রান্তিক এই নামে বিখ্যাত। অপর একটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে উল্লিখিত তিনটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতই ভ্রান্ত বা বিরুদ্ধ ভাষা সংযুক্ত। এই চতুর্থ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম বৈভাষিক। ইহাদের মতে বহির্জগত এবং অন্তর্জগত উভয়ই সত্য। বহির্জগত আপনার অস্তিত্বের জানা এ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না।

নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বৈভাষিকগণ সৌত্রান্তিকগণের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সৌত্রান্তিকগণের মতে জ্ঞান হইতে আমরা বহির্জগত অনুমান করি।

সৌত্রান্তিক মত খণ্ডন। কিন্তু পূর্ব্বে যদি বহির্জাগতিক বস্তুর অনুভূতি মনের মধ্যে না থাকে তাহা হইলে বহির্জাগতিক বস্তু অনুমান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত বহির্জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব প্রথমতঃ স্বীকার না করিয়া উহার অস্তিত্ব অনুমান করা অসম্ভব ও অন্যায়। প্রত্যেক অনুমানের জন্যই সার্ব্বজনীন সত্য বা Universal truth এর প্রয়োজন। সর্ব্ব প্রথমে প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত বস্তু স্বীকার না করিলে এমন কোন বস্তু বা বিশেষ থাকে না যাহা হইতে কোন সার্ব্বজনীন সত্য পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং সৌত্রান্তিকগণ কোন সার্ব্বজনীন সত্য পাইতে পারেন না এবং সেইজন্য তাঁহাদের পক্ষে কোন অনুমানও সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং গোড়াতেই অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমেই আমাদিগকে অন্তর্জগত ও বহির্জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইন্দ্রিয় গ্রামের সাহায্যে আমরা বহির্জাগতিক বস্তু সমূহ অনুভব করি। সুতরাং অনুভূতি জ্ঞানের যন্ত্র স্বরূপ। কারণ উহা দ্বারা আমরা বহির্জাগতিক বস্তু সমূহ অবগত হই। এই অনুভূতি বিচার, বিশ্লেষণ

অনুভূতির স্বরূপ। অনুমান ইত্যাদি হইতে মুক্ত। ঠিক যে অবস্থায় বহির্জাগতিক বস্তুর আকৃতি ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় আমাদিগকে সেই অবস্থাকেই নির্বিচারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এই নির্বিচার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে গাফ মহোদয় aprehension আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং সৌত্রান্তিকগণের মতে বহির্জাগতিক বস্তু যে আমরা অনুমান দ্বারা অবগত হই তাহা বৈভাষিকগণের মতে অসত্য। বৈভাষিকগণের মতে আমরা বহির্জগত অনুমান দ্বারা জানি না, উহা আমরা প্রত্যক্ষ করি। শুধু জ্ঞান বা cognition দ্বারা আমরা বাহ্যজাগতিক বস্তু জানিতে পারি না কারণ

জ্ঞান নিজে অন্তর্জগতের বস্তু সুতরাং উহা কখনই বহির্জাগতিক বস্তুর প্রমাণ হইতে পারে না। বিজ্ঞানের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রত্যক্ষের মত নির্বিচারে কোন কিছু গ্রহণ করে না। কোন কিছু সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিজ্ঞান ভাল মন্দ সম অসম ইত্যাদি বিচার করিয়া দেখে। কিন্তু তথাপি ইহা বহির্জাগতিক বস্তুর চিত্র যথাযথ ভাবে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য বৈভাষিকগণের মতে বিচার সম্পন্ন জ্ঞান বুদ্ধি (=বিজ্ঞান) ভ্রান্তিময়। সেইজন্য বলা হইয়াছে—প্রত্যক্ষানুভূতি (বেদনা) নির্বিচারী।

হির্জাগতিক বস্তু আমরা ইহা ভাবনা চিন্তাময় জ্ঞান হইতে বিমুক্ত এবং অভ্রান্ত। সবিচারী ত্যক্ষ করি। অনুমান ভাবনা চিন্তা বা বিজ্ঞান বস্তু সমূহের বাহ্য দৃশ্য হইতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু রা উহা জান য য না। ঐ বস্তু সমূহ হইতে পৃথক জাতীয় হওয়ায় উহা ভ্রান্তিপূর্ণ, অর্থাৎ উহা হইতে আমরা বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারি না। বস্তু সমূহের অস্তিত্বের এবং স্বরূপের উপযুক্ত প্রমাণ হইল প্রত্যক্ষানুভূতি বা বেদনা। এ প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত বহির্জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব জানাও যায় না, প্রমাণও করা যায় না। ভাষা, অনুমান এবং কোন প্রকার জ্ঞান হইতেও উহার অস্তিত্ব জানা বা প্রমাণ করিতে পারা যায় না।

প্রতিপক্ষ যদি বলেন যে যে কারণে সবিতর্ক জ্ঞান অগ্রাহ্য এবং অসত্য ঠিক সেই সেই কারণের জন্য প্রত্যক্ষানুভূতিজনিত অবিচারী জ্ঞান অগ্রাহ্য হওয়া উচিত। কারণ আমরা দেখিতে পাই প্রত্যক্ষানুভূতি এক রকমের বস্তু আর বহির্জাগতিক অন্য রকমের বস্তু। সেই জন্য প্রত্যক্ষানুভূতিকেই বহির্জাগতিক বস্তু বলা কিম্বা প্রত্যক্ষানুভূতি হইতে অন্য কোন কিছুর সাহায্য ব্যতীত বহির্জাগতিক বস্তু directly পাওয়া যায় বলা অসঙ্গত। ইহার উত্তরে বৈভাষিকগণ কহিয়াছেন—এরূপ যুক্তি আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজ্য নহে। কারণ যদি প্রত্যক্ষানুভূতি হইতে একচোটে (directly) বহির্জাগতিক বস্তু পাওয়া যায় না বটে কিন্তু পরোক্ষ ভাবে বা indirectly আমরা উহা হইতে বহির্জাগতিক বস্তু পাইতে পারি। যেমন মণির রশ্মি প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা জানিতে পারি ঐ রশ্মি মণি হইতে আসিতেছে এবং সেই জন্য ঐ মণি হস্তে গ্রহণ করিতে পারি কারণ ঐ রশ্মির নীচেই মণি থাকে। সুতরাং ঐ রশ্মিকে মণি বলাতে কোন ভুল হয় না। কিন্তু সবিচার জ্ঞান দ্বারা যদি প্রথমেই শুক্তিকে রৌপ্য বলিয়া গ্রহণ করি তাহা হইলে হাজার চেষ্টা করিলেও যে রৌপ্য মিলিবে না তাহা সকলেই জানে।

এ ক্ষেত্রে বৈভাষিকগণ যে সৌত্রান্তিকগণের যুক্তির যথাযথ উত্তর না দিয়া পাশ কাটাইয়া গেলেন তাহা আমরা দেখিলাম। প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্যেও যে অনুমান রহিয়াছে তাহাং সৌত্রান্তিকগণ উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈভাষিকগণ সে কথার উত্তর না দিয়া অবান্তর কথা বলিলেন।

অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় বৈভাষিকগণের যুক্তি সৌত্রান্তিকগণের যুক্তির সহিত মিলিয়া যায়, সেই জন্য মাধবাচার্য্য তাহার পৃথক বিবরণ প্রদান করেন নাই।

বুদ্ধদেবের উপদেশের বিভিন্নরূপ হইল কেন?

বহু প্রাচীন কাল হইতেই একই গুরুর একই উপদেশ শিষ্যবর্গ তাহাদের নিজ নিজ চিন্তা ও চরিত্রের জন্য নানা ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। বুদ্ধদেবের উপদেশ তাঁহার শিষ্যগণ আপনাদের চরিত্র ও চিন্তানুসারে বিভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই জন্য বোধচিত্ত (বোধহয় বসুবন্ধু কৃত বোধিচিত্ত) নামক গ্রন্থের টীকায় বলা হইয়াছে,—

মানবনেতা বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর চরিত্র ও অভিপ্রায় অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার যান, পথ বা মার্গ অবলম্বন করিয়া নানাবিধ আকার ধারণ করিয়াছে। কারণ এই সকল উপদেশের কতক খুব গভীর, কতক আবার অগভীর বা বাহ্যিক, কতক আবার গভীর অগভীর দুই-ই। সার্ব্বজনীন শূন্যবাদ নামক অদ্বৈতবাদও শিষ্যমণ্ডলীর গুণে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

আয়তন।

বৌদ্ধগণের মতে অন্তর্জ্জাগতিক দ্বাদশ আয়তনের অর্চ্চনা করিলে সুকৃতি বা আনন্দ লাভ করা যায়। প্রচুর পরিমাণ ধন উপার্জ্জন করিয়া এই দ্বাদশ আয়তনের অর্চ্চনা করা বিধেয়। এই দ্বাদশ আয়তনের নিয়স্থিত বস্তু সমূহ অর্চ্চনা করা অসঙ্গত। এই দ্বাদশ আয়তন বলিতে বৌদ্ধগণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অনুভব শক্তি বা বেদনা, বিজ্ঞান বা বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ বুঝেন। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে প্রতীত্য সমুৎপাত নামক প্রামাণ্য বৌদ্ধ গ্রন্থে দ্বাদশ আয়তনের স্থানে ষড়ায়তনের উল্লেখ আছে। ষড়ায়তনের অর্থ ছয়টি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ বা মন। এখানে ইন্দ্রিয় বলিতে যেন কেউ দেহগত যন্ত্র না বুঝেন। দর্শন শাস্ত্রে রূপ রসাদি জ্ঞান সংগ্রহের শক্তির নামই ইন্দ্রিয় (জিজ্ঞাসা, ২০০)।

বিবেক বিলাস নামক গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের মূল সূত্রগুলি অতি সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কয়েক স্থানে এই গ্রন্থের উক্তির সহিত বৌদ্ধ মতের তারতম্য লক্ষিত হয়। তথাপি বিবেক বিলাসের মূল্য যথেষ্ট। এই গ্রন্থের মতে বৌদ্ধগণের নিকট সুগত বুদ্ধই দেবতা আর জগত ক্ষণস্থায়ী এবং পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ কেবল পরিবর্ত্তন পরম্পরা মাত্র। বৌদ্ধগণ চারিটি মহাসত্য বা আর্য্যসত্য স্বীকার করেন, যথা—(১) দুঃখ, (২) আয়তন, (৩) দুঃখ ও আয়তনের সমষ্টি এবং (৪) দুঃখ নিবৃত্তির পথ বা মার্গ। দুঃখ যাহাতে প্রকাশ পায় তাহার নাম স্কন্ধ, এই স্কন্ধ পঞ্চবিধ প্রকারের, যথা—(ক) বেদনা (Sensation) (খ) সংজ্ঞা, বোধ বা প্রতীতি (Perception) (গ) বেদনা ও সংজ্ঞা ছাড়া অন্যান্য চিদ্‌বৃত্তি বা সংস্কার, (ঘ) বিজ্ঞান (Consciousness) যাহা দ্বারা এই তিনটি স্কন্ধ সমষ্টি বদ্ধ হয়। এই চারিটি স্কন্ধের সমষ্টিকে নাম বা অংন্তর্জগত বলা হয়। (ঙ) রূপ বা বাহ্য জগত। (এইখানে বোধহয় গাফ মহোদয় সংজ্ঞার তর্জ্জমা করিয়াছেন Name আর বিজ্ঞানের তর্জ্জমা করিয়াছেন Consciousness আর সংস্কারের তর্জ্জমা করিয়াছেন impression। যদি তাহাই সত্য হয় তবে অনুবাদ যথোচিত হয় নাই বলিতে হইবে। কিন্তু সে ভ্রম গাফ মহোদয়ের না বিবেক-বিলাস রচয়িতার?) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অনুভব শক্তি এবং জ্ঞান বা বুদ্ধি এই দ্বাদশটি আয়তন বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন। এই সকল আয়তন হইতেই তৃষ্ণা আকাঙ্খা ইত্যাদি জন্ম গ্রহণ করে। দুঃখ এবং আয়তনের সমষ্টি আত্মার স্বভাব বা অন্তর্জ্জগত নামে পরিচিত, অর্থাৎ দুঃখ এবং আয়তনের সংযোগ ব্যতীত আত্মা আর কিছুই নহে। সমস্ত বস্তু ও ধারণাই ক্ষণস্থায়ী বা পরিবর্ত্তন পরম্পরা মাত্র—এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে মনের মধ্যে স্থান পাইলে মানুষ নির্ব্বাণ লাভ করিতে সক্ষম হয়। সেইজন্য এই সার্ব্বজনীন ক্ষণস্থায়ীত্বের দৃঢ় ধারণাই নির্ব্বাণের উপায় পথ বা মার্গ বলিয়া কথিত হয়। বৌদ্ধগণের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ উপায়ে আমরা জ্ঞান লাভ করিতে পারি। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। উঁহাদের মধ্যে বৈভাষিকগণ অন্তর্জ্জগত ও বহির্জ্জগত, জ্ঞান ও বস্তু উভয়ই স্বীকার করেন। সৌত্রান্তিকগণ অন্তর্জ্জগত বা জ্ঞান স্বীকার করেন এবং বহির্জ্জগত জ্ঞান হইতে অনুমেয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। সুতরাং সৌত্রান্তিকগণ বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও উঁহার স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার

বিবেক বিলাসের বৌদ্ধদর্শন।

করেন না। যোগাচারগণ বহির্জগত একেবারেই স্বীকার করেন, তাঁহারা শুধু অন্তর্জগত বা রূপময় বুদ্ধি বা জ্ঞানের কর্ত্তা স্বীকার করেন। মাধ্যামিকগণ কিছুই স্বীকার করেন না, সকলই শূন্যময় বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। তাঁহারা জ্ঞান স্বীকার করেন বটে কিন্তু জ্ঞানের কর্ত্তা বা বিষয় কিছুই স্বীকার করেন না। নির্ব্বাণ সম্বন্ধে উক্ত কয়েকটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরই একমত। এই নির্ব্বান তৃষ্ণা ইত্যাদি পরিশূর্ণ জ্ঞান ও ধারণা স্রোত নিরোধ করিতে পারিলেই লাভ করা যায়। চর্ম্মাবরণী (চর্ম্ম-নির্ম্মিত আবরণী নহে, চর্ম্মের জন্য বা গোপনীয় স্থান সমূহ আবৃত করিবার জন্য কাপড় বা অন্তরবাস), জলপাত্র, মুণ্ডিত মস্তক, ছিন্ন কন্থা, দিনরাত্রি মধ্যে দ্বিপ্রহরে একবার মাত্র আহার, সজ্ঞ এবং কাষায় বসন বৌদ্ধ ভিক্ষুর চিহ্ন।

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহস্থিত বৌদ্ধদর্শনের আলোচনা এইখানে সমাপ্ত হইল। বৌদ্ধদর্শন এ অত্যন্ত জটিল, মাধবাচার্য্য অত্যন্ত সংক্ষেপে উহার বর্ণনা করিয়া উহাকে আরও জটিল ক তুলিয়াছেন। গাফ মহোদয় টীকা টিপ্পনি বিরহিত আক্ষরিক অনুবাদ দ্বারায় বিষয়টি অ জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন। মাধবাচার্য্যের এই দর্শনটুকুর প্রত্যেক যুক্তি ভাল ক বুঝাইতে বাংলা কিম্বা ইংরাজীতে কেহ এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা ন অনেকেই ইহাকে অপাঠ্য এবং অযোগম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এত বড় জটিল বিষ যদি কিয়দংশও সহজবোধ্য করিয়া থাকি তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

শ্রী প্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

ম্যালেরিয়া জ্বর।

—:•:—

ওগো ম্যালেরিয়া জ্বর!
আমি যে তোমার বড় ভালবাসি 'করিনে ক' অন্তর।
পল্লীর তুমি নিজস্ব ধন
আমাদের(ও) তাই বুকের রতন
কম্পন-মাখা মুর্ত্তি তোমার অঙ্কনে রত কবি।
কলমে সাকার হও নিরাকার সহরে দেখাব ছবি।
হে সহর ভয় নাই,
পল্লী কখনো আসিবে না নিতে তব সন্তানের ঠাঁই।
তীর্থ আমার সে যে—
তোমার প্রভাব বিথারি রয়েছে যেথায় পূর্ণ তেজে।
পচা পুকুরের পঙ্কিল জলে
কিনিয়া তোমায় স্বাস্থ্য বদলে
জননীর জাতি দুর্ব্বল আজি, দুর্ব্বল তাই সবে।
বাঁশ-বাগানের সমল হাওয়ায় স্বাস্থ্য কেমনে রবে।
হে সহর অভিনব!
তা' বলে ভেব না কর জোড়ে আমি চাহিব 'পার্ক' সব।
পেটটি আমার মোটা—
মেরুদণ্ডের হাড় কয়খানি গোণা যায় বটে গোটা।
বৈকাল বেলা অবসাদ আসে
'টন্-টন্' করে মাথার দু'পাশে

শুতে পেলে পরে বসিতে চাহি না, অভ্যাস এই মত
এর পরে আর বল ম্যালেরিয়া ক্ষমতা তোমার কত!
হে সহর বলি ফের—
অঞ্জলি বাঁধি যাচ্ঞা করি না, ঔষধ আমি এর।
খবর নেয় না কেহ—
হ'লেও দৈন্য রোগ-শোক-তাপে জর্জ্জর এই দেহ
চোখের সামনে আজি এটি গেল
প্রাণের প্রিয়েরা কত শোক পেল
বসনে অশ্রু নিবারি গোপনে নামিব তবু ত' কাজে।
শত ঘটনার মাঝে শত স্মৃতি নির্মম এ বুকে বাজে।
সহরের কোলাহল—
তা' বলে ত' আমি চাহি না কর্ম্মে ও বিস্মৃতি অবিরল।
বিদায় ? তা' হলে আসি !
শোনাব না আর আমার বুকের গোপন বেদনা রাশি।
ম্যালেরিয়া জ্বর থাকুক্ মোদের
যা' আছে তা' হোক প্রিয় সকলের
আর যাহা আছে তাই নিয়ে থাক্ কুইনিন্ হোক্ অরি;
ভক্ত তোমার চাহিছে মেলানি, বিদায়-প্রণাম করি।
সহর, ভেব না তুমি
বিদায়ের পর রব চিরকার তোমার বক্ষঃ চুমি' ॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য পুরাণতীর্থ

পুরুষ ও নারী।

(১)

ভারত পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধকে গঠিত নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিল একটা বিশেষ আদর্শে, একটা বিশেষ ধরণে। নারীকে সে পুরুষের একান্ত অনুগত করিয়া বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছিল। পুরুষের হইতে আলাদা ব্যক্তিগত সত্তা ও সার্থকতা নারীদের দেওয়া হয় নাই। পুরুষের যে জীবনধর্ম্ম নারী তাহা স্বীকার করিয়া লইবে, তাহারই পরিপূর্ত্তির জন্য নারী আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিবে। পুরুষই স্থির করিয়া দিতেছে লক্ষ্য, সাধনা—নারী হইতেছে পুরুষের পথে সহায় শক্তি যে নারী যতখানি আপনার নিজত্ব, আপনার বৈশিষ্ট এ ভাবে পুরুষের মধ্যে হারাইয়া ফেলিতে পারিয়াছে, আপনাকে বলি দিয়া পুরুষকে জড়াইয়া ধরিতে পারিয়াছে সেই ততখানি নারীত্বের আদর্শ।

শুধু ভারতে কেন, আগে সর্ব্বত্রই নারীর জীবন এই ভাবে গড়িয়া তোলা হইত। ইউরোপেও এই নিয়মই ছিল। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ত কথাই নাই, মধ্যযুগ পর্য্যন্ত এবং তাহার পরেও এই আদর্শের জের টানা হইয়াছিল। তবে ভারতের এই আদর্শকে রীতিমত আদর্শেরই পদে স্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহাকে ধর্ম্মের নীতির বাঁধনের মধ্যে ফেলিয়া একটা সাধনার বস্তু করিয়া তোলা হইয়াছিল। ইউরোপ বড় জোর ইহা ছিল একটা সামাজিক ব্যবস্থা বা সংস্কার; কিন্তু ভারতে এই সামাজিক ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়া দিয়াছিল তাহাকে জীবন সাধনার, জীবনের ঊর্দ্ধগতির সহিত মিলাইয়া ধরিয়া। নারীর ব্রত পুরুষের মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া দেওয়া, পুরুষেরও কর্ত্তব্য নারীকে আপনার মধ্যে তুলিয়া ধরা।

এই রকম ব্যবস্থার বা আদর্শের একটা হেতুও ছিল। ইহা যে কেবল পুরুষের প্রভুত্বলোভ বা নারীর অসহায় বশ্যতা প্রমাণ করিতেছে তাহা নহে। পুরুষ ও নারীর নিজের নিজের স্বভাবের একটা বিশেষ সত্যকে ধরিয়াই এই সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে পুরুষের চক্রান্ত নাই, নারীও একান্তই বাধ্য হইয়াই যে এই সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে তাহাও নয়। পুরুষের সেই সত্য কি, নারীর সেই সত্য কি যাহার বশে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই নেতা ও নীতের সম্বন্ধ অথবা প্রভু ও দাসের সম্বন্ধ সমাজে দেখা দিয়াছে।

পুরুষের সহজ প্রতিষ্ঠা মনের জগতে, নারীর সহজ প্রতিষ্ঠা প্রাণের জগতে। উপনিষদের কথায় পুরুষের জীবন-কেন্দ্র হইতেছে মনোময় কোষে, মনোময় সত্তায়, আর নারীর জীবনকেন্দ্র হইতেছে প্রাণময় কোষে, প্রাণময় সত্তায়। তাই পুরুষ স্বভাবতঃ জ্ঞানের প্রতীক আর নারী শক্তির বিগ্রহ। প্রাণশক্তির ধর্ম্ম হইতেছে প্রথমতঃ জীবকে যতদূর পারা যায় পৃথিবীর সাথে বাঁধিয়া রাখা, নিম্নাভিমুখী করিয়া, ঘরমুখী করিয়া রাখা। এই জন্যই নারী হইয়া উঠিয়াছে সমাজ গড়িবার কেন্দ্র, নারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম গৃহে, গৃহ রচনায়—গৃহিণীত্বে হয়ত। প্রাণশক্তির আর একটা দিক আছে, তাহা গড়িতে ততখানি চায় না বা পারে না, যতখানি চায় বা পারে ভাঙ্গিতে। প্রাণশক্তির মধ্যে আছে একটা অবাধ গতি, চঞ্চল আবেগ, অতৃপ্ত বুভুক্ষা। প্রকৃতির একদিকে যেমন দেখি রহিয়াছে সৌম্য, শান্ত, কল্যাণকর মূর্ত্তি—জ্যোৎস্না, মধুযামিনী, দিনের আলো, বরষার জল, ফল ফুল, রূপ, রস, গন্ধ; অন্যদিকে তেমনি তাহার আছে একটা ভীষণ প্রলয়ঙ্কর রুদ্রমূর্ত্তি—অমানিশা, কালবৈশাখী, ঝঞ্ঝাবাত, অগ্ন্যুৎপাত, মহামারী। ভীম ও কান্ত ভাবের সমাবেশে নারীও প্রকৃতির মতনই 'অধৃষ্যশ্চাধিগম্যশ্চ'—একদিকে দুরাসদ, আর একদিকে লোভনীয়।

নারীশক্তির মধ্যে রহিয়াছে একটা অন্ধ প্রমত্ত ভাব, একটা অধোমুখী টান একটা অনিশ্চয়তা। তাই তাহাকে বশীভূত করিয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে পুরুষের জ্ঞানের ঊর্দ্ধগতির কাছে। প্রাণময় শক্তিকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য একটা বিশেষ প্রণালীর মধ্য দিয়া চালাইয়া লইবার জন্য, সংহত শৃঙ্খলিত করিয়া উচ্চতর আদর্শের দিকে উঠাইয়া ধরিবার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল মনোময় সত্তার চাপ, প্রভাব। নতুবা সমাজ গড়িয়া উঠে না, টিকিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের শৃঙ্খলা ও স্থিতির জন্যই দরকার হইয়াছিল পুরুষ ও নারীর প্রভু দাসী ভাব। মনোময় সত্তার সহজ ধর্ম্ম হইতেছে জ্ঞানের সাধনা, আদর্শের নিরূপণ, জীবন ব্রতের স্বরূপনির্ণয়। তাই দেখি পুরুষই স্থির করিয়াছে লক্ষ্য, বিশেষ দীক্ষা; নারী আপন প্রাণশক্তিকে তাহারই সাথে জুড়িয়া দিয়াছে—তাহারই পরিপূর্ণতার স্বার্থকতার জন্য। প্রাচীন সমাজ নারীকে স্বাতন্ত্র্য দিতে যে চাহে নাই বা পারে নাই, এই হেতু। প্রাণশক্তি যাহাতে সংযমের ভিতর থাকে, যাহাতে তাহা উদ্বেগ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া না চলে সমাজে যাহাতে একটা কেন্দ্রাতীত ভাঙ্গনের ধারা না ফুটিয়া ওঠে সেই গোষ্ঠীগত প্রয়োজনের চাপে চারিদিকে একটা দেয়াল গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অজুহাতে

অজ্ঞানেও তাহাকে এমন নিগড়ে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। নারীর স্বাতন্ত্র্য অর্থ প্রাণশক্তি পথ অবাধে খুলিয়া দেওয়া—তাহাতে সমাজে শক্তির বিকাশ হইতে পারে, কিন্তু সে শক্তি কোন্ পথে চলিবে তাহার ত স্থিরতা নাই; তাহা ভালও করিতে পারে মন্দও করিতে পারে, কিন্তু সমাজ এমন অনিশ্চিত জিনিষের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে পারে না। তাই শক্তিকে খাট করিয়াও, তাহাকে দিতে চাহিয়াছে একটা নিশ্চিত পরিমিত মূর্ত্তি। পুরুষের মনোময় সত্তার জ্ঞান-চক্ষু দিয়া সে চালাইয়া লইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছে নারীর অন্ধ প্রাণশক্তিকে।

অবশ্য এমন কথা বলা চলে না যে পুরুষ মাত্রই হইতেছে জ্ঞানের আধার, আর নারী মাত্রই হইতেছে শুধু প্রাণশক্তির বিগ্রহ। ইহার বিপরীত প্রমাণও সমাজকে যথেষ্ট মিলে। কিন্তু কথাটা হইয়া হইতেছে সাধারণ ধর্ম্মের কথা, ব্যক্তিগত সত্যাসত্য ছাড়াইয়া যে তত্ত্বগুলি জীবনধারার পিছনে থাকিয়া কাজ করিতেছে তাহার কথা। সমাজকে দেখিতে হইয়াছে সাধারণ শক্তির প্রকরণকে, তাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নামে ও রূপে তাহার ব্যবস্থা অনুপযুক্ত মনে হইলেও, মোটের উপর সমাজশৃঙ্খলার জন্য তাহা মানিয়াই লইতে হইয়াছে।

"বিজলী" শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

সার্থকতা।

—:*:—

বীণা বেজে বেজে এইমাত্র থেমেছে, তার শেষ ঝঙ্কার ঘরের মাঝে বদ্ধ হয়ে ঘুরে ঘুরে কেঁদে বেড়াচ্ছে। দিনের শেষ আলো পাহাড়ের উচ্চতায় ঢাকা প'ড়ে গেছে, তাই,—অসময়ে 'এল আঁধার'। সুচেতা স্তব্ধভাবে বীণা কোলে ব'সে ভাবছিল, 'একি সুর আজ তার অজানিত ভাবে আত্ম-প্রকাশ করলে! এ ভাব নিয়ে ত' মনে কোন দিনই সে গাইতে বসে না, আর আজও বসেনি। তবে একার প্রাণের বেদন কা'র হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক ব্যথার আভাষ আজ তার হাত দিয়ে তারই বীণা কাঁদন গাইল।"

সান্ধ্য ভ্রমণের পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রী ঘরে ঢুকে বললেন, "তুমি এমন সুন্দর বাজনা কার কাছে শিখেচ' বলত সু—?" লজ্জিত ভাবে সুচেতা বললে, "এর মধ্যে যে আজ ফিরলেন? কাল ত হাফ হলিডে।" "তুমি কি মনে করছ' আমি আজ বেরিয়েছি, মোটেই না। বেরুবার উপক্রম করেছি মাত্র এমন সময় তোমার বীণ্‌ কেঁদে উঠ্‌ল'। কেউ কাঁদলে কি বেরুন যায়? এমন সুন্দর সন্ধ্যা তুমি এমনি করে মাটি করলে যদি, ত' শাস্তি স্বরূপ আবার সুর বসাও, বেড়ানের সুখ গানের মাঝে সমাপ্ত হোক্।"

দু'বছর হ'ল সুচেতা পশ্চিমের এই বোর্ডিংয়ে দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হয়ে এসেছে। সে বড় একটা কারুর সঙ্গে মেশে না। নিজের কাজটি ও অবসর কালে বীণা বাজিয়ে প্রবাসী চিত্তকে জাগিয়ে রাখে। তার ভিতর কার সংবাদ অন্য কেউ কিছু জানে না। সুচেতার আকর্ষণী শক্তি এমনি বেশী ছিল যে এই সুন্দরী তরুণীর বিনা আহ্বানে ও বিনা আলাপে উচ্চ হতে নিম্নপদস্থ সকল 'টিচার'রাই তাকে ভালবাসতেন।

* * *

সামনে পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে রূপার থালার মত উজ্জ্বল চাঁদের আধখানা মুখ দেখা যাচ্ছিল. তখন আধা আলো, আধা আঁধিয়ারে খেলা চলছিল,—বোর্ডিংয়ের সামনে যে কেয়ারি করা ফুলের বাগান ছিল, তার মধ্যে সুচেতা একখানা চেয়ারে বসেছিল একলা।

যুঁই, রজনীগন্ধার গন্ধে মন তার উধাও হয়ে গিয়েছিল' কোন এক নিভৃত পুরীর মাঝে, যেখানে তার গোপনতার সু-গোপন জিনিষ রেখে সে, চলে এসেছে। মাতাল মন কয়েক বছরের সুখদুখময় স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে একটা দুখের হর্ষ, সুখের বেদনে সুচেতার প্রাণ উদ্বেল করে তুলেছিল। 'তলিয়ে' পড়া মনটাকে তোলবার বৃথা চেষ্টা না করে সে, সেই অতল জলে নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে সঁপে দিয়ে বাহ্য ভাবে সে বেশ নিশ্চিন্তে ব'সে আরাম খাচ্ছিল। কতক্ষণ পরে সে নিজেকে নিজেই যেন ধম্‌কে উঠল—"ছিঃ, নিজে হেলায় যা পরিত্যাগ করে এসেছি, আজ আবার তারই জন্যে আঁখি ঝরে কেন! ব্যর্থতা আবার কি? ব্যর্থ! জীবন কখন ব্যর্থ হতে পারে কারুর? দুর্ব্বলতা! এই দুর্ব্বলতার জন্যেই নারী, পুরুষের কাছে এত তুচ্ছ—এত হেয়। অদৃষ্টের' একি ফের? সমস্ত জীবনটা 'অদৃষ্টকে' সঁপে দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে হবে, 'অদৃষ্ট আমার অদৃষ্ট।' এ কি ভয়ার্ত্ত নারী জীবন!"

মাস কাবার। সুচেতা তার মাইনের অর্দ্ধেক পোষ্ট করে ফিরছিল। তার পাস দিয়ে দ্রুত একখানা মোটর হর্ণ বাজিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্যমনস্ক সুচেতা সেখানায় নজর করতে গিয়ে চমকে উঠল একি! মোটর-আরোহীর মুখখানা যেন বড় পরিচিত; সেই কি না! সে কেন এখানে আসবে? পড়ন্ত রোদে মাথাটা তার হঠাৎ ধরে গেল, কপালটায় হাত দিয়ে সে ভাবলে, "ভুল দেখেছি। কিন্তু এ কি রকম ভুল।" দিন কতক থেকে তার মানসিক অবস্থা যেরূপ বিকৃত হয়ে উঠেছে তাতে বড় সুবিধে বলে বোধ হয় না।

সন্ধ্যার সময় সে ক্লান্ত হয়ে বোর্ডিংয়ে ফিরে এল' তখনও অন্যান্য 'টীচার'রা ফেরেন নি। সুচেতা ক্লান্তির আতিশয্যে 'বেড্-রুমেই তার শ্রান্ত দেহখানি লতিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে পড়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে 'লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট' এসে সুচেতাকে একখানি 'খাম' দিয়ে বললেন "তোমার একজন আত্মীয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে এই পত্র রেখে গেছেন।" তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাড়াতাড়ি সুচেতা নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চ'লে গেল। ঘরে লাইটের আলোয় চিঠিটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে নিয়ে সুচেতা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, তারপর যেন হঠাৎ জেগে উঠার মত বললে-- "না, না, সমস্ত মিথ্যে! যে ভুলের সংশোধন নেই, তার জন্যে বৃথা আক্ষেপ করে লাভও কোন নেই। ক্ষমা? বেশ, তোমাকে তাইই করলুম।"

* * *

ছ' মাস পরের কথা। টিফিন্ ঘণ্টা বেজে উঠল্, ক্লাসের মেয়েরা সব অস্ফুট কোলাহলে তাড়াতাড়ি ক'রে বেরিয়ে গেল—সুচেতাও বেরিয়ে এসে মেয়েদের খেলা দেখ্ছিল। সেক্রেটারী মহাশয়া নিজে এসে সুচেতাকে বললেন "কই, তোমার যে এখানে কোন আত্মীয় আছেন তা' ত' জানিনি, আর তুমিও তা' কোন্ দিন বলনি'। আচ্ছা এখনই তোমাকে যেতে হবে, তোমার আত্মীয় পীড়িত। সেখান হতে মোটার আর ঝি এসেছে, শীগ্গির ঠিক হয়ে এস। এই নাও, তোমার চিঠি। অবশ্য আমারও আলাদা চিঠি আছে। কম্পিত হাতে সেইখানেই দাঁড়িয়ে সুচেতা চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। স্পষ্ট মেয়েলি ধাচে লেখা,—

সুচরিতাসু—

যদিও আমরা উভয়ে উভয়কে চিনি না, তবুও আজ এই বিদেশে আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থিনী। আশা করি হতাশ হব না। ইতি— কমলা দেবী।

ঘরে এসে তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করতে করতে সুচেতা ভাবলে, "মন্দ-লোককে তুমি নিমন্ত্রণ করনি। জানি না ভগবানের উদ্দেশ্য কি। আমার এ যাত্রার শুভ ফল যে কি জানতে যদি পারতুম, তা হ'লে নিজের কোন উপকার না হোক অন্ততঃ নিমন্ত্রণকারিণীর একটু উপকার হতে পারত। আজ এ পীড়িত হৃদয় নিয়ে কোন্ নারীর সাহায্য করতে যাচ্ছি তা যদি জানতাম, জানতাম যদি এ তীর কে হয় তবে—পারতাম কি।··· ···"

বিস্তীর্ণ প্রকৃতির বুকের উপর ছোট একখানি বাংলো দাঁড়িয়ে আছে। লাল কাঁকর বিছান রাস্তা। মোটর আসতেই সুচেতাকে নিয়ে ঝি ভেতরে চলে গেল,—বোডিংয়েরও একজন ঝি সুচেতার সঙ্গে এসেছিল। সারা বাড়ীখানা যেন স্তব্ধ হয়ে আছে, কোন্ এক অতর্কিত মর্ম্মন্তুদ অবসরের অপেক্ষায়। সুচেতা ধীর দৃঢ় পদে ঝির সঙ্গে একটা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল; বিস্তৃত এক শয্যার পানে চেয়ে ঘরের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে প'ড়ল। এতখানি সে যে কল্পনাতেও আঁকতে পারেনি। মৃত্যুর পরশে কি মানুষ এমনি হয়ে যায়! একি নিষ্ঠুরতা ! কালের দুয়ারে যেতে হলে কি এমনি নিঃস্ব সর্ব্বহারার সাজে সাজতে হয় গো। হাইত কি দেখতে সে এসেছে, কার কাছে সে এল আজ। মনে মনে সুচেতা বল্লে, ওগো নিষ্ঠুর, হে আমার নির্দ্দয়। এতদিন পরে নিমন্ত্রণের এই কি তোমার শুভ অবসর হ'ল গো! কার দু'খানি কোমল হাত সুচেতার হাত দু'খানি ধরে বললে, "এস,—কাছে গিয়ে দেখ, জ্ঞান নেই।" অবশ আতুর দৃষ্টি তুলে সুচেতা দেখলে যিনি হাত ধরেছেন তিনি বয়সে তার এক কিম্বা কিছু ছোট হবেন। শান্ত শুষ্ক মুখ গম্ভীর, উজ্জ্বল চোখ দুটি ক্লান্তি কালিমার ম্লান, রুক্ষ চুল ছোট কপালখানি ঢেকে দিয়েছে—সুচেতা মুগ্ধ হয়ে গেল।

সমস্ত জানলা খোলা, তার মধ্যে দিয়ে চাঁদের অফুরন্ত হাসি ঘরে ও রোগীর বিছানা স্নিগ্ধ রজত ধারায় ভরিয়ে তুলেছিল। কেতকী, হেনার গন্ধ চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ঘর প্রায় নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে রোগী প্রলাপশব্দ করছে ও কাকে যেন খুঁজছে পাচ্ছে না।······

রাত্রি গভীর, সুচেতা কমলাকে শুতে যাবার জন্যে অনুরোধ করলে ; রোগী তখন একটু শান্ত ভাবে ঘুমচ্ছে।

কমলা একবার রোগীকে ভাল করে দেখে, সুচেতাকে বলে গেল, যেন ঘণ্টা দেড়েক পরে সে তাকে জাগায়।

টিক্, টিক্, টিক্,—ছোট টাইমপিস্‌টা ক্রমাগত সময়ের মাপ মেপে চলেছে। সুচেতা পীড়িতের মুখ পানে চেয়ে অতীত দিনকার আশাভরা স্মৃতিগুলা পুনরায় ঝালিয়ে তুলছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। যৌবন ও বাল্য তখন সবে মাত্র পরস্পর দ্বন্দ্বের আয়োজন করে তুলেছে, কলেজের ছাত্রী সে 'ভাবের' ঢেউ তখন তার কাছে পরিস্ফুট হতে অবসর পায় নি। মানুষ চেনবার বুদ্ধি তার তখনো হয় নি ; সহজ, সরল তৃপ্তিতে তার দিন কাটত ; ব্যর্থতার তীব্র বেদনার স্বাদ কেমন, আর তা আছে কিনা এ সব কোন গবেষণার প্রয়োজন তার ছিল না তখন। চিরন্তন প্রথামত সে, ধীরেশকে ভালবেসে ছিল পূর্ণ বিশ্বাসে। কত আনন্দের স্বপ্ন, কত আকাশ-কুসুম তার তরুণ প্রাণকে রঙিন ক'রে তুলত! তারপর একদিন তাকে জানতে হয়েছিল মন প্রাণ অন্তর দিয়ে! পুরুষের কাছে নারী প্রেম-ই বল ভালবাসাই বল তার মূল্য কতখানি! জগতের স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী পুরুষেরা ইচ্ছা করলেই নারী-মর্য্যাদার সম্মান ক্ষণভঙ্গুর কাচের মত দু'পায়ে পিষে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে দ্বিধা করে না, একটুকুও তাতে তার বাধ্যবাধকতা নেই—লজ্জা নেই—সেই তার পৌরুষ! সমাজের পাসপোর্ট তার আছে। নারী নির্য্যাতন ;—সে আর এমন বেশী কি। নারীর প্রাণ—বেদনা তার তাতে আসে যায় কি। বাধ্যবাধকতা কিছুই নেই।·········

* *

*

রোগী তার ক্ষীণ হাত দু'খানি তুলে ডাক্‌লে,—"কমলা,—তোমার হাতটা দাও ত' কমলা।" সুচেতা কি করবে স্থির করতে পারলে না ; উঠে গিয়ে অন্য ঘর হতে কমলাকে তুলে আনাও সে অবস্থায় শ্রেয় নয়। একটুখানি ভেবে সে, তার হাতখানা রোগীর দুর্ব্বল হাতের উপর রাখল। রোগী যেন কেমন চমকে উঠ্‌ল কিন্তু কিছু বল্‌লে না, হাতটা বুকের উপর টেনে নিয়ে চুপ করে রইল। পীড়িতের বুকে সুচেতার হাত বারম্বার কেঁপে উঠতে লাগল। তাই ত' একি করছে সে! সে যে সাহায্য করতে এসেছে, গ্রহণ করতে ত' আসে নি।·················

রোগী বল্লে "কমলা, আজ আমার বড় ভাল লাগছে, কেন বল ত! বেঁচে যাব নাকি? কিন্তু বাঁচতে ত' আমার মন চায় না। শুধু তোমার জন্যে যা দুঃখ হয় কিন্তু, তবু আমি বাঁচতে পারিনে। দেখ কমলা, সে আমাকে নিশ্চয় সেদিন দেখেছিল আমি তা যে বুঝেছিলুম। তার বোর্ডিংয়ে গেলুম দেখা পেলুম না, ক্ষমা কর,—অসুস্থ আমি, দেখা করো ব'লে একখানা চিঠি রেখে এলুম কিন্তু কমল—যাক গে। দেখ কমলা তোমার এই যে হাতটা মনে হচ্ছে এ যেন তোমার নয়, তোমার মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না। কমল, আমাকে তোমার পানে ফেরাও ত'।"

সুচেতার দেহের, মনের উপর দিয়ে কম্পনের শিহরণ বইতে লাগল। নিজেকে বুঝি সে আর সামলাতে পারে না, এতদিন—এতক্ষণকার প্রাণপণ চেষ্টায় মর্ম্ম-বীণায় যে ত্যাগের মহামন্ত্র সে তার হৃদয় তন্ত্রীতে জাগিয়ে তুলেছিল, আজ এই মরণোন্মুখ ব্যক্তিতের সংস্পর্শে সে আর—পারছিল না, তার ব্যথার 'সাধন'কে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে। অদম্য আকাঙ্ক্ষা আজ প্রবলভাবে তার সংযমকে ছাপিয়ে উদ্দাম হয়ে উঠ্‌ছে। চিরক্ষুধিত চিত্ত ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, ওই মৃত্যু-ছায়া-স্পর্শ হিম বুকের মাঝে, নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে যেন বল্‌তে চায়,—এসেছি—ওগো এসেছি! আজ তুমি আমাকে নাও, যাবার সময় এ ব্যথা নারীর জীবনে নিমেষের তরে সার্থকতার এতটুকু যাবে ভরিয়ে দিয়ে এ নারীত্বকে সার্থক করে দিয়ে যাও—!··· ······· ···

সুচেতার হাতটা ললাটে রেখে রোগী বল্লে, "কথা কচ্ছ না কেন কমলা!" আপনার বিদীর্ণ প্রায় বুক, অশ্রুবিধৌত অবসন্ন মুখ পীড়িতের মুখের পানে চেয়ে সুচেতার মন আর্ত্তস্বরে ডাক্‌লে "ধীরেশ!—প্রিয় আমার! আজ, এতদিন বাদে নিজের জিনিষ ফিরে নিতে এসেছি, ফিরে দাও, ওগো ফিরে দাও!" নিষ্প্রভ চোখের কোন বেয়ে অশ্রু ঝ'রে পড়ল, রোগী আবেগ ভরে সুচেতাকে তার বিশীর্ণ ক্ষীণ বুকে টেনে নিতে হস্ত প্রসারিত করে বল্লে—"এসেছ সুচেতা! নূতন জিনিষ ত এক মরণ, তাহাই আজ আমার বুকে পোরা, দেবার মত যা কিছু তা'ত সবই দিয়েছি নূতন করে আর কি নেবে সু আমার—"

সুচেতার মনপ্রাণ হাহাকার করে উঠ্‌ল! বিমল আনন্দে—না—মর্ম্মন্তুদ দুঃখে! "ওগো বাঞ্ছিত,—প্রাণের প্রাণ হে,—তুমি আজ বিত্ত,—না চাইতেই ভিক্ষারিণীর প্রাণের তৃষা, যতনে পোষা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চাইছো গো! জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী আমি—পেয়েছি গো

পেয়েছি—সার্থক আমার জীবন ! কিন্তু—কিন্তু—সে যে হ'বার নয় এ জীবনে,—এপারে নয় পরপারে !'

মনকে কঠিন করে, পাষাণ হতেও পাষাণ হয়ে সুচেতা ডাক্‌ল—"কমলা বোন এস ত একবার।"

রোগী অতি ক্ষীণ স্বরে, অতি করুণ সুরে,—সুচেতার বীণের করুণ আবেগ করুণ ঝঙ্কার হতেও করুণ সুরে—ঝঙ্কারে,—প্রাণের তারে তারে কম্পন দিয়ে ডাক্‌ল—সুচেতা—সু— ।'

কণ্ঠস্বর স্ফুরিত হ'ল না। শেষ হয়ে গেছে সব !

মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে সুচেতার প্রাণ সুখদুঃখের অতীত হয়ে—বল্‌ল—এই কি স্বার্থকতা !

শ্রীপরিমল দেবী .

সাময়িক প্রসঙ্গ ।

কার্ত্তিকের পরিচারিকা ফাল্গুনে প্রকাশিত হইল। আমাদের এ ত্রুটীর জন্য সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকার নিকট আমরা লজ্জিত অন্তঃকরণে সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। অগ্রহায়ণ মাসে পরিচারিকার বর্ষ আরম্ভ হইত;—রাজ অনুগ্রহে পরিচারিকা সরকারী ছাপাখনায় মুদ্রিত হয় ; আশ্বিনে পূজার বন্ধ ; তাহার পরও অনেক ছুটী থাকায় পরিচারিকা যথাসময়ে মুদ্রিত হইত না। আমরা এইজন্য পরিচারিকার বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিব। চৈত্রের শেষে নবম বর্ষের পরিচারিকা গ্রাহকগ্রাহিকার নিকট প্রেরিত হইবে। আশা করি, তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া আমরা কৃতার্থ হইব।

পরিচারিকা যাহাতে যথাসময়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং প্রবন্ধ গৌরবে ও অঙ্গ সৌষ্ঠবে পাঠকপাঠিকার আনন্দবর্দ্ধন ও জ্ঞানানুশীলনের সহায়ক হয়, আমরা যথাসাধ্য তাহার চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিব না ; তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পাঠকপাঠিকা, গ্রাহকগ্রাহিকা,

লেখকলেখিকা আমাদিগকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহার জন্য ঘরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি; তাঁহাদের সহায়তাই পরিচারিকার সম্বল। কবি ভবিষ্যতে আমরা তাঁহাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব না।

অন্নসমস্যা ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। নিত্য আবশ্যকীয় প্রায় প্রত্যেক দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য,—চাউল এবারে ৮৷৮৷৹ টাকা মণ। ব্যারাম পীড়া অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু গো-মড়ক বর্ষব্যাপী থাকায় রাজ্য গোশূন্য করিয়া ফেলিল। কৃষক হালের গরু অভাবে সমস্ত জমী চাষ করিতে পারে নাই। রাজসরকার হইতে ইহার নিরাকরণের চেষ্টা কম হয় নাই। নিম্ব প্রজাকে গরু বিনিবার জন্য অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। কোচবিহারে একজন পশুচিকিৎসকের স্থলে আরও দুইজন চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গোজাতির উন্নতির জন্য (ষ্টাড্ বুল) ষাঁড় আনয়ন করা হইয়াছে।

কেবল রাজসরকারের চেষ্টায় কোন উন্নতি সম্ভবপর নয়। অনেক স্থলেই দেখা যায়, কৃষক যথাসময়ে গোপীড়ার সংবাদ দেয় না;—পশু চিকিৎসক গ্রামে উপস্থিত হইলে তাহাকে সাহায্য করে না। এ বিষয়ে রাজ্যের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি,—তাঁহারা নিরক্ষর কৃষককুলকে বিজ্ঞান অনুমোদিক চিকিৎসার উপকারিতা বুঝাইয়া দিন। গোচর ভূমির সুব্যবস্থা হউক।

স্থানে স্থানে জলকষ্ট উপস্থিত। সুপেয় নির্ম্মল জলের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে ওলাউঠা আমাশয় প্রভৃতি ভীষণ ভাবে দেখা দেয়। তাহার সাময়িক প্রতীকারের চেষ্টা সরকার হইতে হইলেও বহু প্রাণ নষ্ট না হইয়া মড়কের অবসান হয় না। রাজ সরকার হইতে এরূপ মড়ক নিবারণের চেষ্টা এ বৎসর বিশেষভাবে করা হইয়াছে। রাজ্যময় পাকা ইন্দারা ও কূপ খননের বন্দোবস্ত হইয়াছে; পূর্ব্বে যে সকল 'এণ্টিকলেরা' মারী নিবারণ উদ্দেশ্যে কূপ খনন করা হইয়াছিল তাহার সংস্কারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কূপগুলির জল যাহাতে দূষিত না হয় তাহার ব্যবস্থা জনসাধারণের হস্তে। তাঁহারা যদি স্বাস্থ্যনীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন তাহা হইলে সংক্রামক ব্যাধির বিলোপ সম্ভব,—নতুবা সকল ব্যবস্থাই পণ্ড হইয়া যাইবে।

'স্বাস্থ্যরক্ষা' আজকাল প্রতি বিদ্যালয়ে পড়ান হয় কিন্তু তাহা পড়ান মাত্রই। যাহাতে স্বাস্থ্যনীতির উপকারিতা আপামর সাধারণের মনে মুদ্রিত হয় তাহার চেষ্টা রিতিমত হওয়া আবশুক। স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধায়ক ব্যবস্থার সহিত, ম্যাজিক লণ্ঠন ও চিত্রাদি সাহায্যে আপামের সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যনীতিপ্রচার করিলে ফল হইবার কথা,—বাংলায় তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে, আমরা আশা করি আমাদের রাজ্যেও অচিরে সে ব্যবস্থা আরব্ধ হইবে।

কোচবিহার রাইস মিল—এতদিন অন্য হস্তে ছিল ও সুবন্দোবস্তের অভাবে অচল হইয়া পড়িয়াছিল। সম্প্রতি মহামান্য রাজসভার আদেশে সদর জেলের সহিত উহা যুক্ত হইয়াছে। ইহার উন্নতিকল্পে লক্ষাধিক মুদ্রা রাজকোষ হইতে মঞ্জুর করা হইয়াছে। এখন আশা করা যায় চাউলের কলটী ভাল ভাবে চলিবে ও রাজ্যের কল্যানকর হইবে। রাজসভা আদেশ করিয়াছেন,—এ কল সরকারের আয়ের পথ রূপে বিবেচিত হইবে না—পরন্তু রাজ্যবাসীর উপকারের জন্য উহা সরকার গ্রহণ করিলেন। ব্যবসায়ীর মত সরকার ত দাঁ বুঝিয়া চাউলের মূল্য চড়াইবেন না—যথাযথ মূল্যে সাধারণের নিকট চাউল বিক্রয় করা হইবে। ইহার ফলে ব্যবসায়ীগণও চাউলের মূল্য অযথা বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইবে না,—কলের দরে বাজার দর রাখিতে বাধ্য হইবে। আমরা আশাকরি, সরকারী চাউল কল হইতে ছোট বড় সকলকেই সোজাসুজী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চাউল সরবরাহ করা হইবে। এজেন্য অন্য ব্যবসায়ীকে মধ্যবর্ত্তী করিলেই বিপদ,—মহাজন পাইকারী দরে কল হইতে চাউল ক্রয় করিবার সুযোগ পাইলেই—দর চড়াইবার পথ পাইবে। অল্প বিস্তর,—মাসে যাহার যেরূপ দরকার সেই অনুযায়ী একবারে কল হইতে চাউল পাইবার সুযোগ থাকিলে সকলে উপকৃত হইবেন,—সদাশয় রাজসরকারের চাউল কল স্থাপন সার্থক হইবে। অন্নপূর্ণার ন্যায় মাতা মহারাণীর রিজেন্ট মহোদয়ার সন্তানবাৎসল্যের প্রকৃত দান লাভ করিয়া অন্নক্লিষ্ট প্রজার প্রাণ রক্ষার পথ উপায় হইবে।